নাটকসমগ্র

প্রথম খণ্ড

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

সম্পাদনা
সৌভিক রায়চৌধুরী ও সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদপট
অপরূপ উকিল

ভিতরের আলোকচিত্র
থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত 'রাজরক্ত' নাটকের একটি দৃশ্য

আলোকচিত্র : নিমাই ঘোষ

NATAKSAMAGRA VOL-1
An anthology of complete plays by Mohit Chattopadhyay. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata-700 073

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশনস্

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা
৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ক্রিয়েশন ২৪বি/১
ড. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৪ হইতে মুদ্রিত

নিবেদন

আমার নাটকের সংকলন ইতিপূর্বে ইতস্তত বেরিয়েছে তবে তার মধ্যে কালানুক্রমিক সংহতি খুব দৃঢ় নয়। এ ব্যাপারে আমার নিজের স্বভাবজাত জাড্য ও আলস্যও বেশ কিছুটা দায়ী। বর্তমান নাটকসমগ্র সেই অভাবপূরণের একটি নতুন সংকল্প, যার জন্যে প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই 'মিত্র ও ঘোষ'-এর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়ের। তাঁর এই আন্তরিক উদ্যোগে সংস্কৃতি ও নাট্যজগতের প্রতি যে অকৃত্রিম আগ্রহ অনুভব করেছি তা সত্যিই বিরল। তাই নিছক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রয়াসকে ছোট করব না।

অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার রায় বর্তমান গ্রন্থের প্রতিটি নাটক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে যে অসামান্য ভূমিকাটি রচনা করেছেন তা এই সংকলনকে বিরল মর্যাদা তো দিয়েছেই, নিঃসন্দেহে ; নতুন করে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে—'হাউ টু রীড আ প্লে'। তবে আমি সঙ্কুচিত বোধ করছি বারবার—এতোখানি শংসা কি প্রাপ্য আমার!

এই সংকলনটি প্রকাশ হওয়ার জন্যে আমার যা যা করণীয় ছিল সে-সবই করেছে সৌভিক রায়চৌধুরী। আমার এই অনুজ বান্ধবের ভালবাসা ও উৎসাহই এই নাটকসমগ্র প্রকাশের উৎস। তাকে প্রয়োজনে যথাযথ সহায়তা করেছে অপর অনুজ, স্নেহভাজন নাট্যকর্মী সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত।

প্রথম খণ্ডে আমার নাটকরচনা-জীবনের প্রথম পর্বটি উন্মোচিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি নাটকই দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে আবৃত ছিল। নতুন প্রজন্মের নাট্যপ্রেমীদের এগুলি কেমন লাগবে সে নিয়ে আমার উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা যে কম নয় তা বলা বাহুল্য।

আষাঢ় ১৪০৮
জুলাই ২০০১

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

নাটক-সূচি

স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক

ভূমিকা

নাটক ছাপা হয় শুধু প্রযোজনার প্রত্যাশা নিয়ে নয়, পাঠকদের কাছে পৌঁছবার জন্যেও। জানিনা নাট্যকার শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত নাটকের পাঠমূল্য তথা সাহিত্যমূল্যটিকে গ্রাহ্য করেন কি না। কিন্তু আমরা করি। প্রযোজনার অভীপ্সায় নাটক সাহিত্যের অঙ্গ নয়—এমন কথা আমরা মনে করি না। বরং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচিত নাটকগুলির বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়। তাই এই সংকলনের প্রকাশনার সূত্রে আমাদের সাধুবাদ প্রকাশন সংস্থাকে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবি-খ্যাতি আমরা জানি। সেই কাব্য-সাহিত্যের হাত ধরেই তিনি কবিতা ছেড়ে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, মনের কোন তাগাদায় তা তিনিই ভাল বলতে পারবেন। আমাদের ধারণা, হয়তো তখন মোহিতের মনে হয়েছিল কবিতা আজ তার বলবার কথাটা বলতে সক্ষম হচ্ছে না। বোধহয় তার ভেতরের নিরন্তর তাগাদা তাকে তাগিদ দিচ্ছিল তখন নাটকের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরবার জন্যে। তাই তার নাট্যপ্রকাশে কাব্যগুণ এবং নাট্যগুণ মিলিত হয়েছিল। ইংরেজ কবি এলিয়টও সেই কারণে নাটকের মধ্যে নতুন সৃষ্টির সমর্থন খুঁজেছিলেন। মোহিতের ক্ষেত্রে এই রকমই কোনও সমর্থন খোঁজা চলছিল হয়তো। "এককালে আমি কবিতা লিখেছি এবং আমার নিজেরও মনে হয়েছিল যে কবিতার মধ্যেই আমি বোধহয় থেকে যাব। কবিতার বাইরে আর কোথায় যাব? সেই ভেবেই আমি কবিতা লিখছিলাম। আমি যখন নাটক লিখতে শুরু করলাম তখন কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার কাছের মানুষও বলেছিলেন মানে তাদের ধারণা যে, আমি কবিতার মধ্যে নিজের যে সংসার পেতেছিলাম এবং তাতে যে খানিক প্রতিষ্ঠা ছিল আমার, সেটা বোধহয় ত্যাগ করে আমি নাটকে চলে এসেছি।"

আর আমরা দেখলাম, তার নাটকেব মধ্যে এক সৎ এবং সারস্বত দায়িত্ববোধের প্রকাশ। আমাদের চমৎকৃত করল তার নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীলরঙের ঘোড়া', 'গন্ধরাজের হাততালি'—সবই 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশের সূত্রে সেই ১৯৬৩ থেকে. ১৯৬৫-র মধ্যে। আমরা এখন বুঝতে শিখেছি নাট্যকারের প্রয়োজন নিরন্তর আত্মনির্মাণ ও শিল্পের বুনন। মোহিতের সেই নির্মাণ আমরা দেখেছি—সেই সঙ্গে আমরা তো আরো দেখবো পরবর্তী এক পর্যায়ে, তার নাটকে লোকজ-ফর্ম, তার নক্‌সা এবং দেশীয় অনুষঙ্গ। আবার এসেছে, তার স্ব-কালের ও স্ব-সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক সংকটের চেহারা এবং ঐতিহ্যও।

'৬০ এবং '৭০ দশকের তার রচনায় একটা বিবর্তনের রূপরেখা আমরা দেখবো এবং তার সৃজনশীলতাও, যার মধ্যে মানুষের অন্তর্লোকের জগৎও আছে আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের সমস্যাও আছে। বরং বলা ভাল মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করাতেই তার উত্তরণ। এই পর্বে নাট্য প্রকাশের ভাষা ধারালো, বিদ্যুৎ চমকিত ভাষার সংবরণ ক'রে--সহজতার আশ্রয় নিয়েছে। এই বিবর্তনও আমরা লক্ষ্য করবো।

আমরা যখন নাটক নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করি তখন দু'টো বিপরীত ঘটনার সম্মুখীন হই। যেমন, প্রথমত, ভাল নাটকে লেখকের ব্যক্তিসত্তা প্রকাশ পাবে যেটা তার

একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবার অন্যদিকে সেই নাট্যরচনার রূপধর্মের মধ্যে অনেক নাট্যকারের কাজের প্রভাব,—অন্য রচনার শৈলীর মিল খুঁজে পাওয়া। প্রত্যেক আলোচনায় আমরা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলি—কিন্তু কখনোই খেয়াল করি না—এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কী? আমরা মোহিতের নাটক নিয়ে আলোচনা করছি—এবং সত্য বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে এই নাটকের এই সংলাপের মধ্যে, কিংবা এই চরিত্রের মধ্যে, এই নাট্যক্রিয়ার মধ্যে আমরা ব্যক্তি মোহিতকে চিনে নিতে পারি—আর এই চিনতে পারার মধ্যেই আমাদের ভাললাগার আনন্দলাভ। এই কথাগুলো বলা হয়ে গেলে আবারো ভাবনায় আসে,—ওই সংলাপ, ওই চরিত্র এবং ওই নাট্যক্রিয়ায়,—একটু অনুধাবন করলে কি আমরা ধরে ফেলবো কোনও পূর্বসৃষ্টির ছায়াপাত—যা একটা বিশেষ সময়ের সাক্ষী —ব্যক্তিগত নয়। যা অন্য কোনও স্রষ্টার অভিজ্ঞতাতেও এসেছে এদেশে কিম্বা ভিনদেশে। অতিবাহিত সময়টাকে একটু দেখা যাক। মোহিতের অনুভবের নির্মাণ কাঠামো কি গড়ে উঠেছিল সেই সময়ের স্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য আবহাওয়ায়! সময়কে আমরা সাধারণত বিচার করতে পারি বাস্তবজীবন দিয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান দিয়ে এবং বিশেষ আদর্শ দিয়ে। কিন্তু কোনটা সময়কে নির্ধারণ করছে?

নাটক যদি একটা প্রতিষ্ঠান হয়,—তাহলে সময়ের নানান রং—রং-এর গভীরতা, বাস্তব জীবন, সমাজ-প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ আদর্শের মধ্যে দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়। এটা অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের ব্যাপার। একটা সময়ের সচেতনতায় যে চালু রূপধর্ম তৈরি হয়—বা প্রকাশের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়—তার একটা বিকল্প ভাবনাও থাকে —সময়ের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও।

নিশ্চিতভাবেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরচনার সূচনাকালে, সেই ষাটের দশকে এই বাংলার চেহারাটা অন্যরকম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপের আধুনিকতায় একটা দর্শন চর্চিত হয়েছিল, তার ঢেউ এসে এই দেশে ধাক্কাও দিয়েছিল। মননে, চিন্তায় একটা ওলোট-পালোটের প্রকাশ ঘটছিল। সংবেদনশীল কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ওপর তার প্রভাব পড়বে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্য হই—মোহিত আলোড়িত হয়েও—তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছিল। কী করে আমরা ভুলি যে কবিতায় 'মা নিষাদ' উচ্চারিত হওয়ার আগের দস্যুর মতই, বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল এই কবি। যে বাউল,—সে একতারার সুরকে ভুলবে কী করে? তাই আমাদের সময়ের পাপ এবং ক্ষয়কে তাঁর কলমে সেই কবে তুলে এনে লিখেছিল "আমরা চাইনি কেউ অমন সুন্দর স্নাইপ মরে যাক গোধূলি বেলায় / প্রণয় নিরত ঘুঘু দম্পতির মৃত্যুও ভাবিনি / ভূলুণ্ঠিত হাঁসগুলি ভেবেছিল সাইবেরিয়ায় ফের চলে যাবে / ওদের মায়ের দুঃখ কোনওকালে চাইনি কখনো।"—নাটকেও তার এই সংবেদনশীল গুণাগুণ বর্তমান। কবিতা থেকেই তার নাটকের ক্ষেত্রে বিচরণ—বিচরণ এই অনায়াস কথন ভঙ্গী নিয়েই, এই সংবেদনশীলতা নিয়েই—যা গভীর অথচ সংযত সূক্ষ্ম কারুকার্যে খোদাই করা।

ঊনষাটের খাদ্য আন্দোলন, বাষট্টিতে ভারত-চীন সংঘর্ষ, তার জের টেনেই চৌষট্টিতে ভারতীয় সাম্যবাদী দলের দ্বিখণ্ডীকরণ। এ সবের প্রভাব সচেতন নাট্যকারের ওপর পড়েছিল। সেই সময়ের আগেই বাংলা নাটকে দুটি ধারা প্রতিষ্ঠিত। নতুন নাট্য আন্দোলনে শম্ভু মিত্রের অবদান এবং অন্যদিকে উৎপল দত্তের চিন্তাধারায় নাট্য ও

নাট্যনির্মাণ। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লেখা হয়েছে। অন্যদিকে সোমেন নন্দীর অনুবাদে চলে এসেছে ইওনেস্কোর নাটক ইত্যাদি। তারই মধ্যে নাটকে রাজনীতি এবং রাজনীতিহীনতার তর্কবিতর্ক সমানে চলেছে তখন। মোহিত কি তখন কোনও রাজনৈতিক আততি ছাড়াই মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম মোচড়ের নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন? এই প্রশ্নটা তুলেই আমি ক্ষান্ত থাকতে চাই।

এই সংকলনে গ্রথিত নাটকগুলি নিয়েই এবার আলোচনা করতে চাই। সময়ের ধাপে ধাপে মোহিতের নাট্যরচনা যে বদলে যাবে সেটাও আমরা লক্ষ্য করবো।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' (১৯৬৩) থেকে 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' (১৯৭০) আর তার পরই ১৯৭২ সালে 'রাজরক্ত' এই সংকলনে পূর্ণাঙ্গ নাটকের এই ইতিবৃত্ত তুলে ধরে আমরা দেখবো 'রাজরক্ত' এক সন্ধিক্ষণের নাটক। এখান থেকেই নাট্যকারের পর্বান্তর শুরু হবে। এই পর্বান্তরের আগের স্তরটি বুঝে নিতে আমরা প্রথমে ৬টি নাটককে বেছে নেব। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' 'নীলরঙের ঘোড়া' (১৯৬৪), 'মৃত্যু সংবাদ' ('৬৫), 'গন্ধরাজের হাততালি' ('৬৫), 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' ('৬৬), 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' ('৬৭); সংকলনের বাকি পূর্ণাঙ্গ নাটকের তালিকায় আছে 'দ্বীপের রাজা' ('৬৭), 'নিষাদ' ('৬৮), 'বাঘবন্দী' ('৭০), 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' ('৭০)। এই নাটকগুলি সমকালে অভিনব নাট্যসৃজন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল—শুধু নামকরণের অভিনবত্বেই নয়—বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাতেও। সেইসঙ্গে একথাও বলতে হবে যে নাট্যকারের এই সৃজনশীল পর্ব স্থাণু নয় (যদিও একটি মাত্র অভিধায় তাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে,—'কিমিতিবাদী'।) এই পর্বেও নানা বিপরীত স্রোত নিয়েই তা সৃষ্টির আনন্দে মেতেছিল। এই পর্বের নাটকগুলিতে মোহিত রেখে গেছে এই চেতনা যে, আমরা তো বেঁচে থাকি,—সেই বেঁচে থাকার সম্ভব-অসম্ভব মাত্রাটিকে খুঁজে বের করা যাক না? সে আমাদের চিনিয়ে দিতে চেয়েছে সেই বাঁচার ধরনটিকে।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে, কবিতার জগৎ থেকে মোহিতের প্রথম পদার্পণ নাট্যের ভুবনে—একথা আগেই বলেছি। সেই কবিসত্তাকে অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে চার অঙ্কের এই নাটকটিতে। ঘটনা ঘটে একটি ঘরে, এই ঘরের মধ্যে নায়কের মনে হয়েছিল তার কণ্ঠে একটি সূর্যগোলক আটকে গেছে—এবং সে জেনেছিল এই রোগ পৃথিবীর মৌলিক রোগ—যে রোগের কপিরাইট একমাত্র তারই। সেই রোগগ্রস্ত মানুষটিই তো জানতে চাইবে—'কুকুরের দর্শন', 'লোভের দর্শন', 'উপেক্ষার দর্শন'। এই জানার সূত্রেই তার মুখ থেকে অনর্গল নির্গত হবে পিংপং বল—যা ড্রপ খাচ্ছে সর্বত্র। পৃথিবীটাই যে ড্রপ খাচ্ছে তখন। আমাদের বাসভূমির অসামঞ্জস্য যেন ধরা দিচ্ছে এই ক্রিয়াটির মধ্যে। আর সেইসব মুহূর্তেই মানুষটা ফিরে যেতে চায় তার অম্লান শৈশবে, বাল্যে। এ এক অযৌক্তিক বিস্ময়ের নাটক। তাই এতে উদ্ভটত্ব, তাই এ নাটকে, ছকবাঁধা জীবনের এক আতিশয্যের ইঙ্গিত। এরই মধ্যে নায়ক মিনুকে বিয়ে করতে চায়—কেননা সে আরশোলার মত মরতে চায় না। ভালবাসার দোহাই দেয়। কবিতার লাইন দিয়েই যেন মেয়েটি উত্তর দেয়, 'ভালো তো আকাশটাকে লাগে—অমনি বিয়ে করতে হবে।'

এ নাটকে ভাষার ব্যবহারও লক্ষ্য করার মত। চিত্রকল্প তৈরি করতেই সে ভাষা হয়ে যায় বিমূর্ত—আর তারই মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার স্পষ্ট আভাস। নীল আলো আর

কালো পোষাকে ঢাকা ছায়ামূর্তিগুলো ঘিরে ধরে নাট্যশেষে নায়ককে। তখন সেই নীল আলো কালো রঙ শুধু যন্ত্রণার প্রতীক হয়ে ওঠে—নাকি, সে তখন প্রস্তুত—দরজার আওয়াজ শুনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, জাহাজের মতো ভেসে যাবার জন্যে—সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। সূর্যের প্রতি ভালবাসা যে তার আবাল্য।

পরের নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া'। এ এক অন্যদৃষ্টির নাটক, অন্য আলোয় দেখা জীবনের নাটক। এ আলোর রঙও নীল—নীল রঙের ঘোড়ার সওয়ার তখন এক রেসুড়ে মানুষ যার নাম এ নাটকে সোমনাথ। চারটি দৃশ্যে এ নাট্যকাহিনী বিধৃত।

তাসের তৈরি দীর্ঘ মালা গলায় একজন প্রৌঢ় একটি রহস্যময় পরিবেশে এক টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পারিবারিক পরিচিতজনের সমাবেশে বক্তৃতার ঢঙে প্রশ্ন তোলেন—'আমরা হাসি কেন?' আর কোনও বিষয় তিনি খুঁজে পান না। আসলে সময় কাটাবার জন্যে এই বক্তৃতার আয়োজন। আসলে এরা সবাই এক প্যাকেট তাস মাত্র, যাদের হাতে নিয়ে, অন্য কেউ খেলছে। নাটকের ধরতাইটা এই রকম। যিনি এই সমাবেশে যোগ দেবেন—সেই অপেক্ষিত মানুষটিই সোমনাথ রায়। পরিচিতজনদের এই সমাবেশে সম্পর্কের বুনট এবং সম্পর্কের ভাঙ্গন একই সঙ্গে বুনে তোলা হয়েছে—আপাত উদ্ভট এক পরিবেশে। সোমনাথ রায় এককালে একটা নীল রঙের ঘোড়ার স্বপ্ন দেখতো। সেই ঘোড়াটাই আজও তাকে রেসের মাঠে টেনে নিয়ে যাবে—সেখানেই তো সেই অনুভবটা সক্রিয় থাকে—'হেলদি অ্যানিম্যাল্‌স্ আর মুভিং'। ভীষণ থ্রিলিং এই ভাবনাটা। সোমনাথ এখনো স্পেকুলেশন করে কোন ঘোড়া বাজী জিতবে! সেখানে অবশ্য যে ঘোড়া দৌড়বে তা নীল নয়, ব্রাউন কিংবা সাদা। একটা অপরাধবোধও কাজ করে তার ভেতরে—নইলে সোমনাথ রায় কেন বলবে স্ত্রী কন্যাকে—'আমরা তিনজনে যদি মন্দির, পাহাড়, সমুদ্র বা আকাশের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই তাহলে আবার তিনটে সবুজ পাতার মত কোন ডালে একসঙ্গে আলো বাতাসে হয়ত এখনো বাস করতে পারি।' কিন্তু রেসের মাঠে যাওয়ার আকর্ষণও দুর্নিবার। সেই স্বপ্নের ছেলেটা যে দিয়ে যায় সেই রঙিন কাগজটা যাতে লেখা আছে শনিবারের মাঠের বাজী জেতা ঘোড়াগুলোর নাম। শনিবারের রেসে জিতে বিপুল সম্পদের অধিকারী তখন সোমনাথ। ঘরে আসবাব বিবিধ উপকরণ। কিন্তু কী যেন খোয়া গেছে তখন রেসুড়ে মানুষটার। নীল রঙের ঘোড়াটাও কেবল স্বপ্নের মধ্যেই আনাগোনা। সেই স্বপ্নের ছেলেটা যে তার হাতে ধরিয়ে দেয় আজ অন্য এক পরোয়ানা।

চেনা জানা মানুষদের নিয়েই গড়ে উঠেছে এ নাটক; তাদের সামাজিক এবং বৌদ্ধিক স্তরটাও জানা। তবু অন্য এক স্তরে উত্তরণ ঘটে।

প্রথম দিককার নাটকে মোহিতের প্রকাশভঙ্গি নিশ্চিতভাবেই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই কি মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে তখন অ্যাবসার্ড গোষ্ঠীর নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছিল! কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও জাঁ জেনেকে—অ্যাবসার্ড গোত্রের নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করেননি জাঁ পল সার্ত্র। পরিস্থিতিগত অস্বাভাবিকতা আছে, জীবনের অসঙ্গতির কথাও আছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসও হয়তো প্রকাশ পেয়েছে—যেমন 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকে সেই আগন্তুক যুবক যে তার সবচেয়ে ভালবাসার পাত্র, তার অস্তিত্বের মূলাধার,--তার বাবাকে নিজে খুন করে পুলিশের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে বুলুদের

বাড়িতে। সেই এক সময় বলে ওঠে "...খুনী আসামী—ঈশ্বর। ইতিমধ্যে কোন জঙ্গলের ধারে নিহত হয়ে পড়ে আছে। ঈশ্বরের মৃতদেহ নেই—'মৃত্যুসংবাদ' আছে। আমরা সবাই ঈশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে পথে শোভাযাত্রা করব।" আবার শেষ দৃশ্যে সে মিউজিয়ামের এক অন্ধকার ঘরে—ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখিয়ে আসবে আকাশ খুঁড়ে পাওয়া 'ঈশ্বরের মমি'। 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকে আমরা দেখি মননের প্রক্রিয়ায় বিপন্নতা থাকলেও সে বিপন্নতা, অস্থির সময়ের স্বাভাবিক তাৎপর্য নিয়ে নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের মাধ্যম হিসেবেই নাটকের সংলাপ সাজিয়েছেন মোহিত। 'গন্ধর্ব' নাট্যদল ও শ্রীশ্যামল ঘোষের পরিচালনায় ঐ নাটকের সফল প্রযোজনার কথা আমাদের স্মৃতিতে জমা আছে। এ নাটকে আলাদা করে দৃশ্য বা অঙ্কের নির্দেশ নেই—প্রধান চরিত্র সেই আগন্তুক মানুষটির কোনও নামও নেই। এই নাম না দেওয়াতেই চরিত্রটি অলীক আগন্তুক হয়েই থাকে। তার জন্মদাতাকে নিহত করার পরে তার বলতে দ্বিধা নেই যে সে,—'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিবেক'। মোহিত হয়তো অজান্তেই আঘাত করতে চেয়েছে এই চরিত্রটির মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত নানা সংস্কারকে—কিন্তু সেটা বাইরের দিক। চরিত্রটির বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ পায়, নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, ভালমন্দের ঊর্দ্ধে আর এক স্বতন্ত্র স্বাদ। এই স্বতন্ত্র স্বাদ তৈরি করতেই মোহিতের সকল উদ্‌যোগ। বিদেশী নাটকের অনুপ্রেরণার অনুসন্ধান না করে আমরা বরং নাট্যকারের নিজস্ব কৈফিয়ৎকে গ্রহণ করতে পারি নিঃসঙ্কোচে "'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটির প্রেরণা সিঙ্গ্‌-এর একটি নাটক। আংশিকভাবে ঘটনাগত মিলও কিছু আছে। কিন্তু এর সমস্যা, অনুভব, চিন্তা, কল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক।" এই নাটকের অলীক আগন্তুক আমাদের চেনা জানা এক পারিবারিক পরিবেশে এসে পড়েছে যেখানে কেউ হয়ত তাকে সনাক্ত করেছে পাগল বলে—কিন্তু বাড়ির মেয়ে বুলুর কাছে পেয়ে যায় সহানুভূতি—হয়তো মনের কোণে সুপ্ত এক ভালবাসাও—যেটা তার প্রেমিকের কাছে অস্বস্তির হয়ে দাঁড়ায়। আগন্তুকের পাগলামির মধ্যে কোনও 'মেথড্‌' খুঁজে পাওয়া যায় কি! সে তার বাবাকে হত্যা করেছে তার কারণ, এই পৃথিবীতে তাকে এনেছে তার বাবা-মা। কাজেই সে তার প্রতিশোধ নিতে চায় বাবাকে হত্যা করে—নাকি নিজের মধ্যেই সে তার বাবাকে খুঁজে পেয়েছিল। এ কি তার নিজেরই আত্মলোপের আয়োজন। তার বাবা যে শেষ দৃশ্যে উপস্থিত হয়ে হলে—"আমাকে আঘাত করাটা ওর ধারণামাত্র। ঘটনার চেয়ে ধারণাটাই ওর কাছে এক এক সময় সত্যি বলে মনে হয়--"—এই কথা উচ্চারণ করে। বাবা ছেলের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটাই উন্মোচিত হয় নাটকের শেষে। তখন 'এক হাস্যকর মজা'র প্রত্যাশা করে আগন্তুক যুবকটি। সেই মজার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই বাবা ছেলে এই আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে চলে যায়। বুলু একা ঘরে তখন দেখে কতকগুলো রঙিন বুদ্বুদ শুধু ঘরময় উড়ছে, ঘুরছে।

এই আগন্তুক এবং একজন প্রৌঢ় চরিত্র মোহিতের অনেক নাট্যগঠনে বেশ গুরুত্ব পেয়ে যায়। আগন্তুক চরিত্র কি এসব নাটকে আউটসাইডার হিসেবে আসে? বোধহয় না। আর প্রৌঢ় চরিত্ররা কি প্রাজ্ঞ? তাও বোধহয় সবসময় মেনে নেওয়া যাবে না। এরা এসেছে আলাদা আলাদা নাটকে—নাটকেরই প্রয়োজনে। পরের নাটক 'গন্ধরাজের হাততালি'-তে অবশ্য প্রৌঢ় চরিত্র নেই কিন্তু আগন্তুক চরিত্র আছে—একটি নয় দুটি তবে অচিরেই তারা নামধারী হয়ে যায়। দুটি দৃশ্যের এই নাটকে, পরিচয় ও পরিচয়হীনতার

কিংবা স্থির পরিচয় নেই এমন এক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এ নাটকে অরুণ, দুটি আগন্তুক, হরিকিঙ্কর আর প্রণব এবং মীরা—এদের সম্পর্কের আলাদা আলাদা ভিত গাঁথা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটা রিলেশনই একটা আইডিয়া। আর এই টানাপোড়েনেই খেলাটা জমে যায়। খেলতে খেলতেই জীবনের স্পর্শ। ভাল না বেসে তো আমরা বাঁচিনা। কিন্তু আমরা সবাই টুকরো। মোহিতের আঁকা চরিত্র তৃতীয় এক মহাযুদ্ধের মধ্যে বাস করছে যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি যে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পৃথিবী-ব্যাপী এই টোটাল ফ্র্যাক্‌চার ডেস্ট্রাক্‌শন—তৃতীয় মহাযুদ্ধ না চললে কী করে সম্ভব। আমাদের কি কোনও আইডেনটিটি আছে? নেই—ফিক্‌স্‌ড় কোনও পরিচয়ও নেই। তবু এ নাটকের শেষে ভালবাসার ইঙ্গিত। ইউরোপের শিল্পী মাতিসের ব্লু-পিরিয়ডের মত, আগের নাটকের মতই, এ নাটকেও নীল রঙ আছে তবে শেষের সংলাপের ইঙ্গিত যেন সেই ব্লু-পিরিয়ডের অবসানের আয়োজন—ফিকে সবুজ চশমাটা হরিকিঙ্কর যাবার আগে মীরাকে দিয়েই যায়। আর থাকে 'গ্লোরিয়াস হোয়াইট' রজনীগন্ধার ফুল। অস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতার নাটক।

প্রথাভাঙ্গা খেলার এই সংকলনের পঞ্চম নাটক 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'। নীলরঙের রেশ এখনও আছে। 'নক্ষত্র' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় এটি অভিনীত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। অপ্রাসঙ্গিক হবে না এই কথার উল্লেখে যে, পরিচালক শ্যামল ঘোষ এবং নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের যুগলবন্দী একসময় বাংলা থিয়েটারে নতুন হাওয়া এনেছিল, ভিন্ন এক দৃষ্টির নাটক হ'য়ে উঠেছিল—অন্য আলো এনেছিল—অথচ তা ছিল জীবনেরই নাটক। একটি পোড়ো প্রাসাদতুল্য বাড়িতে এই নাট্যঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক সমাবেশে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, এক ডাক্তার (দু'জনেই প্রৌঢ়), রাধাগোবিন্দ, থানার ইনস্‌পেক্টর এবং স্কুল শিক্ষয়িত্রী শান্তা, এই বাড়ির মালিক মল্লিকবাবু—এদের নিয়েই নাটক। এরা উপস্থিত হয়েছে—মৃত্যুর পর অতৃপ্ত অশরীরী সূক্ষ্ম প্রেতাত্মা খুঁজতে। শান্তা সেই ঘরে ঢোকে হাতে সাদা ফুলের গুচ্ছ নিয়ে,—যাকে সে বলে 'আলো, অনেকগুলো আলো—মৃত্যুকে পাহারা দেবার আলো।' ওর বিশ্বাস একটা ভয়ঙ্কর অলৌকিক ঘটনায়। মৃত প্রেত যে—সেও যে ভালবাসতে চায়। আমরা নাটক এগিয়ে যেতে দেখবো আলো-অন্ধকার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব কিছু মিলে এ এক 'আশ্চর্য রাসলীলা'। এটাকেই, সেই কল্পলোকের কর্তৃপক্ষ, শাসকের প্রতিনিধি, বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করছে। ফিনকি দেওয়া চাঁদের আলোকে তারা মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল। অলৌকিক বাতাসের খপ্পরে পড়েছে সমস্ত দেশ। বাঁচার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রেতের মৃত্যু হয়। শান্তা একা হয়ে যায়। এক রহস্যময় পরিবেশে বাড়ির মালিক মল্লিকবাবুও।

'স্বপ্ন কিম্বা দুঃস্বপ্নের নাটক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন নাট্যকার 'দ্বীপের রাজা' নাটকটিকে। পশ্চিমী অ্যাবসার্ড নাটকের মৌলিক লক্ষণ--অস্তিত্বের অর্থহীনতা,—কিন্তু এ নাটকে মোহিতকে আলোড়িত করেছে সেই সময়ের সারা বিশ্বের অনেক ঘটনা—তার মধ্যে অন্যতম ঘটনা 'ঘৃণ্য হাইড্রোজেন বোমা'র সফল পরীক্ষা। এই ঘটনা নিয়ে জ্বালাময়ী প্রতিবাদ-নাটক হতে পারত—বেশ প্রচারধর্মী। কিন্তু মোহিত সে পথে হাঁটেননি। কবির মনোজগতের 'স্বপ্ন' আর 'দুঃস্বপ্নের' মধ্যে একটা সেতু অবিষ্কার করেছেন নাট্যকার এই নাটকে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাগুলি যেন এক বিবর্তনের স্তর। মোহিতের এ নাটক যখন প্রথম ছাপা হয় 'থিয়েটার' পত্রিকায় সেই ১৯৬৬ সালে,

তখন তার মুখবন্ধে লিখেছিলেন,—"নাটকটির চরিত্র ও বর্ণ অনেকটা কোন স্বপ্নের-দুঃস্বপ্নে বদলে যাওয়ার মতো, একটি সবুজ গাছের ক্রমশঃ ভৌতিক নিষ্পত্র শূন্যতায় রূপান্তরের মত—আজকের যুদ্ধের মুখোমুখি পৃথিবীর যা পরিণাম।"—এই মুখবন্ধটি অবশ্য বর্তমান সংকলনে নাটকের আগে নেই। কাল্পনিক এক দ্বীপে এ নাটকের ঘটনা রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু বাস্তবগ্রাহ্য হতে অসুবিধা নেই। একদল দ্বীপবাসী মেয়ে পুরুষের প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি দিয়ে নাটকের শুরু। এদের স্বপ্নও আছে সাহসও আছে। কিন্তু সহসা এরোপ্লেনের শব্দ, বিস্ফোরণ হতচকিত করে দেয় এই শান্তিকে। এ নাটকে সাগর নামে এক চরিত্র আছে—যে চরিত্র যেন দ্বীপের চারপাশে আবর্তিত সাগরের মতই প্রাণোচ্ছল যৌবনের প্রতীক। কিন্তু সেই সাগর বিপত্তি ঘটিয়ে বসেছে। এ দ্বীপে ভয়ানক, একটা গোলা পড়েছে। সৈনিকরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে সেই বোমা এই দ্বীপে। তারা সাগরের জলের তলাতে খুঁজতে নেমেছে। যে গোলাগুলো আকাশ থেকে ফেলা হয়েছে—সাগর সেটা দেখেছে। তারই একটার কাছে সাগর গিয়ে,—পরিণাম কী না জেনেই, তার সমস্ত রাগ আর ঘেন্না জড়ো করে একটা লাথি মেরেছে। থুতু দিয়েছে তার গায়ে—তাই আজ সে এ দ্বীপের রাজা, বনের রাজা, তার ভালবাসার পাত্রী রঙনের রাজা। এই অনুভবটা সে সকলের কাছে বলে। স্পেন দেশের কোথাও এইরকম এক লাথি মারার ঘটনা বাস্তবে ঘটেছিল—তখন বোমাটার স্পর্শ তার শরীরকে রেডিওএ্যাকটিভ করে তুলেছিল। গোটা বসতিটাই সেই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মোহিতের কল্পনার ছোঁয়ায় সেই বাস্তব ঘটনাটার সূত্র ধরেই এ নাটকের জন্ম। আকাশের শকুনের—মত দানবের রথ উড়ে চলে। পেট থেকে আগুনের গোলা নামে। 'দ্বীপের রাজা' নাটকের শুরু হয়। পাগলা সাগরের লাথি মারার ফল অবশ্য অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে মানুষ ছোঁয়াচ বাঁচায়। সেখানকার পুরোহিত দেবতার গায়ে কুঠারাঘাত করে, কেননা, সে দেবতা দেশের এই দুর্দিনে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে—দেবতা রক্তহীন—এই কথা পুরোহিতেরও অনুভবে এসেছে। আর দ্বীপের রাজা সাগর নিজের চোখে দেখতে পায় না তবু চৌকিদারের আশ্বাস যে তার না দেখার বদলে 'আকাশ বাতাস সবাই দেখবে'—এই কথা শুনে সে গান গেয়ে ওঠে। দ্বীপের রাজা তো কাঁদে না। সে তখন আত্মস্থ। নাট্যকারও কালের ঘটনাক্রমকে অনায়াসে এক কল্পলোক রচনা করে আমাদের অব্যর্থভাবে চিনিয়ে দেয়। অনেকে প্রত্যক্ষভাবে পারমাণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতি দেখিয়েছেন। নাট্যকার বাদল সরকারও তাঁর 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকে। মোহিত সেই প্রত্যক্ষতার পথে হাঁটেননি। হাঁটতেই হবে এমন কোনও দাবী সাহিত্য বা শিল্পের কাছে কেইবা করে? 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ'—আর এক কল্পকাহিনী। কিন্তু সে কাহিনী বাস্তব থেকে দূরে নিয়ে গিয়েও বড় প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়। আমাদের অভিজ্ঞতারই অংশ হয়ে ওঠে। আড়ালটা আর আড়াল থাকে না। যখন দুর্গশাসক বলে ওঠে—"আমাদের শাসনযন্ত্রের যদি একটি রমণীমূর্তিতে ছবি আঁকা হয় রানী সেই ছবি। তবে অতি মূল্যবান ছবি। ছবিটা উজ্জ্বল রাখা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।" এ সেই রানীর রাজত্বের কাহিনী। যে রাজত্বে বার্তা-অধিকর্তা, দুর্গশাসক, বৈজ্ঞানিক, পল্লীসেবক—সবাই সে রানীর মহিমা কীর্তনে আগুয়ান। রাজাকে একদিন ভ্রান্ত নীতি পালনের জন্য এরা সবাই হত্যা করেছে। এ রাজত্বে দুর্গের বাইরে 'জনতাগণ'-এর মধ্যে একটা মাতন দেখা দিয়েছে। তাকে

সামলানোর জন্যে রানীর আদেশে, তাদের মঙ্গলের জন্য বহুমূল্য পুষ্পোদ্যান নীলামে ডাকা হবে এবং দেশবাসীর কল্যাণে রানী তা দান করবেন। গরিবী হটে যাবে। সামলানোর এও এক পদ্ধতি—অপর পদ্ধতিও সঙ্গে সঙ্গে চলে, জনতার স্ফুলিঙ্গ যখন বাতাসে উড়ছে তখন রানীর দুর্গশাসক-এর প্রতি আদেশ 'বাতাস বশ কর। তর্জনীর ইশারায় অবাধ্য বাতাসকে ক্রীতদাসের মতো চালাতে পারলেই তো তুমি আমার যোগ্য অনুচর। তোমার যোগ্যতায় আমাকে খুশি কর।' বাইরে তখন রানীর কুশপুত্তলিকা জ্বলছে—রানী সেটা উপভোগ করে। এক চিত্রকর রানীর দরবারে ঢুকে প'ড়ে—এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ সভাসদদের মনে হয় রানী এই চিত্রকরকে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন। রানীর দুর্গশাসক অবশ্য রানীর বশীকরণ শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। রানীও জানে অন্যসব পদ্ধতি যেখানে অকার্যকর সেখানে সম্মোহনের যাদুদণ্ড অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু সেই চিত্রকর রানীর আশ্রয় ছেড়ে হঠাৎ উধাও হল দুর্গ থেকে, সেই তো আবিষ্কার করবে যে দুর্গের সিংহাসনে বহুদিনের পাপ জমেছে। আর দুর্গের ঢোলবাদক জীবনলাল ঘোষণা করে 'পুরবাসীগণ সিঁদুরে মেঘ উঠেছে, বরণডালা সাজাও।' তার সঙ্গিনী চিত্রলেখার প্রতি তার আহ্বানে পথেবই হাতছানি, রানী এবারে বড় ক্লান্ত। সেই ক্লান্তি অপনোদনের জন্যেই যেন নতুন খেলার চমক নাট্যশেষে। এ নাটক পড়তে পড়তে মনে হয় রক্তকরবী পর্বের রবীন্দ্রনাথ মোহিতের কলমের ডগায় ভর করেছেন—কবি মোহিতের এ জাতীয় নাটকে বোধহয় সেটাই প্রত্যাশিত।

একেবারেই আমাদের চেনা জানা দৈনন্দিন জীবন নিয়ে 'নিষাদ' নাটকটি কোন রূপকথার জগৎ নয়। বাঁচা আর মরা নিয়ে সমস্যা। ক্যামেরার ছবি কিম্বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস-এ আমাদের বাঁচা-মরার লক্ষণগুলো কি দেখতে পাওয়া যায়? আমরা তো সবাই অপেক্ষা করে থাকি মৃত্যুর সীমান্তে দাঁড়িয়েও সেই বলবার মুহূর্তটার জন্য—'ইউরেকা, ইউরেকা' আর সেই ইউরেকার আবিষ্কার ঘটে একজন ম্যাজিসিয়ানের হাতে—সে আবিষ্কার করে ভালবাসার একটা মিষ্টি সবুজ লতা যে জড়িয়ে উঠবে। দিবাকর আর লতার ভালবাসার কাহিনী। কিন্তু মোহিত এ কাহিনীকে বাস্তব এবং স্বাভাবিকতায় মুড়ে দিয়েও ক্ষণে ক্ষণে নিয়ে যায় পরাবাস্তবের সীমানায়। কিন্তু এই জোড়-এব চিহ্নটিকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েই এটা ঘটে। তাই দিবাকরের এখন মৃত্যুর পর বেঁচে উঠে, ফের না ম'রে, বাঁচতে চাওয়াটা অতি স্বাভাবিকভাবেই নাটকে চলে আসে। তিনটি দৃশ্যে জীবনের তিনটি পর্বে বেঁচে থাকার সোনার আপেলের স্বপ্নটা খান খান হয়ে যাবে। প্রলোভন থেকে পতন, পতন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে আবারও মৃত্যু। 'নিষাদ' সক্রিয়, কিন্তু 'উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব'—এমন এক আর্তিও শুনতে পাওয়া যাবে সেই বলির বাজনার মধ্যেও। 'নিষাদ' ১৯৬৮ সালের রচনা।

পরের নাটক 'বাঘবন্দী' (১৯৭০)। এটিও তিন দৃশ্যের নাটক। সাজানো গোছান মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সংসার। আর পাঁচটা নাটকের মতই শুরু হয়। পরিবেশে সেই '৭০-'৭১ সালের ঝোড়ো হাওয়া। এ নাটকে মোহিত সেই দিনগুলি নিজস্ব বিশ্লেষণে ধরেছে। সুন্দরী স্ত্রী ও স্বামীর সংসারে এসে তাদের সংসারে সেই মাঝরাতের আগন্তুক 'টুনু' একটা ব্যাগ রেখে গেছে—আর ফেরেনি। আবারও এক আগন্তুক বিল্টু ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। শুরু হয়ে যায় মোহিতের নাটক অন্য এক মাত্রায়—বাস্তব

অবাস্তবের আলোছায়ায়। নাটকে মোক্ষম বাস্তবটা ঘটে অন্য এক স্তরে। পরস্পরের সম্পর্কগুলো জটিল থেকে আরও জটিল হয়—কিন্তু বাস্তব। ঘুম আর জাগরণের বাস্তব। সেই ঘুমের মধ্যেই আসে দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। ফুটে ওঠে রাজ্য পরিচালনার স্বরূপ। জনবলকে কেমন করে কব্জা করা যায় তারই পরামর্শ।

এই নাটকেই মোহিতকে একটু বক্তৃতাধর্মিতার শিকার হতে হয়েছে। তবু অমোঘ তার বার্তা। পূর্ব-পশ্চিমের পুরাণ এ নাটকে হাত ধরাধরি করে চলে—বোধকরি নাট্যঘটনার ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যেই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল তখন তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

'রাজরক্ত' নাটকের দিক পরিবর্তনের আভাসের আগের নাটক 'ক্যাপ্টেন হুররা'। বলা ভাল মোহিতের প্রথম পর্বের নাটকের শেষ নাটক। রচনাকাল ১৯৭০। দিক পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত কি এ নাটকে পাওয়া যায়—বোধহয় যায়। আগের নাটকের মতই অনেকখানি বাস্তবের পটভূমি রচনা করেও এর ভরকেন্দ্র প্রতীকের মধ্যেই নিবদ্ধ। তবে এ নাটকে মোহিতের আত্মানুগ দেখাটা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে বস্তুগত বিচার দ্বারা। একটি হোটেল, যে হোটেলের মালিক মনে করেন হোটেলটা হচ্ছে একটা 'জাহাজ' এবং সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তিনি। শুধু ভাবেন না, হোটেলটিকে সাজিয়েছেন জাহাজের মত করেই। কিন্তু এ জাহাজ তো চলে না--ভাসে না—স্থাণু। এই স্থাণুত্বের অনুভব ক্যাপ্টেনের ছিলই না। সেটার উদয় হল নতুন দুই খদ্দের আসাতেই। তারা হল সুনীল আর ইবা। তারা তো চলতে চেয়েছে,—বাইরের চলার জগৎটাকে দেখেছে—তবু ক্যাপ্টেন হুররার এই জগতের ধূসরতা যেন তাদের টানে। এদের উপস্থিতিতেই ক্যাপ্টেনের মনে হয় এই জাহাজটা পৃথিবীরই মত। আর তখনই তার চৈতন্যে টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বহুদিনের অনড়ত্বের(?) বোধ কি অত সহজে কাটানো যায়? নিজেকেই যে তাকে ভাঙতে হবে। চারিদিকের বিপদের সঙ্কেত যে তিনি পেয়েছেন। কিন্তু কাজটা তো সহজ নয়। বেরিয়ে আসতে হবে এতোকালের অনুভূতির বন্ধ দরজা খুলে। একার সাধ্য তো নয়—ওই সুনীল ইরা-রা যোগ দিলে ক্যাপ্টেনের জাহাজ ভাসবে চলবে। দু'পক্ষের ইচ্ছা এবং সঙ্গতি না মিললে তো সেটা সম্ভব নয়। মোহিতের নাটক শেষ হয় এই ইচ্ছা আর সঙ্গতির মিলের মধ্যে। কেউ মনে করতেই পারেন এ বড় সরল সমাধান। ভাবতে বাধা নেই কিন্তু না, হুররা-র উপলব্ধিটা যে স্বাভাবিক—ওটা তো 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' নয়। উপলব্ধিতে যে এসেছে,—'নয়তো জাহাজটা কি অনন্তকাল কেবল জল ঠেলে ভাসবে। জাহাজটা তো ডাঙ্গায় পৌঁছবে বলেই জলে নামে। জাহাজটা একটা নতুন দেশের ডাঙ্গা খুঁজছে।' মানচিত্র ধরেই সেটা এবার ভাসবে—দিক নির্ণয় করবে।

এই সংকলনে পূর্ণাঙ্গ নাটকের শেষ 'রাজরক্ত'। নাটকটি 'গিনিপিগ' নামে 'বহুরূপী' নাট্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় যখন 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এ অভিনীত হয় তখন নাম পাল্টে করা হয় 'রাজরক্ত'। অবশ্যই সেই প্রাথমিক রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েই। এর আগে সংকলনের অন্য নাটকগুলি শুরু হয়েছে আমাদের চেনা জানা জগৎকে নিয়েই—অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, যাকে একসময় উদ্ভট বলা হয়েছিল, তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্রায় প্রতি নাটকেই এটা ঘটেছে। 'রাজরক্ত' সে দিক থেকে ব্যতিক্রমী। দৃশ্যসজ্জার বর্ণনায় এবং চরিত্রের সংলাপ থেকেই ধরা পড়ে এ নাটকের জাত আলাদা। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য নাটক। নাটকের আস্বাদন বদলাল

—তবে মোহিতকে চিনতে অসুবিধা হয় না। তার চারিত্র্যধর্ম বজায় রেখেই একটা ভিন্ন চাল চাললেন এই নাটকে। হয়তো সময়ের একটা নিরন্তর চাপ সেই সময় অনুভব করবেন তিনি। যে চাপ শুধু অন্তরের আর্তি নয়, বাইরের ভয়ঙ্কর সময়েরও। আগের নাটকগুলির মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মোহিতকে কল্পপৃথিবীর অধিবাসী হিসেবেই চিনেছেন। অবশ্যই, উৎপল দত্ত যেমন সময়ের উত্তালতাকেই চিত্রিত করেছেন তাঁর নাটকে—মোহিত সে গোত্রের নাট্যকারই নয়। তার জাত আলাদা। এ নাটকে সমকাল মূর্ত হয়েছে সূক্ষ্ম স্তরে। নির্যাসের মতই তা ব্যাপ্ত হয়েছে নাটকে। বাস্তবতায় নানান ভঙ্গী—এটা যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে এ মোহিত সেই ভিন্ন ভঙ্গীকেই রপ্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের পূর্বতন মডেল বা তখনকার প্রচলিত মডেল এ নাটকে বর্জিত হয়েছে। দু'টি চরিত্রের কাটাকাটা ছোট ছোট বাক্যে রাজত্বের চেহারাটা ফুটে ওঠে। নাটকের ধরতাই যেমন, মঞ্চসজ্জার বিবরণেও তেমনি। এই কাটা কাটা ভাবটা শুরুতেই পাওয়া যাবে। এ নাটকে লাল আর সাদা রঙের চমক আছে। এ নাটক কাহিনী দিয়ে বাঁধতে হয়নি নাট্যকারকে—তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেই নাটকের প্রধান আকর্ষণ তৈরি করেছেন। অন্তত সে চেষ্টাটা স্পষ্ট। শুরুতেই মঞ্চসজ্জার প্রতীকগুণে দর্শকের কাছে তা দুর্বোধ্য থাকে না। রাজাসাহেব এবং তার অনুচরদের চিনতে অসুবিধা হয় না। আর ছেলে এবং একটি মেয়েকেও চেনা যায়। 'রাজরক্ত' নাটকেই প্রথম স্পষ্টতর রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করল মোহিতের নাটকে। অবশ্য এ নাটকের স্পষ্টতর দাবী পাঠক বা দর্শকের বুদ্ধির দুয়ারে। যে গণতন্ত্রকে আমরা একভাবে না একভাবে আজকে মেনে নিয়েছি,—তা সদর্থক রূপে পেতে গেলে যে দরকার সাধারণ মানুষের সদাজাগ্রত বিচারবোধ। 'রাজরক্ত' নাটকে আমরা একটা আবিষ্কারের প্রয়াস দেখি,—যে আবিষ্কার, কৌতূহলের নিবৃত্তি নয়, নাটক পরিণতি পেল কেমন ভাবে সে জিজ্ঞাসাও নয়, মনস্তত্ত্বের সন্ধানও নয়—নাটকের গভীরে কি কোনও জীবনচিত্র কিম্বা এই সমাজের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে? নাটকের কোণায় কোণায় ঘটনা বিন্যাস বা চরিত্র এ সবের মধ্যে? কিম্বা অন্য এক তাৎপর্যময়, রূপময় ছবি ফুটে ওঠে —যা দর্শককে মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়; এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই সেই আবিষ্কার। রাজার চূড়ান্ত পরাজয়ের ইঙ্গিত অবশ্য দেওয়া আছে নাটকে—রাজাসাহেবের রক্তের আকাঙ্ক্ষা এবং তার প্যাথলজিক্যাল বিশ্লেষণে, বিদ্রোহী মানুষের ফণা তোলার বীজ খুঁজে না পাওয়ার অসহায়ত্বে।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের পাঁচটি নাটক, যথাক্রমে 'রিঙ', 'বাজপাখি', 'মাছি', 'ফিনিক্স' এবং 'সোনার চাবি' এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। নানা পত্র-পত্রিকায় কোন না কোনও সময়ে এগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এবং এর কয়েকটি নাটক কোনও কোনও নাট্যগোষ্ঠী অভিনয়ও করেছেন। এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম দুটি অবশ্য 'রাজরক্ত' (১৯৭১) পর্বের আগের লেখা। মোহিতের যে নতুন অনুভব আশির দশকে আমরা দেখি তার প্রত্যক্ষতা 'স্বদেশী নকশা' এবং বিশেষ করে 'তোতারাম' নাটক থেকে। না,—এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটকগুলি সেই মনন সঞ্জাত নয়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটকে গঠন স্বতন্ত্র। স্বল্প পরিসরেও নাট্যকার তার কাহিনী ও চরিত্রের রূপের মধ্যে কখনও জীবন বিরহী হয়ে ওঠেননি। জীবনকে মূল্যহীন ভাবতে শেখায়নি। এ সব নাটিকার অন্তরের তাগিদটা আমরা অনুভব করতে পারি।

স্বল্পায়তন বৃত্তের মধ্যেও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিন্যাস ও জটিলতা যা এই সময়েরই প্রতিক্রিয়া তা অভিজ্ঞতার সংহৃত রূপেই গড়ে উঠেছে। এ সংযমের ফসল ; স্বল্পায়তনে বিস্তারবিহীনতা ও বাহুল্যবর্জনই এই রূপধর্মের বৈশেষিক লক্ষণ। একটি মাত্র আইডিয়াকে অবলম্বন করেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। সংক্ষেপে হলেও, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের হদিশ পাওয়া যায়। এই সব মিতায়তন নাটিকাতেও।

'রিঙ্' এবং 'বাজপাখি'—এ দু'টি নাটকেই সেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—সম্পর্কের জটিলতা। প্রথমটিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, দ্বিতীয়টি এক কেরানী পরিবারের মধ্যে।

স্বামী-স্ত্রী অরুণ আর শীলা ক্রমশই উপলব্ধি করছে তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। স্বামীর ভাবনায় স্ত্রী ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে—আর নাট্যশেষে মনঃসমীক্ষক ডাক্তারের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে দু'জনেই ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই আবিষ্কারে ও উপলব্ধিতেই আবার তারা স্বাভাবিক হবে এই প্রত্যাশা।

'বাজপাখি' নাটিকায় শুভা আর কল্যাণ—স্বামী-স্ত্রী। পরিবারে আরও দুই ভাই। ছোটটি রাজনৈতিক দলের কর্মী। বড়ভাই কল্যাণ, তার বাবার স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি বহন করে চলেছে মস্তিষ্কে, আর সকালের সংবাদপত্রে ডুবে থাকে এবং ভাবে সমাজের এবং দেশের কথা। কিন্তু একেবারেই সক্রিয় নয়। ছোট ভাই, সেদিনের রাজনৈতিক মিটিং-এর প্রস্তুতি চালায়—পোস্টার লিখে আর সভায় অত্যাচারের প্রতীক এক বাজপাখির মডেল তৈরি করে। সেই বাজপাখির মডেলটাই কল্যাণকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে মানসিক ভাবে। একটা ফ্যান্‌টাসির জগতে নিয়ে যায় সকলকে, পরিত্রাণ খুঁজতে।

এর পরের মিতায়তন রচনাটির নাম 'মাছি'। এর কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যা কবলিত এক গ্রামের। এই বন্যার মধ্যেও দোতলার জানলা দিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরার কৌতুকময় দৃশ্য দিয়ে সূচনা। সে বাড়িটা জোতদার মজুতদারের। কাহিনীর বিন্যাস তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্যের অনুসারী। বড় চেনা জানা। অন্নের জন্য হাহাকার। তারই মধ্যে পাখি বলে এক গৃহবধূর সন্তান বন্যার জলে ভেসে যাওয়ার করুণ বৃত্তান্ত। আর মহামারীর প্রকোপের ইঙ্গিত। মিতায়৩ন নাটকে যতটুকু বিস্তার সম্ভব। কিন্তু চিনে নিতে অসুবিধা হয় না ঘটনার ক্রম। গৃহবধূর শোক এবং অনাহারে ক্লান্তির মধ্যেও গৃহকর্তার দৃষ্টি অন্যবকম। ভাতের বদলে এইটুকু সুবিধা তো নিতেই পারে। যেন সেটা অধিকার। বন্যায় আশ্রয় নেওয়া গ্রামের মানুষদের হাত নিস্‌পিস্ করলেও তারা তো অক্ষম, দুর্বল। পরের দিন সেই গৃহকর্তার ভেদবমি শুরু হয়ে যায়। আগের দিন তারই বানভাসি আঙিনায়, চাষী পরাণ কলেরায় যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রামবাসীর নিষ্ফল আক্রোশের আগুন তখন স্তিমিত। পরাণের সান্ত্বনা তারই ভেদবমিতে বসা মাছি কলেরার বীজ বহন করেছে। সে মাছি তার কাছে অক্ষমের প্রতিবাদের প্রতীক। গ্রামের পাঁচজনে যা পারল না—একটা মাছি 'সে কম্ম হাসিল করে দিল'। অক্ষম মানুষের এক ইচ্ছাপূরণের নাটক।

সংকলনের শেষ দুটি নাটিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। 'ফিনিক্‌স্'—টেনেসি উইলিয়ামস্—এর একটি নাটকের ভাষান্তর। বিদেশী পটভূমিতে এক সাহিত্যিক, যে শেষ বয়সে চিত্রশিল্পী সেই লরেন্স, তার স্ত্রী ফ্রিডা এবং বান্ধবী বার্থা—এই তিন চরিত্র নিয়ে নাটক অন্য এক জগতের বার্তা বহন করে আনে। লরেন্স গুরুতর অসুস্থ। সে কাউকে সঙ্গী হিসেবে এখন চায় না। 'রুক্ষ পাহাড়, চন্দ্রালোক আর গম্ভীর জলস্রোতের নির্দয়তা

ছাড়া আর কেউ থাকবে না'—এই তার আকাঙ্ক্ষা। সে যে ছবি এঁকেছে, তার মধ্যে, সে জীবনের আলোড়ন খুঁজেছিল, এই মাত্র। সেটা মিথ্যে নয়। দিনের শেষের অন্ধকারকে লরেন্সের মনে হয় বেশ্যা—যে সূর্যকে লোভ দেখিয়ে আঁচলে ঢেকে দেয়। এই বোধ নিয়ে ফ্রিডা এবং বার্থার স্পর্শ বাঁচিয়ে একা মরতে চায়। কিন্তু পারে কি?

শেষ নাটিকা দেশজ, 'সোনার চাবি'। একটা রহস্য গল্পের পরিবেশে শুরু এবং এর সমাপ্তি। প্রথম নাটিকা 'রিঙ'-এর সঙ্গে সংকলনের শেষ রচনার মধ্যে একটা মিল আছে। স্বপ্নাবিষ্ট বা হিপনটিক স্পেল্ তৈরি করে কার্য-উদ্ধার। গৌতম ও নন্দিতা আর এক অদ্ভুত মানুষ সোমেন্দু—এই তিনজনকে নিয়ে নাটক। সোমেন্দু অঘটন-ঘটন পটিয়সী হয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। রহস্য পরিবেশের প্রহেলিকাও শেষ হয়। সেই মণিমুক্তোর সন্ধান করতে সোনার চাবিটার প্রয়োজনও ফুরোলো তখন। অন্য এক রত্নভরা বাক্সের সন্ধান পেয়ে গেল বোধহয় গৌতম।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে কবি এবং নাট্যকার তাই তার সমগ্র নাট্যকর্মে সব সময়েই এক অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয়ে যায়। এ সংকলনের পাঠক লক্ষ্য করবেন, অসাধারণ কাব্যময়তা যেমন তেমনি প্রয়োজনে তার তূণীর থেকে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করতেও তিনি সমান পারঙ্গম। দর্শকের বুদ্ধি এবং মননের কাছে তার দায়বদ্ধতা, এক-আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া, এ সংকলনের নাটকগুলিতে সুস্পষ্ট।

বহুরূপী।
৭, লোয়ার রেঞ্জ
কলকাতা-৭০০ ০১৭

কুমার রায়

নাটকসমগ্র

প্রথম খণ্ড

কণ্ঠনালীতে সূর্য

চরিত্র লিপি

একজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক

মিলু

ডাক্তার লাহিড়ী

সমীর

বনমালী

প্রথম কর্মচারী

দ্বিতীয় কর্মচারী

কালো পোশাকে ঢাকা ছায়ামূর্তির মতো

কয়েকজন লোক

প্রথম অঙ্ক

[*অভিজাত পরিবেশের একটি কোঠা। বাঁ দিকের কোণে টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার। একপাশে আয়না-বসানো ওয়াড্রোব। টেবিলে ফোন। দেয়ালের একটু উঁচুতে বাঘের মুখের মাস্ক, তার নিচে চীনে মেয়ের মুখ আঁকা চ্যাপ্টা ধবধবে ফ্লাওয়ার-ভাসে মানিপ্ল্যান্টের সতেজ পাতা। ডানদিকের খাটে মার্জিত একক বিছানা। মিলু ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠল। তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে—পাতলা সচ্ছল চেহারা, সপ্রতিভ। সম্প্রতি মুখে অস্থিরতা। এই ঘরের সঙ্গে যুক্ত পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় মিলু টোকা দিল, আবার ঘড়ি দেখল, দ্রুত ব্যস্ততা ওর দৃষ্টিতে।*]

মিলু।। সমীর, হল? শেষ পর্যন্ত হাতে আর সময় পাবে না। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বম্বে এক্সপ্রেস হাওড়ায় ইন করবে ; যদি কোনওকালে কাজের হতে!

সমীর।। (*পাশের ঘর থেকে*) যাই। (*বিরক্তভাবে*) এসব কিছু ছাই আমার গায়ে লাগছে না। যতোসব বাজে ঝক্কি!

মিলু।। (*একটুকাল চুপ করে চেয়ারে বসেই উঠে পড়ল*) কোনমতে তাড়াতাড়ি পবে নাও না। (*দরজার কাছে গিয়ে*) কই, বেরোও! সঙ্গে সঙ্গে কি আর ট্যাক্সি পাবে?

সমীর।। (*ও ঘর থেকে*) জামাটা ঠিক লাগছে না মিলু! এতো আঁটো-আঁটো, ইচ্ছে করছে একটানে ছিঁড়ে ফেলি!

মিলু।। যা'হোক করে পরে নাও না লক্ষ্মীটি! (*মিলু টেলিফোন ডায়াল করল*) হ্যালো... কে? ছোটমাসি? মা তোমাদের ওখান থেকে কি বেরিয়ে পড়েছে? যায়নি? দাও না একবার মাকে (*ফোনটা কানে রেখে কিছুকাল চুপচাপ*) কে, মা? হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। এক্ষুণি জ্যাঠামণির চিঠি পেলুম। আজকের দুপুরের বম্বে এক্সপ্রেসে আসছেন। লিখেছেন—দাঁড়াও, চিঠিটা পড়ছি।

[*মিলু ফোনটা টেবিলে শুইয়ে রেখে চিঠিটা আনতে গেল। দরজা খুলে সমীর বেরুল —খাকি হাফপ্যান্ট, ফুল-হাতার টকটকে লাল গোলকিপারের মতো একটা গেঞ্জি গায়ে, হাতে কালো রঙের একটা মুসলিম টুপি। মিলু ওর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। কোনোমতে উত্তাল হাসিটা থামাল।*]

মিলু।। বাব্বা, কি অপরূপ মূর্তিই না করেছ! হাসতে হাসতে মরে যাব দেখছি। এত রূপও তোমার মধ্যে ছিল। কিগো রূপবাবাজী, রেগে গেছ মনে হচ্ছে?

[*আবার হাসল মিলু*]

সমীর।। হাসো, আর একবার হাসো, সমস্ত খুলে ফেলব—

মিলু।। লক্ষ্মীটি রেগে যেও না! তুমি তো জ্যাঠামণির জন্য করনি, আমার জন্য করেছ।

সমীর।। যাক অন্তত এটুকু বলেছ তাই আমার ভাগ্য! এতক্ষণ কি মনে হচ্ছিল জান, মিলু?

মিলু।। দাঁড়াও, মাকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দি আগে। (*ফোনটা তুলে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল*) মা, জ্যাঠামণি বাবাকে লিখেছেন, পনের ষোল বছর পর তোমাদের বাড়ি যাইতেছি। শরীর বাতে বেশ কাহিল। স্টেশনে অবশ্যই কাহাকেও পাঠাইবে। তুমি নিজে

আসিলে তো চিনিবই। তোমার ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ছোটবেলায় দেখিয়াছি, উহারা আমাকে চিনিবে না। কাজেই যাহাকে পাঠাইবে আকার চেনার সুবিধার্থে তাহাকে খাকি প্যাণ্ট, লাল জামা আর কালো মুসলিম টুপি পরিয়া থাকিতে বলিবে। তাহা হইলে চিনিতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইবে না।...এরপর কে কেমন আছ এসব লিখেছে। এ চিঠি পাবার পর কি করি বলতো? বাড়িতে এখন কেউ নেই। বনমালীটা তো বিশ্ববোকা। হঠাৎ সমীর এল, বহুকষ্টে রাজি করিয়েছি। যা সাজপোশাক হয়েছে ওর, দেখলে হাসতে হাসতে মরে যেতে তুমি। সত্যি জ্যাঠামণিটা পাগল! নিজে কি আর আসতে পারতেন না, আসলে একটা মজা করতে চান। রাখছি।

[*ফোনটা রাখে মিলু*]

সমীর।। মিলু (*অনেকটা তদ্‌গত ভাবে*), তোমার জ্যাঠামণির মজার ফাঁসিকাঠে কিন্তু আমি হাসি মুখেই ঝুলতে যাচ্ছি। আজ আমার নিজের সাজপোশাকের দিকে তাকিয়ে কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে...

মিলু।। কি মনে হচ্ছে?

সমীর।। মনে হচ্ছে, ভালবাসার কী অসীম শক্তি! কেবল তোমার দুটি কথায় আমি এই চেহারায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারি, স্টেশনতো ঘরের দরজায়। ভালবাসা যদি চায়, মেরুদণ্ড খুলে ফেলে ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, আরশোলা যা খুশি তাই হতে কোন লজ্জা নেই ; ভালবাসা যদি চায় সমস্ত ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ পোঁটলা করে মাথায় তুলে খালি গায়ে এসপ্লানেডের মোড়ে খড়ম পরে নৃত্য পর্যন্ত করে যেতে পারি। তুমি যখন ছোট্টটি ছিলে, পনের ছুঁয়েছ কি ছোঁওনি, তখনই এই মহাসত্য আমি টের পেয়েছিলাম। মনে আছে, তখন তোমাকে মনে রেখে লিখেছিলুম—

আধ ফোটা কুঁড়ি তুমি দু'চোখে কাজল
অলক দুলায়ে মোরে করেছ ছাগল।।

মিলু।। আজকেও তুমি তাই আছ। এখন এসব বক্তৃতা থামিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো বেরোও তো, গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে না?

সমীর।। গাড়ির থেকেও আমার আজকের উপলব্ধি অনেক বড় মিলু। (*আবেগে উত্তেজিত হয়ে*) গরম বালির মধ্যে যেমন করে খই ফুটতে থাকে, তেমনি করে অজস্র কবিতা আমার মনে জাগছে। ব্যাঙের ছাতা খোলার শব্দের মতো আমি তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মিলু।। সমীর, ঘড়িটা একবার দ্যাখো।

সমীর।। আমাকে বলতে দাও, বুঝতে দাও। কি দুঃসহ অস্থিরতায় এক একদিন মধ্য রাত্রে আমাকে হাতের কাছে কেবল কলম আর কাগজ নিয়ে জাগতে হয়, ঘুম আসে না, কিছুতে না।

মিলু।। খুব খারাপ লাগলে ঘুমের ওষুধ খেতে পার না? দিব্যি আরাম পাবে।

সমীর।। (*আহত হয়ে*) কি বলছো মিলু, ঘুমের ওষুধ খেয়ে সৃষ্টির যন্ত্রণা থামাব, সৌন্দর্যের আরতি থামিয়ে আমি নাক ডেকে যাব, চাঁদের আলো ফেলে ডালমুট খাব! খাতা খুলে তখন আমি লিখে যাই। অক্ষরের মালায়, চাঁদের আলোতে, আমি তোমাকে

সাজিয়ে যাই!

মিলু।। দোহাই তোমার, এখন ওসব সাজানোর কথা যাক। একবারটি বেরোও তো!

সমীর।। বেরিয়ে তোমার জ্যাঠামণিকে পাব ঠিকই, কিন্তু আমার অনুভূতিকে হারাব। এ তো কারুর কাছে রেখে যাওয়া যায় না। এ তো ছাতা নয়, বাক্স নয়, বেডিং নয়!

মিলু।। সঙ্গে করেই যাও।

সমীর।। *(করুণ হেসে)* তা হয় না মিলু। অনুভূতি দাড়ি গোঁফ নয় যে, যেখানে যাব সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আজ একটি অনুভূতির সমাধি-রচনা করে আমি যাচ্ছি!

মিলু।। তোমার তো কত অনুভূতি জন্মাচ্ছে, একটা-দুটোর মৃত্যুতে তেমন কোন ক্ষতি হবে না।

সমীর।। শিল্পী পিতা, মিলু। একটি অনুভূতির মৃত্যু একটি সন্তানের মৃত্যু! যাক্—তুমি এ ব্যথা বুঝতে পারবে না।

মিলু।। সব বুঝেছি সমীর, কিন্তু এক্ষুণি তোমাকে যে না গেলে নয়!

সমীর।। বেশ, যাচ্ছি! সন্তানের মৃত্যু বুকে বয়ে আমি যাচ্ছি!

[*সমীর চলে গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢুকল।*]

মিলু।। *(বিরক্ত)* আবার ঢুকলে?

সমীর।। কি চমৎকার একা ছিলে তুমি? যেন নির্জন পথের শেষ ল্যাম্পপোস্টটি।

মিলু।। আহা, ন্যাকামিতে মরে যাই আমি! ঘড়িটা একবার দ্যাখো। জ্যাঠামণি তো একা আসছেন!

সমীর।। হা ঈশ্বর, সব একা যদি এক রকম হত। মন্দিরে প্রদীপ যেরকম একা...

মিলু।। তোমার একাকিত্বের দর্শন, বিলাপ এসব শুনবার জন্য গাড়িটা চাকা থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। প্লিজ, এবার যাও।

[*সমীর যাচ্ছিল—*]

মিলু।। শোনো, শুনেছি জ্যাঠামণি হুট করে রেগে যান, তবে, বেশিক্ষণ থাকে না। বেশ মানিয়ে চ'ল, কেমন?

সমীর।। ছিটের সঙ্গে বদরাগের মিশ্রণ। চমৎকার! নৈবেদ্যর উপর আনন্দনাড়ুটি পর্যন্ত রয়েছে। ভাগ্য আমার আজ প্রসন্ন দেখছি!

মিলু।। সমীর, তুমি যাবে?

সমীর।। মৃত্যু আর তোমার জ্যাঠামণি, এ দুজনের কাছে না গিয়ে উপায় নেই।

মিলু।। আজেবাজে কথা বোলো না। যাও বলছি।

[*সমীর চলে গেল*]

[*মিলু টেবিলের কাছে এসে ডেট-ক্যালেণ্ডারের তারিখ পাল্টাল। গুছিয়ে রাখল। হঠাৎ বাইরে থেকে গণ্ডগোল শোনা গেল।*]

সমীরের গলা। মিলু, মিলু!

অন্য একটা গলা।।—"চ্যাচাবেন না ওরকমভাবে।"

(মিলু দ্রুত ঘর থেকে বেরুল। মঞ্চ ফাঁকা। বাইরে থেকে কতকগুলো কথা ভেসে আসছে)

মিলুর গলা। ছাড়ুন, ছাড়ুন বলছি!

অপরিচিত কণ্ঠ॥ কেন ছাড়ব? কিছুতেই ছাড়ব না, বহু কষ্টে ধরেছি।

সমীরের গলা॥ আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো!

মিলুর গলা॥ ছাড়ুন, ছাড়ুন বলছি! বনমালী, কি করছিস, লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দিলি কেন? দাঁড়া, বাবা বাড়ি ফিরুক—

(ক্রমশ ওরা মঞ্চে এল। সমস্ত মুখে খোঁচা দাড়ি, পাৎলুন আর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী পরা, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে একটা লোক সমীরের জামাটা গলার কাছে মুঠো করে ধরে আছে, বনমালী আর মিলু লোকটির হাত ধরে যথাসাধ্য টানছে।)

মিলু॥ ছাড়ুন, ছাড়ুন না ওকে! কি করেছে ও আপনার?

লোকটি॥ কি আবার করবে! আমি ছাড়া আমার ক্ষতি সব চাইতে বেশি কে আর করতে পারে?

মিলু॥ তাহলে অকারণ কারুর বাড়িতে ঢুকে এরকমভাবে...কি করেছে ও আপনার?

লোকটি॥ *(সমীরকে দেখিয়ে)* লোকটি চোর। মনে হচ্ছে সম্ভবত এই লোকটি আমার অনেক কিছু চুরি ক'রে রোজ এই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। অনেকদিন লক্ষ্য করেছি।

মিলু॥ আপনার মনে হয়, নিশ্চিত নন আপনি?

লোকটি॥ তা বলতে পারেন।

মিলু॥ কি চুরি করেছে ও আপনার?

লোকটি॥ অত সহজে বলা যায় না। মনে হয় অনেক কিছু।

মিলু॥ ও চোর, সেটাও আপনার মনে হয়, চুরি হওয়াটাও মনে হয়। আসলে আপনার মনটাকে মেরামত করুন। লুম্বিনী ভাল কারখানা। *(সমীরকে)* আচ্ছা লোক তো তুমি! এই ল্যাকপ্যাকে লোকটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পার না, কিরকম পুরুষ তুমি! *(সমীর হঠাৎ ঝটকা দিয়ে লোকটির আয়ত্তের বাইরে এল।)*

সমীর॥ তুমি জান মিলু, আমি একটু ডেলিকেট নেচারের। মারামারিটা আমি ঘৃণা করি। ওসব নোংরামো আমার আসে না! ন্যাস্টি!

মিলু॥ কি আসে তোমার? প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে? ছিঃ! লজ্জা করে না, ডেলিকেট নেচার! আর কথা বোলো না!

সমীর॥ তুমি কাছে আছ বলে কোন গণ্ডগোল পাকাতে চাইনি। তাছাড়া এটা আমার বাড়িও নয়। নিজের বাড়ি হলে শিকারের বন্দুকটা নিয়ে কুকুরের মতো...

[*হঠাৎ লোকটা চমকে উঠল*]

লোকটি॥ কুকুরের মতো বললেন কেন!

সমীর॥ কী বলব তাহলে?

লোকটি॥ *(ভয়ানক ঠাণ্ডা গলায়)* না, সে কথা নয়। মানে, কুকুর না বলে বেড়াল, বাঁদর, বাঘ, ভালুক যাহোক কিছুই তো বলতে পারতেন। কুকুরের কথা আপনার মনে এল কেন? আমার সম্পর্কে এতো জানলেন কি করে?

মিলু॥ কি আবোল-তাবোল বকছেন আপনি!

লোকটি॥ *(আপন মনে)* কুকুরের প্রসঙ্গে এল কেন?

সমীর॥ বসলেন যে, উঠুন বলছি। যদি না ওঠেন—

মিলু॥ *(ঠাট্টার গলায়)* না উঠলে, তুমি বাসে করে বাড়ি গিয়ে বন্দুক এনে তার

লাইসেন্স রিনিউ করে ওকে গুলি করবে, তাই না? হাত ধরে টেনে তুলতে পার না?

সমীর।। (*ওর হাত ধরল*) উঠুন।

[*জোরে টান দিতে লোকটি দুর্বলের মতো হুমড়ি খেতে-খেতে দেওয়ালের গায়ে দাঁড়াল।*]

সমীর।। যাবেন কিনা বলুন? না হলে আর এক ধাক্কায় সিঁড়ি দিয়ে নিচে ফেলে দেব। (*দূরে চোখ রেখে*) ওঃ মিলু, তুমি আমার ভিতরের পশুটাকে খুঁচিয়ে দিয়েছ। তীব্র গর্জন করে ওটা এখন সিংহের মতো জাগছে।

[*হঠাৎ লোকটি পকেটে হাত ঢোকাল*]

লোকটি।। (*অত্যন্ত শান্ত গলায়*) কিন্তু আমার পকেটে একটা বন্দুক রয়েছে। আপনি কাছে এলে আপনার মুখোমুখি রেখে একটা মিষ্টি শব্দ করব।

মিলু।। সরে এস সমীর, সরে এস। (*সমীরকে টেনে নিয়ে এল। তারপর সমীর বনমালী, মিলু এক কোণে জড়ো হল।*)

মিলু।। (*গলা কাঁপছে*) দেখুন, সমীর বড্ড ছেলেমানুষ, ও না বুঝে, কেবল আমার কথায় ক্ষেপে গিয়ে...ও কখনো চোর নয়। ওর চুরির দরকার নেই, টাকা পয়সার কোনও অভাব নেই ওদের।

সমীর।। সত্যি, ওরকম স্বভাব আমার নয়...কোমল কবিতা ছাড়া... আমি কোনো ক্ষিপ্ত কবিতা পর্যন্ত লিখি না। চুরি আমার আসে না।

লোকটি।। অনেক কিছু চুরি করতে ইচ্ছে হয় যা বড়লোকের ঘরে না থাকতে পারে।

মিলু।। বলুন, কি নিয়েছে? আমার কথায় ও ঠিক ফিরিয়ে দেবে। কি চুরি হয়েছে আপনার?

লোকটি।। হয়তো বুঝবেন না, কিংবা আমিও হয়তো পুরো বুঝি না। ধরুন, যদি বলি রোদ্দুর থেকে সাদা চুরি গেছে, জল থেকে ঠাণ্ডা, আগুন থেকে তাপ, চরিত্র থেকে উল্লাস। (*ওরা নির্বিকার তাকিয়ে রইল*) কিংবা ধরুন, চুরি আমার কিছুই যায়নি, আসলে আমার স্বভাব। কোন লোককে চোর মনে করে হঠাৎ ঠ্যাঙালে আরাম পাব, পকেটের বন্দুক বের করে গুলি করলে মজা পাব।

মিলু।। (*এগিয়ে গিয়ে*) কিন্তু সমীরকে আপনি ছেড়ে দিন। আমাকে বিশ্বাস করুন, বড় ভাল ছেলে ও, আপনাকে চেনে না, দেখেনি পর্যন্ত।

লোকটি।। তা হতে পারে। তা উনি চলে যান না। আমি কখনো নিশ্চয়ই ওকে থাকতে বলিনি। যত কম লোক থাকে ততই ভাল লাগে আমার। ঠিক আছে, আপনি যান। (*আপন মনে*) অদ্ভুত! আমার কথায় কারুর যাওয়া নির্ভর করে! যেন আদেশ করছি। মাথায় মুকুটটা ঠিক আছে তো?

[*একটা কাল্পনিক মুকুট ঠিকভাবে বসাল মাথায়।*]

মিলু।। তুমি চলে যাও সমীর, যাও।

[*প্রায় দরজা দিয়ে ঠেলে দিতে চাইল সমীরকে।*]

সমীর।। সে হয় না, মিলু। বন্দুক-হাতে একটা ক্ষ্যাপা লোকের কাছে তোমাকে একা তো ফেলে যাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে আমাকে মরতে দাও। কবিতার খাতা বুকে রেখে তোমাকে পাশে নিয়ে একটা নিবিড় মধুর মৃত্যু আমি অনেক কাল ভেবেছি...কিন্তু

বন্দুকের গুলিতে বড় কষ্ট!

লোকটি॥ (*পকেট উল্টে দেখিয়ে*) পকেটে কিছু নেই আমার। বন্দুকে আপনার থেকে আমার বেশি ভয়, চালাতেও জানি না। আপনি আমার দিকে তেড়ে আসতে হঠাৎ কেমন দুম্ করে বলে ফেললাম। কিন্তু বিশ্বাস করবেন ভাবিনি। আপনাদের দেখে মজা লাগছিল। বহুদিন হাসি পায় না, নয়তো হাসতাম। রাগ হয় না, তাহলে অনেক কিছু ছিঁড়ে ফেলতাম ; কান্নাও আসেনা, তাহলে মোটামুটি কারো কাছে ফিরে যাওয়া যেত, প্রার্থনা-টার্থনাও করা চলত। ধার্মিক হতে পারতাম আর কি! বন্দুক তো নেই, বসলে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।

মিলু॥ আপনি যদি নিচে গিয়ে বসেন ভাল হয়। বনমালী চা দেবে, কথাবার্তা বলে শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। (*সমীরকে*) তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও! আর মিনিট চল্লিশ বাকি আছে মাত্র!

[*সমীর চলে গেল*]

লোকটি॥ কিসের ভয় আমাকে? পকেটে বন্দুক নেই, মাথায় ধারালো শিং নেই, হাতে উঁচোনো নখ নেই, স্বভাবে বুনো মোষের দাপট নেই, লোভে গোঁয়ার গণ্ডার নই কেবল আমার ক্ষিধের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভিখিরি ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মিলু॥ কিছু খাবেন আপনি?

লোকটি॥ না। পেটভর্তি ক্ষিধে নয়, হৃৎপিণ্ডভর্তি ক্ষিধে। নানারকম ক্ষিধে। যেমন লাল খাওয়ার ক্ষিধে, সবুজ কিংবা রূপোলি খাওয়ার ক্ষিধে...জলের উপরের বাতাস, অনেক দূরের বজ্রপাতের শব্দ, কাগজের মসৃণ স্পর্শ, জলে ভেজা কামিনীফুলের গন্ধ, আপনার ঘাড়ের উপর গড়িয়ে-পড়া চুল—এরকম অনেক কিছু খেতে চাই। হ্যাঁ, আর এখুনি আপনার চোখে যে ভয়, সেটাও খেতে চাই। এই যে ঘাবড়ে গেলেন তাও ; এই যে অবাক হচ্ছেন, তাও।

মিলু॥ প্রথমে চা খেয়ে নিয়ে যদি ওসব খান...

লোকটি॥ আগে একটা দেশলাই পেলে ভাল হয়।

মিলু॥ দেশলাই, খাবেন?

লোকটি॥ নয়তো কি, আপনাদের বাড়িটা জ্বালাব?

মিলু॥ দেশলাই খান আপনি?

লোকটি॥ দেশলাই দিয়ে খাই।

মিলু॥ কি, চা?

লোকটি॥ না, সবাই যা খায়, সিগ্রেট। তবে অন্য ধরণের সিগ্রেট। যা দোকানে নেই। তৈরি করতে হয়েছে। পুলিশ দেখলে ফেউ লাগাবে।

মিলু॥ তাহলে খুব বিপজ্জনক জিনিস নিশ্চয়ই?

লোকটি॥ (*পকেট থেকে চুরুটের মতো মোটা একটা সিগারেট বের করল*) বিপজ্জনক নয়, অদ্ভুত। কয়েকটা টান দিলেই টাইম এ্যাণ্ড স্পেসের সমস্ত কনভেনশন্ ভেঙে যাবে। আপনি কোথায় আছেন, কেমন সময়ে আছেন এই ধারণাটা গুলিয়ে গেলে কি ভীষণ মজা আর বৈচিত্র্য বলুন তো! হয়তো মনে হবে পাঁচশো বছর ধরে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি কিংবা 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটছি'। অথবা অদ্ভুত

সব দৃশ্য দেখব যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। আপনি এই শূন্য দেয়াল সিলিং দেখে দেখে ক্লান্ত অথচ আমি সেখানে অনেক কিছু দেখব। হয়তো মরুভূমি কিংবা নক্ষত্রের মধ্যে আটকে-যাওয়া ময়ূরের ঠোঁট কিংবা সবুজ সাপের রক্তবর্ণ জিভ।

মিলু।। অথবা জলের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো শালুক! তাই না?

লোকটি।। দারুণ বলেছেন! খাবেন আপনি একটা? আপনার খাওয়া উচিত। ইম্যাজিনেটিভ ব্রেন না হলে, এসব খাবার মানে হয় না।

মিলু।। যাবার সময় একটা দিয়ে যাবেন, রাত্তিরে ছাদে উঠে খাব।

লোকটি।। ভেরি গুড়, (*পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট দিল*) ধরুন একটা।

(*হঠাৎ লোকটি কি মনে করে উঠে গিয়ে টেবিলে কি খুঁজতে লাগল।*)

মিলু।। কি খুঁজছেন?

লোকটি।। আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় একটা লাল নীল পেন্সিল আর সিল্কের একটা ছোট গোলাপী রং-এর জামা ; ওর পকেটে আমি পয়সা রাখতাম। একদিন রাণীর মুখ আঁকা সোনার মতো একটা চকচকে পয়সা পকেটের ছেঁড়া জায়গা থেকে গড়িয়ে অন্ধকার পথে হারিয়ে গিয়েছিলো।

মিলু।। ওটা এখানে কি করে আসবে?

লোকটি।। অনেক সময় গড়াতে গড়াতে আসে! আমি এলাম কি করে?

মিলু।। তাও তো বটে। (*একটু ভেবে*) দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন—

লোকটি।। বলুন।

মিলু।। এক্ষুণি আমার একটু বাইরে যাবার দরকার ছিল। আপনি যদি আর একদিন আসেন, বেশ গল্প করা যেত।

লোকটি।। তা বেরুন না আপনি। আমি আপনার বাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

মিলু।। আমার বাবা!

লোকটি।। হ্যাঁ, আমি আপনাদের একতলার ক্লিনিকের ওয়েটিং-রুমে এতক্ষণ বসেছিলাম।

মিলু।। আপনার কোনো অসুখ?

লোকটি।। হ্যাঁ, অসুখও বলতে পারেন—গলায় একটা ভয়ানক জিনিস আটকে রয়েছে।

মিলু।। কই, আপনার কথাবার্তায় তো সে রকম কোনো কষ্ট দেখছি না।

লোকটি।। বাইরে কষ্ট তেমন করে প্রকাশ করতে পারি না।

মিলু।। কি হয়েছে আপনার?

লোকটি।। গলায় সূর্য আটকে আছে ; টিউমারের মতো ছোট থেকে এখন বিরাট হয়েছে। হঠাৎ-হঠাৎ কাশি হয়। খুব কাশলে সূর্যটা ভেঙে সাবান ফেনার বেলুনের মতো গোল-গোল অসংখ্য পিং-পং বল হয়ে চারদিকে গড়িয়ে পড়ে।

মিলু।। তাহলে আপনার তো টেবিল-টেনিস খেলার বেশ সুবিধে। কিংবা চাকরি ছেড়ে পিং-পং বলের দোকান দিতে পারেন। রোগটা তো আপনার চাকরির থেকেও বড়, ব্যাঙ্কের মতো। ইচ্ছেমতো কেশেই টাকা জমাতে পারেন।

লোকটি।। কিন্তু গলা থেকে সূর্যটার হয় বেরুনো উচিত কিংবা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে গিয়ে ঢুকে থাকা দরকার। কণ্ঠনালীতে ব্যাপারটা এত অস্বস্তিকর।

মিলু।। একটু কাশুন তো।

লোকটি।। তাহলে এতো বল পড়তে থাকবে যে আপনি মুস্কিলে পড়বেন। তাছাড়া আর একটা উপসর্গ আছে। বলটা গলার কাছে ঘুরে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা খেয়ে ড্রপ খেতে থাকে। বুকের নিঃশ্বাসে তার শব্দ শোনা যায়। আপনি আমার বুকে কান পাতুন, বুকের মধ্যে ঠিক শুনবেন।

[*মিলুর দিকে এগিয়ে যায়*]

মিলু।। (*পিছিয়ে*) না না, আমি অবিশ্বাস করছি না। এখান থেকেই যেন কানে আসছে শব্দটা। বেশ মিষ্টি শব্দটা, তাই না? যেন কচুপাতার উপর বৃষ্টির মৃদু ফোঁটার শব্দ, ঠিক বলিনি?

লোকটি।। শব্দটা মিষ্টি লাগল আপনার! অসম্ভব কর্কশ শব্দ ; বিরক্তিকর, ভয়ংকর একঘেয়ে, ভয়ানক খারাপ লাগে আমার! যে কোনরকম একঘেয়ে শব্দ মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। ধরুন যদি আপনি রাত্রে শুয়ে শুয়ে শোনেন একটা বল চারতলার সিঁড়ি দিয়ে একতলায় টপাটপ করে নামছে আবার উঠছে—এরকম ক্রমাগত হতে থাকলে আপনার কিরকম মনে হবে বলুন তো?

মিলু।। ভূতের ভয়ে মরে যাব।

লোকটি।। ধরুন ওটা ভূতের ব্যাপার নয়।

মিলু।। ওটা ধরলেও ভূতুড়ে, না ধরলেও ভূতুড়ে।

লোকটি।। (*হতাশ ভঙ্গিতে*) আপনাকে বোঝানো শক্ত। যাকগে, আপনি দেশলাইটা দিন।

মিলু।। বনমালী আনছে।

(*লোকটি ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল! বাঘের মাস্কটাব দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল*)

মিলু।। কিন্তু আপনি তো আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। উনি বোকারোতে দিদির বাড়ি বেড়াতে গেছেন। দিন দশেক বাদে আসবেন।

লোকটি।। বাপরে, তাহলে আরো দিন দশেক আমাকে ওয়েট করতে হবে! (বসল) কিন্তু এভাবে গল্প করে দশদিন কাটানোও তো একঘেয়ে হয়ে উঠবে।

মিলু।। আপনি কি (*ভয়ে ভয়ে*) এখানেই অপেক্ষা করার কথা ভাবছেন?

লোকটি।। যে কোন জায়গাতেই যখন ওয়েট করতে হবে, তখন এ জায়গাটারই বা অপরাধ কি? তাছাড়া আপনি লোকটি কোনক্রমেই বিরক্তিকর নন!

মিলু।। কিন্তু আপনার যখন ওরকম ভয়ানক একটা অসুখ, এতোদিন রোগটাকে ফেলে রাখা কিন্তু মোটেই উচিত হবে না। বরঞ্চ ইতিমধ্যে অন্য কোন ভাল ডাক্তার আপনি দেখান।

লোকটি।। না, দেখুন, কোনও ব্যাপারেই ঘোরাঘুরি আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

মিলু।। তাহলে দিন দশেক পরে আপনি আসুন! আমি বাবা এলে আপনার সব কথা

বলে রাখব, কেমন?

লোকটি ।। ধন্যবাদ। আমার সম্পর্কে কেউ ভাবলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই। নানারকম অ্যালার্জি দেখা দেয়। বরঞ্চ আপনি দেশলাইটা যদি আনান।

মিলু ।। বনমালীটা এমন হয়েছে। বনমালী *(চেঁচিয়ে ডাকল)*, দেশলাইটা কি আনবি, না আমাকেই যেতে হবে? *(হঠাৎ সুরটা নরম করে)* বনমালী আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে, কেমন?

লোকটি ।। কি দরকার? বনমালী আমাকে এখানে নিয়ে আসেনি। বনমালী চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে না ; আমার সঙ্গে জম্মায়নি, আমার সঙ্গে মরবেও না। বলুন তাই না?

মিলু ।। তাতো ঠিকই। আচ্ছা আপনি কোথায় থাকেন?

লোকটি ।। আপাতত কিছুই জানিনা।

মিলু ।। এখানে আসবার আগে কোত্থেকে এলেন?

লোকটি ।। আপনাদের একতলার সিঁড়ি থেকে।

মিলু ।। তার আগে?

লোকটি ।। *(গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করল, মাথা চুলকোলো, বিরক্ত হল)* ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সিঁড়ির আগে আপনাদের ক্লিনিক, তার আগে রাস্তা।

মিলু ।। তার আগে?

লোকটি ।। তার আগে একটা টেনিস বলের উপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এসেছি বলে মনে হচ্ছে।

মিলু ।। নিশ্চয়ই তার আগের কিছু মনে পড়ছে না?

লোকটি ।। হ্যাঁ, পড়ছে। অন্ধকার, তার আগে অন্ধকার, তারো আগে অন্ধকার, আর আমি বিরাট একখানা জাল হাতে করে হাঁটছি।

মিলু ।। জাল হাতে? কেন?

লোকটি ।। জাল আবার কেন? মাছ ধরতে। সোনালি রূপোলি সব বিচিত্ররকম মাছ। ভীষণ কালো অন্ধকার জলে অজস্র আলোকিত মাছ খেলা করছে, ভাবুন তো।

মিলু ।। আচ্ছা, আপনার সেই জালটা নিচের ক্লিনিকে রেখে আসেননি তো আবার?

লোকটি ।। জালটা কোথায় রাখলাম? *(পকেট খুঁজল)* হ্যাঁ, একটা পেল্লাই মাছ হাত থেকে টেনে নিয়ে গেছে।

মিলু ।। তারপরেই টেনিস বলে ভাসতে ভাসতে এলেন। আপনার সব কিছুতেই কিন্তু একটা বলের ব্যাপার আছে তাই না?

লোকটি ।। *(উৎসাহিত হয়ে)* ঠিক ধরেছেন। গলায় গোল সূর্য আটকে যাবার পর থেকে গোলাকার বলের হ্যালিউসিনেশন্ আমার খুব বেশি হয়। বলের দৃশ্য, বলের কথা আমাকে ঘিরে থাকে। আপনি ঠিক ধরেছেন এটাও আমার রোগের একটা সিমটম।

[*বনমালী দেশলাই এনে দিল। পকেট থেকে সিগারেটটা ধরিয়ে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে গুম হয়ে থাকল লোকটি। বনমালী, ভয়ে ভয়ে দেখছিল। মিলু ওদের দুজনকে লক্ষ্য করছিল।*

লোকটি আর একটা টান দিয়ে চোখ বুজল। মিলু আস্তে আস্তে ফোনটার কাছে গেল, দু'বার ডায়াল ঘোরাতেই হঠাৎ লোকটা ভয়ানক কেশে উঠল। ফোনটা রেখে দ্রুত এগিয়ে এল মিলু। লোকটি কাশতে কাশতে শূন্যে কাল্পনিক কিছু মুঠো করে ধরতে চাইছে। অবাক হয়ে দেখছিল মিলু কি করবে বুঝতে পারছিল না।]

মিলু॥ এই যে শুনুন, তাকান। [*লোকটি তাকাল।*]

লোকটি॥ ধরুন, ধরুন ; অনর্গল পিং-পং বল পড়ছে মুখ থেকে, অনেক অনেক। সমস্ত ঘরে ড্রপ খাচ্ছে, সবাই ড্রপ খাচ্ছে—আপনি, আমি, টেবিল, চেয়ার। জানলা দিয়ে তাকান, রাস্তা, ল্যাম্পপোস্ট, লোকজন, গোটা পৃথিবী ড্রপ খাচ্ছে। সমস্ত শরীরটা বড়ো খারাপ লাগছে, অদ্ভুত দুর্বল লাগছে। (*খাটে হাতের ভরে আধশোয়া হল*) আমি আমার ছোটবেলা দেখতে পাচ্ছি। ছোটবেলার পুকুরধারের চাঁদটা ড্রপ খেতে খেতে ঘরে ঢুকছে। (*মিলুকে*) সরুন আপনি, মনে হচ্ছে চাঁদটা বেশ শক্ত। ঠিক আপনার কপালে লাগবে। আমার পিছনে আসুন, পিছনে আসুন। চাঁদটাকে কে আঁচড়ে দিয়েছে। কে যেন কয়লা ভাঙতে ভাঙতে ধরেছে, চাঁদটায় কালি লেগে আছে। আপনি সরুন ; ফুঁ দিন, জানালা দিয়ে সরে যাক। ফুঁ দিন।

(ফুঁ দিতে লাগল লোকটি। বনমালী ভয়ে ভয়ে বিমূঢ় হয়ে দুবার ফুঁ দিয়ে চারদিক তাকিয়ে থেমে গেল। মিলু নির্বাক। ক্লান্ত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়লো লোকটি।)

লোকটি॥ সারা ঘরে পিং-পং বল ড্রপ খাচ্ছে...গলায় সূর্য আটকে আছে। বড়ো কষ্ট হচ্ছে আমার। (*মিলুকে*) শুনুন, আপনার বাবা এলে দশদিন বাদে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবেন, কণ্ঠনালী থেকে সূর্যটা তুলতে হবে। আর যদি দ্যাখেন নিজে থেকেই গলা থেকে ছাড়া পেয়ে মুখের মধ্য দিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে—তাহলে কোনও ডাক্তার চাইনা কিংবা যদি সূর্যটা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলেও ডাক্তার চাইনা।

[*আস্তে আস্তে চুপ করল লোকটি। মিলু কাছে গেল*]

মিলু॥ শুনুন, শুনুন।

[*সাড়া নেই। হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে টেবিলে দু'হাতের মধ্যে মাথা রাখল। উঠে ফোনটা ধরল, কি ভেবে আবার রেখে দিল।*]

মিলু॥ (*বনমালীকে*) ঠিক করে শুইয়ে দে না লোকটাকে। ঘাড়টা কেমন ঝুলে আছে দেখছিস না?

[*বনমালী ঠিক ভাবে শুইয়ে দিল। তারপর মুখটা এগিয়ে গিয়ে দেখল। হাত থেকে সিগারেটটা সন্তর্পণে নিয়ে গন্ধ শুঁকল, তারপর বিকৃত মুখে জানালা দিয়ে ফেলে দিল।*]

মঞ্চ অন্ধকার হয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেই ঘর। জ্যাঠামণি ডাক্তার লাহিড়ী একটা প্লেটে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা পরীক্ষা করছেন এবং অন্যমনস্কভাবে ডিস থেকে সিঙাড়া তুলে খাচ্ছেন। প্রায় বৃদ্ধ। চোখে পুরু চশমা। টেবিলল্যাম্পের দিকে এগিয়ে কি একটা নোট করলেন। হঠাৎ কিছু মনে হতে নোট করা বন্ধ করে কলমটা পকেটে রাখলেন।]

ডাক্তার।। মিলু। (*একটু জোরে*) মিলু!

মিলু।। (*বাইরে থেকে*) যাই জ্যাঠামণি।

[মিলু ঢুকল। ঘরোয়া ছিমছাম পোশাক। খোঁপায় ফুল রয়েছে]

মিলু।। আমাকে ডাকছিলে, জ্যাঠামণি?

ডাক্তার।। হ্যাঁ, আজকে আমাকে কটা সিঙাড়া দিয়েছিলি?

মিলু।। ছ'টা।

ডাক্তার।। আমার ডাইরিতে নোট করেছিস?

মিলু।। ভুলে গেছি একদম।

ডাক্তার।। আশ্চর্য ভুল তোদের।

মিলু।। বাঃ, ভুলে গেলে কি করব!

ডাক্তার।। ডান হাতে ভাত খেতে তো ভুল হয়না। থাক্‌গে! (*পকেট থেকে ডাইরিটা বের করে দিল*) নাও আজকের ডেটে লেখো, ক'টা সিঙাড়া কখন খেলাম। এপর্যন্ত যতগুলো খেয়েছি তা ব্রট ফরোয়ার্ড করা আছে, এই চারটে নিয়ে গ্র্যাণ্ড টোটাল দিতে হবে।

[মিলু খাতায় লিখে হিসেবটা করতে লাগলো]

ডাক্তার।। ক'টা হল?

মিলু।।তেইশ হাজার ছশো নিরানব্বুই।

ডাক্তার।। এঃ নিরানব্বুই, মানে আর একটা হলেই সাতশো হত।

মিলু।।নিয়ে আসি-না আর একটা। এক্ষুনিতো দোকান থেকে আনা হয়েছে, বেশ গরম আছে।

ডাক্তার।। তা আনো। একটা অড-নাম্বারে সারাদিন থাকার কোন মানে হয় না। (*মিলু চলে গেল। ডাক্তার প্লেটটা হাতে নিয়ে একটা চামচে দিয়ে সিগারেটটার গুঁড়োগুলি নেড়ে চেড়ে শুঁকলেন! মিলু সিঙাড়া নিয়ে এল। তুলে নিলেন।*)

ডাক্তার।। মিলু, এরকম সিগ্রেট লোকটির কটা আছে রে আর?

মিলু।। আর নেই সম্ভবত। বনমালী খুঁজে দেখেছে।

ডাক্তার।। আসলে এগুলো সাধারণ সিগ্রেট নয়—জটিল মাদক উপকরণে তৈরী একরকম মশলা কাগজে রোল করে নেওয়া হয়েছে। জিনিসটা সোজা ব্রেনে গিয়ে হিট্ করে ; তারপর সব এলোমেলো হয়ে যায়? মন্দ না, ভাবছি আমিও একটা খাব কি না।

মিলু।।জ্যাঠামণি, ওসব ছোঁবে না বলছি। দাঁড়াও মাকে বলছি!

[চলে যেতে চাইল।]

ডাক্তার।। বোস, ও সূর্যটা ক'দিন হল গিলেছে?

মিলু।। তুমিও তেমনি। এতোদিন ডাক্তারি করে কী বুদ্ধি হয়েছে তোমার! সত্যি সত্যি বুঝি কেউ সূর্য গেলে? আসলে মাথার রোগ, নেশার ঘোর থেকে আবোল তাবোল বকছে।

ডাক্তার।। কিন্তু ওর ভেতর থেকে কিছু একটা বের না করলে ও সারবে না। (চিন্তা করে) ওর সেই নোটবুকটা পড়েছিলি?

মিলু।। কিছু বুঝিনি, কি সব ছাইপাঁশ কবিতা, এলোমেলো লেখা, ছেলেমানুষের মতো আঁকা ছবি।

ডাক্তার।। লোকটা অন্ততপক্ষে কবি এটা বোঝা যাচ্ছে। আর কবিরা সব অদ্ভুত অদ্ভুত ভেবে থাকে। হয়ত সূর্যের একটা ধারণা গিলেছে বলেই এরকম বলছে, মানে বেশ বড়োরকম কিছু একটা ওর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, সূর্যের মতো বড়ো, উজ্জ্বল ; অথচ প্রকাশও করতে পারছে না, ভিতরে অসহ্য লাগছে।

মিলু।। ওসব কবিতার ব্যাপার আমি বুঝি না। তবে হাসি হৈ চৈ-এর মধ্যে না এলে লোকটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ ওর ধারণা ও হাসতে বা কাঁদতে একদম ভুলে গেছে।

ডাক্তার।। তাহলেও হাসাতে হবে ; ভয়ানক কাঁদাতে হবে। আর এটাই ওর প্রথম চিকিৎসা।

[*বনমালী চা নিয়ে ঢুকল*]

বনমালী।। জ্যাঠাবাবু, পেসেন ঘরে একা একা ঘুরছে আর ভক্‌ভক করে সেই সিগারেট টানছে, নাক দিয়ে যেন ইঞ্জিনের ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। ডাকলুম,—কি ভাবছে, মোটে সাড়া দিচ্ছেনা।

ডাক্তার।। ডেকে নিয়ে আয় ওকে।

[*বনমালী চলে গেল।*]

মিলু।। নিশ্চয়ই কোথাও সিগ্রেট লুকিয়ে রেখেছিল। এরকম ভাবে ঐ বিষাক্ত জিনিস খেলে লোকটা ঠিক মারা যাবে।

ডাক্তার।। লোকটা সম্পর্কে তোর মমতা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে।

মিলু।। তুমি মোটেই জ্যাঠামণিব মতো কথা বলনা, যা তা বল। মায়া মমতা আমার কাছে মায়া মমতাই।

[*বনমালী এবং লোকটি ঢুকল। সিগারেট টানছে লোকটি। বিশেষ কোনওদিকে দৃষ্টি নেই। সব কিছু যেন অপরিচিত। যেন এইমাত্র প্রথম পৃথিবীতে এসে অবাক হয়ে পড়েছে।*]

মিলু।। (*লোকটিকে*) বসুন।

[*লোকটি বসল।*]

মিলু।। উনি আমার জ্যাঠামণি। বড়ো ডাক্তার ছিলেন মিলিটারিতে। এখন রিটায়ার্ড! আপনার অসুখ ঠিক সারিয়ে দেবেন।

লোকটি।। কিন্তু আমি তো আপনার বাবার কাছে এসেছিলাম।

ডাক্তার।। ওর বাবা না আসা অব্দি, আমি দেখলে আপনার খুব আপত্তি হবে না

নিশ্চয়ই! তাছাড়া গলায় সূর্য আটকানো জাতীয় রোগের চিকিৎসা আমি করেছি।

লোকটি ॥ (*ক্ষেপে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে*) অসম্ভব। এটা পৃথিবীর প্রথম মৌলিক রোগ। আমার আগে কারুর হতে পারে না। তাছাড়া এ রোগটার সমস্ত কপিরাইটও আমার!

ডাক্তার ॥ না ঠিক সূর্য আটকানোর চিকিৎসাই যে করেছি তা নয়, তবে এ জাতীয়। আমার একজন চিত্রশিল্পী বন্ধুর বুকের মধ্যে একটা মরা পাখি উড়তে উড়তে ঢুকেছিল।

লোকটি ॥ মরা পাখি উড়েছিল! ভেরি গুড আইডিয়া। তারপর, তারপর? সাকসেসফুলি অপারেশন করতে পেরেছিলেন?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, ছুরি না চালিয়েই।

লোকটি ॥ চমৎকার! আমার গলাতেও কিন্তু ছুরি চালাবেন না!

ডাক্তার ॥ অসম্ভব। একজাতীয় পাখি খোঁজ করছি আমি, অস্ট্রেলিয়ার পিউট্রাস গাছের ডালে দেখা যায়। পাখিটার শরীরের প্রায় সবটাই ঠোঁট, ছোট্ট একটুখানি মাত্র শরীর। আপনার ঠোঁটে বসে গলার মধ্যে চঞ্চু ঢুকিয়ে সূর্যটা ও টেনে তুলতে পারবে। তবে তার আগে গলার ভিতরের সূর্যটায় একটা আংটা লাগিয়ে নিতে হবে। নয়তো গোল সূর্য ঠোঁটে ধরায় অসুবিধা।

লোকটি ॥ ঠিক ধরেছেন আপনি। কিন্তু সূর্যটায় আংটা লাগাবেন কেমন করে?

ডাক্তার ॥ তাও ভেবে রেখেছি। ভালবাসা, দুঃখ কিংবা প্রাণখোলা হাসি থেকে যদি চোখে জেনুইন জল আসে তা দিয়ে কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় একরকম আঠা তৈরী করা যায় ; সেই আঠা দিয়ে একটা আংটা সাঁড়াশি দিয়ে কণ্ঠনালীর সূর্যে আটকে দিতে হবে।

লোকটি ॥ (*সিগারেট জোরে টান দিয়ে*) প্ল্যানটা বেশ ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে!

মিলু ॥ (*একপাশে সরে এসে ডাক্তার লাহিড়ীকে*) কি সব বলে গেলে তুমি জ্যাঠামণি, তুমিও ঐ সিগ্রেটে টান দাওনি তো!

ডাক্তার ॥ (*গম্ভীর মুখে*) কি জানি, পরীক্ষা করতে নাড়াচাড়া করেছি। (*হেসে*) ভুলে দু'একটা টানও দিয়ে বসতে পারি। জিনিসটা খুব খারাপ বলে তো মনে হয়না। এসব ব্যাপার আমাকে টানে।

মিলু ॥ তোমাকে কিন্তু কেমন যেন দেখাচ্ছে।

ডাক্তার ॥ মানুষের মতো দেখাচ্ছে তো! এক এক সময় মনে হয় প্রচণ্ড ক্ষিধেয় বকাসুর হয়ে যাব।

[*লোকটি প্রবলভাবে সিগারেট টানছে। মিলু ওর কাছে গেল*]

মিলু ॥ আপনি ঐ সিগ্রেটটা ফেলে দিন। শুনছেন?

[*লোকটি তাকাল।*]

মিলু ॥ সিগ্রেটটা ফেলে দিন। ওটা খুব ভালো জিনিশ নয়।

লোকটি ॥ আপনি খেয়েছিলেন?

মিলু ॥ না।

লোকটি ॥ আগে খান। আর নিষেধ করবেন না।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা, সিগ্রেটটা আমার হাতে দিন। একটা প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করা যাক।

(*লোকটি সিগ্রেটটা দিতে টেবিলে রাখল। স্টেথসকোপটা [illegible] এলেন ডাক্তার।*

জিভ, বুক, পিঠ পরীক্ষা করলেন। নোটবুকে লিখলেন।)

ডাক্তার।। আপনার নামটা দয়া করে বলবেন?

লোকটি।। নাম শুনে আজ অবধি রোগ সারেনি কারুর। আমার অসুখের নামটা লিখুন।

ডাক্তার।। তাহলেও চিনে রাখার জন্য দরকার। আপনার পরিচয় তো চাই।

লোকটি।। লিখুন, পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির মনুষ্যাকৃতি প্রাণী। কণ্ঠনালীতে সূর্য আটকেছে, কপালে ধনুকের কাটা অদৃশ্য দাগ। ইচ্ছেমতো লিখে থাকি। পাপ এবং পুণ্য চিনি না, চেনা দুঃসাধ্য মনে হয়। প্রচুর শাস্তি পেয়েছি, অপরাধ জানা যাচ্ছে না। জলের থেকেও মাটি কম বিপজ্জনক নয়, অনেকে ডুবেছে দেখেছি। ঘুমুলে দেখতে একটা মরা পতঙ্গের মতো, একদিন একপাল পিঁপড়ে মরা পোকা ভেবে তুলে নিতে এসেছিল। পিপাসা খুব বেশি, জলও বেছে খেতে হয় বলে বিপদ। এসব লিখলেই আমাকে চেনা যাবে, নাম বোধ হয় চাই না।

মিলু।। কিন্তু নামে সোজা হত।

লোকটি।। এতে সঠিক হল।

মিলু।। আপনার বাবার নাম নিশ্চয়ই বলবেন।

লোকটি।। নাম জানি না তবে একখানা পুরনো ফটোর চেহারা মনে আছে। বিংশ শতাব্দীর মতো দেখতে, পুরনো শতাব্দীর দাড়ি মুখে একজন অচেনা লোক তার দাড়ি কাটছে আর গলাকাটার ভয়ে বাবার মুখে ভয়ের চিহ্ন।

মিলু।।আপনার যতো অদ্ভুত ভাবনা। এসব আবোল তাবোল ভাবেন কেন?

লোকটি।। আমি ভাবতে চাই না।

মিলু।।বনমালী বলল, একটু আগেও আপনি ও ঘরে বসে ভাবছিলেন।

ডাক্তার।। আচ্ছা, কি ভাবছিলেন আপনি?

লোকটি।। ভাবছিলাম, ধরুন একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা নতুন বাড়ি করা হয়েছে। সেখানে হঠাৎ টিকটিকি আসে কোত্থেকে! তাছাড়া ভাবছিলাম, কুচকুচে কালো, ধপধপে সাদা, টকটকে লাল কিন্তু হলুদের আগে কি শব্দ বসানো হবে?

মিলু।।তাইতো! অ্যাতোও আপনার মাথায় আসে?

[*হঠাৎ সমীর এলোমেলো চুলে ঘরে ঢুকল। ধুতি পাঞ্জাবী পরে আছে। হাতে রজনীগন্ধা।*]

সমীর।। (*প্রায় কান্নার মতো গলা*) মিলু সর্বনাশ হয়েছে।

মিলু।। কি হল?

সমীর।। আমাদের বুলটেরিয়ারটা কর্পোরেশনের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। আর এই ফুলগুলো এখন আমার কাছে বিষাক্ত লাগছে। তোমার জন্য এনেছিলাম।

[*ফুলগুলো টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল।*]

মিলু।।বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে, টমিকে?

[*লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদিকে কান রেখে শুনছে। চোখে ভয়।*]

সমীর।। কুকুরটা পাগলের মতো রাস্তায় কয়েকদিন ধরে ছুটেছিল, তাছাড়া নাকি কাদের কামড়ে দিয়েছিল।

মিলু।। কামড়েছিল?

ডাক্তার।। তা কামড়ানো তো ঠিক নয়।

সমীর।। বাঃ, কুকুর কামড়াবে না তো কি আমি কামড়াব? মোটে দু'চারজনকে কামড়েছিলো, তাও মরেনি কেউ। তাই বলে সাঁড়াশি দিয়ে গলা চেপে ধরে খাঁচায় ঢোকাবে।

[সমীরের কথা যত শুনছিল ততই লোকটি ভয়ে ওয়াড্রোবটার পিছনে লুকোচ্ছিল। ডাক্তার এবং মিলু লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছিল।]

সমীর।। সবাই বলছিল, টমিটা গাড়িতে উঠে কি ভীষণ কাঁদছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে করুণ চোখে বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। ও আমাকে খুঁজছিল, নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছিল।

[লোকটি আরো ভয়ে জড়োসড়ো হল। চোখ ঢাকল।]

সমীর।। সাঁড়াশির চাপে ওর গলায় ঠিক লালচে দাগ পড়েছে। এতক্ষণে নীল হয়ে গেছে। মিলু, তুমি একবার আমার সঙ্গে ওদের অফিসে চল না, দেরি করলে ওরা যদি গুলি করে মারে?

[ওয়াড্রোবের পিছন থেকে সমীরের কথা শেষ হতেই যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় লোকটি তীব্র চিৎকার করে উঠল। ওরা তাকাল। মিলু এগিয়ে এল। তারপরে ডাক্তার।]

মিলু।। কি হল আপনার? ওখানে ঢুকেছেন কেন?

[ওরা লোকটিকে বের করে আনতে ধীরে সে ধীরে সমীরের কাছে গেল।]

লোকটি।। কুকুর-ধরা গাড়ি চলে গেছে?

সমীর।। কেন? আপনার কি তাতে?

লোকটি।। দে আর চেজিং মি। ওরা কয়েকদিন ধরে সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সমীর।। থামুন তো মশাই! দুনিয়াশুদ্ধ লোক আপনাকে খুঁজছে, তাড়া করে ফিরছে! এখন আপনার ওসব পাগলামো শুনবার ধৈর্য নেই আমার।

মিলু।। অত চেঁচিয়ে কথা বলনা। কোনো রোগীর সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না।

সমীর।। রোগী তোমাদের, আমার নয়।

লোকটি।। (*সমীরের কাছে গিয়ে*) বুকের মধ্যে কান পাতুন। এ ডগ ইজ বার্কিং দেয়ার। একটা কুকুর ভয়াবহভাবে ডাকছে—এ লোনলি টেরিব্‌ল্ হাংরি ডগ।

ডাক্তার।। (*একপাশে মিলুকে ডেকে নিয়ে*) লক্ষ্য করেছিস্ মিলু—লোকটি হাসি কান্না ভুলে গেলেও ওর ভয়ের বোধ আছে। কুকুর সম্পর্কে একটা মারাত্মক ভীতি রয়েছে। (*লোকটির কাছে গিয়ে*) কুকুরকে আপনার ভয়, তাই না?

লোকটি।। কুকুরকে ভয় নেই, কুকুর-ধরা লোকগুলোকে। ওরা আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

ডাক্তার।। আপনি ভয় পান, এটা একটা শুভ লক্ষণ। চিকিৎসার সুবিধে হবে।

লোকটি।। বেশ ভয় আমার। নানারকম ভয়। ভয় ছাড়া তো মানুষ একা হতে পারে না, তাই ভয় আমার দরকার। এমনকি চিকিৎসাতেও আমার ভীতি। এখানে আসার আগে

একজন ডাক্তারের স্বপ্ন দেখে বিকট ভয় পেয়েছিলাম। একটা বিরাট লম্বা গলির অন্ধকার পথ ধরে একজন ডাক্তার আমার দিকে এগুচ্ছিল। অদ্ভুত দেখতে, হাফ প্যান্ট, জামা নেই, একটা চোখ বেমালুম নেই। গলায় স্টেথস্কোপ্ ঝোলানো। দুহাতে সাদা গ্লাভ্স্। কাছে আসতেই দেখলাম গ্লাভ্স্ নয়, দুহাতে তীব্র সাদা শ্বেতী—লিওকোডারমা—আমি ভয়ে ঘুম ছেড়ে উঠেছিলাম।

ডাক্তার।। বাঃ, তাহলে ভয় আপনার রয়েছে। আশার কথা। এবার হাসি এবং কান্না আপনার মধ্যে আনবার চেষ্টা করা যাক। আচ্ছা লাস্ট আপনি কবে, কখন হেসেছেন?

সমীর।। মিলু, প্লিজ আমার সঙ্গে একবার এসোনা! টমিটার জন্য আমি সুস্থ থাকতে পারছি না। আমি ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ডাক্তার।। থামো সমীর। মিলু কোথাও যাবেনা এখন। বোস তুমি। আমরা সবাই মিলে তোমার কুকুরের কাছে যাব'খন।

মিলু।। কিচ্ছু হবেনা তোমার টমির। একটুকাল সুস্থ হয়ে বসোনা। জ্যাঠামণি রেগে যাচ্ছে দেখছ না।

সমীর।। টমিকে নিয়ে কবিতাটা একবারটি পড়ব? বাসে আসতে আসতে লিখেছি।

ডাক্তার।। (*বিরক্ত*) পড়। তাহলে তুমি থামবে তো?

[*সমীর মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়।*]

সমীর।। (*কাগজখানা হাতে নিয়ে, মুখে ভাবাবেগ এনে*) পড়ি তাহলে?

মিলু।। পড়।

সমীর।। (*পড়ছে*) টমি টমি টমি

টমি টমি টমি

টমি টমি টমি

টমি টমি টমি

ডাক্তাব।। কই আরম্ভ কর।

সমীর।। আরম্ভ তো অনেকক্ষণ করেছি!

ডাক্তার।। করেছ? এবার থামো। তোমাকে না থামালে এরকম কোটি কোটি ছত্র তুমি পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত পড়ে যাবে। (*লোকটাকে*) হ্যাঁ, আপনি লাস্ট কবে হেসেছিলেন?

লোকটি।। সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা কেমন গুলিয়ে গেছে। তবে গতকাল কিংবা গতবছর একদিন খুব হেসেছিলাম।

ডাক্তার।। কি কারণে?

লোকটি।। বাক্সে হঠাৎ একখানা পুরনো চিঠি আবিষ্কার করে।

ডাক্তার।। কার?

লোকটি।। একটি মেয়ের।

মিলু।। চিঠির বক্তব্য নিশ্চয়ই হাসির ছিল না?

লোকটি।। না, বেশ গম্ভীর।

মিলু।। তবু আপনি হেসেছিলেন?

লোকটি।। প্রচণ্ড।

মিলু।। অদ্ভুত লোক তো আপনি।

ডাক্তার।। আচ্ছা লাস্ট কবে কেঁদেছিলেন?

লোকটি।। ঠিক কাঁদিনি, কান্নার মতো লাগছিল।

ডাক্তার।। কি কারণে?

লোকটি।। সেই চিঠিটাই দ্বিতীয়বার পড়ে।

সমীর।। তার মানে আপনি একই কারণে হাসেন এবং কাঁদেন। বাড়ির কোন আত্মীয় মারা গেলে আপনি না কেঁদে ইচ্ছে হলে হাসতেও পারেন।

লোকটি।। তাতে কি ভুল হবে? হাসি আর কান্নার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। নির্জন দুপুর আর গভীর রাত্রির অনুভূতি এক-একসময়ে একই রকম লাগে না? সব ব্যাপারেই আপনি হাসতে বা কাঁদতে পারেন। ধরুন (*মিলুকে দেখিয়ে*) ওঁর সঙ্গে আপনার গভীর ভালবাসা রয়েছে—

সমীর।। (*বাধা দিয়ে*) ব্যক্তিগতভাবে আপনার কিছু বলা ঠিক নয়।

লোকটি।। হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবেই এই মেয়েটির সঙ্গে আপনার গভীর ভালবাসা। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমি হাসতেও পারি, কাঁদতেও পারি। যেটা প্রথমে আসে। সংস্কার থেকে এড়িয়ে যাই। অভিজ্ঞতা থেকে হাসি, সহানুভূতি থেকে কাঁদতে পারি। কিংবা যে কোন একটা কিছু করলেই হয়—হাসি বা কান্না। (*হঠাৎ আপন মনে*) তবে ভাবনা হয় এই হাসির শব্দটা কিংবা চোখের জল শরীরের মধ্যে কোথায় থাকে। বাজির মধ্যে যেরকম শব্দ থাকে, কিংবা ডাবের মধ্যে যেরকম জল, সেরকমভাবে কি?

মিলু।। ভালবাসা সম্পর্কে আপনি কিন্তু বেশ পেসিমিস্টিক। কাউকে গভীর করে ভালবাসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি।। চাইলেই কি ভালবাসা যায়? দৈব ব্যাপার। অথচ মজা কি জানেন, এ বস্তুটি সকলেরই নিতান্ত দরকার। চাল ডালের মতো দোকানে থাকলে ভাল হতো। কিংবা জলের কলের মতো ঘোরালেই বালতি ভর্তি করে নিতে পারলে সুবিধে হতো। তাছাড়া ভালবাসা থেকেই লোকসানের পরিণতি পৃথিবীতে সব থেকে বেশি। যখন যায় সব নিয়ে যায় —কিছু লাভ অন্তত থাকা দরকার।

মিলু।। অত হিসেব করে কি কিছু হয়?

লোকটি।। কেন হবে না। ধরুণ যে প্রথম ভালবাসতে যাবে তাকে অপর পক্ষের প্রয়োজন মতো একটা এনট্রি-ফি দেবার নিয়ম মেনে চলতে হবে। ধরুণ আমার মতো লো-ভাইটালিটির রুগণ লোককে যদি কেউ ভালবাসতে চায় এনট্রি ফি হিসেবে আমাকে তার মালটিভিটামিন ফরটি তিনটে বড় ফাইল, বিজি ফস তিন ফাইল, এক কোর্স ক্যালসিয়াম ইনজেকশন ; বছরে গোটা কয়েক পাঞ্জাবী, কয়েকটা ধুতি, খানকতক বই —এসব দেয়া উচিত। কারুর হয়তো অন্যরকম দরকার। প্রয়োজন অনুসারে প্রবেশমূল্য আর কি। বাড়াবাড়িও হতে পারে, রেস্টুরেণ্টে খাওয়ানো বা সিনেমা দেখানোও হতে পারে। এতে সুবিধে এই, প্রেম চলে গেলেও এই সুবিধেগুলো থেকে যায়—ভালবাসা থেকে কিছু বাস্তব লাভ, মেটেরিয়াল গেইন আসে। তাছাড়া এরকম হলে প্রেম ব্যাপারটা অতো নিরাকার অ্যাবষ্ট্রাকসনের উপরেও থাকে না। দায়িত্ব আসবে, একটা স্পষ্ট দেনা পাওনার ব্যাপার এসে যাবে। কেবল শূন্য নিয়ে বিরহের ডুগডুগি বাজানোর করুণ বাজনাটাই

শুনতে হবে না।

সমীর।। কিন্তু কোনও ব্যাপারেই আমার মন নেই। মিলু টমিকে নিয়ে কবিতাটার দ্বিতীয় স্তবকটা শুনবে?

মিলু।। তুমি থামো তো!

ডাক্তার।। একটা লাভের ব্যাপার সব কিছুতেই অবশ্য থাকলে ভাল। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। বিরাট পণ্ডিত ছিল। দু'বছর সে পড়ছে না একদম, ভাল ভাল সন্দেশ, কলা, দুধ এসব খাচ্ছে। তার ধারণা পড়াশুনো করে তার যা কিছু হয়েছে তা কমনসেন্স থেকেই হতে পারতো। তাছাড়া দুধ সন্দেশের ফলে মোলায়েম চেহারাটা চোখের সামনে ভাসে।

মিলু।। (*লোকটিকে*) ভালবাসা ব্যাপারটাকে অত হাল্কা করে ভাববেন না। যতই এনট্রি-ফি নিন, বিচ্ছেদের কষ্ট ঢাকে না।

লোকটি।। কোন কষ্টই ঢাকা যায় না। ঢাকার চেষ্টা করতে হয়।

মিলু।। আপনি কিভাবে চেষ্টা করেন?

লোকটি।। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজি।

মিলু।। সারাজীবন তো দাঁত মাজা যাবে না।

লোকটি।। তাছাড়া দাঁতও পড়ে যায়।

মিলু।। তাহলে উপায়?

সমীর।। জ্যাঠামণি, টমিকে নিয়ে কবিতার লাস্ট স্ট্যাঞ্জাটা পড়বো?

ডাক্তার।। (*অত্যন্ত বিরক্ত*) পড়।

সমীর।। (*কাগজ খুলে, আবেগ এনে*) টমি টমি টমি, টমি টমি টমি,...

ডাক্তার।। অসহ্য, আবার গোড়া থেকে ধরলে?

সমীর।। না তো, এটা লাস্ট স্ট্যাঞ্জা। কবিতার করুণ শেষটুকু।

ডাক্তার।। আমারও ধৈর্যের শেষ, তুমি থামো।

সমীর।। মিলু, টমিকে কিছুতে ভুলতে পারছি না!

মিলু।। অত উতলা হচ্ছ কেন? সবতাতে তোমার বাড়াবাড়ি।

লোকটি।। দেখুন, ফের যদি আপনি কুকুরের কথা তোলেন আপনাকে কামড়ে দিতে পারি।

ডাক্তার।। সমীর, পেসেন্টের কুকুরে অবসেসন। ওকে তুমি ঘাঁটিও না। (*লোকটির দিকে তাকিয়ে*) যদি কিছু মনে না করেন আপনি একটু হাসুন তো।

লোকটি।। ঠিক মনে পড়ছেনা, বহুকাল হাসিনি! হাসিটা যেন কি রকম—

মিলু।। চেষ্টা করুন, ভাবুন।

[*লোকটি ভাবতে থাকল। হঠাৎ কি মনে পড়ল।*]

লোকটি।। হাসব?

ডাক্তার।। হ্যাঁ।

লোকটি।। আচ্ছা, হাসিটা খুব দুঃখের হবে তো?

ডাক্তার।। যেমন ভাবেই হোক হাসুন, বেশ জোরে।

[*লোকটি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।*]

ডাক্তার॥ কই হল না তো, আপনি তো কাঁদলেন।

লোকটি॥ কাঁদলাম! মানে হাসির উল্টো করেছি। এবার যদি কান্নার উল্টো করি। তাহলেই হাসি হবে, কি বলেন?

ডাক্তার॥ হ্যাঁ, তাই করুন।

লোকটি॥ (*কান্নাটাকে নিয়েই নানারকম চেষ্টা করতে লাগল। তারপর বিরক্ত হয়ে*) ধ্যাৎ, ভুলে গেলাম যে ছাই! (*সমীরকে*) প্লিজ একবার হাসুন না, দেখলে ঠিক মনে পড়বে।

সমীর॥ হঠাৎ বিনা কারণে হাসব কি করে?

ডাক্তার॥ হাস সমীর। চেষ্টা কর। হাস।

[*সমীর বিরক্ত ভাবটা সরিয়ে হাসবার চেষ্টা করতেই ওর মুখের দিকে তাকিয়েই মিলু বেশ জোরে হেসে উঠল।*]

ডাক্তার॥ (*লোকটিকে*) মার্ক করুন, দেখুন, ভাল করে দেখুন, হাসি কেমন, কি করে হাসতে হয়।

[*লোকটি মনোযোগ দিয়ে দেখতেই মিলু থেমে গেল।*]

ডাক্তার॥ থামলে কেন মিলু। তোমরা সব এমন। (*লোকটিকে*) আচ্ছা এই দেখুন আমি হাসছি। লক্ষ্য করবেন, আপনি লক্ষ্য করুন, (*বিচিত্র ভঙ্গিতে, নানারকম পর্দায় ডাক্তার লাহিড়ী হেসে চললেন*) হোঃ হোঃ হোঃ।

লোকটি॥ থামুন, ধরতে পেরেছি।

[*ডাক্তার থামলেন। রুমালে চোখমুখ মুছতে লাগলেন।*]

লোকটি॥ আচ্ছা, তাহলে গোড়ায় একটু হাঁ করে, আপনার মতো চোখ বুজে কেঁপে কেঁপে হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ এরকম শব্দ করে যাব, তাহলেই হাসি হবে?

[*ডাক্তার ঘাড় নাড়তে, ওরকমভাবে হাসতে লাগল।*]

ডাক্তার॥ লাইফ, লাইফ আনুন হাসিতে, প্রাণ আসুক, প্রাণ!

[*লোকটি বেপরোয়া ভাবে হেসে চলল।*]

ডাক্তার॥ (*চেঁচিয়ে*) লাইফ, লাইফ আনবার চেষ্টা করুন।

[*লোকটি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।*]

থামুন; কাঁদলেন কেন আবার?

লোকটি॥ লাইফ আনতে গিয়ে কিরকম হল! সত্যি কান্না হয়েছে?

মিলু॥ হ্যাঁ, কান্নার মতোই হলো। তাই না সমীর?

সমীর॥ পরিষ্কার কান্না। বিদীর্ণ কান্না!

লোকটি॥ তাহলে হঠাৎ বোধহয় উল্টে গিয়েছে।

ডাক্তার॥ কাঁদতে বললেও আপনার উল্টে হাসি হয়ে যেতে পারে।

লোকটি॥ কি করে বলব!

ডাক্তার॥ (*বিরক্ত*) ইম্‌পসিবল! এভাবে হবে না। ইলেকট্রিক চার্জ দিতে হবে।

লোকটি॥ (*হঠাৎ ভীতভাবে সরে গিয়ে*) অসম্ভব! ও আমি সহ্য করতে পারব না। মরে যাব তাহলে (*উঠল*), তার থেকে আমি চলে যাব একেবারে।

ডাক্তার॥ ধর ওকে।

[*সমীর ধরল।*]

লোকটি।। ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন। সমস্ত শরীরে ভীষণ গরম বিদ্যুৎ বয়ে গেলে আমি মরে যাব। বিদ্যুতের করাত দিয়ে আমাকে কাটবেন না, প্লিজ। *(সমীরকে)* অন্তত আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। কুকুর-ধরা সেই লোকটির মতো আপনার হাত, চোখ। ছাড়ুন, ছাড়ুন আপনি। আমি কোথাও পালাব না, আপনি ছাড়ুন।

ডাক্তার।। ছেড়ে দাও সমীর।

[*সমীর ছেড়ে দিল। হঠাৎ ফোনটা বাজল। ডাক্তার লাহিড়ী ধরলেন।*]

ডাক্তার।। হ্যালো, হ্যাঁ, সমীর রয়েছে এখানে। ধরুন আপনি *(ফোনটা নামিয়ে, হাতে রেখে)* সমীর তোমার ফোন, বাড়ি থেকে।

সমীর।। *(ফোন)* কি বললে, টমিকে ছাড়বে না। মেরে ফেলবে, গুলি করবে টমিকে! *(ফোনটা রেখে দিয়ে, টেবিলে মাথা রেখে)* ওঃ গড্ মাই লিটল...টমি!

মিলু।। *(কাছে গিয়ে)* সমীর, সমীর!

ডাক্তার।। সমীর তাকাও এদিকে, তাকাও।

[*লোকটি ধীরে ধীরে ওয়াড্রোবের পিছনে গিয়ে লুকোল। ডাক্তার লক্ষ্য করেন। মিলু সমীরের কাছে এগিয়ে এল।*]

লোকটি।। *(চাপা অথচ তীব্র স্বরে)* দে আর চেজিং মি। এ লোন্‌লি টেরিবল্ হাংরি ডগ ইজ বার্কিং ইন্ মি। কুকুরটা ভিতরে বড্ড জোরে ডাকছে। আমি থাকব কেমন করে? ওরা আমাকে খুঁজছে, সাঁড়াশি হাতে করে এগুচ্ছে। আমি কেমন করে পালাব, বাঁচব কেমন করে?

মিলু।। সমীর, ও রকম কোরোনা, সমীর।

[*হঠাৎ লোকটি শব্দ করে হেসে উঠল তারপর হাসিটা কান্না হল। মিলু সমীর দুজনেই চমকে তাকাল।*]

ডাক্তার।। ইলেকট্রিক চার্জ। ইলেকট্রিক চার্জ ছাড়া সারবে না, কিছুতে না।

মঞ্চ অন্ধকার হয়।

তৃতীয় অঙ্ক

[*সেই ঘর। ক্রুশ কাঠিতে লেস বুনছিল মিলু। ব্যস্তভাবে সমীর ঘরে ঢুকল।*]

মিলু।। কি হল?

সমীর।। অসম্ভব, মিলু! তোমরা ঐ লোকটিকে কি তাড়াবে, না ওর হাতে প্রাণ দেবে?

মিলু।। কেন, ও কি করল তোমার?

সমীর।। হাত ধরে নিয়ে পথে ছেড়ে দিলেই হতো ; তা না ইলেকট্রিক চার্জ, হ্যানো ত্যানো। এখন সামলাও! চার্জ খেয়ে এখন তো তিনি কুকুর সেজে আছেন। হাঁটছেন, চলছেন আর মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে উঠছেন। কি দরকার ছিল ইলেকট্রিক চার্জের। একটু আগে ঘ্যাঁক করে আমার হাতটা টেনে ধরেছিল, কোনও মতে ছাড়ান পেয়েছিলাম

ভাগ্যিস, কামড়ে দিতে পারতো!

মিলু।। *(মুখটা বিষণ্ণ)* লোকটির জন্য তোমার একটুও মায়া হয় না, সমীর?

সমীর।। রাখ তোমার মায়া! সাধারণ পাগল হলে হত। আমার উপর লোকটার একটা ভয়ানক রাগ আছে, ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যেচে যে কেন অশান্তি ডেকে আন? ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যেত।

মিলু।। কিন্তু ওর ঘরই বা কোথায়? কিছুই তো বলছে না।

সমীর।। কাগজে খবর দাও, পুলিশে জানাও। নাহলে আমিই জানিয়ে দেব। ও যখন কুকুর আর খ্যাপাকুকুর, তখন কুকুর ধরা অফিসে জানানো উচিত নয় আমার?

মিলু।। জ্যাঠামণি বলেছে, ওকে সারিয়ে তুলবে।

সমীর।। সারাবে! গলায় সূর্য আটকানো, এখন তো আবার কুকুর হয়েছে। এরপর হয়ত বাঘ ভালুক হবে, আবার যমও হতে পারে। এরকম উন্মাদ সারে না মিলু। তাছাড়া কিছু মনে করনা, তোমার জ্যাঠামণিটিও বাতিকের শিরোমণি। তোমার মুখ চেয়ে সব সইতে হচ্ছে।

মিলু।। যাক, তবু আমার গর্ব করার মতো কিছু থাকল।

সমীর।। সব কিছু উড়িয়ে দিও না মিলু। এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। একবার অন্তত বাইরে চল, ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আসি। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে *(হাসল)* আমার গলাতেও সূর্য আটকেছে।

মিলু।। কারুর অসুখ নিয়ে ঠাট্টা কর না।

সমীর।। তোমার মায়া লোকটির উপর যে হারে বাড়ছে তাতে আমার হয়তো—

মিলু।। ন্যাকামি কর না।

সমীর।। কিন্তু কি করবে ওকে দিয়ে?

মিলু।। সারাটা জীবন কাটাব, হল?

[*হাতের সেলাইটা গুটিয়ে রাখল।*]

সমীর।। তাই কাটাও, মিলবে দুজনে , কয়েকটা কবিতা নিয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাব।

মিলু।। যাওনা, কে আটকে রাখছে তোমাকে?

সমীর।। *(কাছে গিয়ে)* তুমি তো জান, অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে না পেলে আমার অসহ্য লাগে। দিনরাত তো এই রোগী নিয়েই আছ। মনে হচ্ছে আমি রোগী হলে ভাল ছিল। আসলে আমি তোমাকে অনেকক্ষণ চাই! একা। নির্জন রাস্তার শেষ ল্যাম্পপোস্টটার উপর যেমন একটা পাখি এসে বসে, সেরকম কোন শালিখ বা কাকের মতো তোমার কাছে একা থাকতে চাই।

মিলু।। *(অল্প হাসল)* এই তো একা। তুমি ছাড়া কেউ নেই।

[*সমীব ওর খুব কাছে বসল। হাত ধরল।*]

সমীর।। মিলু! টিকটিকি দেওয়ালে সাঁতার দিয়ে যেমন সবুজ পোকা খায়, তোমাকে সেরকম খেতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে এখুনি একটা কবিতা লিখি। এক শিট কাগজ দিতে পারো মিলু। প্রথম ছত্রটি মনে এসেছে, মিলু পেপার, বি কুইক।

মিলু।। আরম্ভ হল! দিন দিন এতো ছেলেমানুষ হচ্ছ।

[*দরজার কাছে মানুষের গলায় ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল। সমীর বিরক্ত হল, মিলু উঠে দরজার কাছে গেল।*]

মিলু ।। (*সমীরের দিকে সকৌতুক তাকিয়ে*) কি হল? থাকলে একা? কবিতা লিখলে?

সমীর ।। অসহ্য, লোকটি যেন আমাকে তাড়া করে ফিরছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও তো মিলু...

মিলু ।। দিনদিন সব কাণ্ডজ্ঞান হারাচ্ছ দেখছি। হয়ত জ্যাঠামণি সঙ্গে রয়েছেন।

সমীর ।। বেশ ওদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এস। এবার নাটক জমবে। আমি আর পারছি না। পালাই। (*আপনমনে*) ল্যাম্পপোস্টটাব উপর থেকে সেই শালিখ বা কাকটা উড়ে যাচ্ছে, অনেক দূর!

[*মিলু দরজা খুলল। লোকটি ঢুকল। নির্বিকার চোখে চারদিক দেখল। চেয়ারে বসল। একবার ঘেউ ঘেউ করে থেমে গেল। খুব আস্তে আস্তে পিছন দিক থেকে সমীর পা টিপে টিপে পালাল, লোকটি ঘাড় কাত করে আড় চোখে চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করল। মিলু ওর কাছে বসল। লোকটি আবার কুকুরের মতো ডাকল। মিলুর চোখে অস্বস্তি।*]

লোকটি ।। লাস্টলি দি ডগ হ্যাজ কাম আউট।

মিলু ।। কি বলছেন আপনি?

লোকটি ।। লাস্টলি দি ডগ হ্যাজ কাম আউট।

মিলু ।। আপনি কোথায় কুকুর দেখছেন?

লোকটি ।। কেন, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

মিলু ।। আপনি তো জলজ্যান্ত মানুষ।

লোকটি ।। কেন কথা বলছি বলে? (*মিলুর দিকে তাকিয়ে*) আমার দিকে ভাল করে তাকান! দেখছেন? অভাবে, লোভে, অপমানে, তাচ্ছিল্যে, অসম্মানে রাস্তার কুকুরের মতো চারপায়ে হাঁটছি। গায়ে ঘৃণ্য লোম, হাত পায়ে ছুঁচলো নখ, দাঁতে ঈর্ষার বিষ! চারিদিকটা কামড়ে দিতে চাই। কতগুলো লোক সাঁড়াশি দিয়ে আমাকে ধরবার জন্য ঘুরছে।

মিলু ।। কেউ ঘুরছে না।

লোকটি ।। ঘুরছে। ঐ যে লোকটি পা টিপে টিপে এক্ষুনি চলে গেল ও কুকুর ধরা অফিসে খবর দিতে গেছে। আমাকে প্লিজ্ লুকিয়ে রাখুন, প্লিজ, আই রিকোয়েস্ট ইউ, প্লিজ্।

মিলু ।। সমীর নিচে গেল। ও কোথাও খবর দেবে না, সেরকম স্বভাব নয় ওর।

লোকটি ।। না না, ঠিক খবর দেবে। ওর চোখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম।...লোকগুলো একটা বিরাট সাঁড়াশি নিয়ে আসবে; তারপর গলার এইখানটায়, যেখানে সূর্যটা আটকে আছে, সেখানে ভীষণ জোরে চাপ দিয়ে ধরবে। এতো জোরে, আমি কাউকে ডাকতে পর্যন্ত পারবনা, আপনাকেও না।

মিলু ।। আমাকে ডাকলে কি ওরা আপনাকে ছেড়ে দেবে? আমার উপর তো আপনার

খুব বিশ্বাস?

লোকটি।। বিশ্বাস? হয়ত বিশ্বাস। কিংবা হয়ত আপনাকে আমি খুব আপন ভাবি।

মিলু।। এতো অল্প সময়ে আপন ভাবলেন? আপনার কপালের দুঃখ কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

লোকটি।। কে বলেছে অল্প সময়? কতো বছর। কতো কাল ধরে আমি ভালবাসা নির্মাণ করে গেছি। কেউ কাছে না থাকলে, নিবেদন করার মতো কারুর দেখা না পেলেও কি ভালবাসা ভিতরে ভিতরে জমতে থাকে না। হঠাৎ কাউকে কাছে পেলে মুহূর্তের মধ্যে সেই বহুকালের সঞ্চয় দিয়ে দেখা যায়, দু'মিনিটে অনুভূতির সমস্ত সামারিটা তাকে জানিয়ে দেওয়া যায়।

মিলু।। যাকে বলবেন, দু'মিনিটে সে যদি না বোঝে?

লোকটি।। মূর্খদের নিয়েই তো বিবাদ।

মিলু।। এ-জাতীয় মূর্খের সংখ্যাই কিন্তু বেশি। তাছাড়া ইচ্ছে করে মূর্খ হবারও প্রয়োজন হয়। আর সব জিনিস তো দু'মিনিটে শেষ হলেই ভাল লাগে না। ডালিম ফলের কুঁড়িটা বৃষ্টির জলে ভিজে, রোদ্দুরের তাপ লেগে, প্রত্যেকটা কণায় কত আস্তে আস্তে রসে ভরে যায়, বলুন তো? তাড়াহুড়োটাই সব সময় ভাল নয়।

লোকটি।। কিন্তু আমার ভিতরে এতোদিনের ধৈর্যও-তো মিথ্যে নয়। 'ডালিম গাছ কতকাল ধরে নির্জনে মনের ভিতর দুলছে, ডালিম নেই।'

মিলু।। *(হাসল)* দোকানে আছে।

লোকটি।। আপনার মধ্যে আছে।

মিলু।। *(কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে)* রক্ষে করুন, বেশ আছি আমি। আমার মধ্যে আমি ছাড়া কিছু নেই। দাঁড়ান, জ্যাঠামণিকে ডাকি।

[*বাইরে গেল মিলু। চেয়ারে ঘাড় নিচু করে চুপ করে থাকল লোকটি। তারপর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠেই চমকে উঠল, দাঁড়াল।*]

লোকটি।। কুকুর ডাকল কোথায়? *(ভয়ে ভয়ে ঘরটা খুঁজল)* একটা কুকুর ডাকতে শুনলাম!

[*আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের চোখ মুখ দেখতে দেখতে কুকুরের মত ডেকে উঠল। বুঝতে পেরে হাসল।*]

লোকটি।। অদ্ভুত, নিজেকেই খুঁজছিলাম। আত্মানুসন্ধান নয়তো! লাস্টলি এ ডগ্ রিয়ালাইজড়্—আত্মানং বিদ্ধি! দেন আই অ্যাম এ গ্রেট মেটাফিজিক্যাল ডগ্। আই অ্যাম টু প্রিচ ডগস্ ফিলসফি। কুকুরের দর্শন প্রচার করতে হবে, লোভের দর্শন, উপেক্ষার দর্শন, ক্ষোভের দর্শন।

(ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসল। ডাক্তার লাহিড়ী এবং মিলু ঢুকল)

ডাক্তার।। কেমন আছেন?

লোকটি।। বেশ ভাল। ডগস আর বেস্ট ক্রিয়েসনস আনডার দি সান। তবে ভীষণ, ভীষণ লোভ আমার।

ডাক্তার ।। কিসের লোভ?

লোকটি ।। সব কিছুতে লোভ। আমি স্পষ্ট করে পেতে চাই, দু'হাতের মধ্যে দেখতে চাই। চোখের কাছে খাদ্যের স্তুপ চাই, নাহলে রাত্রে ঘুম হয়না, মনে হয় রক্তে ছারপোকা ঢুকেছে, চিন্তার মধ্যে বিরক্তিকর মাছি উড়ছে, জ্বালাচ্ছে। কেবল চাঁদের আলো নয়, মাংসের বলের মতো চাঁদটা আকাশ থেকে ছিঁড়ে চার হাত-পায়ের মধ্যে ভীষণভাবে ধরে দাঁত নখে ছিঁড়ে খেতে চাই। আমার দুই কষ দিয়ে জ্যোৎস্নার রস গড়িয়ে পড়বে। আপনার ভাবতে ভালো লাগছে না, একটা কুকুর বলের মত চাঁদটা নিয়ে খেলছে, তারপর চুপচাপ কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে।

মিলু ।। নিজেকে অকারণ কুকুর ভাবছেন কেন?

লোকটি ।। প্রথমে ভাবিনি, গোটা পৃথিবী আমাকে ভাবত, লক্ষ্য করেছি।

ডাক্তার ।। আপনি কোয়াইট ও. কে., পুরো মানুষ। কেবল আপনার গলায় সূর্য আটকে আছে মনে আছে?

লোকটি ।। ভীষণ মনে আছে। খানিক আগেও বড্ডো কেশেছি। অজস্র পিং-পং বলে ঘরটা ভরে গিয়েছিল! আমি দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত পাইনি। কোনক্রমে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমার কাশতে ভয় করে—মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী পিং-পং বলে ভরে যাবে। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত হারাব। কী নিদারুণ অবস্থা হবে তাহলে বলুন তো?

মিলু ।। ভয় নেই আপনার, আপনি ঠিক সেরে উঠবেন। তখন এসব অস্বস্তি কিচ্ছু থাকবে না।

ডাক্তার ।। আচ্ছা, অতবড় সূর্যটা গলায় নিয়ে চলতে আপনার কষ্ট হয় না?

লোকটি ।। একদম না। সূর্যের চেয়েও ভারি ভালবাসা নিয়ে মানুষ চলে। শুধু চলছে? অতবড় একটা ভার বুকে ঝুলিয়ে ছুটছে, খেলছে, স্নান করছে, সাঁতার কাটছে, লাফাচ্ছে, —কোন অসুবিধা হয় না। তবে টেনে তোলা শক্ত। প্রচণ্ড ভার।

ডাক্তার ।। ভয় নেই আমি টেনে তুলবই। অস্ট্রেলিয়ার সেই পাখি না পেয়ে আমি বিরাট একটা ক্রেনের অর্ডার দিয়েছি। আপনার গলা থেকে ক্রেনে করে যখন বিরাট সূর্যটা টেনে তোলা হবে, কী ভীষণ দৃশ্য হবে, বলুন তো!

লোকটা ।। ওঃ, ভাবতে দারুণ লাগছে। (*মিলুকে*) তাই না?

মিলু ।। কিন্তু সূর্যটা টেনে তুলে রাখবেন কোথায়?

ডাক্তার ।। কেন কুড়ুল দিয়ে কেটে কাঠের মতো স্তুপ করে রাখব।

লোকটা ।। (*উত্তেজিত হয়ে*) অসম্ভব, কাটা যায় না। ওটা একটা টোটালিটি, আপনি একটা চোখ কেটে রাখতে পারেন?

ডাক্তার ।। তাহলে জলে ভাসিয়ে দেব।

লোকটি ।। কিন্তু জলের থেকে ভারি হলেই তো ডুবে যাবে।

মিলু ।। যাকনা, রাজ্যের মাছগুলো লক্ষ বছর ধরে খুঁটে খুঁটে খাবে, বেশ মজার হবে!

লোকটি ।। কিন্তু তুলবে কে? অত গরম ধরবে কে?

ডাক্তার ।। ক্রেনে করেই জলে ফেলে দেওয়া যাবে।

লোকটি ।। জলে ভিজে গিয়ে ঝকঝকে সাদা সূর্যটা যদি নিস্তেজ ভেজা কয়লার মতো হয়ে যায়, তাহলে ভয়ানক আঘাত লাগবে। চোখের সামনে অত বড় একটা আলোর

সর্বনাশ ভাবা যায় না।

মিলু।। তাহলে একটা কাজ করুন—চাকার মতো গাড়িয়ে দিন। যেদিকে খুশি যাক।

লোকটা।। কিন্তু পৃথিবীর থেকেও বড় সূর্যটা তাহলে চলবার পথ পাবে কোথায়?

ডাক্তার।। তাহলে?

মিলু।। বিরাট সমস্যা হল তো?

লোকটি।। সমস্যা আর কোথায়? এরকম অবস্থায় আবার খেয়ে ফেলব। ব্যস, সব সমস্যা চুকে যাবে।

মিলু।। সে কি! আবার খেয়ে ফেলবেন?

ডাক্তার।। আবার সেই পুরনো চিকিৎসা!

লোকটি।। হ্যাঁ, আবার চিকিৎসা, আবার খেয়ে ফেলা, আবার চিকিৎসা।

ডাক্তার।। আচ্ছা, আগে বের করেই দেখা যাক না হয়ত সমস্যাই থাকবে না। শরীরের মধ্যে এতদিন ধরে আছে বলে সূর্যটা হয়ত চুপসে আছে।

লোকটি।। অসম্ভব নয়।

মিলু।। আচ্ছা, সূর্যটা বের করবার আগে আপনার বাবা-মাকে একটা খবর দিলে হয় না?

লোকটি।। কেন?

মিলু।। ওঁরাও দেখতেন।

লোকটি।। কোথায় আছে জানি না। তাছাড়া এতো আগে আমার জন্ম হয়েছে যে মনেও পড়ে না। সম্ভবত বাবা-মার আগেই আমার জন্ম হয়েছে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আমার জন্ম ব্যাপারটা বড় প্রাচীন। একটা সমুদ্রে সমস্ত দেবতারা হাবুডুবু খাচ্ছে, কোন থাকবার জায়গা পাচ্ছে না। তারপর সেই অনাথ দেবতারা আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীরে ঢুকতে লাগল।

ডাক্তার।। আপনার শরীরের মধ্যে?

লোকটি।। হ্যাঁ। অগ্নিদেবতা বাক হয়ে মুখে, বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায়, সমস্ত গাছপালা ত্বকের মধ্যে ঢুকে চুল আর রোমরাজি হল, দশদিক শব্দ হয়ে কানের মধ্যে ঢুকল, চন্দ্র মনে, অধঃবায়ু মৃত্যু নাভিপথে, রেতঃ জলরূপে শিশ্ন মধ্যে ঢুকল! আর সূর্য অক্ষিমণ্ডল থেকে সম্প্রতি কণ্ঠনালীতে এসে আবদ্ধ হয়ে আছে।

মিলু।। আপনার এরকম অবস্থা তো সত্যি ভাববার। আচ্ছা আপনার বন্ধুবান্ধবরা কোথায়?

লোকটি।। বন্ধুবান্ধব? চিঠি পেয়েছি, ওরা উট ধরতে গেছে।

ডাক্তার।। উট কেন?

লোকটি।। পায়ের তলায় বালি বড্ড গরম বলে।

মিলু।। আপনি যাননি কেন?

লোকটি।। গলায় যে হঠাৎ সূর্যটা আটকে গেল।

ডাক্তার।। আপনার আত্মীয়স্বজন?

লোকটি।। অষ্টম পানিপথের যুদ্ধে মারা গেছে।

মিলু।। অষ্টম পানিপথ?

লোকটি॥ হ্যাঁ, সপ্তম পানিপথও হতে পারে; কিংবা পঞ্চম বা নবম।

ডাক্তার॥ আপনি সে যুদ্ধে ছিলেন?

লোকটি॥ হ্যাঁ।

মিলু॥ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?

লোকটি॥ গোলাপের।

ডাক্তার॥ জিতলেন?

লোকটি॥ কেউ জেতেনা, কেবল যুদ্ধ করে। যুদ্ধই নিয়তি।

মিলু॥ আপনি এই যে একা রয়েছেন, সকলের জন্য মন কেমন করে?

লোকটি॥ কার জন্য?

মিলু॥ সকলের।

লোকটি॥ আপনাকে নিয়ে সকলে?

মিলু॥ উঃ, যা লোক আপনি, আপনার সঙ্গে কথা বলে উত্তর পাওয়া যায় না।

ডাক্তার॥ ঘরে বসে থাকতে খারাপ লাগছে না? চলুন বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

লোকটি॥ কিন্তু বেরুব কেমন করে?

মিলু॥ কেন?

লোকটি॥ সাঁড়াশি হাতে নিয়ে সেই কুকুর-ধরা লোকগুলো ঘুরছে। গলার কাছে যেখানে সূর্যটা আটকে আছে সেখানে চেপে ধরে খাঁচায় পুরে নেবে।

মিলু॥ আমাদের এখান থেকে কেউ আপনাকে ধরে নিতে আসবে না। জানবেই না আপনি এখানে আছেন।

লোকটি॥ কিন্তু সেই ভদ্রলোক আস্তে আস্তে এখান থেকে চলে গেলেন, নিশ্চয়ই ওদের খবর দিতে গেছেন?

ডাক্তার॥ কে সমীর? ভিতরে গিয়ে সমীরকে নিয়ে আসছি। আপনার সব সন্দেহ কেটে যাবে।

[ডাক্তার চলে গেলেন।]

মিলু॥ এতো অকারণ ভয় পান আপনি!

লোকটি॥ অকারণ বলছেন, আমার অবস্থায় আপনার কি হতো বলুন তো?

মিলু॥ আপনার মতো অবস্থা আমার হবে না! অকারণ কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে বেড়াচ্ছেন, কে বলেছে আপনি কুকুর?

লোকটি॥ চুপ্! কে যেন আসছে।

মিলু॥ জ্যাঠামণি।

[ডাক্তার লাহিড়ী ঢুকলেন।]

মিলু॥ সমীর এলনা?

ডাক্তার॥ (*একটু চিন্তিত, গম্ভীর মুখ*) মিলু, সমীরকে কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

মিলু॥ (*অবাক*) কেন?

ডাক্তার॥ বনমালী বলল, ও বাইরে কুকুরের অফিসে ফোন করতে গেছে। অথচ বাড়িতেই ফোন ছিল।

লোকটি।। (উত্তেজিত) দেখলেন, ঠিক বলেছি, আমি চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, ভদ্রলোক আমাকে ধরিয়ে দিতে চান। এখন, এখন আমি কি করে বাঁচব?

ডাক্তার।। আপনার কোনও ভয় নেই ; আপনি আমার গেস্ট, কেউ আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।

লোকটি।। কিন্তু ওরা আমাকে খুঁজছে, অনেকদিন ধরে খুঁজছে। (*মিলুকে*) আপনি আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখুন। ডাক্তারবাবু, সামনের দরজাটা প্লিজ বন্ধ করে রাখতে বলুন না। বলবেন, লোকটা চলে গেছে।

মিলু।। সমীর হয়তো নিজের কুকুর সম্পর্কে কথা বলতে গেছে ফোনে।

ডাক্তার।। কিন্তু যাবার আগে বনমালীকে নাকি বলেছে, এ বাড়ির মানুষ কুকুরটিকেও সে টমির মতো খাঁচায় পুরে পাঠিয়ে ছাড়বে। সমীরের কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি। সমীর হঠাৎ কেমন দ্রুত পাল্টে গেছে। ওর কবিতা হয়তো শোনা উচিত ছিল।

মিলু।। শেষ পর্যন্ত সমীর!

লোকটি।। আমার শরীর কেমন অবশ লাগছে। কে যেন পায়ের তলা থেকে শরীরের সব রক্ত টেনে নিচ্ছে।

[*বনমালী ঢুকল।*]

বনমালী।। জ্যাঠাবাবু, কুকুর অফিস থেকে লোক এসেছে। ঘরটা দেখতে চায়। বলছে বাড়িতে নাকি পাগলা কুকুর আছে।

[*লোকটি ভয়ে মুখ ঢাকল।*]

ডাক্তার।। (*লোকটিকে*) ভয় নেই আপনার। বনমালী, তুই একটু দাঁড়া, আমাকে ভাবতে দে। (*একটু চিন্তা করলেন*) হয়েছে! আমরা সবাই একসঙ্গে গান করব। বনমালী এক্ষুণি ছুটে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়।

[*বনমালী চলে গেল।*]

মিলু।। গান কেন, জ্যাঠামণি?

ডাক্তার।। তিনজনে মিলে যদি গান করতে থাকি, কুকুর-ধরা অফিসের লোক এসে ঠকে যাবে। যে গান করে সে নিশ্চয়ই কুকুর নয়।

লোকটি।। কিন্তু আমি যে গান জানি না।

ডাক্তার।। আমি কি ছাই জানি? মিলুর সঙ্গে আমরা গলা মেলাব।

[*হারমোনিয়াম এল।*]

ডাক্তার।। হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীরটা ধর, কেমন?

মিলু।।(*লোকটিকে*) এটা জানেন!

লোকটি।। কেবল প্রথম লাইনটা মুখস্ত আছে।

ডাক্তার।। ঐ একটা লাইন কেবল গেয়ে যাব আমরা।

[*ওরা তিনজনে 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর হও উন্নত শির নাহি ভয়' এই ছত্রটি শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেয়ে চলল। হঠাৎ লোকটি ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ওরা থামল।*]

ডাক্তার।। অসম্ভব। কুকুরের মতো ডাকছেন কেন?

লোকটি।। ডাকতে চাইনি, হঠাৎ...

ডাক্তার।। নাঃ, এভাবে হবে না। (*ব্যস্তভাবে উঠে*) ঠিক আছে, চল বনমালী, মিলু তুই ওকে দেখিস। আমি এক্ষুণি আসছি।

[*ডাক্তার এবং বনমালী চলে গেল। লোকটি জানলার কাছে ছুটে গেল।*]

লোকটি।। আচ্ছা, যদি এখান থেকে লাফিয়ে পালাই।

[*ঝুঁকে পড়ল।*]

মিলু।। (*টেনে ধরে*) পাগল হলেন নাকি আপনি? মরতে চান?

লোকটি।। যদি পাইপ বেয়ে নামি?

মিলু।। কোথায় নামবেন? রাস্তায় ওদের লোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে না?

লোকটি।। (*হতাশ হয়ে*) আচ্ছা, দু'হাত মেলে ওড়া যায় না!

[*ব্যস্তভাবে ডাক্তার ঢুকলেন।*]

ডাক্তার। মিলু, মিলু, শিগগির ওকে ওয়াড্রোবের পিছনে লুকিয়ে রাখ। ওরা এঘরে একবার আসবে।

লোকটি।। কি বললেন, এখানে আসবে? ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! মরা আরশোলার মতো ফেলে দেবে, একরাশ শকুন উড়ে আসবে, এক পাল শকুন!

ডাক্তার।। (*পায়চারি করে*) আচ্ছা, আপনি নাচ জানেন? যাক্‌গে সময় নেই...(*দ্রুত চলে গেলেন ডাক্তার।*)

লোকটি।। ওরা আমাকে ধরে নেবেই। মিছিমিছি কষ্ট করছেন।

মিলু।। কোনও কথা নয়, এখন আপনি আসুন।

[*মিলু ওকে ওয়াড্রোবের পিছনে লুকিয়ে রাখল। হঠাৎ লোকটি কেশে উঠল।*]

মিলু।। চুপ, কাশবেন না। প্লিজ।

লোকটি।। কিন্তু কাশি পাচ্ছে। এক্ষুণি বল পড়তে শুরু করবে।

মিলু।। একটু কষ্ট করে কাশিটা চেপে রাখুন। ওরা বোধহয় আসছে। (*লোকটি দু'হাতে মুখ ঢেকে থাকল শক্ত করে। হঠাৎ হাতটা সরিয়ে ঘেউ ঘেউ করে একবার ডেকে উঠল।*)

মিলু।। কি করছেন! ওরা এসে পড়ল যে!

লোকটি।। কি করব, ভিতর থেকে ঠেলে আসছে। বুঝলেন, আপনি অনেক করলেন, কিন্তু...আই এ্যাম নাথিং বাট এ স্ট্রিট ডগ। আচ্ছা, (*হঠাৎ চিন্তা করে*) আপনি আমাকে বিয়ে করবেন? তাহলে ওরা আমাকে নেবে না। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে হয়ত ওরা নেবে না। আর যদি নাচতে পারতাম, ওরা আমাকে কুকুর ভাবতো না। আর নাচতে জানি না বলেই আপনি আমাকে বিয়ে করুন না! কিংবা বিয়ে করলে নাচতে পারব, হয়তো নাচতে না জানলে বিয়েই হয় না।

মিলু।। পাগলের মতো যা খুশি মনে হচ্ছে আপনার। শিগগির লুকোন। বিপদে পড়ে বিয়ের কোনো মূল্য নেই!

লোকটি।। কিন্তু আপনাকে তো আমার খুব ভালও লাগে।

মিলু।। ভাল তো আকাশটাকেও লাগে, অমনি বিয়ে করতে হবে।

(বাইরে ডাক্তার লাহিড়ীর এবং আরো দু-একটি পায়ের শব্দ বাইরে শোনা গেল।)

মিলু।। লুকোন, একটুও শব্দ করবেন না। বুঝলেন, একটুও না।

(মিলু চেয়ারে বসে ক্রুশের শেলাইটা হাতে নিল। ডাক্তার এবং প্যাণ্ট শার্ট-পরা দু'জন লোক ঢুকল। লোকটি আড়ষ্ট ও আতঙ্কগ্রস্ত হল।)

ডাক্তার।। আসুন, আসুন। মিলু, আর একখানা চেয়ার—

১ম কর্মচারী।। না, না, বসবার দরকার নেই। সার্চ করবার কোনো ব্যাপার নেই। ডাক্তার লাহিড়ীকে আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। মিয়ার ফর্মালিটি, পাশের ঘরটা দেখেই চলে যাব।

২য় কর্মচারী।। কিন্তু এঘরে ঢুকবার আগেই কুকুরের ডাক শুনেছিলাম দু'বার।

মিলু।। পাশের বাড়িতেই একটা স্প্যানিয়েল রয়েছে। ওটা খালি খালি ডাকে।

১ম।। ও।

[*হাসল মিলুর দিকে তাকিয়ে।*]

২য়।। কিন্তু শব্দটা এঘর থেকেই এল।

১ম।। থামুন তো, মিঃ বোস। চলুন পাশের ঘরটা দেখে পালাই।

[*মিলুকে আর একবার দেখল।*]

ডাক্তার।। আসুন—

[*মিলু বাদে ওরা পাশের ঘরে ঢুকল। মিলু লোকটির কাছে এসে দাঁড়াল। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ তাকতে বলল। হঠাৎ লোকটি আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল।*]

মিলু।। *(চাপা গলায়)* উঃ, জ্বালালে দেখছি! কি হবে এখন!

[*ওরা আবার এল।*]

১ম।। ডাকটা আবার শুনলাম।

মিলু।। সেই স্প্যানিয়েলটা। *(মুখে ভয়ের হাসি)* আপনার সন্দেহ কাটাতে ওটা এখানে আনবার বন্দোবস্ত করতে পারি।

১ম।। কোনো দরকার নেই। বোস, ডোণ্ট বি সো ডিউটিফুল। আপনি কি গোয়েন্দাগিরি করবেন, না ফিরবেন আমার সঙ্গে? মহিলাদের কথায় বিশ্বাস রাখুন বোস, *(মিলুর দিকে তাকাল)* বিশ্বাস রাখুন।

২য়।। কিন্তু...আচ্ছা, চলুন।

[*বিপুল সন্দেহ নিয়ে লোকটি এগুল। ডাক্তার ওদের এগিয়ে দিতে গেলেন।*]

লোকটি।। *(বেরিয়ে এসে)* একটা লোক এখনো সন্দেহ করে যাচ্ছে। ও আমাকে ছাড়বে না। আবার আসবে।

মিলু।। অত ভয় পাবেন না! চুপটি করে এখন বসুন তো। একটু চা খাবেন?

লোকটি।। কোন দরকার নেই। আপনি আমার জন্যে অ্যাতো করবেন না, প্লিজ, আমার নানারকম ভয়। কিন্তু ঐ লোকটা আবার আসবে, কিছুতে ছাড়বে না আমাকে। *(হঠাৎ প্রবল কাশতে কাশতে)* সূর্যটা বের করবার আগেই ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। *(খাটের উপর ক্লান্ত হয়ে বসল)* অসংখ্য পিং-পং বল পড়ছে। সারা ঘর, সমস্ত পৃথিবী ভরে

যাবে। আপনি বাইরে যান, চাপা পড়ে যাবেন। বলগুলো ড্রপ খাচ্ছে, আমার ছোটবেলা, সুখ, দুঃখ বয়স সব বলগুলোর মধ্যে ড্রপ খাচ্ছে। গলার দিকে সোজা একটা সাঁড়াশি এগুচ্ছে, আপনারা কানে আঙুল দিন, প্রচণ্ড চাপে গলার ভিতরের সূর্যটা বিরাট শব্দে ফেটে যাবে! রক্ত লেগে লক্ষ লক্ষ সাদা পিং-পিং বল লাল টকটকে হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে গড়াবে। (*শুয়ে পড়ল*) আপনি কান চাপা দিন। প্লিজ্ সরে যান বলছি, ভীষণ শব্দ হবে, চারিদিকের দেয়াল, ধৈর্য, আবেগ, অনুভূতি সব ফেটে যাবে।

(লোকটি আচ্ছন্নের মতো থেমে গেল। একটু বাদে ডাক্তার ঢুকলেন)

মিলু।। শুনুন, শুনুন।

ডাক্তার।। কি হল? (*পরীক্ষা করে*) কিছু না! ফেইন্টের মতো। মিলু, নিজেকে কুকুর ভাবা ওর কিছুতে যাচ্ছে না। ওকে সারানো শক্ত। ভাবছি হয় লোকটি কিংবা আমি যে কেউ সরে পড়ব। তাছাড়া পথ নেই।

মঞ্চ অন্ধকার হয়।

চতুর্থ অঙ্ক

[*সেই ঘরের খাটে শুয়ে আছে লোকটি। ফিকে মৃদু নীল আলো ঘরে। হঠাৎ তড়াক করে লোকটি উঠে বসল, চারদিকে তাকাল। চোখে মুখে আতঙ্ক। দরজা দিয়ে কালো পোশাকে আবৃত কালো রুমালে নাক পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া কয়েকটি লোক ঢুকল! সকলের সামনের লোকটির হাতে বিরাট একটা সাঁড়াশি, একটু ঝুঁকে নিচু হয়ে ওরা অর্ধবৃত্তের মতো লোকটির দিকে এগুচ্ছে। লোকটির মুখের আতঙ্ক বাড়ছে।*]

লোকটি।। *কে? কে?*

[*লোকগুলো দেয়ালের দিকে সরে গেল। কিছুকাল চুপচাপ। সাঁড়াশি হাতে লোকটির নির্দেশে ওরা আবার এগুচ্ছে। সাঁড়াশিটার মুখটা খুলে লোকটির দিকে এগিয়ে আনা হচ্ছে।*]

লোকটি।। আমাকে ছেড়ে দাও! গলায় ভীষণ জোরে চাপ লাগবে! একটা সূর্য আটকে রয়েছে ওখানে। প্রচণ্ড শব্দ হবে! (*সাঁড়াশি এবং কালো পোশাকের লোকগুলো আরো কাছে এল*) প্লিজ, অতো এগিয়ো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। তাছাড়া মরে গেলে আমি কথা বলতে পারব না, আমি অনেক অদ্ভুত কথা জানি, মহৎ কথা জানি, ভয়ংকর কথা জানি—আমাকে বলতে হবে, নিশ্চয়ই বলতে হবে, নিশ্চয়ই বলতে হবে।

[*সাঁড়াশিটা গলার প্রায় কাছে এল।*]

লোকটি।। সূর্যটা ফেটে যাবে, ভীষণ শব্দ হবে, তোমরাও ভয় পাবে। কান চাপা দাও (*সাঁড়াশিটি গলা স্পর্শ করল*) লাগছে, লাগছে! ওরা আমাকে ছেড়ে দিল না! হে ঈশ্বর, ওরা কি করছে, তুমি ওদের ক্ষমা কোরো না। যিশুর মৃত্যু হচ্ছে ; কুকুরের মূর্তিতে যিশুর মৃত্যু হচ্ছে।

[*তীব্র চিৎকার। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হতে ওর গলা*

থেকে সাঁড়াশি সরিয়ে নেওয়া হলো। কালো পোশাক পরা লোকগুলো ওর চিবুক তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। লোকটিও অবাক চোখে ওদের দেখছে। ধীরে ধীরে কালো পোশাকের লোকগুলো দরজা দিয়ে চলে গেল। লোকটা খাটের উপর উঠে দাঁড়াল। গলাটা হাত দিয়ে দেখল, লাফিয়ে নামল।]

লোকটি॥ বেঁচে আছি! লোকগুলো কি দেখল মুখে, চলে গেল কেন?

[*আয়নার কাছে গেল। দেখল নিজেকে, হাত পা ছুঁড়ল, নিজেকে চিমটি দিয়ে আর্তনাদ করল।*]

ঠিক বেঁচে আছি। বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, আমি বেঁচে আছি।

মিলু॥ কি হয়েছে?

লোকটি॥ আমি বেঁচে আছি। এর থেকে বড় খবর হয় না, বুঝলেন এর থেকে বড় খবর নেই। বেঁচে আছি তো, অর এ গোস্ট? দেখুন তো পা দুটো উল্টোনো কিনা? ছায়া পড়ছে? চিমটি কাটুন তো, কাটুন। আরে লাগবে তো আমার, কাটুন।

[*মিলু চিমটি কাটল।*]

লোকটি॥ লাগছে, ব্যথা লাগছে। ব্যথা খুব ভাল, তাই না?

মিলু॥ হ্যাঁ, এবার শান্ত হোন, ঠিক আছেন আপনি।

লোকটি॥ আচ্ছা, আপনি ভূত নন তো?

মিলু॥ আমরা কেউ ভূত নই তবে আপনি একটা ভূতুড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন, আর খুব চেঁচাচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙে আমার ভয় করেছিল, তবুও এলাম। কি হয়েছিল আপনার?

লোকটি॥ ভীষণ ব্যাপার। (*কি ভেবে*) এত চ্যাঁচানো ঠিক নয়। হয়তো ওরা কোথাও লুকিয়ে রয়েছে!

মিলু॥ কারা!

লোকটি॥ সাঁড়াশি হাতে সেই কুকুর-ধরা লোকগুলো আমার গলা পর্যন্ত এসেছিল। হঠাৎ একটা শব্দ হতে ওরা সরে গেল। ঐ দরজা দিয়ে সরে গেল।

মিলু॥ কে ঢুকবে এ বাড়িতে? সব বন্ধ, সামনের গেট, দরজা, সব। আসলে আপনি স্বপ্ন দেখে ছেলে মানুষের মতো ভয় পেয়েছেন।

লোকটি॥ তার মানে ঐ লোকগুলো আমার স্বপ্ন পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। ওরা আমাকে পালাতে দেবে না, ঘুমে পর্যন্ত না? আচ্ছা, একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ, শব্দটা কিসের!

মিলু॥ জ্যাঠামণি সেই যে ক্রেনটা এনেছিলেন সেটা হঠাৎ উল্টে পড়েছে।

লোকটি॥ ভেঙে গেছে?

মিলু॥ জানি না, তবে কালকেই ওটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে।

লোকটি॥ কিন্তু সূর্যটা তাহলে কেমন করে তুলবেন ডাক্তারবাবু?

মিলু॥ (*একটু আড়ষ্টভাবে*) আপনাকে বলার সময় হয়নি। জ্যাঠামণি আজ রাত্তিরে বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে বোকারো গেছে, দিদির খুব অসুখ।

লোকটি।। কবে ফিরবেন?

মিলু।। ওখান থেকে বম্বে যাবেন, ফিরবেন না।

লোকটি।। তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট? আমি সারব কি করে?

মিলু।। (*একটুকাল চুপ থেকে*) আমার মনে হয় কি জানেন, এসব অসুখ যদি সারে আপনা থেকেই সারে। মিছিমিছি ডাক্তার দেখিয়ে লাভ কি?

লোকটি।। ভেবেছিলাম, সূর্যটা বের করলে চাকার মতো গড়িয়ে দেব। আর ছোটবেলায় যেমন চাকার পিছে ছুটতাম সে রকম পিছে পিছে ছুটব। আসলে আমি সূর্যটাকে বড় ভালবাসি, ওটাকে ছাড়তে পারি না।

মিলু।। আমাদের ছাড়তে পারেন?

লোকটি।। আপনিও চলুন না, দেখা যাক চাকাটা কোথায় থামে।

মিলু।। আমি অত ছুটতে পারিনা, বড্ড কুঁড়ে। কুঁড়েমি ভাল লাগে না আপনার?

লোকটি।। আপনার বলাতে মনে হয় লাগে।

মিলু।। কুঁড়েমিতে কাজ নেই, আপনি ঘুমোন।

লোকটি।। আমি কবে যাব?

মিলু।। কাল আপনাকে আর একটা জায়গায় পাঠাবো। যদি চিকিৎসা পছন্দ হয় সেখানে আপনি থেকে যাবেন।

লোকটি।। না না, আমি আর কোথাও যাব না। হঠাৎ কুকুরের মতো ডেকে উঠলে তারা আমাকে ধরিয়ে দেবে, ঠিক ধরিয়ে দেবে। বরঞ্চ আমি চলে যাব।

মিলু।। আচ্ছা, এখন তো আপনি ঘুমোন। অনেক রাত হল।

লোকটি।। আপনি যান, ঘুমোন গিয়ে। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি।

[*মিলুকে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল, ফিরল।*]

মিলু।। ফ্লাস্কে দুধ আছে, কাপে ঢেলে দেব?

লোকটি।। থাক। খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি যান।

[*মিলু চলে গেল।*]

লোকটি।। অদ্ভুত নীল আলো ঘরে। মনে হচ্ছে বাইরের সমস্তই নীল। আমি চলে যাব। সেই টেনিস বলটা একটা বিরাট জাহাজের মতো ভেসে আসছে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমি জাহাজের শব্দ শুনছি। আমি চলে যাব।

[*লোকটি উঠল। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে নিল। দরজায় একটা কাল্পনিক শব্দ যেন শুনল।*]

লোকটি।। কে? দরজায় কড়া নাড়ে কে? খুলছি, আমি তৈরি। একটু, একটুকাল।

[*টেবিল থেকে খুঁজে নিজের খাতাটা নিল। পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে ধরাল। দরজার দিকে এগোয়। ধীরে অন্ধকার হয় মঞ্চ।*]

পর্দা

নীল রঙের ঘোড়া

চরিত্র লিপি

সোমনাথ

একজন প্রৌঢ়

চঞ্চল

সুহাস

বিমল

হ্যারি গোল্ডেন

একটি বাচ্চা ছেলে

পর্ণা

মিঠু

মিনু

মৃণ্ময়ী

সমগ্র নাটকটির পরিকল্পনা, কাহিনী, ভাবনা, চরিত্র, সংলাপ মৌলিক তবে একটি শোনা বিদেশি কাহিনীর অতি সামান্য সাদৃশ্য বর্তমান নাটকটির একটি ছোট অংশের সিচুয়েশনের মধ্যে রয়েছে। এতে রচনাটির মৌলিক চরিত্র বিশেষ আহত হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি।

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা ওঠেনি। মঞ্চের ভিতর থেকে সমবেত হাসি উঠল। উচ্ছল হাসির মধ্যে পর্দা উঠল। কয়েকজন তখনও হাসছে। এদের মধ্যে একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। সপ্রতিভ এবং গভীর চরিত্রের, নাম পর্ণা। একটি সতের আঠেরোর কিশোরী—মিঠু। হ্যারি-গোল্ডেন নামে একজন অ্যাংলো যুবক একখানা ক্রিকেট ব্যাট কোলে রেখে হাসছে। আর একজন বছর ত্রিশের যুবক কোনমতে হাসি থামিয়ে সিগ্রেট ধরাল। তার নাম সুহাস। গোল সরু ড্রামের মত বিচিত্র এক ধরনের টেবিল সামনে। ওরা টুলে বসে। কোণে অনুরূপ চেহারার একটা বড় ড্রাম। এখানে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বক্তৃতার ভঙ্গিতে টুলে দাঁড়িয়ে। কাচাপাকা চুল, গলায় সুতো পরানো তাসের দীর্ঘ মালা। হাত নেড়ে চুপ করতে বলছে। ঘরে মৃদু আলো। নীল, হলুদ আর লাল ছোট ছোট ত্রিভুজ এবং গোলাকাব আলো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা অপরিচিত রহস্যময় পরিবেশ।]

প্রৌঢ়।। আমার বক্তব্য হল, আমরা হাসি কেন?

সুহাস।। আমরা না হেসেও পারি।

[সকলে স্ট্যাচুর মত নিঃশব্দ এবং স্থির হল]

প্রৌঢ়।। তাহলে আমার বক্তব্য বিষয় হল, আমরা হাসি না কেন?

[সকলে তুমুল হেসে উঠল। প্রৌঢ় লোকটি অসহায়ের মত তাকাতে লাগল]

প্রৌঢ়।। আসলে বুঝলেন, কোন কিছু সম্পর্কেই গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে কিছু বলার মানে হয় না। তাছাড়া কোন বিষয় নেই, তেমন কোনও বিষয়ই নেই বলার মত।

সুহাস।। দেখুন, অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে আছি, এবার আমরা উঠতে চাই।

মিঠু।। আপনার অতিথি বোধহয় এখানে আসবার কথা ভুলে গেছেন।

প্রৌঢ়।। অসম্ভব, তিনি এলেন বলে।

পর্ণা।। এরকম তো আপনি অনেকবার বললেন।

প্রৌঢ়।। প্লিজ, আর একটুকাল বসুন আপনারা। আমার অতিথির সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কটাই বড়। আমি তো আপনাদের কথা বলেই তাকে ডেকেছি। আমি নিজে ডাকলেও কিছুতেই আসত না। আমার একটু দরকার রয়েছে—গোপন। তাহলেও আপনারা জানতে পারবেন।

হ্যারি গোল্ডেন।। বসে না থেকে আমরা অন্তত কিছু একটা করি না?

সুহাস।। অগত্যা আমি তো সাত আটটা সিগ্রেট খেয়ে ফেললুম।

মিঠু।। ইস্ যদি উলের সেলাইটা নিয়ে আসতুম। কে জানত ছাই এ রকম একটা দেরি হবে।

প্রৌঢ়।। দেখুন, এই সময় কাটাবার জন্যই বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। কিন্তু তেমন কোন অ্যাট্রাক্টিভ টপিকই পেলাম না। মাথায় আমার চুল ছাড়া কিছু নেই দেখছি।

মিঠু।। চুলও গোণাগুণতি!

প্রৌঢ়।। মেয়েটা বড্ড ফাজিল তো।

হ্যারি।। দেখুন আমার সঙ্গে ক্রিকেট ব্যাট রয়েছে। ক্রিকেট খেললে কেমন হয়?

প্রৌঢ়।। দি আইডিয়া। লাইফ ইজ ক্রিকেট! বুঝলেন, বক্তৃতার বিষয় পেয়ে গেছি। আমাদের এই খেলায় বোলার থাকবে না। স্টাম্পও না। আসলে একটা মারমুখী গুগলি বল নানা কায়দায় তীব্র বেঁকে কিংবা ধূর্ত মোচড়ে বারবার আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তাই না? আর এ-ভাবেই কি আমাদের লেগস্টাম্প বা অফস্টাম্প কিংবা মিড্‌লস্টাম্প ভেঙে যায়নি? আমরা অনুক্ষণই একটা মারমুখী বলের দিকে তাকিয়ে আছি, হাতে একটা অসহায় ব্যাট! দিস ইজ রিয়্যাল ক্রিকেট।

[*সুহাস হাততালি দিল*]

প্রৌঢ়।। হাততালি কেন? বেশ বলেছি, তাই না?

সুহাস।। এটা বক্তৃতা থামিয়ে দেবার হাততালি।

প্রৌঢ় ।। কেন?

সুহাস।। কারণ আমরা বক্তৃতায় ক্লান্ত, একটা কিছু করতে চাই।

হ্যারি।।। আমরা এখানেই ক্রিকেট খেলা শুরু করে দিচ্ছি। রাজি?

প্রৌঢ়।। আপত্তি কি? ব্যাট এবং বল আমাদের নিয়ে খেলবে। আমরা আসলে এক প্যাকেট তাস। কয়েকজন চারপাশ থেকে আমাদের সাফল করছে, ডিল করছ, চারহাতে লুকিয়ে তুলে নিচ্ছে, খেলছে। আমরা নিজেরা অর্থহীন চার পাঁচ টেক্কা গোলাম।

[*কেউ ওর কথা শুনছিল না। সকলে ড্রামের মত টেবিল এবং টুলগুলো একপাশে করছিল। হ্যারি প্রৌঢ়কে বলে–*]

হ্যারি।। কই, নেমে আসুন। প্রথম আপনি ব্যাট করবেন।

প্রৌঢ়।। আমি।

সুহাস।। কেন, আপত্তি কি?

প্রৌঢ়।। কিন্তু আমি তো অলরেডি আউট, ক্লিনলি বোল্ড্।

পর্ণা।। আপনি যেভাবে আউট হয়েছেন তাই দেখান।

প্রৌঢ়।। কিন্তু রিপিটেশন ভয়ানক শক্ত।

মিঠু।। চেষ্টা করুন।

[*প্রৌঢ় লোকটি নেমে এল। ব্যাটটা নিল। মঞ্চের এক প্রান্তে গিয়ে ব্যাটসম্যানের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। ব্যাটটাকে হাতে ঠিকমত সেট করে নেবার ভঙ্গি করতে লাগল*]

হ্যারি।। তাহলে ফিল্ডিংটা সাজিয়ে নি। (*সুহাসকে*) আপনি উইকেটে কিপিং-এ যান। আমি গালিতে থাকছি। মেয়ে দু'জনকে নিয়ে কি করি? (*মিঠুকে*) আপনি ফার্স্ট স্লিপ, আর আপনি (*পর্ণাকে*) সেকেণ্ড স্লিপে দাঁড়ান।

প্রৌঢ়।। মনে রাখবেন, কোন বোলার থাকবে না। মানে তাকে দেখা যাবে না—কিন্তু সে আছে, এবং তার অদৃশ্য বোলিংও।

হ্যারি।। ঠিক আছে। এবার স্টার্ট করা যাক।

প্রৌঢ়।। তাহলে ব্যাট করছি। প্রথমবার যেভাবে আমি আউট হয়েছিলাম সেটাই দেখাই। এ ভাবে গার্ড নিলুম (*ব্যাটটায় গার্ড নিল*), মনে করুন, বলটা প্রায় ত্রিশ বছর পিছন থেকে আসছে। আমার স্টাম্পের বয়স তখন কুড়ি বাইশ হবে। মাঠে দর্শক ছিল না, বোলার দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বলটা একটা চেনাশুনো মেয়ের মুঠোর মধ্য থেকে ছিটকে প্রচণ্ড গতিতে এসে লেগ স্টাম্পটা কাত করে দিল। দ্বিতীয়বার—

সুহাস।। বর্ণনা বাদ দিয়ে খেলাটা শুরু করা যাক।

মিঠু।। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে যাবে আমার। আমি ব্যাট করব।

প্রৌঢ়।। আচ্ছা ঝামেলা তো!

মিঠু।। ঝামেলার কি আছে এতে।

প্রৌঢ়।। ঢের, ঢের আছে, বুঝবে না তুমি।

পর্ণা।। ওকে ব্যাট করতে দিলে আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না।

প্রৌঢ়।। আচ্ছা গেঁড়ো তো! কই হে, হ্যারি—স্কিপার হয়েছ, এবার সামলাও। মেয়েছেলে নিয়ে ক্রিকেট!

হ্যারি।। ঝামেলা কাটাতে হলে এরা কেউ ব্যাট করবে না। সুহাস মিত্র ব্যাট ধরুন। রাজি আপনি?

সুহাস।। কেন রাজি নই। কিন্তু পর্ণার কোনও আপত্তি নেই তো?

পর্ণা।। একমাত্র ঐ মেয়েটি ছাড়া যে কেউ ব্যাট করতে পারে।

মিঠু।। দেখুন, কী প্রচণ্ড হিংসা ওর! শুনলেন তো!

পর্ণা।। আমার উপর তোমার হিংসা নেই?

মিঠু।। কেন থাকবে না।

পর্ণা।। তবে!

হ্যারি।। আপনারা থামুন, খেলা শুরু হচ্ছে। সুহাস মিত্রেরই আগে ব্যাট করা উচিত। কারণ আজকের অতিথির সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই জটিলতা এনে দিয়েছে।

প্রৌঢ়।। কিন্তু মনে থাকে যেন, কোনো ব্যক্তিগত জটিলতা নয়—আমার একটা বিশেষ প্রয়োজনে ওকে আমি ডেকেছি। সবাই মিলে এই আসল কথাটাই আমাকে ভুলিয়ে দিও না। হ্যারি, মনে থাকে যেন, এ ব্যাপারে তুমিই আমার একমাত্র সহায়।

হ্যারি।। ঠিক মনে থাকবে। আচ্ছা, স্টার্ট করা যাক। (*সুহাস কাল্পনিক স্টাম্পের কাছে ব্যাট হাতে তৈরী হল। মিঠু গিয়ে একটা টুলে বসল।*)

প্রৌঢ়।। এই যে খুকি, মাঠে এস, মাঠে এস।

মিঠু।। আমি ঐ মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

পর্ণা।। ঠিক আছে, না চাইলে খেলতে হবে না তাকে! ওর বসে থাকাই ভাল।

মিঠু।। আমার ভালমন্দ ভাবতে হবে না কাউকে। সব্বাইকে চেনা আছে। জানেন, এই মেয়েটা আমাকে কি ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

পর্ণা।। জেনেশুনে কোন কষ্ট ওকে আমি দিইনি।

মিঠু।। শুধু এই মেয়েটি একা নয়। আজকে যে অতিথি আসবেন, সেই সোমনাথ রায় আর এই পর্ণা রায়, দু'জনে মিলে ভিতরে ভিতরে পুড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। কাউকে বলতে পারিনি আমি, মনে মনে শুধু ছটফট করেছি।

পর্ণা।। আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাই না, ওটা আমার স্বভাব নয়।

সুহাস।। কিন্তু পর্ণা, তুমি আর সোমনাথ এ দুজনে মিলে আমাকে কি কষ্ট দাওনি কোনরকম?

পর্ণা।। তুমি কষ্ট পেয়েছ, আমি দেইনি।

সুহাস।। যদি মানতে না চাই?

পর্ণা।। না মানলে আমি কি করব? সব, সব দোষই বুঝি আমার। বলুন, আপনারাও বলুন, আপনাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের মূলে আমি। ভূমিকম্প হচ্ছে, সেও আমার জন্য, ঝড় হচ্ছে সেও আমার জন্য—বলুন, বলুন আপনারা?

মিঠু।। এই মেয়েটির ধারণা ওর থেকে বেশি কেউ সোমনাথদাকে ভালবাসতে পারে না। কিন্তু ও জানেনা—

প্রৌঢ়।। দেখুন, আপনারা না থামলে কিন্তু খেলা হতে পারবে না।

মিঠু।। আপনাদের আজকের অতিথি অর্থাৎ সোমনাথদার একখানা ছবি আছে আমার কাছে। দেখবেন?

[*ব্যাগ থেকে বের করে দেখাল। পর্ণা এবং সুহাস ছাড়া বাকি দু'জন ঝুঁকে দেখল*]

মিঠু।। (*পর্ণাকে দেখিয়ে*) দেখছেন, এমনভাবে দূরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবিটায় ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অথচ সোমনাথদার কাছে কতোবার আমার কাছ থেকে ছবিটা ফেরৎ নিতে বলেছে। সোমনাথদার কোনও স্মৃতি আমার কাছে থাক—এ ওর সহ্য হয় না। অথচ ওর বিয়ে হয়েছে, স্বামী আছে—কি মিথ্যে ওর মধ্যে ভাবুন! (*সুহাসের দিকে তাকিয়ে*)এ-রকম একজন মেয়েকে আপনার স্ত্রী ভাবতে গায়ে জ্বালা ধরে না!

প্রৌঢ়।। কি ব্যাপার! দেখছি, পারিবারিক অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে যাচ্ছে। কোনরকম অশান্তি যেন এখান থেকে শুরু না হয়।

সুহাস।। কোনরকম শান্তিই আমার নেই। কাজেই অশান্তির ভয় আমি করি না।

পর্ণা।। কি বলতে চাও? তোমার অশান্তির মূলে আমি! কিন্তু আমার শান্তি? কেউ আমাকে বুঝতে পারল না, কেউ বুঝতেও চাইল না।

[*টুলে বসে টেবিলে মাথা নিচু করল*]

মিঠু।। কান্না পাচ্ছে তো? বেশ লাগছে আমার! কাঁদুক বসে বসে। এক-একদিন সারা দুপুর বসে বসে যখন আমি কেঁদেছি, তখন কে দেখতে এসেছিল?

প্রৌঢ়।। আচ্ছা গেঁড়ো তো! ক্রিকেট খেলাটাই মাটি হল দেখছি। (*পর্ণার কাছে এসে*) এই যে উঠুন, উঠুন! লাইফ ইজ্ এ গেম, লেটস্ স্টার্ট! উঠুন, উঠে পড়ুন। (*সুহাসকে*) ধরুন ব্যাট। আরম্ভ করুন।

[*সুহাস ব্যাট ধরল*]

প্রৌঢ়।। এবার বলটা আসছে, আসছে। গেট রেডি। আম্পায়ার বোলিং-এর নির্দেশ দিয়েছেন, বল আসছে, আসছে—

[*সুহাস সবেগে ব্যাট চালাল মঞ্চের কোণের দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বছর পঞ্চাশের একজন লোক ঢুকল, উদ্‌ভ্রান্ত মুখ। কাঁচাপাকা চুল। চোখ বিষণ্ণ। ক্লান্ত। ঢুকেই বুক চেপে তীব্র চিৎকার করে*

উঠল। যেন বলটা ওখানে ভয়ানক লেগেছে। প্রৌঢ় লোকটি, পর্ণা, মিঠু এবং হ্যারি ছুটে এসে ওকে ধরল। আস্তে আস্তে একটা টুল টেনে বসালো ওকে।]

পর্ণা॥ সোমনাথ, খুব লেগেছে না?

সোমনাথ॥ ঠিক আছে। ব্যস্ত হ'য়ো না তুমি।

প্রৌঢ়॥ কি কাণ্ড, আমাদের অতিথিকে আমরা এবাভে রিসিভ করব মোটে ভাবিনি।

হ্যারি॥ বুঝলেন, এটা পুরো অ্যাক্সিডেন্টাল। (*হো-হো করে হেসে উঠল*) আমার বলটা যে গিয়ে ওর বুকে লাগবে, এ আমি জানতাম। আমি না হয়ে যদি আপনাদের এই অতিথিটি ব্যাট করতেন, তাহলে ওর ব্যাট থেকে বলটা ঘুরে গিয়ে আমার বুকে লাগত।

প্রৌঢ়॥ দেখুন, আপনি একটু থামুন! আমাদের অতিথির প্রাথমিক সেবা অন্তত আমাদের কর্তব্য। আচ্ছা, কোনরকম ফ্র্যাক্চার? ব্যাণ্ডেজের দরকার আছে?

সুহাস॥ কিছু দরকার নেই। পর্ণাকে ওর কাছে রেখে যদি আমরা সকলে চলে যেতে পারি, তাহলেই সব মিটে যাবে। অসুখের পাশে ওষুধের মত ওদের মানাবে!

[মিঠু খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল]

সোমনাথ॥ সুহাস, পর্ণা তোমার স্ত্রী, সকলের সামনে তুমি ওকে কেন অপমান করতে চাও?

সুহাস॥ আমার স্ত্রীর উপর আমার থেকে তোমার সহানুভূতি কিছু বেশি বলে। লক্ষ করেছ, সহানুভূতি বলেছি, অন্য কোনো মারাত্মক শব্দও ব্যবহার করতে পারতুম।

পর্ণা॥ সব কথায় কান দিও না তুমি সোমনাথ, সবকিছু আমার সহ্য হয় আজকাল। খুব লেগেছে তোমার. তাই না?

সোমনাথ॥ বস তোমরা। বলটা কড়ি-বাইশ বছর পিছন থেকে সটন ভিতরে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সব কেমন ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়ে দিল। দেখুন, কিছু ভাববেন না আপনারা, কষ্টটা কেবল আমার, আমি সামলে নেব।

সুহাস॥ ব্যাপারটা বোধ হয় পর্ণারও কিছু, তাই না সোমনাথ?

সোমনাথ॥ কিছুটা তোমার ও সুহাস।

মিঠু॥ আমার নয়?

সোমনাথ॥ তুমি এতো ছোট ছিলে। আর তক্ষুণি পর্ণাকে দেখলাম। তোমাকে কষ্ট দিতে আমি বাধ্য হয়েছি। নিয়তির মত সব ঘটে গেল। মিঠু, তোমার কাছে হয়ত আমি পাপ করেছি, কিন্তু মনে মনে পর্ণাকে ভালবেসে তোমার কাছে থেকে গেলে হয়ত আরো বড় পাপ করতাম। তুমি ছোট ছিলে আমি সরে গেলে দুদিন বাদে তোমার সয়ে যাবে —আমি এরকম ভেবেছিলাম।

মিঠু॥ ছোট ছিলাম বলে বুঝি আমার হাত কাটলে রক্ত পড়বে না, চোখে বুঝি জল আসবে না? ছোট ছিলাম বলে বুকের মধ্যে সুখ থাকে না? লোভ থাকে না? মন থাকে না?

সোমনাথ॥ এতো সব থাকে আমি জানতাম, কিন্তু এতো দীর্ঘকাল তোমার মধ্যে

থাকবে বুঝিনি। বোঝার ভুলেও অনেক বড় পাপ হয়—সে পাপ আমি করেছি। আমার ভিতরে অনেক পুড়ে পুড়ে আছে, তুমি তাকালে দেখতে পাবে। ওগুলো পাপের চিহ্ন। আমি ওদের বয়ে বেড়াই।

প্রৌঢ় ।। দেখুন, আপনাকে একটা বিশেষ দরকারে ডেকেছিলাম। আপনারা যদি এতো ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে থাকেন—

সোমনাথ।। কিন্তু আমি আর কোনো দরকারে লাগতে পারি না।

প্রৌঢ়।। আপনি নিশ্চয়ই পারেন।

সোমনাথ।। পারি না! আমি কিছু পারি না! অফিসে যাই। ফিরি। তারপর নিজের খাটে বসে রেসের ঘোড়ার খবর পড়ি। আপন মনে স্পেকুলেট করি। কখনও কখনও অদ্ভুত মিলে যায়। এটা একটা খেলা এখন আমার কাছে। শনিবারের মাঠে আমি যাই না। একদিনও না। এ আমার ঘরে বসে বসে খেলা।

পর্ণা।। সত্যি তুমি একেবারে মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, সোমনাথ!

সোমনাথ।। একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

পর্ণা।। শুনে তোমাকে আমার এতো ভাল লাগছে, ইচ্ছে করছে—

সুহাস।। আমি চলে যাইনি, পর্ণা, স্বামী ভদ্রলোকের অন্তত কাছে থাকাটাকে সম্মান কর।

পর্ণা।। মনটাকে আমি চেপেচুপে লুকোতে পারিনা।

সুহাস।। কোনও মিথ্যে ছিল না তোমার?

পর্ণা।। না, তোমার মনগড়া মিথ্যে দিয়ে ভুল বিচার করেছ আমাকে।

প্রৌঢ়।। দেখুন, প্লিজ্, আপনারা একটু থামুন। আমার একটা ভীষণ দরকার ছিল। হ্যারি, তুমিই কি বলবে আমাদের অতিথিকে?

হ্যারি।। আপনি বললেই ভাল।

প্রৌঢ়।। বেশ, আমিই বলছি।

মিঠু।। আমার কিন্তু ওদের ঝগড়াটাই ভাল লাগছিল—ক্রমশ সকলের মুখ থেকে মুখোশটা খুলে পড়ত। আর তখনি আমি একটা আয়না এনে ওদের চোখের কাছে ধরতুম।

প্রৌঢ়।। তুমি থাম তো হে! কাজের কথাটা বলতে না বলতেই বাচালতা শুরু করে দিল। এত সব গেঁড়ো না!

মিঠু।। আমাকে আপনি ওভাবে ধমকালে আমি কিন্তু ঠিক চলে যাব।

[*ব্যাগটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল*]

সোমনাথ।। মিঠু। শোন। (*মিঠু ফিরল*) তুমি ঠিক সেই আগের মিঠুটাই আছ। তেমনি ছেলেমানুষ, দুমদাম রেগে যাও। আমার কাছে বসে পড়তে পড়তে কতোদিন তুমি রেগে উঠে গিয়েছিলে মনে আছে?

মিঠু।। ওসব মনে করে কোনো লাভ নেই।

সোমনাথ।। আমি ভুলি না। চুল পেকে গেছে তবু ভুলি না। আসলে স্মৃতি বুড়ো হয় না। তুমি তাই আমার কাছে বড় হওনি। আমার চুল পাকল, তুমি তবু ছেলেমানুষ, পর্ণা এখনো সেই পঁচিশ-ছাব্বিশের মেয়ে। স্মৃতির সমস্ত মানুষগুলো তাদের বয়স হারায় না, কেবল আমি বুড়ো হই।

মিঠু ।। মজা কি জান, আমি যখন তোমাকে ভাবি তখন তোমাকেও আমার বুড়ো লাগে না। মনে পড়ে, সন্ধ্যা হলেই তুমি আমাকে পড়াতে আসছ, হো-হো করে হাসছ। পড়া তো ঘেচু—যা সব বলতে না তুমি—মাস্টারমশাইয়ের কথাবার্তা শুনলে গার্জেনদের চোখ কপালে উঠত।

[*মিঠু খিলখিল করে হাসল*]

প্রৌঢ় ।। দেখুন, এসব হাসাহাসি, স্মৃতির চচ্চড়ি—সহ্য হচ্ছে না আমার। আমি সোজাসুজি কেন আপনাকে ডেকেছি সে কথাটা বলে নি আগে। আপনাকে আবার রেস খেলতে প্রেরণা দিতে চাই আমি। আমি আর এই বিখ্যাত জকি হ্যারি গোল্ডেন।

সোমনাথ ।। কিন্তু ঘোড়ার মাঠে আমি আর যাব না। এ নিয়ে অনেক অশান্তি ভুগেছি আমি।

প্রৌঢ় ।। অশান্তি কেন?

সোমনাথ ।। আমার সমস্ত সংসার এটা চায় না, আমার স্ত্রী-সন্তান কেউ চায় না।

প্রৌঢ় ।। আপনি চান না?

সোমনাথ ।। জানি না।

প্রৌঢ় ।। তার মানে আপনার ভিতরটা এখনও চায়। চলে আসুন শনিবারের মাঠে। ঘোড়া আপনাকে অনেক কিছু এনে দেবে। মনে আছে, ছোটবেলায় স্বপ্নে আপনি একটা নীল রঙের ঘোড়া দেখতেন? সেই ঘোড়াটা আপনাকে মাঠে ডাকছে। হোয়াট এ থ্রিল! ভাগ্য নিয়ে কি উল্লাস! কি চিৎকার! অ্যাট লিস্ট একটা চমৎকার দৃশ্য—হেলদি অ্যানিম্যালস্ আর মুভিং। ভাইব্রেশন, আপনার হারানো ভাইব্রেশন যদি ফিরে পেতে চান—গেটআপ মাই ফ্রেণ্ড!

পর্ণা ।। আপনি ওকে কেন উত্তেজিত করছেন? সোমনাথ ও সব ছেড়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ় ।। কোথায় ছেড়েছে? ও স্পেকুলেশন ছাড়েনি। স্টাডি ছাড়ে নি। ইনটুইশন, লাক, থ্রিল—সব মিলিয়ে লাইফ। হেলদি অ্যানিম্যালস আর মুভিং—ও, হোয়াট এ গ্লোরিয়াস সাইট! উঠে পড়ুন, আজ শুক্রবার, কালকের খেলাতেই চলে যান। পাস্ট! বিটার পাস্ট একটা ভাঙা মারবেলের মত গড়াতে গড়াতে নর্দমায় হারিয়ে যাবে।

পর্ণা ।। কেন, অতীতকে ও এভাবে ফেলে দেবে কেন? আপনি ওকে কুমতলব দিচ্ছেন, আপনি ওর শত্রু।

প্রৌঢ় ।। আমি ওর প্রকৃত হিতৈষী। আসলে সোমনাথের চেহারা আয়নায় ধাক্কা খেয়ে, অন্ধকারে টলে পড়ে, আলোয় পিছলে গিয়ে, মেঘের শব্দে চমকে উঠে, বিদ্যুতে পুড়ে চিৎকার করে, বেঁকে তুবড়ে যা দাঁড়িয়েছে আমি তারই ছায়া। আমি সোমনাথেরই একটা তোবড়ানো রূপান্তরের মত। তাই ওকে আমি ভাল বুঝি। ও কি চায় বুঝি। ও জুড়িয়ে যাচ্ছে—ওকে আমি একটা উত্তেজনার দোলনায় তুলে দিতে চাই।

সোমনাথ ।। আপনি সত্যি সত্যি আমার ভিতরের একটা থেমে থাকা চাকা গড়িয়ে দিতে চাইছেন। আমার মনের মধ্যে যেন আপনি একটা টর্চের আলো নিয়ে হাঁটছেন, সব ধরা পড়ছে। সত্যি, আমি আবার খেলতে চাই।

পর্ণা ।। না, তুমি খেলবে না।

[*একটা বাচ্চা ছেলে একগাদা খবরের কাগজ*

নিয়ে ঢুকল। ছেলেটির পোশক, সাজ যেন স্বপ্ন লোকের। ঘরের আলো তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন]

বাচ্চা ছেলেটি॥ কাগজ! কাগজ!

[*সোমনাথ হাত বাড়িয়ে একটা রঙিন কাগজ নিতেই ছেলেটা ছুটে পালাল। খুলে পড়তে থাকল সোমনাথ। কাগজটি একটি রঙিন সংবাদপত্র—কোনও অক্ষর নেই তাতে*]

সোমনাথ॥ (*ওর চোখমুখ ভয়ানক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে*) পর্ণা! পর্ণা!

পর্ণা॥ কি হল?

সোমনাথ॥ দেখ-দেখ আমার স্পেকুলেশন কতো কারেক্ট। যা স্পেকুলেট করেছিলাম। পড়ে দেখ, রেসের রেজাল্ট দেখ, উইনে,— বেবি চকোলেট, মহারাজ, ডালিমবিবি, ক্রিম সোলজার—সব ঘোড়াগুলো রয়েছে। কতগুলো রেসে জিততাম ভাব! দু-পকেট আমার টাকায় ভরে যেত! তার থেকেও উত্তেজনায়, নিজের স্পেকুলেশনের ক্ষমতায় আমি ঈশ্বর ভাবতে পারতাম নিজেকে। কাল ঘরে বসে যা স্পেকুলেট করেছি, সব মিলে গেছে।

প্রৌঢ়॥ তাইতো বলছি, মাঠে যান—থ্রিল, লাক, ভাইব্রেশন, মানি, এক্সাইটমেন্ট অ্যাণ্ড হোয়াট নট।

মিঠু॥ বেবি চকোলেট ঘোড়া বুঝি?

সোমনাথ। চমৎকার ঘোড়া! সাদার ওপর চকোলেটের ছোপ, পুষ্ট সবল পা। ওর হিস্ট্রি পড়লে চমকে উঠবে—কী বিরাট অভিজাত বংশে ওর জন্ম। ওর বাবা-মা—সব বড় বড় রেসে দৌড়ে সম্মান পেয়েছে। এর মত আর একটা ঘোড়া ছিল সুইট ফায়ার। ওটাই আমার শেষ ঘোড়া।

সুহাস॥ সোমনাথ তোমার শেষ ঘোড়ার নাম হয়ত পর্ণা। ওর উপরই তুমি বোধ হয় শেষ টিকিট কিনেছ। ঘোড়াটা এখনও ছুটছে, কিন্তু জকি নেই। কিংবা জকি মুখোশ ঢাকা—চেনা যাচ্ছে না। মুখোশ খুললে কার মুখ?

[*হেসে উঠল সুহাস*]

সোমনাথ॥ সুহাস, তুমি তো এ রকম ছিলে না? এ রকম হাসতে না। বালকের মত হাসি ছিল। পর্ণা, আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন ওর হাসিটা ছিল সুন্দর, ভোরবেলার বাতাসের মত। ও যখন বিয়ে করে, প্রথম তোমার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেয় তারপরেও প্রায় এক বছর ও চমৎকার হাসত। ক্রমশ কি সব হয়ে গেল! কার পাপে হল!

সুহাস॥ আমাদেরে সমবেত পুণ্যে।

[*আবার হাসল সুহাস*]

সোমনাথ॥ আমরা তিনজনে যদি মন্দির, পাহাড়, সমুদ্র বা আকাশের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই তাহলে আমরা তিনটে সবুজ পাতার মত কোনও ডালে একসঙ্গে আলো বাতাসে হয়ত এখনও বাস করতে পারি।

সুহাস॥ আলো-বাতাসেও আমার অবিশ্বাস।

সোমনাথ॥ তোমার অবিশ্বাস আর লোভই তোমাকে মেরে ফেলেছে, সুহাস।

প্রৌঢ়।। (*কাগজটা পড়তে পড়তে*) আশ্চর্য একটা ব্যাপার আপনি লক্ষ করেন নি কিন্তু।

সোমনাথ।। কি বলুন তো?

প্রৌঢ়।। আজ কি বার?

পর্ণা।। শুক্রবার আজ। শুক্রবারের বিকেল।

প্রৌঢ়।। অথচ দেখুন, এখানে যে রেসের রেজাল্ট বেরিয়েছে তা আগামীকাল অর্থাৎ শনিবারের খেলার। কাগজটা কিন্তু শুক্রবারেরই!

সোমনাথ।। (*কাগজটা দেখে*) তাইতো। আমি আগে পেলাম কি করে? কালকের খেলার ফল আজকে জানলাম কি করে? তাছাড়া আমার স্পেকুলেশনের সঙ্গেই বা মিলল কি করে? কেউ কি আমাকে নিয়ে কৌতুক করছে? আমার স্পেকুলেশন শুনে কি কেউ ছাপাল? কিন্তু কি করে সম্ভব?

[*সুহাস চলে যচ্ছিল*]

সোমনাথ।। সুহাস, যাবে না তুমি। কেন তুমি যাচ্ছ আমি জানি। এরকম তুমি এর আগে বহুবার করেছ। যে ঘোড়াগুলো জিতবে তার নাম তুমি শুনে নিয়ে এবার নিজে খেলতে চাও। কিন্তু আমি এভাবে তোমাকে আর খেলতে দেবনা। একবার ঘোড়ার নাম আমার কাছ থেকে জেনে তুমি কৌশলে খেলার দিন পর্ণার সঙ্গে আমাকে সিনেমায় পাঠিয়েছিলে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলে। আমি, পর্ণা দুজনেই বুঝেছিলাম। সেদিনই স্পষ্ট হয়েছিল পর্ণার থেকে টাকা তোমার কাছে বড়, আর আমার কাছে টাকার থেকে পর্ণা মূল্যবান।

সুহাস।। কিন্তু আমি রেসের মাঠের ঘোড়ার কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—এ কথাই বা ভাবছ কেন? ঐ ঘোড়াও আজ আমার কাছে তেতো হয়ে উঠতে পারে তো?

সোমনাথ।। তোমার কাছে তা যাই হোক, আমি যেতে দেব না তোমাকে।

সুহাস।। আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতাও কি তোমার মুঠোয়? পর্ণার মত ওকেও কি তুমি জড়িয়ে রাখতে পার?

পর্ণা।। সুহাস, এতো চেঁচিয়ে তুমি নোংরা কথা বলতে পারছ?

সুহাস।। এখন আর লুকিয়ে পাপ করতে পারি না বলে।

পর্ণা।। আরও একবার শোন, এক সময় সবই বুঝবে।

সুহাস।। ধৈর্য আমার কম। আমি যাচ্ছি। যদি যেতে চাও, চল আমার সঙ্গে।

সোমনাথ।। ঠিক আছে, তোমরা যাও। পর্ণা, আমি বড় বেশি উত্তেজিত হচ্ছি। আজকাল আমার মনটাও কেমন হয়ে যাচ্ছে। ঝগড়া করে কিছু হয় না। আমি বুঝি তবু—

পর্ণা।। আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কিছুতে খেলতে যেও না। মাঠে যেও না তুমি। লোভ খুব খারাপ। তাছাড়া তুমি ক্লান্ত।

[*সুহাস চলে যায়*]

সোমনাথ।। কিন্তু আমি যে খেলার আগেই সব কটা খেলাব ফলাফল জানি। আমি ঈশ্বর। আমি ক্লান্ত হব না।

পর্ণা।। ঈশ্বরের মত ক্লান্ত কেউ নেই। সব জেনে ফেলার অসীম ক্লান্তি ঈশ্বরের সারা

দেহে-মনে। তুমি এই ভয়াবহ জালে জড়িও না, সোমনাথ। তুমি মাঠে গেলে আমি আর আসব না তোমার কাছে। আমাকে আর ডেকো না। আমি তাহলে কেউ নই তোমার।

সোমনাথ।। তোমারা সবাই ছেড়ে গেলেও আমি আর একা নই। আমি একটা তুমুল ঝড়ের মধ্যে স্নান করছি। তোমরা সবাই যাও, লোনলি অ্যাস এ ক্লাউড—নিঃসঙ্গ মেঘের মত আকাশে ঘুরব—অজস্র বৃষ্টি ঝড় বিদ্যুৎ আমার মধ্যে। আমি আর ভয় পাই না। ক্লান্ত হব না। একটুও না।

[*ধীরে ধীরে পর্ণা চলে গেল*]

সোমনাথ।। (*প্রৌঢ় লোকটিকে*) আপনি শপথ করে বলছেন, আজ শুক্রবার?

প্রৌঢ়।। আদি এবং অকৃত্রিম শুক্রবার।

সোমনাথ।। (*হ্যারিকে*) শুক্রবার?

হ্যারি। কোন সন্দেহ নেই এতে।

সোমনাথ।। তাহলে আমি ঈশ্বর! এক হাতে চন্দ্র আর এক হাতে সূর্য তুলে নিয়ে আমি বলের মত যেদিকে খুশি ছুঁড়ব। (*ঘর অন্ধকার হল*) আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর। খাটের উপর মধ্যবয়সী একজন মহিলা। আঠেব-উনিশ বছরের একটি মেয়ে মহিলাটির পিছনে বসে ওর কাঁধে চিবুক রেখে বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের সোজা মঞ্চের কোণের দিকে ছোট একটা পড়ার টেবিলের কাছে একটি রুগ্‌ণ তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাস সাফল করছে। মুখে হাসি, চোখ চকচক করছে। ছেলেটির নাম চঞ্চল, মেয়েটির নাম মিনু। ভদ্রমহিলার নাম মৃণ্ময়ী। আর একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে খাটেব কাছে চেয়ারে বসে, পা-দুটো হাতলের উপর দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। নাম বিমল। চঞ্চল প্যাকেট থেকে দুটো তাস বের করে দূর থেকে দেখাল ওদের।]

চঞ্চল।। দেখছেন, দু'খানা মাত্র তাস।

মিনু।। ভাল করে দেখান, নাড়াচ্ছেন কেন অতো?

মৃণ্ময়ী।। থাম্ না। এতোক্ষণে ধরতে তো পারলি না একটাও। খালি কথা! কি করে দেখ!

বিমল।। চঞ্চল, ঠিক দুটো তাস তো?

চঞ্চল।। (*তাস যে দু'খানাই তা ভাল করে দেখাল*) দ্বিধা আছে? আচ্ছা, প্যাকেটটা এই টেবিলে রইল। হাতসাফাই-এর কোন স্কোপ রইল না। এই একটা তাস প্যাকেটের ভিতরে রাখলুন, এবার দ্বিতীয় তাসটাও প্যাকেটের অন্য জায়গায় রাখলুম। প্যাকেট হাতে দিচ্ছি না। বেশ, এবার তাস দুটো কোথায় আছে?

মিনু।। প্যাকেটের মধ্যে।

চঞ্চল।। প্যাকেটের মধ্যে—থ্যাঙ্কিউ। আমাদের কথা বলার ফাঁকে তাস দুটো এবার প্যাকেটের ঠিক উপরে চলে আসবে।

বিমল।। তুমি তাসে কিন্তু আর হাত দিতে পারবে না।

চঞ্চল।। দেব না।

মিনু।। ঠিক আছে, কই দেখান তো উপরে এল কি না।

চঞ্চল।। আঃ, আসতে দাও। তাসগুলোকে এটা-ওটা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উঠে আসতে হবে তো। সময় তো চাই কিছুটা।

মৃণ্ময়ী।। সবতো হাতের কায়দা। কথার ভড়ং করে যাচ্ছ, এটুকু বুঝি বাপু।

চঞ্চল।। সত্যি, এ খেলাটায় মোটে হাতসাফাই নেই। পিওর যোগের ব্যাপার। গভীর মনোসংযোগের বলে যে ইচ্ছাশক্তি—

মিনু।। সব গুল মা। শিখে এক্ষুণি তুমিও করতে পারবে। এক মিনিটও লাগে না। যোগ না ছাই।

চঞ্চল।। ঠিক আছে, তবে এ-খেলাটা থাক।

মিনু।। কেন থাকবে কেন? হাতের কায়দা বোধহয় ঠিকমত করা যায় নি। ধরা পড়ে গেছে, ঘেচু ম্যাজিসিয়ান।

চঞ্চল।। তা নয়, সন্দেহ আমার মনোসংযোগে বাধা এনেছে।

মৃণ্ময়ী।। রাখ তো তোমার ঢং। দেখাও উপরে এল কিনা।

চঞ্চল।। সত্যি মাসিমা, ব্যাপারটা ঠিক,...আচ্ছা দেখি কতটা পেরে উঠি। আচ্ছা বিমলদা, আপনি গিয়ে প্যাকেটের উপরের তাস দুটো ওঠান। একমাত্র আপনিই সন্দেহ করেননি। আপনার স্পর্শে যদি তাসদুটো উপরে উঠে আসে।

মিনু।। কথার কতো কায়দা। যাও দাদা, পঞ্চাশটা তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করেছ, তুমিই যাও।

বিমল।। পুণ্য-ফুণ্য নেই। তবে বল তো তুলতে পারি।

চঞ্চল।। তাই তুলুন।

[*বিমল তাস দুটো ধরতে যেতেই বাধা দিল চঞ্চল*]

চঞ্চল।। থামুন, থামুন বিমলদা—স্থির হয়ে নিন মনে মনে। যে কোনও ঈশ্বরের নাম স্মরণ কবে তুলুন।

বিমল।। ঈশ্বরে তেমন বিশ্বাস নেই আমার।

চঞ্চল।। তাহলে যে কোনও জানোয়ারের নাম ভেবে তুলুন।

মিনু।। ঈশ্বর থেকে একেবারে জানোয়ার?

চঞ্চল।। দুয়ের মাঝখানে যে প্রচণ্ড ভিড়।

বিমল।। ঠিক আছে, যে কোনও জন্তুর নাম করেই তুলছি।

[*স্থির হয়ে, আস্তে আস্তে তাস দুটো তুলেই দুই চোখে অবাক হল।*]

বিমল।। আরে, কামাল কর দিয়া, ব্রাদার। ঠিক সেই তাস দুটো!

[*মিনু হাততালি দিল*]

মৃণ্ময়ী।। বসে বসে অনেক রকম শিখেছ দেখছি। পি. সি. সরকারের চেলা হয়ে কবে উধাও হবে কে জানে! মিনু, এবার ম্যাজিসিয়ানকে একটু চা করে খাওয়া।

মিনু ৷৷ তুমি কর না বাবা, আমি চঞ্চলদার কাছ থেকে ম্যাজিকটা শিখব।

মৃণ্ময়ী। ম্যাজিক শিখবে! তোর মত তড়বড়ে মেয়ে আবার ম্যাজিক করবে। ওর জন্য ধীরস্থির চালাক-চতুর মাথা চাই।

মিনু ৷৷ দেখ, তোমাদের সব্বাইকে শিখে কেমন বোকা বানাই। বাবা এলেই দেখিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব।

বিমল ৷৷ বাবা তো এখনো ফিরল না মা?

মৃণ্ময়ী ৷৷ গঙ্গার পারে হয়ত বসেই আছে।

চঞ্চল ৷৷ অফিস তো কখন শেষ হয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে।

মৃণ্ময়ী ৷৷ কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে লোকটার। একটা বাড়ি-ঘর যে আছে, সেখানে লোকজন চিন্তা করছে, এসব হুঁশ থাকলে তো একটা মানুষের মত মানুষই হত লোকটা। এক্ষুণি এলে একসঙ্গে চা-টা করা যেত।

চঞ্চল ৷৷ ঠিক আছে, মেসোমশাই এলেই করবেন।

বিমল ৷৷ আমি টিউশনে যাব না? কেটলিটা বসিয়েই দাও। বাবা হয়ত এসে চা খাবেনই না।

মৃণ্ময়ী ৷৷ বসাই গিয়ে চা। কতোবার হাঁড়ি-কড়াই নামিয়ে যে এই শ্রীমানের জন্য চা বসাতে হয়। লিভারটি যাবে।

[*মৃণ্ময়ী চলে গেলেন*]

বিমল ৷৷ চঞ্চল, তুমি আমাকে অন্তত দুটো ম্যাজিক শিখিয়ে দাও। থটরিডিং আর এই তাসের খেলাটা।

মিনু ৷৷ আমি সবগুলো শিখব।

চঞ্চল ৷৷ শিখলেই তো হল না, বিমলদা,—প্র্যাকটিস চাই।

বিমল ৷৷ করব প্র্যাকটিস। চাকরি নেই, বাকরি নেই—চোখ কান বুজে প্র্যাকটিস করে যাব।

চঞ্চল ৷৷ ঠিক আছে, আজ তো শুক্রবার, কাল শনিবার শিখিয়ে দেব।

বিমল ৷৷ কাল আমার ইন্টারভিউ। পরশু রবিবার।

মিনু ৷৷ তোমাদের আবার ছুটির দিন, রোববার—এসব কি! যারা চাকরি করে না তাদের তো রোজই রোববার।

বিমল ৷৷ আরে টিউশনিটাও মারাত্মক চাকরি। নো ক্যাসুয়াল লিভ, নো আর্ন লিভ —নির্মম চাকরি। কাল ইন্টারভিউ আছে, যদি লেগে যায় না! আচ্ছা, তুমি বাংলা পড়তে গেলে কেন বলত? ফিজিক্স পড়, কেমিস্ট্রি পড়। কিঙ অফ সাবজেক্টস্—বিভিন্ন কলেজ থেকে চতুর্দোলা পাঠিয়ে দিত। এখন কর ইস্কুল মাস্টারি! ওটাতো এক্সক্লুসিভলি মেয়েদের সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে। বেশিদিন বাংলা পড়লে নাকি গোঁফদাড়ি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে, চুল কেটে বিনুনি বাঁধতে ইচ্ছে হবে।

চঞ্চল ৷৷ ভাল রেজাল্ট হলে একটা—

মিনু ৷৷ যে হারে আড্ডা চলছে, তাতে ভাল করে ফেল করা যায়, বুঝলেন ম্যাজিসিয়ান। আজকাল আবার ম্যাজিক শুরু হয়েছে। আবার নাকি প্ল্যানচেট করবে!

বিমল ৷৷ প্ল্যানচেট করতে পার তুমি? সত্যি ওটা কি বুজরুকি নয়? আমার তো মনে হয় প্ল্যানচেট আসলে এ প্ল্যান টু চিট্।

চঞ্চল ।। ওটাও এক ধরনের সায়ান্স বিমলদা। একদিন বসলে আপনার বিশ্বাস হবে। মেসোমশাই একদিন বসবেন বলেছন?

বিমল ।। বাবা?

চঞ্চল ।। বলেছিলেন তো।

বিমল ।। ঠিক আছে, একদিন আলাদা তোমাকে নিয়ে প্ল্যানচেটে বসব। একটা গোপন মৃত আত্মার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। কয়েকটি প্রশ্ন আছে আমার।

[*হঠাৎ চঞ্চলের ঘড়ির দিকে তাগিয়ে বিমল চমকে উঠল*]

একি সাতটা চল্লিশ, টিউশনের চাকরি গেল আমার! পালাই দৌড়ে। জামাটা, ও, ও-ঘরে।

[*বিমল চলে গেল*]

মিনু ।। দাদা মীরাদির আত্মা আনতে চাইবে।

চঞ্চল ।। কে মীরাদি?

মিনু ।। আত্মহত্যা করে মরেছে, খুব ভাল ছিল। বলব তোমাকে এক সময়।

চঞ্চল ।। মিনু, পৃথিবীতে নির্জন সময় এতো কম না। এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে। চটপট তোমাকে দু' চারটে ভালবাসার কথা আগেভাগে বলে নি।

মিনু। ইয়ার্কি কর তুমি এতো!

চঞ্চল। কি করব, সময় দিচ্ছে কে? কয়েক সেকেণ্ডের জন্য স্টেশনে গাড়ি থামলে, চা-চা বলে হন্তদন্ত হয়ে হঠাৎ পেয়ে গেলেই ভাঁড়টা ধরেই যেমন সঙ্গে সঙ্গে চুমুক দি তেমনি—

মিনু ।। তেমনি কি? আমাকে চুমুক দিয়ে খেতে চাও?

চঞ্চল ।। পাগল হয়েছে, বিশাল গরম, ঠোঁট পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক আর কি?

মিনু ।। আজকাল বড্ড আজেবাজে কথা বলছ।

চঞ্চল ।। বিশ্বাস কর, কোন খারাপ কিছু মিন করিনি।

[*বাইরে থেকে বয়স্ক পুরুষের গলা শোনা গেল; 'সোমনাথ আছ নাকি?'*]

মৃণ্ময়ী ।। (*ভিতরের ঘর থেকে*) মিনু দেখ তো, তোর নরেনকাকু বোধহয় ওঁকে ডাকছেন?

মিনু ।। (*জানলায় ঝুঁকে*) কে কাকু? বাবা ফেরেননি এখনও।

নেপথ্যে কণ্ঠ ।। সোমনাথ এলে বলিস, এসেছিলাম।

মিনু ।। কিছু বলবেন?

নেপথ্য কণ্ঠ ।। না, এমনি যাবার পথে হয়ে যাচ্ছিলাম।

মিনু ।। চা হচ্ছে, খেয়ে যান না?

নেপথ্য কণ্ঠ ।। না, যাই আজ।

চঞ্চল ।। বুড়োমানুষদের যখন তখন ডেকে যা ঝামেলা ক'র না। ওরা বসলে আর নড়ে না। কথাবার্তা বলার দফা গয়া।

মিনু ।। তোমার তো সবসময় কথা। কোনও কথায় ভুলছি না, আগে আমাকে ম্যাজিক শিখিয়ে দাও।

চঞ্চল।। কি মহামূর্খ রে বাবা, ম্যাজিক সকলের সামনেও শেখা যায়।

মিনু।। সেই ভ্যানিশের খেলাটা শেখাবে।

চঞ্চল।। ভ্যানিশের খেলা? চা-টা খেয়ে নি, তারপর তোমাদের বাড়ির সব্বাইকে দেখাব কেমন করে মিনুর মত একটা বড়সড় জলজ্যান্ত মেয়েকে দুম্ করে ভ্যানিশ করা যায়।

মিনু।। যা ফাজিল হয়েছ না। শেখাও না একটা ম্যাজিক, বাবা এলে দেখাব।

চঞ্চল।। ম্যাজিক-ম্যাজিক করে কানের কাছে প্যানপ্যান ক'র না তো! ম্যাজিক ছাই আমি নিজেই বুঝে উঠি না, কে চায় এসব ঝামেলা করতে। নিছক তোমাদের বাড়িতে এসে চুপচাপ তোমার সঙ্গে গল্প করার লজ্জা কাটাতে পাড়ার উঠতি ম্যাজিসিয়ানের হাত-পা ধরে দু' চারটে সহজতম খেলা শিখে এসব করে যাচ্ছি। একটু প্রেম করার জন্য, ছেলেদের ম্যাজিক, ভোজবিদ্যা, যাদুর খেলা—এসব বই কিনতে হচ্ছে, কি ট্র্যাজেডি বলত! তোমাকে একটু দেখার জন্য কি বোকার মত গচ্চা বলত! বুঝবে না এসব। এক রকম মেয়ে থাকে, হৃদয়-রক্ত-মাংস নেই, মেয়েদের মত একটা মুখোস নিয়ে ঘোরে।

মিনু।। আমাকে তাদের দলে ফেলছ নিশ্চয়ই।

চঞ্চল।। কি করব, কিছু বলতে চাইলেই যে রকম মুখ করতে থাক তুমি। নাকের উপর বসা মাছির মত আঙুল নেড়ে তাড়াতে পারলে বাঁচ!

মিনু।। আমি তাহলে এরকম মেয়ে?

চঞ্চল। হ্যাঁ বললেই তো চটে যাবে। মিষ্টি মত একটা ঝগড়া পর্যন্ত করা যাবে না। দু-রকম মেয়ে থাকে, বুঝলে? একদল রাগ করে সামনে গুম হয়ে বসে থাকে। আস্তে আস্তে রাগ ভাঙাতে দেয়। ডালিমের মত ভেঙে ভেঙে খাবার আনন্দ আছে তাতে। আর একদল রাগলেই ধাঁ করে চলে যায়। তুমি, এই দলের। একটা মাত্র প্রেম অথচ এতো প্রব্লেম না তুমি! পুরো গোলকধাঁধা! সেই গোলকধাম খেলার মত—এখানে আসিলে যমালয়ে পতন।

মিনু।। কেন অলকাপুরীতে গমন নেই, বৈকুণ্ঠধামে গমন নেই?

চঞ্চল।। এই তো সিমপ্যাথেটিক কিছু বলেছ। দিস ইজ্ প্রেম, বুঝলে? সহানুভূতি প্রেমের প্রথম এবং শেষ সিঁড়ি। পরস্পর একটা ইয়ে, মানে তোমার আর আমার হৃদয়টা আস্তে বের করে নিয়ে কড়ির মতো গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা। তারপর দুজনে চলে গেলে হঠাৎ মনে হবে তোমার হৃদয়টা ভুলে আমার মধ্যে আর আমারটা তোমার সঙ্গে। দিস্ ইজ লাভ ব্রাদার, দিস, ইজ্ লাভ।

মিনু।। আমি ব্রাদার?

চঞ্চল।। ঐ হল, দিস ইজ লাভ সিস্টার, দিস ইজ্ লাভ।

মিনু।। আমি সিস্টার? বেশ মনে থাকে যেন।

চঞ্চল।। আবেগ-মুহূর্তের ভুল ভুল নয় হৃৎপিণ্ডেশ্বরী— এবার ব্যাকরণ সুদ্ধ সম্বোধন হল?

মিনু।। তুমি একটা বাচাল হনুমান!

চঞ্চল।। তুমি গালাগালি দিলে যা ভাল লাগে না। নিজেকে পাগ্‌লা-পাগ্‌লা লাগে।

মিনু।। ইয়ার্কি করলে ঠিক চলে যাব।

চঞ্চল ।। চলে যাওয়া ছাড়া তোমার সব ভাল। আমি বিয়ে করলে তোমাকে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগে ভাঁজ করে নিয়ে ঘুরব। আর ঘরে এসে আনন্দে একটা রবারের বলের মত তোমাকে দমাদ্দম দেওয়ালে ছুঁড়ে লুফব। হয়ত এসব কিছুই করব না, মাথাটা খারাপ করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।

মিনু ।। কী আমার ভালবাসার কল্পনা!

চঞ্চল ।। এমন ভালবাসা সুয়েজের এপারে আর পাবে না বলে দিচ্ছি। অনেক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে পাবে, বড় চাকুরে পাবে; আই-এ-এস, ইঞ্জিনিয়ার—না এসব তোমার ক্যালিবারের মেয়ের জুটবে না।

মিনু ।। কি বললে?

চঞ্চল ।। মানে, আসলে তোমার মত মেয়ের একশ বার পাওয়া উচিত। কিন্তু ওদের বাপ-মা তো মেয়ে চেনে না, রূপো চেনে। অথচ আড়াইশ' ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের মুণ্ডু কেটে তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেও তোমাকে দেবী, দেবী লাগবে। কিন্তু আমার মস্তক-ছাড়া ওর লকেট হবে না।

মিনু ।। কি বীভৎস কল্পনা তোমার!

চঞ্চল ।। দেখ ব্রাদার, যত বড় দরের ছেলেই পাও, যদি লেস অ্যামবিশাস, সরল, নির্ভেজাল, নো দালদা বিজনেস, সেন্ট পার্সেন্ট লাভার, খাঁটি মানুষ চাও তাহলে মার্কেটে এখনও এই একটি মহাত্মা রয়েছে।

মিনু ।। কেউ চাইবে না তোমাকে।

চঞ্চল ।। কাউকে চাইতে হবে না, কেবল তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে। আচ্ছা মিনু, একবার তোমার হাতটা একটু ধরব। একবার? আমার হাতটায় একমুহূর্ত তোমার হাতটা রাখলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হবে? তুমি তো হাতটা খাটে রাখছ, চেয়ারে রাখছ, কাপ ধরছ, বেড়াল ধরছ, চিংড়িমাছ ধরছ, আমার হাতটা এসব থেকেও কম দামের? কি ঘেন্নার এমন?

মিনু ।। আজেবাজে কথা বল না তো। মা আসবেন এক্ষুণি।

চঞ্চল ।। (*এগিয়ে এল*) এক সেকেণ্ড, একবার টুক করে একটু হাতটা ধরব। বিশ্বাস কর।

মিনু ।। না, তোমাকে চিনি আমি। পাগলামির জাহাজ!

[*মৃণ্ময়ীর গলা শোনা গেল। "খোকাটা কি পাগল ছেলে বল তো? চা খাব বলে, কোথায় পালালো।" চঞ্চল তাড়াতাড়ি তাসের প্যাকেটটা হাতে নিল*]

চঞ্চল ।। হ্যাঁ, ধর এই তাসটা কেউ নিল, তুমি প্যাকেটের এই অংশের তলার তাসটা দেখে নিলে, চাপা দিলে . . .

[*মৃণ্ময়ী চা নিয়ে ঢুকতেই এগিয়ে চা-টা হাতে নিল চঞ্চল*]

চঞ্চল ।। বুঝলেন মাসিমা, এতো করেও ম্যাজিক মাথায় ঢোকাতে পারলাম না।

মৃণ্ময়ী ।। জানি না আমি! যা তরবড়ে মেয়ে। কিন্তু এখনও ওর বাবা এল না। অফিসের পর একবার বাড়ি না এসে তো ও কোথাও যায়না।

মিনু।। হয়ত কেউ ধরে নিয়ে গেছে। আসবে এক্ষুণি, দেখ।

চঞ্চল।। মেসোমশাইকে কয়েকদিন ধরে কেমন অন্যমনস্ক লাগছে। রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

মিনু।। সেই যে গতবছর স্ট্রোক হয়েছিল, তারপর থেকে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব বাবার সব সময়।'আমাকে বলছিল, একদিন ঘুম ভেঙে হয়তো দেখবি, আমি নেই। এমন করে বলল কথাটা মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

মৃণ্ময়ী।। কি সব বলছিস তোরা। শুনতে ভাল লাগে না! কলকাতা শহর। লোকটা এখনও ফিরল না!

চঞ্চল।। মাসিমা, আমার একজন বন্ধু ডাক্তার আছে, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছে। বললে, ও এসে মেসোমশাইকে অমনি দেখে যাবে।

মৃণ্ময়ী।। ওকি বিনে পয়সায় দেখাবে?

চঞ্চল।। বেশ, যৎসামান্য ফি দেবেন।

মৃণ্ময়ী।। বলব ওকে, তুমি তো আমাদের সংসারের সব খবরই জান। রোগ-ভোগ ঘাড়ের উপর এসে না পড়লে ডাক্তার-কবরেজ আর হয়ে ওঠে না।

[*কাশির শব্দ বাইরে*]

মিনু।। কাশির শব্দ পেলাম, বাবা এসেছেন! কিন্তু এতোশব্দ করে বাবা তো সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন না।

[*মিনু দরজা দিয়ে সিঁড়ির কাছে যেতেই সোমনাথ ঢুকল। খাটে এসে বসল। তারপর উত্তেজিতভাবে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল। তারপর কেমন বিমূঢ়ের মত চেয়ারটায় বসল। চশমাটা খুলে কাচটা মুছে নিল*]

মৃণ্ময়ী।। এতো দেবি হল যে আজ?

সোমনাথ।। মাঠে চুপচাপ বসেছিলাম।

মৃণ্ময়ী।। এদিকে আমরা যে ভেবে মরছি। বাড়ির কথা ভেবেও তো একটু সময়-মত ফিরতে পার। এতোবড় কলকাতায় কতোকিছু ঘটছে।

সোমনাথ।। আচ্ছা, আজকে কি বার বলত?

মৃণ্ময়ী।। কেন, শুক্রবার।

সোমনাথ।। চঞ্চল, সত্যি শুক্রবার?

চঞ্চল।। হ্যাঁ, কাল বিস্যুৎবার ছিল।

সোমনাথ।। মিনু তুইও বলছিস আজ শুক্রবার?

মিনু।। শুক্রবার নয়? কাল বিস্যুৎবারের লক্ষ্মীপুজো হল না।? বাজার থেকে কলা আনতে ভুলে গেছিলে তুমি, মনে আছে? মা বকাবকি করল।

সোমনাথ।। ঠিক আছে, তোমরা যাও। এককাপ চা পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা, সবাই থাক।

মৃণ্ময়ী।। কি হয়েছে তোমার বলত? শেষ বয়সে কি নেশাভাঙ করে ফিরছ। আবোল তাবোল কি বলছ!

চঞ্চল।। আমি বরঞ্চ আজ চলি মেসোমশাই।

সোমনাথ।। বস চঞ্চল। তোমাকেও দরকার হতে পারে। আজ যদি শুক্রবার হয় তাহলে এই গোটা বাড়িটা, বাড়ির মানুষ-জন সকলের ভাগ্য আমি বদলে দেব। সব্বাই মিলে ঘোড়ায় চেপে আমরা রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠব।

মৃণ্ময়ী।। মাথাটা তোমার সত্যি-সত্যিই গেছে। কি হয়েছে তোমার বলত?

সোমনাথ।। কিছু হয়নি, কিচ্ছু না। কেবল আমি কাল শনিবার রেস খেলতে যাব, এ ব্যাপারটা স্থির করে রেখেছি। কিছু টাকা দাও আমাকে, যেমন করে পার।

মৃণ্ময়ী।। আবার রেস! এতো ঠকেও তোমার কাণ্ডজ্ঞান হল না? শেষ বয়সে আবার জুয়ো খেলায় নামবে? ছেলেমেয়েদের সামনে আবার বড় গলা করে এ-কথা বলতে পারলে!

সোমনাথ।। আমি জিতবই। আমি কালকে যে খেলা হবে তার রেজাল্টটা আগে থেকেই জানি। তোমরা বিশ্বাস করবে না, এমন একটা অবস্থায় আমি জেনেছি! অনেকটা অলৌকিক, অবিশ্বাস্য—কিন্তু সত্য, পুরো সত্য। যেমন তোমরা আমার কাছে, এরকম সত্য।

মৃণ্ময়ী।। আগে সুস্থ মাথায় রেস খেলে অনর্থ করেছ এবার মাথা খারাপ নিয়ে খেলে ভরাডুবির ব্যবস্থা করবে? এসব বদ মতলব মাথা থেকে তাড়াও তো! কে এ সব ঢোকাল মাথায়?

সোমনাথ।। তোমরা যতোই বল, আমি খেলবই। আমার কেবল এখন টাকা দরকার। কিছু টাকা চাই। আমি যে ঈশ্বর, তার প্রমাণ দেবার জন্য অন্তত কিছু টাকা চাই। চঞ্চল, তুমি কিছু টাকা যোগাড় করতে পার?

চঞ্চল।। আমি, মানে; আপনি তো আমাদের—

মৃণ্ময়ী।। ও যোগাড় করবে কোত্থেকে?

সোমনাথ।। ঠিক আছে। (*মৃণ্ময়ীকে*) তোমার যা আছে কুড়িয়ে-কাছিয়ে দাও। আমি তার অনেকগুণ বেশি কাল ফেরৎ দেব তোমাকে।

মৃণ্ময়ী।। একটি পয়সা দেব না তোমাকে। আর, কিই বা আছে আমার?

সোমনাথ।। কেন গলার হার, হাতের রুলি দু'গাছা?

মৃণ্ময়ী।। আশ্চর্য! চাইতে পারলে? এতোদূর নেমেছ তুমি! তাও যদি নিজে গড়িয়ে দিতে। বাবা-মায়ের শেষ স্মৃতি এই রুলিজোড়া। আমাকে তা দিতে বল না তুমি। একটা অসুখ বিসুখ করলে কোথায় হাত পাতব? ব্যাঙ্কে তো লাখ লাখ টাকা জমিয়ে রেখেছ!

সোমনাথ।। মিনু, তোর কিছু গয়না আছে?

মৃণ্ময়ী। আবার মেয়ের কাছে হাত পাতছ? এতোবড় জুয়োর নেশা তোমার, ছি! বিয়ের সময় একখানা গয়নাও তো দিতে পারবে না মেয়েকে। যেটুকু আছে তা-ও ডাকাতের মত কাড়তে চাইছ? শত্তুরে যা করে না, বাপ হয়ে তুমি তা-ই করছ! আমার ঘেন্না হচ্ছে, লজ্জা হচ্ছে, ছি ছি ছি!

সোমনাথ।। কি আশ্চর্য, বেবি চকোলেট, ক্রিম সোলজার, ডালিম বিবি—এদের গলায় ঝোলানো আমার কেনা অসংখ্য টিকিটের মালাগুলো যেন সবাই মিলে ছিঁড়ে নিতে চাইছে। তোমরা কিভাবে নিজেদের বঞ্চিত করছ জাননা। তোমরা নিজেদের হাতে পায়ে কুড়ুলের কোপ বসাচ্ছ!

চঞ্চল। মেসোমশাই, আমার হাতের এই ঘড়িটা দিতে পারি। বাঁধা রেখে কিছু পাওয়া যেতে পারে।

মৃণ্ময়ী।। চঞ্চল, তুমি হাতের ঘড়ি খুলবে না। তাছাড়া তুমি দিতেই বা যাবে কেন?

সোমনাথ।। হ্যাঁ, ও দেবে। কোনও ভয় নেই তোমার। ওর টাকা ফিরিয়ে দেবার কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে।

মৃণ্ময়ী।। কোনও বিশ্বাস আর নেই তোমার উপর আমার। যা খুশি তাই কর। এ সংসারর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার।

[*মৃণ্ময়ী চলে গেল*]

সোমনাথ।। দাও, তোমার ঘড়িটা দাও।

[*চঞ্চল খুলে দিল*]

সোমনাথ।। ইউ আর মাই অনলি ফ্রেণ্ড, নাউ। আমার ঘড়িটাও কাজ দেবে। কিছু ধার করতে হবে, অফিসের কারুর কাছ থেকে। ব্যস।

মিনু।। লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কঙ্কণটা দিতে পারি তোমাকে। দেখি, মাকে লুকিয়ে আনতে পারি কিনা।

সোমনাথ।। যদি আনতে পারিস, আমি নেব মিনু। ভয় নেই, সব ফেরত পাবি। বাঁধা রাখব জিনিশগুলো—সব ছাড়িয়ে আনব কালকের খেলা শেষ হলেই। একটা অলৌকিক কাগজ, (*স্বরটা নামিয়ে বলল*) একটা অদ্ভুত ছোট্ট ছেলের কাছ থেকে আমি পেয়ে গেছি। (*দরজাটার কাছে গিয়ে কেউ আসছে কিনা দেখল*) কাউকে বলবি না, যে-ঘোড়াগুলো কাল জিতবে, তার নাম সেই কাগজটায় লেখা আছে। কাকে হারাল, কতোটা দৌড়ল, কেমনভাবে দৌড়ল, সব লেখা আছে। আমি পেয়েছি সেটা। নামগুলো মনে রাখিস, বেবি চকোলেট, ডালিম বিবি, ক্রিম সোলজার, মহারাজ—এরা সব উইনের ঘোড়া। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমুল চিৎকার ভেদ করে কি সুন্দর ভঙ্গিতে ওরা এগুচ্ছে! কি থ্রিল, ভাগ্য নিয়ে কি প্রচণ্ড লোফালুফি খেলা!... টাইগার নিয়ে ব্লেক কবিতা লিখেছে, আমি পারলে ঘোড়ার মনোরম দৌড়নো নিয়ে লিখতাম। কতো শিল্পী ঘোড়ার ছবি এঁকেছে। তাছাড়া হেল্‌দি অ্যানিম্যালস আর মুভিং! দেখার মত, বুঝলে চঞ্চল। কবির মত. দার্শনিকের মত, সুরের সাধকের মত ছুটে চলা খোড়া আর রেসের মাঠ উপভোগ করা যায়।

মিনু।। যদি হঠাৎ তুমি জিততে না পার। কাগজটা যদি মিথ্যে হয়?

সোমনাথ।। অসম্ভব; কিন্তু কেবল আমার সন্দেহ হচ্ছে, আজ শুক্রবার কি না! সবাই মিলে ভুল করছি কিনা!

চঞ্চল।। গ্যারান্টি দিচ্ছি, মেসোমশাই; আজ শুক্রবার। শুক্রবার ছাড়া আজ আর কি হতে পারে? হওয়া সম্ভবই নয়। ক্যালেণ্ডারে দেখুন না—এইতো নাইন্থ জুলাই (*ক্যালেণ্ডারে আঙুল রেখে দেখাল*) শুক্রবার, ফ্রাইডে। ক্যালেণ্ডার তো ভুল নয়।

মিনু।। তাছাড়া কালকে দাদার ইণ্টারভিউ, মনে নেই তোমার? টেনথ জুলাই, শনিবার। কাল যদি শনিবার আজকে তাহলে শুক্রবার।

সোমনাথ।। খোকা আছে?

চঞ্চল।। এইতো টিউশনিতে বেরুল।

সোমনাথ।। থাকলে কনফার্মড্ হওয়া যেত।

চঞ্চল।। কোন সন্দেহ রাখবেন না মেসোমশাই! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আজ শুক্রবার। শুক্রবার না হলে, কি বলব?—আপনি আমার হাত কেটে ফেলবেন।

সোমনাথ।। যদি শুক্রবার হয় আজ, তাহলে চঞ্চল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই ঘরবাড়ি সব পাল্টে যাচ্ছে। একটা ভরটেক্স অফ ভাইব্রেশনের মধ্যে আমি সাঁতার কাটছি। ভাইব্রেশনই সব মিনু। ঝিমিয়ে পড়লেই শেষ। ছোটবেলায় সেই যে একটা নীল রঙের ঘোড়ার স্বপ্ন দেখতাম। সেই ঘোড়াটা যেন সবল পা ফেলে ছুটে আসছে . . . সমস্ত জড়তা নড়ে উঠছে . . . একটা সম্রাটের সিংহাসন পিঠে নিয়ে আমার সেই নীল রঙের ঘোড়াটা দেবদূতের মত পা ফেলে ফেলে আসছে . . . তলোয়ারের মত ঝকঝকে ঘাড়, গায়ে রোদ আয়নার মত ঠিকরোচ্ছে . . . একটা সুন্দর নীল বিরাট অতিকায় ফুলের মত ভাসছে ঘোড়াটা। আমি ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, তোরা পাচ্ছিস? পাবি না, আমি পাই।

[*আস্তে আস্তে এগিয়ে জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকাল সোমনাথ। বিমূঢ়ের মত মিনু আর চঞ্চল পরস্পরের দিকে তাকাল। দরজার কাছে গম্ভীর মুখে চা আব খাবার নিয়ে মৃণ্ময়ী এসে দাঁড়াল*]

মৃণ্ময়ী।। (*ওখান থেকেই*) মিনু, চা খাবারটা দিয়ে আয়।

[*মিনু চা-খাবার এনে টেবিলে রাখল*]

মিনু।। বাবা, খেয়ে নাও এটা।

[*কোন সাড়া দিল না সোমনাথ*]

মৃণ্ময়ী।। কি, কানে কি ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছাড়া কিছু যাচ্ছে না? ওটা কি খাবে না ঠাণ্ডা হবে পড়ে পড়ে?

[*উত্তর এল না*]

চঞ্চল।। মেসোমশাই খাবার দিয়েছে'

[*উত্তর এল না। একসময় আস্তে আস্তে শিক থেকে সোমনাথের হাত দুটো শিথিল হয়ে খসে পড়ল, মাথাটা ঝুলে পড়ল। ওরা ছুটে গেল ওদিকে*]

মৃণ্ময়ী।। কি হল, কি হল তোমার।

মিনু।। বাবা! বাবা!

চঞ্চল।। মেসোমশাই!

মৃণ্ময়ী।। বোধহয় সব শেষ হয়ে গেল রে, মিনু!

চঞ্চল।। একজন ডাক্তার—

[*ছুটে বেরিয়ে গেল*]

মিনু।। কথা বল, কথা বল না, বাবা।

[*খাটে ধরে এনে শোয়াল। মিনু হাওয়া দিল মাথায়। আস্তে আস্তে উঠে বসল সোমনাথ। ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল।*]

মিনু।। তুমি শুয়ে ঘুমোও। জামাটা খুলে দি।

[জামা খুলে, চোখ থেকে চশমাটা সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সোমনাথ]

সোমনাথ।। মিনু, মিনু, ক্যালেণ্ডারটা কে নিয়ে নিল দেয়াল থেকে! নেই, দেখতে পাচ্ছি না।

মৃণ্ময়ী।। ক্যালেণ্ডার কেউ নেয়নি, মিনু তোমার চোখ থেকে চশমা খুলে রেখেছে।

সোমনাথ।। না, চশমা পরিয়ে দাও। ক্যালেণ্ডারটা দেখব আমি।

[চশমা চোখে দিল]

মিনু।। শুয়ে পড়, কিছু হয়নি তোমার বাবা।

[মিনু উঠে আলোটা ডিম করে দিল। সোমনাথের গলা শোনা যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে]

সোমনাথ।। সেই নীল রঙের ঘোড়াটা মিনু দেবদূতের মত পা ফেলে ফেলে সম্রাটের সিংহাসন পিঠে নিয়ে আসছে। সুহাস ওর লাগাম ধরে টানছে, পর্ণা ডাকছে আমাকে, মৃণ্ময়ী ডাকছে আমাকে, মিনু চিউইংগাম খাচ্ছে, মিনু-চঞ্চল ঘোড়াটাকে চন্দন দিয়ে সাজাচ্ছে! কিন্তু খোকা? খোকা কোথায়?

মৃণ্ময়ী।। খোকা ফিরবে এক্ষুণি।

সোমনাথ।। তোমরা সকলে আমার চারপাশে থেক। নীল রঙের ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে যাবে। আমার মুকুটে হীরে, মুঠোয় সোনা, জামায় আতর, পায়ে জরির জুতো। একটা বাগানের মধ্যে ঘুমোব। ফুলেরা গান জানে না কেন? ফুলেরা কথা জানে না কেন? ফুলগুলো কাকে খুঁজছে? এইতো এইতো, আমি। আড়াই লক্ষ ফুল আমার ঘোড়াটার লাগাম ধরে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তোমরা ধর! সবাই মিলে ধর।

[অন্ধকার]

তৃতীয় দৃশ্য

[আগের দৃশ্যের ঘরটি। বিমল খাটে শুয়ে কাগজ পড়ছে। মৃণ্ময়ী খাটের এক কোণে বসে। মিনু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।]

মৃণ্ময়ী।। কি, আসতে দেখছিস ওকে?

মিনু।। উঁহু।

বিমল।। বারবার বারণ করেছিলাম তোমাদের, বেরুতে দিও না বাবাকে। ডাক্তার পর্যন্ত বারণ করে গেছে। রেসের মাঠের ঐ এক্‌সাইটমেণ্টের মধ্যে যেতে দিলে বাবাকে! কিছু একটা হয়ে গেলে?

মৃণ্ময়ী।। এই বয়সের মানুষ যদি বারণ না শোনে কি করব? নিজেরা বাড়িতে থাকলেই পারতিস।

বিমল।। ইন্‌টারভিউ ছিল যে আমার!

মৃণ্ময়ী।। নিজেরা নিজেদের কাছে থাকবেন, আর একা মেয়েমানুষ আমি যতো চোট সামলাব। অতোসব পেরে উঠি না বাপু আমি। বুড়ো মানুষটার যদি মতিচ্ছন্ন হয়, কারুর কথা না শুনে গোঁয়ার্তুমি করে চলে, তাকে ঠেকাবে কে?

মিনু।। মা, একটা ট্যাক্সি থামল দরজায়। বাবা নামছেন।

বিমল।। ট্যাক্সি থেকে নামছে, নিশ্চিত জিতেছে। হিপ্ হিপ্ হুররে!

[*কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ল*]

মৃণ্ময়ী।। শরীর-টরির খারাপ দেখাচ্ছে না তো?

মিনু।। একটা বিরাট ঠোঙা নিয়ে আসছে।

বিমল।। মা, মাগো, তড়াং করে যদি ঘোড়াগুলো লেগে গিয়ে থাকে না! ফিরে গেল আমাদের কপাল। কেন যে টাকাপয়সা সব জড়ো করে দিলে না বাবাকে! হিয়ার কাম্‌স্ মাই ফাদার, দি ফিউচার কিঙ্। দি টায়ার্ড ম্যাজিসিয়ান উইথ দি গোল্ডেন ওয়ান্ড!

মৃণ্ময়ী।। থাম তো, ওরকম চেঁচাস না, লোকটাকে আসতে দে আগে।

[*ঘরে ঢুকল সোমনাথ। বুকে জড়ানো একটা লম্বা ব্রাউন কাগজের ঠোঙা। চোখমুখ উত্তেজিত, যেন অন্য কোন দেশের হাওয়া চোখে মুখে*]

সোমনাথ।। বলেছিলাম না, যার যা আছে দাও। তোমার গয়নাগুলো দিলে তার কয়েকগুণ এনে দিতাম। চঞ্চল কোথায়? ওর ঘড়ি ছাড়িয়ে এনেছি। এই নে মিনু তোর কঙ্কণ। (*টেবিলে ঘড়ি আর কঙ্কণ রাখল*) ছাড়িয়ে এনেছি। ঠোঙায় ফল আছে, খাবার আছে। সব খাও, খেতে আরম্ভ কর, ছড়াও, ছুঁড়ে দাও! তোমাদের সন্দেহ ছিল কিন্তু ঘোড়াগুলো জিতেছে। জিতবেই আমি জানতাম।

বিমল।। সবগুলো জিতেছে?

সোমনাথ।। সব, সবকটা ঘোড়া জিতেছে। ডালিম বিবি কয়েক ফার্লং পিছিয়ে ছিল, ছুটে এসে ঠিক নেকে মেরে দিল। ওটাই আমার প্রথম হিট্—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস এসে গেল। তারপর ক্রিম সোলজার—আগাগোড়া রাজার মত দৌড়ে এল। কি একসাইট্‌মেণ্ট চারদিকে। কিন্তু ওরা দুটো উইন করার পরেই আমি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। মনে হল সব জানা, এর পরে কি হবে সব আমার জানা। কিছু টাকা জিতব, আমার এ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি তো কেবল টাকা জিততে যাই নি।

মৃণ্ময়ী।। টাকা জেতা ছাড়া আর কিইবা থাকবে?

সোমনাথ।। অনেক, অনেক কিছু,—আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না। আমি কেমন হতাশ হয়ে গেলাম। কেমন যেন সিংহাসনে বসেও ভিখিরি-ভিখিরি লাগছিল। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। নিজের মুখের মধ্যে জিভটা এতো তেতো লাগছিল। চারদিকটা এতো অর্থহীন, মানুষের লোভের, লোকসানের চিৎকার এতো ভালগার, উল্লাস এতো ডিসটার্বিং। না, আর না—এ খেলা আর নয়।

মিনু।। আমি তোমার সঙ্গে গেলে বেশ মজা হত, না বাবা?

[*ঠোঙার ভিতর থেকে একটা ফল বের করে মিনু খেল। বিমলকে একটা দিল*]

মৃণ্ময়ী।। ধুয়ে খেলি না! এতো নোংরা তোরা!

মিনু॥ শাড়িতে মুছে নিলুম না বেশ করে।

বিমল॥ আচ্ছা, বাবা, একটা কাজ কর না। তোমার যখন খেলতে খারাপ লাগে তুমি আমাকে পাঠাও। যেখান থেকে সেই কাগজটা তুমি পাও আমাকে নিয়ে যেও সেখানে। তুমি বাড়ি বসে থাকবে, আমি খেলব।

সোমনাথ॥ সে জায়গায় আমিই হঠাৎ গিয়ে পড়ি, হঠাৎ চিনে ফেলি জায়গাটা, মানুষগুলো। সেখানকার রাস্তার কোন নাম নেই, চারপাশে চেনা বাড়ি নেই, লাইট-পোস্ট নেই, পিওন নেই, ডাকঘর নেই, মাঠ নেই, গাছ নেই—কয়েকটা কালো দেওয়ালঘেরা একটা ঘর, কয়েকটা অর্ধসত্য মানুষ এসে যায় সেখানে। আমি মনে মনে তাদের নিয়ে গল্প বানাই, একটা অদ্ভুত খেলা খেলি। সেখানে হঠাৎ দরজা ঠেলে সেই বাচ্চা ছেলেটা ঢুকে প'ড়েই 'কাগজ কাগজ' বলে চেঁচাতে থাকে। আমি ছাড়া কেউ শোনে না, দেখে না, বোঝে না।

মৃণ্ময়ী॥ তোমার কথা শুনে কেউ বলবে না যে তোমার মাথা একটুও ঠিক আছে।

সোমনাথ॥ (*পকেট থেকে কয়েকটা নোটের বাণ্ডিল খাটে ছুঁড়ে দিয়ে*) কিন্তু যখন এভাবে টাকা বের করে দেব ; তখন? তখন বিশ্বাস হবে না যে একটা সুস্থ মাথায় খেলে দারুণ জিতে এসব উপার্জন করেছি? আমার কথাটায় তোমার এখন ভরসা আসছে না? টাকা সব প্রমাণ করে, করছে না?

মৃণ্ময়ী॥ এতো টাকা জিতেছ! দেখ খোকা, আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। খেলে জিতেছ তো?

সোমনাথ॥ তবে কি চুরি-ডাকাতি করেছি?

মিনু॥ বাপরে কতো টাকা, কী ভাল লাগছে।

বিমল॥ অতো চেঁচাস না, চারপাশের লোক জানলে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে দেবে। টাকার উপর সবচেয়ে বেশি মাছি এসে পড়ে। যা বাবাকে চা-টা এনে দে।

মৃণ্ময়ী॥ এ রকম যদি তুমি সত্যি সত্যি সব খেলায় জেত, তাহলে তো একটা মাসের মধ্যে ধনী হয়ে যাব আমরা। নাও বাপু, খুলে দিচ্ছি আমার হার-চুড়ি, যা খুশি কর তুমি।

সোমনাথ॥ এখন থাক। ভাল লাগছে না আমার। রহস্যশূন্য এই খেলাটা আমার আর ভাল লাগছে না।

বিমল॥ কি আশ্চর্য, বাবা তুমি বুঝতে পারছ না! আমার চাকরি নেই। মিনুটার ঘটা করে একটা বিয়ে দিতে হবে। বিজনেস অর্গানাইজেশন পড়ার একটা সুযোগ হয়ে যেতে পারে, গ্লাসগোতে দু'তিন বছর থেকে, কোর্সটা করে এলে—। এই নোংরা হতচ্ছাড়া বাড়িটা, কালকেই পাল্টে ফেলব।

[*চঞ্চল ঢুকল*]

বিমল॥ চঞ্চল, বাবা সবগুলোয় জিতেছে। খাওনা, ফল আছে, খাবার আছে। এ বাড়িটা কালকেই ছাড়ব। খুঁজে দাও তো একটা বাড়ি। এরকম কয়েকটা দাও মারতে পারলে না—গ্লাসগো যাওয়া কে আটকায়? মিনুর ছবি আঁকার হাত ছিল, আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে যাক। মা তীর্থগুলো ঘুরে আসবে।

সোমনাথ॥ চঞ্চল, তোমার ঘড়িটা এনেছি। শুধু ঘড়ি না, ঘড়ির শেয়ার কিছু টাকাও তুমি পাবে।

চঞ্চল ।। কি বলছেন মেসোমশাই, ঘড়িটা দিয়েছিলাম, নিয়ে নিলুম ব্যস।

সোমনাথ ।। না, টাকা তোমাকে কিছু নিতেই হবে, তোমার প্রাপ্য।

চঞ্চল ।। নিতে আমার খুব খারাপ লাগবে!

সোমনাথ ।। কেন খারাপ লাগবে? তোমার শেয়ার ছিল।

মৃণ্ময়ী ।। ও যদি সংকোচ করে, তুমি জোর করবে?

সোমনাথ ।। করব।

মিনু ।। বাবা বলছেন, নিয়ে নিও কিছু।

বিমল ।। আরে বাবা, সংকোচ-ফংকোচ বাজে জিনিশ, কিছু প্রাপ্য তো তোমার জেনুইন ক্লেম। ঠিক আছে, চঞ্চলকে আমি বুঝিয়ে দেব।

চঞ্চল ।। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছিল আপনার, তাই না মেসোমশাই? এক একটা জিতছে আর মিলে যাওয়ার দারুণ আনন্দ হচ্ছিল আপনার, না?

বিমল ।। তা হবে না!

মিনু ।। আমি হলে হার্টফেল করতুম।

চঞ্চল ।। কিন্তু বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে মেসোমশাই।

মৃণ্ময়ী ।। তুমি কিছু একটা খেয়ে, শুয়ে একটু বিশ্রাম কর না।

মিনু ।। ও ঘরে বিছানা করে দেব?

সোমনাথ ।। নারে, দরকার নেই।

মৃণ্ময়ী ।। আচ্ছা, কাল তুমি যখন দুর্বল হয়ে পড়লে কাদের সব নাম করছিলে— পর্ণা, সুহাস। কে ওরা?

সোমনাথ ।। ওরা আমার মনে মনে খেলার সেই ঘরটার চরিত্র। যেখানে বাচ্চা ছেলেটা কাগজ নিয়ে এসেছিল।

মৃণ্ময়ী ।। ওরা কে হয় তোমার?

সোমনাথ ।। কেউ না। ওরা সব কুড়ি বছর আগের ঘোড়া, অনেক আগে ভাল দৌড়ত, এখনও হয়ত কেউ কেউ ছুটছে, কারুর পা খোঁড়া হয়েছে, কেউ কাছে গেলেই লাথি ছোঁড়ে, কেউ কেউ অবশ হয়ে গেছে।

মৃণ্ময়ী ।। এমনভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল। আসলে সব কথা তুমি আমাদের বলতে চাও না।

[*চঞ্চল ঘড়িটা পরে নিল*]

চঞ্চল ।। আমার ঘড়িটা বেশ পয়া আছে, মেসোমশাই। আবার যখন খেলবেন, এটা নিয়ে যাবেন।

সোমনাথ ।। আমি আর খেলতে চাই না, চঞ্চল। একটু পরেই কেমন রহস্য ফুরিয়ে যায়। আগে থেকে জেনে ফেলা সব চাইতে বড় অভিশাপ। মাথায় সোনার মুকুট পরে ভিক্ষে করার মত করুণ অসহায় লাগে।

চঞ্চল ।। খারাপ লাগলে খেলবেন না।

মৃণ্ময়ী ।। ভাল বুদ্ধি দিচ্ছ তোমরা। এ রকম সুযোগ থাকলে কোন্ বোকা লোক খেলে না? রোজ-রোজ অফিস না দৌড়ে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে সপ্তাহে এভাবে একদিন করে খেললেই ভাল। বিশ্রামে বিশ্রাম, টাকায় টাকা।

মিনু।। যদি সেই কাগজটা না পায়!

মৃণ্ময়ী।। পাবে না কেন? ও চেষ্টা করলে ঠিক পাবে। নিজের সংসারের ভালমন্দ অ্যাদ্দিন ধরে ভেবে চুল পাকিয়ে ফেলল, জোয়াল কাঁধে দিন কাটাল, আর আজ সংসারের এতোবড় একটা সুদিন দেখা দিলে ওকি আর এতো সহজে ফিরিয়ে দিতে পারে? সংসার করলে বুঝতে এটা কতোবড় মায়ার ফাঁদ।

সোমনাথ।। খোকা, ইন্টারভিউ কেমন দিয়েছিস?

বিমল।। ও ছেড়ে দাও, হয়েছে একরকম।

সোমনাথ।। ভাল দাওনি তাহলে?

বিমল।। ও সব জঘন্য মাইনের চাকরি পেলেই বা কি না পেলেই বা কি।

সোমনাথ।। কিন্তু এক এক সময় নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগে! তুই টিউশনি গেলি না?

বিমল।। ত্রিশ টাকার টিউশনি, ধ্যাৎ। কি হবে গিয়ে?

সোমনাথ।। কিন্তু আমার উপর খুব ভরসা কর না তোমরা। ভিতরে ভিতরে বড় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি আমি। এক এক সময় কার উপর জানি না প্রচণ্ড রাগ হয়। কাঁধে যেন একটা ভারি বোঝা বইছি! বুকের মধ্যে একটা দানো যেন হাঁপাচ্ছে, কষ্টে না সুখে না উত্তেজনায়, বুঝি না। হাত শক্ত করে মুঠো করতে ভয় করে, মনে হয় শব্দ করে মুঠোর মধ্যে একটা বোমা ফেটে যাবে।

বিমল।। তুমি রেস্ট নাও তো! ঠিক আছে, আমি টিউশনি থেকে ঘুরে আসছি।

[*বিমল চলে গেল*]

সোমনাথ।। আমি যখন ট্যাক্সি করে আসছিলাম, প্রথমে বেশ লাগছিল। তারপর বুঝলি মিনু, পথের দুপাশ, ঘর-বাড়ি, গাছপালা, মানুষ, শব্দ, হৈচৈ সব কেমন ভৌতিক লাগছিল। যেন প্রচণ্ড প্রয়োজনের নেশায় সবকিছুর আত্মা বিক্রী হয়ে গেছে। যেন সব্বাই আমরা চাবি-দেওয়া পুতুল। যেন কেউ একটা প্রকাণ্ড বেলুন ফোলাচ্ছে আর তার গায়ে আমরা আঁকা, ছাপ দেওয়া। ভয়ে আমি চোখ বুঁজে ছিলাম—যে কোনও মুহূর্তে ফেটে যেতে পারি।

মৃণ্ময়ী।। ও ঘরে চল তো, তোমার বিছানাটা পেতে দি। একটু গড়িয়ে নেবে। চল, যেতে হবে তোমাকে।

[*সোমনাথকে নিয়ে মৃণ্ময়ী চলে গেল*]

মিনু।। তুমি অতো গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

চঞ্চল।। মিনু, তোমরা দুদিন বাদে হয়ত সত্যি সত্যি ধনী হয়ে যাবে।

মিনু।। যাবই তো। হিংসে হচ্ছে?

চঞ্চল।। দুঃখ হচ্ছে।

মিনু।। কেন? তোমার দেখছি সবই উদ্ভট।

চঞ্চল।। তোমাদের বিরাট আনন্দ আর লাভের মধ্যে দু'জন খুব ঠকে যাচ্ছে।

মিনু।। কে কে?

চঞ্চল।। আমি ঠিকই ভাবি। মেসোমশাই একটা কেমন অদ্ভুত জগতে চলে গেছেন। ওঁর কথাবার্তা, হাবভাব, কাজ, সব কিছু যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছে। আমি বুঝি না, হয়ত তোমরাও বোঝ না! তোমাদের ঘরের এই শান্ত নির্জন মানুষটাকে চিরকাল

আমার বড় দূরের মনে হত। আজ যেন আরও দূরে চলে গেছেন। তোমাদের কাছে চলছেন, ফিরছেন, তোমাদের জন্য ভাবছেন—কিন্তু তবু যেন অনেক দূরের কোনও গাড়ি চেপে উনি চলে যাচ্ছেন। একটুও টের পাচ্ছ না তোমরা।

মিনু।। এতো প্যাঁচোয়া করে ভাব তুমি। সব কিছু কবিত্ব করে ভাব বলেই সমস্যা। মাঠে একটা উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন, বয়স হয়েছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এতে অতো আবেগ দিয়ে, গলা করুণ করে ভাষণ দেবার কি আছে? বাবাই বা ঠকছেন কোথায়? তুমিই বা ঠকলে কিসে?

চঞ্চল।। ঠিক আছে, তুমি বুঝতে চাইছ না। টাকার চুম্বকে তুমিও ধরা পড়েছ। তোমার মধ্যে সবটাই সোনা ভাবতুম, দেখছি লোহা। চুম্বক এলেই খট্ করে ছুটে যাচ্ছে।

মিনু।। তোমার জেনে রাখাই ভাল—টাকায় আমার বিতৃষ্ণা নেই। অনেকদিন টাকার কষ্টে ভুগেছি। ঝলমলে পৃথিবীটার মধ্যে ছেঁড়া পোশাকে লুকিয়ে চলায় কোন গৌরব পাই না আমি। আমি ধনী হতে চাই, হলে ভালবাসি। টাকার বৃষ্টিতে চান করে আরাম পাই। তাই বলে তাতে আমি নষ্ট হয়ে যাব না। টাকা পেলেও মানুষ মানুষ থাকে—এটুকু মনের জোর আমার আছে। তোমার মত দুর্বল নই আমি।

চঞ্চল।। তোমাকে বিয়ে করলে তাহলে তোমাব ক্ষোভ থাকত আমি দরিদ্র বলে।

মিনু।। আমাকে যদি সরল হতে দাও, থাকত। তুমি ধনী হলে আমি খুশি হতাম, তা মিথ্যে নয়। তাই বলে তোমার তেমন টাকা নেই বলে দিনরাত তোমাকে খোঁচাব, জ্বালাব, কষ্ট দেব এতোটা ছোট আমি নই। নিজের মুখ মনের মত না হলেও এতো আপন আর কার মুখ লাগে? তুমিও যতো অভাবেই থাক, আমার আপন থাকবে।

চঞ্চল।। তোমার এই বড় মনটা কতোদিন বাঁচবে অভাবের মধ্যে, আমার সংশয় আছে। তাছাড়া দুদিন বাদেই আমাদের পাড়া ছেড়ে তোমরা হয়ত নিউ আলিপুর বা ওরকম কোথাও উঠে যাবে। রোজ অদ্দুর যাবার মতো পয়সা পর্যন্ত নেই আমার।

মিনু।। তোমার দু'পকেট ভরে আমি দেব।

চঞ্চল।। সারা জীবন?

মিনু।। কেন, সারা জীবন কেন?

চঞ্চল।। শুনে নিচ্ছিলাম আমার যন্ত্রণার আয়ু কতদিন।

মিনু।। তুমি এতো অদ্ভুত লোক না, নিজের ভাবনায় কষ্ট পাও। অকারণ। তুমি আমাকে ভাল করে চিনতে পারনি অ্যাদ্দিনে। তুমি কোনদিন ভালবাসনি হয়ত আমাকে, ভালবাসলে বুঝতে।

চঞ্চল।। আমিও এরকম কিছু ভাবছিলাম।

মিনু।। কি ভাবছিলে?

চঞ্চল।। ভাবছিলাম জীবনে নানারকম ঘটনার প্রয়োজন আছে, পরস্পরকে বুঝে নিতে।

মিনু।। এটা তুমি আজ বুঝলে?

চঞ্চল।। উপলব্ধি করলাম, অভিজ্ঞতায় পাকা হল।

মিনু।। আমি অনেক আগেই জানতাম। তবে তোমার আর আমার জানায় পার্থক্য আছে। তুমি আজ জানলে, হঠাৎ অবস্থার বদলে আমি পাল্টে যেতে পারি। আর আমি

জেনেছি, যে কোন অবস্থার বদলে আমি পাল্টাই না, চারপাশটা বদলায়। আমার ভিতরের মানুষটা ঠিক থাকে। চারদিকটা বদলে গিয়ে সুখের হলে আমি তা চাইব না কেন? দুঃখ নিয়ে কবিত্ব আমার আসে না।

চঞ্চল।। যুক্তিতে তোমার জিৎ, কথায় তোমার জিৎ, কিন্তু কোথায় যেন একটা দূরত্ব আসছে, একটা সংকোচ—

মিনু।। সব তোমার বানানো।

চঞ্চল।। কিন্তু আমার ভয় করে মিনু। সমস্ত পৃথিবীটায় আমি তেমন কোন সুখ দেখিনি, আলো দেখিনি, ঐশ্বর্য দেখিনি। তুমি ছাড়া, কেবল তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তাই তুমি একটু নড়ে উঠলেই আমার ভিতরে ভূমিকম্পের ভয় হয়।

[*টেবিলের উপর মাথা নিচু করল চঞ্চল। ওর চুলের মধ্যে হাত রাখল মিনু*]

মিনু।। এই পাগল! কি হচ্ছে! আমার এই যে হাতটা তোমার মাথায় এটা কি বড়লোক?

চঞ্চল।। (*তাকিয়ে*) যদি বদলে যায়!

মিনু।। যাবে না।

চঞ্চল।। যদি যায়?

মিনু।। তোমার কষ্ট কেউ কমাতে পারবে না। যদি বদলে যায় তুমি চলে যেও, অভিসম্পাত ক'র।

চঞ্চল।। এতো সহজে সব শেষ হবে? এতো সহজে তোমার দায়িত্ব শেষ হবে?

মিনু।। হ্যাঁ, হবে। যদি জোর করে এসব ভাব, হবে।

[*মিনু জানালার কাছে চলে এল। তাকিয়ে থেকে হঠাৎ যেন চমকে উঠল*]

মিনু।। কি ব্যাপার, এস দেখবে এস—(*চঞ্চল গেল ওর কাছে*) বাবা কেমন অদ্ভুতভাবে রাস্তায় নেমে চারদিকে তাকাচ্ছেন। কিভাবে হেঁটে চলে যাচ্ছেন দেখ! বোধহয় স্বপ্নের মধ্যে মানুষ ওরকম হাঁটে। তুমি একবার যাও না।

চঞ্চল।। যাব?

মিনু।। যাও। শিগগির যাও।

[*চঞ্চল চলে গেল*]

মিনু।। মা! মা!

[*মৃণ্ময়ী ঢুকলেন। কেমন থমথমে মুখটা, কিছুটা রহস্যময়*]

মিনু।। বাবাকে যে বেরিয়ে যেতে দেখলাম মা! কিরকম লাগছিল বাবাকে!

মৃণ্ময়ী।। বারণ করলুম, শুনল না, বললেন, ঘরে দমবন্ধ হয়ে আসছে, একটু বাইরে গিয়েই ঘুরেফিরে আসবে।

মিনু।। কিন্তু শরীর যে খারাপ ছিল। আমি না হয় সঙ্গে যেতাম।

মৃণ্ময়ী। ওঁর একা যাওয়াই ভাল।

মিনু।। কেন?

মৃণ্ময়ী।। সব ব্যাপারে অতো কেন কেন করিস না।

[মৃণ্ময়ী চলে যাচ্ছিল]

মিনু।। মা!

[ফিরল মৃণ্ময়ী]

মিনু।। মা, বাবা কোথায় গেল? তোমাকেও কেমন অদ্ভুত লাগছে।

মৃণ্ময়ী।। ওর সঙ্গে ইচ্ছে করেই আমি কাউকে পাঠাই নি।

মিনু।। আমি চঞ্চলদাকে পাঠালুম।

মৃণ্ময়ী।। ভুল করেছিস। সব ব্যাপারে বুদ্ধিমানী করতে গিয়ে সর্বনাশ করিস তোরা।

মিনু।। কি সর্বনাশ করলুম?

মৃণ্ময়ী।। ওর একা থাকাই ভাল ছিল।

মিনু।। কেন?

মিণ্ময়ী।। ও শুয়ে শুয়ে কতগুলো ঘোড়ার নাম করছিল। তারপর বলল সেই বাচ্চা ছেলেটা যেন তাকে ডাকছে। সেই কাগজওয়ালা ছেলেটা। তারপরেই বেরুতে চাইল। আমি ভাবলুম, এক্ষুণি না গেলে যদি কাগজটা না পায়।

মিনু।। কিন্তু বাবাকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। যেন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। পথে এতো গাড়ি-ঘোড়া।

মৃণ্ময়ী।। বললেন—কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। রিক্সা করে যাবে।

*[বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।
মিনু জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল]*

মৃণ্ময়ী।। কি হল রে রাস্তায়?

মিনু।। মা, বাবাকে ঘিরে একটা ভিড়।

মৃণ্ময়ী।। কি বলছিস?

মিনু।। হ্যাঁ, বাবা একটা বাচ্চা ছেলের কান ধরে বোধহয় চড় মারলেন। চঞ্চলদা, বাবাকে ধরে আনছে। বললুম, না বেরোনই ভাল ছিল।

মৃণ্ময়ী।। কে ছেলেটা?

মিনু।। কি করে বুঝব? বাবা এতো রাগতো না কোনো কালে। কাউকে মারার কথা ভাবতেনই না।

*[চঞ্চল এবং সোমনাথ ঢুকল। সোমানাথের
কপালে ঘাম। চোখে চশমা নেই।
কিছুটা শ্রান্ত]*

মৃণ্ময়ী।। ছেলেটা কে? কি হল?

চঞ্চল।। পকেটমার-টার হবে?

মিনু।। পকেট মেরেছিল বুঝি।

সোমনাথ।। কিছু করেনি। আমি যতো হাঁটছি, ছেলেটা আমার পিছে পিছে আসছিল। পকেট ধরে টানল একবার। তাকাতেই মনে হল, আমাকে সেই অদ্ভুত কাগজটা দেয় যে ছেলেটা অনেকটা তার মতো দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সেই ছেলেটাকে আমি মনে মনে এতো ভয় করি জানতাম না। ওর কানটা ধরে চড় মারতে

গেলাম, ভিড় জমে গেল। ছেলেটাকে ধরে নিয়ে আসছিলাম। চঞ্চল ওকে সরিয়ে দিল।

চঞ্চল।। মেসোমশাই, আপনি স্থির হয়ে একটু বসুন।

মিনু।। যা ঘেমেছ, জামাটা খুলে দিচ্ছি আমি।

[*জামার বোতাম খুলতে লাগল*]

সোমনাথ।। কিন্তু মিনু আমার যেন কি একটা নেই। কি যেন চুরি গেছে। চশমা, আমার চশমা নেই তো চোখে।

মৃণ্ময়ী।। ভিড়ের মধ্যে কখন পড়ে গেছে। চোখ থেকে আর কে চুরি করবে?

সোমনাথ।। না-না, চুরি। তোমরা বুঝতে পারছ না। বহুকাল থেকে আমার অনেক কিছু চুরি যাচ্ছে। আজ আমার দৃষ্টির খানিকটা চুরি গেছে, বুঝলে, আমার দৃষ্টির খানিকটা চুরি গেছে। এরপর আমার হাত, পা, মন, আত্মা সব চুরি যাবে!

মিনু।। আলোটা কমিয়ে দি, তুমি এখানে ঘুমোও।

সোমনাথ।। আমার দৃষ্টির খানিকটা চুরি গেছে!

[*আলোটা কমিয়ে দিল*]

[ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়]

চতুর্থ দৃশ্য

[অত্যন্ত সুদৃশ্য ধনী পরিবারের একটি কোঠা। মার্জিত রুচির টেবিলে ফোন। সোফা। লম্বা ধরণের মাদুরের ক্যালেণ্ডারে ধাবমান ঘোড়ার ছবি। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত একটি দেয়ালঘড়ি। সুতোর কাজ করা একটি শৌখিন ঢাকনা রেডিওর উপর। সোমনাথ সোফায় বসে চুরুট খাচ্ছে। তার পোশাক অভিজাত। ফোন বেজে উঠল। পরেশ, এ-বাড়ির নতুন চাকর। সে ঢুকল।]

পরেশ।। বাবু, ফোন বাজছে।

সোমনাথ।। হুঁ।

পরেশ।। ধরবেন না?

সোমনাথ।। তুই ধর।

[*পরেশ রিসিভার তুলল। সোমনাথ চুরুটের ধোঁয়া মুখের চারপাশে একরাশ ছাড়ল*]

পরেশ।। হ্যালো। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিদিমণি আছেন। ডেকে দিচ্ছি, ধরে রাখুন।

[*ফোন টেবিলে কাত করে রাখল*]

পরেশ।। দিদিমণিকে ডাকছে।

সোমনাথ।। ডেকে দাও।

[*পরেশ চলে যেতে মিনু ঢুকল। প্রচুর সেজেছে। কোথাও বেরুবে। ফোন তুলল*]

মিনু।। ও, আপনি ? এক্ষুনি বেরুচ্ছি যে মায়ের সঙ্গে। একটু দরকারি কেনাকাটা

আছে। বার্থ-ডে পার্টি? কবে, রবিবার? আজ তো শুক্রবার। নিশ্চয়ই যাব। দেখেছেন, আমাকে কিচ্ছু বলেনি।. . . যা আড্ডাবাজ মেয়ে না ও।. . . হ্যাঁ, আমি যা লক্ষ্মী মেয়ে জানা আছে—কম টো-টো করছি। পরীক্ষা যা হবে না? আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি, কেমন? নিশ্চয়ই যাব। না, না (*হেসে উঠল*) বাব্বা! যা লোক না আপনি? (*হেসে উঠল জোরে*) রেখে দিচ্ছি।

[*ফোন রেখে সোমনাথের পাশটায় এসে আদুরে ভঙ্গিতে ধপ্ করে বসল*]

মিনু॥ (*চেঁচিয়ে*) মা, আমি বাবার কাছে, তোমার হলে ডেকো। (*সোমনাথের দিকে তাকিয়ে*) রীণার ছোড়দা ফোন করেছিল। রবিবার রীণার জন্মদিন। রীণার ছোড়দা বীরেশবাবুকে দেখনি তুমি? সেদিন এসেছিল বাড়িতে, মার জন্য ওষুধ লিখে দিয়েছেন অনেক। যা আমুদে লোক না। ডাক্তারদের এতো আমুদে দেখিনি কোনকালে।

সোমনাথ॥ খোকাকে দেখছি না।

মিনু॥ সেই যে বাইরে যাবে মাথায় ঢুকেছে! পাশপোর্টের ব্যাপারে ছোটাছুটি করছে।

সোমনাথ॥ চঞ্চল এসেছিল?

মিনু॥ পরশু এসেছিল। এমন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে না ও। কিরকম একটা হয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ॥ কি রকম?

মিনু॥ কেমন বিরক্ত-বিরক্ত!

সোমনাথ॥ তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

মিনু॥ মা কি সব কিনবেন। গ্লোব নার্সারি থেকে ফুলের বীজ আনবেন। বারান্দায় কতো গাছ লাগিয়েছেন মা, দেখনি?

সোমনাথ॥ পরেশ টব কিনে আনছিল দেখেছিলাম।

মিনু॥ (*হাত ধরে*) দেখবে এস, অদ্ভুত গোলাপ ফুটেছে। হলুদ রঙের যা একটা গোলাপ-হয়েছে না? এস না!

সোমনাথ॥ পরে দেখব।

মিনু॥ তুমি না, কেমন হয়ে যাচ্ছ! বসে আছ তো আছ, ভাবছ তো ভাবছ। চল না, আমাদের সঙ্গে বেরুবে।

সোমনাথ॥ কয়েকদিন কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

মিনু॥ চল না বাবা, কাশ্মীরে যাই। ছোটবেলা থেকে কাশ্মীর দেখতে এতো লোভ ছিল!

সোমনাথ॥ কাশ্মীর নয়, আর কোথাও।

মিনু॥ মধুপুর? রাজগীর? সিমলা?

সোমনাথ॥ না, মিনু আমাদের আহিরীটোলার সেই পুরনো বাড়িটায় যেতে ইচ্ছে করছে। জানলার কাছে পাতা-শূন্য সেই বেলগাছটা। রাজ্যের কাকের জটলা। কতো বেল হত, মনে আছে? দেওয়ালে চুনকাম হয়নি কতোকাল, রাজ্যের দাগ। ঐ দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে নানারকম ছবি জাগত আমার মনে। ও বাড়িতে খেতে বসে তোর আর খোকার গল্প . . . রাত্তিরের ফাঁকা ঠাণ্ডা ছাদে বসে হঠাৎ গঙ্গার স্টিমারের শব্দ। ছাদের কোণটায় দাঁড়ালে গঙ্গার ওপারের আলো মালার মত লাগত। তোর মা ছাদে এসে সংসারের অভাব

তাড়াবার সব অভিনব প্ল্যান দিত মাঝে মাঝে। খুব ভয়ে ভয়ে তুই একদিন এসে বলেছিলি, বাবা একটা টিউশনি পেয়েছি, করব? বলতে তোর এতো আনন্দ আর ভয় ছিল। কুড়ি টাকার টিউশনি, অথচ আনন্দে হৈচৈ করে আমরা মাংস খেলাম, মনে আছে?

[*হেসে উঠল সোমনাথ*]

মিনু।। বাবা, তুমি অনেকদিন পর হাসলে।

সোমনাথ।। তাই নাকি?

মিনু।। এতো গম্ভীর হয়ে থাক আজকাল। এখন আমাদের তো অতো অভাব নেই—

সোমনাথ।। অতো কিরে, মোটে অভাব নেই।

মিনু।। থাকলে তুমি বোধ হয় খুব খুশি হতে।

সোমনাথ।। কি জানি!

মিনু।। অভাব বুঝি ভাল!

সোমনাথ।। কিছুই ভাল নয়, মিনু। কেবল যা চলে যায় তাই ভাল।

মিনু।। আমার কষ্ট ভাল লাগে না। সুযোগ থাকলে কষ্ট করব কেন?

সোমনাথ।। না, কষ্ট করবি কেন? কিন্তু কি যেন একটা আমরা সবাই হারাচ্ছি।

[*মৃণ্ময়ী ঢুকলেন। দামী জামা-কাপড়। পান খেয়েছেন।*]

মৃণ্ময়ী।। জর্দার কৌটোটা খুঁজে পেলাম না, থাক, চল মিনু। (*সোমনাথের দিকে তাকিয়ে*) আমরা একটু বেরুচ্ছি, বুঝলে? এক্ষুণি ফিরব। তুমি যখন বেরুবে ঘড়ি, ড্রয়ার এ সব লক্ষ রেখে বেরিও। সেদিন খোকার পকেট থেকে পাঁচটা টাকাই খোয়া গেল —চাকরবাকররা সব মুনিঋষি নয়, বুঝলে।

সোমনাথ।। কোথাও বেরুচ্ছি না আজ।

মৃণ্ময়ী।। কি বলছ তুমি! বেরুবে না মানে! আজ কি বার মনে আছে? শুক্রবার। কালকে শনিবার তোমার খেলা না? আজ না বেরুলে সেই খবরগুলো যোগাড় করবে কে? জেতা-ঘোড়ার নাম ছাপানো সেই কাগজটা তো আর জানলা দিয়ে উড়ে আসবে না? ঘরে কুনো হয়ে বসে না থেকে একটু ঘুরে এস—গায়েও আলোবাতাস লাগবে।

সোমনাথ।। আমি আর পারব না। অনেকবার তোমাদের কথা আমি রেখেছি। বার বার তোমার কথায় মাঠে গেছি। কিন্তু আর পারব না। ঢের হয়েছে। ঢের টাকা, ঢের উত্তেজনা, ঢের ক্লান্তি। সব মিলিয়ে একটা যান্ত্রিক চাকাব তলায় যেন চাপা পড়ে আছি, নিজেকে যেন কাদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছি। মনে হচ্ছে, যেন ভিতর থেকে আমার আত্মা বেরিয়ে গেছে। তোমরা এক একজন আমার চামড়ার মধ্যে ঢুকে যেমন খুশি হাঁটছ, চলছ, ঘুরছ! অসহ্য!

মৃণ্ময়ী।। তোমার কথাবার্তা এমন উদ্ভট হয়ে গেছে, তোমাকে আর কেউ সুস্থ বলবে না। স্বাভাবিক মানুষের মত একটু কথাবার্তা বল। একটু সুস্থ হও।

সোমনাথ।। একটু অসুস্থ থাকাই এখন আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মিনু।। বাবা আজকে নাই-বা বেরুল। পরের সপ্তাহে যাবে।

মৃণ্ময়ী।। ভাল বুদ্ধি দিচ্ছিস তোরা। পরের সপ্তাহে যাবে। কেন, এ সপ্তাহে গেলে কি শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। কোনও সুযোগই ছাড়তে নেই।

সোমনাথ।। পরের সপ্তাহেও আমি যাব না। আমি আর খেলব না। কোনওদিন না। আজকাল আমার ভয় করে। মনে হয় জোর করা উত্তেজনায় ভিতরের একটা দরকারি শিরা ছিঁড়ে গিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। দেখ, আমার শরীর কেমন শাদা হয়ে যাচ্ছে! . . . কোনদিন বাজারে গিয়ে হয়ত দেখব—মাংসের দোকানে আমার ফুস্‌ফুস্‌ বিক্রী হচ্ছে।

মৃণ্ময়ী।। তোমার কথার কি কোনো ছিরিছাঁদ আছে, না কোন তাল আছে! মাথায় তোমার কি যে একটা ঢুকেছে। বুঝলে শনি, তোমাকে শনি কুমতলব দিচ্ছে কানে! তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হয়, টাকা পয়সা তোমার গায়ের জ্বর, নামাতে পারলে বাঁচো! টাকার কি তোমার দরকার নেই? খোকা যদি বাইরে যায় তার জন্য কিছু থোক্ টাকার দরকার হবে না? মিনুর বিয়েটা তো ঘটা করেই দিতে হবে। এখন তো আর আহিরীটোলার এঁদো গলিতে নেই আমরা . . . এখানকার পরিবেশমত চলতে হবে। তাছাড়া খোকা তোমার একটা মাত্র ছেলে, ওর জন্য একখানা মোটরগাড়ি যদি কিনে দিতে পার, একখানা বাড়ি কলকাতার আশপাশে তুলে দিতে পারলে আমরা মরবার কালেও শান্তি পাব। আমরা আর কদিন বলতো? আমার সাধ-আহ্লাদের জন্য একটি পয়সা দিতে হবে না তোমাকে। আমার উপর জিদ করে ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত কর না।

সোমনাথ।। বেশ, আজকেই শেষ। আর কোনদিন খেলতে বল না আমাকে। এই শেষ খেলা আমার।

মৃণ্ময়ী।। যা তোমার খুশি। আমাদের যতো আছে, সবকিছু দিয়ে খেল এবার। শেষ খেলায় যেন চিরকালের কাজ হয়।

সোমনাথ।। সবকিছু দিয়ে খেলবে? তোমার দুঃখ সুখ আত্মা সব কিছু দিয়ে?

মৃণ্ময়ী।। আবার তোমার সেই বিকার শুরু করলে! চল্ মিনু, থাকলেই আবার সেই শনি পোকাটা ওর মাথায় ঘুর ঘুর করবে। চল্। তুমি তাহলে বেরুচ্ছো, কথা দিলে, কেমন?

[*ওরা বেরিয়ে গেল।* ভূতগ্রস্তের মত সোমনাথ বসে থাকল কিছুকাল। উঠে ঘরের চড়া আলোটা নিভিয়ে ডিম্ আলোটা জ্বালল। ঘর প্রায় অন্ধকার। চুরুট ধরাল। সোফায় হেলান দিয়ে বসল। প্রায় শোয়ার ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে লাল নীল বিচিত্র আলোর বৃত্ত আর ত্রিভুজ ঘুরতে আরম্ভ করল। একটি অপরিচিত পরিবেশ আলো আর নেপথ্য যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে অলৌকিক রূপ পেতে লাগল। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। চমকে উঠল সোমনাথ। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সে চলে যেতে চাইল, যেন ফোনটা মারাত্মক ভয়ের কিছু। দরজার কাছে যেতে ফোনটা আবার বাজল। বাঁ হাতের মুঠি ডান হাতে একবার জোরে চেপে ধরে শিথিলভাবে ছেড়ে দিল, আস্তে আস্তে ফোনটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আবার বেজে উঠতেই দ্রুত ফোনটা তুলল।]

সোমনাথ।। (*সভয়ে*) কে আপনি? কি নাম বললেন? সোমনাথ রায়? আমিই তো সোমনাথ রায়? আমি নিজেকে কি করে ফোন করতে পারি? অসম্ভব। আমি কি দু' টুকরো হয়ে গেছি? কোত্থেকে ফোন করছেন? কুড়ি বছর দূর থেকে? সকাল না দুপুর না রাত? কি বলছেন? শুনতে পাচ্ছি না, ক্রশ-কানেকশন হয়ে যাচ্ছে, নানা গলা আসছে, কি আশ্চর্য চেনা গলা সব . . . আপনিও শুনতে পাচ্ছেন? হাসছেন কেন? কি বললেন শুনতে পাচ্ছি না! এতো দূরের গলা, একদম শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ আছে, নীল রঙের সেই ঘোড়াটা আছে . . . না না পাগল! বেচে দেব কেন? আমি কি কশাই! আমার স্বপ্নের মধ্যে বাঁধা আছে। না-না, আমি বেচি না। অসম্ভব! অসম্ভব! পর্ণা? হ্যাঁ, পর্ণা কি? শুনতে পাচ্ছিনা! কি বলছেন আপনি? শুনতে পাচ্ছি না! একদম না! জোরে বলুন প্লিজ—ছেড়ে দিয়েছেন? . . . শুনুন, ছেড়ে দিয়েছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি না, আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না!

[*ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা রেখে দিল। টেবিলের কোণটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুটা ঝুঁকে। হঠাৎ দরজাটা নড়ল। কে যেন একবার ঢুকেই আবার বাইরে চলে গেল। দরজার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকল সোমনাথ। তারপর একটু এগোল। সোফাটা ধরে দাঁড়াল।*]

সোমনাথ।। (*তীব্র চিৎকার করে*) কে? কে ওখানে?

[*হ্যারি গোল্ডেন ঘরে ঢুকল। ওর বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ, হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো।*]

হ্যারি গোল্ডেন।। আমি

সোমনাথ।। সামনে এস।

হ্যারি।। আমাকে চিনতে পারছেন না? হ্যারি গোল্ডেন। আমি আপনার কালকের ঘোড়ার জকি।

সোমনাথ।। তোমাকে ভুলব কেমন করে? কাল শনিবারের মাঠে তুমি পুণা প্লেটে, একহাজার আটশ মিটার খান্না প্লেটে আর অলিম্পিক প্লেটে ছুটছ। তুমি হ্যাট্‌ট্রিক করবে। আমার স্পেকুলেশন যে কতো সঠিক তা সেই কাগজটা পেলে তোমাকে দেখাব। সেই বাচ্চা ছেলেটা এখনও এল না। আমার কিরকম অস্বস্তি হচ্ছে।

হ্যারি।। কিন্তু একটা দুঃসংবাদ আছে!

সোমনাথ।। কি দুঃসংবাদ?

হ্যারি।। দুঃসংবাদ তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।

সোমনাথ।। মানে?

হ্যারি।। আগামীকালের পুণা প্লেটের ফার্স্ট স্টার্টেই আমি তাজা ঘোড়া গ্রীন হুইস্কির পিঠ থেকে উল্টে পড়ে গেছি। আমার বাঁ হাতটা কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে গেছে।

সোমনাথ।। কালকের রেসে তুমি আজকে পড়ে গেলে কি করে?

হ্যারি।। কি জানি। কালকের জেতার খবর আপনি যেমন আজকে পান, হয়ত সে-রকম কোনভাবেই।

সোমনাথ।। তুমি পড়ে গেলে! বাকি ঘোড়াগুলোর কি দশা হবে তাহলে! হাঙরি মুন কি আর উইন করবে? সমস্ত গ্যালারি উল্লাসে ফেটে পড়ত! ট্রেনার টমসনকে তাজ্জব করে দিয়ে ফেভারিট ঘোড়া নটোরিয়াস লেডিকে পিছে ফেলে হাঙরি মুন একটা বিস্ময়ের মত ফিনিশে পৌঁছত . . . কি স্পেকটাকুলার ফিনিশ! কিন্তু তুমি হাতটা ভেঙে ফেললে? কি করলে তুমি হ্যারি গোল্ডেন! সব কেমন ভেঙে যাচ্ছে! তোমার হাতটা কি একেবারে অকেজো হয়ে গেছে?

হ্যারি।। কনুইয়ের জয়েন্টটা ভেঙে গেছে। হাতটা নড়াতে পারছি না পর্যন্ত।

সোমনাথ।। শুধু তোমারই নয়, সময়ের জয়েন্টগুলোও ভেঙে যাচ্ছে। Time is out . . . হ্যামলেট পড়েছ?

হ্যারি।। হ্যামলেট? সেই সিমলা প্লেটের ঘোড়া? প্রায়ই ননস্টার্টার হত। পুয়োর ফিনিশ ছিল।

সোমনাথ।। চুলোয় যাক হ্যামলেট। কিন্তু হ্যারি, এই প্রথম আমি ধ্বসে গেলাম।

হ্যারি।। আমার ক্ষতিও কম নয়।

সোমনাথ।। এটাই আমার শেষ খেলা ছিল। ভেবেছিলাম কালকের খেলার পর তোমাদের সকলকে নিয়ে সেই ঘরটায় এতোদিন যতগুলো কাগজ পেয়েছি সব স্তূপাকার করে জ্বালিয়ে দেব। অদ্ভুত এক উৎসব হত। এই আগুনে অনেক কিছু পুড়ত। কাগজগুলো ঐ ভারি বাক্সটার নিচে লুকিয়ে রেখেছি। (*ওয়াড্রোবের কাছে একটা বাক্স দেখাল*)। আর কি দরকার আছে ওগুলোর? এস আমরা দুজনে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলি! উৎসব হোক, রাজি?

হ্যারি।। কোনও কিছুতে আমার আপত্তি নেই এখন। আমিও শেষ হয়ে গেছি।

[সোমনাথ বাক্সটা তুলবার চেষ্টা করল, পারল না। হ্যারি গোল্ডেন এল। গলা থেকে ব্যাণ্ডেজের মালার মত ফিতে খুলে ফেলল। দু'হাতে বাক্সটা ধরে একটু সরাল। তারপর বাক্সটা উঁচু করে তুলল।]

হ্যারি।। নিন, তলা থেকে কাগজগুলো বের করে নিন।

[সোমনাথ হ্যারির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল। হ্যারির মাস্‌ল্ ফুলে উঠেছে, গলা আর কপালের শিরা জেগে উঠেছে। মুখটা লাল। বাক্সটা তখনো তুলে ধরে আছে। হঠাৎ সোমনাথ ওর গলাটা চেপে ধরল। শব্দকরে বাক্সটা ফেলে দিল হ্যারি গোল্ডেন।]

সোমনাথ।। ইউ ড্যাম চিট্! বলছিলে না তোমার হাত ভেঙেছে! অতো ভারি বাক্স তুমি তুললে কেমন করে? বল, কি করে তুললে, বল? বুঝতে পারছি আমাকে নিয়ে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে—আমার কনসেনট্রেশন, জোর, বিশ্বাস—সব কিছুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমার ক্ষতি করতে চাও, আমার ভাগ্য, ঐশ্বর্য, সব কিছুর বিরুদ্ধে তোমাদের ঈর্ষা। এরকম হাত ভাঙার অভিনয় করলে? কথা না বললে (*পেপার ওয়েটটা টেবিল থেকে তুলল*) আমি তোমার জঘন্য মাথাটা গুঁড়িয়ে ফেলব! বল, কেন এ রকম করলে, বল?

হ্যারি ॥ বিশ্বাস করুন, কোনো দোষ নেই আমার। বাধ্য হয়ে করেছি। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাচ্ছি।

সোমনাথ ॥ তাহল কে আমার শত্রুতা করল, বল, কে তোমাকে মিথ্যে সাজিয়ে পাঠিয়েছে? আমি জানি কে। তাহলেও তোমার মুখে নামটা শুনতে চাই। নাম বল।

হ্যারি ॥ প্লিজ, নাম বলতে বলবেন না আমাকে। আমি পারব না। কথা দিয়েছি তাকে। মাফ্ করুন। ছেড়ে দিন আমাকে, প্লিজ্।

সোমনাথ ॥ নাম তোমাকে বলতেই হবে।

হ্যারি ॥ দেখুন—

সোমনাথ ॥ কিছু দেখব না আমি, শুনব—তোমার মুখ থেকে কেবল নামটা শুনব। কে সে? সুহাস? মাই ওল্ড্ এনিমি!

হ্যারি ॥ সুহাস নয়। ওর সঙ্গে আমার দেখা পর্যন্ত হয়নি।

সোমনাথ ॥ কে তবে?

হ্যারি ॥ পর্ণা।

সোমনাথ ॥ পর্ণা!

হ্যারি ॥ হ্যাঁ, পর্ণার কথামত আমি এসব করেছি। ওর অনুরোধে বাধ্য হয়েছি। বিশ্বাস করুন।

সোমনাথ ॥ বিশ্বাস আমি করি না। তুমি একটি প্রচণ্ড লায়ার। নিদারুণ মিথ্যেবাদী। পর্ণা কেন আমার ক্ষতি চাইবে, ও কেন আমার শত্রুতা করবে?

হ্যারি ॥ উনি এক্ষুনি এখানে আসবেন বলেছিলেন।

সোমনাথ ॥ এখানে কেন?

হ্যারি ॥ আমার হাত ভাঙার কথা শোনার পর আপনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেখতে।

সোমনাথ ॥ আশ্চর্য! আমার সব কেমন তছ্নছ্ হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সাহস তাহলে পর্ণার। ও কখন আসবে?

হ্যারি ॥ এক্ষুণি। আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

সোমনাথ ॥ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল?

[*জানালায় ঝুঁকে তাকাল সোমনাথ। তক্ষুণি দরজায় টোকার শব্দ শোনা গেল। দ্রুত ফিরে তাকাল সোমনাথ*]

হ্যারি ॥ এসে গেছেন। কিন্তু কি করব আমি। আমি দু'দিকের করাতে কেটে যাচ্ছি। অন্য কোনও দরজা নেই? আমি চলে যেতাম।

সোমনাথ ॥ কোথায় যাবে তুমি? তুমি সত্যবাদী কি না তারও পরীক্ষা দরকার আমার। তোমাকে থাকতে হবে। পাশের ঘরটায় তোমাকে আটকে রাখব ততোক্ষণ।

[*দরজায় আবার টোকা। সোমনাথ প্রায় জোর করেই হ্যারি গোল্ডেনকে পাশের ঘরটায় ঢুকিয়ে দিয়ে মঞ্চের দিক থেকে শিকল টেনে দিল। আস্তে আস্তে সোফায় বসল। কপালের ঘাম মুছল। চুরুট ধরাল। দরজায় আবার টোকার শব্দ*]

সোমনাথ।। খোলা আছে, ভিতরে এস।

[*পর্ণা ঢুকল। শাদা পোশাক। বিষণ্ন। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল।*]

পর্ণা।। বাব্বা, ঘুমুচ্ছিলে নাকি অবেলায়। কতোক্ষণ কড়া নাড়লুম।

সোমনাথ।। খেয়াল করিনি।

পর্ণা।। এরপর এলে সঙ্গে ঢাক-ঢোল এনে বাজাতে হবে দেখছি।

সোমনাথ।। সমস্ত ঘরে কি দেখছ?

পর্ণা।। চমৎকার বাড়িটা তোমার। কিন্তু মোটে সাজাতে পারনি। আমাকে ছেড়ে দাও একদিন, এমন সাজিয়ে দেব, চমকে যাবে। সত্যি, বাড়িটা কী ভাল না!

সোমনাথ।। আরও ভাল হতে পারত। কিন্তু হবে না।

পর্ণা।। কি দরকার অতো বেশিতে। বেশি জিনিশটার নামই রাক্ষস—আমাদের অনেক কিছু খেয়ে নেয়। বেশি আমার ভাল লাগে না।

সোমনাথ।। তোমার ভাললাগা নিয়ে হয়ত আমি চলতে চাইব না।

পর্ণা।। কিছুটা তো চাইবে।

[*ফুলদানিতে নতুন করে ফুলগুলো সাজালো*]

সোমনাথ।। কেন?

পর্ণা।। (*সোমনাথের বেশ কাছে এসে বসে*) কেন আবার? তোমাকে আমি ভালবাসি বলে।

সোমনাথ।। (*সোফা থেকে উঠল*) পর্ণা! (*উত্তেজিত এবং দ্রুত হল গলা*) প্রত্যেক মানুষের কয়েকটা জিনিশ হাত পায়ের মত সঙ্গে করে জন্মান উচিত; তার মধ্যে একটা হল লোডেড্ বন্দুক।

পর্ণা।। কেন?

সোমনাথ।। কারণ, কয়েকটা মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে বা আর কাউকে মিথ্যে আর সহ্য হয় না বলে গুলি করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়, অথচ হাতের কাছে ইচ্ছে মেটাবার কিছু থাকে না!

পর্ণা।। এ কথা বলছ কেন?

সোমনাথ।। পৃথিবীটা কুৎসিতভাবে অবাক করে বলে! প্রতারণা আর অবিশ্বাস চারদিকে হৈ চৈ করছে বলে!

পর্ণা। বন্দুক নয়, অন্য একটা জিনিশ নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে আসা উচিত।

সোমনাথ।। কি?

পর্ণা।। আমাদের যেমন আছে তার থেকে অনেক উজ্জ্বল আর মহৎ দুটো চোখ। যাতে সত্যি করে, স্পষ্ট করে, আর সুন্দর করে সব কিছু দেখতে পারা যায়। তাহলে বন্দুকের ভারটা আর বইতে হবে না।

সোমনাথ।। এ সব কথা আজ তোমার মুখে মানায় না! কয়েক ঘন্টা আগে বললে হয়ত তারিফ করতাম। কেমন মুখস্থ-মুখস্থ লাগছে, কেমন বিস্বাদ, একটু থিয়েটারি ঢং।

পর্ণা।। কেন এ কথা বলছ?

সোমনাথ।। অভিজ্ঞতায় ক্রমশ জিব তেতো হয়ে যাচ্ছে বলে!

পর্ণা॥ কেমন রুক্ষ লাগছে তোমাকে। তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সোমনাথ॥ বোঝা উচিত ছিল তোমার, তুমি কোনোকালে তেমন অবুঝ নও।

পর্ণা॥ বুঝে তো কেনো লাভ হয়নি আমার সোমনাথ। চিরকাল ঠকে এসেছি আমি। ইচ্ছেমত কিছুই পাইনি। লটারি ধরলে শূন্য উঠত!

সোমনাথ॥ গলার স্বর তোমার করুণ শোনাচ্ছে পর্ণা! কিন্তু আমার মন আজ আগের মত কোমল হচ্ছে না। বৃষ্টি পড়লে পাহাড় কাদা হয় না। আমার ভিতরটা পাথরের মত শক্ত হয়ে আসছে।

পর্ণা॥ তুমি একটা কিছু বলতে চাইছ। কি বলতে চাও তুমি?

সোমনাথ॥ তুমি কি বলতে এসেছ আগে বল।

পর্ণা॥ কিছু বলতে আসিনি, তোমাকে কেবল দেখতে এসেছি। মনে হচ্ছিল, তোমার শরীর খুব খারাপ। ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ছ, তোমার মুখ দেখলে মায়া হয়, কেমন বুড়ো হয়ে পড়ছ!

সোমনাথ॥ এতো ভেবেছ আমার জন্য!

পর্ণা॥ আমাকে এভাবে ঠাট্টা করতে না কোনদিন!

সোমনাথ॥ এখন করছি বুঝলে কি করে?

পর্ণা॥ একটু আগেই তো তুমি বলছিলে, আমি কোনকালে অবুঝ নই। তোমার গলা শুনে আমিই কেবল নয়, যে-কেউ বুঝবে তুমি আমাকে বিদ্রূপ করতে চাও।

সোমনাথ॥ এও তো হতে পারে, তুমি তোমার ভিতরের পাপ স্মরণ করে সব কিছুর নতুন ব্যাখ্যা করে যাচ্ছ।

পর্ণা॥ কোনও পাপ করিনি আমি।

[*তীব্র সোজা তাকাল পর্ণা*]

সোমনাথ॥ পাপপুণ্যের বিচার থাক। তুমি আজ যাও, পর্ণা। আমি একবার হ্যারি গোল্ডেনের কাছে যাব। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?

পর্ণা॥ না।

সোমনাথ॥ দেখা হয়নি? একটু আগেও না। ও কিন্তু আমাকে ফোন করেছিল, বলছিল—

পর্ণা॥ ও হ্যাঁ, হঠাৎ, মানে . . . পথে দুম্ করে দেখা।

সোমনাথ॥ সব কথাবার্তা তোমার হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কি বলবে, না বলবে, একবার গুছিয়ে ভেবে নাও।

পর্ণা॥ ফোনে ও কি বলল?

সোমনাথ॥ একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা বলল। ওর হাত ভেঙে গেছে। আমার সর্বস্ব ভেঙেছে এও বলতে পার।

পর্ণা॥ হ্যাঁ, পথে যখন দেখা হল, দেখেছিলাম বেচারা প্রচণ্ড জোয়ান মানুষটা—

সোমনাথ॥ অথচ ঐ জোয়ান জন্তুর মত চেহারার লোকটা তোমার কথায় ওঠে বসে। কী যাদু তোমার!

পর্ণা॥ কি যা-তা বলছ!

সোমনাথ॥ অন্তত মিথ্যে বলছি না।

পর্ণা।। ও আমার কথায় কি করেছে?

সোমনাথ।। কিছু করেনি?

পর্ণা।। না।

সোমনাথ।। তাহলে হ্যারি মিথ্যে বলেছে আমাকে? তুমি বল, আমাকে ও মিথ্যে বলেছে, আমি ওকে শেষ করে ফেলব! শোন, হ্যারিকে আমি ও-ঘরে আটকে রেখেছি। বল, ও মিথ্যে বলেছে? ওকে ডাকছি আমি।

[সোমনাথ দরজার দিকে দ্রুত এগোল]

পর্ণা।। শোন।

সোমনাথ।। কি বলবে?

পর্ণা।। দরজা খুলতে হবে না।

[সোফার পিছন দিকটায় মাথাটা হাতের ওপর নিঃশব্দে কাত করে রাখল পর্ণা]

সোমনাথ।। খুব ভেঙে পড়েছ মনে হচ্ছে? কিন্তু কেন, কেন এ সব করতে গেলে তুমি? কি চাও? আমার কাছে এ সব গোপনতা, প্রতারণা কেন তোমার, পর্ণা? আমি কি নিতান্ত পর হয়ে গেছি?

পর্ণা।। পর ভাবিনি কোনকালে তোমাকে, বিশ্বাস কর।

সোমনাথ।। তাহলে? তুমি কি তাহলে সুহাসের চাপে করেছ এসব! তুমি বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছায় করলে আমি বেঁচে যাই পর্ণা। তোমার কোন দোষ নেই, ভাবতে আমার কি ভীষণ ভাল লাগে তুমি জান না। বল, সুহাসের কথায় করেছ? যাতে আমার মনের জোর ভাঙে, হতাশা আসে। যাতে ঘোড়াগুলোর নাম উত্তেজিত মুহূর্তে বলে দেব, তারপর হ্যারির কাছ থেকে জেনে ও টাকার ফোয়ারায় চান করবে? বল, সুহাস এর পিছনে আছে কিনা বল?

পর্ণা।। সুহাস কিছু জানে না। কিছু না।

সোমনাথ।। তবে কে?

পর্ণা।। আমি। সব আমি করেছি। এটা যে কেউ বোঝে, কেন আমি করেছি। তুমি এতো উত্তেজিত, এতো নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন, তুমি আর ভাবতে পারছ না। তুমি যাতে আর না খেল আমি কেবল তাই ভেবেছি। বিরক্ত হয়ে হোক, ভেঙে পড়ে হোক, আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে হোক—যে করেই হোক, তুমি আর খেলবে না, আমি তাই চেয়েছি। তুমি জান না, তুমি শেষ হয়ে যাচ্ছ, চুরি হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে তোমার আত্মা ছেড়ে গেছে।

সোমনাথ।। আমি এ কথা মাঝে মাঝে ভাবি, পর্ণা। কিন্তু কি যেন হয়, কে যেন টানে . . .

পর্ণা।। তোমার মৃত্যু তোমাকে টানে। তুমি এত জোরে দৌড়চ্ছ, তোমার পথ ফুরিয়ে যাচ্ছে। সবাই তোমাকে ঠেলছে, চাকাটা ভীষণ গড়িয়ে দিচ্ছে . . . তুমি পাগলের মত ছুটছে। তোমার ভয় জাগছে না? অবশ লাগে না?

সোমনাথ।। লাগে! ভীষণ ভয় করে পর্ণা, অবশ লাগে!

পর্ণা।। তুমি একটা খোলস, একটা আলমারির মত তুমি। সবাই তাদের জিনিশপত্র

তোমার মধ্যে এনে রাখছে। তোমার নিজের কিছু রাখবার নেই। তুমি খেলা ছেড়ে দাও। আমি খেলতে দেব না তোমাকে!

সোমনাথ।। কিন্তু এটাই আমার শেষ খেলা ভেবেছিলাম।

পর্ণা।। না, আর নয়। আর খেলবে না তুমি। দেখছ না, তোমার হাত ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। আয়নায় তাকিয়ে দেখ কি ভীষণ বুড়ো দেখাচ্ছে তোমাকে। হাত মুঠো করে কিছু ধরে রাখতে পারছ না তুমি। মুঠোর ভিতর বাতাসের মত সব সরে যাচ্ছে। সর্ব দিক থেকে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছ!

সোমনাথ।। হ্যাঁ, পর্ণা, আমার ভিতর থেকে একজন দীর্ঘ লোক যেন কোথায় চলে গেছে—এ লঙ্ ম্যান হ্যাজ্ লেফট্ মি। আমি আর খেলব না, একদম না, তুমি যদি রোজ এরকম আস আমার কাছে, আমি আর খেলতে চাই না তাহলে। কোথাও বেড়াতে যাব আমরা। সেই একবার চৌরঙ্গিতে বাস ধরতে উঠে দুজনে দারুণ মজার ভিজেছিলাম, মনে আছে? কুড়ি বছর আগে, তাই না? এখন বেড়াতে গেলে যদি সেদিনের বৃষ্টিটা নামে, তাহলে কি কুড়ি বছর আগের বয়স ফিরে পাব? তুমি রোজ আসবে বল?

পর্ণা।। কি করে হয়! আমরা বড় দূরে-দূরে আছি।

সোমনাথ।। তাহলে কি করব আমি?

[*দরজায় হ্যারি ধাক্কা দিতে লাগল। সোমনাথ উঠে খুলে দিল। হ্যারি গোল্ডেন বেরিয়ে এল*]

সোমনাথ।। হ্যারি, এবার তুমি চলে যেতে পার। কিছু মনে কর না। তখন আমার উত্তেজিত না হয়ে উপায় ছিল না কোন।

হ্যারি।। কিছু ভাবছি না আমি।

[*হ্যারি জানালার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল*]

সোমনাথ।। কি দেখছ?

হ্যারি।। ও-ঘরের জানালা দিয়ে দেখলুম, আপনাকে যে বাচ্চা ছেলেটা কাগজ দিয়ে যায়, সেটা ঘুরঘুর করছে।

পর্ণা।। ওকে হাত নেড়ে চলে যেতে বল।

সোমনাথ।। কিন্তু . . .

পর্ণা।। ওকে চলে যেতে বল, হ্যারি।

হ্যারি।। কিন্তু ওকে যে আমি ও-ঘর থেকে উপরে আসবার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলুম। নিচে দেখছি না। ও হয়ত উঠে আসছে।

পর্ণা।। কি করেছ তুমি, কেন আসতে বললে ওকে। শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও।

[*সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল*]

সোমনাথ।। আমি ওর পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আসুক না। অন্তত আমার স্পেকুলেশনটা মিলিয়ে দেখি।

পর্ণা।। না, কিছুতে নয়।

[*উঠে দরজা বন্ধ করতে গেল পর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ছেলেটা কাগজ হাতে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল,*

'কাগজ কাগজ।' পর্ণা ওকে ধরতে যেতে পাশ কাটিয়ে সোমনাথের কাছে এল। ওর কোলের উপর কাগজটা ফেলে দিয়েই পালাল। সোমনাথ কাগজটা খুলতেই পর্ণা কেড়ে নিল]

পর্ণা।। না, তুমি তাকাতে পারবেনা এ কাগজটার দিকে।

সোমনাথ।। অন্তত শেষবারের মত, পর্ণা।

পর্ণা।। না, পাবে না তুমি।

হ্যারি।। কাগজটা আমাকে দিন না একবার। দেখি হাঙরি মুন আর গ্রীন হুইস্কির সম্পর্কে কি লিখেছে।

[কাগজটা নিল হ্যারি]

পর্ণা।। পড়ে নিঃশব্দ থাকবে তুমি, হ্যারি। একটা কথাও জোরে পড়বে না।

[ঘাড় নেড়ে পড়তে লাগল হ্যারি। হঠাৎ একটা কাতরোক্তির মত করে উঠল]

হ্যারি।। একি! কি করে সম্ভব! কি বার আজ? কত তারিখ?

সোমনাথ।। কেন? আজ শুক্রবার। শুক্রবারের রাত।

হ্যারি।। কত তারিখ?

পর্ণা।। থার্ড সেপটেম্বর।

হ্যারি।। তাহলে কি হল এটা, কি করে হয়?

[পর্ণা কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। হ্যারি বিমূঢ়র মত বসে পড়ল সোফার একধারে]

পর্ণা।। (*পড়ছিল। ওর নিঃশ্বাস দ্রুত হচ্ছে। মুখে উত্তেজিত আতঙ্ক*) সোমনাথ! সোমনাথ! একি হল! এ কি করে সম্ভব? বল কি করে সম্ভব?

সোমনাথ।। কি হল তোমাদের? এরকম করছ কেন তোমরা?

পর্ণা।। (*দ্রুত কাছে গিয়ে*) আজ কি বার? কত তারিখ?

[দৌড়ে ক্যালেণ্ডারের কাছে যায় পর্ণা]

সোমনাথ।। আজ থার্ড সেপটেম্বর, শুক্রবার। কি হয়েছে পর্ণা? হ্যারি কাগজটা একবার আমাকে দাও।

পর্ণা।। (*চিৎকার করে*) দেবে না! না না দেবে না ওঁকে। ছিঁড়ে ফেল, হ্যারি, শিগগির ছিঁড়ে ফেল কাগজটা!

[সোমনাথ কাগজটা হ্যারির হাত থেকে কেড়ে নেয়। পর্ণা সোফায় বসে কেঁদে ফেলল। সোমনাথ কাগজে দ্রুত চোখ বোলাচ্ছে। তারপর একজাতীয় হাসি ফুটল মুখে। হ্যারিকে কাগজটা ফিরিয়ে দিল।]

সোমনাথ।। চেঁচিয়ে পড়, হ্যারি। খবরটা অপরের মুখে শুনতে কেমন লাগে, দেখি।

পর্ণা।। না! আমি ও শুনতে পারব না, পারব না। তুমি পড়বে না হ্যারি!

সোমনাথ।। আমি বলছি তুমি পড়।

পর্ণা।। আমি আগে চলে যাই তারপর।

[সোমনাথ ওর হাত ধরল]

সোমনাথ।। তুমি যাবে না! আমরা সবাই মিলে শুনব। তুমি পড়, হ্যারি!

[হ্যারি বোকার মত চারদিকে তাকাল। তারপর পড়তে আরম্ভ করল]

হ্যারি।। শোক সংবাদ! গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আজ পাঁচই সেপটেম্বর রবিবার সুপরিচিত রহস্যময় রেস খেলোয়াড় সোমনাথ রায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুইটি সন্তান এবং প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করছি।

সোমনাথ।। ফিফথ্ সেপটেম্বর! রবিবার! আজ? আজ তো শুক্রবার, থার্ড সেপটেম্বর। আগামী পরশু আমি মারা গেছি। নির্ধারিত নিয়তি। আজ আর কাল-এ দু'দিন কি করব?

পর্ণা।। সোমনাথ কাগজ লিখল না কেন?—তুমি আমাকেও রেখে গেছ। কেবল তোমার স্ত্রী-পুত্র-অর্থই নয়!

সোমনাথ।। কাগজ সব জানে না।

[সেই বাক্সটার নিচে কাগজটা রেখে দিল]

সোমনাথ।। কেবল তোমাকে নয়। আরও অনেক কিছু রেখে যাচ্ছি। আমার নীল রঙের সেই ঘোড়াটা পর্যন্ত। পর্ণা, আজ তোমরা যাও। আমি কিছুকাল চুপ করে বসে থাকব। আর দশটা চুরুট আছে। এতেই কুলিয়ে যাবে। আর কিনব না। কি বল? যাও তোমরা।

[পর্ণা ফুঁপিয়ে উঠল]

পর্ণা।। আমি যাব না!

সোমনাথ।। বলছি যাও।

[সোমনাথ হাত ধরে তুলল পর্ণাকে। ওর পিঠে হাত রেখে দরজার দিকে এগোল। হ্যারিও গেল। আস্তে আস্তে দরজার বাইরে গেল পর্ণা এবং হ্যারি। সোমনাথ দরজাটা ভেজিয়ে রাখল। সোফার কোণটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল সোমনাথ। ধীরে ধীরে আলোর ত্রিভুজ আর বৃত্তগুলো সরে গেল। কেবল টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে। একটুকাল চুপচাপ। রেডিওটা খুলে দিল। টুংটাং শব্দে মৃদু পিয়ানো বাজছে। সোফায় এসে বসল। ক্যালেণ্ডারটার দিকে সোজা তাকাল। তারপর নিজের মাথাটা দু'হাতের মধ্যে চেপে মুখ নিচু করল। দরজা খুলে মিনু, মৃণ্ময়ী আর চঞ্চল ঢুকল। নিঃশব্দে ওরা সোমনাথের কাছে দাঁড়াল।]

মিনু।। বাবা!

[সোমনাথ তাকাল]

মিনু।। বাবা, চঞ্চলদার কথা বলছিলে না, ধরে এনেছি।

সোমনাথ।। বেশ করেছ। এতোদিন আসনি কেন চঞ্চল?

চঞ্চল।। কালই আসছিলাম, হঠাৎ একটা বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সিনেমায় গেলুম।

মৃণ্ময়ী।। বেরিয়েছিলে?

সোমনাথ।। সব ঠিক আছে। কোন ভয় নেই তোমার। আমার সব কাজ হয়ে গেছে।

চঞ্চল।। ঘরে বসেছিলেন বুঝি একা?

সোমনাথ।। না। হ্যাঁ, একাই ছিলাম। কেন? ঘরে অসংখ্য পায়ের ছাপ দেখছ বুঝি?

মৃণ্ময়ী।। আবার আবোল-তাবোল বকছ?

সোমনাথ।। তা নয়, সত্যি সত্যি এ-ঘরে অনেক পায়ের ছাপ রয়েছে।

মৃণ্ময়ী।। এবার রাঁচি যাও, সোজা রাঁচি যাও!

সোমনাথ।। চঞ্চলকে কোথায় পেলে?

চঞ্চল।। আমি এখানে আসতেই পথে দেখা।

মিনু।। এখানে আসতে না ছাই।

চঞ্চল।। এদিকে এলে আর কোথায় যেতাম?

মিনু।। কেন, আপনার বন্ধু নরেন রায় এ-পাড়ায় থাকে—শুনিনি? সব মনে থাকে বুঝলেন?

চঞ্চল।। নরেনের বাড়ি জীবনেও যাইনি। নম্বর পর্যন্ত জানি না। (*সোমনাথের দিকে তাকিয়ে*) কাল তো খেলা, মেসোমশাই।

সোমনাথ।। কাল? পরশু না? ওহো কালই তো শনিবার। কালই খেলা। আচ্ছা হঠাৎ যদি ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে এসে মাঠ ছাড়িয়ে আমাকে মাড়িয়ে গ্যালারি ভেঙে পালায়?

চঞ্চল।। মেসোমশাই অদ্ভুত সব ভাবেন।

মিনু।। তোমার চোখ দুটো অমন লাল কেন, বাবা?

[*কাছে এসে কপালে হাত রাখল*]

মিনু।। একি! ভীষণ জ্বর যে তোমার! কপাল পুড়ে যাচ্ছে। কিছু বলনি তো আমাদের।

মৃণ্ময়ী।। কই দেখি। (*দেখল জ্বর*) বেশ জ্বর! কখন থেকে খারাপ লাগছিল?

সোমনাথ।। সকাল থেকেই কেমন যেন শরীরটা--

মৃণ্ময়ী।। এর উপর তো চান করলে, ভাত খেলে। তোমরা আমাকে সুস্থ থাকতে দেবে না? এক একজন নিজের খেয়ালমত চলবে! নিজে তো ভুগবে না, আমাকে শুদ্ধু ভোগাবে!

সোমনাথ।। কিছু ভয় নেই তোমার, কালকে সেরে যাবে। ঠিক মাঠে যাব আমি।

মিনু।। কী কেবল মাঠের কথা ভাবছ? মরতে চাও তুমি! শরীরের এই অবস্থা তোমার!

সোমনাথ।। কিন্তু কি করে আমি মাঠে যাব? কেন যাব আমি?

মৃণ্ময়ী।। চল ও ঘরে। চুপটি করে শোও গিয়ে। মিনু থার্মোমিটারটা বের কর। চঞ্চল, একবার ডাক্তার ব্যানার্জিকে ডাক না।

[*চঞ্চল চলে গেল*]

সোমনাথ।। ডাক্তার নয়। মিনু, একজন ভাল ফটোগ্রাফার ডেকে নিয়ে আয়। অদ্ভুত ব্যাপার একটা কি জানিস? হঠাৎ আমার আজ মনে পড়ল—এবাড়িতে অনেক হল কিন্তু

আমাদের সবাই মিলে একটা গ্রুপ ছবি নেই। ওরকম একটি ছবি তুলব।

মিনু॥ ঠিক আছে বাবা, আমরা সবাই মিলে ছবি তুলব।

সোমনাথ॥ গ্রুপ ছবি উঠবে। মিনু, তোর বিয়ের পর এক কপি সঙ্গে নিয়ে যাবি। তবে ঠিক গ্রুপ ছবি তোলা যায় না, বুঝলি। সকলকে তো পাওয়া যায় না। আমরা সবাই এত ছড়িয়ে গেছি। অনেককে কাছে নিয়ে একসঙ্গে মিলে দাঁড়ানো এতো শক্ত। পৃথিবীর সকলে একটা মনের মত গ্রুপ ছবি তুলতে পারেনি বলে ভীষণ কষ্ট বোধ করছে।

মৃণ্ময়ী॥ তুমি এবার এ ঘরে এস।

সোমনাথ॥ আমার অসুখ ঠিক করেনি মিনু।

মিনু॥ তুমি একটু চুপ কর বাবা। কথা বেশি বললে রাগ বাড়ে।

মৃণ্ময়ী। এই এক স্বভাব করেছ। জ্বরও হল, কথার বাইশ পাহাড় হয়ে উঠলে। একটু চুপ করতে পার না!

সোমনাথ॥ সেই নীল রঙের ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। ওকেও ছবিতে নিতে ইচ্ছে, কিন্তু হতভাগাটা যে স্বপ্নের মধ্যে থাকে। মিনু, গ্রুপ ছবিতে স্বপ্নের প্রাণীরা আসেনা?

মিনু॥ হয়ত আসে। আমি ঠিক বুঝি না বাবা।

সোমনাথ॥ এলেই ভাল।

মৃণ্ময়ী॥ তুমি একটু চুপ করে থাক তো। এস আমার সঙ্গে।

[*মৃণ্ময়ী হাত ধরে সোমনাথকে নিয়ে চলল*]

সোমনাথ॥ মিনু, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ফটোগ্রাফার এলে আমাকে ডেকে দিস।

মিনু॥ দেব।

[*সোমনাথ চলে গেল। শূন্য মঞ্চে মিনু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে মঞ্চের বাইরে চলে গেল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়*]

পঞ্চম দৃশ্য

[*প্রথম দৃশ্যের স্থান। মাঝখানে একটি বড় গোল কালো টেবিল। টেবিলে দু'হাত আলাদাভাবে রেখে চোখ বুজে বসে আছে পর্ণা, সুহাস, হ্যারি গোল্ডেন, মিঠু এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি। কোণের দিকে ছোট একটা টেবিলে একটা মৃদু ল্যাম্প রাখা আছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। সবুজ, হলদে এবং লাল আলোর বৃত্তগুলো ঘুরছে। ওদের টেবিল ঘিরে বসবার অবস্থান দেখে মনে হবে, ওরা যেন প্লানচেটে বসেছে।*]

প্রৌঢ় লোকটি॥ আপনারা সকলে সোমনাথের আত্মাকে স্মরণ করুন। মনে মনে ওর কথা ভাবুন! সোমনাথের আত্মা ছাড়া বাকি সব চিন্তা সরিয়ে ফেলুন। আমার মধ্যে ওর প্রেতাত্মা এসে ধীরে ধীরে ভর করবে। তখন প্রশ্ন করবেন আপনারা।

মিনু।। প্রেতাত্মায় আমার ভীষণ ভয়।

প্রৌঢ়।। কোন ভয় নেই। ওর আত্মা শান্ত, ধীর।

পর্ণা। আমি চলে যাব! এসব আমি সহ্য করতে পারিনা।

প্রৌঢ়।। এখন চলে যাবেন না। ওর আসার সময় হয়ে এসেছে। সব চুপ করুন। ভাবুন, ভাবুন ওকে।

সুহাস।। তোমার ব্যাগে অনেকগুলো চিঠি রয়েছে দেখলাম পর্ণা?

পর্ণা।। সোমনাথের চিঠি ওকে ফেরৎ দিয়ে দেব। দিনের পর দিন এগুলো ভারি হয়ে উঠছে।

প্রৌঢ়। চুপ করুন। একেবারে নিঃশব্দ হবে ঘর, আমি মিডিয়াম। আমার একটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। আমার মনটাকে স্থির একটা তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে—একটা শূন্য অবস্থা, নেগেটিভ কনডিশন। রেডি, বি কোয়াইট। প্ল্যানচেটে কোনও কোলাহল থাকবে না। চোখ বুজুন। অ্যাবসলিউট সাইলেন্স! অ্যাবসলিউট ডার্কনেস অফ্ মাইণ্ড।

[সকলে চোখ বুজে স্থির হয়ে বসল। ঘরের ভ্রাম্যমাণ আলোয় বৃত্তগুলো কেবল প্রৌঢ় লোকটির মুখে ঘুরতে লাগল। মিঠু চোখ খুলল, চারদিকে তাকাল। চেয়ার ছেড়ে উঠল। টেবিলে রাখা পর্ণার ব্যাগ খুলে চিঠিগুলো নিল। তারপর ভয়ার্তের মত দরজার দিকে সন্তর্পণে পা টিপে পা টিপে এগোল। প্রৌঢ় লোকটি একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠল। দ্রুত মিঠু দরজার আড়ালে লুকোল। ওখান থেকে ও তাকিয়ে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। পর্ণা তাকাল। টেবিলের উপর মিঠুর ব্যাগটা দেখতে পেল। চারদিকে তাকাল, তারপর ব্যাগটা খুলে একটা ছবি নিয়ে জামার মধ্যে লুকিয়ে আবার চোখ বুজে স্থির হল। সুহাস তাকাল। চেয়ার ছেড়ে উঠল। চারদিকে তাকাল। পর্ণার কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলে রাখা ওর ব্যাগটা খুলে খুঁজতে লাগল কিছু। পেল না। মিঠুর চেয়ারের দিকে তাকাল। ফাঁকা দেখে ঘরের সবদিকে দেখতে লাগল। দরজার পাশ থেকে মিঠু ওকে চিঠিগুলো দেখাল। সুহাস ওর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে পর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওরা দু'জন চমকে স্থির হয়ে দাঁড়াল]

পর্ণা।। চোর! চোর! আমার ব্যাগ থেকে পুরনো চিঠিগুলো সব চুরি করে নিয়েছে!

প্রৌঢ়।। আশ্চর্য, এরকম হলে সোমনাথের আত্মাকে আহ্বান অসম্ভব!

পর্ণা।। কিন্তু আমার চিঠি চুরি করে নিল যে!

প্রৌঢ়।। কে চুরি করেছে?

পর্ণা।। ঐ ভয়ানক মেয়েটা!

মিঠু।। আর আপনি যে আমার ব্যাগ থেকে সোমনাথদার ছবিটা চুরি করলেন?

সুহাস।। সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গেলেই পারতে পর্ণা!

পর্ণা।। চিঠিগুলোর উপর তোমারও যে কতটা লোভ তাও জানতে বাকি রইল না!

সুহাস।। লোভ আমার অনেক কিছুরই উপর, কিন্তু লাভবান হতে পারলুম কই?

পর্ণা।। চিঠিগুলো তুমি দেখতে চাইলে দেখাতাম।

সুহাস।। ভেবেছিলুম, না দেখতে চাইলেও দেখাবে।

হ্যারি।। আপনারা যে-যা নিয়েছেন ফেরৎ দিয়ে দিন। ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা প্ল্যানচেটে বসেছি।

প্রৌঢ়।। এতোটা ইন্‌সিন্‌সিয়ার হলে আত্মার আসা অসম্ভব হয়ে উঠবে। আপনারা স্থির হয়ে বসুন। নিজেদের সমস্যা না হয় একটু পরেই ভাববেন। আসুন, বসুন সবাই। সোমনাথের কথা ভেবে অন্তত কিছুকাল সবাই চুপচাপ এসে বসুন।

[সকল এসে বসল। মিঠু চিঠিগুলো দিতে, ছবিটা ফেরৎ দিল পর্ণা। কিছুকাল চুপচাপ। হঠাৎ প্রৌঢ় লোকটির মুখে-চোখে তীব্র যন্ত্রণা ফুটে উঠল। আলোর বৃত্তগুলো এখন কেবলমাত্র প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে! মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ করে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। সুহাস এবং হ্যারি ওর দুহাত চেপে ধরল। কিছুকাল ছটফট করে প্রৌঢ় লোকটির মাথা অবশ হয়ে টেবিলে কাত হয়ে পড়ল]

প্রৌঢ়।। আমি এসেছি।

সুহাস।। কে আপনি?

প্রৌঢ়।। চিনতে পারছ না! (*কণ্ঠস্বর ভারি এবং কিছুটা রহস্যময়*) সুহাস চিনতে পারছ না আমাকে? (*হেসে উঠল*) সোমনাথকে তো এতো সহজে তোমার ভোলা উচিত নয়।

পর্ণা। কোথায় আছ তুমি, সোমনাথ?

প্রৌঢ়।। অদ্ভুত একটা নির্জন জায়গা—নো-ম্যানস ল্যাণ্ড। পৃথিবী থ্রি-ডাইমেনশনাল, এখানে একটা নতুন গভীরতার স্তর আছে। এখানটা ফোর ডাইমেনশনাল। এখানে মৃত ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর মানুষের বিষণ্ন ক্ষুধার্ত স্মৃতি ঘুরছে। এখান থেকে তাকিয়ে মানুষের হৃদয় দেখা যায়, ঢেকে রাখলেও পাপপুণ্য দেখা যায়! তোমাদের আমি একটা কাচের স্বচ্ছ পুতুলের মত দেখছি, ভিতরে রক্ত বইছে, মিথ্যে বইছে, সুখ-দুঃখ বইছে- – আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

মিঠু।। সোমানাথ, এখনও আমাকে মনে আছে তোমার?

প্রৌঢ়।। সব, সব মনে আছে।

মিঠু।। আমি মরে গেলে তোমাকে খুঁজে বের করব।

প্রৌঢ়।। এখন আমার মায়া খুব কম মিঠু।

সুহাস।। (*হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত গলায়*) কে কে ওখানে? দরজার কাছে?

[*আস্তে আস্তে সোমনাথ ঢুকল। মিঠু সভয়ে চিৎকার করে চোখ ঢাকল। পর্ণা স্থির তাকিয়ে থাকল*]

হ্যারি।। কে আপনি?

সোমনাথ।। আমি সোমনাথ। সোমনাথ রায়। চিনতে পারছ না আমাকে হ্যারি। পর্ণা, ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমাকে কি ভুলে গেছ তোমরা।

মিঠু।। তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও সোমনাথদা। চোখের সামনে প্রেতাত্মা আমি সহ্য করতে পারব না! আমি মরে যাব!

সোমনাথ।। কিন্তু আমি মরিনি, মিঠু। এখনও মরিনি।

পর্ণা।। তাহলে তোমার আত্মা এল কি করে? ঐ মিডিয়ামের মধ্যে তোমার আত্মা যে কথা কইছিল।

সোমনাথ।। অসম্ভব, আমি বেঁচে আছি।

প্রৌঢ়।। ঠিক আছে, তুমি বস সোমনাথ। তুমি বেঁচে আছ ঠিকই, কিন্তু তোমার আত্মা কিছুকাল হল তোমাকে ত্যাগ করেছে। আমি সেই আত্মা। তুমি প্রশ্ন করতে পার আমাকে।

সোমনাথ।। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। নিশ্বাস নিচ্ছি। আমি ছুটতে পারি, লাফাতে পারি, টেবিল-চেয়ারগুলোতে ঘুঁষি মারতে পারি।

পর্ণা।। যদি সত্যিই বেঁচে আছ, তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যাও সোমনাথ।

সোমনাথ।। কেন যাব? আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

পর্ণা।। কেন?

সোমনাথ।। আমি একটা গ্রুপ ছবি তুলব ভাবছিলাম। সবাই মিলে এমন ছবি তোলা বড় শক্ত। আমরা পারি না!

প্রৌঢ়।। আমাকে ছাড়া তোমার গ্রুপ ছবি কি করে তুলতে? আত্মা ছাড়া তোমার ছবি কেমন মিথ্যে মিথ্যে লাগত না?

মিঠু।। আমাকেও ডাকতে তুমি?

সোমনাথ।। ডাকতাম।

পর্ণা।। তুমি চলে যাও, সোমনাথ!

প্রৌঢ়।। কি করে যাবে?

সোমনাথ।। আমার সেই নীল রঙের ঘোড়া . . . আমার স্বপ্নের সেই নীল রঙের ঘোড়া।

প্রৌঢ়।। (*বীভৎস হেসে উঠল*) নীল রঙের ঘোড়া? আমি সেই ঘোড়াটা নিতেই তো এসেছি। বড় ক্লান্ত, ওর পিঠে চেপে আমাকে ফিরতে হবে। আমি তোমার আত্মা! তুমি সোমনাথের খোলস। আত্মা চলে গেলে মানুষের আর কি থাকে? আত্মাই মানুষের মালিক। এখন আমিই যথার্থ সোমনাথ—তোমার স্বপ্নের সেই নীল ঘোড়ার যথার্থ মালিকও আমি। আমি ঐ নীল রঙের ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাব। ঝক্‌ঝকে বাতাসের মধ্য দিয়ে, সবুজ গাছপালা আর কমলা রঙের রোদ গায়ে মেখে আমি চলে যাব। চাঁদটা ডালিমের মত ঠোঁটের কাছে ঝুলতে থাকবে।

সোমনাথ।। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আমার সেই নীল রঙের ঘোড়া আমি ছাড়ব না। কি করে আমার আত্মা আমাকে ছেড়ে গেল? কি করে গেল?

প্রৌঢ়।। এক একদিন তোমার মনে হয় না, কেমন মৃত্যু মৃত্যু লাগছে? মনে হয় না?—নিজের জিভ নিজের মুখের মধ্যে তেতো লাগছে—মনে হয় না? —সব কিছু শক্ত করে মুঠো করেও ধরা যাচ্ছে না। দেওয়ালে রেগে আঘাত করতে গেলেও লাথি পৌঁছয় না, বাতাসে ঝুলতে থাকে। মনে হয় না?

সোমনাথ।। হয়।

প্রৌঢ়।। ভীষণ একা থেকে হঠাৎ মনে হয়নি, প্রেম ভালবাসা সোনালি রূপোলি মাছের মত চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে কোথায় হারিয়ে গেল! তোমার জাল অদৃশ্য ধারালো দাঁতে মারাত্মক ছেঁড়া, মনে হয়নি?

সোমনাথ।। হয়েছে।

প্রৌঢ়।। এক একদিন মনে হয়নি?—তোমার ভরপুর সংসারের মধ্যেও তুমি অপরিচিত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ তোমাকে দেখে তোমার মৃণ্ময়ী, খোকা বা মিনু বলে উঠতে পারত না, কে? কে আপনি? কি নাম? এখানে কেন? বলতে পারত না?

সোমনাথ।। পারত।

প্রৌঢ়।। আত্মা ছেড়ে গেলে এইরকম হয়, তোমার আত্মা খোয়া গেছে। মাথা থেকে যেমন অজান্তে ঘুমের মধ্যে চুল খসে পড়ে, তোমার আত্মাও তেমনি খসে গেছে।

সোমনাথ।। আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে। তুমি শয়তানের আত্মা। পর্ণা, মিঠু, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর আমি বেঁচে আছি। এই দেখ, আমি টেবিলে কি ভীষণ জোরে আঘাত করছি।

[*টেবিলে জোরে দু'হাতে কিল মারতে লাগল*]

সোমনাথ।। শুনছ, শুনতে পেলে শব্দ? আমি বেঁচে আছি। এই শব্দই তার প্রমাণ।

[*ভয়ানক জোরে হেসে উঠল প্রৌঢ় লোকটি আর ধীরে ধীরে সোমনাথের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল*]

সোমনাথ।। পর্ণা!

পর্ণা।। কি হল!

সোমনাথ।। পর্ণা, মিঠু, আমি টেবিলে আঘাত করলাম, শব্দ হল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন টেবিলটা ছুঁতে পারিনি। পর্ণা, তুমি আমার কাছে এস, তোমাকে আমি ধরে দেখি। মিঠু, তোমার সেই কিশোর মুখটা আমার কাছে নিয়ে এস।

[*ওদের চুলে, মুখে, গায়ে অন্ধের মত হাত বোলাতে লাগল সোমনাথ।*]

পর্ণা, মিঠু আমি ছুঁতে পারছি না, ছুঁতে পারছি না আমি। মিনু, মৃণ্ময়ী, খোকা আমি ছুঁতে পারছি না কেন? আমার আঙুল থেকে স্পর্শ পালিয়ে যাচ্ছে, হাত থেকে কররেখা পালাচ্ছে।

[*প্রৌঢ়টি ভয়ানক হেসে উঠল। সোমনাথ একটা চেয়ারের পিছনটা ধরে দাঁড়াল*]

প্রৌঢ়।। আপনারা সকলে বসুন। এবার আমি যাব।

[যন্ত্রের মত সোমনাথ ছাড়া সকলে বসল]

চোখ বুজুন। থিঙ্ক অফ দি সোল। সোমনাথের আত্মার কথা ভাবুন।

[সকলে চোখ বুজল]

সোমনাথ॥ তাকাও, তোমরা তাকাও।

[সকলে চোখ বুজেই থাকল।]

আমার ঘোড়া? আমার সেই নীল ঘোড়াটা কোথায়? আমি পালাব এখান থেকে। এক্ষুণি। কিন্তু কে যেন দরজার কাছ থেকে আমার সেই নীল রঙের ঘোড়াটায় চেপে ছুটে পালাচ্ছে। কে? কে? আমি আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার আত্মা আমার নীল রঙের ঘোড়ায় চেপে পালাচ্ছে! আমি যাব কি করে?

[বাইরে ছুটে চলে গেল। নেপথ্য থেকে সোমনাথের আর্ত গলা শোনা গেল—মাই ব্লু হর্স, এ হর্স, এ হর্স, মাই কিঙ্ডম ফর এ "হর্স"। টেবিলে সকলের মাথা মৃতের মত নেমে এল।]

যবনিকা

মৃত্যুসংবাদ

চরিত্র লিপি

বুলু

সুবোধ

আগন্তুক লোকটি

নীরেনবাবু

প্রৌঢ়

সুহাস

অমল

সুশান্ত

অশোক

অন্যান্য ছেলেরা

১

[*বসবার ঘর। টেবিলে ছড়ানো কতকগুলো কার্ডে বুলু নাম লিখে যাচ্ছে। অন্যদিকের কোণে অ্যাকুইরিয়াম। সন্ধ্যা। নাটকের প্রয়োজন মতো কিছু আসবাব থাকবে। সমস্ত মঞ্চটিতে বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ না করে কিছুটা অর্থপূর্ণ ভাবে ভেঙেচুরে নাটকের ভাবগত চরিত্রের সপক্ষে বিন্যাস করলেই ভাল। একদল তরুণ এলোমেলো কথার গুঞ্জন তুলে ঘরে ঢুকল। তারা উচ্ছল কিন্তু উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিদীপ্ত।*]

অমল।। এই যে বুলুদি, কার্ডগুলো লিখেছ?

বুলু।। না লিখে উপায় আছে? কিচ্ছু হবে না তোমাদের দিয়ে। পরশু স্পোর্টস্, এখন নেমন্তন্নের কার্ড নিয়ে এলে! কখন বিলি করবে, কখন আর সব কাজ করবে? এতো অপদার্থ হয়েছ না! আমি দেখেছি, সুশান্তকে কাজের ভার দেওয়া মানেই কাজ পণ্ড করা।

সুশান্ত।। প্রেসটা এত ভোগাবে কে জানত!

বুলু।। তা অন্য প্রেসে দিলেই পারতে? ক-দিন বাদে আমার পরীক্ষা, এখন নিয়ে এলে একগাদা কার্ড—বুলুদি, নাম লিখে দাও! আর কাউকে দিয়ে করালেই হত না?

নরেন।। প্রত্যেকবার যে তুমিই লিখে দাও। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করতে হবে সে তুমিই ভাল বোঝ।

অশোক।। তাছাড়া হাতের লেখা ভাল হলে এসব ঝামেলা একটু পোয়াতে হয়, বুলুদি।

বুলু।। পরীক্ষার একটুও পড়া হচ্ছে না। বাবা-মা বাড়িতে থাকলে তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করত। আমার পড়ার ঘরটা তোমাদের আপিস বানিয়ে তুলেছ!

অমল।। জান বুলুদি, সুবোধদাকে না, রেসে নাম দিতে ধরেছি। রাজীও হয়েছে।

বুলু।। কেন ও লোকটাকে নিয়ে আবার লেগেছ? নেহাৎ আমার ভয়ে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, নয়তো এর ধারও ঘেঁসত না।

সুহাস।। আসলে কিন্তু বেশ দম আছে সুবোধদার। যদি ভয় পাইয়ে দিতে পারে কেউ, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ফার্স্ট হয়ে যাবে। সেবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে যখন বোমা ফাটল, হাজারখানেক লোককে বিদ্যুৎবেগে পিছনে ফেলে একেবার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল।

বুলু।। থাম তো। বয়সে বড়দের নিয়ে অত ইয়ার্কি কোরো না। তোমাদের ও কম ভালবাসে না। (*নাম লেখা কার্ডগুলো এগিয়ে দিল*) এবার পেয়েছ তো? বাঁচলুম বাবা! আর কিচ্ছু নিয়ে আমাকে জ্বালাতে পারবে না। নিজেরা প্রাইজ কিনবে, যা যা করবার সব করবে। নাও কাটো সব, পালাও। বাব্বাঃ!

[*ছেলেরা চলে যেতেই মাথাটা টেবিলে শুইয়ে একটু বিশ্রাম নিল বুলু। একটু পরে উঠে একটা বই টেনে বসতে যাবে, ফোন বেজে উঠল।*]

হ্যালো...ও, পিসেমশাই? বাবা তো নেই এখানে, মীরাট গেছেন।...হ্যাঁ, মাকে নিয়েই গেছেন। নন্তুমামার ছোটমেয়ে রত্না, ওর বিয়ে।...আমি যাব কি করে? পরীক্ষা যে! এতো বিশ্রী লগে না।...কি বললে?...না না। মীরা খুব পড়ছে তাই না...না, ও পড়ে না!...ব্বাঃ, ভয় করবে কেন? একা আমার ভয় লাগে না। বাবার বন্ধু নীরেনকাকু—উনি রোজ আসেন। খারাপ লাগলে তোমাদের বাড়িতে চলে যাব। রেখে দি?...মীরাকে নিয়ে এস। এস কিন্তু। রেখে দিচ্ছি।

[*দরজাটা ভেজিয়ে পড়তে বসল। দরজায় টোকা পড়ল। বিরক্ত মুখে শব্দ করে বইটা রাখল।*]

বুলু ।। কে?

বাইরে ।। আমি...

বুলু ।। (*মুখটা রেগে উঠল*) এস।

[*দরজা ঠেলে সুবোধ ঢুকল। সাতাশ-আটাশ বয়স, শান্ত নিরীহ দেখতে। সম্প্রতি মুখে কেমন একটা অস্বস্তি, মুখটা রুমালে মুছল। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।*]

সুবোধ ।। তোমাকে বিরক্ত করলাম হয়তো...

বুলু ।। হয়ত নয়, করেছ। সবে একটু বইটা খুলেছি—

সুবোধ ।। ভাবছিলুম আসব না।

বুলু ।। তা নিজের ভাবনাটা পছন্দ হল না যে? আচ্ছা, তোমার কথা কি ফুরোয় না? এতক্ষণ বকবক করে গেলে—

সুবোধ ।। বুলু, সবটা শুনলে তুমি আমার উপর এতটা রুক্ষ হতে না।

বুলু ।। এইতো একটু আগে পর্যন্ত তোমার এত কথা শুনলুম। আমি একটু পড়ব তো? সবাই মিলে যেন জোট পাকিয়ে আমাকে ফেল করাবার চেষ্টা করছ!

সুবোধ ।। তোমার কাছে আমি আসতুম না। নীরেনকাকুর বাড়িতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি তখন প্রচণ্ড মদ খেয়ে পাড়ার ছেলেদের বক্তৃতা করছিলেন। আমার দরকারটা বলতেই পারলাম না। চারদিকে এত অসুবিধে!

বুলু ।। কি এমন দরকার তোমার? অতক্ষণ গল্প করলে, তখন তো কই বললে না!

সুবোধ ।। ব্যাপারটা তার পরে ঘটেছে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, আমাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছে।

বুলু ।। তুমি চিরকালই নার্ভাস। কি হয়েছে চট্‌পট্‌ বল।

সুবোধ ।। বুলু, তোমাকে আমি ভালবাসি। তাছাড়া আমাদের বিয়েও তোমার পরীক্ষার পরে হবে। তাই—

বুলু ।। তাই কি?

সুবোধ ।। তাই আমার কিছুই তোমার কাছে লুকনো ঠিক না। তুমি জান, আমার একটু ভয় বেশি। সব রকমে ভয়: ভূতে, ভালবাসায়, ভগবানে।...ছোটবেলায় জলের ভয়ে সাঁতার অবধি শিখিনি। মনুমেন্টের উপর বাড়ির সব্বাই উঠেছে, আমি উঠিনি। হাওড়ার ব্রিজের রেলিং ধরে গঙ্গার দিকে তাকাতেও আমার ভয়। যখন আমার সাত বছর—

বুলু ।। তোমার সাত বছর থেকে সাতাশ বছরের আত্মজীবনী পরে আমি ধৈর্য ধরে শুনব। এখন তোমার কি হয়েছে বল।

সুবোধ ।। এখন, এক কথায়, আমি ভয় পেয়েছি।

বুলু ।। ভয় পেয়েছি! রোজই তো তুমি একটা না একটা ভয় পাচ্ছ! কথাটা বলতে লজ্জা করে না?

সুবোধ ।। তোমার কাছে কোন লজ্জা নেই আমার। তোমাদের বাড়ি থেকে রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে একটা মজা ডোবার ধার দিয়ে আমাদের বাড়ি যেতে পথটা

রাত্তিরে কি নির্জন জান তো। তুমি তো গেছ ও পথ দিয়ে। ডোবাটার পাশে, মনে আছে, একটা ঝোপ-মত রয়েছে? আমি ওর কাছ দিয়ে যেতেই একটা লোক যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমাকে দেখে ছায়ামূর্তির মত একটা গাছের আড়ালে লুকোল।

বুলু।। তারপর?

সুবোধ।। তারপর আমি এক ছুটে নীরেনকাকুর বাড়ি, সেখান থেকে এখানে।

বুলু।। বীরত্বের দেখছি অন্ত নেই! মনের ভয়ে কিছু ভুল দ্যাখনি তো?

সুবোধ।। কান্নাও যে শুনলুম, কানেরও কি ভুল হবে? তবে ঠিক কান্না নয়, যেন হাঁপাচ্ছে। মনে হল যেন অসুস্থ। বোধহয় গোঙাচ্ছিল...

বুলু।। ভাল করে দেখলে না পর্যন্ত!

সুবোধ।। ভয় পেয়ে গেলুম যে! সাত বছর বয়সে টাইফেয়েডে ভোগার পর থেকে ভয়টা আমার রোগ হয়ে উঠেছে, বুলু।

বুলু।। আশ্চর্য। হয়তো একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে!

সুবোধ।। না-ও তো হতে পারে।

বুলু।। সেটা তো বোঝা উচিত তোমার। বুঝলে, জীবনে কিছুটা সাহস অন্তত দরকার।

সুবোধ।। কিন্তু অসুস্থ কেউ না হয়ে আর কিছু হলে কী ভয়ানক ঝুঁকি ভাব?

বুলু।। (*অসহায়*) একটু পৌরুষ নেই তোমার?

সুবোধ।। যদি বেঁচে থাকি পৌরুষ না থাকলেও পুরুষ তো থাকব। বীরের মতো দু'দিন বাঁচার থেকে ভিতু হয়েও বহুদিন বাঁচতে আমার ভাল লাগে।

বুলু।। তা কি করতে চাও এখন? এখানে বসে থাকবে আর ভয়ের কাঁদুনি গাইবে?

সুবোধ।। দ্যাখো বুলু, আমাদের যখন বিয়েই হবে, তোমাকে আমি কিছু লুকোতে চাই না। তাছাড়া আমার এই জীবনের একটা দামও তো আছে। আমার এখন একা ফেরা ঠিক নয়। তাই নীরেনকাকুর কাছে গিয়েছিলাম, ওঁর কাছে সব খুলে বলতাম। উনি তো অনেকবার সুইসাইড করতে চেয়েছেন, আমাকে এগিয়ে দিতে পারতেন।

বুলু।। ব্বাঃ!

সুবোধ।। দ্যাখো, ভয়ও একটা রোগ, আমার রোগটা আছে বলে তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? এ তো পাপ নয়, দোষ নয়, রোগ। একদিন হাসপাতালে বুলু, তোমার মত একটি মেয়েকে অসুস্থ দেখে আমার বুকটা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ; আমি মনে মনে কেবল বলছিলাম, কোন অসুখ যেন তোমাকে না ছোঁয়। এতো ভয় করছিল...ভাবলাম চিরকাল তোমাকে আমি আগলে রাখব, আমার এই ভয় যেন কোনকালে না ভাঙে। এই ভয়টাও তো ভালবাসা, বুলু।

[*দরজা দিয়ে নীরেনকাকু ঢুকলেন। প্রৌঢ়। মুখটা বিষণ্ণ এবং বিদগ্ধ। এক এক সময় সরল এবং শিশুর মত। ওঁর পকেট থেকে একটা মদের বোতল উঁকি দিচ্ছে। চোখে মদ্যপানের আমেজ।*]

নীরেন।। বুলু, তোমার বাবা চিঠি দিয়েছেন একটা—দু-এক দিনের মধ্যেই আসবেন। তুমি চিঠি পেয়েছ?

বুলু।। (*গম্ভীর*) পেয়েছি।

নীরেন ।। এই যে সুবোধ, তোমাকে আমার জানলার কাছে যেন উঁকি মারতে দেখলুম?

সুবোধ ।। হ্যাঁ, আপনি কয়েকজনকে ধরে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন তাই চলে এলুন।

নীরেন ।। ইয়েস। বলছিলাম, পৃথিবীর চারদিকটা গর্ত গর্ত হয়ে আছে, সো মেনি হোলস্...ইভন্ দ্যা স্কাই হ্যাজ হোলস্। তাছাড়া —(*বুলুকে*) কিন্তু বুলু যেন গম্ভীর হয়ে আছে। তোমার জিভ আর বাতাস তো বন্ধ থাকে না। কি হয়েছে বল তো?

বুলু ।। তোমার সঙ্গে আমি কোনদিন কথা বলব না কাকু!

নীরেন ।। বাব্বা! আমার অপরাধ?

বুলু ।। তুমি আবার মদ খাচ্ছ? বললে না আর খাবে না।

নীরেন ।। কি করব? খেয়েছি বলে কি আর আমি একটুও বদলেছি? তাছাড়া একেবারে খাব না এ শপথ কি আর করা যায় রে!

বুলু ।। ঠিক আছে, খাও। মরে যাও। আমরা সবাই নিষেধ করছি— না শুনলে যদি তোমার পুণ্য হয়, পুণ্য জমা কর।

নীরেন ।। (*মুখটা বিষণ্ণ হল*) পুণ্য দিয়ে আমার কি হবে রে? কিছু পাপ জমা থাকলে তবু না হয় ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স হত।

বুলু ।। আজেবাজে বোকো না তো! একদিকে তোমার প্রলাপ, অন্য দিকে এই লোকটির ভয়ের বিলাপ। মাঝখান থেকে আমার অবস্থাটা ভাব।

নীরেন ।। কিসে আবার ভয় পেলে হে, সুবোধ?

সুবোধ ।। নীরেনকাকু, একা বাড়ি ফেরা আমার ঠিক হবে না।

নীরেন ।। কেন বল তো?

সুবাধ ।। রেল লাইন ছাড়িয়ে নির্জন ঝেপটার কাছে ছায়ামূর্তির মত একটা লোককে বসে থাকতে দেখেছি। হাঁপাচ্ছে। ব্যাপারটা ভৌতিক, এতো আনক্যানি। এতো—

বুলু ।। থাম তো তুমি, হয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে ঝোপের কাছে পড়ে রয়েছে, তোমার উচিত ছিল ব্যাপারটা বোঝা। এমন কিছু তো লোকটা করেনি যাতে তুমি ভয় পেতে পার। বরঞ্চ লোকটাই হয়ত ভয় পেয়ে লুকিয়েছে।

নীরেন ।। চল না আমরা দুজনে দেখে আসি।

বুলু ।। কি আশ্চর্য, ও একটা পুরুষমানুষ—একা যাবার সাহস নেই? কেন? মেয়ে হয়ে আমার যে সাহস রয়েছে—

সুবোধ ।। তুমি বললে আমি যেতে পারি। কিন্তু যদি এর একটা ব্যাড কনসিকোয়েন্স হয়—

বুলু ।। যেতে হবে না তোমাকে। ভয়, ভয় আর ভয়! এত বিশ্রী লাগে আমার!

নীরেন ।। লোকটাকে কি আহত দেখলে?

সুবোধ ।। কিছুই দেখিনি জানেন, সময় পাই নি।

বুলু ।। শুনলে?

নীরেন ।। না, না, ও জায়গাটা সত্যি-সত্যিই খারাপ। এত নির্জন, অনেক সময় শুনেছি ওখানে খুনটুনও পর্যন্ত হয়েছে। কোন আহত লোক যদি সত্যি-সত্যি পড়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। পৃথিবীটাকে মারাত্মক শূন্য মনে হলেও আমি ভাবি, নিশ্চয়ই আমার একটা বড় কাজ বাকি আছে, একটা মিশন —নয়তো বেঁচে আছি

কেন? হয়তো এই লোকটিকে বাঁচানোই আমার সেই বড় কাজ। বরঞ্চ আমিই দেখে আসি।

বুলু॥ লজ্জা হয় না তোমার? বাষট্টি বছরেব কাকু যাচ্ছে সাহস করে, আর তুমি কাঁপছ?

সুবোধ॥ ঠিক আছে আপনি বসুন, নীরেনকাকু, আমিই যাচ্ছি।

নীরেন॥ কি দরকার, আমিই তো—

সুবোধ॥ যাচ্ছি, কিন্তু ফিরব কি না জানি না।

নীরেন॥ সুবোধ—

[বিদ্যুৎবেগে সুবোধ বেরিয়ে গেল, নীরেনবাবু বাধা দিতে গিয়ে কোটটা ধরতে কোটটা খুলে ওঁর হাতেই ধরা রইল।]

নীরেন॥ কেন ক্ষেপিয়ে দিলি ওকে? একে নার্ভাস। ঝোঁকের মাথায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আমিও যাচ্ছি, বুলু। দেখি আবার—

বুলু॥ চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

নীরেন॥ যাবি? তবে টর্চটা সঙ্গে নিয়ে নে। আর তোর বাবার বন্দুকটা।

বুলু॥ কিন্তু কার্তুজ তো নেই—

নীরেন॥ কেবল বন্দুকের চেহারাটা সঙ্গে থাকলেই অনেকটা কাজ দেবে।

[দরজা খুলে সুবোধ ঢুকল। চারদিকে কি খুঁজল, হঠাৎ কোটটা পেয়ে দ্রুত গায়ে পরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ওরা অবাক।]

নীরেন॥ সুবোধকে কেমন অদ্ভুত লাগল না?

বুলু॥ তাই তো মনে হচ্ছে...দাঁড়াও বন্দুকটা নিয়ে আসি—

[বুলু ভিতরে গেল। নীরেনবাবু প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা মদের বোতল বের করে দু-একটা চুমুক খেলেন।]

নীরেন॥ ভার্চু ইজ এ পেয়ার অফ প্যান্টস, য়্যু ড্রপ দেম হোয়েন য়্যু গেট এ চানস্।

[বুলু একটা টর্চ আর বন্দুক নিয়ে ঢুকল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবোধও ঢুকল। মুখটা অস্থির। বুলুর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।]

বুলু॥ কী আরম্ভ করেছ, সুবোধ! বন্দুক নিয়ে কি করবে? এতে গুলি নেই।

সুবোধ॥ বন্দুকটাই যথেষ্ট। বুঝলেন, নীরেনকাকু, লোকটা না, আমার থেকেও ভিতু। তাই আমার সাহসটা যেন দশগুণ হয়ে উঠেছে। লোকটা...বুলু, তোমাদের পোলট্রির খাঁচার কাছে গুঁড়ি মেরে কিছু করছিল—নিশ্চয়ই মুরগি চুরির ব্যাপার। আমাকে দেখেই এক পাশে লুকোল। এবার গিয়ে সোজা বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে এখানে নিয়ে আসব। আমার মধ্যে সাহস আসছে। দারুণ ভাল লাগছে!

নীরেন॥ আমরাও তো যাচ্ছিলাম—

সুবোধ॥ কেউ যাবেন না। আমার যে সাহস আছে, আমি যে কিছু পারি তা বুলু, তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে চাই। আমি যাচ্ছি। লোকটা হয়তো এর মধ্যে পালাবে।

আমি যে দেখতে পেয়েছি তা জানতে দিইনি। আসছি। এক্ষুনি যাব আর আসব। তোমরা বস।

[*সুবোধ বেরিয়ে গেল।*]

নীরেন।। ছেলেটা কোনো কাণ্ড করে না বসে। বুলু, ওর ভেতরে একটা কোমল সৌন্দর্য আছে। একটু ভিতু বলে ওকে আঘাত দিস নে।

বুলু।। এক-এক সময় গা জ্বলে যায়। সবাই ওকে নিয়ে হাসে!

নীরেন।। তুই কেবল হাসিস না। ও তোকে ভালবাসে রে। ভালবাসা অনেক ক্ষমা চায়। ভালবাসা একটা ডাক্তারি বিদ্যে, অনেক মেয়ে এটা বোঝে না।

[*বাইরে থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল—'বুলু!' মঞ্চে ওরা সন্ত্রস্ত হয়ে বেরুবার জন্য এগিয়েই পিছুতে লাগল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, প্যাণ্ট, বুশ শার্ট, বুট পায়ে মলিন চেহারায় একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের লোক সুবোধের কলার ধরে প্রায় ঝুলিয়ে ঘরের ভিতবে টেনে আনছিল। লোকটার হাতে সুবোধের বন্দুক। ঘরে এনে সুবোধকে ছেড়ে দিল।*]

নীরেন।। কি হল, সুবোধ!

সুবোধ।। আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম, সেই সুযোগে এই খুনীটা এসে নেকড়ের মত—

লোকটি।। (*'খুনী' শব্দটা শুনেই ভাঙা তীব্রকণ্ঠে*) চুপ! (*দু-হাতে নিজের মুখটা যেন আঁচড়ে আঁচড়ে মুছল*) কে বলেছে আমি খুনী? আমার হাতে রক্ত লেগে নেই, সঙ্গে ছুরি নেই! কিন্তু কিন্তু কি করে আমি আমার বিষাক্ত স্মৃতি থেকে রক্ত মুছে ফেলব? কি করে আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যের ভয়ঙ্কর বাঘটাব কামড় থেকে বাঁচব? তাকান আমার দিকে, তাকান আপনারা—কী ভীষণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছি আমি; কী ভীষণ ভেঙেচুরে গেছি। ভয়ানক উঁচুতে ঈশ্বরের হাত থেকে একটা কাচের লণ্ঠনের মত মাটিতে পড়ে গেছি। উঃ, পতনের কী ভীষণ শব্দ! আলোর শিখাটা ময়লা কাদা মেখে, বাতাসের খোঁচা খেয়ে, পায়ের নোংরা সব চাপে কি ভীষণ অসহায়! বুঝবেন না, আপনারা কেউ বুঝবেন না—

সুবোধ।। কথার জাল ছড়াচ্ছে লোকটা, আসলে একটা ডাকাত!

লোকটি।। আমি কক্ষণো ডাকাত নই। যদি হতে পারতাম—যদি ডাকাতের মতো একটা লাঠির আঘাতে ঐ চাঁদটকে গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম, নিজের ছায়াটার বুকে চেপে বসে যদি তার শ্বাসরোধ করে দিতে পারতাম, যদি হাতের রেখাগুলোকে টেনে তুলে অন্যরকমভাবে সাজাতে পারতাম!! আমি পারি না, কিচ্ছু পারি না আমি, কিচ্ছু পারি না।

নীরেন।। আমাদের এই ছোট্ট শহরটায় আগে আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

লোকটি॥ আমি এই প্রথম এসছি। (*হঠাৎ কি মনে করে দ্রুত উঠে দরজাটা বন্ধ করে এসে জড়সড় হয়ে বসল*) এতো গরম তবু যেন শীত-শীত করছে।

বুলু॥ দরজা বন্ধ করলেন কেন?

লোকটি॥ এমনি। (*তারপর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বুলুর দিকে তাকিয়ে থেকে, চোখ বুজে মুখটা বুকের দিকে ঝুলিয়ে দিল*) আশ্চর্য, আমি বাঁচব না! (*মুখ তুলে বুলুর দিকে আবার তাকাল*) আপনার মুখের উপর দিয়ে, চোখের মণির মধ্য দিয়ে আমি একটা প্রজাপতি উড়ে যেতে দেখলাম। এইমাত্র আপনার ঘাড়ের উপর বসল। কানে, গালে, কপালে, শাড়িতে, জামায় পায়ে কি ভীষণ উড়ছে। কি অদ্ভুত রঙ, কি আশ্চর্য পাখা! আমি মরে যাব!

[*লোকটা টেবিলে মাথা নুইয়ে রাখল।*]

বুলু॥ কি আবোলতাবোল বকছেন আপনি?

সুবোধ॥ মাথার গণ্ডগোল, বুঝতে পারছ না? বুলু, তুমি ভিতরে যাও, আমরা যাচ্ছি। চল, তোমাকে ভিতর-ঘরে এগিয়ে দি।

বুলু॥ অত অস্থির হ'য়ো না তো।

নীরেন॥ (*লোকটিকে*) এই যে শুনুন--

সুবোধ॥ ফেইণ্ট হয়ে গেল নাকি রে বাবা!

বুলু॥ শুনুন, কথা বলছেন না কেন?

নীরেন॥ কোন একটা ব্যাপারে সম্ভবত ওর ভেতরটা নাড়া খেয়েছে। আমার সব সময় মনে হয় আমার কিছু একটা করার আছে, একটা মিশন, বোধহয় এই লোকটিকে দেখাই আমার সেই কাজ। একে এক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

সুবোধ॥ অদ্ভুত একটা ঝামেলা বয়ে নিয়ে এলুম দেখছি।

নীরেন॥ ঝামেলাটা আমার। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বুলু॥ জিগ্যেস কর না কাকু, কি হয়েছে ওঁর?

নীরেন॥ কাকে জিগ্যেস করব? কথাই তো বলছে না।

লোকটি॥ (*তাকাল*) আবার, আবার সেই প্রজাপতিটা, আপনার চিবুকের কালো তিলটার উপর বসে ডানা নাড়ছে!

সুবোধ॥ এ ঘরে প্রজাপতি দেখার মতো দিব্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই! আমার মনে হয় ড্রিংক করেছে লোকটা। বুলু, এসো মাথায় জল ঢেলে দি। ঠিক হয়ে যাবে।

নীরেন॥ প্রজাপতি দেখছেন কোথায়?

লোকটি॥ আমি জানি আপনারা অবাক হবেন। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমার মাথার মধ্য থেকে একটা রঙিন উজ্জ্বল প্রজাপতি বেরিয়ে গেছে, আর একটা ভিমরুল সেখানে ঢুকে অহরহ হুল ফোটাচ্ছে, কামড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পোকাটা আমার হৃৎপিণ্ডটাও ফুটো করে দেবে। আমি মরে যাব তখন। (*চুপ করে তাকাল*)...আর ঐ প্রজাপতিটাকে জানেন, আমি হঠাৎ-হঠাৎ উড়তে দেখি, কখনো কারুর মুখে-চোখে, কখনো-কখনো জ্যোৎস্নার মধ্যে, ফুলের বাগানে, ভোরের রোদের মধ্যে, আকাশের নীলচে রঙে, এমন কি বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যেও আমার ওই প্রজাপতিটাকে উড়তে দেখি। বিশ্বাস হয় না, না?

সুবোধ।। কেন হবে না! আপনার এখন মাথার যা অবস্থা তাতে আপনি প্রজাপতির বদলে যদি চড়ুই দেখেন, বা চামচিকে কিংবা পেঁচা—যা দেখেন তা-ই সম্ভব মনে হবে!

[*দরজায় কড়া নড়তেই লোকটি চমকে উঠল।*]

লোকটি।। দরজা খুলবেন না! আমি না দেখেই বলে দিচ্ছি ও পুলিশের লোক! আপনারা আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখুন। বিশ্বাস করুন, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

নীরেন।। দাঁড়ান, আমি দেখছি। (*জানালা দিয়ে তাকিয়ে*) কে? ও, হরি? তুই যা, আমি একটু বাদে যাচ্ছি। (*ফিরে এসে*) আমাব মালিক বলতে পারেন। ও-ই আমার রান্নাবান্না করে দেয়, দেখাশোনা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরীহ লোক। কোন ভয় নেই আপনার।

বুলু।। কিন্তু আপনি এতো পুলিশে ভয় পাচ্ছেন কেন?

লোকটি।। নিশ্চয়ই কারণ আছে।

সুবোধ।। আপনাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে তো দেখছি আমারই বিপদে পড়ে যাব। আপনাকে খুনী, চোর কিংবা ডাকাত বললে চটে যাচ্ছেন, কিন্তু এ সবের কিছু না হলে পুলিশে ভয় হবে কেন? পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চয়ই টাকা ধার করে পালাননি?

নীরেন।। আপনি আমাদের বলুন, কি হয়েছে আপনার, কোন ভয় নেই, আমরা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করব।

লোকটি।। বলা সম্ভব নয়। ভাবলে আমার সমস্ত অস্তিত্ব কাঁটা দিয়ে ওঠে! মনে হয় একটা ক্ষিপ্ত ভয়ংকর কাল বেড়াল রক্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে যাচ্ছে! রাত্তির হলে অন্ধকারটা হাতুড়ির মতো বুকে ঘা দিতে থাকে। আমার পাপের ক্ষমা নেই। কী ভয়ংকর অপরাধ করেছি আমি!!

বুলু।। কি করেছেন বলুন না? কোন ভয় নেই আপনার।

সুবোধ।। বুলু যখন বলছে, তখন বলুন না।

নীরেন।। বলে ফেলুন, আমরা আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করব।

লোকটি।। আমি...আমি...মানে...উঃ! অসহ্য লাগছে আমার! আমি আমার বাবাকে খুন করে পালিয়েছি!!

সুবোধ।। বাবাকে খুন করেছেন? আর কি লোক পেলেন না?

বুলু।। কি করেছিলেন উনি?

লোকটি।। কিছু না। প্রচণ্ড ভালবাসতেন আমাকে।

সুবোধ।। তাহলে তো খুবই দোষ করেছেন, বলতে হয়?

লোকটি।। বিন্দুমাত্র নয়।

সুবোধ।। তবে নিশ্চয়ই আপনার বাবার মধ্যে আপনি কোন দোষ দেখতে পেয়েছিলেন?

লোকটি।। একটুকুও না। এতো ভাল লোক সচরাচর দেখতে পাবেন না। আমার মা নেই। বাবার মতো কেউ আমাকে এতো ভালবাসতেন না।

বুলু।। এতো ভালবাসতেন আপনাকে, তবু তাকে খুন করলেন?

লোকটি।। উপায় ছিল না, জানেন—এ ছাড়া কোন পথ ছিল না আমার। একটা দুঃস্বপ্নের অন্ধকার আমাকে তাড়া করছিল। বাবা ঘুমিয়ে ছিলেন, হাতের কাছে কিছু না

পেয়ে কয়লাভাঙার হাতুড়িটা তুলে নিয়েছিলাম। তারপর বাবার শান্ত উদাসীন নিরুদ্বেগ ঘুমন্ত মাথাটায় চোখ বুজে ভীষণ জোরে ঘা মারলুম। ব্যাস, সব শেষ! উঃ, কী ভয়ানক দৃশ্য! ফিন্‌কি দেওয়া রক্ত! আমি যত ছুটছি, মনে হচ্ছে ঐ রক্তও আমার পিছনে ছুটছে। জানেন, ঐ ভয়ংকর রক্তের ফোঁটা এসে এই বন্ধ দরজায় আঘাত করতে পারে? বাবার সেই আর্ত শেষ চিৎকার এই দেয়াল ফুটো করে বজ্রপাতের মতো আমাকে পুড়িয়ে দিতে পারে!

সুবোধ।। আপনি তো তাহলে দেখছি বর্ন-ক্রিমিন্যাল। আপনার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীর একটা জঘন্য প্রাণী দেখছি। মানুষকে অকারণ একটা চড় মারাই পাপ —আর আপন পৃথিবীর সব থেকে আপন, নিজের বাবাকে—

লোকটি।। দেখুন, বাবা নিজেরই হয়।

নীরেন।। বাবার উপর এতো ভালবাসা আপনার, অথচ এমন কাণ্ড করলেন?

লোকটি।। আমি কি চেয়েছি? উপায় ছিল না যে! এই পৃথিবীটার উপর প্রচণ্ড রাগ আমার। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি অসহ্য। কিছু হই নি, হল না, হতে পারব না। ভালবাসিনি, ভালবাসেওনি কেউ। মাথার মধ্যে ভিমরুলটা অসহ্য কামড়াচ্ছে, ক্রমশ হৃৎপিণ্ডটাও ফুটো করে ফেলবে। প্রজাপতিটা, আমার প্রজাপতিটা কোথায় পালাল? এই পৃথিবীতে আমি না এলেই কত ভাল ছিল। আমার বাবা, মা এরাই তো আমাকে অনর্থক নিয়ে এল। পৃথিবী কি নিষ্ঠুর খেলা খেলছে আমাকে নিয়ে। আমার বাবাই তো দায়ী। মা থাকলে তাঁকেও দায়ী করতাম। আমি মরে যেতে পারতাম—বাবা আমাকে ঘিরে রেখে রেখে বাঁচিয়ে রেখেছে আরও ভয়াবহ অস্তিত্বের অগ্নিকাণ্ডে আমাকে দিনরাত পোড়াবে বলে। বাবা, আমার বাবাই সব অস্বস্তির মূলে। ওই প্রৌঢ় লোকটি স্নেহের ছাতা ধরে আমাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবতে-ভাবতে অস্থির হয়ে যেতাম এক-একদিন। অসহ্য মুহূর্তে প্রতিদিন মেরে ফেলতে চেয়েছি, পারিনি। শেষ পর্যন্ত পারলুম। আজ আমি মুক্ত, পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার শোধ নিয়েছি।

বুলু।। পৃথিবীর আর সব খুনীর থেকে কিন্তু আপনি আলাদা। খুনের মধ্য দিয়ে আপনি একটা অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন, তাই না?

লোকটি।। ঠিক বলেছেন আপনি। তা ছাড়া আমি আমার বাবাকে ছাড়া আর কাকে মারতে পারি? আমার আপন লোক ছাড়া কাকেই বা মারবার অধিকার আছে আমার?

[চারদিক ভুলে গিয়ে পকেট থেকে মদ বের করে কয়েক চুমুক খেলেন নীরেনবাবু। একটু হাঁটলেন। দ্রুত বোতলটা পকেটে লুকোলেন। উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি।]

নীরেন।। কেবল বাবা নয়, আমাদের উচিত সমবেত আত্মহত্যা। যারা অর্থহীন তারা একটা বিরাট উৎসবের মতো করে মরবে। আমিও কয়েকবার মরতে চেয়েছি, বুঝলেন? কিন্তু আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছি। শেষবার বিষ খেলাম, তারপর একটা চৌবাচ্চার ওপর দাঁড়িয়ে বাথরুমের কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় পরলুম। তাতেও যদি বেঁচে যাই এই ভয়ে নিজেকে গুলি করে ঝুলে পড়েছিলাম। কিন্তু কি জানেন? আফিংয়ের বিষ, গলায় দড়ি আর বন্দুকের গুলি এই তিনের আক্রমণেও মরলাম না।

লোকটি।। বেঁচে গেলেন!

নীরেন্।। পুরোপুরি। প্রথমত, গুলিটা গিয়ে ফসকে ঝোলান দড়িটাতে লাগল। ছিঁড়ে চৌবাচ্চার জলে পড়লুম। আর জলে বিষের ক্রিয়া লোপ পেল।

লোকটি।। আশ্চর্য তো!

নীরেন।। আজও আমার মরে যাবার ইচ্ছে লোপ পায়নি। তাহলেও বেঁচে গিয়ে বিশ্বাস হয়েছে, কি একটা কাজ আমার করা বাকি আছে—একটা মিশন, একটা মিশন নিশ্চয়ই রয়ে গেছে। আপনাকে পেয়ে মনে হল আমি ঠিক লোক পেয়েছি, যে সমস্ত বুকে ভালবাসা রেখেও বাবাকে মেরে পৃথিবীতে তার জন্মগত শাস্তির শোধ নিতে পারে সেই তো প্রকৃত বীর। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বীরকে দেখতে পাচ্ছি আপনার মধ্যে! কি বলিস বুলু?

বুলু।। আমিও অবাক হয় যাচ্ছি কাকু। আপনার মধ্যে কত বড় একজন বীর বাস করছে আপনি জানেন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে আপনি জিতেছেন। আপনার আচরণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঘটনা।

সুবোধ।। তোমরা এ সব কি বলছ, বুলু? নীরেনকাকু, বুলু—কি বলছ তোমরা?

লোকটি।। আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমি এক মহৎ কাজ করেছি। কেবল অনুশোচনা আমাকে একটু পীড়া দিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, আমার ভেতরের ভিমরুলটা আর তেমন কামড়াচ্ছে না। কী চমৎকার জ্যোৎস্না দেখছি ঐ জানালার বাইরে! জ্যোৎস্নার মধ্যে আমার মাথার মধ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই প্রজাপতিটাকে যেন উড়তে দেখছি! কাউকে ভয় করিনা আমি, কেবল এক টিকটিকি ছাড়া।

বুলু।। টিকটিকিকে ভয়! কেন?

লোকটি।। আমি যখন বাবাকে মারতে যাচ্ছিলাম, বাবার মাথার উপরের দেয়ালে একটা টিকটিকি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে লক্ষ করছিল। আমি বাবার মাথায় ঘা দিতেই ওটা বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে কড়ি-বরগার মধ্যে হারিয়ে গেল। ঐ সাক্ষী টিকটিকিটা বোধহয় আমাকে খুঁজছে, বোধহয় আমাকে দেখলে মানুষের মতো 'খুনী! খুনী!' বলে চিৎকার করে উঠবে।

নীরেন।। কাউকে ভয় নেই আপনার। ঐ টিকটিকিটাও মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দেখেছে। মানুষের প্রবলতম বিদ্রোহে ও অবাক হয়েছে। আপনি বুঝতে পারছেন না।

বুলু।। সত্যি, আপনার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রথম সার্থক বিদ্রোহের জন্ম হল।

সুবোধ।। বুলু, আমি তোমাদের যেন চিনতে পারছি না। তোমরা আমাকে চিনতে পারছ? একজন খুনীকে নিয়ে তোমরা কি সব আরম্ভ করলে, বল তো?

নীরেন।। *(আবার মদ খেলেন)* তুমি জীবনের এই বিশাল রহস্য বুঝবে না সুবোধ। এর ভাষা বুঝবে না, আচরণ বুঝবে না—তোমার মূর্খতা তোমার আশীর্বাদ! ঈশ্বর করুন, এই দুঃসহ আগুন যেন তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে।

সুবোধ।। কিছু বুঝতে পারছি না আমি। বুলু, একটু বাইরের হাওয়ায় চল না—দেখবে আবার সব আগের মত হয়ে যাবে। লোকটা একটা ম্যাজিশিয়ান, হিপ্‌নোটিজম্ জানে—তোমরা দুজনেই মেসমেরাইজড় হয়েছ। চলে এস বাইরে।

নীরেন।। একটা হিপ্‌নোটিক স্পেলই তো চাইছিলুম হে। একজন ম্যাজিশিয়ানের

অপেক্ষাই তো করছিলুম—যে শূন্যের থেকে ফুল এনে দেখাবে, অন্ধকারে হাত ঢুকিয়ে পায়রা এনে হাজির করবে, যাদুদণ্ডের একটু নাড়ায় এই পরিচিত পৃথিবীর বোধগুলোকে অথর্ব করে আর একটা আচ্ছন্ন পৃথিবী জাগিয়ে তুলবে। ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না, সুবোধ? তোমরা ভুলে গেছ আমি বলতাম, দ্য আর্থ ইজ ফুল অফ হোলস্, ইভন্ দ্য স্কাই হ্যাজ হোলস, আর সেই গর্তের মধ্য থেকে বাঘের মতো এই মানুষটি বেরিয়ে এসেছে। উই হ্যাভ গট আওয়ার হিরো। আমরা আমাদের নায়ককে পেয়ে গেছি।

সুবোধ॥ পাপকে আপনি সমর্থন করছেন?

নীরেন॥ পাপ! কী বলছ তুমি? মানুষ—মানুষ যখন ঈশ্বরকে হত্যা করল, তখনই মানুষ প্রথম বিশুদ্ধ রক্ত দেখেছে। ঈশ্বর হত্যার ছুরি মানুষের আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এ হত্যা কি পাপ? ঈশ্বরের পরেই পিতা দ্বিতীয় শহীদ—যে আমাদের এই অনিচ্ছুক জন্মের অন্যতম কারণ। সত্যিকারের হিরো ছাড়া এই হত্যা সম্ভব নয়।

সুবোধ॥ আমি একটু বাইরে যাই, বুলু। চারদিকের বাতাসে আমি কেমন বদলে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, খানিকক্ষণ এখানে থাকলে আমিও কি রকম একটা বক্তৃতা-ফক্তৃতা দিতে আরম্ভ করব। হয়তো চারতলা থেকে একতলা কতটা নিচু মাপবার জন্যে ফিতে হাতে ছাদ থেকে রাস্তায় হাসিমুখে লাফ দিয়ে বসব। দ্যাখো, চেনাশুনো পৃথিবীটা আমার কাছে খারাপ লাগে না, বুলু, কেবল তোমরা বদলে গেলেই ভয় করে; সব কিছু যদি খারাপ লাগতে আরম্ভ করে?

বুলু॥ সারাজীবন তোমার কেবল ভয় ভয় আর ভয়!

লোকটি॥ আচ্ছা, হঠাৎ যদি পুলিশ আসে?

নীরেন॥ কে জানবে আপনি এখানে আছেন?

লোকটি॥ কেন, সেই টিকটিকিটা!

বুলু॥ ভয় নেই, টিকিটিকি এতদূর পথ চিনে আসতে পারবে না।

সুবোধ॥ উঃ! আমি একটু বাইরেই দাঁড়াই। এক-এক সময় মনে হয় পরিষ্কার বাতাসের থেকে বড় আত্মীয় কেউ নেই।

[*সুবোধ আস্তে আস্তে চলে গেল।*]

নীরেন॥ বুলু, একটা কাজ করা যাক—হরি তো খাবার জন্য আমাকে তাড়া দিয়ে গেল। আমি বরঞ্চ ওকে দায়িত্ব মুক্ত করে আসি। উনি তো এখানেই থাকছেন, আমিও না হয় তোদের বাড়িতেই থেকে যাব। কিংবা আমার বাড়িতেও ওঁকে নিয়ে যেতে পারি।

লোকটি॥ এখানে দোষ কি? মনে হচ্ছে আমি ঠিক জায়গায় এসেছি। (বুলুকে) আমি আপনাদের এই ঘরটায় থাকলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?

বুলু॥ না, না, এতো বড় বাড়িটা তো আমাদের কাজেই লাগে না।

নীরেন॥ আমি তাহলে ঘুরে আসছি?

বুলু॥ তাড়াতাড়ি এস কাকু।

নীরেন॥ আসব। তুই ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিস।

[*নীরেনবাবু চলে যান।*]

লোকটি॥ (*জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে*) কী চমৎকার বাতাস! জানেন, আগে ঠাণ্ডা-

ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলেই ভয় করত। মনে হতো ভবিষ্যতের কালো-কালো জঙ্গল থেকে হিম একটা বাতাস আমার আত্মার মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

বুলু।। আর এখন?

লোকটি।। এখন আমার ভাল লাগছে। বাইরে জ্যোৎস্নায় আমার সেই প্রজাপতিটা উড়ছে। (*বুলুর দিকে তাকিয়ে*) কী আশ্চর্য, এখন আপনার মুখের উপর উড়ছে! আপনার জামা-কাপড়ের মধ্যে লুকোচ্ছে—কি মজার একটা খেলা চলছে। আপনাকে আমার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।

বুলু।। (*একটু চকিত দ্রুত গলায়*) আপনি হাতমুখটা একটু ধুয়ে নেবেন না? খেয়ে নিন না, নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে?

লোকটি।। বেশ ক্ষিধে। আটদিন ধরে কেবল হাঁটছি আর হাঁটছি, কখনও লুকিয়ে বেড়িয়েছি। মানুষ দেখলে চমকে উঠেছি। ভয় পেয়েছি।

বুলু।। আমাকে ভয় করছে না, আমিও তো মানুষ।

লোকটি।। একদম না। মজা কি জানেন, আমি যেমন একজন খুনী হতে পারি, তেমনি একটা ছোট্ট শিশুও হতে পারি। আপনাকে দেখে এখন আমার শক্ত হাত-পা বালকের মতো লাগছে। চোখে মুখে কৈশোরের নরম রোদ্দুর এসে পড়ছে, ঘাসফুলের উপর উড়ে বেড়ানো ফড়িংগুলো যেন আমাকে খেলায় ডাকছে। আমি কোন ভালবাসা পাইনি, অথচ ওই ভালবাসা ভীষণ দরকার আমাদের, ভীষণ দরকার আমাদের, ভীষণ—। একটি মনের মতো মেয়ে অনেক পারে জানেন, অনেক পারে।

বুলু।। কাউকে ভালবাসেননি আপনি?

লোকটি।। আপনাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসিনি আমি।

বুলু।। (*বিব্রত*) আমাকে ভালবাসার সময় পেলেন কোথায়?

লোকটি।। একটা মৃত্যু হতে যেমন এক মুহূর্তও লাগে না, একটা ভালবাসার জন্মেও তাই। এক-এক রকম ভালবাসা আছে জন্মেই হাজার বছর বয়স পেয়ে যায়। অসম্পূর্ণ, অপরিণত ভালবাসা ধীরে ধীরে বড় হয়, বয়স পায়,—আমি আসলে আপনাকে ভালবেসে গেছি না দেখেই; এখন দেখা হতেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হল।

বুলু।। আপনি অদ্ভুত-অদ্ভুত ভাবেন তো।

লোকটি।। কিন্তু সত্যি ভাবি। বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

বুলু।। বিশ্বাস করব না কেন?

লোকটি।। বিশ্বাস করলেও মানতে পারছেন না তো? জানি, এই-ই হয়, তা না হলে সেই বিশ্রী ভয়ংকর ভিমরুলটা আমাকে অমন জ্বালাবে কেন? আমি যেদিন মরে যাব একটা কাগজে অনেককে মৃত্যুর জন্য দায়ী করে যাব।

বুলু।। আমাকে?

লোকটি।। আপনাকে ছাড়াও অনেককে। অনেক কিছুকে। ছোটবেলায় একটা চড়ুই পাখিকে ধরে রঙ করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেটাকেও আর দেখিনি। দেখলে ভাল লাগত। আমার এখন কিচ্ছু ভাল লাগে না যে! আমার মরে যাবার জন্য ঐ চড়ুইটাও দায়ী। আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন। আমার বাঁচতে এতো ভাল লাগে। আমি বাঁচতে জানি বলেই এত ভুগি, ভুল করি, পাপ করি, বোকা হই, ধূর্ত হই, খুনী হই। আমার

দু-হাতের মধ্যে আপনার মুখটা ছুঁয়ে থাকলে আপনি হয়ত একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখবেন। আমার বাজে চেহারাটা দেব-বালকের মত হয়ে যাবে। গলার স্বর চমৎকার, গায়ের ময়লা জামাকাপড় স্বর্গের উজ্জ্বল পোশাকে ঝলমল করে উঠবে। আমার মন যেখানে ছিটিয়ে দেবেন, ফুলের বীজের মতো বাগান গড়ে দেবে। চোখে যা ছোঁব, ঝাঁক ঝাঁক পাখি হয়ে যাবে ; আঙুলগুলো যাতে লাগবে ভোরের রোদ আর জ্যোৎস্নায় চিকচিক করে উঠবে। আমাকে একটা সুন্দর ম্যাজিকওয়ালা মনে হবে। দারুণ লাগবে।...আমাকে ভালবাসবেন?

বুলু।। দেখুন, আপনি হাতমুখটা ধুয়ে খেয়ে নিন। ক্লান্ত হয়ে আছেন তো, জুতো খুলে ফেলুন।

লোকটি।। খুলছি। (*খুলল*) আপনি খুবই ভাল, খুব। যা বলি, একটুও রেগে যান না।

বুলু।। আমার সঙ্গে আসুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই।

[*বুলুর পিছনে পিছনে লোকটি বাইরে চলে গেল। মুহূর্তকাল পরে সুবোধ ঢুকল। বুলুও ফিরে এল।*]

সুবোধ।। বুলু, আমার মনটা আশ্চর্য খারাপ লাগছে!

বুলু।। কেন?

সুবোধ।। ঐ লোকটি তোমাকে যে সব কথা বলছিল, আমি শুনতে পেয়েছি।

বুলু।। (*বিস্মিত*) তার মানে তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে? ছি ছি!

সুবোধ।। কিন্তু শোনবার জন্যে লুকোইনি। একটা পাগল লোকের কাছে তোমাকে একলা রাখার কথাই ভাবতে পারিনি—তাই বারান্দা থেকে ওই জানলাটা দিয়ে চোখ রেখেছিলাম। সব কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। লোকটি তোমাকে ভালবাসার কথা বলছিল। বিশ্বাস কর বুলু, আমার এত খারাপ লাগছিল। ভিতরটা এত জ্বলছিল, আমি পারছিলুম না।

বুলু।। ভালবাসার কথা তুমি বল না?

সুবোধ।। বলি, কিন্তু লোকটা এত সুন্দর করে বলল! আমার প্রোজ এতো খারাপ, আমি যে ভাল কথা বলতে পারি না। শোন, ঐ লোকটা যা বলল, তা আসলে আমার মনের কথা। অবিকল আমার মনের কথা। তোমার বিশ্বাস হয়?

বুলু।। হয়।

সুবোধ।। (*খুশি*) তুমি খুব ভাল বুলু। আমার খুব ভাল লাগছে। এখন ওই লোকটার উপর হিংসে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আমি যা বলতে চাই তোমাকে, তাই বলে লোকটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্টএর কাজ করবে।...আই অ্যাম সো নোবল। কিন্তু ভয় হয়, ধীরে ধীরে যদি ওকেই তোমার ভাল লেগে যায়?

বুলু।। একটা মানুষকে ভাল লাগায় দোষ কি?

সুবোধ।। না বুলু, ভালবাসার ব্যাপারে আমি খুব রক্ষণশীল। আসলে আমি নোবল-টোবল নই। দ্যাখো, ও যাই বলুক, তুমি শুন না। তুমি ওকে খুব স্নেহ দেখিও না। ...আমি...আমার খুব খারাপ লাগে...আমাদের বিয়ে হবে...কী যে দুর্ভাগ্য...কোত্থেকে যে লোকটা এল! এতো অদ্ভুত না সব...

[*স্নানের ঘর থেকে একটা বালতি পড়ার শব্দ হল, ওরা চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বালতি হাতে, মাথার চুল ভেজা, সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়া চুল,*

লোকটি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঢুকল। সমস্ত মুখে সাবানের ফেনা।]

বুলু॥ কি হল?

লোকটি॥ একটা বিরাট ক্ষতি হয়েছে আমার! বিশাল ক্ষতি!

সুবোধ॥ কি ক্ষতি হয়েছে, বলুন না?

লোকটি॥ আপনারা বুঝবেন না হয়ত।

বুলু॥ আপনি বলুন।

লোকটি॥ মাথায় জল ঢালতে গিয়ে মনে হল আমার একটা দরকারী জিনিশ চুরি হয়েছে। আমার নিজের নামটা চুরি হয়ে গেছে। এই আটদিনের মধ্যে। সেদিনও আমার মনে ছিল। অথচ এক্ষুণি কিছুতেই মনে আনতে পারছি না...কিছুতেই না। দাঁড়ান, আমার ঝোলা ব্যাগটার ডায়েরিটায় নামটা লেখা থাকতে পারে...ওখানে আমার নাম আমি প্রায়ই লিখতাম। *(ডায়েরি বের করল, পাতা উল্টোল)* কী কাণ্ড, চশমাটা আবার বাথরুমে ফেলে এসেছি বোধহয়। *(বুলুকে দিয়ে)* আপনি দেখুন তো—প্রথম দিকের পাতায়?

বুলু॥ *(পাতা উল্টে)* হ্যাঁ, অনেকগুলো নাম রয়েছে...পর পর অনেকগুলো।

লোকটি॥ পড়ুন তো। নামটা যদি পেয়ে যাই। প্রথম নামটা পড়ুন।

বুলু॥ শান্টু।

লোকটি॥ আমার নাম নয়। আমার ছোটবেলার নাম। ঐ ছেলেটা, বুঝলেন, ঐ ছেলেটাই চড়ুই পাখিটাকে রঙ করে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল। পরে কি নাম আছে?

বুলু॥ সুন্দর।

লোকটি॥ সুন্দর! ওটা বোধহয় নাম নয়, বুঝলেন, মনে হচ্ছে ঐ কথাটা আমি সারাজীবন ধরে উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম। পারিনি। কী দুরূহ শব্দ, কী ভীষণ ভারি শব্দ, চারিদিকে এত কাঁটা!

বুলু॥ খোকা। আপনার নাম!

লোকটি॥ আমার বাবা ডাকতেন, মা-ও। ওঁরা তো কেউ নেই।

বুলু॥ তারপর কোন নাম নেই, কতকগুলো শব্দ, পড়া শক্ত। *(চেষ্টা করে)* বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটি॥ বুঝতে পেরেছি। ঐ লেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে, রোজই অস্পষ্ট হচ্ছে। আমরা ধরে রাখতে পারি না, পারব না। সত্যি সত্যি তাহলে আমার নাম চুরি গেছে!

সুবোধ॥ কি আশ্চর্য বাজে বকছেন? নিজের নাম মনে নেই?

লোকটি॥ কী ভয়ানক হারিয়ে গেছি আমি, বুঝুন। লস্টনেস! হারিয়ে যাওয়া কি ভয়ানক ব্যাধি...কি হবে আমার!

বুলু॥ একটা কাজ করুন। হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিন। তারপরে ঘুমোন। দেখবেন, সকালবেলা সব মনে পড়বে।

লোকটি॥ আর যদি না মনে পড়ে?

সুবোধ॥ আর যদি না মনে পড়ে, আমরা সবাই মিলে আপনার একটা নামকরণ করব। বেশ ভাল নাম।

লোকটি॥ আপনাদের দেওয়া নামে কি হবে আমার?

বুলু॥ আপনি যান। ঠিক মনে পড়বে দেখবেন।

[লোকটি বিমর্ষ এবং চিন্তিতভাবে স্নানের ঘরে চলে গেল।]

বুলু॥ (*সহানুভূতি নিয়ে*) আহা, আমার কেমন মায়া হয়!

সুবোধ॥ হা ঈশ্বর! দেখছি পাগলের ওপরই তোমার টান বেশি। যদি পাগল হতে পারতাম...হুঁ, বোধহয় হচ্ছি!

[*সুবোধ অসহায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ধীরে পর্দা নামে।*]

২

[*সেই ঘর। পরদিন ভোর। লোকটি খাটে শুয়ে। জানালায় কয়েকজন কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেদের দেখা গেল। তারা আগের দৃশ্যের ছেলেরা। সুহাস, অমল, সুশান্ত, নরেন, অশোক। দরজা ঠেলে আস্তে ঢুকল। লোকটিকে দেখতে লাগল। ওদের চোখে মুখে ফুটেছে চাপা বিস্ময় এবং গর্ব।*]

সুহাস॥ চ্—চ্—ঘুমুচ্ছে। যে লোকটি ক-দিন আগে নিজের বাবাকে খুন করেছে সে ঘুমোয় কেমন করে?

অমল॥ বুলুদি বলছিল, সাতদিন নাকি ঘুমোয়নি।

সুশান্ত॥ উই শুড নট ডিস্টার্ব হিম। লেট দ্যা টায়ার্ড সোল স্লিপ।

অশোক॥ লোকটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেবেল, অন্যতম বিদ্রোহী।

নরেন॥ পুলিশ খবর পেলে কিন্তু একেই জেলে ঢোকাবে।

অশোক॥ জাঁ জেনেকে তো প্যারিসের পুলিশ খুন-জোচ্চুরির দায়ে প্রাণদণ্ডাদেশ দিল, অথচ সার্ত্র তাঁকেই বললেন—সেন্ট জেনে, ঋষি জেনে। দিস ইজ দা ওয়ার্ল্ড।

অমল॥ চুপ। নড়ছে। দ্যাখ, ওঁর রুমালটায় কিসের দাগ?

নরেন॥ বোধহয় রক্ত।

সুশান্ত॥ চল পরে আসব।

সুহাস॥ হ্যাঁ, তাই চল। হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের দেখলে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

[*ওরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাবার আগেই লোকটি হঠাৎ জেগে উঠল। তাকাল।*]

লোকটি॥ কে! কে?

[*ওরা ফিরল। বিব্রত।*]

সুহাস॥ আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

লোকটি॥ কেন?

অশোক॥ বুলুদি থাকলে সব বুঝিয়ে বলতেন। বুলুদি, মানে যাঁদের বাড়িতে আপনি থাকছেন-

নরেন॥ উনি আমাদের বুলুদি।

লোকটি॥ তাতে কি বোঝাল?

নরেন॥ (*ঘাবড়ে গিয়ে*) না, তাই—

অমল॥ আপনার সব ব্যাপার আমরা জানি তো—

লোকটি॥ (*চমকে*) কি জানেন আপনারা?

অশোক॥ জানি মানে, বুলুদি বলেছেন আর কি—

সুহাস॥ আমাদের যুবসম্প্রদায়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বুলুদি। উনি আমাদের বলেছেন, আপনি আশ্চর্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সুশান্ত॥ সমস্ত পৃথিবীটা বামন হয়ে যাচ্ছে, আমরা তাই একজন জায়ান্টকে দেখতে এসেছি।

অমল॥ আপনার কথা আমরা দলের বাইরে কাউকে বলব না।

লোকটি॥ কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে কেমন একটা হৈ চৈ হচ্ছে না?

অশোক॥ কিচ্ছু হৈ চৈ হবে না—আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।

লোকটি॥ পারি?

সুহাস॥ পারেন।

লোকটি॥ আচ্ছা, এখানে আয়না আছে?

[*সকলে এলোমেলো খোঁজে।*]

নরেন॥ ওই তো!

[*লোকটি আয়নার কাছে গিয়ে মুখ দেখতে লাগল। হাত-পা, সমস্ত শরীরটা। ফিরল। চোখে-মুখ তখন খুশিতে চকচক করছে।*]

লোকটি॥ কি চমৎকার বদলে যাচ্ছি আমি! এ ক'দিনে আমার চামড়ায় একটা জঘন্য ভয় ফুটে উঠেছিল। মনে হত আমার সারা গায়ে কাদা, বিশ্রী কাদা। এখন দেখুন, ঘুমের মধ্যে কে যেন আমাকে নতুন চামড়া পরিয়ে দিয়েছে। দুটো চোখ এতো ঝকঝকে, যেন কেউ কেচে রেখেছে। এতো হাল্‌কা লাগছে, যেন উড়তে পারি। জানেন দেবদূতেরা এজন্যই উড়তে পারে—অ্যানজেলের ছবি দেখবেন,—ডানা লাগানো রয়েছে।

সুশান্ত॥ নিজের বাবাকে খুন করে একটা মানুষ যে দেবদূত হয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আপনি। পৃথিবীর ভ্যালুস কী দ্রুত বদলাচ্ছে!

অশোক॥ বিশ্বাস করুন—আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। আমাদের মধ্যে এতো ভয়, এতো সংস্কার, এতো অসম্পূর্ণতা...

লোকটি॥ কিন্তু দেখুন, আমরা কোনকালেই সম্পূর্ণ হতে পারব না। আর সম্ভব নয়। আমাদের বৃত্তটা গোল হয়ে উঠবে না আর। ছোটবেলাতেই কেবল কম্পাসে পেন্সিল পরিয়ে বৃত্ত এঁকেছি। এখন আর বৃত্ত আঁকা যাবে না। সার্কেল আর স্ট্রেট লাইন—এই দুটো আঁকার জন্যেই তো আমাদের জীবন। ঠিক বলি নি?

নরেন॥ আশ্চর্য বলেছেন। বড় দামী কথা।

অমল॥ আপনি আমাদের কাছে থাকুন। আপনাকে পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে।

লোকটি॥ কিন্তু কি হবে আমাকে দিয়ে? আমি যে কিছু হতে চাইছি না। আমার যে কোন উদ্দেশ্য নেই। কোথায় যেন পড়েছিলাম—কিংবা হ্যালুসিনেশন কিংবা আমার জীবনেই একটা ঘটনা ঘটেছিল—আমি একটা ট্রেনের কামরায় বসে আছি, পাশে মাত্র একটি লোক। কাঁধে ঝোলা, চোখে নিরাকার দৃষ্টি, মাথায় বিপর্যস্ত চুল। সে কামরায় আর

কোন লোক উঠছিল না। উঁকি দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কামরায় যাচ্ছে। আমার ভয় করছিল। হঠাৎ লোকটি বলল, 'এ কামরায় আর কেউ উঠবে না, আমাকে দেখে পালাচ্ছে।' জিজ্ঞেস করলাম,—'কেন?' বলল, 'আসলে আমি ক্যানিবাল, নরখাদক। আপনি যেই ঘুমুবেন আমি আপনাকে খেয়ে ফেলব।' 'আমাকে খেয়ে ফেলবেন'—হেসে উঠলাম। মনে হল লোকটার বোধহয় মাথা খারাপ। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা ঝোলা থেকে নানান রকম মশলার শিশি পাশে নামিয়ে রাখতে লাগল। বলল, 'এসব দিয়ে খাব, আগে ঘুমোন। ঘুমুলে মাংসটা নরম হয় তো'—বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। হঠাৎ আমার মনে হল, এই লোকটারও তো একটা ইচ্ছে আছে, লোভ আছে, উদ্দেশ্য আছে, অথচ আমার নেই। এতো ভয়ানক খারাপ লাগছিল! একটা নতুন ধরনের ইস্কুল করতে চেয়েছিলাম, হল না...কিচ্ছু হবে না আমার। একটু আগেও ভাল লাগছিল, আবার বিষণ্ন লাগছে, দারুণ!

অশোক।। এই বিষণ্নতাই পৃথিবীর স্থায়ী জলবায়ু, তাই না?

লোকটি।। আমি বুঝি না। আমরা ক্রমশ মূর্খ হই। আপনারা যান, আমি এই আয়নাটার কাছে থাকব। আয়নাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপক।

সুহাস।। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। তবে যাবার আগে আমাদের বাড়ির এই ব্ল্যাকপ্রিন্সটা আপনাকে উপহার দিয়ে যাব। আমার দেখা প্রথম বীরকে আমার গাছের প্রথম গোলাপটা দিলাম।

[*ফুলটি দিল।*]

লোকটি।। (*অবাক*) মানে আমাকে...? আমি...

অমল।। আপনি নিজেকে চিনেও চিনতে পারছেন না। আমরা আপনাকে উঁচু করে তুলব।

অশোক।। আপনার জন্য আমরাও একটা প্রেজেন্টেশন আছে। আমার আঁকা এই ছবিখানা আপনি নিন। মাই ফেভারিট সাবজেক্ট, ক্লাউন—দি গ্রেট মার্টার।

[*ছবিখানি দিল।*]

সুশান্ত।। আমার কবিতার বইখানার একখানি লুকনো কপি আপনাকে দিতে চাই —'পাতালের ঈশ্বরসমূহ'। পুলিশ বাকি সংখ্যাগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে।

[*বইখানা দিল।*]

লোকটি।। কিন্তু আমি...

সুহাস।। আপনি আমাদের দেখা প্রথম হিরো। আমাদের শ্রদ্ধা আপনি ফিরিয়ে দেবেন না।

লোকটি।। আমার মাথা কেমন ঘুরছে! এরকম অবস্থা কোনকালে হবে ভাবিনি!

[*বুলু ঢুকল। সকালের স্নান সেরেছে। ঝরঝরে দেখাচ্ছে।*]

বুলু।। এই যে পঞ্চপাণ্ডব—ঘুম না ভাঙতেই এসে তোমরা জ্বালাচ্ছ। চা পর্যন্ত খান নি উনি এখনো। (*লোকটিকে*) চা খাবেন, না কফি? ঘুমুচ্ছেন দেখে একবার এসে ফিরে গেছি। কফি আনি?

লোকটি।।-যা খুশি।

বুলু।। (*ছেলেদের*) এই তোমরাও খেয়ে যাবে কিন্তু।

সুশান্ত।। আর একসময় হবে, বুলুদি। স্পোর্টস্-এর প্রাইজগুলো কিনতে যাব।

নরেন ।। চলি।

বুলু ।। খুব কাজ দেখাচ্ছ!

[*ওরা পাঁচজন চলে যেতে বুলু ফুলদানি সাজাতে লাগল।*]

ঘুম হয়েছে ভাল?

লোকটি ।। হ্যাঁ।

বুলু ।। এখন বেশ ভাল লাগছে?

লোকটি ।। আপনি আসার পর বেশ লাগছে। একটু আগে হঠাৎ খারাপ লেগেছিল। অথচ ঘুম ভেঙে উঠে চমৎকার লাগছিল।...আচ্ছা, আয়না আপনার ভাল লাগে?

বুলু ।। সব মেয়েদেরই লাগে। অনেক ছেলেরও লাগে।

লোকটি ।। অথচ মজা কি জানেন, আয়নায় মুখ দেখলে মনে হয় আমার মুখের মাপেরই ছায়া পড়েছে। কিন্তু সাবানের ফেনা দিয়ে ছায়াটার চারদিকে রেখা টেনে সরে দাঁড়ান, দেখবেন ছায়াটা কত ছোট। হাসি পাবে।

বুলু ।। মেপে দেখিনি। আপনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেন তো?

লোকটি ।। আমার কিছু করার নেই কিনা।

বুলু ।। (*ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে*) আপনার কিছু জানি না কিন্তু। কি করেন, কি নাম, কোথায় থাকেন...

লোকটি ।। আমার নিজের নামটি এখনও মনে পড়ছে না। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। একটা ইস্কুল করতে চেয়েছিলাম...আসলে সেই ভিমরুলটাই আমার শত্রু।

বুলু ।। দেখবেন ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি ।। আপনাকে দেখলেই সেই প্রজাপতিটাকে মনে পড়ে। আপনাকে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, কাউকে ছুঁয়ে না দিলে আমাদের গড়ন হয়না। জন্মেই একবার মাটি ছুঁতে হয়। তারপর আর একবার ছোঁযার দরকার হয়, সে নারী। যে পায় না, সে অস্পৃশ্য থাকে।

বুলু ।। আসলে ছুঁতে হয় মনটাকে।

লোকটি ।। একটা সময় আসে যখন নিজের দশটা আঙুলে দশ সহস্র মন এসে কাঁপতে থাকে। আর যে শরীরটা ছোঁব তার সবখানেও মন আর মন। আকাশের যে দিকে তাকান কেবল চাঁদটা চোখে পড়বে। এক-এক সময় দেহের যে দিকে তাকাবেন মনটা চাঁদের মত সবদিকে ভাসতে থাকে।

বুলু ।। আপনি চমৎকার বলেন।

লোকটি ।। আমার অনেক অভাব যে! কথার জন্মই তো অভাব থেকে, শূন্যতা থেকে।

বুলু ।। ঐ ফুল-ছবি-বই ওরা আপনাকে প্রেজেন্ট করল, না?

লোকটি ।। হ্যাঁ, আমাকে এসব দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

বুলু ।। আমি কিন্তু আপনাকে কিছুই দিই নি।

লোকটি ।। অথচ আপনার মুঠো ভর্তি অনেক কিছু।

বুলু ।। আপনার মত যদি ভাবতে পারতাম! যদি আপনার মত অসাধারণ বীরের মত মন হত—যাদের মনে নির্মম শক্তি, অথচ আসলে কোমল, তাদের আমার দারুণ ভাল

লাগে। আমাদের উপরের ঘরে বাবার একটা বন্দুক হাতে শিকারের ছবি আছে—আমি তাকিয়ে থাকি মাঝে মাঝে। দেখে মনে হয়, কী কঠিন! অথচ এলে কথা বলে দেখবেন, মাটির মানুষ। আপনি শিকার জানেন?

লোকটি॥ না।

বুলু॥ কাল স্পোর্টস্ হবে। আপনাকেও নাম দিতে হবে কিন্তু।

লোকটি॥ কোনদিন নাম দিইনি, পারি না আমি।

বুলু॥ ঠিক পারবেন। আমরা হাততালি দিয়ে দৌড়ে আপনাকে জিতিয়ে দেব।

লোকটি॥ জেতার পর?

বুলু॥ বেশ ভাল লাগবে।

লোকটি॥ আমার বাবা বেঁচে থাকলে, আমি স্পোর্টস্-এ নাম দিয়েছি শুনলে অবাক হতেন। ভাবতেই পারতেন না। খুশি হতেন খুব। আচ্ছা, আমাকে আপনার ভাল লাগে?

বুলু॥ খারাপ লাগবে কেন?

লোকটি॥ আমি যদি চিরকাল এখানে থেকে যাই?

বুলু॥ থাকুন না।

লোকটি॥ কিন্তু পুলিশের লোক তো আমাকে ছাড়বে না! ছদ্মবেশে গোয়েন্দা সব সময় ঘুরছে, হঠাৎ দেখবেন ধরে নিয়ে যাবে।

বুলু॥ আমরা ছাড়া কেউ জানেই না, পুলিশ খবরই পাবে না।

[সুবোধ ঢুকল। ওদের কথা বলতে দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করল। মুখটা অসহায়ের মত হল।]

সুবোধ॥ ও, কথা বলছ তোমরা? ঘুরে আসব একটু?

বুলু॥ ঘুরে আর আসবে কোত্থেকে, বস। আমি বরঞ্চ চা আর কিছু খাবার করে নিয়ে আসি।

সুবোধ॥ আমি নীরেনকাকুর কাছ থেকে আসছি, তোমাকে একবার ডেকেছেন উনি—একবার টুক করে ঘুরে এস না।

বুলু॥ আমি সারাদিন এই করি! চা-টা খেয়ে একটু পড়তে বসব ভেবেছিলাম।

সুবোধ॥ ক্লাবের স্পোর্টস্, হৈ চৈ...দু একটা দিন কি আর বই-টই পড়া হবে। তাছাড়া দিনরাত গল্পই তো করছ।

বুলু॥ কোথায় আবার গল্প করতে দেখলে?

সুবোধ॥ না, মানে তোমার স্বভাবের কথা বলছি।

বুলু॥ আমার স্বভাব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

[একটু রেগে চলে গেল।]

সুবোধ॥ (*চেষ্টা করে হেসে*) দেখতে পেলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা বেশ মিষ্টি ঝগড়া করে কেটে যাবে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পারছেন আমাদের বিয়ে হবে? বুঝলেন, বিয়ের মতো ভাল জিনিস নেই। এত পবিত্র, এত আন্তরিক, এত ইয়ে...

লোকটি॥ আপনাদের বিয়ে হবে আমি জানতুম না।

সুবোধ॥ আমাদের বিয়ে হলে আপনার ভাল লাগবে না?

লোকটি॥ না।

সুবোধ।। কেন?

লোকটি।। আমার কিছুই ভাল লাগে না।

সুবোধ।। ও।...দেখুন, আপনাকে একা আমার একটু দরকার ছিল। বুলুর অ্যাবসেন্সে কয়েকটা কথা বলব আপনাকে। (*কাতর ভঙ্গিতে*) আপনি, কেবল আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন। আসলে কি জানেন, আমি ভীষণ ভালবাসি ওকে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারি না। সাহস নেই, মনের জোর নেই, চেহারাও তেমন একটা কিছু নয়। আর একদম কথা বলতে পারি না। সিনেমা হলে খুব করুণ একটা জায়গায় হঠাৎ কেউ হেঁচে ফেললে সবাই যেমন বিরক্ত হয়, বুলুর সঙ্গে সিরিয়াস্‌লি ইমোশনাল কিছু বলতে গিয়ে হাঁচির মতো বেয়াড়া কিছু বোকার মতো বলে ফেলি। অথচ আপনি কি চমৎকার কথা বলেন!

লোকটি।। আমায় কি করতে হবে তাহলে?

সুবোধ।। আপনি একটু কম কথা বলবেন। ও অবশ্য আপনাকে খোঁচাবে। কথা শুনতে তো ও ভালবাসে।

লোকটি।। আমি কি করব তখন?

সুবোধ।। আপনি চুপ করে থাকবেন। না, বরঞ্চ বিরক্ত হবেন।

লোকটি।। আমি মিথ্যে-মিথ্যে কিছু পারি না।

সুবোধ।। কিন্তু আপনাকে পারতে হবে, আমার খাতিরে।

লোকটি।। আপনাকে আমি খাতির করব কেন?

সুবোধ।। এতো বেয়াড়া কথা বলেন না আপনি। আপনি কি আমাকে বাঁচাবেন না? আমাদের যে বিয়ে হবে!

লোকটি।। তাতে আমার কি?

সুবোধ।। আপনার? আপনার কি বলুন তো? জেরা করলে আমি কেমন ভড়কে যাই। কপালে ঘাম হয়, কথা হারিয়ে ফেলি। সত্যি, আমাদের বিয়ে হলে আপনার কি?

লোকটি।। আমার কিচ্ছু না।

সুবোধ।। হ্যাঁ, আপনার কিচ্ছু না—অথচ আমার কিছু, মানে অনেক কিছু। সেইজন্যেই আপনি আমাকে হেল্প করুন। নীরেনকাকুর সঙ্গে এ নিয়ে আমি কথা বলেছি। উনি আমাকে স্নেহ করেন খুব। সে সব পরে বলব। আসলে, সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, আমার একটা অসুখ আছে—মানে ভয়। ভয়টা আমার রোগ। আমার ভয় হয়, ধীরে ধীরে বুলু আপনাকে ভালবাসছে, বাসবেই। কারণ আছে। আমার বাবাও নেই যে আপনার মতো খুন করব। মা আছেন, এতো ভাল না, খুন করব ভাবাই যায় না। তাছাড়া বাবা থাকলেই বা কি হত? এতো বয়স হয়েছে তো, তবু আমি বাবাকে মনে হলে একটু একটু কাঁদি। ধ্যাৎ, আপনার তুলনায় আমি এতো বাজে, এতো অপদার্থ...

লোকটি।। দেখুন, আমার কি রকম খারাপ লাগছে। আপনারও খারাপ লাগছ নিশ্চয়ই?

সুবোধ।। খুব।

লোকটি।। এ রকম হলে,আমি একটা কাজ করতাম। বেলুন কিনে ফোলাতাম। আর চোখ বুজে, পায়ে চাপ দিয়ে হঠাৎ ফাটিয়েই চমকে উঠতাম!

সুবোধ।। আপনাকে বেলুন কিনে এনে দেব? অনেক বেলুন?

লোকটি॥ খুব ভাল হয়। নানা রঙের আনবেন। গোল মত। লম্বা একরকম আছে, বিশ্রী—ওটা দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

সুবোধ॥ গায়ে ছবির ছাপ দেওয়া?

লোকটি॥ না, কেবল রঙ।

সুবোধ॥ বেশ, এনে দিচ্ছি। শুনুন, তাহলে আপনি বুলুকে ছেড়ে দিন। বাবার সব সম্পত্তির আমি মালিক। আমি আপনাকে সারাজীবন বেলুন পাঠিয়ে দেব, যত চান। কেবল আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনি থাকলে আমার সব ভেস্তে যাবে। বুলু চলে গেলে আর আমার কি থাকে বলুন তো?

লোকটি॥ আমি যাব কেন? কোথায় যাব আমি?

সুবোধ॥ যদি না যান, আমাদের বিয়ের আগে দিনকতক একটু ঘুরে আসুন না হয়, মানে যদ্দিন আমাদের বিয়েটা না হয় তদ্দিন আর কি! যখনই খারাপ লাগবে বেলুন ফাটাবেন! যতো বেলুন লাগে, কথা দিচ্ছি, আমি কিনে দেব আপনাকে। তবে দেখুন, প্রত্যেক মুহূর্তে যদি বেলুন ফাটাতে থাকেন, সে বেলুন কেনার সাধ্য স্বয়ং জনসনেরও নেই; আপনি একটু কম-কম মন খারাপ করবেন, কম-কম বেলুন ফাটাবেন।

লোকটি॥ কিন্তু ঐ মেয়েটি ছাড়া আমার আর কোন আকর্ষণ নেই এখানে। বিশ্বাস করুন, আমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রজাপতিটা ওর মধ্যে উড়ে বেড়ায়। ওর চোখ, মুখ, জামাকাপড় সবকিছুর মধ্যে। সারাজীবন ওর মধ্যে প্রজাপতিটা বালকের মতো খুঁজতে ইচ্ছে করে।

সুবোধ॥ বালকের মতো? এ বালক তো খুব সুবিধের নয়। অশ্লীল! এতোক্ষণ আপনাকে যা বললুম, কিছুরই ফল হল না দেখছি। আপনি যদি কিছু না শোনেন, আমি কিন্তু ভিনডিক্‌টিভ হয়ে যাব! আমি সোজা পুলিশে খবর দেব।

লোকটি॥ পুলিশ! জানেন, পুলিশে আমার ভীষণ বিরক্তি? আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন কেন?

সুবোধ॥ আপনি যে আমাকে জ্বালাতে জ্বালাতে ছাই করতে চলেছেন!

লোকটি॥ কি আশ্চর্য! কোথায় ছিলেন আপনি? বেমালুম আমার জীবনে বিরক্তিকর ভাবে জুড়ে যাচ্ছেন?

সুবোধ॥ আপনাকেও কি আমি শাঁখ বাজিয়ে তোরণ সাজিয়ে ডেকে এনেছি? আমার মশারির মধ্যে মশার মতো ঘুরছেন, ভনভনিয়ে জ্বালাচ্ছেন। আপনি না পালালে আমি নিশ্চিত পুলিশে খবর দেব।

[*নীরেনকাকু ঢুকলেন।*]

এই যে নীরেনকাকু এসেছেন। কতরকম বোঝালুম ওঁকে, অথচ বিন্দুমাত্র নড়তে চাইছেন না।

নীরেন॥ দরকার কি নড়বার?

সুবোধ॥ আশ্চর্য! সমস্ত সকালটা আপনাকে কী বোঝালুম। আপনি তো তখন আমার কথায় সায় দিয়ে গেলেন; আর এখন আবার ওর পক্ষে চলে যাচ্ছেন?

নীরেন॥ তোমার কথায় সায় না দিলে তুমিই কি নড়তে?

সুবোধ।। তাই বলে আমাকে মিথ্যে-মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন?

নীরেন।। কিছুই মিথ্যে বলিনি সুবোধ। কেবল তাড়াহুড়ো করতে চাই না আমি। সব সময়ে মনে হয়, কি একটা কাজ আছে আমার। একটা মিশন। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। (*লোকটিকে*) তারপর, কেমন ঘুম হয়েছিল আপনার?

লোকটি।। ভাল।

নীরেন।। আপনার নাম মনে পড়েছে? আত্মীস্বজন কারুর কথা?

লোকটি।। না।

নীরেন।। এখানটা ভাল লাগছে?

লোকটি।। কখনো কখনো।

নীরেন।। কালকে স্পোর্টস হবে। দৌড়ে আপনার নাম রয়েছে, লং জাম্পেও—বুলু বলল।

লোকটি।। শুনেছি।

নীরেন।। আমাদের ক্লাবের ছেলেরা, বুলু—সকলেই কিন্তু আপনাকে মাথায় তুলে রেখেছে। ভেবে আপনার ভাল লাগছে না?

লোকটি।। লাগছে। এক-এক সময় এতো খারাপ লাগে আমার!

সুবোধ।। বেলুন কিনে আনব?

নীরেন।। বেলুন?

সুবোধ।। হ্যাঁ, বেলুন।

নীরেন।। বেলুন কি হবে?

সুবোধ।। খারাপ লাগলে উনি বেলুন ফুলিয়ে পায়ের তলায় রেখে চোখ বুজে ফাটান।

লোকটি।। যদি বেলুন এনে দিতে পারেন, ভাল হয়।

সুবোধ।। ঠিক আছে, নিয়ে আসছি আমি। বাট প্লিজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

[*সুবোধ চলে গেল।*]

নীরেন।। সুবোধ ছেলেটি অসহায় বলে আমার ভাল লাগে।

লোকটি।। কি সব ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি হল। অথচ আমি তা চাই না। জলের ভেতরে কত মাছ চলে, কদাচিৎ ওদের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে। অথচ মাছের থেকে সংখ্যায় কম আমরা, চলতে ফিরতে কেবল ঠোকাঠুকি করি!

নীরেন।। চলুন, আজকে আমরা দুজনে বিকেলে শিকারে যাই।

লোকটি।। বেশ যাব। আমার ভয় যেন কমে যাচ্ছে। তবে এই জানালাটায় বসে থাকতেও আমার খারাপ লাগে না। (*জানালাটার দিকে তাকিয়ে*) কী কাণ্ড, আমি কি ভূত দেখছি! আসুন, আসুন এখানে। (*নীরেনবাবু জানালার কাছে এলেন*) কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

নীরেন।। হ্যাঁ, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দেখছি এ বাড়ির দিকে আসছেন।

লোকটি।। আমার বাবা! যাঁকে আমি মেরে ফেলেছিলাম। কী আশ্চর্য! ভৌতিক ব্যাপার। মৃত্যুর পরে জ্যান্ত মানুষ আমি এর আগে আর দেখিনি। দেখলেন, ঠিক খুঁজে খুঁজে আমাকে ধরে ফেলেছেন। কি করি এখন?

নীরেন ॥ একটা কাজ করুন। আপনি পাশের ঘরে যান। আমি ব্যাপারটা দেখছি।

[*বাইরে চলে গেলেন নীরেনবাবু। লোকটি দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকল। বিচিত্র পোশাক পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নিয়ে নীরেনবাবু ফিরে এলেন।*]

নীরেন ॥ আসুন, বসুন।

প্রৌঢ় ॥ দেখুন, বসব না। একটা খবর পেয়ে অ্যাদ্দূর ছুটে এসেছি। আমার ছেলেটি শুনলাম আপনাদের এখানে রয়েছে?

নীরেন ॥ আপনার ছেলে? না, এখানে তো কোন ছেলে নেই। তবে হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে একটি অদ্ভুত ধরনের ছেলে এখানে এসেছিল অবশ্য। কেমন ভয়-ভয় মুখ, এখানে তো থাকতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু রাত্তিরেই পালিয়েছে।

প্রৌঢ় ॥ কি রকম দেখতে বলুন তো? কোন নাম বলল?

নীরেন ॥ না। দেখতে মোটামুটি। কাঁধে একটা ঝোলা। ছাই রঙের প্যান্ট, কপালের কাছে একটা কাটা দাগ আছে।

প্রৌঢ় ॥ আমারই ছেলে। খোকা—তাহলে এখান থেকেও পালাল! বহু কষ্টে খবর জোগাড় করেছিলাম। আমরা দুজনেই দুজনকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি।...কিন্তু খবর পেলাম আজ সকালেও ওকে এখানে দেখা গেছে?

নীরেন ॥ তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে সেই সাংবাদিকের কাছে গেলেই তো আপনার সুবিধে হতো।

প্রৌঢ় ॥ না না, আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। এতো ক্লান্ত লাগছে আমার। *(বসুল)* তাছাড়া আমার মনের অবস্থা এতো বিশ্রী!

নীরেন ॥ চা খাবেন?

প্রৌঢ় ॥ না, ওসবের দরকার নেই। ভিতরটা আমার যেন শুকিয়ে আসছে!

নীরেন ॥ ছেলেটি কি পালিয়েছে আপনার?

প্রৌঢ় ॥ পালিয়েছে মানে—সম্প্রতি ওর চিন্তা ভাবনা আচরণ এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিল যাকে বাইরের লোক পাগলই বলবে। কিন্তু আমি বুঝতাম ওর সব কিছুর মধ্যে একটা অর্থ আছে। নানান রকম কষ্ট, অভাব আর অসহায়তা ওকে অন্যরকম করে দিচ্ছিল। আমি ওকে জন্ম দিয়েছি তাই ওর সব অস্বস্তির কারণ ভাবত আমাকে। ও আমাকে মেরে ফেলে মুক্ত হবে—এ সব বলত। একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমার মাথায় নাকি একটা কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেই ও পালিয়েছে—এই রকম একটা চিঠি আমার দাদার কাছে লিখেছিল।

নীরেন ॥ তাহলে আপনার মাথায় আঘাতই করেনি বলছেন?

প্রৌঢ় ॥ যথার্থ ধরেছেন। আসলে আঘাত করাটা ওর একটা ধারণা মাত্র। ঘটনার চেয়ে ধারণাটাই ওর কাছে এক-এক সময় সত্যি বলে মনে হয়। অদ্ভুত ধরণের ছেলে তো!

নীরেন ॥ ভাবতে অবাক লাগে, যে ছেলের ওপর আপনার এতো ভালবাসা, সে-ই আপনাকে মেরে ফেলতে চাইল?

প্রৌঢ় ॥ পৃথিবীটাও তো এতো ভাল। তবু এক-একটা মানুষ হঠাৎ এক যন্ত্রণায় ক্ষেপে

গিয়ে সেই পৃথিবীটাকেও তো টুকরো টুকরো করতে চায়। হয়তো সে রকম কোন ব্যথা ওর মধ্যে ছিল।

নীরেন।। তা হঠাৎ এ রকম হল কি করে?

প্রৌঢ়।। জানি না। আমার রক্তে ওর জন্ম। তবু দিনের পর দিন ও যেন কেমন আলাদা হয়ে যেতে লাগল। ও যখন ঘুমোত, আমার মনে হয় ওর স্বপ্নের মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলত। অথচ আমি কি সুন্দর স্বপ্ন দেখি! একবার স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা বিরাট ব্রিজ তৈরি করছি।

নীরেন।। ব্রিজ?

প্রৌঢ়।। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রিজ। জেগে উঠতেই সেই ব্রিজের প্ল্যানটা একটা কাগজে এঁকে ফেললাম। ঐ ব্রিজটা আমি বানাব।

নীরেন।। অ। তা আরম্ভ করেছেন?

প্রৌঢ়।। ওই জন্যেই তো ছেলেটাকে চাই। দেখবেন, দেখবেন আমার ব্রিজের প্ল্যানটা? পৃথিবীর দীর্ঘতম, বৃহত্তম ব্রিজ। (*থলের মধ্যে প্ল্যান খুঁজতে গিয়ে নানান ধরণের জিনিস বেরিয়ে আসে।*) ...রাজ্যের জিনিশ সব কিনে রেখেছি। দাঁড়ান এর ভেতর থেকে ব্রিজের প্ল্যানটা উদ্ধার করতে হবে। (*একটি পুতুল দেখিয়ে*) পুতুল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভালবাসে,...আমিও (*একটা মুখোশ মুখে এঁটে*) হুম...মুখোস...আসলে পৃথিবীর সব ভয়ই তো মুখোশ, তাই না? হেঁ হেঁ...

নীরেন।। হেঁ হেঁ...

প্রৌঢ়।। (একটা ফুলদানি নিয়ে) ফুল কিনতে হবে, অনেক ফুল—

নীরেন।। হেঁ হেঁ, অনেক ফুল।

প্রৌঢ়।। (*এবারে প্ল্যানটি পাওয়া যায়*) পেয়েছি, নিন ধরুন। আহা ধরুন না মশাই, উঠুন— শূন্যতা থেকে সুন্দর, একটা কালো অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত—এই যে দেখুন, এখানে একটা অন্ধকার আছে! দেখতে পাচ্ছেন।

নীরেন।। না।

প্রৌঢ়।। এই তো এখানে, এখানে একটা কালো দাগ আছে।

নীরেন।। কোথায়?

প্রৌঢ়।। চোখে দেখবেন কি করে? একি কালিতে তুলি ডুবিয়ে কালির ছোপ? কালো মানে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত হারিয়ে যাওয়া রঙের শূন্যতা। এই শূন্যতা থেকে একটা উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত, সবুজ মানে তো জীবনের সব আনন্দের মেলানো রঙ, তাই না? এই শূন্যতা থেকে সুন্দর—একটা কালো অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত আমি পৃথিবীর দীর্ঘতম, বৃহত্তম ব্রিজ বানাতে চাই। হেঁ হেঁ—

নীরেন।। (*নিরাসক্ত*) অ।

প্রৌঢ়।। অ নয়। অ নয়। দেখবেন, আমরা বানাব। হেঁ হেঁ, আমার ছেলেটা যে ইস্কুলটা তৈরি করতে চায়—সেই ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো ওই ব্রিজ পার হয়ে ইস্কুলে পড়তে আসবে। কি চমৎকার হবে বলুন তো?

নীরেন।। (*নিরুৎসাহে*) চমৎকার।

প্রৌঢ়।। তা এতো ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছেন কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না, না?

নীরেন।। না, বিশ্বাস হবে না কেন?

প্রৌঢ়।। আমার ছেলেটা জানেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। ও বলে এ সবই হল স্বপ্নের কথা। আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে আনার গল্প। কিন্তু হতেও তো পারে, বলুন, হতেও তো পারে? বিশ্বাস, বিশ্বাসের চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ছেলেটার তাই কোন বন্ধু নেই। আমি ওকে পাগলের মতো খুঁজছি। ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। না হলে কত বড়ো ক্ষতি ভাবুন তো?

নীরেন।। তা কোথায় পাবেন ওকে?

প্রৌঢ়।। জানি না। আমার ভয় করে। ও যদি হঠাৎ ভুল ক'রে...না না, আমি ও সব ভাবব না।

নীরেন।। তা ওকে পেলে কি করবেন? কোন লুন্যাটিক অ্যাসাইলামে দেবেন নিশ্চয়ই?

প্রৌঢ়।। না। আপাতত ওর ইচ্ছেমতো সেই ইস্কুলটা খুলে ওকে চালাতে দেব। আমার ছেলে তো। ওর মতো কিছু খেয়াল আমারও রয়েছে।

নীরেন।। ইস্কুল...কি রকম?

প্রৌঢ়।। যেমন—খোকা বলত, প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এমন একটা খেলা শিখতে হবে, যা বুড়ো বয়সেও খেলা যায়। এমন একটা শিল্প শিখতে হবে, যা বেশি বয়সেও সঙ্গী হতে পারে। কথা বলা শেখানো হবে। ভাল হাঁটা, রঙের ব্যবহার। বন্ধুত্ব করা। বন্ধুত্ব ভাঙা। কখন কাঁদব, কখন কাঁদবনা। ভালবাসা। ভালবাসা ভেঙে দেওয়া। ঘৃণা করা। বমনের চেষ্টা...এ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতাম না। ও যে কেন, কোথায় বমি করতে হবে শেখাবে, বুঝতাম না। তা-ছাড়া ধরুন, পদাঘাতের সাহস। থুতু ফেলা, দেখা হতেই কেমন আছেন বা ভাল তো? উত্তরে এই চলে যাচ্ছে, এক রকম কেটে যাচ্ছে—এ সব ভোলানো। ট্রামের ভিড়ে ট্যাক্সিতে গেলই তো পারেন —এ জাতীয় রসিকতা সম্পূর্ণ ভোলানো। নেশার গুরুত্ব, পুলিশের অধিকার, সরকারের অধিকার, সাবানের ক্ষমতা, ন্যাপথলিনের গন্ধ, মদ্যপানের অর্থ, ডেথ্-ডেথ্ খেলা, হাসা, বিষণ্ণতা—এ রকম বিচিত্র বিষয় শেখানোর ইচ্ছে আছে।

নীরেন।। বিরাট প্ল্যান!

প্রৌঢ়।। বিরাট। যদি খোকার দেখা না পাই আমি একাই কাজ শুরু করে দেব।

নীরেন।। মনে হয় পিতাপুত্রে মিলতে পারল একটা বড় রকম আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে আমাদের দেশে।

প্রৌঢ়।। আমিও ঠিক অবিশ্বাস করিনা। তবে খোকাকে পাব কিনা সন্দেহ। বলা যায় না, ভাবতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, হঠাৎ ও আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে! প্রত্যেক মুহূর্তে আমি একটা দুর্ঘটনার সংবাদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি! খবরের কাগজ পড়ি না, পাছে কোনা অপঘাতের সংবাদ চোখে পড়ে,...আর দেখুন, আমি কেমন এক্সাইটেড হয়ে পড়েছি...আমি বরঞ্চ চলি...খোকা কোথায় গিয়েছে কিছু বলেছে আপনাদেব?

নীরেন।। কিছুই বলেনি, হঠাৎ উধাও হয়েছে।

প্রৌঢ়।। ওই ওর স্বভাব। আমিও চলি, বুঝলেন। ধন্যবাদ।

নীরেন।। চা খেলেন না।

প্রৌঢ়।। মাফ করবেন, ঠিক চা খাবার মত...আচ্ছা নমস্কার।

নীরেন।। নমস্কার।

[ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভেতর থেকে লোকটি বেরিয়ে এল।]

লোকটি।। আপনি বাঁচিয়েছেন আমাকে। অসংখ্যা ধন্যবাদ। আর দেখুন, বুলু বলে ঐ মেয়েটিকে আপনি আমার বাবার কথা বলবেন না। আমার সম্পর্কে তাহলে ওদের সমস্ত কল্পনা ভেঙে যাবে। আমার মধ্যে যতোটুকু আবিষ্কার করেছে, সব মিথ্যে ভাববে। আসলে বাবাকে মেরে ফেলা আর মারতে চাওয়া যে ফিলসফিক্যালি একই ব্যাপার তা ওদের বোঝানো যাবে না। আপনি প্লিজ বলবেন না!

নীরেন।। বলব না।

লোকটি।। তাহলে আপনি কিন্তু আমাকে কথা দিলেন?

নীরেন।। দিলাম।

লোকটি।। সব কি রকম গোলমাল হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝবেন না। সত্যি সত্যি আমি বাবাকে মেরে ফেলেছি বলে ভেবেছিলাম, এর মধ্যে ফাঁকি নেই। মিথ্যে আমি ভালবাসি না।

নীরেন।। আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু *(জানালার দিকে তাকিয়ে)* আপনি বরঞ্চ ভিতরের ঘরে যান। আপনার বাবা মাঝে মাঝে এদিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। জানি না, আপনাকে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছেন কি না।

লোকটি।। ঘরের ভিতর চলে যাই তাহলে।

[লোকটি ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরের দরজা দিয়ে একরাশ বেলুন নিয়ে সুবোধ ঢুকল।]

নীরেন।। ওগুলো আবার কি?

সুবোধ।। বেলুন।

নীরেন।। আহা, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সুবোধ।। ওই যে উনি মন খারাপ হলে বেলুন ফাটান। তাই—

নীরেন।। বেশ করেছ।

সুবোধ।। নীরেনকাকু, আপনাকে কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে! বুলু, আমার সম্পর্কে কিছু বলেছ?

নীরেন।। না, ওসব কিছু নয়।

সুবোধ।। ঐ লোকটির গ্রাস থেকে বুলুকে বাঁচিয়ে আমাকে রক্ষা করুন নীরেনকাকু। সমস্ত পথটা মনে হচ্ছিল,আমার থেকে বড় ভিখিরি কেউ নেই।

নীরেন।। সব ঠিক হয়ে যাবে সুবোধ। আমার সব সময় মনে হয় কি একটা কাজ যেন বাকি আছে। একটা মিশন। হয়তো তোমাদের এই ব্যাপারটাই আমার সেই কাজ, আমার মিশন।

[সুবোধের একটা বেলুন হঠাৎ এই কথায় ফেটে যায়। পর্দা।]

৩

[*সেই ঘর। নীরেনকাকু রুমালে ঘাড় মুছতে মুছতে ঢুকলেন। জানালা দিয়ে আকস্মিক উঁকি দিলেন সেই পূর্বদৃশ্যের বিচিত্র পোশাক পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দ্রুত আড়াল হয়ে গেলেন। বাইরে হৈ চৈ। হাততালি। মাইকে স্পোর্টস সম্পর্কে ঘোষণা চলছে। বুলু এল। ভীষণ ব্যস্ত। ঘামছে।*]

বুলু ।। কাকু চলে এলে যে? *(ড্রয়ারে কিছু খুঁজছে)* প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে—

নীরেন ।। অসহ্য রোদ্দুর। ক্যাম্পে যা ভিড়। কি খুঁজছিস?

বুলু ।। ও ঘরের আলমারির চাবিটা।...অশোক ওরা এমন, কি বলব! কতবার বললুম, সেই ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা রাখেনি। এখন তুলো, আয়োডিন, ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা কর।

[*অশোক দ্রুত ঢুকল।*]

অশোক ।। বুলুদি, ডেটলের শিশিটা এনো।

[*চলে গেল।*]

বুলু ।। কি ছেলে সব। অর্ডার করে ছুটল। যেন সব বাড়িতে আছে! সব এখন কিনে আনগে যাও।

[*বুলু ওঘরে চলে গেল। বাইরে হাততালি, মাইকে কথা চলছে। নীরেনবাবু জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বুলু তুলো, ডেটল ইত্যাদি নিয়ে চলে যাবার মুখে নীরেনবাবুর দিকে তাকাল।*]

বুলু ।। কাকু মাঠে এস না?

নীরেন ।। যাচ্ছি। এখানকার জানালা থেকেও বেশ দেখা যাচ্ছে।

বুলু ।। তাই বলে মাঠে যাবে না?

নীরেন ।। যাব রে। একটু বাদেই যাচ্ছি।

[*চলে গেল বুলু। নীরেনবাবু আয়নার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে বোতল বের করে খেলেন।*]

দ্য কার্স অফ আওয়ার সিভিলাইজেশন ইজ বোরডম।

[*জানালার কাছে আবার সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা গেল। নীরেনবাবু চমকে তাকালেন। ততক্ষণে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েছেন। নীরেনবাবু তাকিয়েই দ্রুত ব্যস্ততায় বসতে বললেন।*]

প্রৌঢ় ।। লিমোনেড খাচ্ছেন বুঝি?

নীরেন ।। না, মদ।

প্রৌঢ় ।। আজ্ঞে?

নীরেন ।। মদ।

প্রৌঢ় ।। ও।

নীরেন ।। মদ খেয়ে আমার মিস্টিক্যাল ফ্যাকালটি স্টিমুলেট করে নিচ্ছিলাম। যাক্‌গে, আপনি তাহলে এখানেই আছেন?

প্রৌঢ় ।। যাই নি যখন, তখন আছি নিশ্চয়ই।

নীরেন ॥ ছেলেটার কোন খবর পেলেন?

ভদ্রলোক ॥ দু-একজন বলছিলেন, এ শহরেই আছে। এখানে একটা স্পোর্টস হচ্ছে। রাজ্যের লোক জড়ো হয়েছে। বলা যায় না, এর মধ্যে যদি হঠাৎ ওকে পেয়ে যাই?

নীরেন ॥ মাঠে খুঁজে দেখেছেন?

ভদ্রলোক ॥ বড্ড ভিড়। ঢুকতে পারছি না। তাছাড়া আমার এই পোশাক দেখে সকলেই আমার দিকে তাকাচ্ছে।

[নেপথ্যে। বাইরে থেকে শব্দ ভেসে এল।]

নেপথ্যে ॥ যাঁরা প্রাইজ পাবেন তাঁরা তাঁবুর সামনের দিকে যে পথ করে দেওয়া হয়েছে, সেদিক থেকে আসুন। আপনারা ওঁকে আসতে দিন দয়া করে...

ভদ্রলোক ॥ আচ্ছা, আপনার ওখানকার জানালা দিয়েও তো বেশ দেখা যায়।

নীরেন ॥ অস্পষ্ট, অতি অস্পষ্ট। তাছাড়া মাথায় প্রায় আড়াল হয়েই আছে।

ভদ্রলোক ॥ আমার একটু লুকিয়ে দেখাই ভাল। কারণ—হঠাৎ যদি খোকা দেখতে পেয়ে যায়, ও ঠিক পালাবে।

[ভদ্রলোক জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন; চশমা মুছে বাইরে তাকালেন। মাইকে ঘোষণা চলছে। হাততালি।]

প্রৌঢ় ॥ কি আশ্চর্য! দেখুন, দেখুন, ঐ যে, ঐ যে ছেলেটি প্রাইজ নিতে যাচ্ছে? আমার ছেলে, খোকা! পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি! ভাগ্যিস চলে যাই নি এখান থেকে। আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি ওকে ধরে নিয়ে আসছি।

[ভদ্রলোক লাঠিটা চেয়ারের কাছ থেকে তুলে দৌড়ে বেরিয়ে যাবার আগে নীরেনবাবু খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেললেন।]

নীরেন ॥ থামুন, আপনি যাবেন না এখন। বসুন এখানে।

প্রৌঢ় ॥ অদ্ভুত কথা বলছেন তো আপনি! হঠাৎ দেখা পেয়েও আমি যাব না? আপনারা জেনেশুনেও এতক্ষন আমাকে ভাঁওতা দিয়ে গেছেন, বুঝতে বাকি নেই আমার। বিশ্বাস করি না আপনাদের। নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে।

নীরেন ॥ কোন ষড়যন্ত্র নেই। এখন আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আপনাদের দুজনেরই ক্ষতি। আপনার ছেলেটিকে আপনার কথা আমি বলেছিলাম। শোনামাত্র প্রথমত অবিশ্বাস করল। তারপর তার মুখ ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে উঠল—জাস্ট লাইক এ ক্রিমিন্যাল। চেঁচিয়ে বলল, দেখামাত্রই ও আপনাকে এবার নিশ্চিত মেরে ফেলবে। আপনি তো নিজেই জানেন, ছেলেটি একটু অ্যাবনর্মাল।

প্রৌঢ় ॥ আমাকে দেখলে ও শান্ত থাকবে। আপনারা ওকে জানেন না।

নীরেন ॥ আপনাকে মারবার চেষ্টার পর ও পালটে গেছে তাহলে। আপনিও ওকে জানেন না এখন। আমরা খেলা-ধুলো স্পোর্টস্ এসবের মধ্য দিয়ে ওকে স্বাভাবিক করতে চাইছি। আপনি বরঞ্চ এক্ষুণি চলে যান। ঠিকানাটা রেখে যান। প্রয়োজনমত যোগাযোগ করব।

প্রৌঢ় ॥ কিন্তু ওকে দেখতে পেয়েও চলে যাব?

নীরেন ॥ গেলেই ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রৌঢ় ॥ আমি ওকে ওর স্কুলের কথা বলব। ও আমার সঙ্গে ফিরে যাবে।

নীরেন ।। সেটা তো আমরাও বলে দেখতে পারি।

[*ভদ্রলোক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।*]

প্রৌঢ় ।। এ কী! একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে দেখতে পাচ্ছি। কে মেয়েটি?

নীরেন ।। মেয়েটি আমার বন্ধুর মেয়ে। এ বাড়িটাই ওদের। আপনার ছেলে মেয়েটির বেশ বাধ্য।

প্রৌঢ় ।। কিন্তু কোন মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। কারণ স্বভাবিক জীবনের নিয়মগুলোয় খোকা তেমন অভ্যস্ত নয়। বিপদে পড়ে যাবে। হয়তো মাথাটা আরো খারাপ করে ফেলবে।

[*নানারকম চিৎকার শোনা যাচ্ছে।*]

বোধ হয় স্পোর্টস্ শেষ। ওরা এদিকেই আসছে। একি, খোকাকে কাঁধে করে ছেলেরা নিয়ে আসছে! আশ্চর্য দৃশ্য মশাই! দেখুন, দেখুন!

নীরেন ।। আপনি এক্ষুনি চলে যান। ওরা এসে পড়লে একটা বিপজ্জনক কাণ্ড হবে। আমি বলছি, আপনি চলে যান। বরঞ্চ কয়েকদিন বাদে এসে খোঁজ নেবেন। আমরা ওকে পালাতে দেব না।

প্রৌঢ় ।। আমি চলে গেলেই ভাল হবে বলছেন?

নীরেন ।। মনে হচ্ছে, ভালই হবে। এক্ষুণি চলে যান। বি কুইক।

[*ভদ্রলোক দ্রুত সরে পড়লেন, লাঠি পড়ে রইল।*]

নীরেন ।। ও মশাই শুনছেন? ও মশাই—

প্রৌঢ় ।। (*দরজা দিয়ে*) আজ্ঞে?

নীরেন ।। আপনার লাঠি।

[*ভদ্রলোক ঢুকে লাঠি নিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে বাইরে থেকে একটা সমবেত শব্দ কাছে আসছে। এবার লোকটিকে কাঁধে নিয়ে, 'হিপ্ হিপ্ হুররে' ধ্বনি দিতে দিতে নামিয়ে দিল। কালো প্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি— পিঠে একটা ছোট কাগজে লাল কালিতে 'ওয়ান' সংখ্যাটি লাগান আছে। ওব দুহাতে তিন-চারটে কাপ, একটা বড় চ্যাম্পিয়ান কাপ, কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক ইত্যাদি।*]

বুলু ।। এক মিনিট প্লিজ।

[*ফোটো তোলে।*]

সুশান্ত ।। স্পোর্টসেও আপনি হিরো। চ্যাম্পিয়ান কাপটা তো বেমালুম অধিকার করে নিলেন!

অশোক ।। ছটা ইভেন্টেই সাকসেসফুল হবেন, সত্যিই ভাবিনি।

বুলু ।। আমার মনে হচ্ছিল একটা অলৌকিক শক্তি আপনাকে পরিচালনা করছে। চারশো মিটারে এতো আনাড়ির মতো লাগছিল, কিন্তু ক্রমশ একটা ক্ষ্যাপা ঝড়ের মতো আপনি এগিয়ে গেলেন।

নীরেন ।। আমার তরফের কনগ্র্যাচুলেশন জানানোর সুযোগ দিচ্ছে না কেউ।

অলক ।। চল, চলে যাই আমরা—

নীরেন ।। না, না, তোমরা থাকো, আমি বলছিলাম—

সুধীর॥ না, না, কাকাবাবু, মাঠে বিস্তর ঝামেলা পড়ে আছে।

অনেকে॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল চল।

সুহাস॥ তোরা যা, আমরা আসছি একটু পরে—

নরেন॥ তাড়াতাড়ি আসিস—

[*পূর্বোক্ত পাঁচটি ছেলে বাদে অন্য ছেলের দল চলে গেল।*]

নীরেন॥ *(লোকটিকে)* কনগ্র্যাচুলেশনস্।

লোকটি॥ কি করে কি হল জানি না। সবগুলো প্রাইজ পেলাম কি করে! একটা সুপার-পাওয়ার আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বোধহয় আছে।

[*প্রায় সকলের অলক্ষ্যে সুবোধ ঢুকল। স্পোর্টস্-এর পোশাক। গেঞ্জিতে 'থারটিন' সংখ্যাটি লেখা। ওর হাতে অতি ছোট একটা কাপ। বুলুর পাশে গিয়ে বসল।*]

নীরেন॥ সুবোধদা দেখছি প্রাইজটা বইত পারছেন না?

বুলু॥ ও যে এ প্রাইজটাও পাবে ভাবি নি আমি।

নীরেন॥ কিসে প্রাইজ পেলে, সুবোধ?

অমল॥ স্লো ওয়াকিং রেস-এ কনসোলেশন প্রাইজ।

সকলে॥ থ্রি চিয়ারস্ ফর সুবোধদা—হিপ্ হিপ্ হুররে।

[*সুবোধ লাজুক হাসল।*]

বুলু॥ ওর জীবনের প্রথম স্পোর্টস্।

সুবোধ॥ ছোটবেলায় স্পোর্টস্ করেছি। প্রাইজ পেতাম না।

লোকটি॥ এসব কাপ না দিয়ে যদি নানারকম পাখি প্রাইজ দেওয়া হত, খুব ভাল লাগত আমার। আমি ছোটবেলায় স্টেশনে বসে থাকতাম, মনে হত ট্রেনে করে কেউ একটা চমৎকার পাখি নিয়ে আসবে আমার জন্য। ও রকম পাখি আর কারও হবে না। আজ অবধি কেউ খাঁচা করে নিয়ে এল না!

নীরেন॥ এই প্রাইজগুলো বলছে, আপনার রক্তের মধ্যে একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে, আপনি নিজেও জানেন না।

সুশান্ত॥ আপনি সত্যিকার ফিলসফির একজন মূর্তিমান থ্রিল।

অশোক॥ প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি আমাদের অভাবিত কিছু উপহার দিতে পারেন বলে মনে হয়।

বুলু॥ যে লোক নিজের বাবাকে দার্শনিক কারণে মেরে ফেলতে পারে, তার শক্তি আজকের স্পোর্টস্ থেকে ঢের ঢের বড়।

নরেন॥ না, তা ঠিক।

সুহাস॥ কিন্তু এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অদ্ভুত পোশাক পরা। বলছিলেন, তিনি নাকি ওঁর বাবা।...মরেননি তিনি।

[*লোকটি চমকে উঠল। নেপথ্য থেকে তৎক্ষণাৎ যেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল যা লোকটি একাই শুনতে পাচ্ছে।*]

নেপথ্যে প্রৌঢ়॥ খোকা—

লোকটি ॥ ইম্‌পসিবল্। হতে পারে না। আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি। (*বুলুকে*) আপনি অবিশ্বাস করেন আমাকে?

বুলু ॥ কেন অবিশ্বাস করব? অবিশ্বাসে তো আমাদেরই ক্ষতি।

অমল ॥ আপনাকে নিয়ে আমাদের যে বিরাট কল্পনা তা তো ধ্বসে পড়বে। এতোটুকু হয়ে যাবে সব কিছু।

নেপথ্যে প্রৌঢ় ॥ খোকা—

লোকটি ॥ ভৌতিক ব্যাপারে কেন বিশ্বাস করব আমরা?

অশোক ॥ নীরেনকাকুর কাছেও এসেছিলেন সেই ফিকটিশাস্ লোকটি?

নীরেন ॥ (*থতমত খেয়ে*) না, মানে হ্যাঁ। ওরকম একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হটিয়ে দিয়েছি। কথাবার্তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, একটু চেপে ধরতেই কেটে পড়ল।

অমল ॥ সত্যি সত্যি যদি উনি ওঁর বাবাকে মেরে না থাকেন, তাহলে আমরা একটা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

সুহাস ॥ ফিলসফির দিক থেকে সত্যি সত্যিই আমরা চিটেড্ হচ্ছি, তাই না?

নরেন ॥ না, তা ঠিক।

অশোক ॥ শুধু তাই নয়, ওক ঘিরে যে 'হ্যালো' তৈরী করে আমরা ইন্স্‌পায়ার্ড হয়েছি, সেই জ্যোতিটাও চূর্ণ হয়ে যাবে।

সুশান্ত ॥ ইয়েস, সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র দুর্লভ জায়ান্টটা মরে যাবে, আর অজস্র পিগমিতে আমরা আবৃত হব।

বুলু ॥ যা নয় তা নিয়ে এতো বক্তৃতা করে কি লাভ?

নেপথ্যে প্রৌঢ় ॥ খোকা—

লোকটি ॥ দেখুন, যদি মরে নাও যায়, তাহলেও আমি মারতে চেয়েছিলাম, এটা তো সত্যি?

সুবোধ ॥ আমিও তো সব প্রাইজ পেতে চেয়েছিলাম, সেটা সত্যি না ঐ পুঁচকে কাপটাই সত্যি!

বুলু ॥ (*হঠাৎ লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে*) এ কি! আপনার কনুইটা যে ভয়ানক কেটে গিয়েছে। অশোক, এই তুলো ব্যাণ্ডেজটা দাও তো ভাই।

[*অশোক এগিয়ে দিল। আয়োডিন দিয়ে বুলু বাঁধতে লাগল।*]

এতোটা কেটে গেছে অথচ কিছু বলছেন না। আপনার কি যন্ত্রণাবোধও নেই? আচ্ছা লোক আপনি যা হোক।

লোকটি ॥ উত্তেজনায় খেয়াল ছিল না।

সুশান্ত ॥ আপনি আমাদের এখানেই থেকে যান, কেমন? এতো ভালবেসে কেউ আপনাকে দেখবে না।

লোকটি ॥ আমার লোভ বেড়ে যাচ্ছে। মায়া আসছে। আমি কেমন বদলে যাচ্ছি হয়ত।

নীরেন ॥ সুবোধ, ওসব পোশাক ছেড়ে এস না। তোমাকে নিয়ে একটু বেরুব। কথা আছে।

সুবোধ ॥ এক্ষুণি যাবেন? উঠব?

নীরেন ।। এক্ষুণি নয়, সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, তারপর।

বুলু ।। আচ্ছা, সত্যি যদি হঠাৎ এখন আপনার বাবা এসে যান, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন? কষ্ট হবে না?

নেপথ্যে প্রৌঢ় ।। খোকা—

লোকটি ।। আমার বাবা আসতে পারেন না। অসম্ভব। আর যদি সত্যি সত্যিই আসেন, তাহালে সেই প্রেতটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। এবার সে অনিবার্য মারা যাবে।

সুবোধ ।। সেকি, এখানে যদি আপনার বাবা আসেন, আমাদের সামনে তাঁকে আপনি মেরে ফেলবেন? আমাদের চোখের সামনে আপনি খুন করবেন?

নেপথ্যে প্রৌঢ় ।। খোকা—

লোকটি ।। চোখের সামনে খুন করব! *(পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে)* এটা দিয়ে শক্ত মাথাটা কয়েকটা আঘাতে আমি গুঁড়িয়ে ফেলব! যা অর্থহীন তাকে শেষ করে ফেলতে কব্জিতে জোরের অভাব হবে না। আই উইল অ্যাভেঞ্জ দ্য গডস্ গিল্ট। ঈশ্বরের কৃত পাপের শাস্তি দেব আমি, নিষ্ঠুর হাতে। ক্ষমাশূন্য জন্তুর মতো আমি কঠোর হতে পারি।

বুলু ।। অথচ আপনাকে দেখে কিন্তু কোমল মনে হয়, সব কঠোরতার ভিতরে আপনার মনটা আসলে কোমল।

সুবোধ ।। এসব কথা শোনার পরেও তুমি কোমল দেখছ, বুলু! খুনীরা তোমার কাছে তাহলে মাখনের পুতুল? হয়ত সব খুনী নয়, এই খুনী লোকটিকেই তোমার কোমল লাগছে।

সুশান্ত ।। এটা পৃথিবীর আর দশটা খুনের মত নয়।

সুবোধ ।। খুনটা খুনই। আমার মুখটা মুখই। হাত নয়, ছাতা নয়, চালকুমড়ো নয়।

সুহাস ।। *(হেসে)* এটা কিন্তু কোন যুক্তি হল না আপনার।

সুবোধ ।। আমি ভাল যুক্তি জানি না।

নেপথ্যে প্রৌঢ় ।। খোকা—

লোকটি ।। *(আর্ত চিৎকার)* কে? কে?

[আস্তে আস্তে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকলেন। লোকটি চমকে ওঠে। মুখে তার ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।]

প্রৌঢ় ।। খোকা, আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বুলু ।। কে আপনি?

প্রৌঢ় ।। আমি ওর বাবা।

বুলু ।। আপনি বেঁচে আছেন?

প্রৌঢ় ।। আমি মরিনি তার প্রমাণ আমি বেঁচে আছি, এসে দাঁড়িয়েছি।

লোকটি ।। তুমি প্রেত। আমার বাবার ভৌতিক ছায়া দেখছি আমি।

[ভদ্রলোক এগিয়ে এসে শক্ত করে লোকটির হাত ধরল।]

প্রৌঢ় ।। খোকা, বত্রিশ বছর ধরে তোকে যে ভাবে ছুঁয়েছি, ঠিক সেই স্পর্শ লাগছে না? আমি পাগলের মত তোকে খুঁজছি! তুই ভালবাসিস না বলে পুলিশে খবর দিই নি। আয়।

লোকটি ।। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমার লাভ কি?

প্রৌঢ় ॥ অনেক লাভ।

লোকটি ॥ ফিরিয়ে নিয়ে তুমি আমাকে শাস্তি দেবে। ভয়ানক কষ্ট দেবে।

প্রৌঢ় ॥ কিছু না। তোর সেই ছোটবেলার পাখির খাঁচাটার মতো আমি ভয়ানক ফাঁকা। আমার বাতাস কমে যাচ্ছে, আলো কমে যাচ্ছে, পা ফেলতে দেরি হয়। তুই আমার কাছে থাক।

লোকটি ॥ অসম্ভব।

প্রৌঢ় ॥ আমি তোকে জোর করে নিয়ে যাব। আমি সেই ব্রিজটা বানাব, তোর ইস্কুল —কতো কাজ আমাদের।

লোকটি ॥ কিছু হয় নি, হবে না। তুমি এই পৃথিবীর স্নেহের লোভ দেখিয়ে আমাকে ভয়ংকর একটা খাঁচায় পুরে নিতে এসেছ, আমি বুঝি।

প্রৌঢ় ॥ তোকে এখান থেকে যেতেই হবে।

[*লোকটি সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে আসে। কণ্ঠস্বরে উগ্রতা।*]

লোকটি ॥ আমার কাছ থেকে সরে যাও তুমি।...সরে যাও বলছি।... বলছি, তুমি সরে যাও। দিস টাইম য়্যু কাণ্ট এসকেপ। পালাতে পারবে না তুমি...আমি ঈশ্বরের অপরাধের শাস্তি দেব...। আমি আমার সব অস্তিত্বের মূল শিকড় উপড়ে ফেলব।

[*টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে নিল।*]

সুবোধ ॥ কি কাণ্ড! আমার কি রকম ভয় করছে বুলু, চল, ভেতরে যাই।

নীরেন ॥ *(ভদ্রলোককে)* আপনি বরং পাশের ঘরে যান।

বুলু ॥ যান না ও ঘরে, আমরা দেখছি।

প্রৌঢ় ॥ খোকা, শোন, আমার কথা শোন—

লোকটি ॥ না, শুনব না। তোমার কোন কথা শুনব না আমি। আমি তোমাকে খুন করব। আই মাস্ট কিল য়্যু...

সুহাস ॥ রক্তপাত হবে মনে হচ্ছে!

নরেন ॥ না, তা ঠিক। চল, চলে যাই।

প্রৌঢ় ॥ খোকা, আমি ভয় পাই না তোকে।

লোকটি ॥ ভয় না পেলে মৃত্যু হবে তোমার।

[*লোকটি পেপার ওয়েট তুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল।*]

সুবোধ ॥ (*লোকটিকে*) দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা—

লোকটি ॥ য়্যু স্টপ। দিস ইজ দ্য থার্ড অ্যাণ্ড লাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়্যার। আমার জন্মের সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ। পিতার সঙ্গে সন্তানের। কে আপনি মধ্যিখানে? আমি কাউকে ছাড়ব না! কে আপনারা?

অশোক ॥ আমাদের চিনতে পারছেন না? আমি অশোক। ওই তো সুশান্ত, অমল, নরেন, চিনতে পারছেন না?

লোকটি ॥ না, চলে যান আপনারা—যান!

[*সুহাস ও নরেন ত্রস্ত চলে গেল।*]

প্রৌঢ় ॥ খোকা, চল, আমার সঙ্গে। আয়।

লোকটি ।। না।

প্রৌঢ় ।। ফেলে দে ওটা হাত থেকে, ফেলে দে।

লোকটি ।। না, ফেলব না। তুমি চলে যাও। না হলে—না হলে আই উইল অ্যাভেঞ্জ দা গডস্ গিল্ট। আমি তোমাকে মেরে ফেলব।

প্রৌঢ় ।। খোকা—

লোকটি ।। আই উইল কিল য়্যু—আই উইল কিল য়্যু... দিস্ টাইম আই উইল কিল য়্যু...

[ভয়ানক দৃষ্টিতে এগোল, ভদ্রলোক পিছু হটে প্রায় দৌড়লেন। পিছনে পিছনে লোকটিও মাতালের মতো ছুটে গেল—চাপা ভাঙা গলায় বলতে লাগল—'দিস টাইম আই উইল কিল হিম, আই উইল কিল হিম।' মঞ্চে সকলে স্থাণুর মতো চুপ। হঠাৎ বাইরে ভদ্রলোকের গলায় একটা মর্মান্তিক চিৎকার শোনা গেল। সকলে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সুবোধ কানে আঙুল দিল। ভীত, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অশোক, সুশান্ত, অমল চলে গেল।]

নীরেন ।। বোধহয় ভয়ানক দুর্ঘটনাটাই ঘটে গেল! আমরা কেউ বাধা দিতে পারলাম না!

বুলু ।। ভদ্রলোককে মেরে ফেলল! কি করব আমরা, কাকু? ওকে ঠিক পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক খুনী বলে কখনও যে ওকে মনে হয় না?

সুবোধ ।। আমি চলে যাব নীরেনকাকু। এ সব খুনে পরিবেশের মধ্যে দার্শনিকতা খোঁজার সাহস আমার নেই। আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে দিলেন?

নীরেন ।। বাধা তো তোমারও দেওয়ার দায়িত্ব ছিল।

সুবোধ ।। আপনারা জানেন ভয়টা আমার রোগ।

নীরেন ।। আমরাও সকলে কোন না কোন ভাবে রুগ্ন।

সুবোধ ।। কিন্তু বুলুর সঙ্গে ওর মেশামেশি বেশি, যে কোন মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যেতে পারে।

নীরেন ।। বুলুকে ও কিছু করবে না, জলের মধ্যে আগুন নিতান্তই পঙ্গু। চুপ কর, ও আসছে।

[বিভ্রান্ত অসহায় দৃষ্টিও লোকটি ঢুকল। টেবিলের কাছে বসে দু'হাতে নিজের মাথা ঢেকে ফেলল।]

লোকটি ।। (*প্রায় কান্নার মতো গলায়*) দিস টাইম আই হ্যাভ কিলড্ হিম। আই হ্যাভ কিলড্ হিম...আমার হাতে আমার বাবার মৃত্যু হল! কিন্তু আমার সব সাহস যেন ফুরিয়ে গেছে! (*তাকিয়ে*) মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব কিছু আমাকে এখন বিরক্ত করছে, আমি হয়ত সকলকে খুন করব। আমার কি যেন একটা হারিয়েছে, প্রত্যেককে খুন করে রক্তের মধ্যে সেটা খুঁজতে হবে। শেষ পর্যন্ত নিজেকেও আমি রেহাই দেব না।

সুবোধ ।। বর্ন ক্রিমিন্যাল। নীরেনকাকু, আমাদের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

নীরেন।। আপাততঃ থাম সুবোধ।

লোকটি।। সেই ভিমরুলটা আমার হৃৎপিণ্ডে মর্মান্তিক হুল ফোটাচ্ছে। দারুণ যন্ত্রণায় আমি মরে যাব...(*বুলুকে*) আমি মরে গেলে দেখবেন একটা প্রজাপতি আমার মৃতদেহের চারপাশে ঘুরছে, কেবল ঘুরছে ; সেই চড়ুই পাখিটা কোন কাছাকাছি ডালে ডেকে উঠবে। ... কে পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু, ঐ ভিমরুলটা না প্রজাপতি? আমি বুঝি না, কিচ্ছু বুঝি না।

বুলু।। আপনি একটু শান্ত হয়ে থাকুন। ভিতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন।

সুবোধ।। তুমি এখনো সহানুভূতির কথা বলছ? আশ্চর্য হৃদয়শক্তি তোমার! পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ এখন এর কাছে থাকতে পারে না।

লোকটি।। আমি একা খুন করিনি। অনেকে মিলে আমার বাবাকে খুন করেছে। আমি পুলিশকে সব বলব। আপনি, আপনারাও খুনী।

সুবোধ।। কি আশ্চর্য, এ যে দেখছি সব্বাইকে জড়াচ্ছে! দ্যাখো বুলু, কী ভয়ানক ধূর্ত! কী প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র! আমার অনেক সময় মনে হত, লোকটার মাথায় কিছু একটা ঘুরছে।

[*লোকটি মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মত হতে নীরেনবাবু ধরে ফেললেন।*]

নীরেন।। আপনার শরীর কাঁপছে, আপনি চুপ করে বসুন।

[*অশোক ছুটে এল।*]

অশোক।। বুলুদি, ব্যাপারটা থানার দিকে গেছে। এখানে সুহাস ছিল —সুহাস আর নরেন, ওরা নাকি থানায় চলে গেছে। আমি দেখি, পথে ওদের ধরতে পারি কিন না—

[চলে গেল।]

নীরেন।। পুলিশের ঝামেলা চিরকালই আমি অপছন্দ করি।

বুলু।। পুলিশ এলে ওকে তো নিশ্চিত ধরে নিয়ে যাবে। (*লোকটিকে*) আপনি পালান। যে কোন দিকে চলে যান। এখনো সময় আছে। যান পালান। যারা বিচার করে, তারা সব কিছু বোঝে না। আপনাকে কিছুতেই ওদের বিচার বুঝবে না, আপনি পালান।

সুবোধ।। বুলু, তুমি কালপ্রিটকে সহায়তা করছ! আইনে এর দণ্ড আছে, তুমি জান?

নীরেন।। আপাতত তুমি চুপ কর, সুবোধ।

লোকটি।। কিন্তু কোথায় যাব আমি? অন্ধকারটা নেকড়ের মত আমাকে তাড়া করবে, আমার বাবার ভৌতিক ছায়া আমার জামা ধরে টানবে। নিজের কাছ থেকে পালানো যায় না। তাছাড়া আমার কোন অপরাধ নেই।

নীরেন।। একটা কাজ করলে হয় না? আচ্ছা, *(লোকটিকে)* ডেডবডিটা কোথায়?

লোকটি।। ঐ ঝোপটার কাছে।

সুবোধ।। এবারে মরেছে তো? আপনি ডেফিনিট?

নীরেন।। চলুন, দেখে আসি।

লোকটি।। আমি বুকে কান পেতে শুনলাম, নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দও জাগল না। শরীর ঠাণ্ডা, নিথর। কারুর যাবার দরকার নেই। এবার আমার ভুল হয় নি।

বুলু।। আপনি আঘাত করেছিলেন?

লোকটি।। ভয়ানক তাড়া করে যখন গেলুম, অসহায়ের মতো ওঁর দুটো চোখ জলে ভেজা, দুটো হাতে আমাকে পাগলের মতো থামাতে চাইল। তারপর পেপার-ওয়েটটা তুলতেই ভয়ানক শব্দ করে পড়ে গেল। হার্টফেল করল। আমি ওঁর ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ শরীরটা পরীক্ষা করে দেখেছি...হি ইজ্ নো মোর আণ্ডার দ্য সান্।

নীরেন।। একটা কাজ করা যাক্। ডেডবডিটা তুলে এনে পাশের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দি। তারপর নানা কৌশলে পুলিশকে শান্ত করার চেষ্টা করা যাবে, কি বলেন?

লোকটি।। না, পুলিশের সঙ্গে কোন আপোস-আদায় নয়। যা ঘটেছে, তা ঘটেছে।

বুলু।। তা হলে যে আপনাকে থানায় যেতে হবে, সে খেয়াল আছে? কেন নিজেকে জড়াচ্ছেন? আপনি একটা বিরাট মানুষ, বিরাট পৃথিবীর মধ্যে আপনি দৌড়ে মিশে যান। জেলখানার ছোট্ট ঘরটা আপনার দম বন্ধ করে ফেলবে না?

লোকটি।। আমরা সবাই যাব। সবাই মিলে জেল খাটব, কিংবা ফাঁসিতে ঝুলব।

সুবোধ।। তার মানে?

লোকটি।। তার মানে আমি একা দোষী নই।

সুবোধ।। আমরা কি দোষ করলুম?

লোকটি।। কমিউনিটি গিল্ট্, গডস গিল্ট্, ম্যান্স্ গিল্ট—আপনাদের, আমার ঈশ্বরের, সব পাপ আমার আঙুলে জমে উঠেছিল। আমরা সকলেই জেলে যাব। আপনারা, সমাজ, ঈশ্বর আর আমি।

নীরেন।। এর মধ্যে বাঁচবে কেবল ঈশ্বর, কারণ তার তো হাত নেই, তাই হাতকড়া পরানো যাবে না।

লোকটি।। ওই একটি পলাতক, খুনী আসামী—ঈশ্বর! ইতিমধ্যে কোন জঙ্গলের ধারে নিহত হয়ে পড়ে আছে। ঈশ্বরের মৃতদেহ নেই—মৃত্যুসংবাদ আছে। আমরা সবাই ঈশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে পথে শোভাযাত্রা করব।

বুলু।। পুলিশ হয়ত এখুনি এসে পড়বে। এসব কথা এক্ষুণি না বলে আপনি সত্যি করেই পালান। আপনাকে বাঁচতে হবে, আপনাকে পৃথিবীর দরকার আছে।

লোকটি।। আপনাদেরও তবে পালাতে হয়। *(বুলুকে)* বিশেষত আপনি। এই মৃত্যুর সঙ্গে আপনি প্রত্যক্ষ জড়িত। আপনি, আপনার এই কাকু, সুবোধবাবু, আমার মৃত মা, প্রজাপতি, সেই পাখিটা, বই, অভিজ্ঞতা, ফুল, হৃদয় অনেক কিছু। যদি জন্ম দিয়েই মা, না মরে যেত, আমি হয়তো কোন শিকড় খুঁজে পেতাম, এ রকম রুটলেস হতাম না। যদি কেউ আমাকে ভালবাসতো, কোন মেয়ে, এমন কি আপনিও, আমি শিকড় খুঁজে পেতাম। বই যদি ভিতরের ব্যথা না জাগাতো, মুর্খ সান্ত্বনায় বাঁচতাম। চারপাশের মানুষ যদি নানাভাবে বিরক্ত না করত, শান্তি পেতাম। প্রতিটি মুহূর্তের পৃথিবী যদি আমার অকারণ বেঁচে থাকাটাকে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে বারবার ফুঁড়ে না দিত, কোন উত্তেজনা পেতাম না। প্রজাপতিটা যদি আমাকে ছেড়ে না যেত, আমি ভিমরুলের জ্বালা থেকে বাঁচতাম। ঈশ্বর আমাকে এনে অপরাধ করেছে, বাবা সেই পাপে সহযোগিতা করেছে। আপনি আমাকে ভালবেসে উত্তেজিত করেছেন। এরা মানুষের খুশি-খুশি পৃথিবীটাকে

আমার হিংসুক, অসহায় চোখের কাছে বারবার নাচিয়ে তুলে অপরাধ করেছে। সকলের পাপ।

সুবোধ।। অত্যন্ত প্যাঁচালো মন। কী বিশ্রী চিন্তা। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারে। বুলু, পুলিশ এলে হঠাৎ আবার আদিখ্যেতা দেখাতে আরম্ভ কর না।

বুলু।। একটু চুপ করবে সুবোধ? শুনন, আপনি একটু শান্ত হয়ে নিজেই ভাবুন না, কি করা উচিত। পুলিশের হাতে পড়ে কি লাভ আপনার? ওখানে কি সঠিক বিচার হবে? সব কিছুর কি বিচার আছে? একটা ফুল ভয়ানক উল্লাসে ফুটতে চেয়েও যখন ঝরে যায়, তার বিচার কে করে?

লোকটি।। আমার উপায় নেই। সত্যকে আমি চেপে রাখতে পারি না। বিরাট সূর্যকে ঢাকা দেবার হাত নেই কারুর।

নীরেন।। আপনি পালালেই কিন্তু ভাল করবেন।

লোকটি।। পৃথিবীটা খুব ছোট। এক-এক সময় ছোট জামার মতো গায়ে লাগে না। ছুঁড়ে ফেলে খালি গায়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কোথায় পালাব? দেয়ালে মাথা ঠুকে যাবে।

সুবোধ।। এলোমেলো বকছে। পাগল। ছাড়া পাবে। নীরেনকাকু, জেলে পচব আমরা। আচ্ছা ঝক্কিতে পড়া গেল তো। একে পালাতে দেব না। এ পালালে খুনের দায়ে সব্বাইকে কিন্তু ঝুলতে হবে। মার্ডারারকে ধরে রাখুন, কাকু।

লোকটি।। পালানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার। তবে এই খুনের কারণ বলার তাগিদেই আমি চলে যেতে পারি। ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলার মাঠে গিয়ে আমি বলব, ওদের ডেকে নিয়ে বিশাল উদাসীন পৃথিবীটা দেখাব। মৃতদেহের উপর অর্থহীন চাঁদের-আলোর বীভৎস বিদ্রূপ দেখাব। মিউজিয়মে পুরনো জামার গায়ে যে সব পাপের রক্ত ছোপ্-ছোপ্ লেগে আছে, দেখাব। মিউজিয়ামের আর একটি অন্ধকার ঘরে ওদের নিয়ে আকাশ খুঁড়ে পাওয়া ঈশ্বরের ম্যমি দেখাব। ওদের অন্ধকারের কথা বলব—যে অন্ধকারের থেকে সুতোয় ঝুলিয়ে একটা বিশাল জন্তুর মুখের কাছে আমাদের দুলিয়ে-দুলিয়ে খেলানো হয়--সেই থ্রেড অফ নেমেসিস্ ওদের দেখাব। হয়তো আমার পালানো দরকার—আমার অনেক কাজ। আমি বরঞ্চ পালাই। আপনি ঠিকই বলেছেন।

[*নিজের ব্যাগটার কাছে গেল। গলায় পরল।*]

নীরেন।। কিন্তু আপনার ডেডবডি? আপনার ডেডবডি?

লোকটি।। আপনাদের প্রেজেন্ট করলাম।

[*বাইরে গোলমাল। হৈ চৈ। নীরেনবাবু তাকলেন জানালায়।*]

নীরেন।। সর্বনাশ অনেক লোক আসছে। সঙ্গে বোধহয় পুলিশ।

বুলু।। এখন আপনি পালাতেও পারবেন না। কোন পথ নেই!

লোকটি।। কোন পথ নেই? কি আশ্চর্য! পথগুলো কোথায় গেল?

বুলু।। কি করা যায় এখন? সত্যি যদি পুলিশ আসে?

[*সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকলেন। মুখে মৃদু হাসি।*]

নীরেন।। আপনি এবারেও মরেন নি? আশ্চর্য। কী প্রাণ করেছেন মশাই?

বুলু ।। ভাগ্যিস মরেন নি। মরে না যাওয়া কি ভীষণ ভাল কাকু, পুলিশের ঝামেলা থেকেও তুমি বাঁচলে।।

সুবোধ ।। (*লোকটিকে দেখিয়ে*) যা বাবা, এ লোকটা দেখি আমার মতই হতভাগ্য, কোন জিনিসটা সাকসেসফুলি করতে পারে না। ধ্যুৎ!

প্রৌঢ় ।। আমাকে বেঁচে থাকতে দেখে আপনাদের মতো আমি নিজেও কম অবাক হই নি। আমাকে মারবার জন্য ও হাত তুলতেই আমি চিৎকার করেই ইচ্ছে করে পড়ে গেলুম। ওর নার্ভের অসুখ আছে, ভাবল মরে গেছি। ওর কাছে ওর ভাবনাটাই গুরুত্ব পায়—আসল ঘটনা নয়।

লোকটি ।। তুমি তাহলে এবারেও বাঁচলে?

প্রৌঢ় ।। এবারে বাঁচলুম। তুই আমার সঙ্গে যাবি। তোর ইস্কুল তৈরি করে দেব আমি। তোর মতই আমি একা খোকা। আমরা দুজনে ফিরে যাই চল।

লোকটি ।। আমি কিছু পারি না। এমন কি দুবারের চেষ্টায়ও কাউকে মেরে ফেলতে পারি না। কিচ্ছু পারি না আমি। হঠাৎ কেমন করে স্পোর্টস্-এ প্রাইজ পেলুম? এগুলো দিয়ে আমার কি হবে? বরঞ্চ তোমার সঙ্গে ফিরে যাই। আমার সেই ছোট্ট ঘরটা, লেখার টেবিল, শুয়ে থাকার খাট, মাথার কাছে জানালা—বাইরের পথে জ্যোৎস্নায় হঠাৎ-হঠাৎ সেই প্রজাপতি, তৎক্ষণাৎ ভিমরুলটার ভীষণ হুল! বেশ লাইফ। বুঝলেন, আমি বাবার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। এবার বাবাই আমাকে খুন করবে, কিংবা কি করবে কে জানে? একটা কিছু হাস্যকর মজা হবে আমাকে নিয়ে। চলি। (*হঠাৎ কি মনে করে*) ও আমার কাপগুলো (*সুবোধকে দিল*) এগুলো আপনি রাখুন। (*ব্যাগটা খুঁজল*) আপনাদের কিছু আবার নিয়ে গেলাম না তো। না, কিছুই নিইনি। (*কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে*) আপনার বাঁধা ব্যাণ্ডেজটা যে সঙ্গে চলল।

বুলু ।। (*চোখে জল আসে*) ওটা থাকুক।

লোকটি ।। (*ম্লান হেসে*) থাকুক। চলি, নমস্কার।

[*ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল। পরে নীরেনবাবু ও সুবোধ। বুলু একা। কতকগুলো রঙিন বুদ্বুদ শুধু ঘরময় উড়ছে, ঘুরছে।*]

যবনিকা

গন্ধরাজের হাততালি

চরিত্র লিপি

মীরা

অরুণ চৌধুরী

ভোলা

জনৈক ভদ্রলোক ওরফে হরিকিঙ্কর তলাপাত্র

প্রণব মিত্র

[সাজানো গোছানো একটি ঘর। টেবিলের চারদিকে কয়েকটি চেয়ার। একজন বছর পঁয়ত্রিশের মহিলা ইজিচেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে একটা গল্পের বই পড়ছে। রাত পৌনে ন'টা। ফোনটা বেজে উঠল। মেয়েটি অর্থাৎ মীরা উঠে ফোনটা ধরতে যেতে হঠাৎ হাঁটুর কাছে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ করল। উঠতে পারল না। ফোনটা বেজে বেজে থেমে গেল। হাতের বইটা কাছের খাটে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার উঠতে চেষ্টা করল। পারল না। বাইরের দরজায় এসময় কে কড়া নাড়ল।]

মীরা।। কে?

বাইরে থেকে।। আমাকে ঠিক চিনবেন না, আমার নাম অরুণ চৌধুরী।

মীরা।। ভেতরে আসুন।

[হাসি খুশি বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের একজন লোক ঢুকল। ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছে। চেহারা কিছুটা শীর্ণ। সপ্রতিভ দেখতে]

অরুণ।। নমস্কার।

মীরা।। নমস্কার। বসুন।

[অরুণ আর একটা ইজিচেয়ারে বসল]

অরুণ।। ভয়ানক দরকার ছিল আপনার সঙ্গে, (*ঘড়িটা দেখল*) সময়তো বেশি নেই। কিন্তু আপনাকে কেমন বিষণ্ন দেখছি, অন্যান্য দিন কেমন ফ্রেশ দেখায়, যখন স্কুলে বা বেড়াতে যান লক্ষ করেছি।

মীরা।। আপনি তাহলে এপাড়ায় থাকেন?

অরুণ।। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেননি আমাকে পথেঘাটে?

মীরা।। না।

অরুণ।। ঐ আমার এক দুর্ভাগ্য। কেউ দেখে না আমাকে। পাঁচফুট কয়েক ইঞ্চির শরীরটা কিভাবে যে অদৃশ্য থাকে। অথচ আমি দেখি। ট্র্যাজেডি, বুঝলেন চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি। আপনার বাড়ির নম্বর 58 আমার 38, খুব দূরত্ব নেই। অথচ আপনি আমাকে কখনও . . . আপনি কি অসুস্থ না কি? মাঝেমাঝে আপনাদের বাড়িতে ডাক্তার আসেন দেখেছি। সাইকোঅ্যানালিস্ট রুদ্র সাহেব-কেও একদিন আপনাদের দরজার সামনে মোটর থামাতে দেখলাম।

মীরা।। আমার পা-টা হঠাৎ অবশ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। মনে হয় শিরদাঁড়াটা আমার ভার বইতে পারবে না।

অরুণ।। আপনার কি মনে হয়, না সত্যি সত্যি হয়?

মীরা।। প্রথমে মনে হয়, তারপর সত্যি-সত্যি হয়। অনেকে বিশ্বাস করে না, জানেন? বলে বাতিক।

অরুণ।। বলা যায়না, বাতিকও হতে পারে।

মীরা।। আমার মোটেই বাতিক নয়। একটু আগে ফোনটা বাজছিল ধরতে পারলাম না। এরকম অনেক ফোন বেজে বেজে থেমে গেছে। সব সময় জানতে পারিনা কে ফোন করেছিল। কি বলার ছিল। এতো হারিয়েছি আমি।

অরুণ।। যা গেছে গেছে, ও নিয়ে ভাবতে নেই। অনেক জিনিশ হাতের নখের মতো কেটে বাদ দিলেই সৌন্দর্য্য, পুষে রাখলে এখান থেকে লালদীঘি অবধি লম্বা এক একটা

নখ হত, কিম্ভুত কিমাকার ব্যাপার। তবে আপনার রোগটা ভাববার বৈকি। আমার মনে হয়, এটা বাত থেকেই হয়েছে।

মীরা॥ আমার বাত নেই। বাত ভাবতেই আমার কেমন ঘেন্না হয়। বাতের কথা আপনি তুলবেন না।

অরুণ॥ চটে গেলেন তো? ট্র্যাজেডি কি জানেন? জীবনে যতো মেয়েদের সঙ্গে মিশলাম প্রত্যেকের সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত অসুখ নিয়ে। ট্রেনে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, চমৎকার দেখতে—কথা স্টার্ট করল টনসিল নিয়ে। এখনো তার সঙ্গে কথা হয়, বেশির ভাগ টিউমার আর অ্যাজমা নিয়ে। ওর বোনের সঙ্গে আলাপ হল, তার আবার চোখের পাতা পড়লে নাকি শব্দ হয়। মিনু বলে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ অ্যালার্জি নিয়ে, মিষ্টি দেখলে ওর গা চুলকোতো। কি কপাল করেছি বুঝুন!

মীরা॥ অনেক মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় দেখছি।

অরুণ॥ অনেক। ওদের পরপর দাঁড় করালে এসপ্ল্যানেড অবধি লাইন হয়ে যেতে পারে। (*হেসে উঠল। তারপর শান্ত গলায়*) সবাই আমাকে পছন্দ করে, অপছন্দ বা ভালবাসলে হয়ত একটা কিছু হতে পারে। এখন বয়সতো চলে যাচ্ছে। চুল, দাড়ি পাকছে। আপনি যদি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন হয়ত দেখতে পাবেন একটা কাল দাড়ি ধীরে ধীরে পেকে শাদা হচ্ছে। ও হ্যাঁ, দেখুনতো আপনার পায়ের অবশ ভাবটা কেটে গেছে কি না।

মীরা॥ বোধ হয় গেছে। (*চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ায়*) বেশ লাগছে এখন। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অন্যমনস্ক ছিলাম তো। আস্তে আস্তে অবশ ভাবটা পালিয়েছে।

অরুণ॥ ধীরে ধীরে রোগটাই পালাবে।

মীরা॥ মুখে ফুলচন্দন পড়ুক আপনার। আপনি কেন এসেছেন কিন্তু এখনো বললেন না।

অরুণ॥ ঠিক বলেছেন (*ঘড়ি দেখল*), সর্বনাশ আর তো সময়ই নেই দেখছি! আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এতো ভাল লাগছিল। যদি কিছু মনে না করেন, ছেলেদের থেকে মেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে আমার বেশ লাগে। মেয়েরা এতো ভাল। কেবল যদি একটু কনসিডারেট হত, একটু কম আহ্লাদে, আর একটু বেশি বুদ্ধিমান কিম্বা কম অভিমানী।

মীরা॥ ভাল বলতে গিয়ে যে নিন্দা শুরু করলেন।

অরুণ॥ মেয়েদের নিন্দা করব আমি? মেয়েদের আমার ভালই লাগে। সময়টা এত হু' হু' করে কাটে আর প্রব্লেম তো সময় নিয়েই। আমার যদি দাড়ি না পাকতে থাকত কিংবা দারুণ স্বাস্থ্য থাকত—যদি একজন সুপুরুষ হতাম মেয়েদের চোখ থেকে অন্তত পিছলে যেতাম না।

মীরা॥ আপনি কিন্তু কি দরকারে এসেছেন মোটেই বলছেন না আর আমাব কৌতূহল বাড়িয়ে তুলছেন।

অরুণ॥ যতবারই বলব ভাবছি, আপনি কিভাবে নেবেন চিন্তা করে দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছি।

মীরা॥ কোনও দ্বিধা নেই, আপনি বলুন।

অরুণ।। না বলে অবশ্য উপায় নেই, সময়তো হয়ে গেছে প্রায় (*ঘড়ি দেখল*)—

মীরা।। বার বার ঘড়ি দেখছেন কেন বলুন তো? কোথায় যাবেন আপনি?

অরুণ।। না, সেই ভদ্রলোক আসবেন।

মীরা।। কে?

অরুণ।। প্রণব বাবু, প্রণব মিত্র।

মীরা।। কে তিনি?

অরুণ।। আমিই কি ছাই ভাল করে জানি নাকি। তাছাড়া উনিও আমাকে সাতজন্মেও দেখেন নি। নামও জানেন না আমার। আসবেন আপনার কাছে।

মীরা।। কেন?

অরুণ।। আপনাকে তার কুড়ি বছর ধরে জমানো ভালবাসা নিবেদন করবেন।

মীরা।। কি আশ্চর্য! কোনও প্রণব মিত্রকেই আমি চিনি না। ঐ নামের কোন ছেলের সঙ্গেও কোনকালে পরিচয় ছিল বলে মনে পড়ছে না।

অরুণ।। আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তো কিচ্ছু আসছে যাচ্ছে না। উনি আপনাকে বুকের ভিতরে গভীরভাবে চিনে রেখেছেন।

মীরা।। কিন্তু আমি তাকে চিনি না। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে না জানিয়ে শুনিয়ে একজন লোকের এভাবে হঠাৎ আসারও কোন মানে হয় না।

অরুণ।। প্রণববাবুর কোনো দোষ নেই। তিনি একজন পারফেক্ট জেণ্টল্‌ম্যান। তাঁর সম্বন্ধে আপনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবেন না।

মীরা।। আপনি তাঁকে চেনেন না বলছেন। অথচ গুণগানে তো তাঁর আত্মীয়কেও হার মানাচ্ছেন।

অরুণ।। একটা চিঠির মারফৎ ভদ্রলোককে আমি চিনি। ওতেই আপনার কথা—

মীরা।। আপনাকে আমার কথা লিখলেন কি সূত্রে?

অরুণ।। চিঠিটা আমাকে লেখেননি। লিখেছেন আপনাকে।

মীরা।। আপনার ঠিকানায়?

অরুণ।। না, আপনার ঠিকানায়।

মীরা।। আপনি সে চিঠি পেলেন কি করে?

অরুণ।। আমার বাড়ির নম্বর থারটি এইট আপনার ফিফটি এইট। থ্রি আর ফাইভের চেহারার সাদৃশ্যে পোস্টম্যান ব্যস্ততায় নিশ্চয়ই গুলিয়ে ফেলেছে। আমি অবশ্য খামের উপর আপনার নামটা লক্ষ করেছিলাম। স্পষ্ট করে লেখা ছিল, মীরা ব্যানার্জি।

মীরা।। আমার চিঠি আপনি খুললেন কেন? চিঠিকে নিশ্চয়ই আপনিও পার্সোনাল ব্যাপার ভাবেন?

অরুণ।। বিশ্বাস করুন, কৌতূহলে। আপনাকে প্রায়ই আমি দেখতাম। চমৎকার একটা শাড়ি পরেছেন। দু-একখানা বই হাতে সুশ্রী বুদ্ধিমতী মুখ—দারুণ লাগত আমার। আপনি ভুল বুঝবেন না। এসব কথা কোনরকম আত্মনিবেদন নয়। জাস্ট ভাল লাগা। সুন্দর আকাশ দেখে আপনি মুগ্ধ হতে পারেন। কাউক দেখে এরকম নিরীহ অথচ সুন্দর অনুভূতি হয় না এক এক সময়?

মীরা।। যাকগে চিঠিটা দিন।

অরুণ।। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছি।

মীরা।। ছিঁড়ে ফেলেছেন! আমাকে ফেরৎ দিলেন না কেন?

অরুণ।। ছিঁড়ে ফেললাম যে!

মীরা।। আমার চিঠি আপনি কেন ছিঁড়ে ফেললেন?

অরুণ।। ভয় নেই সবটা পড়ে রেখেছিলাম। অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে আছে।

মীরা।। অপরের চিঠি আপনি পড়লেন? কি রকম লোক আপনি?

অরুণ।। বাঃ, খামের মুখটা খুললাম কেন তাহলে? আমি কি খামের মধ্যে টাকার নোট আছে মনে করে খুলেছি?

মীরা।। অত্যন্ত খারাপ লোকতো আপনি! পরের চিঠি খুলে পড়ে নেন?

অরুণ।। দেখুন, আমি গোটা ব্যাপারটা চেপে যেত পারতাম। পারতাম তো? কিন্তু সরলভাবে প্রকাশ করে অভিযোগের পাত্র হচ্ছি। সরলতা কতো বিপজ্জনক দেখুন!

মীরা।। কি ছিল সে চিঠিতে? নিশ্চয়ই একজন বুড়ো অপদার্থ যা খুশি অশোভন কথা লিখেছিল।

অরুণ।। বুড়ো নন, He is only forty three-বা তার কাছাকাছি বয়সের।

মীরা।। বুড়োর আর বাকি কী?

অরুণ।। তা কিছু বাকি আছে। তবে অত্যন্ত রুচিশীল, কোন অশোভন কথা তিনি লেখেননি।

মীরা।। কি শোভন কথা লিখেছেন তিনি? অস্বস্তিকর কিছু হলে বলতে হবে না।

অরুণ।। আচ্ছা আপনার যখন বয়স চৌদ্দ-পনের, একদিন একগোছা রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে আপনি ঘরে ঢুকছিলেন। একটা ঝলমলে জংলা শাড়ি পরণে। ব্লাউজটা ছিল গোলাপী, দুধের মত সাদা ফিতেয় বিনুনীর শেষ প্রান্তে একটা ধব্‌ধবে ফুল বানানো ছিল? হঠাৎ একটা ফিটনগাড়ি আপনাদের দরজার কাছ দিয়ে মিষ্টি ঘণ্টা বাজিয়ে যেতেই আপনি থেমে চঞ্চল চোখে রাস্তার দিকে তাকালেন। গাড়িতে বাইশ-তেইশ বছরের একজন তরুণ ছেলে ছিল। সে আপনাকে দেখল। তারপর কুড়ি বাইশ বছর কেটে গেলেও সে আপনাকে ভোলেনি। সেই ছেলেটিই প্রণব মিত্র। মনে পড়ে আপনার?

মীরা।। পনের বছর বয়সে ফিটনগাড়ির দিকে একবার তাকিয়েছিলাম বলে তো আমার মনে পড়ে না। এসব কি কারুর মনে থাকে?

অরুণ।। কিন্তু ওঁর মনে আছে। সেই কথাই চিঠিতে লিখেছেন। ছেলেটি গরিব ছিল। দু'খানা বই বেচে দিয়ে অনেক দিনের শখ মেটাতে ফিটন চেপে ছিল আর সেই বিলাসের রোম্যাণ্টিক মুহূর্তে আপনাকে দেখল। নানা কারণে প্রচণ্ড পিপাসা থাকলেও কাউকে ভাল বাসতে পারেনি। তার কারণ হয়তো এও হতে পারে আপনার সেই বালিকা মুখটি ওঁর মনে ভয়ানক দাগ কেটে বসেছিল। ব্যাখ্যাটা ওঁরই।

মীরা।। কিন্তু আমি তো আর বালিকা নেই।

অরুণ।। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ভদ্রলোক হঠাৎ সপ্তাহখানেক আগে আবার কলকাতায় এসেছেন। এবং আকস্মিকভাবে আপনাকে এই বাড়ির দরজায় হঠাৎ দেখেই চিনতে পারেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার পুরনো তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। Now he is helplessly helpless!

মীরা।। এসব পাগলামোর জন্য আমার কি দায়িত্ব?

অরুণ।। আপনার কোন দায়িত্বই নেই। ভদ্রলোক কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনার সব খবর নিয়ে জেনেছেন আপনি অবিবাহিত এবং সম্ভবত কোনো ভালবাসার ব্যাপারেও জড়িত নন। তাই উনি আসবেন, ওঁর এতোদিনের ভালবাসা নিবেদন করে চলে যাবেন। প্রস্তাবটা কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ।

মীরা।। অসম্ভব। ওঁর কোনও কথা আমি শুনতে যাব কেন?

অরুণ।। আপনি চটে যাচ্ছেন কেন? একজন নিরীহ ভদ্রলোকের একটা পবিত্র অনুভূতির কথা আপনি শুনতে পারবেন না!

মীরা।। না, তাছাড়া আপনার স্বার্থ কি এতে? আপনার এতো গরজ কেন? কি লাভ এতে আপনার?

অরুণ।। কিছু না, আসলে আমি ভদ্রলোকের ভালবাসার তীব্রতায় moved। আমি নিজে কাউকে ভালবাসতে পারিনি। তাই অপরের ভালবাসার সেবা করতে চাই, এটা একধরণের Social Service, জনকল্যাণ।

মীরা।। আপনার Social Service নিয়ে আপনি থাকুন, আমাকে জড়াবেন না। এই বয়সে এসব ছেলেমানুষি ভাল লাগে না আমার।

অরুণ।। আপনি তো সেরকম বুড়িয়ে যাননি।

মীরা।। গেছি।

অরুণ।। যাননি।

মীরা।। আপনি আমার কি জানেন?

অরুণ।। জানি, আপনি বুড়িয়ে যাননি। তাছাড়া ভদ্রলোক আপনার অনিচ্ছা থাকলে আপনাকে বিরক্ত করতেও চান না। উনি লিখেছেন, আপনার খোলা জানালার ধারের টেবিলের ওপরের ফুলের টবে যদি সেদিনের মত একগুচ্ছ রজনীগন্ধা রাখেন তাহলে উনি বুঝবেন যে আপনি অন্তত তাঁর কথা শুনতে রাজি আছেন। রজনীগন্ধা না থাকলে ভদ্রলোক বাইরে থেকেই চলে যাবেন। এর মধ্যে কোন ঝামেলাই নেই। ব্যাপারটা আপনি একটু শান্তভাবে ভেবে দেখুন, কোন গণ্ডোগোলই নেই।

মীরা।। কিন্তু এখন রজনীগন্ধা কোথায় পাব?

অরুণ।। রজনীগন্ধা আমি ব্যাগে করে নিয়ে এসেছি (*ব্যাগ থেকে বার করে দিয়ে*) নিন, দ্রুত ভাসটায় রাখুন। এক্ষুনি এসে পড়বেন উনি। আপনি মনের দিক থেকে প্রস্তুত থাকুন। আমি চলি। মাই ডিউটি ইজ ওভার।

মীরা।। কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি যাবেন না। আমার কেমন অসহায় লাগবে। Please আপনি থাকুন।

অরুণ।। ভদ্রলোকের অস্বস্তি হতে পারে। আমি থাকলে।

মীরা।। আপনি অন্তত আলাপ পরিচয়ের পর চলে যাবেন।

অরুণ।। বেশ। নটায় আসবেন বলেছিলেন। (*ঘড়ির দিকে তাকিয়ে*) Just Nine.

মীরা।। আমার কেমন ভয়ভয় করছে।

অরুণ।। ভয়ের কি? তবে ভদ্রলোক অদ্ভুত সন্দেহ নেই।

[*একটুকাল চুপচাপ*]

মীরা।। কই আসছেন না তো?

অরুণ।। এক্ষুনি আসবেন।

মীরা।। ডেটটা ভুল করেন নি তো! আজকেই আসবেন, আপনার ঠিক মনে আছে তো?

অরুণ।। হ্যাঁ।

মীরা।। একটা বিশ্রী রকম অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তাই না?

অরুণ।। হ্যাঁ।

মীরা।। আপনি এত কম কথা বলছেন কেন?

অরুণ।। আমার চলে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে বলে। আমার বলার কথা আর কি থাকবে?

মীরা।। যা হোক কিছু বলুন। বিশ্রী রকম একটা লাগছে আমার।

অরুণ।। (*হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে*) আপনাদের গেটের কাছে এক জন ভদ্রলোককে দাঁড়াতে দেখলাম যেন। (*জানালার কাছে গেল*)

মীরা।। কি করি এখন? শাড়িটা বদলে আসব?

অরুণ।। ঠিক আছে। এমনিতেই ভাল দেখাচ্ছে আপনাকে। (*মীরা দ্রুত লুকিয়ে আয়নায় মুখটা দেখে নিল, চুলটা ঠিক করল। আঁচলে মুখটা মুছল*) হ্যাঁ, প্রণববাবুই হবেন। দাঁড়ান আমি ডেকে নিয়ে আসি। জানলার ফুলগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। প্রণববাবু না হয়ে যায় না। আসছি আমি।

[*অরুণ দ্রুত বেরিয়ে গেল। মীরা জানালার কাছে গিয়ে একটু বাইরের দিকে তাকিয়ে দ্রুত ফিরে এল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।*]

মীরা।। ভোলাদা—

[*ভোলা এল*]

মীরা।। তিন কাপ চা।

ভোলা।। এইতো চা খেলে!

মীরা।। একজন ভদ্রলোক আসছেন। যা বলছি কর তাড়াতাড়ি। বিস্কুট-টিস্কুট থাকলে সঙ্গে দিও। (*ভোলা চলে গেল। অরুণের সঙ্গে প্যান্ট আর বুশশার্ট পরা একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। শার্টটায় বিচিত্র রঙের চৌকো, গোল, ত্রিভুজ আঁকা। প্যান্টটা প্রখর কালো, হাতের ব্যাগটাতে নানা রঙ। ব্যাগটা ভারি। কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে।*)

অরুণ।। আসুন, (*চেয়ার দেখিয়ে*) বসুন।

[*ভদ্রলোক বসে চারদিকে তাকালেন। রজনীগন্ধার উপর চোখ পড়ল।*]

ভদ্রলোক।। রজনীগন্ধা! So gloriously white! কিন্তু অন্য রঙের রজনীগন্ধা হয় না কেন? আমি মধ্যে মধ্যে রজনীগন্ধা রঙ করে নানা রঙের ক'রেনি। আই লাভ্ কলার। আমার পোশাক দেখেই বুঝতে পারছেন। রঙ হচ্ছে মনের ভ্রমণ বিলাস। একটা রঙ থেকে আর একটা রঙের কাছে যাওয়া—এছাড়া আমরা আর কি চাই? এই ভাবে মনের মতো রঙটা খুঁজতে খুঁজতেই জীবন শেষ।

অরুণ।। আপনার জন্য আমরা এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

ভদ্রলোক।। How funny! আমার জন্য তো মৃত্যু ছাড়া কেউ অপেক্ষা করে নেই।

অরুণ।। আলাপ করিয়ে দিই, উনিই মীরা দেবী। আপনি যার কাছে আসবেন বলে লিখেছেন। রজনীগন্ধাও সেজন্য সাজানো আছে।

মীরা।। দেখুন ঐ ফুলটুল কিন্তু অরুণবাবুই এনেছেন!

ভদ্রলোক।। কাকে চিঠি লিখেছি বলছেন, আপনাকে? কিন্তু আপনাকে তো আমি সাতজন্মেও চিনি না। তাছাড়া তিন বছর আগে একখানা চিঠি লেখার পর তো আমি খাম-পোস্টকার্ড কিনিনি। লাস্ট চিঠিও তো পোস্ট করা হয়নি।

মীরা।। আপনি প্রণববাবু তো?

ভদ্রলোক।। প্রণববাবু আমার জ্যাঠামশায়ের ছোটভাই অর্থাৎ আমার কাকার নাম।

অরুণ।। কেন আপনি সব ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চাইছেন? আপনার বয়স যখন বাইশ কি তেইশ তখন এই মীরা ব্যানার্জীকে কিশোরী বয়সে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আজ তা ভুলতে পারেননি বলে আপনার ভালবাসা জানাতে আপনি এখানে আসেননি?

ভদ্রলোক।। ঐ বয়সের একটি মেয়েকে আমার এখনো কিছু বলার আছে ঠিকই, কিন্তু সে কি আপনি? (*মীরার দিকে তাকিয়ে*) আপনি কি?

মীরা।। আমি কি করে বলব?

ভদ্রলোক।। আচ্ছা মুশকিলে পড়ে গেলাম তো! এখন যেন মনে হচ্ছে আমি আপনার কাছেই এসেছি!

অরুণ।। আপনি ওঁর কাছেই এসেছেন। বুঝতে পারছি এজাতীয় মনের অবস্থায় একটা গোলমাল হয়ে যায়। ঐজন্যই প্রথম দিকে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

ভদ্রলোক।। তা হতেও পারে। গোলমাল একটা হচ্ছে। তাহলে কি লাস্ট চিঠিটা ডাকে ফেলেছিলাম? কিন্তু তাও তো তিন বছর আগের কথা! ঘুমের মধ্যে কিছু লিখেছি? কি লিখতে পারি?

অরুণ।। আপনি লিখেছিলেন, কয়েকটি রজনীগন্ধা ফ্লাওয়ার ভাসে যদি থাকে তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার কথা শুনতে উনি রাজি আছেন। মনে পড়ছে?

ভদ্রলোক।। মেনে নিতে আপত্তি কি?

অরুণ।। প্রথম যখন আপনি ওঁকে দেখেন। দু'খানা কলেজের বই বেচে দিয়ে আপনি ফিটনে চেপেছিলেন।

ভদ্রলোক।। চমৎকার, ফিটন বেশ লাগে আমার। তবে চাকাগুলো আর গাড়িটা নানা রঙের হলে বেশ লাগে, তাই না?

[*চা দিয়ে গেল ভোলা। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপ নিয়ে চা খেতে আরম্ভ করে দিল। কাপগুলোর প্রত্যেকটা শাদা রঙের*]

ভদ্রলোক।। এক রঙের সব কাপ করেছেন কেন? বিচিত্র হবে কাপের রঙ। আমার ব্যাগে নানা রঙের চশমা আছে। আমি বদলে বদলে পরি। এঃ! চায়ে দুধ ঢেলে ফেলেছে, আমি লিকারে দুধ ঢেলে দেখি, চমৎকার দৃশ্য হয়। লিকারের তলা থেকে একটা অস্পষ্ট

সাদাটে ভাব টুঁ মেরে উঠতে থাকে। তারপর (*ওরা চা নিল*) ভালবাসার মত সন্তর্পণে মিলিয়ে যায় পুরো চা-টার মধ্যে। হাউ নাইস!

মীরা।। আপনি একটু রোম্যান্টিক স্বভাবের। বয়স হলেও মনটা টাটকা রেখেছেন।

ভদ্রলোক।। কত বয়স আমার বলুন তো?

মীরা।। তা আপনার চিঠি অনুযায়ী তেতাল্লিশ! পঁয়তাল্লিশ।

ভদ্রলোক।। ভুল করলেন! মাত্র ছত্রিশ! পাকা চুল দেখে বলছেন তো? চুল আমার পাকা নয়। কুচকুচে কালো। রঙ ভালবাসি তো, কানের দিকের চুলগুলোয় শাদা রঙ করে বেরিয়েছি। এই যে কানেব কাছে তিলটা দেখুন, ঘসে তুলে ফেলছি (*তুলে ফেলল*)। দেখবেন, আমি ইচ্ছেমত সাজ বদলাব। নিজেকে পাল্টে পাল্টে দেখতে ভাল লাগে না? (*চায়ে চুমুক দিয়ে কি ভাবেন*) আমাদের কোনো স্থির পরিচয় নেই। আমরা চরিত্রের দিক থেকে নানারকম—মালটিপল্ সেলফ্‌হুড় হচ্ছে মডার্ন ম্যানের ক্যারেকটার। মায়ের কাছে আপনি যা, স্বামীর কাছে ঠিক তার বিপরীত। মাস্টার মশাই-এর কাছে যা, মাস্টার হয়ে তার ঠিক বিপরীত। প্রত্যেকটা রিলেশনে আমরা আলাদা। কেবল চেহারাটা বদলায় না—আমি তাই আলাদা আলাদা করে নেই।

মীরা।। আপনি কি করেন?

ভদ্রলোক।। ডাক্তারি।

অরুণ।। কোত্থেকে পাশ করেছেন?

ভদ্রলোক।। কোন ডাক্তারী কলেজ থেকে নয়। আমার ট্রিট্‌মেণ্ট আলাদা। দার্শনিক চিকিৎসা, কখনো কমনসেন্স ট্রিট্‌মেণ্ট।

অরুণ।। অদ্ভুত ভাল হল। মীরা দেবীরও একটা অসুখ আছে। উনি হঠাৎ হঠাৎ অবশ হয়ে পড়েন। পায়ের দিক থেকে শুরু হয়।

ভদ্রলোক।। করা যাবে ট্রিট্‌মেন্ট। হয়ত এর চিকিৎসার জন্য প্রথমে ওঁকে আমি ন্যাড়াও হতে বলতে পারি। না না, বলব যে তার কোনো মানে নেই। তবে হতেও পারে। কিম্বা যাতে উনি বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকেন তার জন্য সকালে দুটো, বিকেলে একটা আর শোবার আগে দুটো ন্যাশনাল সঙ্।

মীরা।। আপনি এপর্যন্ত ক'জন রোগী পেয়েছেন?

ভদ্রলোক।। একজন। তবে তিনি চিকিৎসার মাঝপথেই উধাও হয়ে যান। শুনেছি, এখনও তিনি নিখোঁজ।

মীরা।। দেখুন প্রণববাবু—

ভদ্রলোক।। Please, ও নামে আমাকে ডাকবেন না।

অরুণ।। না, মানে আপনার চিঠিতে—

ভদ্রলোক।। বলেছি তো, আমার নাম কস্মিনকালেও প্রণববাবু নয়। কোন চিঠিও আমি লিখিনি। আমার নাম হরিকিঙ্কর তলাপাত্র। আপনাদের বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কি রকম রঙ হলে মানাত। ঠিক তক্ষুণি এই ভদ্রলোক, কি নাম আপনার?

অরুণ।। অরুণ সান্যাল।

ভদ্রলোক।। হ্যাঁ, অরুণবাবু আমার হাত ধরে "আসুন-আসুন" বলে টেনে নিয়ে এলেন। তবে প্রণব মিত্র হতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কারণ প্রণববাবু আপনাদের

কাছে একটা আইডিয়া। প্রত্যেকটা রিলেশনই একটা আইডিয়া। আমি নিঃসন্দেহে প্রণববাবু সম্পর্কিত আইডিয়ার মধ্যে ঢুকে যেতে পারি। তখন আমিই প্রণব মিত্র, আর তখন এই রজনীগন্ধা, আপনাদের অপেক্ষা, এ-সব কিছুই রিয়্যাল হয়ে উঠবে। তাহলে আমি বরঞ্চ বাইরে গিয়ে দ্বিতীয়বার ঢুকি। এবার যখন ঢুকব তখন আমি আর হরিকিঙ্কর তলাপাত্র নই। প্রণব মিত্র। বাইরে যাচ্ছি, কেমন?

[*কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত বাইরে চলে গেল। বিমূঢ়ের মত পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা*]

অরুণ।। অদ্ভুত ভদ্রলোক, তাই না? একেই প্রণব মিত্র ভাবা যাক্ না।

মীরা।। অদ্ভুত কি, পাগল। ওকে প্রণব মিত্র ভাবলেই প্রণব মিত্র হয়ে যাবেন?

অরুণ।। দেখাই যাক্ না। এক্সপেরিমেন্ট।

মীরা।। বেশ বিপজ্জনক লোকতো আপনি। এসব এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে আমি নেই।

[*দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল*]

বাইরে থেকে।। আসতে পারি?

মীরা।। সত্যি সত্যি আসছে যে। ওঁকে বিদেয় করুন। লোকটির মাথা খারাপ—তাও বুঝছেন না?

অরুণ।। তা মনে হবে—তবে ব্যাপারটা বেশ ইনটরেস্টিংও লাগছে। আর একটু দেখি না। আসুন।

[*হরিকিঙ্কর ঢুকল। এবার একটু গম্ভীর। ভিন্নরকম চশমা। ব্যুশশার্টটাও পাল্টেছে। অন্য রঙের জামা।*]

হরি।। নমস্কার। (*রজনীগন্ধার দিকে তাকিয়ে*) সেই রজনীগন্ধা! কুড়ি বছর আগের ফুলগুলো যেন এইমাত্র ফুটল। (*মীরার দিকে তাকিয়ে*) আপনার মধ্যে সেই বালিকা মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি। সেদিনের ফিটনগাড়ির বেলটা বাজতে শুনলাম। সতেজ ঘোড়ার খুরের শব্দ আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

মীরা।। ও কেবল আপনিই শুনতে পাবেন।

হরি।। আশ্চর্য! আপনাকে বলতে হবে 'অস্পষ্ট ভাবে শুনছি'! (*অরুণকে*) এরকম বলাই ঠিক হবে না? খেলাটা নয়ত শুরুই হবে না যে।

অরুণ।। নিশ্চয়ই, আপনি বলুন, বলুন না।

মীরা।। শুনছিনা, তবু বলব কেমন করে? তাছাড়া আপনিও আমাকে ওর হয়ে এরকম অদ্ভুত রিকোয়েস্ট করছেনই বা কেন?

অরুণ।। আমি ওকে হেল্প করছি। এটা একধরণের ক্রিয়েশন। এক্সপেরিমেন্ট। আপনি বলুন। একটা ক্র্যাজ করুন, জানলার কাছে যান, অন্ধকারের দিকে তাকান মনে মনে পিছোতে থাকুন আর নিজের ভালবাসার শূন্যতাকে 'ফিল' করতে থাকুন। দেখবেন রজনীগন্ধাগুলো কুড়ি বছর আগের মনে হবে। ফিটন গাড়ির বেলটা বেজে উঠবে।

হরি।। রাইট। চমৎকার বলেছেন, যান, জানলার কাছে যান। At least its a game

and this game will get life. 'Life' বুঝলেন, যে কোনভাবেই হোক জীবনের স্পর্শ দরকার, ভাইব্রেশনের দরকার, যান আপনি।

অরুণ।। অন্তত একটা সময় কাটানোর খেলা ভেবেই না হয় যান। Please—যান . . .

মীরা।। যাব?

অরুণ।। বলছি তো।

[*জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল মীরা*]

হরি।। সেই ফিটনের শব্দ শুনছেন? আপনার হাতের মধ্যে রজনীগন্ধার তোড়াটা আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছে, তাই না? আপনি টাটকা ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন? একজন পুরুষ, একজন অনিবার্য পুরুষ, আপনাকে দেখছে! কৈশোরের সেই দৃষ্টি আপনার চোখে ফিরে আসছে . . . আপনি তাকে অস্বীকার করতে পারেন না। আপনি আপনার রক্তকে অস্বীকার করতে পারেন না, পিপাসাকে অস্বীকার করতে পারেন না। শুনতে পাচ্ছেন, সেই ফিটনটা আসছে? বেলের শব্দ, ঘোড়ার পায়ের শব্দ বেলের শব্দ, ঘোড়ার পায়ের শব্দ? (*ফিটনের শব্দ শোনা যায়*)

মীরা।। (*তাকিয়ে*) কি আশ্চর্য! আপনি বোধহয় ম্যাজিসিয়ান। হয়ত হিপ্নোটিজম জানেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অতো মিথ্যে মনে হচ্ছে না। যেন ফিটনের বেল বাজার শব্দ শুনলাম।

অরুণ।। ইউরেকা!

হরি।। আমার দিকে তাকান। আমি যদি প্রণব মিত্র হই ক্ষতি কি?

অরুণ।। কোনও ক্ষতি নেই। প্রণব মিত্র মিস ব্যানার্জীর কাছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট রিলেশন মাত্র। আপনার কথায় একটা আইডিয়া।

হরি।। আমি সেই আইডিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি। পারি না?

মীরা।। সব কেমন অদ্ভুত লাগছে।

হরি।। এবার একা আপনি আছেন এমন একটা পরিবেশ হলে ভাল হত।

অরুণ।। বরঞ্চ আমি এখন চলে যাই। কাল ভোরে আসব। আপনি থেকে যাবেন আজকে এখানে?

মীরা।। আপনি চলে যাবেন?

অরুণ।। ভয় কি, কাল আসছি।

মীরা।। কিন্তু আমি—

অরুণ।। কিছু না, কিচ্ছু অস্বস্তি নয়, ওঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দেবেন। হরিকিঙ্কর সরি প্রণব বাবু কাল দেখা হবে। ভোলাদা আছেন, ভাবনা কি। আসি।

হরি।। আসুন। আমার একটু একা হওয়ার সত্যি দরকার রয়েছে।

[*অরুণ চলে গেল*]

হরি।। দেখুন, আমি চশমাটা পালটেছি। এবারের কাচটা নীলচে। আপনাকে আমি একটা নীলের মধ্যে দেখছি। জানেন, নীল আর সবুজ বড় অহঙ্কারী রঙ। যখন রাত্তির হয় বাগানে ঢুকে দেখবেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে সব রঙগুলোকে চিবিয়ে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে। নীল, সবুজ গাছপালার পাতা তবু অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। ওদের পুরোপুরি গ্রাস

করা যায় না। আপনার চোখে মুখে দেখছি এই নীল। আপনার এমনি নীল রঙের মত বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

মীরা।। আপনার কথা শুনলে তো তেমন ইচ্ছেই হয়।

হরি।। ইচ্ছে করে না, একদিন নানারঙের বৃষ্টি হোক। বাইরে ছুটে যাবেন, হাতে মুখে কতোরকম রঙ। কী বিচিত্র রূপ! ভাল লাগেনা?

মীরা।। রঙিন বৃষ্টি তো হয় না।

হরি।। হলে কেমন হত?

মীরা।। চমৎকার।

হরি।। রঙিন বৃষ্টি হয়। বুকের মধ্যে হয়। আমি যখন চাই, যখন আপনি চান, সবাই চাই তখন নিশ্চয়ই হয়। মানুষ যা ভীষণভাবে চায় তা আছে। আপনার মধ্যে একটা আকাশের যা আছে তা সব আছে। বিদ্যুৎ আছে, জ্যোৎস্না আছে, নীল আভা আছে, চোখের দৃষ্টির মত নক্ষত্র আছে, গুরুগুরু মেঘের ডাক আছে। আপনি কত বড়—আকাশের মত বড়, সুন্দর ঝকঝকে! সব মানুষেরই এতোসব থাকে। কিন্তু জানে না। জানলেও বিশ্বাস করে না। কিম্বা টের পেলেও ভুলে যায়।

মীরা।। এতোসব থাকে বলছেন? হয়ত থাকে। কিন্তু আমি কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছি। বয়সও তো কম হল না।

হরি।। কিন্তু ফুরোননি তো আপনি!

মীরা।। ফুরিয়ে যাব।

হরি।। ফুরোবেন না। বাঁচা ছাড়া পৃথিবীতে বড় কাজ নেই। আর বাঁচাটাকে প্রতিমুহূর্তে টের পেতে হবে—যেমন করে হোক। জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছি। না, না সঙ্কোচের কিছু নেই। ভাল না বেসে আমরা বাঁচিনা। ভাল আপনাকে-ও বাসতে হবে। মানুষের অশান্তির এটাই প্রথম ও শেষ চিকিৎসা।

মীরা।। আমার একটা বিচ্ছিরি অসুখ আছে।

হরি।। সেরে যাবে।

মীরা।। সারল না তো?

হরি।। আমি সারিয়ে দেব।

মীরা।। আপনি ডাক্তার, তাঁই সারাবার কথা ভাবছেন?

হরি।। হয়ত।

মীরা।। আপনাকে এখানে খাবার কথা বলে দি। খেতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?

হরি।। আপত্তি কেন হবে?

মীরা।। ভোলাদা—

[*ভোলা এল*]

মীরা।। উনি খাবেন রাত্রে।

[*ভোলা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল মীরা*]

হরি।। এতো ক্লান্ত লাগছে। চোখের সামনে খাট দেখলে কেমন একটু গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হয়।

একটু ঘুমিয়ে নিন না। খাবার সময় ডেকে দেব। নতুন জায়গা, রাত্রে আপনার ঘুম হবে কিনা কে জানে! আমার তো প্রায় রাত্রিতেই ঘুম আসে না।

হরি।। ঘুম না এলে কি করেন?

মীরা।। চুপ করে শুয়ে থাকি। এতো কষ্ট হয়, পৃথিবী শুদ্ধ ঘুমুচ্ছে আর আমি সোজা তাকিয়ে।

হরি।। একটা কাজ করবেন। ছাদে প্রায় আধঘণ্টা স্কিপিং করবেন। ভাল ঘুম হয় এতে।

মীরা।। তারপর হাতে পায়ে ব্যথা নিয়ে মরি আর কি! তাছাড়া এ বয়সে স্কিপিং? দৃশ্যটা ভাবুন। ভাবলে হাসি পায় না আপনার?

হরি।। না তো। আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করবেন। আমি যা করি। হাত-পাগুলো এক এক করে খুলে রাখবেন। তারপর শরীর যখন মারাত্মক হাল্কা হবে, ঘুম আসবে।

মীরা।। হাত-পা খুলে রাখব, মানে? এসব কি আলাদা!

হরি।। হ্যাঁ, আমি তা-ই ভাবি। এই দেখুন আমি সব খুলছি। হাত-পা খোলা খুব শক্ত কাজ নয়—সবাই পারে। তাকিয়ে দেখুন—

[*হরিকিঙ্কর কাল্পনিক ডান পা-টা আস্তে খুলে খাটের একপাশে রাখল। তারপর দু'হাতে বাঁ-পা খুলল। আস্তে মাথাটা খুলল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।*]

হরি।। (*হাতে কাল্পনিক মাথাটা ধরে*) কাছে আসুন। (*বিস্মিতভাবে মীরা কাছে এল*) এটা রাখুন।

মীরা।। কি রাখব?

হরি।। আমার মাথাটা। এই যে, দুহাতে ধরে আছি—এটা সাবধানে ধরুন। আপনার চোখের সামনেই তো মাথাটা খুললাম—তারপরেও প্রশ্ন করছেন?

মীরা।। আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

হরি।। কথার মাথামুণ্ডু পরে বুঝবেন, তার আগে আমার মুণ্ডুটা ধরুন। ধরবেন তো? (*বিমূঢ় মীরা মুণ্ডুটা দুহাতে ধরে*) ফুলের ভাসের ফুল সরিয়ে তার উপর মাথাটা রাখুন।

[*মীরা আস্তে আস্তে তা-ই করল।*]

হরি।। এবার বাঁ-হাতটা খুলছি।

[*বাঁ-হাতটা খুলে খাটে রাখল। রাখল, অন্ধের মত*]

আঃ কি হাল্কা লাগছে! (*শুয়ে পড়ল*) একটু বিশ্রাম ক'রে নি। রান্না হলে ডেকে দেবেন, কেমন? আপনি আপাতত চলে যেতে পারেন। আমরা একটা টোটালিটি নয়, বুঝলেন? খুলে খুলে রাখা যায়। আমরা সবাই টুকরো টুকরো, তাই না? Disintegration! চমৎকার লাগছে। একটা কাজ করুন। আমার মুণ্ডুটার দুটো চোখ প্লিজ একটু বুজিয়ে দিয়ে যান। নয়তো ঘুম আসবে না। (*মীরা কাল্পনিক মাথার কাছে গেল*) হ্যাঁ, আপনি এবার হাত দিয়ে দুটো চোখের পাতা বুজিয়ে দিন। (*মীরা চোখের পাতা বুজিয়ে দিতে হরিও চোখ বুজল*) কী বন্ধুত্ব আর স্নেহ আপনার হাতে! কি চমৎকার ঠাণ্ডা! আপনার

আশ্চর্য আঙুল আমার দুটো চোখের পাতা যেন এখনও ছুঁয়ে আছে। এবার আপনি যান। এতোভাল লাগছে, চুপ করে শুয়ে থাকব! যান আপনি। আপনি চলে গেলেও মনে হবে, আছেন। আমরা মনে মনেও অনেক পাই।

[*যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ থেকে মীরা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটা কষ্টের শব্দ করে হাঁটুতে হাত দিয়ে কোনমতে চেয়ারে বসে পড়ল*]

হরি।। কি হল?

মীরা।। কিছু না, আপনি ঘুমোন। পা-দুটো মধ্যে মধ্যে আমার অবশ হয়ে যায়। এক্ষুণি আবার ঠিক হয়ে যাবে।

হরি।। দাঁড়ান হাত পা-গুলো লাগিয়ে নি। আমি দেখছি—

মীরা।। কিচ্ছু করতে হবে না আপনাকে। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে।

[*হরি দ্রুত হাত-পাগুলো লাগাতে লাগল*]

হরি।। এবার উঠে মুণ্ডুটা পরিয়ে নি।

[*উঠে দাঁড়াল। চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল*]

হরি।। এই যাঃ, যা ভয় করেছিলাম, তাই! কি করি এখন?

[*হাঁটতে চেষ্টা করে কেমন বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে অদ্ভুত দৃশ্য রচনা করল*]

মীরা।। কি হয়েছে?

হরি।। সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। বাঁ হাতটা ডানহাতে, ডান-পাটা বাঁপায়ে পরিয়ে নিয়েছি যে। কি করি এখন? আমি একটি অপদার্থ। সব খোল এখন! দাঁড়ান, কোনমতে হেঁটে মুণ্ডুটা নিয়ে আসি।

(*অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে, দুটো হাত মৃতের মত ঝুলিয়ে হরিকিঙ্কর টবের কাছে গিয়ে মুণ্ডুটা তুলে পরল)* সর্বনাশ! মুণ্ডুটাও উল্টো পরলাম! পিছন দিকে চোখ। আপনি সেই যে পাতা দুটো বুজিয়ে দিয়েছেন। বুজেই আছে। (*মীরার কাছে গিয়ে উল্টো করে দাঁড়িয়ে*) দিন আস্তে হাত দিয়ে চোখ দুটো মেলে দিন!

(*মীরা বিমূঢ়ের মত ওর কাল্পনিক চোখ মেলে দিল*) এবার আপনার মুখোমুখি আমি পুরোটা হতে পারছি না। আমার চোখ-মুখ আপনার সামনে, বাকিটা পিছনে। সবটা মিলে আপনার মুখোমুখি হতে পারছি না। হাত-পায়ের গোটা ছন্দ নিয়ে আপনার কাছে এলুম না। অদ্ভুত লাগছে! হাসি পাচ্ছে! দারুণ হাসি পাচ্ছে। আপনি অসুস্থ তবুও যদি হাসি চটে যাবেন না তো? কারণ এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।

[*প্রচণ্ড হাসতে লাগল হরিকিঙ্কর*]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[*ভোর। চায়ের টেবিলে অরুণ, মীরা, হরিকিঙ্কর। চা খাওয়া চলছে*]

অরুণ॥ রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে?

হরি॥ চমৎকার (*দরজার চৌকাঠের কাছে ভোলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে*) দরজার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওকে সরে যেতে বলুন না। লোকটি এঘরে আসবে না বাইরে যাবে, বুঝতে পারছি না। মাঝামাঝি ব্যাপারটা আমাকে এতো জ্বালায়!

মীরা॥ ভোলাদা বাইরে যাবে তো এই বেলা যাওনা। দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে?

ভোলা॥ কাপগুলো নিতে হবে না?

মীরা॥ দরকার নেই, তুমি যাও। আমি নিয়ে যাব। (*ভোলা চলে গেল*)

হরি॥ (*মীরাকে*) আপনি নখ দিয়ে টেবিল আঁচড়াবেন না! প্লিজ, আমার খারাপ লাগে।

মীরা॥ আঁচড়াচ্ছি না তো, দাগ কাটছি।

হরি॥ ঐ একই হল। নখ দিয়ে কেউ কিছু আঁচড়ালে আমার বেড়াল মনে পড়ে যায়। কিছু মনে করবেন না, মনে পড়লে কি করব?

[*বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল*]

মীরা॥ কে? আসুন, ভিতরে আসুন।

[*একজন বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক ঢুকলেন।*
ধুতি-পাঞ্জাবী। সুদৃশ্য স্টিক হাতে।]

আগন্তুক॥ (*রজনীগন্ধা দেখে*) হাউ লাকি আই অ্যাম! (*এগিয়ে গন্ধ শুঁকে*) সমস্ত অতীত কটা ফুলে ঝকঝক্ করে জ্বলছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে।

[*মুগ্ধের আচ্ছন্নতায় গিয়ে চেয়ারে বসল।*
চুরুট ধরাল। মেজাজে ধোঁয়া ছাড়ল]

মীরা॥ আপনাকে চিনলাম না।

আগন্তুক॥ (*ধোঁয়া ছেড়ে*) কুলি।

অরুণ॥ কি বললেন?

আগন্তুক॥ কুলি। কুলিও চেনেন না? না কানে তালা ঝুলিয়ে রয়েছেন বলে শুনতে পাচ্ছেন না?

হরি॥ কুলি চিনি, কিন্তু মানেটা বুঝছি না।

আগন্তুক॥ কুলি মানে, কুলি আমার জিনিশপত্র নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। (*চেঁচিয়ে*) কুলি—, ঠিক জায়গায় এসেছি, ঢুকে পড়।

[*মাথায় হোল্ডল, বাক্স নিয়ে একজন কুলি,*
পিছনে একটা ইজিচেয়ার নিয়ে আর
একজন কুলি ঢুকল]

আগন্তুক॥ (*ইজিচেয়ারটায় বসে*) যেখানেই যাই একে সঙ্গে নিয়ে যাই। এখানে না বসলে ঠিক মেজাজ পাই না। কথা হারিয়ে যায়।

হরি॥ চেয়ারটার কাপড়টা যদি ফিকে নীল রঙের হত আর কাঠটা মাটির রঙ।

আগন্তুক॥ হ্যাঁ, তাহলে গোটা ব্যাপাবটাই মাটি হত। আশ্চর্য! আপনারা সকলেই দেখছি বেশ চুপচাপ। এদিকে যে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঘটে গেল। সব অক্ষত আছেন মনে হচ্ছে?

অরুণ।। তৃতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে?

আগন্তুক।। কবে! আমি একটা খবরের কাগজ বের করছি। তার প্রথম এবং শেষ সংবাদ হল তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিবরণ। প্রত্যেকটি সংখ্যায় প্রত্যেকদিন এই একই বিষয়ের খবর থাকবে। যদ্দিন না চতুর্থ মহাযুদ্ধ ঘটে।

মীরা।। কিন্তু আমরা কেউ জানলুম না।

আগন্তুক।। জানা উচিত ছিল। প্রত্যেকটা রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি কি আজ ভাঙা চুরো নয়? পৃথিবীব্যাপী এই টোট্যাল ফ্র্যাক্চার, ডেস্ট্রাক্শন —তৃতীয় মহাযুদ্ধ ছাড়া কি সম্ভব? কি খবর বাজারে ছাড়ছি বুঝুন। কাগজ তুমুল কাটবে মনে হচ্ছে। দেখা যাক।

মীরা।। আপনার পরিচয়টা কিন্তু—

আগন্তুক।। কেন চিঠিতেই তো লিখেছি। প্রণব মিত্র। কালকের ট্রেনটা লেট করায় ন'টায় পৌঁছতে পারিনি। হোল নাইট স্টেশনে কাটালাম, ভোরবেলা চলে এলাম। (*হাঁচল*) স্টেশনে পাখার নিচে শুয়ে এতো ঠাণ্ডা লেগেছে। প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে। (*হাঁচল, পয়সা বের করে কুলিদের দিল*)

অরুণ।। আপনিই প্রণব মিত্র?

প্রণব।। সকলের কাছে তাই তো শুনি। কেন, আপনারা কি আমাকে রাধাগোবিন্দ বলে জানেন নাকি?

অরুণ।। আপনিই চিঠি দিয়েছিলেন?

প্রণব।। হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে পারেন!

অরুণ।। না, না, অবিশ্বাস করছি না কিন্তু ভয়ানক গোলমাল হয়ে গেল!

প্রণব।। একটু দেরি করে ফেলার জন্য আমি লজ্জিত। (*মীরাকে*) আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।

মীরা।। বলুন।

প্রণব।। আলাদাভাবে বলব।

অরুণ।। কিন্তু আপনার দেরি হওয়ায় যে এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে!

প্রণব।। কিরকম?

অরুণ।। (*হরিকিঙ্করকে দেখিয়ে*) এই যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ওঁরা নাম হরিকিঙ্কর তলাপাত্র। আপনি সময়মত না আসায় উনি ঢুকে পড়েন।

প্রণব।। ঢুকে পড়েন মানে? কোথায় ঢুকে পড়েন?

অরুণ।। মানে আপনার সঙ্গে মীরা ব্যানার্জীর রিলশনের যে idea, সেই idea-র মধ্যে ঢুকে উনিই প্রণব মিত্র হয়ে বসে আছেন।

হরি।। অলরেডি আমার দাবি পেশ করা হয়ে গেছে।

প্রণব।। কিন্তু আমি রিয়্যাল প্রণব মিত্র কি তাহলে কেউ নই? মানে আমিই আমি নই! অদ্ভুত বলছেন তো মশাই। (*মীরাকে*) আপনিও কি এসবে আমল দিতে চান নাকি?

মীরা।। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রণব।। আমিও আপাতত বুঝতে পারছিনা। অন্তত নির্বুদ্ধিতার দিক থেকে দুজনের মধ্যে মিল দেখতে পাচ্ছি। ক্রমশ সব দিকে হবে। কিন্তু হরিকিঙ্করবাবু, আমি যখন এসে গেছি এবং আমার ভালবাসার আইডিয়া সমেত তখন আপনি আপনার idea-র খোলস নিয়ে সরে পড়লেই সৌজন্য বজায় থাকে।

হরি।। সরব মানে? আমি কি প্রণব মিত্র হতে পারি না? আমাদের ফিক্সড্‌ কোন পরিচয় নেই। মীরা দেবী যে ভাবে প্রণব মিত্রকে চান, আমি যদি হুবহু তাই হয়ে যেতে পারি তাহলে প্রণব মিত্র হিসেবে আমি আপনার থেকে কম রিয়্যাল নই।

প্রণব।। আশ্চর্য! আমার ভালবাসা আর আপনার ভালবাস কি এক? ভালবাসা কি একটা চেয়ার যে কেউ এসে বসে পড়লেই হল? আমার আইডিয়ায় ঢুকেছেন! আমার জামাটা আপনি পরবেন?

হরি।। যদি গায়ে লেগে যায় এবং মানায়, পরতেই পারি।

প্রণব।। আমার জামা আপনি পরবেন?

হরি।। আপত্তি কি, আপনি আমার জামাটা পরুন! হরিকিঙ্কর হয়ে যান, আমি না করব না।

প্রণব।। ঐ রঙচঙে কিম্ভুতকিমাকাব জামা—আমি পরব?

হরি।। এটা আপনার সাবকনসাস্‌ মাইণ্ডের জটিল চক্রাকার রঙ।

প্রণব।। আমার সাবকন্‌সাস্‌ মাইণ্ড ছিট্‌কে আপনার জামায় গিয়ে লাগল কি করে? মনটা কি পিচ্‌কারি?

হরি।। নয়ই বা কেন?

অরুণ।।। দেখুন, এভাবে কথা বললে তর্ক বেড়েই যাবে।

প্রণব।। থামুন! এঁর সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লাগছে। কথাটা জমে উঠেছিল। আর তক্ষুনি এসে . . . আপদ! কে মশাই আপনি? (*মীরাকে*) কে উনি বলুন তো?

মীরা।। উনি আমার বন্ধু।

প্রণব।। তা এক্ষুণি ওঁর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব করার প্রয়োজন আছে? যান তো আপনি। একটু ঘুরে আসুন, সময়মত পরে বন্ধুত্ব হবে। বন্ধুত্ব কি সব সময়ের ব্যাপার, বন্ধুত্ব কি জিভ, যেখানেই যাব, মুখে পুরে চলব?

অরুণ।। আমি আপনাদের হেল্প করার জন্যই ছিলাম। আপনাদের ভালবাসার একটা পরিবেশ আর উদ্দীপনা তৈরী করতে চাই। আপনাদের চারদিকটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে চাই।

প্রণব।। আশ্চর্য। আমি ভালবাসব, তার আপনি কি গুছিয়ে দেবেন? ভালবাসা কি একটা বেলুন? যে আপনি ফুলিয়ে সুতো বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দেবেন? না-কি একটা চায়ের দোকান, টেবিল চেয়ার সাজিয়ে মাথার ওপর ফ্যানটা ছেড়ে চলে যাবেন?

হরি।। কথাটা কিন্তু ভালই বলেছেন।

প্রণব।। আপনি আসুন। কথা আমি ভালই বলি। প্যারাট্রুপারের মত আপনি বর্ডার লাইন ক্রস করে আমার টেরিটরিতে ঢুকে পড়েছেন, খেয়াল আছে? আস্ত ইনট্রুডার একটি আপনি!

হরি।। টেরিটরিতে আপনার ক্লেইম্‌ তো এস্টাবলিশড্‌ হয়নি!

প্রণব।। হতে আর দিচ্ছেন কোথায়? (*মীরাকে*) আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বুঝলেন? আসলে আমি লোক খারাপ নই। কাউকে আঘাত দিইনা, খুব চটিও না।

মীরা।। আপনি এখন কোত্থেকে এলেন?

প্রণব॥ সে আর বলবেন না। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আমার মাথা খারাপ ভেবে চিকিৎসা শুরু করেছিল। আমার সেই বন্ধুই কাল অ্যাসাইলামে ভর্তি হল, আমি চলে এলাম। যাবার সময় চেঁচাচ্ছিল, ও নাকি থিসিস্ লিখে প্রমাণ করবে পাগলামি উৎকট ছোঁয়াচে রোগ, বুঝুন!

হরি॥ দেখুন, আমিও ডাক্তার।

প্রণব॥ তাই নাকি! ভালই হল। কিন্তু আমি কি করতে পারি?

হরি॥ পাগলামোর ছোঁয়াচে ব্যাপার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমি একটা ডি-ডি-টি আবিষ্কার করেছি।

অরুণ॥ তাহলে স্প্রে করে দিন না। অনেকক্ষণ আপনার কাছাকাছি বসে আছি, কপালে কি আছে জানিনা।

প্রণব॥ কেন? আমাকে কি পাগল ভাবছেন? আশ্চর্য অডাসিটি দেখছি। আপনারাও কি এরকম ভাবছেন?

মীরা॥ কেন ওসব ভাবতে যাব আমরা।

প্রণব॥ আমার ভাল লাগছে। আপনার সহানুভূতি আছে। আফটার অল মেয়েদের মন তো—পঙ্গু, পাগল, অনাথ সবাই ওদের স্নেহ পায়।

হরি॥ আপনি কিন্তু আমাকে সংঘর্ষের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

প্রণব॥ আপনি আমাকে সংঘর্ষের দিকে টানছেন না?

হরি॥ মোটেই না—আমি চাই বন্ধুত্ব।

প্রণব॥ তাই বুঝি?

হরি॥ তা-ই। বন্ধুত্বপূর্ণ আপোস ছাড়া আমরা দুজনের কেউই এগুতে পারব না।

প্রণব॥ কথাটা ব্যাখ্যা করুন।

হরি॥ আমি তো আপনারই আইডিয়া তাই আপনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব আসুন আমরা দুজনে মিলে অগ্রসর হই। দু'মুখী আক্রমণে এগিয়ে যাই। আমি যদি ওঁর ভালবাসা পাই তাহলেও আপনার পাওনা আর আপনি যদি ওকে পেয়ে যান তাহলেও আমার পাওনা হল।

প্রণব॥ ঠিক বলেছেন। তাহলে বিরোধ নেই। ওঁকে পেলেও ঠকছিনা, না পেলেও ঠকছিনা।

মীরা॥ দেখুন—

হরি॥ না-না দেখব আবার কি? আমরা কিছুই দেখব না। আপনারা দেখুন কে জয়ী হয়।

প্রণব॥ দেন্, স্টার্ট। উঠে দাঁড়ান এবং আমার কথামত অগ্রসর হন।

হরি॥ (উঠে) কি করব?

প্রণব॥ আমাদের এই দ্বৈত প্রচেষ্টায় তৃতীয় এই ব্যক্তি অহেতুক। আসুন এঁকে আমরা বের করে দিই।

মীরা॥ কি বলছেন আপনারা! অরুণবাবু আপনি এদের কথায় কিছু মনে করবেন না।

হরি॥ আগে একে চলে যেতে আদেশ করা যাক! দেখি কি করে? পরে অন্য ওষুধ।

প্রণব ॥ বেশ। (*আদেশের গলায়*) আপনি চলে যেতে পারেন।

হরি ॥ গলাটা একটু কোমল করুন, গোড়াতেই আমরা রুক্ষ হব না।

প্রণব ॥ (*মিষ্টি গলায়*) দেখুন দয়া করে আপনি চলে যান।

[*অরুণ বসেই থাকে*]

হরি ॥ আরো নম্র করুন।

প্রণব ॥ খুব ছোট একটি শব্দে বলি? (*অরুণের কাছে গিয়ে*) প্লিজ (*তারপর আঙুল দিয়ে সকাতর মুখে দরজা দিয়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করল*)

অরুণ ॥ কিন্তু আমি যাব কেন? আপনাদের আবোলতাবোল কাণ্ডের মধ্যে মীরা দেবীকে একা রেখে কেন যাব?

হরি ॥ কেন, কেন করবেন না। আপনি যান। বেশি কথা বললে আমার শরীর বড় খারাপ লাগে। শীত করে। জানেন আমার শরীরের মধ্যে বরফের কুচি আছে!

অরুণ ॥ বরফের কুচি আছে বলে আমি চলে যাব কেন? (*মীরাকে দেখিয়ে*) ওঁকে আমারও তো ভাল লাগতে পারে।

মীরা ॥ অরুণবাবু, আপনারা সবাই মিলে—

হরি ॥ না, না, আপনি সঙ্কোচ করবেন না। ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়া ভাল।

প্রণব ॥ আমার এখন মনে হচ্ছে, ওঁর থাকা ভাল, প্রেমে ত্রিকোণ তৈরী হওয়া চাই। না হলে অ্যাডভেঞ্চার আসে না। জেলাসি আসেনা।

হরি ॥ তাহলে লটারি করা হোক। উনি থাকবেন কিনা। হেড় পড়লে থাকবে, টেল পড়লে থাকবে না।

[*পকেট থেকে পয়সা বের করে প্রণবকে দিল।*]

হরি ॥ ছুঁড়ুন।

[*প্রণব ছুঁড়ল, ঝুঁকে দেখল সবাই। এক সঙ্গে বলল 'হেড'*]

হরি ॥ তার মানে উনি থাকবেন।

প্রণব ॥ আসুন, এদিকে এসে বসুন অরুণবাবু।

হরি ॥ আপনি আমাব কাছেই বসতে পারেন।

অরুণ ॥ আপনারা যদি দয়া করে পাশের ঘরে যান আমি মিস ব্যানার্জীকে কয়েকটা কথা বলব।

হরি ॥ তার মানে আপনি প্রথম ওর সঙ্গে কথা বলার অ্যাডভানটেজ্ নিচ্ছেন?

প্রণব ॥ দ্যাট্ ক্যানট্ বি টলারেটেড়্।

অরুণ ॥ দেখুন, আমি ওঁকে আপনাদের থেকে কিছু বেশি দেখেছি, তার দাবিতে সম্প্রতি যে জটিল অবস্থা তৈরী হয়েছে তা ওঁর কাছে সহজ করে দিতে চাই। নয়ত উনি হয়ত আমাদের পছন্দমত চলাটা allow করবেন না। বিচিত্র কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তো—এসব উনি সহ্য করবেন, তা-ই বা আমরা ভাবি কি করে?

হরি ॥ ঠিক আছে।

প্রণব ॥ কিন্তু দেখুন, আমার বুকের ভিতরে কুড়ি বছর ধরে সঞ্চিত কথা প্রকাশের

জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরে একটা তাপে আমি পুড়ে যাচ্ছি। কতোকাল পর আমি আমার ভিতরের তাপ ফিরে পাচ্ছি। এতোদিন আমার হৃৎপিণ্ডের চারদিকে, বুকে, চোখের মণিতে বরফের কুচি ছড়ানো ছিল। ভিতরটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপত।

হরি।। ভেতরে বরফ ঢুকল কি করে? একজন ডাক্তার হিসেবে বোধহয় জিজ্ঞেস করতে পারি?

প্রণব।। ব্যাপার কি জানেন, একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমার বুকের ভিতরের আগুনটা লাফাতে লাফাতে সব জায়গায় ছড়িয়ে গেল। আমি চেঁচাতে লাগলাম। কে একটা হোস-পাইপ এনে আমার গায়ে জল ছড়াতে লাগল। একসময় শীত করতে লাগল। থামাতে বললাম, থামাল না। জল ঢালতেই লাগল। ধীরে ধীরে শীতে আমার সমস্ত শরীর জলে বরফ হয়ে গেল। এখনো মনে হয় যেন সেই বরফ কুচি কুচি হয়ে দেহের এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি ওঁর কাছে আসাতে যেন সেই বরফ ভাঙছে। আপনি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করবেন। আমার ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার—তা হবে আমার বরফ সরিয়ে উত্তাপে বেঁচে ওঠা।

অরুণ।। খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব।

হরি।। তাহলে আমি সকলের শেষে কথা বলব? তাই হোক। হ্যাঁ, আপনার ট্রিটমেন্ট ভাবছি।

অরুণ।। তাহলে আপনারা যান।

হরি।। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

[*ওরা দুজনে পাশের ঘরে চলে গেল*]

মীরা।। অরুণবাবু আমাকে বাঁচান। এসব পাগলামোর মধ্যে অনেকক্ষণ চুপ করে আছি। আর সহ্য হচ্ছে না।

অরুণ।। একথা বলছেন কেন?

মীরা।। আমার মনে হচ্ছে, এই পরিবেশে আমার মাথাটা পুরো গোলমাল হয়ে যাবে।

অরুণ।। কিচ্ছু হবে না।

মীরা।। হবে না মানে? আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এদের কাউকে স্বাভাবিক মনে হয় আপনার?

অরুণ।। অস্বাভাবিকও মনে হয়না।

মীরা।। তার মানে আপনিও একজন উম্মাদ।

অরুণ।। আস্তে। আমাদের মনের ভিতরে অনেক উদ্ভট বাস করে। ওরা সেই স্বাভাবিক উদ্ভট। ওদের ব্যথা, ইচ্ছে, বাসনা—কোনটাই অবাস্তব নয়। আর একটু সহ্য করুন।

মীরা।। আপনার মত সহিষ্ণুতা আমার নেই।

অরুণ।। মেয়েরাই তো সহিষ্ণুতা জানে।

মীরা।। আমি তাহলে আদর্শ মেয়ে নই।

অরুণ।। আপনি খুব ভাল। কেন জানিনা আপনাকে চমৎকার লাগে আমার। আপনি যখন স্কুলে যান। আপনাকে প্রচণ্ড পরিচ্ছন্ন মনে হয় আমার, মুখে আপনার কেমন একটা বিষাদ লেগে থাকে। ঐ বিষণ্নতাটুকু আমার সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তাই তো একটা সুযোগ পেয়ে আপনার কাছে এলাম। ভাবি, কেন এই বিষাদ!

মীরা।। ও আমার অসুখের আর ক্লান্তির ছাপ।

অরুণ।। হয়ত হবে। আমি তাছাড়াও কিছু ভাবি। অনেক মেয়ের সঙ্গে আমি মিশেছি কিন্তু আপনি আলাদা—আপনি আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

মীরা।। যখনই যার সঙ্গে মিশেছেন তাকেই এরকম নতুন মনে হয়েছে।

অরুণ।। নতুন মনে হয়েছে, কিন্তু নতুনের আকর্ষণ অনুভব করিনি। মনে হয়নি এই মুখটি একটি আশ্চর্য আশ্রয়। চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়নি, একটি ছায়াভর্তি গাছ মাথার উপর দুলে দুলে হাওয়া দিচ্ছে।

মীরা।। আপনার মধ্যে যেন কবিত্ব টের পাচ্ছি?

অরুণ।। আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন না, এ আমার অন্তর থেকে বলছি। ঠাট্টা করবেন না।

মীরা।। আমি ঠাট্টা করছি না, আপনি খুব ভাল মানুষ। তবে কিছুটা পাগলাটেও।

অরুণ।। তার মানে পছন্দ হচ্ছে আমাকে? এখানেই আমার ট্র্যাজেডি। পছন্দ থেকে কখনো বেড়ে ভালবাসাও হয় না কিংবা কমে বিতৃষ্ণাও নয়। একজন জীবন্ত ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে আছি, বহুকাল ঝুলে আছি।

মীরা।। বিয়ে করে ফেলুন। বুঝলেন। আর ঝুলে থাকবেন না।

অরুণ।। হয়ত করতেও পারি।

মীরা।। আমাকে নেমন্তন্ন করবেন তো!

অরুণ।। করব।

মীরা।। মনে থাকবে?

অরুণ।। আমি কম ভুলি।

[*পাশের ঘর থেকে হরিকিঙ্করের ডাক শোনা গেল—"হ্যালো অরুণবাবু এক মিনিটের জন্য আমরা আসতে পারি"*]

অরুণ।। আসুন।

[*ওরা দুজনে ঢুকল*]

প্রণব।। (*হরিকিঙ্করকে দেখিয়ে*) বুঝলেন মীরাদেবী, কথাবার্তা বলে দেখলাম ভদ্রলোক একজন অরিজিন্যাল ডক্টর।

মীরা।। উনি বলছিলেন।

হরি।। চলুন, চলুন—We shouldnot disturb them

প্রণব।। ঠিক বলেছেন। আমি হোল্ডলটা নিয়ে যাব। আপত্তি নেই তো!

মীরা।। কি আশ্চর্য, ওটা তো আপনারই।

প্রণব।। তাহলেও আপনার অনুমতির প্রয়োজন বোধ করছি। আপনার বাড়িতে আপনার অনুমতিই প্রথম দরকার, হোক না আমার জিনিশ।

মীরা।। আপনি নেবেন কেন? ভোলাদাকে বলছি। ভোলাদা নিয়ে যাবে। এখন তো আর ঘুমুচ্ছেন না।

হরি।। তা নয়, ট্রিটমেণ্টের জন্য দরকার। জরুরি।

প্রণব।। আমার ট্রিট্‌মেন্ট্‌ আর কি! বললাম না, He is a good doctor.

অরুণ॥ হোল্ডল দিয়ে চিকিৎসা?

হরি॥ তাও সম্ভব।

অরুণ॥ কি রকম?

প্রণব॥ That's a secret. তাছাড়া এসব চিকিৎসা আগে থেকে না বলাই ভাল। নিতে পারি?

মীরা॥ নিন।

প্রণব॥ Thank you. ধরুন হরিকিঙ্করবাবু।

[*ওরা দুজনে ঘরের মধ্যে হোল্ডলটা নিয়ে চলে গেল। তারপরেই প্রণব মিত্র ঢুকল।*]

প্রণব॥ (*অরুণকে*) আপনার কথা একটু তাড়াতাড়ি সারবেন। নেক্সট টার্ন কিন্তু আমার। আমার ভিতরেব কথাগুলো ওঁকে বলা দরকার। ভিতরটা যদি ঠাণ্ডা হয়ে আসে আমি কথা খুঁজে পাবনা। Then I am totally helpless.

অরুণ॥ আমার কথা প্রায় শেষ।

প্রণব॥ Thank you, একটু বাদেই তাহলে আসছি।

অরুণ॥ আসুন।

প্রণব॥ চলি।

[*ভিতরে ঢুকে গেল*]

মীরা॥ হোল্ডল নিয়ে কি চিকিৎসা?

অরুণ॥ হরিকিঙ্করবাবু কিছু একটা ভেবেছেন হয়ত। রোগ বা বাতিক সারলেই হল। চিকিৎসা যা দিয়েই হোক।

মীরা॥ এই চিকিৎসারও অর্থ আছে ভাবছেন? কী লোক আপনি?

[*পাশের ঘর থেকে উত্তেজিত কথা ভেসে এল। তারপরেই প্রণব মিত্রের গলা "অরুণ বাবু! অরুণ বাবু! বাঁচান, বাঁচান আমাকে"!*]

হরি॥ (*ভেতর থেকে*) অমন চেঁচাচ্ছেন কেন? এটা ট্রিটমেন্ট।

[*মীরা এবং অরুণ উঠল*]

অরুণ॥ (*মীরাকে*) আপনি যাবেন না। আমি দেখছি।

মীরা॥ সাবধানে থাকবেন, হয়ত হরিকিঙ্করবাবু খেপে গেছেন। ওঘরে আমাদের পুজোর মোষ-কাটার খাঁড়াটা দেয়ালে ঝোলানো ছিল। বলা যায় না—

অরুণ॥ নানা ওসব কিছু না। তা হলেও হঠাৎ খালি হাতে হয়ত ঢোকা ঠিক হবে না।

প্রণব॥ (*ঘরের ভেতর থেকে*) অরুণবাবু, মিস ব্যানার্জী, মেরে ফেলল, মেরে ফেলল আমাকে। Oh! he is a criminal, a brutal criminal.

মীরা॥ আপনি যাবেন না। বরঞ্চ পুলিশে খবর দিচ্ছি। ঘরে এতো পাগল জুটলে অনর্থ তো হবেই। পুলিশ ডাকাই ভাল।

অরুণ॥ পুলিশে খবর দেবার মধ্যে একটা কিছু হয়ে যাবে।

হরি।। (*ভেতর থেকে*) আপনাকে আসতে হবে না অরুণবাবু। কোনও ভয় নেই আপনাদের।

অরুণ।। (*টেবিলের ওপর থেকে ফুলদানিটা হাতে নিয়ে*) দাঁড়ান, আমি আসছি।

মীরা।। কি মাথা খারাপ হল, মাটির ফুলদানিতে কি প্রাণ বাঁচে!

অরুণ।। কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে বসুন। (*অরুণ ভিতর-ঘরে গেল। মীরা সন্ত্রস্তভাবে ইজিচেয়ারটায় বসে পড়ল*)

প্রণব।। (*ভেতর থেকে*) দেখুন কি অবস্থা আমার!

হরি।। অতো চ্যাচাবেন না, যেন আপনি মরে গেছেন!

প্রণব।। মরার আর বাকি কি? আমার মনে হচ্ছে আমি মরেই গেছি।

অরুণ।। মরবেন কেন? আপনি বেঁচেই তো আছেন।

প্রণব।। ওঃ, সমস্ত শরীরে কী যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে ওঘরে নিয়ে চলুন।

অরুণ।। ও ঘরে নাইবা গেলেন।

প্রণব।। না, মিস ব্যানার্জী দেখুন যে আমার আইডিয়া, এই হরিকিঙ্করবাবু আমার কতো সর্বনাশ করেছে। আমাকে নিয়ে চলুন, নিয়ে চলুন!

অরুণ।। বেশ ধরুন, ধরুন ওঁকে। (*এঘরে ভয়ে চোখ ঢাকল মীরা*)

প্রণব।। না, আপনি একা নিয়ে চলুন, এই ব্রুট লোকটা যেন আমাকে স্পর্শ না করে।

অরুণ।। কিন্তু একা আপনাকে এ অবস্থায় নেওয়া অসম্ভব।

প্রণব।। বেশ তাহলে ও ধরুক। তবে পায়ের দিকটা।

অরুণ।। ধরুন। হ্যাঁ, ওঠান।

মীরা।। (*ভীত মুখ তুলে*) আপনারা আসবেন না, আমি দেখতে পারব না। (*উঠে দাঁড়াল মীরা। তাপর দরজাটা একটু খুলে যেতেই ভয়ে চোখ ঢেকে বসে পড়ল। একটা হোল্ডলে জড়িয়ে বেল্ট দিয়ে রোল করে বাঁধা প্রণব মিত্রকে ওরা দু'জনে ধরাধরি করে মঞ্চের খাটের উপর রাখল। চোখ দুটো সামনের দিকে, মাথা কাত করে হেলানে—কিছু কাতরোক্তি হচ্ছে।*)

প্রণব।। মীরা দেবী, তাকান, কি হাল হয়েছে আমার দেখুন।

[*মীরা আস্তে আস্তে তাকাল*]

মীরা।। একী, এ অবস্থা কেন আপনার? কি হয়েছে?

হরি।। কিছু হয়নি, কোনরকম আঘাত করা হয়নি। কেবল হোল্ডল দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রণব।। অরুণবাবু না এলে নিশ্চয়ই আমার মুখে বালিশ চেপে দম বন্ধ করে মারত।

হরি।। বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরব কেন?

প্রণব।। নিশ্চয়ই চাপতেন। আপনি বালিশটা তুলেছিলেন!

হরি।। আপনি আমার চিকিৎসাটাই বুঝতে পারছেন না! বিশ্বাস রাখতে পারলেন না।

প্রণব।। নিকুচি করেছে আপনার চিকিৎসার!

মীরা।। ওকে খুলে দিন। শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাবে যে।

প্রণব।। আর কেউ নয়, আপনি খুলুন। আমার বন্ধনমুক্তি কেবল আপনার হাতে হবে। please—

[*মীরা এসে খুলে দিতে লাগল*]

মীরা।। দেখুন, ছাড়া পেয়ে আপনারা দু'জন কিন্তু আবার গণ্ডগোল শুরু করবেন না।

হরি।। গণ্ডগোল সৃষ্টির কোনরকম চরিত্রই আমার নয়।

মীরা।। (*প্রণবকে*) আপনিও শান্ত থাকবেন বলুন?

প্রণব।। শরীর এতো অবশ লাগছে শান্ত না থেকে আমার উপায় নেই মিস্ ব্যানার্জী।

মীরা।। তাহলে কথা দিলেন।

প্রণব।। না দিয়ে উপায় কী?

[*হোল্ডল থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রণব মিত্র*]

প্রণব।। আশ্চর্য, এই লোকের সঙ্গে আমাকে একসঙ্গে থাকতে দিয়েছিলেন!

হরি।। কিন্তু আমি তো কেবল আপনার ট্রিট্মেণ্ট্ করতে চেয়েছিলাম। আপনার ধারণা, ভেতরটা আপনার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শরীরের ভেতরে কুচিকুচি বরফ জমে গেছে। তাই দেহে তাপ আনবার জন্য সকালে একবার আর রাত্রে একবার হোল্ডল জড়িয়ে থাকবার প্রেসক্রিপশন্ করেছিলাম। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতেন।

প্রণব।। কিন্তু আপনি হাতের বালিসটা দিয়ে যে মুখ চেপে ধরতেন না, তার কি নিশ্চয়তা ছিল? রাইভ্যালকে ট্রিটমেন্টের নামে সরিয়ে দেবার তাল, বুঝিনা?

হরি।। ওটা আপনার মনের ভয়। তাছাড়া হোল্ডলে জড়ানো থাকলে আপনি নিজের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারতেন, পৃথিবীর ঘাড়ে একটা বোঝা ছাড়া আপনি আর কিছু নয়। একটা দার্শনিক ফিলিং হত।

মীরা।। মনে হচ্ছে, আপনার দার্শনিক চিকিৎসা ওঁর ঠিক বোধগম্য হয়নি।

প্রণব।। আপনি কি আমাকে নির্বোধ ভাবেন?

মীরা।। ছি, ছি, তা ভাবব কেন?

অরুণ।। আপনার সম্ভবত একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। শরীরের উপর বড্ড চাপ গেছে তাই না?

প্রণব।। তা গেছে। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন, এসব চিকিৎসার নামে দুবুদ্ধির অর্থ আমি বুঝি। এর রিভেঞ্জ আমিও নিতে জানি। আমার idea-র সঙ্গে আপনার আর তেমন মিল থাকছে না। বুঝলেন, আমাকে আলাদা করে ভাবুন, অনুরোধ করছি, আলাদা করে ভাবুন। না হলে শেষ অবধি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। শুনে রাখুন—এই হরি আর এই প্রণব, সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি।

হরি।। কিন্তু আপনার থেকে আমাকে আলাদা করা তো সম্ভব নয়। আমরা দু'জন চোখ আর চোখের পল্লব।

প্রণব।। কবিত্ব রাখুন! আলাদা হওয়া সম্ভব না হলে আমার এখানে থাকাও অসম্ভব।

হরি।। আপনি না থাকলে কিন্তু আমাদের খুব একটা ক্ষতি হবে না।

প্রণব।। তার মানে আপনি চান আমি চলে যাই?

হরি।। লোকজন চারপাশে কম থাকলেই আমার ভাল লাগে। হাওয়াটা ভাগে বেশী জোটে।

প্রণব।। কিন্তু আমি যাব না। আমার দাবি সকলের থেকে বেশি। আমি নড়ব না।

তাছাড়া এবার মিস্ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কথা বলার পালা। আপনারা এখন ওঘরে যেতে পারেন।

অরুণ॥ ঠিক আছে আমরা ওঘরে যাচ্ছি। চলুন হরিকিঙ্করবাবু।

হরি॥ চলুন। এই যে বলা মাত্র যাচ্ছি, এতেই আমি কত নির্বিবাদী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা।

মীরা॥ অরুণবাবু আপনি সত্যি সত্যি আমাকে একা রেখে যাবেন?

প্রণব॥ আমি তো থাকছি। আমাকে কি আপনি জনসংখ্যায় আনতে চান না?

মীরা॥ না, না, তা নয়।

অরুণ॥ উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। এসময় আমাদের না থাকাই ভাল।

হরি॥ এর পরেই কিন্তু আমার পালা।

অরুণ॥ ঠিক আছে, আগে ওর বলা শেষ হোক। চলুন।

[*ওরা চলে যেতে লাগল*]

মীরা॥ অরুণবাবু দেখবেন আবার আপনারা যেন কোনও গণ্ডগোল বাধাবেন না।

অরুণ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[*চলে গেল ওরা*]

প্রণব॥ একটি অতি শান্ত মগ্ন পরিবেশে আপনার সঙ্গে বসে গল্প করব ভেবেছিলাম। কিন্তু চারদিকটা যেন এখন কেমন লাগছে, একটা অস্থিরতা।

মীরা॥ আপনি একটু চুপচাপ বসে থাকুন, দেখবেন ধীরে ধীরে বেশ শান্ত লাগবে নিজেকে।

প্রণব॥ কিন্তু সত্যি বড্ড শীতল মনে হচ্ছে নিজেকে, ভেতরটায় অসংখ্য বরফের কুচি গিজ্‌গিজ্ করছে। অথচ যখন প্রথম এলাম আপনার কাছে, কেমন যেন জীবন্ত লাগছিল নিজেকে। হয়ত বয়স কিংবা এতোদিনের তিক্ত জীবনটা আমাকে এরকম করে দিচ্ছে। কিছু ভাল লাগেনা এক একসময়। নিজেকে মনে হয়, ঠাণ্ডা একটা চায়ের কাপ; কে খাবে বলে অর্ডার দিয়ে ভুলে গেছে।

মীরা॥ কেন, এখন আর ফিটন গাড়ি ভাল লাগে না?

প্রণব॥ লাগে, আরো ভালো লাগে আপনি যদি সেই পনের বছরের বালিকা হয়ে যান।

মীরা॥ আমি বেশ বুড়িয়ে গেছি, তাই না?

প্রণব॥ বুড়িয়ে যাননি, বদলেছেন। বদলাতে তো হবেই।

মীরা॥ আপনিও বদলেছেন।

প্রণব॥ আমার ডায়েরিতে অনেক অদ্ভুত কথা লিখে রেখেছি। আপনাকে সময় পেলে বলব। আপনার কথাও লেখা আছে। অনেক পাতায়। আমি মনে মনে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম। ভাল ভাল সব কথা। এখন সে-সব কথা বলতে হাসি পাচ্ছে। মানুষ, মানুষের মন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে এক এক সময় বেশ লাগে। ব্যাঙও তো হতে পারতাম, অ্যাঁ? কি কণ্ঠস্বর আর চেহারা হত ভাবুন!

মীরা॥ (*হাসল*) বেশ কথা বলেন কিন্তু আপনি।

প্রণব॥ বলতে পারতুম। কিন্তু বলার সুযোগ হয় না। আলোর চারদিকে একটা সবুজ পোকার মত আমার ঘরে উড়ে উড়ে ঘুরতে ইচ্ছা করত, হঠাৎ কে যেন একটা টিকটিকির মত দেয়াল সাঁতরে সাঁতরে একসময় টুপ করে আমাকে খেয়ে নিয়েছে। একটা কুৎসিত প্রাণীর পেটের মধ্যে যেন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এতো বমি পায়! আপনাকে এখন দেখে ভাল লাগছে। আপনাকে চিরকাল দেখলে আমার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে। আমার আর বমি পাবে না। টিকটিকির পেটের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে না। আমার শীত কেটে যাবে।

মীরা॥ আমি খুব সাধারণ মেয়ে। তেমন কিছু নেই আমার মধ্যে। আমাকে নিয়ে বেশি ভাবছেন।

প্রণব॥ অসাধারণে আমার লোভ নেই।

মীরা॥ লোভ করার মত কিছু নেই আমার মধ্যে।

প্রণব॥ আপনি নিজেকে জানেন না।

[*ঘরে হরিকিঙ্কর ঢুকলেন। পিছনে অরুণ।*]

হরি॥ ডিসটার্ব না করে পারলুম না। একটা কথা বলার ছিল।

প্রণব॥ কাকে, আমাকে?

হরি॥ হ্যাঁ। আমি অবশ্য অরুণবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট্ করেছি।

প্রণব॥ আমার কোন চিকিৎসার ব্যাপারে কি?

হরি॥ না।

প্রণব॥ ভাল। বলুন।

হরি॥ অরুণবাবু আপনি আমার হয়ে বলুন।

অরুণ॥ হরিকিঙ্কর বাবুর পয়েন্টটা ঠিক উড়িয়ে দেবার মত নয়। উনি বলছিলেন, একবার আমি, তারপরে প্রণববাবু, মিস ব্যানার্জীর কাছে নিজেদের কথা বলার পর স্বভাবতই একটা ক্লান্তি ওর আসতে পারে। আর সেই ক্লান্তির মুহূর্তেই হরিকিঙ্করবাবুর কথা জানানোর পালা আসবে। তখন মীরাদেবীর দিক থেকে স্বভাবতই উনি তেমন অ্যাটেনশন পাবেন না। তাইতো হরিকিঙ্কর বাবু?

হরি॥ চমৎকার বলেছেন। বেশ গুছিয়ে বলেছেন। আপনার মাথায় দেখছি চুল ছাড়াও আরো কিছু আছে। নাইস। তারপর বলুন।

অরুণ॥ তাই ওঁর সাজেশন্ হল, প্রণববাবু কিছুটা বলবেন, তারপর উনি, আবার হরিকিঙ্করবাবু কয়েক মিনিট বলার পর প্রণববাবু—এইরকম অর্ডারে দুজনে বলতে পারলে দুজনেরই সমান সুবিধে এবং অসুবিধে।

প্রণব॥ শুনতে বেশ লাগছে। কিন্তু সময়টা তাহলে স্থির করে নেয়া হোক।

হরি॥ সময়ের কোন বাঁধাবাঁধি নেই। একটা সংকেতের বন্দোবস্ত থাকবে। ওঘর থেকে যখনই সেটা বাজানো হবে, এঘরে যিনি থাকবেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চলে যেতে হবে।

প্রণব॥ কিন্তু তাতে কথাবার্তায় অসময়ে বাধা পড়তে পারে। ইনকমপ্লিট থেকে যাবে যে। তবে আই ডোণ্ট্ মাইণ্ড। যে কোন সাজেশন এলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তা ফেলে দিতে চাই না। দেখাই যাক না, এতে কি রকম দাঁড়ায়। কথা কমপ্লিট হবে না? তাতে কি হয়েছে? আমরা আমাদের কোনও ব্যাপারটা কমপ্লিট্ করতে পারি! কমপ্লিটনেসের

অভাবেই তো আজকের ফ্রাসট্রেশন্। ভালো কথা, মিস্ ব্যানার্জী আপনার কাছে সংকেত করবার মতো কোন ঘণ্টা বা কিছু আছে?

মীরা।। ঘণ্টা তো নেই। তবে ওঘরে ঠাকুরের আসনের কাছে একটা ভাঙা কাঁসি আছে।

প্রণব।। চমৎকার হবে। ফাটা-মত একটা আওয়াজ হবে। বাঃ। তাহলে আপনারা যান, সময়মত ঘণ্টা বাজাবেন। আচ্ছা কিরকম সময় পাব আমি?

অরুণ।। তার কোন ঠিক নেই। হরিকিঙ্করবাবুর যেই মনের মত কোন কথা বলার জন্য একটা আবেগ তৈরী হবে তক্ষুণি বাজাবেন। আপনার ক্ষেত্রেও তাই।

প্রণব।। তাই হোক। যান আপনারা।

হরি।। ঘণ্টার পরেও আপনি না উঠলে বলপ্রয়োগ হবে। বুঝলেন?

প্রণব।। কি জাতীয় বল?

অরুণ।। সেটা বলা হবে না।

প্রণব।। চমৎকার! সিক্রেসির থ্রিল্ আমার বেশ লাগে। যান আপনারা।

[*ওরা চলে গেল*]

প্রণব।। বুঝলেন মিস্ ব্যানার্জী, হাতে তাহলে সময় নেই, যে কোন মুহূর্তে একটা বিদঘুটে ফাটা-মত শব্দ হতে পারে। সত্যি করেই একটা বিশ্রীরকম বাধা আমাদের দুর্লভ মুহূর্তগুলোকে গুড়িয়ে দেবার জন্য তৈরী, তাই নয়?

মীরা।। তাতো আমার জীবনেও আমি লক্ষ করেছি। এক একসময় আমার পাটা অবশ হয়ে যায়। আমার মনে হয়, আমার স্বাভাবিক চলাটা যেন কোনো দৈব আক্রোশ পছন্দ করে না। দেখতে না পাওয়া কোনো শত্রু আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় জন্মায়।

প্রণব।। ঠিক বলেছেন, আমরা যমজ হয়ে জন্মাই—আমরা আর আমাদের শত্রু। দেখুন সময় নষ্ট হচ্ছে, আমি বরঞ্চ আমার একেবারে মূল কথাটা আপনাকে আগে ভাগে বলে নি।

[*কাঁসি বাজল*]

শুনলেন? উঠি তাহলে।

মীরা।। যা নিয়ম আপনারা করেছেন, তাতে উঠতে তো হবেই। এখনো আপনারা সব ছেলেমানুষ।

[*কথা শেষ না হতেই ধমকের মত আবার ঘণ্টা বাজতে একেবারে চুপ করল।*]

প্রণব।। তা ঠিকই।

[*হরিকিঙ্কর তার ব্যাগটা নিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রণব মিত্র ভেতরের ঘরের দিকে চললেন। হরিকিঙ্কর এসে বসল। ব্যাগটা খুলতে লাগল।*]

মীরা।। ব্যাগে কী?

হরি।। ব্যাগে আমার কথার ভূমিকা।

মীরা।। আপনি কি লিখে রেখেছেন?

হরি।। লিখলে কি গলার স্বরের কম্পন ধরা দেয়?

মীরা।। বলছিলেন ভূমিকা আছে এতে?

হরি।। হ্যাঁ, বের করছি। তাড়াতাড়ি করতে হবে, হুট্ করে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলেই সেরেছে! (*আট-দশটা চশমা নামিয়ে রাখল হরিকিঙ্কর*)

মীরা।। চশমা দিয়ে কি হবে? আপনি কি চশমার ডাক্তার?

হরি।। চশমার ডাক্তার হয় না, চোখের ডাক্তার বলা উচিত। ওসব থাক। এই চশমাগুলোই আমার ভূমিকা।

মীরা।। ঠিক বুঝলাম না।

হরি।। চশমাগুলোর প্রত্যেকটা কাচ এক এক রঙের। আমাদের আলোচনাটা কোন রঙের মধ্যে হবে সেটা বেছে নিয়ে দুজনে সেই কাচের চশমা পরে কথা বলব। রঙটা আমার পরিবেশ, মনের কথার ভূমিকা, কোন্ রঙ আপনার এখন ভাল লাগছে?

মীরা।। ঠিক স্পষ্ট করে কোন রঙ মাথায় আসছে না।

হরি।। কিন্তু দ্রুত যে কোন একটা রঙের কথা আপনাকে যে বলতেই হবে। (*ঘড়ি দেখে*) সময় কতো মূল্যবান ভাবুন। আপনার প্রিয় রঙের নামটা প্লিজ বলুন।

মীরা।। ফিকে নীল।

হরি।। ভেরি গুড। আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনি ফিকে নীল বলবেন তাই হাতে এই চশমাটা ধরে নিয়েছিলাম। পরুন। পরিয়ে দেব?

মীরা।। ঠিক আছে, আমিই পরছি। আপনিও এ রঙের পরবেন?

হরি।। না, আমার মধ্যে মৃদু প্যাশন টের পাচ্ছি, আমি পিঙ্ক রঙের পরবো। উঁহু, মৃদু প্যাশনটা কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ মেরুন রঙেরটা পরছি। আসলে স্পষ্ট কোন বিশেষ প্রিয় রঙ আমার নেই। একটা মিশেল কিছু, জড়ানো-পাকানো কিছু।

মীরা।। আমারটা তো নীলচে, দুটোয় মিলে হয়ত একটা জটিলতা আসবে।

[*ভাঙা কাঁসিটা বেজে উঠল*]

হরি।। হয়ে গেল! চশমাটা আপনি রেখে দিন। নেক্সট টাইমে আমি যেখান থেকে আরম্ভ করেছি তারপর থেকে শুরু করব।

[*প্রণববাবু ঢুকে পড়ল। আস্তে আস্তে হরিকিঙ্কর বেরিয়ে গেল। ব্যস্তভাবে প্রণববাবু এসে বসল*]

প্রণব।। বাজে সময় একটুও নষ্ট করা যাবে না, বুঝলেন। আমি যা বলব হয়ত আপনার শুনে হাসি পাবে। কারণ কানের পাশের পাকা চুলগুলোর সঙ্গে মিলবেনা। কিন্তু সময়টা বুড়িয়ে গেলেও তরুণ বয়সের ব্যথা সেদিনের মতোই আছে।

মীরা।। আপনাকে কিন্তু দেখে তেমন বয়স্ক মনে হয় না।

প্রণব।। কিন্তু পঞ্চাশ হতে মাত্র কয়েক বছর বাকি।

মীরা।। শরীরটাও বেশ শক্ত আছে।

প্রণব।। ব্যায়াম করতাম যে! এখনো রেগুলার দৌড়ই, অসম্ভব দম আমার। স্পোর্টসে ওয়াকিং রেসে আমার হাঁটার একটা বিশেষ স্টাইল ছিল। দেখবেন?

মীরা।। এখানে?

প্রণব।। দোষ কি? হাঁটব? দেখবেন চমৎকার একটা রিদম্ ফুটে উঠবে।

[*প্রণব মিত্র উঠে স্টেজের কোণের দিকে গেল। তারপর বিশেষ ভঙ্গীতে হেঁটে এল*]

প্রণব॥ এখানে স্পেস্ কম তাই স্পিডটা আনা সম্ভব নয়। আপনি রিদ্‌মটা লক্ষ করেছিলেন? স্লো-মোশন ক্যামেরায় আমার হাঁটাটা তুলে দেখালে বিউটিটা চমৎকার টের পেতেন। দাঁড়ান, খুব আস্তে হাঁটছি এবার, অনেকটা স্লো — মোশনে হাঁটলে সিনেমায় যেমন দেখায়।

[*খুব আস্তে, স্লো-মোশন ক্যামেরায় দেখালে যেরকম হয় অনেকটা সেই ভঙ্গিতে হাঁটতে আরম্ভ করল। খানিকটা আসতেই কাঁসিটা বেজে উঠল। ফ্রিজ্ হবার মত থেমে গেল। যেন পাথরের স্ট্যাচু। তারপর কোন কথা না বলে ঘুরে গিয়ে পাশের ঘরের দিকে আগের ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল। এবার হরিকিঙ্কর ঢুকল। দ্রুত এসে চেয়ারে বসল*]

হরি॥ নিন, চশমাটা পরে নিন, সময় নষ্ট করবেন না। পরুন চশমাটা।

[*মীরা পরল।*]

হরি॥ কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? দেখছেন, সব কিছুকে কালারে দেখার একটা মজা আছে। অন্তত বৈচিত্র্য বৈকি। আর একটা মজার খেলা আছে আমার। একটা কার্ডবোর্ড মাঝখানে ত্রিকোণ করে কেটে ওতে চোখ লাগিয়ে সবকিছু দেখি। ওতে বাইরের সবকিছুর একটা নতুনরকম ফ্রেম আসে। নতুন রকম একটা কম্পোজিশন্ হয়।

মীরা॥ তৈরী করে দেখব কিরকম দেখায়।

হরি॥ আমার সঙ্গে আছে, আমিই দিয়ে দেব আপনাকে। আচ্ছা, ঐ চশমাটা পাল্টে আর একটা রঙের পরে নিন। দেখবেন আবার চারদিকটা বদলে যাচ্ছে।

মীরা॥ ওটাতেই বেশ লাগছে।

হরি॥ আমি বরঞ্চ পাল্টে নি। এবার লালটা পরলুম। কারণ সত্যিকারে একটা প্যাশন ফিল করছি। এখন মনে হচ্ছে আমার রক্তের মধ্যে থেকে একটা রক্তবর্ণ বেলুন কবে কে ফুলিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিস, সেটা উড়তে উড়তে আপনার মধ্যে এসে দুলছে। আমি আমার দু'হাতের লোভের চাপে ওটাকে ফাটিয়ে দেব।

মীরা॥ তাহলে আমার কিন্তু বেশ বিপদের কথা। বেলুনের মত যদি ফেটে যাই।

হরি॥ আচ্ছা, আপনার কপালটা একটু ছোঁব, একবিন্দু? আমি কোনদিন কাউকে ভালবেসে ছুঁইনি। এতো ইচ্ছে করে! কি এমন ক্ষতি এতে বলুন তো, অথচ কেউ রাজি হয় না।

মীরা॥ ঐ একটু থেকে যে অনেক বিপদ তৈরী হয়।

হরি॥ জানেন, পথেঘাটে চলতে চলতে অনেক মেয়েকে আমার ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে। অথচ তাতো সম্ভব নয়। একবার এসপ্ল্যানেডের দুপুরে একটি চমৎকার মেয়ের ভুরুটা ছুঁতে ইচ্ছে করছিল। ছুঁয়েও দিলাম।

মীরা॥ তারপর?

হরি।। মেয়েটির একটি বিকট চিৎকার শুনলাম, কয়েকজন লোক কাছাকাছি এল তারপর মিনিট পাঁচেক কিছু জানিনা আমি। মানুষ কেন যে এক এক সময় এতো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে!

[*ওঘর থেকে কাঁসি বেজে উঠল*]

হরি।। দেখেছেন, কতো কুইক্ বাজিয়ে দিল। আমি নিজেকে এখনো এক্সপ্রেস্ করতে পারলুম না।

[*প্রণববাবু ঢুকলেন*]

হরি।। অল্প একটু বাকি আছে, বুঝলেন, অতি সামান্য একটি কথা।

প্রণব।। ইম্পসিবল্। চলবে না।

হরি।। ব্যাপারটাকে একটা রুক্ষ নিয়মের মধ্যে আনছেন কেন? আপনি কি কোমলতা ভুলে যাচ্ছেন? কোমলতা, যা মাখনের মত নরম। সাবানের ফেনার মত পরিষ্কার।

প্রণব।। সময় নষ্ট করলে আমি কঠোরতা শব্দের অর্থ বোঝাব। যা আঘাতের মত নির্মম, হ্যাঁচকা টানের মত নিষ্ঠুর। উঠুন বলছি।

হরি।। আপনি এক মিনিট অন্তত জানালা দিয়ে আকাশটা দেখে আসুন। মানুষ তো থুতুও ফেলে, থুতু ফেলার মত সময় অন্তত আমাকে দিন। আপনি পান খান না কেন? তাহলে আপনার পিক্ ফেলার অবকাশে কিছু সময় জুটত আমার।

প্রণব।। যথেষ্ট হয়েছে। এবার আমি অনন্যোপায় (*হাত ধরে টান দিল*)

হরি।। একি করছেন! আমার হাত ধরে টানছেন কেন? জানেন, আমার হাত পা সব খোলা খোলা।

প্রণব।। কি বললেন, হাত পা খোলা খোলা?

হরি।। হ্যাঁ, সব খোলা, বাসের পিছন দিকে আমি বসি না, ঝাঁকুনিতে মাথাটা খুলে কোলে পড়ে যেতে পারে।

প্রণব।। মাথাটাও আলগা?

হরি।। হ্যাঁ! সব কিছু খুলে রেখে আমি ঘুমোই।

প্রণব।। তাহলে আমি এক এক করে খুলে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

[*হরিকিঙ্করের হাত ধরে টানতে বীভৎস চেঁচিয়ে উঠল। অরুণ এগিয়ে এল*]

মীরা।। কি হচ্ছে, থামুন আপনারা, কি করছেন?

অরুণ।। প্রণববাবু, এদিকে আসুন আপনি। হরিকিঙ্কর বাবু আপনি ওঘরে যান— তেমনই চুক্তি ছিল।

হরি।। বেশ, আমি ঝঞ্ঝাট পছন্দ করি না বলেই যাচ্ছি।

[*চলে গেল*]

অরুণ।। প্রণববাবু, আপনিও আপাতত ওঘরে যান। এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরী হয়েছে, এখন কি করা যায় সে ব্যাপারে মিস্ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করা দরকার।

প্রণব।। কিন্তু ঐ ঘরে ওর সঙ্গে থাকা অসম্ভব। দুজনে মিলে একসাথে থাকা কোন রকমেই উচিত হবে না। আমি আলাদা, ওর সঙ্গে কোন যোগ নেই। আমার সঙ্গে মিস্

ব্যানার্জীর সম্পর্কের মধ্যে লোকটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনারা ভুল করেছেন। মিস্ ব্যানার্জী আপনি বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়ে কি করে এই অসম্ভবকে মেনে নিলেন?

মীরা।। এ ব্যাপারে আমার কিন্তু কোন পরামর্শ নেই। যা ঘটেছে আমি মানিয়ে নিতে চেয়েছি।

অরুণ।। সব কিছু হয়ত আমার জন্যই হয়েছে আর সেজন্য আমাকে আপনারা ভাবতে দিন, দেখা যাক কি করা যায়। আপনি ওঘরে যান দয়া করে, চুপ করে বসে থাকেবেন, একটিও কথা বলবেন না, দেখবেন কোন গণ্ডগোল হবে না।

প্রণব।। কিন্তু লোকটি আমাকে হোল্ডলে পুরে যে ট্রিট্মেণ্ট করেছে আমি তার রিভেঞ্জ নিতে পারি কিন্তু। ওর দিকে তাকলেই রিভেঞ্জ নেবার জন্য কেমন যেন ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে উঠি।

মীরা।। দয়া করে আর রিভেঞ্জের চেষ্টা করবেন না। একটা হুলুস্থুল কাণ্ড হয়ত শুরু হয়ে যাবে।

অরুণ।। আপনি প্লিজ যান!

প্রণব।। বেশ যাচ্ছি, কিন্তু কি পরিণাম হবে আমি জানিনা, আগেই জানিয়ে রাখছি।

[*চলে গেল*]

মীরা।। আমি পারছিনা অরুণবাবু। আপনার এক্সপেরিমেণ্টে আমিই হয়ত শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে না পেরে পাগল হয়ে যাব। এবার এসবের ইতি হোক।

অরুণ।। সত্যি যথেষ্ট বিরক্ত করেছি আপনাকে। আমার নিজের অপরাধের হয়ত ক্ষমা নেই। আপনার সহিষ্ণুতায় আমি অবাক হয়ে গেছি।

মীরা।। সহিষ্ণুতার কথা নয়, ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত লাগছিল। তাছাড়া একের পর একটা এমন ভাবে ঘটে যাচ্ছিল আমি নিজের মত কিছু ভাববার সময় পাইনি। তাছাড়া আপনি যখন আছেন, মনে জোর ছিল অঘটন কিছু ঘটবে না।

অরুণ।। আমি সত্যি করেই ভরসা করবাব মত লোক নই। তাহলেও আপনার কাছে আমি নিজেকে শক্তিশালী ভেবেছি। এবার এদের হাত থেকে আপনাকে ছুটি দেবার চেষ্টা করব। আমরা সবাই বিদেয় হব।

[*ওঘর থেকে চেঁচামেচি ভেসে এল*]

হরি।। (*নেপথ্যে*) এ কী করলেন আপনি আমার? দিয়ে দিন, ফিরিয়ে দিন আমাকে।

প্রণব।। (*ও-ঘর থেকে*) অসম্ভব। This is my revenge. এবার শোধ নিলুম তো!

হরি।। ফিরিয়ে দিন বলছি। অরুণবাবু! অরুণবাবু!

মীরা।। (*এ-ঘর থেকে*) আবার কি শুরু হল?

হরি।। (*ও-ঘর থেকে*) অরুণবাবু! অরুণবাবু! প্লিজ্-শিগগির আসুন . . .

অরুণ।। যাচ্ছি।

[*সঙ্গে সঙ্গে প্রণব মিত্র হাতে কাল্পনিক একটা কিছু দুহাতে ধরে এঘরে ছুটে এল। হরিকিঙ্কর অন্ধ যেমন হঠাৎ লাঠিটা হারিয়ে শূন্যে দুহাতে খুঁজতে খুঁজতে হাঁটে তেমনি দ্বিধাগ্রস্তর মত আঁকাবাঁকা পা ফেলতে ফেলতে ঢুকল*]

হরি॥ (*অন্ধের মত চোখ বুজে*) মিস ব্যানার্জী, দেখুন আমার মাথাটা প্রণববাবু নিয়ে পালিয়েছেন। হাত না খুলে শুয়েছিলাম। টুক্ করে মুণ্ডুটা টেবিল থেকে তুলে নিয়েছে। চোখসমেত আমার মাথাটা নিয়ে লোকটা কি বিশ্রীভাবে ছুটছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তাড়াতাড়িতে আবার আমার হাতপাগুলো উল্টোপাল্টা লাগিয়ে ফেলেছি।

প্রণব॥ আমি ওর মাথা দিচ্ছি না! এতো বদবুদ্ধি যে মাথায় আমি দোতলায় উঠে সেই মাথাটা আস্তে বাস্তায় ফেলে দেব। মিষ্টি একটা শব্দ করে কাচের গ্লাশের মত মাটিতে পড়ে চৌচির হবে। এতো ভাল লাগছে আমার ভাবতে।

হরি॥ উঃ, কি হবে আমার! মিস ব্যানার্জী, আমাকে বাঁচান।

মীরা॥ প্রণববাবু, ওর মাথাটা আপনি ফিরিয়ে দিন।

প্রণব॥ আপনার সহানুভূতি দেখেছি এই ক্রিমিন্যালটার উপরেই। অসম্ভব! আমি ফিরিয়ে দেব না।

অরুণ॥ আপনি ফিরিয়ে দিন তাঁকে। বেচারার ঘাড়ের ওপরটা কিরকম হাল্কা লাগছে ভাবুন।

হরি॥ ভয়ানক হাল্কা লাগছে। জানেন, ঘাড়ের ওপর মাথাটার ওজন আমার প্রায় দেড় কেজি। এখন কোন ওজনই টের পাচ্ছি না।

প্রণব॥ তা দেড় কেজির একটা বাটখারা চাপিয়ে দিন ওখানে। বুঝতে পেরেছি আপনারা সকলে আমার এগেনইস্টে। আমি এক্ষুণি চলে যাব। একটা কুলি ডেকে দিন। মাথাটাশুদ্ধ চলে যাব। আমার কাছে থাকবে। শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে না অন্তত।

হরি॥ দেখেছেন, আমি এর পিছু পর্যন্ত নিতে পারব না। ঠিক গাড়ির তলায় চাপা পড়ে যাব। মিস্ ব্যানার্জী!

মীরা॥ কি কচ্ছেন, প্রণববাবু! আপনি দিয়ে দিন ওকে।

অরুণ॥ আপনি তো শান্তিপ্রিয় লোক, ওর মাথায় মুণ্ডুটা প্লিজ্ পরিয়ে দিন। তারপর বিদেয় হ'ন।

প্রণব॥ এখন ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার। আমাকে তাড়িয়ে এই লোকটিকেই আপনারা প্রণব মিত্র হিসেবে ভাববেন। একটা শর্তে আমি এর মুণ্ডুটা ফিরিয়ে দেব। আমি এক্ষুণি ট্রেণে চেপে চলে যাব। হরিকিঙ্করবাবুও আমার সঙ্গে যাবে। ট্রেনের কামরায় ওর মাথায় আমি মুণ্ডু পরিয়ে দেব।

হরি॥ আপনি চলে গেলে আমাকে তো যেতেই হবে, অতো শর্তের কি দরকার। আমি তো আপনারই আইডিয়া, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদায় নেব। তাছাড়া মাথাটি আপনার হাতে—মাথা ছেড়ে থাকব কি করে?

প্রণব॥ তাহলে ডাকুন কুলি, নমস্কার। বিদেয় হই। তবে মুণ্ডুটা ট্রেনের কামরাতেই পরিয়ে দেব।

হরি॥ তাই দেবেন।

অরুণ॥ আচ্ছা আমি কুলি দেখছি।

[*চলে গেল*]

হরি॥ মীরাদেবী, যাবার আগে আপনাকে একবার দেখে যেতে পারলাম না! হয়ত আমার কাটা মুণ্ডুটা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে থাকবে। আপনি আমার

কাটা মুণ্ডুটার চোখ দুহাতে বুজিয়ে দিয়েছিলেন, ঐ স্পর্শটা একেবারে মুছে যাবে না।

প্রণব॥ অতো করুণ বক্তৃতার দরকার নেই। আমার ভেতরের বরফের কুচিগুলো যদি ভয়ানক বাড়তে না থাকত আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল ভাল কথা বলতে পারতাম আপনাকে। মিস্ ব্যানার্জী, আমার রক্তের মধ্যে বরফের কুচিগুলো যদি না থাকত, দেখতেন আমার দুটো হাতে, বুকে নতুন ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ তাপ, প্রথম ফোটা চাঁদের মত উষ্ণ আমার ভেতরটা।

[*একজন কুলি-সহ অরুণ ঢুকল*]

অরুণ॥ এগুলো বাইরের ট্যাক্সিতে তোল।

[*কুলি জিনিস নিয়ে বাইরে যেতে লাগল*]

হরি॥ অরুণবাবু, আমার হাতে ব্যাগটা তুলে দিন।

[*অরুণ দিল*]

প্রণব॥ নমস্কার মীরাদেবী।

মীরা॥ নমস্কার।

হরি॥ নমস্কার, চলি, প্রণববাবু আমাকে ধরে নিন।

প্রণব॥ এতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই। I am not at all heartless. চলুন।

[*প্রণব মিত্রের হাত ধরে হরিকিঙ্কর অন্ধের মত বেরিয়ে গেল*]

অরুণ॥ আমিও চলি মীরাদেবী। যথেষ্ট বিরক্ত করেছি আপনাকে। এখন আপনার ছুটি।

মীরা॥ কিন্তু আপনারা চলে যেতে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সত্যি।

অরুণ॥ বিজ্ঞান বলেছে, কোথাও কিছু ফাঁকা থাকে না। চলি, নমস্কার।

মীরা॥ নমস্কার—আসবেন আবার।

অরুণ॥ এলে হয়ত আমি নিজেই বিপদে পড়ব। চলি।

[*অরুণও চলে গেল। মীরা একা ঘরটির দিকে তাকাল। টেবিলে রজনীগন্ধাগুলো ছড়িয়ে ফুলদানিটা কাত করা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে গুছোল, ভাসে রাখল, তক্ষুণি কি মনে করে ফুলগুলো সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ঢুকল।*]

মীরা॥ কি ব্যাপার, ফিরে এলেন যে?

অরুণ॥ একটা কথা মনে হল। আচ্ছা মীরাদেবী, আমার এক্সপেরিমেন্টটা কি সত্যিই মিথ্যে। প্রণব মিত্রর জন্য আপনার প্রয়োজন, তার আসা—এগুলো কি মিথ্যে!

মীরা॥ কী জানি?

অরুণ॥ প্রণব মিত্র আপনার একটা সম্পর্কের আইডিয়া, একটা অনিবার্য দরকারের নাম। আমিও তো সেই প্রণব মিত্রের আইডিয়ার মধ্যে ঢুকে যেতে পারি। পারিনা? আর একটা এক্সপেরিমেন্ট। আপনার তো বিপুল সহ্য!

মীরা।। মনে হচ্ছে আবার একটা গণ্ডগোল শুরু হবে। তিনজনে যা শুরু করেছিলেন।

অরুণ।। না, এবার চরিত্র মাত্র দুটি। আপনি এবং আমি। ওদের ট্যাক্সি প্রায় স্টার্ট দিচ্ছে।

মীরা।। আগে চা খান।

[*ওঠে মীরা*]

অরুণ।। আপনি বসুন। ভোলাদাও তো চা দিতে পারে।

মীরা।। কেন, আমি যদি চা করে খাওয়াই।

অরুণ।। মীরাদেবী!

মীরা।। আমি দেবীটেবী নই কোনকালে, পুরোপুরি মানুষ। দাঁড়ান চায়ের আগে রজনীগন্ধা ফুলগুলো ফুলদানিতে সজিয়ে রাখি। প্রণব মিত্র তা না হলে ফিরে যেতে পারেন।

[*দরজা দিয়ে অন্ধের মত হরিকিঙ্কর ঢুকল*]

হরি।। মীরাদেবী আমার ফিকে সবুজ চশমাটা আপনার টেবিলে রইল। ওটা আমি চাইনা, বুঝলেন, ওটা দিয়ে দিলুম আপনাকে, চলি।

[*চলে যায় হরিকিঙ্কর। ধীরে পর্দা নেমে আসে।*]

চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড

চরিত্র লিপি

চেয়ারম্যান

ডাক্তার

রাধাগোবিন্দ

মল্লিকবাবু

শান্তা

সীমা

ইন্সপেক্টর

সর্বেশ্বর

মাখন

প্রেত

প্রথম দৃশ্য

[এককালের জমিদার মল্লিকবাবুদের পুরনো ভাঙা বাড়িব ছাদ। এককালে খুব পাখি পোষার শখ ছিল মল্লিকবাবুদের। আজও ছাদের উপরে বিরাট ভাঙা খাঁচা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় এখানে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের নিয়ে সরকাবী উদ্যোগে একটি জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে। কয়েকটি পুরনো চেয়ার-টেবিলও সে জন্যে আনা হয়েছে। সন্ধ্যা। একটা বড় সেজের বাতি জ্বলছে। ফাঁকা মঞ্চে একটু পরে ঢুকল চেয়ারম্যান। বয়সে তিনি প্রৌঢ়।]

চেয়ারম্যান।। যাঃ বাবা! কেউ আসেনি নাকি এখনো? সন্ধে না হতেই জায়গাটা যেন অন্ধকারে কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। এঃ! চিমনিটার দশা দেখছ? এতো কালিঝুলি, লণ্ঠন থেকে আলোটা যে খুঁজে বের করতে হয়! হুঁ! (*আচমকা একটা কুকুর ডেকে উঠতেই চমকে ওঠে চেয়ারম্যান*) কে আছ? শুনছ? কে আছ? কি আশ্চর্য! কেউ কোথাও নেই নাকি? (*আবার কুকুরটা ডেকে ওঠে*) খেলে কাণ্ড! এই বিদ্‌ঘুটে জায়গায় কি একা-একা বসে থাকব? কে আছ? শুনছ? একটা কথা জিগ্যেস করতুম। কে আছ? (*আচমকা একটা ঘোড়া তীব্রস্বরে ডেকে ওঠে*) কে? কে? কে? (*প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ দ্রুত বাড়িটার পাশ দিয়ে নৈঃশব্দ্য ভেঙে চলে গেল এবং পিছনে নিঃশব্দে প্রৌঢ় ডাক্তার ঢুকলেন*)

ডাক্তার।। (*হাসতে হাসতে*) ঘোড়ার ডাক।

চেয়ারম্যান।। (*চটে যান*) ঘোড়ার ডাকটা আমি চিনি ডাক্তার, ওটাকে বেড়ালের ডাক ভাবিনি।

ডাক্তার।। এতে চমকে উঠছ কেন চেয়ারম্যান?

চেয়ারম্যান।। এ-পরিবেশে একটা মশা ডাকলেই চমকাতে হয়, তো ঘোড়ার ডাক! চারদিকটা কেমন থমথম করছে দেখছ না?

ডাক্তার।। তা আজকের মিটিংটা এই ভুতুড়ে বাড়ির জঙ্গলে না করে টাউন হলে করলে তো তোমাদের কোন অস্বস্তি হত না।

চেয়ারম্যান।। ইন্সপেক্টর যে এ-জায়গাটা ছাড়া মিটিং করতে রাজিই হল না। বললে, মিটিংটা নাকি একেবার স্পটেই হওয়া দরকার। অথচ স্পটখানা কেমন থমথমে লক্ষ করেছ তো? ছিল পাখির ঘর, এখন তো এই ছাদে আর পাখি নেই, মরা পাখির আত্মাগুলো হয়তো ফাঁকা খাঁচা আর দাঁড়গুলোতে আস্তানা নিয়েছে। কিন্তু ইন্সপেক্টরকে বোঝাবে কে?

ডাক্তার।। রাখ তোমার ইন্সপেক্টর-এর কথা। মাথা-পাগল একটি! মজুমদারদের দিঘিতে কে নাকি একজন জলকন্যা দেখেছিল। বলতে, গোটা পুকুরের জল ছেঁচে ফেললে!

চেয়ারম্যান।। তারপর থেকে কিন্তু জলকন্যা আর দেখা যায় নি। একটা সাকসেস সন্দেহ নেই।

ডাক্তার।। একদিন ওর ধারণা হল, ওর ঘোড়াটা মেয়েদের দিকে পুরুষমানুষের মতো তাকায়। ঘোড়ার চোখে পরাবার জন্য একটা ঠুলি বানাবে বলেছিল।

চেয়ারম্যান।। তাই নাকি?

ডাক্তার।। হ্যাঁ। ঘোড়াটা আমার হলে ঠুলির বদলে, ওর চোখে একটা বায়নোকুলার পরিয়ে দিতাম।

[*দু'জনে হাসতে থাকে। একটি তরুণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতে একটা নোটবুক নিয়ে ঢোকে*]

রাধাগোবিন্দ।। স্যার আসেন নি এখনো?

ডাক্তার।। না।

রাধাগোবিন্দ।। যাচ্চলে। এদিকে নোট করতে করতে আমার খাতা যে প্রায় ফুরিয়ে এল।

চেয়ারম্যান।। কি নোট করছেন?

রাধাগোবিন্দ।। এখানকার সব কিছু। স্যার এখানকার সবকিছুই নোট করতে বলেছেন —নিজেকে আড়ালে রেখে।

চেয়ারম্যান।। ও।

রাধাগোবিন্দ।। যখন কিছু নোট করার নেই, বুঝলেন, জঙ্গলের লুকনো লতপাতার ফাঁক দিয়ে আকাশটা দেখতে পাই তো; আমি আকাশেরও নোট নিয়েছি—এতো চমৎকার সব রঙ না!

ডাক্তার।। তা ইন্সপেক্টর কি তোমার অতো সব পড়তে সময় পাবে, না পড়তে চাইবে?

রাধাগোবিন্দ।। আপনি ঠিক বলেছেন, একটা বিশ্রী লাল কলম দিয়ে উনি প্রায় সবটাই কেটে দেন। আচ্ছা চলি, হয়তো এর মধ্যে অনেক কিছু 'পাস' করে গেল। স্যার এলেই আসছি। (*দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার ঢোকে*) ইয়ে, জঙ্গলে যেখানে লুকিয়ে আছি, বুঝলেন চারদিকে শুধু গ্রীন, গ্রীন অ্যাণ্ড গ্রীন লীভস! আচ্ছা চলি।

[*দ্রুত চলে যায়। বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ*]

ডাক্তার।। ইন্সপেক্টর তো ঘোড়া ছুটিয়ে চারদিকটা কাঁপিয়ে তুলল।

চেয়ারম্যান।। তা তুলল।

ডাক্তার।। আমরা এসে গেছি সে খবরটা তো দেওয়া দরকার।

চেয়ারম্যান।। তা তো দরকার। কিন্তু ওর ঘোড়ার পিছনে দৌড় গিয়ে খবরটা জানাবে কে? এদিকে মল্লিক-এরও তো দেখা নেই। এতোবড় ফাঁকা বাড়িটায় একা-একা লোকটা সারাটা দিন যে কেমন করে কাটায়।

ডাক্তার।। দু'তলায় মল্লিকের ঘরের পাশ দিয়ে আসতে ওকে কেমন অদ্ভুত লাগল। ইজিচেয়ারটায় কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথায় ওদের রাজবংশের পুরনো একটা মুকুট, গলায় বায়নোকুলারটা ঝুলছে। মুখটা বিষণ্ণ।

চেয়ারম্যান।। শুনলাম ওর শেষ শাদা কাকাতুয়াটাও নাকি আজ দুপুরে মারা গেছে।

ডাক্তার।। শোক পেলে মল্লিক শুনেছি পূর্বপরুষদের পোশাক পরে রাতের ছাদে একা-একা ঘুরে বেড়ায়।—প্রাচীন দম্ভের মধ্যে হয়তো পালিয়ে বাঁচতে চায়।

চেয়ারম্যান।। বিয়ে-থা করে সংসারী না হ'লে এসব মনের অসুখ বাড়ে, ডাক্তার। যুবক ছেলে, মেয়েরাই তো এ-বয়সে গড়েপিঠে দেয়। আচ্ছা ডাক্তার—

ডাক্তার।। বল।

চেয়ারম্যান।। আমাদেব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে ডাক্তার! সেই হরেন কোবরেজের

মেয়ে মনোরমা . . . আহাহা, কী বয়েসটাই না হারিয়েছি! মনটা যেন কে এসে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে গেল হে!—আচ্ছা ডাক্তার—

ডাক্তার।। উঁ?

চেয়ারম্যান।। তুমি কাউকে ভালবেসেছ?

ডাক্তার।। বুড়ো হয়ে গেছি যে।

চেয়ারম্যান।। না, না, কচি বয়সে?

ডাক্তার।। দুর, কচি বয়সে কি প্রেম হয়?

চেয়ারম্যান।। (*বিরক্ত হয়ে*) তা হলে হবেটা কখন?

ডাক্তার।। যে সময়টা হাত ফসকে চলে যায় তখন।—যাক গে। এস, ইন্সপেক্টরকে একটা হাঁক দেওয়া যাক।

[*দূরে মেয়েদের কলরব শোনা যায়*]

চেয়ারম্যান।। না, না, হাঁকাহাঁকি না করাই ভাল। হাঁক দিলে ওরা ছাড়া অন্য কোনও অলৌকিক আত্মা যদি সাড়া দিয়ে বসে—

ডাক্তার।। তুমি কি ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ছ, এ্যাঁ? বুড়ো বয়সে ভূত ধরতে এসে ভূতের ভয় দেখছি তোমার বাড়ছে!

চেয়ারম্যান।। ভূত বুড়ো-কাঁচা বাছে না হে, পছন্দমত ঘাড় পেলেই মটকায়।

ডাক্তার।। হাঃ হাঃ হাঃ!

চেয়ারম্যান।। কে? কে ওখানে? কে যায়? পড়ে যাবেন, কার্ণিশটা ভাঙা, পড়ে যাবেন . . .

ডাক্তার।। কে?

চেয়ারম্যান।। (*পিছিয়ে এসে*) এদিকে আসছে। এতো বিদঘুটে অন্ধকার।

[*তরুণবয়স্ক মল্লিক ঢোকে। মুকুটটা হাতে। স্বপ্নাচ্ছন্ন।*]

মল্লিক।। আমি। কি আশ্চর্য! ঘুমের মধ্যে কে যেন "আগুন আগুন" বলে চেঁচিয়ে উঠল। স্বপ্নে মনে হোল, আমাদের পূর্বপুরুষ পিতা-প্রপিতামহের যত পুরনো পোশাক সব যেন দাউদাউ করে জ্বলছে—আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম। ওগুলো পুড়ে গেলে আমাকে আর কেউ বোধহয় ছোটরাজাবাবু বলে মানবে না—আমাদের বংশের রাজপ্রতাপের শেষ চিহ্ন।

ডাক্তার।। একটু চুপচাপ হাওয়ায় বসুন মল্লিকবাবু, ভাল লাগবে।

[*বাইরে কয়েকটি কিশোরী মেয়ের ছুটোছুটি আর শব্দ শোনা গেল। খুব সন্তর্পণে একটি সবুজ ও সাদা স্কার্ট পরা মেয়ে পা টিপে টিপে ছাদের কোণটায় লুকল।*]

চেয়ারম্যান।। আরে আরে আরে আরে . . . এ্যাই এ্যাই, এখানে লুকোচ্ছ কেন? ব্যাপার কি? এ্যাঁ?

[*মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওদের চুপ করে থাকতে*

বলল। মিষ্টি একটু হেসে উৎকর্ণ হল। বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত চেহারার তেইশ-চব্বিশের শাদা শাড়ি সবুজ পাড়, সবুজ ব্লাউজ একটি মেয়ে ঢুকেই কিশোরীটির দিকে তাকাল। মেয়েটি ধরা পড়ায় হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ নিচু করল। কিশোরী মেয়েটির নাম সীমা, তরুণীটি শান্তা]

শান্তা।। এখানে এসে লুকালে কেন, সীমা? তুমি নিয়ম ভেঙেছ, এবার তুমি চোর দেবে। যাও। *(সীমা বাধ্যের মত চলে গেল)*

ডাক্তার।। শান্তা, তুমি এখানে? লুকোচুরি খেলছ বুঝি মেয়েদের নিয়ে?

শান্তা।। ওরা এক্ষুণি স্কুলের গাড়িতে চলে যাবে। এখানকার বাগানে ওদের লতাপাতা চেনাচ্ছিলাম। ওরা ধরল, লুকোচুরি খেলছিলাম।

মল্লিক।। ওদের খেলাধুলোর মধ্যে আপনাকেও কেমন বালিকার মত লাগে। আমি অনকসময় বায়নোকুলারটা নিয়ে দেখি। অপরাধ নেবেন না, কেবল দেখাটা হয়ত পাপ নয়, তাই না?

শান্তা।। পাপ হবে কেন?

চেয়ারম্যান।। আমাদের আজকের মিটিং-এ তো আপনাকেও ডাকা হয়েছিল, তাই না?

শান্তা।। হ্যাঁ, ওজন্যেই আমি থেকে যাচ্ছি। মেয়েরা চলে যাবে একটু বাদে।

ডাক্তার।। প্রেতের অনুসন্ধানে তোমাকেও ডাকা হয়েছে? ইন্সপেক্টর দেখছি বিরাট আয়োজন করেছে।

চেয়ারম্যান।। আপনার কাছ থেকেই কিন্তু আমরা বড় রকমের সাহায্য আশা করছি।

শান্তা।। আমি যেটুকু পারি—

চেয়ারম্যান।। ব্যস, ব্যস, তার বেশি আমরা চাই না।

[দরজায় কয়েকটি মেয়ের মুখ উঁকি দিল]

ডাক্তার।। শান্তা, তোমার স্কুলের মেয়েরা তোমাকে চাইছে। তুমি বরঞ্চ ওদের কাছে যাও। ইন্সপেক্টর এলেই তোমাকে ডাকছি।

[একটি ছোট মেয়ে ছুটে এল]

মিঠু।। দিদিমণি—

শান্তা।। কি মিঠু!

মিঠু।। খেলবে না? *(ডাক্তার ও শান্তা হেসে ওঠে)*

শান্তা।। *(হেসে)* হ্যাঁ, চল।

মল্লিক।। মিস্ লাহিড়ী, একটু দাঁড়ান। নিচের ঘরটা খুলে দিচ্ছি, ওদের নিয়ে ওখানে বসুন। এখানকার অন্ধকারটা ভাল না। আপত্তি নেই তো?

শান্তা।। বাঃ, আপত্তি কেন? ওঘরে তো একটা নকল বাঘ রয়েছে। ওটার সঙ্গে ছোটদের জানালা দিয়ে কতোরকম বন্ধুত্ব চলে! *(হেসে)* আসুন— *(ওরা চলে যায়)*

[বাইরে থেকে একটা বন্দুকের শব্দে সকলে থমকে

উঠল। ইন্সপেক্টর আর রাধাগোবিন্দর কথা শোনা গেল। বাইরে রাধাগোবিন্দ-ইন্সপেক্টর এবং ভেতরে ডাক্তার-চেয়ারম্যান উভয় তরফে কথা চলছে]

ইন্সপেক্টর।। আরে আরে আরে আরে, এতো মেয়ে এল কোত্থেকে এ্যাঁ?

রাধাগোবিন্দ।। ওরা প্রায়ই আসে। সঙ্গে ওদের দিদিমণি থাকে।

ইন্সপেক্টর।। দিদিমণিটি কে হে,? যার ডাইরিটা পাওয়া গেল?

রাধাগোবিন্দ।। হ্যাঁ, স্যার।

ইন্সপেক্টর।। অ। তা আজকের মিটিং-এ ওঁকে আসতে বলা হয়েছে তো?

ডাক্তার।। চেয়ারম্যান, ইন্সপেক্টর বোধহয় আসছে।

চেয়ারম্যান।। তাই নাকি? আমার কাগজপত্রগুলো . . . —বেশ পাঙচুয়াল আছে কিন্তু!

ডাক্তার।। না। চার মিনিট লেট।

চেয়ারম্যান।। আরে, ঐ হল—চার মিনিট কি মিনিট নাকি? বাঙালির ছেলে—

ইন্সপেক্টর।। বেশ, বেশ, বেশ। (*ভিতরে ঢুকে*) বাঃ, আপনারাও সবাই এসে গিয়েছেন। থ্যাঙ্কস্। ঘরে ঢোকবার মুখে গাছের ডালে চমৎকার একটা পাখি দেখে গুলি করলাম। একে আবছা আলো, তার পর রিভলবারের গুলি—কিন্তু ঠিক গিয়ে বুকে বিঁধেছে। পালকগুলো এতো সুন্দর, গুলি করে না নামালে ঠিক বুঝতেই পারতুম না।

রাধাগোবিন্দ।। আপনার নখে বোধহয় রক্ত লেগে আছে।

চেয়ারম্যান।। রক্ত! এই দ্যাখ, মিটিং এর শুরুতেই রক্তপাত! কেমন যেন অশুভ হল না?

ইন্সপেক্টর।। রক্ত অশুভ? বলেন কি মশাই? দ্যাখেননি পুজার সময় বলিদানের রক্ত লেগে খড়্গটা কেমন পুণ্যাত্মার মত ঝকঝক করে জ্বলে! রক্তমাখা খড়্গটা এতো ভাল লাগে দেখতে! (*আঙুলটা চোখের কাছে তুলে*) চমৎকার রঙটা, না? রক্তের রূপও কম নয়।

রাধাগোবিন্দ।। ওটা মুছে ফেলুন না, স্যার।

ইন্সপেক্টর।। ইউ, যাঃ ও। (*রাধাগোবিন্দ চলে যেতে রুমালে আঙুলটা মুছল*) যাকগে, একটু দেরী হয়ে গেল। চারদিকটা একটু অবজার্ভ করে এলাম।

চেয়ারম্যান।। ভূতটুত কিছু চোখে পড়ল?

ইন্সপেক্টর।। আরে মশাই, চোখে পড়লে তো মিটেই যেত। আসলে খাঁচা নিয়ে হাওয়া ধরতে যাওয়া আর দলবল নিয়ে ভূত ধরা, একই কথা। আমার মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো ভূতের খোলস পরা কোনো দুষ্ট লোকের খেলা।

চেয়ারম্যান।। হতে পারে। কিন্তু তবু আত্মা আছে জানেন?

ইন্সপেক্টর।। দেখুন চেয়ারম্যান, আমাদের আলোচনার বিষয় কিন্তু আত্মা নয়, ভূত কিংবা. . . কিংবা . . . কিংবা অশুভ আত্মাও বলতে পারেন, বা—

ডাক্তার।। আমার মনে হয় আপনি প্রেতাত্মা বলতে চাইছেন।

ইন্সপেক্টর।। রাইট। আত্মা দার্শনিক খুঁজবেন, আমরা প্রেতাত্মা খুঁজব। যদিও বলেছি, প্রেতাত্মায় আমার কোনও বিশ্বাস নেই, আমার অবশ্য কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। আমি এও বিশ্বাস করি না যে আমার ছেলে এবার পরীক্ষায় পাশ করবে। (*সকলের*

মুখের দিকে বিব্রত তাকিয়ে) ব্যাপারটা পার্সোনাল হয়ে গেল বোধহয়?

চেয়ারম্যান।। ব্যক্তিগত ব্যাপারে না আসাই ভাল।

ডাক্তার।। তাছাড়া আমাদের আলোচনাও তো পার্সনের নয়, স্পিরিটের, গোস্টের।

ইন্সপেক্টর।। রাইট। এখন প্রশ্ন, ভূতটি কে?

চেয়ারম্যান।। ভূত হচ্ছে মৃত্যুর পরে অতৃপ্ত অশরীরী, সূক্ষ্ম আত্মা।

ইন্সপেক্টর।। আপনি আবার 'আত্মা' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন কিন্তু।

চেয়ারম্যান।। সরি, প্রেতাত্মা।

ইন্সপেক্টর।। (*হাসিমুখে*) রাইট। আজকের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ প্রতিটি শব্দ আমাদের যথেষ্ট সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে। জীবনে এর প্রচণ্ড দরকার, অথচ আমার স্ত্রীকে এটা বোঝাতে পারলুম না।

ডাক্তার।। ব্যাপারটা কিন্তু আবার ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর।। রিয়েলি সরি। আমার এই স্বভাবটা আমার বাবার কাছ থেকে ইনহেরিট করেছি। দারুণ চেহারা ওঁর। আজ অবধি একটাও দাঁত পড়েনি, সরি, একটা বোধহয় আজ পড়েছিল . . . কিন্তু পড়েছে কি? সারাদিন এতো বিশ্রীরকম ব্যস্ত কোনো কিছুই ঠিক ঠিক মনে থাকছে না দেখছি। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাবার দাঁতটা এখনো পড়েনি; বুঝলেন, ঝুলছে। আমার মেয়ে সকালবেলায় দেখছিলুম, একটা সুতো দাঁতের গোড়ায় বাঁধছিল —ও যা দুষ্টু মেয়ে, বেঁধেই না কখন একটা টান মেরে বসে। ফানি ব্যাপার, অ্যাঁ, বাড়ি থাকলে বেশ হত। (*সকলের উদাসীন মুখের দিক তাকিয়ে*) সরি। যদিও দাঁত একটা ইম্পর্ট্যান্ট . . . যাকগে, চেয়ারম্যান, শান্তা লাহিড়ীর যে ডাইরিটা লেকের কাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে সেটা আনা হয়েছে তো?

চেয়ারম্যান।। হয়েছে।

ইন্সপেক্টর।। থ্যাঙ্কিউ। ডাইরিতেই স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে এই প্রেতটির সঙ্গে মিস লাহিড়ীর একটা সম্পর্ক আছে।

ডাক্তার।। ইন্সপেক্টর, এ সম্পর্কটা কি অবৈধ?

ইন্সপেক্টর।। বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে না; আমাদের শাসনতন্ত্রে এবং কোন দেশের আইনে, আনফরচুনেটলি, ভূতের সঙ্গে রিলেশন নিয়ে কোনও নির্দেশ নেই। অথচ আমরা আজ বেশ বুঝতে পারছি, শাসনতন্ত্রে প্রেতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কোন নির্দেশ থাকার দরকার ছিল।

[*মল্লিক এসে দাঁড়ায়*]

চেয়ারম্যান।। তাহলেই ভেবে দেখুন, আমরা কতো অসহায়, আইন কতো অসম্পূর্ণ।

ইন্সপেক্টর।। তাই আমরা একটা বৈপ্লবিক কাজ করতে যাচ্ছি। যা আইনে নেই তাকে আইনের অন্তর্ভূক্ত করতে যাচ্ছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করছি। আমার বাবাও একজন —(*সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে*) যাকগে।

ডাক্তার।। কিন্তু যথার্থই কি আপনার ভূতে বিশ্বাস আছে?

ইন্সপেক্টর।। প্রমাণ ছাড়া কি করে বিশ্বাস করব? যদি স্পিরিট থেকে থাকে সে এক্ষুণি প্রমাণ দিক, আমি গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করব। আমি সকলের সামনে অশরীরী প্রেতাত্মাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।

মল্লিক।। ভূত প্রমাণ দেবে?

চেয়ারম্যান।। নিশ্চয়ই। অবশ্য যদি থেকে থাকে।

ডাক্তার।। কিভাবে?

চেয়ারম্যান।। (*একটু ভেবে*) চোখের সামনে এসে দাঁড়াক।

চেয়ারম্যান।। সেটা একটা বীভৎস ব্যাপার হবে না? মানে মুখোমুখি ভূতকে দাঁড়াতে বলা কি রিস্কি নয়? বিশেষত প্রেত সম্পর্কে আমরা যখন নিতান্তই কম জানি। না কি?

ইন্সপেক্টর।। মন্দ বলেন নি। তাহলে ধরুন আমি এক, দুই, তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা চড়ুইপাখি উড়ে আসুক। অর্থাৎ ভূত নিজে না এসে একটা নিরীহ প্রমাণ দিক আর কি। ব্যাপারটায় কাজও হবে। অথচ বেশ সেফ্। বিপদে আমার মাথাটা কেমন কাজ করে দেখলেন? তাহলে গুনছি—এক দুই তিন!

[*ঘরটা মুহূর্তকাল স্তব্ধ। হঠাৎ টেবিলের কোণা থেকে চেয়ারম্যানের লাঠিটা শব্দ করে পড়ল। শব্দটা চেয়ারম্যান আর ইন্সপেক্টর-এর মুখে ভয় মেশা প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলল*]

চেয়ারম্যান।। প্রমাণিত হল স্পিরিট আছে।

ডাক্তার।। কিরকম?

চেয়ারম্যান।। ভূত আরও নিরীহভাবে নিজের পছন্দমত একটা ঘটনা ঘটিয়ে তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিল। চড়ুইপাখির থেকে লাঠি ফেলে দেওয়া তার বেশি পছন্দ হয়েছে।

ইন্সপেক্টর।। ব্যালান্সের অভাবে লাঠিটা সহজেই পড়ে যেতে পারে।

চেয়ারম্যান।। না, না, লাঠি পড়ার শব্দটা কেমন যেন . . . মানে অন্যরকম শোনাল না? দেখুন, আমি কিন্তু এর মধ্যে একটা অলৌকিক কিছুর গন্ধ পাচ্ছি।

ইন্সপেক্টর।। আপনার ঘ্রাণশক্তি দেখছি বেশ প্রবল। ফর ইয়োর স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শন, আরো স্পষ্ট প্রমাণের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। যদি স্পিরিট থেকে থাকে তাহলে সে সবুক্তগীনের মূর্তিতে এখানে এসে হাজির হোক্।

মল্লিক।। সবুক্তগীন, সেই ইতিহাসের সবুক্তগীন?

ইন্সপেক্টর।। ইয়েস। এবার? ভূতের অবস্থাটা ভাবুন! এতো শর্ট টাইমে মেকআপের সুযোগ অবধি পাবে না। তাছাড়া চোখের সামনে সবুক্তগীনকে দেখলে আমরা বোধহয় তেমন ভয়ও পাব না। হি ওয়াজ ভেরি কাইণ্ড-হার্টেড। মনে নেই, হরিণশিশুটাকে কী দারুণ ভালবেসেছিলেন ভদ্রলোক। আমি গুনছি—ওয়ান, টু, থ্রি—

[*সঙ্গে সঙ্গে একটি নেপথ্য কণ্ঠস্বর শোনা যায়—সকলে চমকে ওঠে।*]

নেপথ্যে।। আসতে পারি?

চেয়ারম্যান।। সবুক্তগীন!

ডাক্তার।। পরিষ্কার বাংলা শিখেছে।

ইন্সপেক্টর।। (*ভীত কণ্ঠে*) ভয়ের কিছু নেই চেয়ারম্যান। ভয়ের কিছু নেই। সবুক্তগীন ওয়াজ এ ভেরি কাইণ্ড-হার্টেড জেন্টলম্যান। আমরা গেস্টকে নিশ্চয়ই ডাকব। কি বলেন? (*রিভলভারে হাত রেখে*) আসুন।

[*একজন মাঝবয়সী অত্যন্ত শৌখিন পোশাকের লোক ঢুকল*]

ইন্সপেক্টর।। আপনি? মানে কি নাম আপনার?

সর্বেশ্বর।। আজ্ঞে আমার নাম সর্বেশ্বর হাটি (*দরজার দিকে তাকিয়ে*) এস হে মাখন। (*মাখন ঢুকল। সরল গোলগাল চেহারা। হাতে বড় টর্চ*)

মল্লিক।। আপনারা—?

[*সর্বেশ্বর বিনীতভাবে ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে ইন্সপেক্টরকে দেয়*]

ইন্সপেক্টর।। (*কাগজ এবং ওদের দুজনের দিকে দুএকবার দ্রুত তাকিয়ে*) I see. বসুন। এরা আমাদের কিছু ইনফরমেশন দেবার জন্য গোপনভাবে অ্যাপয়েন্টেড।

ডাক্তার।। আমরা ভেবেছিলাম হরিণশিশু সমেত সবুক্তগীন।

মাখন।। কিছু বললেন?

সর্বেশ্বর।। মাখনের কানে একটু ইয়ে মানে গোলমাল আছে। লজ্জার কিছু নেই মাখন, যন্তরটা কানে লাগাও।

[*মাখন অডিওফোনটার প্লাগ কানে পরে লাজুক হেসে চারদিক তাকায়।*]

চেয়ারম্যান।। আপনার একটা চোখেও বোধহয় কিছু গোলমাল রয়েছে।

সর্বেশ্বর।। আজ্ঞে স্যার, চোখটা বেমক্কা কেমন একটা চোট খেয়ে গেল। মাঠে লুকিয়ে মিস্ লাহিড়ীকে একটু নিরীক্ষণ করছিলুম। ছোট ছোট ছেলেরা খেলছিল, হঠাৎ বলটা ধাঁ করে এসে আলটপ্কা ডান চোখটায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখছেন তো, ঠুলিটা পরে আছি। মোটে আলো সইছে না, দিনের আলো তো দূরের কথা, চাঁদের আলোর দিকে তাকালেও মণিটায় যেন ছুঁচ ফুটতে থাকে।

মাখন।। ছেলেটার জম্পেস টিপ আছে বল, হাটিদা,—নাকে নয়, গালে নয়, কপালে নয়, ঠিক মণিটা কেমন বেমালুম চমকাল! তুরূপ ছেলে আছে একখানা, বল?

সর্বেশ্বর।। থাম। বিজ্ঞজনের মাঝে কথাটা একটু কম বলবে।

ইন্সপেক্টর।। হ্যাঁ, আপনাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা এখানে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মাখন।। কৌটোটা দাও।

সর্বেশ্বর।। কি হবে?

মাখন।। পান সাজব।

সর্বেশ্বর।। ধর।

ইন্সপেক্টর।। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের মিটিংটা শুরু করা যাক। মল্লিকবাবু, আপনি আজেকর মিটিং-এর উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন। স্টার্ট।

মল্লিক।। (*উঠে*) দেখুন, সত্যি কথা বলতে গেলে এই প্রেত-অনুসন্ধানের ব্যাপারটা আমার ভালই লাগে না—অনেক কিছুই আমার ভাল লাগে না। কিন্তু এই বিশ্রী ব্যাপারটার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা, আমি শান্তা লাহিড়ীর কথা বলছি, জড়িয়ে পড়ায় কেন জানি না একটা দায়িত্ব বোধ করছি। যেকোন মহিলাকে অবাঞ্ছিত দুর্ভোগ থেকে বাঁচানো আমি কর্তব্য বলে মনে করি। আর এই ভেবেই আপনাদের অ্যাডমিনস্ট্রেশনের সঙ্গে যোগ

দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান মশাই অনেক ভাল বলতে পারবেন। (*চেয়ারম্যানকে*) আপনি কিছু বলুন।

চেয়ারম্যান।। (*সলজ্জ এবং পুলকিত ভঙ্গিতে*)আবার আমি কেন . . . দেখ দেখি...(*গলা খাঁকারি দিতে থাকে। ডাক্তার পাইপে আগুন ধরায়।*)

ডাক্তার।। কই হে, শুরু কর চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান।। (*উঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে*) বন্ধুগণ।

ইন্সপেক্টর।। বন্ধুগণ ইত্যাদিতে সময় চলে যাচ্ছে, মোদ্দা সমস্যাটা বলুন।

চেয়ারম্যান।। সমস্যাটা কিছু নয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে—আমাদের দিন ফুরিয়ে এল। যে চন্দ্রসূর্যের নিচে আমরা, মানে—

ডাক্তার।। সংকটটা বল চেয়ারম্যান, চন্দ্রসূর্য মাথায় রেখে সংকটটা বলে ফেল।

চেয়ারম্যান।। সংকটটা কিছু না। মোদ্দা কথা হচ্ছে—আমাদের দিন ফুরিয়ে এল। না, না, এটা তো বলা হয়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে—এই ঝিলের ধারে যে ছায়ামূর্তি অশরীরীর আবির্ভাব ঘটেছে, তার একটা অশুভ প্রভাব এ-অঞ্চলে ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টি করেছে। রাত্রে অনেকে ঘুমোতে ভয় পাচ্ছে—অদ্ভুত ধরনের সব স্বপ্ন দেখছে। ছেলেমেয়েদের কথাবার্তায়, হাবেভাবে, কাজেকর্মে পাপপুণ্য কেমন যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে।

ডাক্তার।। এ যে নির্বাচনী বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল।

চেয়ারম্যান।। হ্যাঁ, কিছু বলছ?

ডাক্তার।। না কিছু না। তুমি বলে যাও।

চেয়ারম্যান।। অ। যাকগে, মোদ্দা কথা হচ্ছে, মেয়েরা বড় বেশি মাত্রায় 'লভ' করছে। আর অভিভাবকদের মূল্যবান নিষেধ না শুনে টুপটাপ বিয়েও করে ফেলছে।

মল্লিক।। কিন্তু প্রেম একটা মহৎ জিনিশ, একটা বিরাট কিছু। ভালবেসে কেউ যদি বিয়ে করে সেতো একটা পবিত্র ঘটনা। এতে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নেই?

চেয়ারম্যান।। (*স্মিতহাস্যে*) মল্লিকবাবুর রক্ত তরুণ, এই বিষবৃক্ষের পরিণাম তিনি বুঝবেন না। বয়স হোক, কথা ঘুরবে। ঘুরবেই। যাক্‌গে একটা কথায় আমরা সকলেই একমত যে এই প্রেতের বিপদজ্জনক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের সতর্ক হতে হব, সংঘবদ্ধ হতে হবে, সাহসী হতে হবে। নমস্কার।

ইন্সপেক্টর।। এবার আমরা (*সর্বেশ্বর ও মাখনকে*) আপনাদের দু' একটা কথা জিগ্যেস করব। আপনারা আজকের আলোচনার ভূতটাকে দেখেছেন?

সর্বেশ্বর।। বিলক্ষণ।

ডাক্তার।। আচ্ছা, লোকটি প্রেত হবার আগে, মানে জীবিত অবস্থায়—আত্মহত্যার জন্য সাঁকো থেকে যখন ঝিলের জলে ঝাঁপ দেয় তখন আপনারা ব্যাপারটা দেখেছিলেন?

সর্বেশ্বর।। লজ্জা দিলেন স্যার, আমরা দেখব না? আমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে এক ইঞ্চি হাওয়া অব্দি পাস করতে পারবে না।

মাখন।। ট্রেন থেকে ঐ অচেনামত লোকটা নামতেই তো—

সর্বেশ্বর।। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক পিছু নিলুম।

মাখন।। লোকটা গিয়ে চুপচাপ ঝিলের সাঁকোটার সেই উঁচুতে গিয়ে দাঁড়াল।

সর্বেশ্বর।। মুখটা কেমন থমথমে। তারপর হঠাৎ দু' হাত তুলে আচমকা ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাখন।। আর উঠল না।

সর্বেশ্বর।। মনে পড়ে মাখন, জলে পড়ার সেই শব্দ?

মাখন।। হ্যাঁ, নিঃশব্দে পড়ে গেল।

ইন্সপেক্টর।। আপনি বলছেন শব্দ হল, উনি বলছেন নিঃশব্দে, কি করে হয়?

সর্বেশ্বর।। হয় স্যার, মাখনের কানে তো তখন যন্ত্র ছিল না।

চেয়ারম্যান।। এটা অবশ্য যুক্তিপূর্ণ কথা, কি বলেন?

মল্লিক।। লোকটি জলে ডোবার পর আপনারা কি করলেন?

সর্বেশ্বর।। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা নোট করে নিলুন।

ডাক্তার।। কী আশ্চর্য, আপনারা তুলবার কোনও চেষ্টা করলেন না?

সর্বেশ্বর।। সে কি বলছেন স্যার, কেবল রিপোর্ট নেবার অর্ডার রয়েছে আমাদের উপর, আর সব তো ডিউটির বাইরে। ডিউটির বাইরে গিয়ে চাকরিটা খোয়াতে পারব না, স্যার।

মাখন।। আমি কিন্তু স্যার, না, না, মনের ভুলে ভয়ে কেমন আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছিলুন।

সর্বেশ্বর।। আর তাইতে অবশ্য দু'চার জন লোক ছুটে এল। তুলবাব চেষ্টাও করেছিল, খুঁজে পাওয়া গেল না।

মল্লিক।। একবারে খুঁজে পাওয়া গেল না!

মাখন।। পাওয়া যাবেই বা কেমন করে স্যার। মানুষ মরেই তো ভূত হয়। আর ভূত মানেই তো স্যার ছায়া। বোধহয় ছায়াটা ঐ ঝিলের জলে গুলে গিয়েছিল, তাই না হাঁটিদা?

ডাক্তার।। ছায়াটা জলে গুলে গেল, আপনি দেখেছেন?

মাখন।। দেখিনি, মানে—

ইন্সপেক্টর।। আচ্ছা আহাম্মক তো! ছায়াটা যদি জলে গুলেই যাবে, তাহলে প্রেতকে আমরা ঝিলের ধারে দেখতে পাচ্ছি কি করে। তার মানে ছায়াটা গুলে যেতে পারে না, তা ছাড়া ছায়া নিশ্চয়ই জলে ভেজে না, কি বলেন?

চেয়ারম্যান।। নিশ্চয়ই—একেবারে বিজ্ঞানের কথা। মানে, কি বলব, ছায়াটা হচ্ছে গিয়ে, ঐ যাকে বলে ওয়াটারপ্রুফ, তাই না?

মল্লিক।। আপনারা রিপোর্টে লিখেছেন, ঐ প্রেতের প্রভাবে এখানে নানারকম আপত্তিকর ঘটনা ঘটছে। সেটা কি রকম?

ডাক্তার।। তাছাড়া মিস্ লাহিড়ীর সঙ্গে প্রেতের সম্পর্কের ফলে চারদিক বিষাক্ত হয়ে উঠছে—আপনাদের এই পয়েন্টাও বুঝিয়ে বলুন।

চেয়ারম্যান।। হ্যাঁ, মানে আমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দিন, তাইতো? বিষাক্ত তো হবেই, কিন্তু কিভাবে, কেন? এটা বলুন।

সর্বেশ্বর।। এটা স্যার আপনাদের বোঝাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা হবে না স্যার? প্রেতের সঙ্গে একজন জ্যান্ত মেয়েছেলের প্রতি সন্ধ্যায় মাখামাখি, এসব দেখেশুনে কি আর ঘরে ঘরে পুজোর ঘণ্টা বেজে উঠবে, স্যার? এখন তো দেখছি, দুটো ছেলেমেয়ে

ওদের দেখাদেখি একটু মিষ্টি করে এখানে ওখানে বসছে। দু'দণ্ড নরম করে কথা বলেই হঠাৎ ফিক করে মেয়েটি হেসে ফেলছে—মানেটা নিশ্চয়ই বোঝাতে পারলুন, স্যার।

মল্লিক।। আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত নোংরা!

সর্বেশ্বর।। কিন্তু স্যার ওদের প্রভাবে যেসব ঘটে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, তা তো কেচে ইস্তিরি করা কিছু নয়। দেখেছেন তো, প্রেতের ছায়া লেগে ঐ দিদিমণিটি দিনকে দিন কেমন হয়ে উঠছেন। ইস্কুলের মেয়েদের মাথায় উনি সব উদ্ভট উল্টোপাল্টা সর্বনাশা চিন্তাভাবনা ঢুকিয়ে যাচ্ছেন।

মাখন।। মেয়েরা তো বাইরেই আছে, ডেকে দু' একটা কোশ্চেন করুন, দেখবেন কেমন লঙ্কাপোড়া উত্তর।

ইন্সপেক্টর।। ঠিক আছে, মিস্ লাহিড়ীকে আমি ডাকছি।

মল্লিক।। আমি ডেকে আনছি।

ডাক্তার।। আপনারা এবার যেতে পারেন।

সর্বেশ্বর।। দিদিমণির ডায়েরিটা স্যার, সরিয়ে এনে জমা দিয়েছিলুন, পেয়ে গেছেন বোধহয়?

ইন্সপেক্টর।। পেয়েছি। এদিক দিয়ে যান।

সর্বেশ্বর।। এস হে মাখন।

মাখন।। (*উঠতে গিয়ে বসে পড়ে*) দেখলে তো পা-টায় কেমন ঝিনঝিন্ ধরে গেল। পেন্সিল আছে?

ডাক্তার।। পেন্সিল?

মাখন।। হ্যাঁ, কানে পরব, পা-টা ছেড়ে যাবে।

সর্বেশ্বর।। জ্বালালে। ধর।

[*সর্বেশ্বর চলে যায়, মাখন ঢুকেই চলে আসে*]

মাখন।। আরি ব্বাস!

সর্বেশ্বর।। কি হল?

মাখন।। কিছু না গো হাটিদা, দ্যাখ দ্যাখ, তোমার ছায়াটা কেমন বেঁকে আছে।

সর্বেশ্বর।। ভয়ে যে একেবারে সেঁধিয়ে গেলে, এস।

[*দুজনে বেরিয়ে যায়*]

ইন্সপেক্টর।। আমার ফাইলটা?

চেয়ারম্যান।। এই যে। সব সিরিয়ালি সাজানোই আছে।

[*দুজনে দেখতে থাকে। শান্তাকে নিয়ে মল্লিক ঢোকে*]

মল্লিক।। আসুন। বসুন মিস্ লাহিড়ী। (*শান্তা বসে*)

ইন্সপেক্টর।। বসুন, বসুন। আপনাকে কি কোথাও দেখেছি?

শান্তা।। সে তো আপনিই বুঝবেন।

ইন্সপেক্টর।। রাইট (*একটা ফাইল টেনে নিয়ে*) আপনার নাম?

শান্তা।। শান্তা লাহিড়ী।

ইন্সপেক্টর।। এখানকার স্কুলে কতোদিন হল এসেছেন?

মল্লিক।। সাত মাস হবে।

ইন্সপেক্টর।। উনি উত্তর দিচ্ছিলেন মল্লিকবাবু। (*শান্তাকে*) কতদিন হল এসেছেন?

শান্তা।। সাত মাস।

ইন্সপেক্টর।। আপনার নিজের নামটা আপনার কেমন লাগে?

শান্তা।। আপনার এ প্রশ্নের ধরণ আমি বুঝতে পারছি না।

ইন্সপেক্টর।। আমিও না। দুম্ করে জিগ্যেস করে ফেললাম। ভুলে যান, কেমন? পড়াতে কেমন লাগে? এটাই জানতে চেয়েছিলাম। কেমন লাগে—পড়াতে?

শান্তা।। ভাল।

ইন্সপেক্টর।। আপনি উদ্ভিদবিদ্যা পড়ান মেয়েদের, তাইতো?

শান্তা।। হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর।। কথা হচ্ছে, আপনার টিচিং নাকি বিপজ্জনক, এরকম অভিযোগ এসেছে। আমরা এ-ব্যাপারে দু'একটা প্রশ্ন করব।

মল্লিক।। কিন্তু স্পিরিট সম্পর্কিত আজকের মিটিং-এ এ-জাতীয় প্রশ্ন একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে না?

চেয়ারম্যান।। আমরা প্রাসঙ্গিক করে তুলব।

ইন্সপেক্টর।। রাইট।

শান্তা।। আমার মনে হয়, আপনারা নিজেদের অধিকারের বাইরে থেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন।

ইন্সপেক্টব।। হতে পারে। না, হতে পারে না। আমাদের অ্যাড্‌মিনস্ট্রেশন আপনাকে এ প্রশ্নের অধিকার রাখে।

ডাক্তার।। শান্তাকে আমি জানি, অত্যন্ত সুন্দর মেয়ে।

ইন্সপেক্টর।। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্ব আমাদেব আলোচ্য নয়, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার।। আমি ওর চরিত্রের সৌন্দর্যের কথা বলছি।

ইন্সপেক্টর।। চরিত্র নিয়েও আমাদের আলোচনা নয়, ওঁর শিক্ষা, শিক্ষাপদ্ধতি . . .

মল্লিক।। চরিত্র আর সৌন্দর্যই কিন্তু খাঁটি শিক্ষা।

ইন্সপেক্টর।। (*বিরক্ত হয়*) কি আশ্চর্য! খাঁটি-ভেজাল বুঝিনে মশাই। ইস্কুলের শিক্ষা নিয়ে আমার প্রশ্ন। মিস লাহিড়ী, বাইরে আপনার মেয়েরা আছে?

শান্তা।। আছে।

ইন্সপেক্টর।। আপনার ক্লাসের একজন ভাল মেয়েকে ডাকুন তো।

শান্তা।। ওরা সবাই ভাল।

ইন্সপেক্টর।। বেশ, যে কোন একজনকে ডাকুন।

শান্তা।। (*ছাদের আলসের কাছে দাঁড়িয়ে*) সীমা, একবার এখানে এস তো (*একটু পরে সীমা এসে দাঁড়াল*)

চেয়ারম্যান।। এস, বস।

সীমা।। ঠিক আছে।

চেয়ারম্যান।। কি নাম তোমার?

সীমা।। সীমা সেন।

ইন্সপেক্টর।। আচ্ছা সীমা, তোমাদের উদ্ভিদবিদ্যা কে পড়ান?

সীমা।। শান্তাদি।

ইন্সপেক্টর।। পড়তে কেমন লাগে?

সীমা।। খুব ভাল।

ইন্সপেক্টর।। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারবে?

সীমা।। হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর।। ডাক্তার, আপনি সায়ান্সের লোক, আপনারই প্রশ্ন করা উচিত।

ডাক্তার।। তুমি সীমা? আচ্ছা সীমা, বলতো, হোয়াট ইজ এ ট্রি? গাছ কি?

সীমা।। গাছ হচ্ছে একজন বলবান মানুষের মত, মাটিতে শক্ত পা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছ—

ডাক্তার।। আচ্ছা গাছ সম্পর্কে অন্য কিছু বলবে?

সীমা।। গাছেদের সমাজ সম্পর্কে বলব?

ডাক্তার।। বল।

সীমা।। গাছ সামাজিক প্রাণী। গাছেদের রাজ্যে কাঠুরেরা হচ্ছে খুনী। কাটাগাছ মৃতদেহ, কাঠঠোকরা পাখিগুলো হল চারপাশের বিশ্রী সব শত্রু।

ডাক্তার।। গুড্।

ইন্সপেক্টর।। গড়গড় করে কিসব উদ্ভট উত্তর দিয়ে গেল, জিভে একটু হোঁচট পর্যন্ত খেল না।

ডাক্তার।। একটা মানে কিন্তু হচ্ছে।

মল্লিক।। এ ছাড়া কি-বা উত্তর হবে।

ইন্সপেক্টর।। কি বলছেন আপনারা। মেয়েটাতো জিরো পাবে পরীক্ষায়—বিগ জিরো।

শান্তা।। জিরোই আমার প্রাইভেট ক্লাশের সব থেকে বেশি নম্বর। কারণ জিরোই ইনফিনিটির কাছাকাছি।

ইন্সপেক্টর।। আপনার প্রাইভেট ক্লাশের এই শিক্ষা নিশ্চয় পরীক্ষার খাতায় চলবে না?

শান্তা।। পরীক্ষার খাতায় ওরা অন্যরকম কিছু লিখে নম্বর তুলবে। খাতায় ভাল নম্বরই পাবে ওরা।

ইন্সপেক্টর।। হরিব্‌ল! আচ্ছা, ডোণ্ট মাইণ্ড ডক্টর। আমিই প্রশ্ন করছি। সীমা বলতো, হোয়াট ইজ এ ফ্লাওয়ার?

সীমা।। ইংরেজিতে বলব?

ইন্সপেক্টর।। বল।

সীমা।। দি ফ্লাওয়ার ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট বিউটিফুল আসপেক্টস অফ নেচার।

ইন্সপেক্টর।। এ পর্যন্ত তো ভালই বলেছে। আর কিছু বলবে ফুল সম্পর্কে?

সীমা।। ইট ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন অফ দি বিউটি অফ দি সেক্সুয়াল প্রসেস।

ইন্সপেক্টর।। স্ক্যাণ্ডালাস! কচি কচি জিভ থেকে যেন বোমা গড়িয়ে পড়ছে! কী ভয়ংকর অসামাজিক উত্তর।

ডাক্তার।। সীমা, ফুল সম্পর্কে আর কিছু বলবে?

সীমা।। মায়ের গর্ভে যে ভ্রূণ থাকে, প্রথম এক অবস্থায় তা চার-পাপড়ি ফুলের মত দেখতে। এই ফুলটাই গন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে আমাদের স্বভাবের মধ্যে মিশে যেতে থাকে।

ইন্সপেক্টর।। থাম, যথেষ্ট হয়েছে। (*শান্তাকে*) আপনার ছাত্রীটিকে বিদেয় করুন মশাই, খানিকক্ষণ এভাবে শুনতে থাকলে গোলাকার পৃথিবী আমার কাছে হকিস্টিকের মতো মনে হবে। গড়! আমি কোথায়?

সীমা।। আপনি মাধ্যাকর্ষণের ফলে-

ইন্সপেক্টর।। থাম! (*শান্তাকে অসহায়ভাবে*) প্লিজ্, ওকে যেতে বলুন।

শান্তা।। সীমা, তুমি যাও। ওদের সঙ্গে স্কুলের গাড়িতে বাড়ি চলে যাবে। (*সীমা চলে গেল*) আমিও চলে যেতে পারি বোধহয়?

ইন্সপেক্টর।। আর একটুকাল থাকতে হবে আপনাকে। আপনার সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ দুটো। প্রথমত এখানকার স্পিরিটের সঙ্গে আপনার রহস্যময় যোগাযোগ। দ্বিতীয়ত, আপনি উদ্ভট আপত্তিকর শিক্ষায় মেয়েদের তথা এ অঞ্চলের শিক্ষার বনিয়াদে ধ্বংস ডেকে আনছেন। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

শান্তা।। পারি।

ইন্সপেক্টর।। পারেন? বেশ, এটা আপনার ডাইরি?

শান্তা।। হ্যাঁ, ঝিলের কাছ বসেছিলুম, হঠাৎ কেউ তুলে নিয়েছিল।

ইন্সপেক্টর।। যাক, অন্তত আমাদের হাতে এসেছে। খোয়া যায় নি। মল্লিকবাবু চুয়াল্লিশ, না তেতাল্লিশ, না চুয়াল্লিশ পাতার লাল দাগ দেওয়া জায়গাটা প্লিজ পড়ুন তো (*শান্তাকে*) আপনি নিজে কি বলছেন, শুনুন।

মল্লিক।। উনি এখানে লিখেছেন, (*পড়তে লাগল*) রাত বারটা। বারান্দার জ্যোৎস্না আর অন্ধকার মিলেমিশে যে রহস্য, ও আমার কাছে তেমনি এক বিস্ময়। আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ও আমাকে একটু একটু করে বুঝতে পারছে। ওর চিন্তা মৌলিক এবং অভিনব। ওর সঙ্গে মিলে আমি অনেক কাজ করতে পারব। এ আমার এক স্বপ্ন। ওকে আমার বড় অসহায় লাগে। এক-এক সময় এতো রেগে যায়! আমাকে কিছু বলতে চায়, আমি বুঝি। কি বলবে? আমরা দুজনে মিলে এ অঞ্চলটাকে দারুণ বদলে দেব, তারপর শহর ছাড়িয়ে গোটা দেশটা।

চেয়ারম্যান।। অ্যাই! এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, প্রেতাত্মার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। এবং আরো ভয়ংকর কথা, যুক্তভাবে আপনারা দেশটাকে বদলে একটা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করছেন।

ইন্সপেক্টর।। (*শান্তাকে*) আপনার কিছু বলার আছে?

শান্তা।। ডাইরিতে আমার ব্যক্তিগত কথা সকলের সামনে চেঁচিয়ে পড়ায় খারাপ লেগেছে।

ইন্সপেক্টর।। অ। এ ছাড়া আর কিছু বলবার নেই?

শান্তা।। না।

ইন্সপেক্টর।। এ অবস্থায় আপনার চাকরিটা কিন্তু হারাতে হবে। একজন প্রেতকে আপনি জীবনের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছেন—ইজ্ ইট পসিবল? প্রেত, কেবল প্রেত।

ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মানেই জীবনকে দূষিত করা। আমরা ঠিক এই মাঝপথে বাধা দেব। আমি আজই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে সমস্ত ডিটেলস্ শুদ্ধু চিঠি দিচ্ছি।

শান্তা।। যা খুশি।

ডাক্তার।। ইন্সপেক্টর, শান্তার অপরাধটা প্রমাণিত হবার আগেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা কি আইনসঙ্গত হবে?

মল্লিক।। আমরা কিন্তু বড় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

ইন্সপেক্টর।। অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শান্তা।। আমি যেতে পারি?

ডাক্তার।। শান্তা, তুমি এখানে আর একটু থাক। দু'একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ইন্সপেক্টর।। ঠিক আছে, আমরা বরঞ্চ চলি। মিটিং আজকের মত শেষ করছি তাহলে। কালকে আমরা এখানে আবার মীট করছি।

[*দ্রুত রাধাগোবিন্দ ঢুকল। হাতে পেন্সিল ও নোটবুক*]

রাধাগোবিন্দ।। আপনারা চলে যাচ্ছেন স্যার?

ইন্সপেক্টর।। হ্যাঁ, যাচ্ছি।

রাধাগোবিন্দ।। স্যার, আমাকে যেখানে লুকিয়ে নোট নিতে বলেছেন, সেটা স্যার সানফ্লাওয়ার, সূর্যমুখী—

ইন্সপেক্টর।। সানফ্লাওয়ার যে সূর্যমুখী সেটা আমি জানি। তোমাকে অনুবাদ করে বোঝাতে হবে না।

রাধাগোবিন্দ।। অনুবাদ করিনি স্যার, ফুল স্যার ফুল, অনুবাদ করা শক্ত। সানফ্লাওয়ারগুলো ডিসটার্ব করছে স্যার।

ইন্সপেক্টর।। চোখের সামনের ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেল, আর ডিসটার্ব করবে না। (*রাধাগোবিন্দ চলে যাচ্ছিল*) আর শোন, নজরটা ফুলের রঙ দেখে ঘোলা করে রেখ না, চাকরিটা পাকা করতে হলে নজরটাকেও পাকা করতে হয়— না হলে পরে সূর্যমুখী নয়, ধুতরো ফুল দেখবে যাও।

রাধাগোবিন্দ।। (*বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে*) স্যার।

ইন্সপেক্টর।। আঃ। আবার কি হল?

রাধাগোবিন্দ।। কিছু হয়নি স্যার, একটা লেটার মানে চিঠি—

ইন্সপেক্টর।। ফের অনুবাদ করছ?

রাধাগোবিন্দ।। অনুবাদ করিনি স্যার। আপনার বাড়ি থেকে আর্দালি দিয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর।। (*চিঠিটা নিয়ে*) ঠিক আছে। (*খুলতে যায়—*)

রাধাগোবিন্দ।। (*বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে*) স্যার—

ইন্সপেক্টর।। (*বিরক্ত*) আঃ!

রাধাগোবিন্দ।। আমি চলে যাচ্ছি স্যার।

ইন্সপেক্টর।। যাও। (*রাধাগোবিন্দ চলে যায়। ইন্সপেক্টর চিঠি পড়ে উদ্ভাসিত মুখে*) গুড নিউজ। মাধুরী, আমার স্ত্রী লিখেছে, বুঝলেন, বারটা বেয়াল্লিশে আমার বাবার দাঁতটা পড়ে গেছে—সেই যেটা ঝুলছিল। চলুন।

*[দূর থেকে একটা বিউগিলের
শব্দ বাজতে লাগল]*

মল্লিক ।। আপনারা একটুকাল দাঁড়ান। শব্দটা শুনলেন? আমার যে কাকাতুয়াটা আজ মারা গেছে ওকে এইমাত্র মাটি চাপা দেওয়া হোল। আসুন, আমরা একমিনিট নীরবতা পালন করছি।

*[মল্লিক মাথা নোয়াল, ধীরে ধীরে সকলে।
মল্লিক একটু বাদে মাথা তুলল]*

চলুন।

*[চলে গেল ওরা। শান্তা তাকিয়ে থাকল ঐ
দিকে। ডাক্তারের মুখে একটা হাসি
জাগল, অস্পষ্ট। শান্তা কেমন
বিষণ্ন, অনেকটা চিন্তিত]*

ডাক্তার ।। শান্তা, তোমার ডাইরি আমাকে পড়তে হয়েছে। ইচ্ছে না থাকলেও কমিটির নির্দেশে পড়তে বাধ্য হয়েছি। এখানকার স্পিরিটের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছে। কেমন আকর্ষণ বোধ করছি বোধ হয়। তুমি যদি চাও তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমি মধ্যস্থ হতে পারি। আমি একজন ডাক্তার। মাঝখানে থাকাই আমার নিয়তি। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানেই কেবল আমার ডাক পড়ে।

শান্তা ।। আপনাকে আমার বড় আপন লাগে, ডাক্তারবাবু। হয়ত আপনিই কেবল আমাকে বুঝবেন।

ডাক্তার ।। বুঝব কিনা জানি না। আমি বোঝা আর না বোঝার মাঝখানের মানুষ। আমি যেন দিন আর রাত্তিরের মধ্যে একটা অদ্ভুত জায়গায় অনন্তকাল হাঁটছি। আচ্ছা, শান্তা--

শান্তা ।। বলুন।

ডাক্তার ।। সন্ধ্যেবেলাটা তোমার কেমন লাগে?

শান্তা ।। ভাল, বেশ ভাল।

ডাক্তার ।। কেন ভাল?

শান্তা ।। সন্ধ্যেবেলাটা এতো ঠাণ্ডা! ছোটবেলায় সন্ধ্যে হলেই সন্ধ্যামণি ফুল তুলতাম। আকাশময় এক এক করে তারা ফুটতে দেখতাম। মনে হত নরম আলোর পা ফেলে জ্যোৎস্না আসছে।

ডাক্তার ।। এতো ছোটবেলার কথা। আর এখন?

শান্তা ।। ছোটবেলার আকাশটা কিন্তু এখনও আছে।

ডাক্তার ।। আর ছোটবেলার মন?

শান্তা ।। সন্ধেবেলার মনটা আজও ছোটবেলার মন।

ডাক্তার ।। প্রেত কখন আসে শান্তা?

শান্তা ।। সন্ধেবেলা। কিন্তু ও প্রেত নয় ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ।। যারা দিনের আলোতে আসে না, সন্ধ্যের জন্য বসে থাকে তারাই প্রেত। শান্তা, প্রেত মানে আলোর ভয়।

শান্তা ।। ও আর প্রেত থাকবে না।

ডাক্তার।। সন্ধ্যার লেকে ঐ প্রেত বোধহয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শান্তা।। আমি যাব?

ডাক্তার।। না তুমি যাবে না। ও এখানে আসবে।

শান্তা।। ও আসবে না। ও আলো ভয় পায়, মানুষ ভয় পায়, ঘরবাড়িকে ভয় পায়। কেবল ঐ ফাঁকা নির্জন সাঁকোটার ধারে ও দাঁড়াতে ভালবাসে।

ডাক্তার।। তুমি এই খাঁচাটার কাছে দাঁড়াও। ও তোমাকে খুঁজবে, দেখতে পাবে, আকর্ষণ বোধ করবে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে।

শান্তা।। ও আসবে না।

ডাক্তার।। আসবে। মৃত্যুও জীবনের দিকে আসে। নিয়তি।

শান্তা।। ও রেগে যাবে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার।। রাগ ওর স্বাস্থ্য বাড়াবে।

শান্তা।। কিন্তু ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার।। তুমি যাও। ঐ খাঁচাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আমি বলছি, তুমি যাও।

[*শান্তা এগিয়ে গেল। ডাক্তার ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছেন*]

ডাক্তার।। ও আসছে?

শান্তা।। হ্যাঁ।

ডাক্তার।। তোমাকে দেখেছে?

শান্তা।। এখনও দেখতে পায়নি। হয়ত খুঁজছে।

ডাক্তার।। আলোটা নিয়ে যাও। (*শান্তা আলো নিয়ে যায়*) আলোটা বাড়িয়ে দাও।

শান্তা।। কিন্তু আলোতে ওর আতঙ্ক।

ডাক্তার।। আলোকে ভালবাসতে দাও। (*মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ*)

শান্তা।। ডাক্তারবাবু আমাকে দেখেছে।

ডাক্তার।। দেখুক।

শান্তা।। কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার।। তোমার হাতের আলোটা কাঁপছে, তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও।

শান্তা।। ডাক্তারবাবু, ওর চোখদুটো এতো ঠাণ্ডা, ওর ভেতরটা এতো ঠাণ্ডা, আমার তাকালে যেন শীত করে। মনে হয় ও ছুঁয়ে দিলে আমি বরফের পুতুল হয়ে যাব। আমার ভয় করে।

ডাক্তার।। এই শীতের নাম মৃত্যু।

শান্তা।। মৃত্যু এতো ঠাণ্ডা কেন?

ডাক্তার।। উত্তাপ চায় বলে।

শান্তা।। ডাক্তারবাবু, ও আসছে।

ডাক্তার।। আসবেই। (*আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে*)

শান্তা।। আমি ভাবতে পারিনি ও আসবে। ভেবেছিলাম ভীষণ রেগে ফিরে যাবে। ডাক্তারবাবু, ও আসছে।

ডাক্তার।। আসবেই।

শান্তা।। এই পাখির ঘরের দিকে আসছে।

ডাক্তার।। আসবেই।

শান্তা।। এই ঘরের খাঁচাগুলোকে ও ভয় পেত, তবু আসছে।

ডাক্তার।। আসুক।

শান্তা।। ডাক্তারবাবু, ও আসছে . . . ডাক্তারবাবু!

[সমস্ত আলো নিভে চারদিক অন্ধকার। ডাক্তার নিঃশব্দে চলে গিয়েছেন। একটা লাল গোলাকাব আলোর বৃত্তের মধ্যে বিষণ্ণ-দৃষ্টি, অদ্ভুত পোশাক পরা একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সবুজ আলোর বৃত্তে শান্তা]

প্রেত।। আপনি আমাকে এখানে ডাকলেন কেন? এইটুকু দূরত্ব হেঁটে আসতে মনে হল লক্ষ মাইল।

শান্তা।। আমি ডাকিনি, কেবল দাঁড়িয়েছিলাম।

প্রেত।। হাত নেড়ে না ডাকলেও ডাকা হয়।

শান্তা।। ফাঁকা মাঠের থেকে এই জায়গাটা কতো ভাল, তাই না?

প্রেত।। একদম ভাল নয়। দেওয়াল, রঙিন জালের দেওয়াল। কতগুলো দেওয়াল অসংখ্য দিক থেকে ছুটে এসে আমাকে পিষে মেরেছিল, জানেন? আমি কি ভীষণ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু বুকের ভিতরের চিৎকার তো কেউ শোনে না। আমাকে কেউ বাঁচাতে এল না। চারদিকের মানুষ এতো অচেনা! জানেন মানুষ আমাকে না চিনলে আমি আর বেঁচে থাকলুম কোথায়?

শান্তা।। আমি চিনব আপনাকে। এবার দেওয়ালগুলো ঘিরে ধরলে আমি বাঁচাতে চাইব। আপনি আবার কি সুন্দর জ্বলে উঠবেন!

প্রেত।। ছাই জ্বলে না। আমি আর তাপ বুঝতে পারি না।

শান্তা।। আপনাকে বুঝতে হবে। আপনার মত মৃত মানুষ আসলে কেবল অবসন্ন। একটু আশ্রয়, বিশ্বাস, সুখ, উদ্দীপনা আবার আপনাকে ফিরিয়ে আনলে কত ভালো ভাবুন তো। একজন কাউকে চাই তো যে আপনার হাত ধরে চারদিকটা দেখাবে, চেনাবে, মুঠোয় ভরে দেবে, জ্বালিয়ে রাখবে। ফুরিয়ে যাওয়া অভিমানী মানুষের এসব চাই—ফিরে আসার জন্য চাই।

প্রেত।। কে করবে? একজন মৃতের জন্য এতোসব কে করবে?

শান্তা।। যারা বেঁচে আছে তারা।

প্রেত।। আপনি! আপনার চারদিকে প্রাণ। আপনি একটা ফোয়ারার মত অলৌকিক সুন্দর। আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাব। সবকিছু আমাকে মানায় না। আমি অন্ধকার, কেবল অন্ধকার।

শান্তা।। ওই অন্ধকার থেকে একটা ঝলমলে পৃথিবীতে আপনাকে যদি ডেকে আনতে চাই?

প্রেত।। অসম্ভব। আমাব ভয় করে।

শান্তা।। কেন?

প্রেত।। আপনি কি সমস্ত প্রেতদের ফিরিয়ে আনতে চান?

শান্তা।। চাই, ভীষণভাবে চাই। আপনিও সঙ্গে থাকুন। এরকম অনেক প্রেতকে আমরা ফিরিয়ে আনব।

প্রেত।। না, না।

শান্তা।। এ যেন পৃথিবীর সব থেকে রোমাঞ্চকর আর সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার।

প্রেত।। মৃত অ্যাডভেঞ্চার বোঝে না। মৃত শুধু মৃত।

শান্তা।। আপনাকে আমার ঘৃণা হচ্ছে। কে বলেছে আপনি মৃত? মিথ্যে, একদম মিথ্যে।

প্রেত।। মিথ্যে?

শান্তা।। মিথ্যে। নিজেকে আপনি বঞ্চনা করে পাপ করছেন।

প্রেত।। পাপ?

শান্তা।। হ্যাঁ, পাপ। আপনার মৃত্যু মনের একটা অবস্থা। একটা অসহায় অবস্থা।

প্রেত।। আপনি থামুন!

শান্তা।। আপনি এর থেকে উদ্ধার চান। সবাই চায়। আপনার ভেতরটা চায়।

প্রেত।। আপনি থামুন!

শান্তা।। আপনি বুঝতে পারেন না, বুঝতে চান না।

প্রেত।। থামুন, দয়া করে থামুন! আপনাকে আমার ভয় করে!

শান্তা।। আমাকে ভয়? কেন?

প্রেত।। আপনার মুখের মধ্যে কিছু আছে। আপনার চোখে কী যেন ভয়ংকর বিপদ —আমি বুঝতে পারি না।

শান্তা।। সত্যি আপনার ভয় করছে?

প্রেত।। সত্যি।

শান্তা।। কিন্তু মৃতের তো ভয় নেই।

প্রেত।। কিন্তু আমার ভয় করছে। করত না, এখন করছে। না হলে আপনার চিবুকের ঐ শান্ত শাদা রঙ হঠাৎ আমাকে নাড়া দিচ্ছে কেন? আপনার আঙুলগুলো চেনা চেনা লাগছে কেন? আপনি এতোদিনেও আপনার নামটা বলেন নি কেন? আপনার নাম কি?

শান্তা।। আমাকে বিশ্বাস না হলে কেবল নামে কি হবে?

প্রেত।। বলুন, কি নাম আপনার?

শান্তা।। কি হবে?

প্রেত।। বলুন, বলুন আপনি। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে। একটা নাম কেবল শুনতে এতো ভাল লাগবে ভুলে গিয়েছিলাম। দেখুন, আমার আঙুল কাঁপছে, আগে কাঁপত না; বুকের মধ্যে ভারি লাগছে . . . কি যেন ফুলে ফুলে উঠতে চাইছে . . . আপনার নাম আমাকে বলুন।

শান্তা।। আগে আমি, তারপরে তো আমার নাম। আমাদের হস্টেলে একদিন আসুন না, সবাই থাকবে—তখন বেশ একটা উৎসব করে আমার নামটা বলব।

প্রেত।। না আমি কোথাও যাব না। আবার সেই দেওয়াল। চারদিক থেকে দেওয়ালের ক্রুদ্ধ চাপ . . .

শান্তা।। বেশ তাহলে এখানে আসবেন। এই খোলা আকাশের কাছাকাছি।

প্রেত।। না, এখানেও আবার সেই ষড়যন্ত্র! সেই বিচিত্র রঙের ফাঁস, আমি আগের মতো আর ওদিকে এগিয়ে যাব না। আমি যাই।

শান্তা।। শুনুন, শুনুন।

প্রেত।। কিছু চাই না আমি। আপনার নামও আমি শুনতে চাই না। মায়ার মত ঐ নামটা হয়ত আমাকে জড়াবে। বাঁধবে . . . হা ঈশ্বর, আবার সেই বন্ধন . . . বন্ধনের জীবন . . . আমি যাই...(*ধীরে ধীরে চলে যায়*)

শান্তা।। (*ছুটে গিয়ে*) শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন, আমার নাম শান্তা, শান্তা।

[*সমস্ত আলো নিভে গেল। একটা তীব্র বাতাসের শব্দ জেগে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে দ্রুত পর্দা নামে।*]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[*পূর্ব দৃশ্যপট। মল্লিক বায়নোকুলার চোখে দূরে কিছু দেখছে। শান্তা ঢুকেই কোণটায় স্থির দাঁড়াল। ওর মুখটা শক্ত*]

শান্তা।। মল্লিকবাবু।

মল্লিক।। আরে আপনি? বসুন, বসুন।

শান্তা।। আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম। এখানে আছেন শুনে চলে এলাম। মানে আসতে বাধ্য হলাম।

মল্লিক।। কি ব্যাপার বলুন তো?

শান্তা।। এই ঝিল, এখানকার মাঠ, বাগান—আপনিই তো এর মালিক?

মল্লিক।। মালিক! উত্তরাধিকারী বলুন! আমি নিজে কিছু করিনি। কিন্তু আপনি এ প্রশ্ন কেন করছেন?

শান্তা।। এখানে যারা বেড়াতে আসে, প্রতিনিয়ত যদি তাদের চারপাশে বিশ্রী অভিসন্ধি নিয়ে চর ঘুরতে থাকে, তাহলে সম্ভবত আপনাকেই জানানো উচিত। দুটো কদর্য লোক সবসময় আমাকে কদাকার ছায়ার মত ঘিরে রাখেছে। আমার নিশ্বাসে পর্যন্ত যেন কান পেতে আছে। এর সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই কোনও যোগ নেই।

মল্লিক।। যোগ নেই, এটা প্রমাণ করা হয়ত সত্যিই আমার পক্ষে শক্ত হবে। তাহলেও ব্যাপারটা আমাব নোংরা লাগছে। বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে অন্তত আমার ব্যক্তিগত কোন নির্দেশ নেই। আমি কেবল এই পাখির ঘরটা মিটিং-এর সুবিধের জন্য দিয়েছিলাম, ইন্সপেক্টর হয়তো অন্যায়রকম আরো বেশি দখল করছে। আমি নিজেও এটা বরদাস্ত করি না।

শান্তা।। আপনাদের যৌথ কমিটি আপনাকে বাদ দিয়েও তাহলে গোপনে কাজ করে যায়! ব্যাপারটা আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে উপকার করলাম হয় তো।

মল্লিক॥ আপনি যে অপকার করতে জানেন না। কে? কে ওখানে? বেরিয়ে আসুন। বেরিয়ে আসুন!

[*সর্বেশ্বর আর মাখন ঢোকে ভিন্ন পোশাকে*]

আপনারা! এখানে কেন? চুপ করে রইলেন যে, এখানে লুকিয়ে কি করছিলেন বলুন? মিস্ লাহিড়ী আমার সঙ্গে কথা বলছেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে শুনছিলেন, বলুন!

মাখন॥ আমি স্যার, কিছু শুনতে পাচ্ছিলুম না। দেখছেন তো আমার কানে যন্ত্রটা লাগানো নেই।

[*মাখন যন্ত্রটা কানে পরে*]

সর্বেশ্বর॥ বিশ্বাস করুন, স্যার। কিছু শুনবার জন্য আসিনি। একটা জিনিশ কুড়োতে এসেছিলাম।

শান্তা॥ আকাশ থেকে নিশ্চয়ই ফুল ফল পড়ছিল না, এখানে কুড়োবার কি আছে?

সর্বেশ্বর॥ না মানে পায়ের ছাপ কুড়োচ্ছিলাম, মানে নানারকম পায়ের ছাপ নিচ্ছিলাম।

মল্লিক॥ কার পায়ের ছাপ?

মাখন॥ প্রেত-এর স্যার। এই ব্যাগ-ভর্তি স্যার পায়ের ছাপ।

সর্বেশ্বর॥ মাখন, বিদ্বজ্জনের মাঝে কথাগুলো আমায় বলতে দাও।

মল্লিক॥ এখানে ছাড়া আর কোথাও ওর পায়ের ছাপ ছিল না?

সর্বেশ্বর॥ বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার। এখানে এসে ওর ছাপটা হঠাৎ বদলে গেছে। মানে অন্যরকম লাগছে। অ্যাদ্দিন যেসব ছাপ নিয়েছি তা মাটিতে বেশ হাল্কামত ছিল, এখানে এসে দেখছি বেশ ভারি লাগছে, মেঝেতে সবকটা ছাপ চেপে বসেছে। অদ্ভুত না স্যার!

মাখন॥ অথচ স্যার, গায়েগত্তিতে প্রেত তেমন ভারিও হয়নি একদিনে। ছায়াগুলোও স্যার, আজকাল ওজনে বাড়তে লেগেছে—দিনকালটা বুঝুন স্যার।

শান্তা॥ দেখে যতোটা মনে হয়, আপনারা কিন্তু ততোটা নির্বোধ নন। বোকামোটাও একটা পোশাক, মানিয়ে পরলে কাজের সুবিধে। তাই না?

সর্বেশ্বর॥ আজ্ঞে দিদিমণি, আপনারা লেখাপড়া করেছেন, আপনার কথায় আমরা মুখ্যুরা কি ভুল ধরতে পারি?

মল্লিক॥ আপনারা যান। আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়িতে আপনারা কোনও কাজকর্ম না করলেই খুশি হব। যান।

সর্বেশ্বর॥ যাচ্ছি স্যার। পায়ের ছাপটাকে হেলাফেলা করবেন না স্যার। এখানে অ্যাদ্দিনের আইনকানুন ভেঙে যারাই স্যার সাহস দেখাচ্ছে, আমরা তাদের সক্কলের বাড়ির কাছে ঐ পায়ের ছাপটা কুড়িয়ে পাচ্ছি, স্যার! আমার রিপোর্ট স্যার অফিসের সাহেবদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। ডিউটিতে স্যার, আমার গলদ পাবেন না।

মল্লিক॥ ঠিক আছে, আপনারা আসুন। (*ওরা চলে গেল*)

শান্তা॥ মল্লিকবাবু, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন লোকদুটো আমাকে সবসময় বিশ্রীভাবে জ্বালায়। এরাই আমার ডায়েরিটা চুরি করেছে—এটা এখন আমি বুঝতে পারি।

মল্লিক।। মিস্ লাহিড়ী, আপনি যদি ঐ প্রেতের সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক না রাখেন, তাহলে কেউ আপনার শান্তিতে বিঘ্ন আনবে না।

শান্তা।। কিন্তু কী দোষ আমার?

মল্লিক।। সমস্ত অ্যাড্‌মিনস্ট্রেশন ভাবে, আপনি অ্যাবনরমাল ব্যাপারে উৎসাহ পান, অপরকে উৎসাহ দিতে চান। এটা একটা রোগ, এতে হয়ত সমাজ উল্লাসের নামে পচে ওঠে।

শান্তা।। সমস্ত অ্যাডমিনস্ট্রেশন বুঝি নরম্যাল? একজন জীবন্ত মানুষ ধীরে ধীরে প্রেত হয়ে উঠেছে, তাকে ফিরিয়ে আনা কি রোগের বিকার? সত্যিই ওর পায়ের ছাপটা ভারি হচ্ছে মল্লিকবাবু, ও আগের থেকে অনেক জোর দিয়ে মাটিতে পা ফেলছে।

মল্লিক।। কিন্তু ওরা আপনাকে ঐ প্রেতের সঙ্গে মিশতে দেবেনা।

শান্তা।। এরা কি আমার অভিভাবক?

মল্লিক।। সমাজের পুরনো নিয়ম আর শাসনের কর্তারাই তো সবথেকে শক্তিশালী অভিভাবক।

শান্তা।। এই অন্যায় শাসন যদি আমি না মানি?

মল্লিক।। বিবাদ হবে।

শান্তা।। হোক।

মল্লিক।। তাহলে আমিও যে আপনার শত্রু।

শান্তা।। তাহলে আপনার সঙ্গেও বিবাদ। কিন্তু কেন মল্লিকবাবু? আপনি এদের মিথ্যেটা কি সত্যি বুঝতে পারেন না, সত্যি পারেন না? কেন?

মল্লিক।। মিস্ লাহিড়ী, পুরনো রাজবাড়ির একটা রহস্যময় রক্ত আমার শিরায় মৃদু হলেও বইছে। এক এক সময় সেটা ক্ষেপে একটা লাল ধারালো দীর্ঘ তলোয়ারের মত লাফিয়ে ওঠে। পাগলের মত বাতাসটা কেটেকুটে যেন বলতে থাকে, যা নিয়মের বাইরে তাকে শাসন কর, শাসন কর। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মিস লাহিড়ী। তারপর কে আমার হাত ধরে এনে এদের দলে নাম লিখিয়ে দেয়। আমিও আপনার শত্রু মিস্ লাহিড়ী।

শান্তা।। আপনার ঐ ক্লান্তিই আপনাকে বাঁচাবে।

মল্লিক।। বাঁচা কি রকম আমি এক এক সময় বুঝতে চাই, মিস্ লাহিড়ী। আমি মরিনি, কিন্তু কোথায় যেন কেটে গেছে; আমি খুঁজে পাইনা। কি যেন আমি কম পেয়েছি, বুঝিনা। মিস লাহিড়ী, বায়নোকুলারটা চোখে দিয়ে আমার হারানো পাখিগুলো খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন আপনাকে দেখতে পেলুম। ব্যাপারটা আমাকে কেমন ভাবায়।

শান্তা।। আপনি যে বড় বেশি একা থাকেন। একা মানুষের অনেক বিপদ। আপনি এখানকার ছোটরাজাবাবু, মনের মত একটি মানুষ নিয়ে আসুন—শুধু আপনি নন আমরা সবাই মিলে আনন্দ করব। একা একা কেউ থাকে!

মল্লিক।। একা আর কোথায়? খাঁচায় একটা টিয়েপাখি রেখেছি। পাখিটা আমাকে ভালবাসছে, অনেকদিন পর ওটাকে আমার ও বাড়ির বারান্দায় রেখছি। কি সুন্দর রঙ ওর। দেখবেন পাখিটা? বায়নোকুলারটায় চোখ রেখে দেখা যায়।

[বাইরে শব্দ হল]

মল্লিক।। বোধহয় ইন্সপেক্টর আসছেন।

শান্তা।। তাহলে আমি যাই, মল্লিকবাবু। লোকটাকে আমার সহ্য হয় না। আর একদিন আপনার পাখিটা দেখে যাব, কেমন?

মল্লিক।। একটু দাঁড়ান, আপনি এদিক দিয়ে যান।

[*শান্তা চলে গেল, ডাক্তার ঢুকল*]

ডাক্তার।। ইন্সপেক্টর আর চেয়ারম্যান আসেনি?

মল্লিক।। এসে পড়বে হয়ত এখুনি। ডাক্তারবাবু, ইন্সপেক্টর নাকি প্রেতের সঙ্গে মিস লাহিড়ীর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রচুর রিপোর্ট জোগাড় করছেন?

ডাক্তার।। তা করছেন। কিন্তু ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে তো কোন আইন নেই। তাহলেও আমরা জিতে যাব। এতোকাল দেখে আসছি অ্যাডমিনস্ট্রেশনই জেতে!

মল্লিক।। আমি আমার দায়িত্বটা বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার।। দায়িত্ব হচ্ছে, অসহায়ভাবে শাসনতন্ত্রকে সহায়তা করা। এ ছাড়া উপায় নেই।

মল্লিক।। কেন?

ডাক্তার।। আমরা বিপ্লব ভুলে যাচ্ছি বলে। লক্ষ করেছেন মল্লিকবাবু, ঐ প্রেত আর শান্তার সম্পর্ক সত্যি করেই যেন নতুন একটা অভিজ্ঞতাকে জয়ী করতে চলেছে। যেন একটা সুবাতাস বইছে। আমাদের বর্ম-আঁটা বুকের মধ্যেও তার অনুরণন যেন স্পর্শ করতে চাইছে। কিছু একটা হচ্ছে—এক রকম জন্ম, অদ্ভুত এক ভালবাসার জন্ম। আমাদের বিশ্বাসের বাইরে বলেই ভাবতে অবাক লাগছে, না?

মল্লিক।। সত্যি একটা অদ্ভুত কিছু হচ্ছে। যে মৃত, প্রেত—সেও ভালবাসায় বাঁচতে চলেছে। কী ভয়ংকর অলৌকিক!

ডাক্তার।। আমাদের মধ্যে একটা গোপন খেলা শুরু হয়েছে। আমরা একসময় জানব, কেন এ সব হয়। এই আলো, অন্ধকার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস—সব কিছু মিলে এক আশ্চর্য রাসলীলা।

মল্লিক।। তাই যদি হয় তাহলে আপনি কেন এই দলে? কেন স্বপ্নের চারদিকের বীজাণু আপনি ছুঁয়ে থাকেন? কেন এদের দলে আছেন? আপনি কি আমারই মত কোথাও একা?

ডাক্তার।। জীবন আর মৃত্যুর অসহায় মাঝখানে আমি এক নির্বোধ দর্শক। একটা ট্রুথ, একটা সত্য বুঝতে হয়ত আমি অনেক দিচ্ছি। মল্লিকবাবু, আপনি সেই ডাক্তারদের যন্ত্রণার কথা শোনেননি যারা রোগের বীজাণুকেও ভালবেসেছে কেবল, কেবল কিছু একটা বুঝতে চেয়ে। জাস্ট ফর ইন সার্চ অফ এ ট্রুথ, এ সিম্পল ট্রুথ! ল্যাবরেটরির টেবিলে সমস্ত পৃথিবীটা একটা ছোট গিনিপিগ-এর মত সূঁচ ফুটে শুয়ে আছে। পয়জন টু লাইফ।

মল্লিক।। ইন্সপেক্টরের গলা পেলাম।

[*ইন্সপেক্টর ও চেয়ারম্যান ঢুকলেন।*
আকাশে মেঘ ঢেকে উঠলা]

ইন্সপেক্টর।। আকাশে বেশ সাজানো মেঘ দেখলুম। সময় নষ্ট না করে আসুন আমরা বসে পড়ি। মিটিংটা দ্রুত শেষ করে ফেলা দরকার। (*সকলে বসল। ইন্সপেক্টর পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে চেয়ারম্যানকে দিল*) চেয়ারম্যান, প্লিজ, চিঠিটা সকলকে পড়ে শোনান। সরকার থেকে পাঠিয়েছে। জরুরি।

চেয়ারম্যান।। (*খানিকটা পড়ে অপ্রস্তুত*) কিন্তু এটা—

ইন্সপেক্টর।। সময় নষ্ট করবেন না, প্লিজ্ পড়ুন। (*ফাইলপত্র সাজাতে থাকে*)

চেয়ারম্যান।। কিন্তু চিঠির বিষয়—

ইন্সপেক্টর।। আশ্চর্য, একটা চিঠি পড়তে—

চেয়ারম্যান।। (*বিরক্ত*) বেশ পড়ছি। (*পড়তে থাকে*) আর্যপুত্র!

ডাক্তার।। (*বিস্মিত*) কী! আর্যপুত্র! সরকারী চিঠিতে?

মল্লিক।। কে লিখলেন? উর্বশী না শকুন্তলা?

চেয়ারম্যান।। না, মানে তলায় তো লেখা রয়েছে—ইতি তোমারই মলি।

ইন্সপেক্টর।। (*চিঠিটা কেড়ে নিয়ে*) আশ্চর্য! তাড়াহুড়োয় ভুলে অন্য একটা চিঠি দিয়ে ফেলেছি। বুঝতেই পারছেন, ডেপুটি-গিন্নী মলি মিত্তির আমাকে উঃ-উঃ কী বিপজ্জনক অ্যাড্রেস দেখেছেন? ভাগ্যিস চিঠিটা আমার স্ত্রীর হাতে পড়েনি। যাকগে, ডোন্ট্ লিক ইট আউট, প্লীজ . . . ব্যাপারটা তাহলে আমরা ভুলে যাচ্ছি, কি বলেন? (*পকেট থেকে অন্য একটা চিঠি বের করে*) এটা—না, আমিই পড়ছি। (*খানিকটা পরে*) প্রেতের ব্যাপারটায় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটাকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছেন। তারপর লেখা আছে— দি গভর্নমেণ্ট রিকোয়েস্ট য়্যু টু টেক অল নেসসারি স্টেপস্ ফর দ্য প্রম্পট লিকুইডিশন অব দিস অ্যাপারিশন। সরকার প্রচুর মিলিটারি পাঠাচ্ছে। ওদের আমি এই অঞ্চলটা ঘিরে ফেলতে আদেশ দিয়েছি। এখানে যে প্রেত রয়েছে সে যদি আগেই সংবাদ পেয়ে পালায় ভাল—না হলে আগামীকাল স্পিরিটটি এখানে এলে ওর সব খেলার শেষ করা হবে। দেশের উপর থেকে অশুভ প্রভাব চলে যাবে। সকলে স্বাভাবিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।

চেয়ারম্যান।। আশ্চর্য, এতো অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি কাল!

মল্লিক।। আমিও আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।

ইন্সপেক্টর।। আমিও। হাউ ফানি! অ্যাঁ?

ডাক্তার।। একটা অলৌকিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর।। আর এর মূলে স্পিরিট আর মিস লাহিড়ীর সম্পর্ক। আরে মশাই, আমি স্বপ্নে দেখলুম মাটিতে চাঁদটা ফলের মত ছিঁড়ে পড়ল। পা দিয়ে লাথি মারতেই গড়িয়ে গড়িয়ে একটা হাঁ করা কবরের মধ্যে পড়ল। আমি মাটি চাপা দিয়ে দিলুম। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে তীরের মত খানিকটা আলো বেরিয়ে এসে আমাকে তাড়া করল। ছুটলুম। দৌড়চ্ছি, দৌড়চ্ছি, দারুণ ঘেমেনেয়ে গেলুম, স্বপ্ন ভেঙে গেল। হোয়াট এ হরিবল্ ড্রিম! ফ্যানটাসটিক! আমি যেন একজন অপরাধী, যেন ফিনকি দেওয়া চাঁদের আলো আমি কবর চাপা দিতে চেয়েছি!

চেয়ারম্যান।। আমিও আজব স্বপ্ন দেখেছি। একটা বিশাল ঘড়ি থেকে পেণ্ডুলামটা ছিটকে এসে আমাকে তাড়া করছে—সময়ের কাছে কোন পাপ করেছি হয়তো।

ইন্সপেক্টর।। ডাক্তারও দেখেছেন নিশ্চয়ই!

ডাক্তার।। আমার স্বপ্নটা এতো ভয়াবহ নয়, দুঃখের। দুটো ফুলের মত ছোট ছেলেমেয়ে একটা লাল ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, আমার হাতে লেগে সুতো ছিঁড়ে ওদের ঘুড়ি কোথায় ভেসে গেল। ইন্সপেক্টর, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, আমরা পাপ করে যাচ্ছি।

ইন্সপেক্টর।। পাপপুণ্য আমি বুঝিনে মশাই। আমি একজন অ্যাডমিনস্ট্রেটর। যেখানে বিশৃঙ্খলা সেখানে শৃঙ্খলা আনাই আমার কাজ। স্পষ্টতই বুঝতে পারছি, এমনকি আমাদের দেখা স্বপ্নই প্রমাণ করে আমরা যুক্তি ও বাস্তব বোধ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। আশ্চর্য এবং অদ্ভুত কিছু ইতিমধ্যেই আমাদের স্বপ্নের মধ্যে রাদার সাবকনসাস্ মাইণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ছে—কনসাস মাইন্ডে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ! বিওয়্যার মাই ফ্রেণ্ডস্, উই আর ইন দি গ্রিপ অব ড্রিমস, এ্যাণ্ড দ্য ড্রিম ইজ এ ডিজিজ।

ডাক্তার।। তাহলে কোন সুপারন্যাচারাল প্রভাব আমাদের উপর এসে পড়ছে?

ইন্সপেক্টর।। হতেও পারে। নেচারকে যদি আমরা হেরে যেতে দেখি—দেয়ার মাস্ট বি সাম্ সুপারন্যাচারাল পাওয়ার।

চেয়ারম্যান।। এবং এই অলৌকিক প্রেত এবং শান্তা লাহিড়ীর মধ্যে সম্পর্কই এই দুষ্ট প্রভাবের কারণ।

মল্লিক।। তাহলে আমাদের বিশ্বাস এখন দৃঢ় যে এখানে সত্যিই অলৌকিক প্রেত রয়েছে। কোন সন্দেহ নেই এতে?

ইন্সপেক্টর।। সন্দেহ কিছু আছে, তাহলেও মেনে নেওয়া যেতে পারে। সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। বহুলোক এর প্রভাবে পড়েছে। আপনারা জানেন না যে কতো অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এ অঞ্চলে। আমার ঘড়িতে কাল রাত বারটার পর একটা না বেজে তেরটা ঘণ্টা বাজল—হোয়াট অ্যান আনলাকি নাম্বার। তাছাড়া কয়েকজন সরকারী হাইর‍্যাঙ্ক অফিসার পার্কের একটা পুরনো বেঞ্চে বসেছিল, উঠে দেখল তাদের প্যান্টে হাস্যকর কাঁচা সবুজ রঙ লেগে গিয়েছে—অথচ বসবার সময় দেখেছে কিছুই ছিল না। বুঝুন! মানুষের বিরুদ্ধে প্রেতের এই অশুভ প্রভাব থেকে বাঁচতে—আসুন, আমরা সংঘবদ্ধ হই। মিলিটারি শক্তি, শাসনতন্ত্রের শক্তি, সমাজের প্রাচীন শক্তি আমাদের সহায়। গোস্ট এবং শান্তা লাহিড়ী আমাদের লক্ষ এবং এদের খেলা অতি দ্রুত শেষ হবে। ব্যাস, এই পর্যন্ত। বক্তৃতা বড় হলে আমার দম ফুরিয়ে আসে, অথচ বাবা সমানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যাকগে কাজের কথায় আসা যাক্।

মল্লিক।। কিন্তু ইন্সপেক্টর, মিস লাহিড়ী হয়তো অশরীরীর প্রভাবে পড়েছেন। ওঁর দোষ ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। প্রেত ওঁর ওপর যদি ভর করে তাহলে উনি নির্দোষ।

ডাক্তার।। এদিকটা আমাদের বিবেচনা প্রয়োজন।

চেয়ারম্যান।। এটা অবশ্যই ভাববার কথা। কে কার প্রভাবে পড়েছে সেটাও আমাদের বিচারের দরকার।

ইন্সপেক্টর।। যেসব রিপোর্ট আমি পেয়েছি তাতে ঐ প্রেতই সব কিছুর মূল, মিস লাহিড়ী এতে যোগ দিয়েছেন। যদি প্রেতকে আমরা সরিয়ে দিতে পারি, মিস লাহিড়ীও বাঁচবেন। আমি যে প্ল্যান করেছি তা ইতিমধ্যেই আপনাদের কিছু কিছু জানিয়েছি। একজন দক্ষ গানম্যানকে আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। এক্ষুনি এসে পড়বে। হি উইল কাম আর্মড্।

[*রাধাগোবিন্দ প্রায় দৌড়ে ঢুকল। মেঘ ডেকে উঠল। বজ্রপাতের শব্দ*]

রাধাগোবিন্দ।। স্যার, প্রেত স্যার, দৌড়ে শালবনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটা খরগোসের পিছে পিছে বাচ্চা ছেলের মত দৌড়ল।

ডাক্তার।। শান্তা?

রাধাগোবিন্দ।। উনি? হাসতে হাসতে ঐ দিক গেলেন। মনে হল, ওরা দুজনে যেন ছোটদের মত খেলছেন।

ইন্সপেক্টর।। কি মনে হচ্ছে জানতে চাইনি, যা ঘটেছে বল।

রাধাগোবিন্দ।। ঝড় আসছে।

ইন্সপেক্টর।। ঠিক আছে, বাইরে গিয়ে সব কিছু অবজার্ভ কর।

রাধাগোবিন্দ।। স্যার, বাইরে দারুণ ঝড়, মেঘটা চমৎকার লালচে। নোট করব?

ইন্সপেক্টর।। (*বিরক্তভাবে*) কর।

রাধাগোবিন্দ।। ঝড়, স্যার দারুণ সাবজেক্ট, একটা বিদ্যুৎ নিয়ে স্যার কয়েক পাতা আমি লিখে ফেলতে পারি। একটা দারুণ কবিতা—স্যার, আপনাদের অ্যাড্‌মিন্‌স্ট্রেটর'স জার্নালে একটা কবিতা দেব স্যার?

ইন্সপেক্টর।। বিদ্যুৎ ফসকে গিয়ে গায়ে পড়লে কবিতা চোখ কপালে তুলবে। আমাদের কাগজে কোন কবিতা ছাপা হয় না, যাও! (*রাধাগোবিন্দ চলে যায়*)

মল্লিক।। (*বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘের গর্জন*) অলৌকিক প্রেতের বিরুদ্ধে যাচ্ছি বলেই বোধহয় ঝড় শুরু হল।

ইন্সপেক্টর।। এই ঝড়ের মধ্যে গুলির শব্দ চমৎকার মিলিয়ে যেত।

চেয়ারম্যান।। ঝড়টা বাড়বে। আমাদের বাড়ি ফেরা উচিত। দেখুন মেঘটা কেমন দলা পাকিয়ে উঠেছে। হয়তো প্রেত ভীষণ রেগে গিয়ে সবকিছুকে খেপিয়ে তুলছে।

ইন্সপেক্টর।। আমরাও দ্বিগুণ ক্ষেপে উঠেবো। ইটস এ গেম, এ স্পোর্ট।

ডাক্তার।। কিন্তু ঝড় উঠলে এরকম খোলা ছাদে থাকাটা নিরাপদ নয়।

চেয়ারম্যান।। তাই বলছিলাম—(*যাবার উদ্যোগ করে*)

ইন্সপেক্টর।। আপনারা সকলে চলে গেলে আমি কি রকম একা হয়ে পড়ব না। গোস্টকে কিল করলে একা একা কি করে আনন্দটা উপভোগ করি বলুন তো!

চেয়ারম্যান।। কাল হবে। আগামীকালই তো গোস্টকে নিশ্চিহ্ন করার প্ল্যান ছিল আমাদের।

ডাক্তার।। তাছাড়া হাতে একটা দিন সময়ও পাব।

ইন্সপেক্টর।। কিন্তু সময়ের দরকার কি আমাদের?

ডাক্তার।। ওদের তো দরকার।

ইন্সপেক্টর।। মানে কি বলছেন আপনি—ওদের সময় মানে সুযোগ দেব আমরা?

মল্লিক।। সুযোগ দেওয়ার মধ্যে একটা উদারতা আছে, বীরত্ব আছে।

ইন্সপেক্টর।। তাহলে উদার হব, অ্যাঁ? মানে একটু খেলিয়ে জেতা . . . তাই না? তাছাড়া যেখানে ক্ষতি নেই সেখানে উদার হওয়া তো রীতিমত লাভজনক। বেশ চলুন। (*প্রথমে মল্লিক, ডাক্তার ও চেয়ারম্যান বেরিয়ে যায়। ইন্সপেক্টর বেরোতে যাবে এমন সময় গানম্যানের ছায়ামূর্তি ভেসে ওঠে। বজ্রপাতের শব্দ। ইন্সপেক্টর চমকে ওঠে*) কে? য়্যু, মাই ফ্রেণ্ড। মাই ফ্রেণ্ড ইন ডার্কনেস! গানম্যান, দেন অলরেডি ইউ আর হিয়ার।

আমরা তাহলে জিতে যাচ্ছি। খেলাটা দারুণ জমে উঠছে। দুটো হাত লুকিয়ে কেন? শো মি ইয়োর হ্যাণ্ডস্ . . . শো মি, প্লিজ্ . . . শো মি। মজা, অ্যাঁ? খেলা। একটা মাত্র গুলিই যথেষ্ট হাঃ হাঃ হাঃ, ভিক্‌ট্রি! ভিক্‌ট্রি!

[*ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায়। ইন্সপেক্টর হেসে ওঠে। ত্রস্তভাবে চেয়ারম্যান ঢোকে*]

চেয়ারম্যান।। ইন্সপেক্টর!

ইন্সপেক্টর।। (*হাসতে হাসতে*) কি হল চেয়ারম্যান?

চেয়ারম্যান।। আপনি কি রকম হেসে উঠলেন—শব্দটা ভাল লাগল না।

ইন্সপেক্টর।। এখানে থাকলে আনন্দে আপনি আরো জোরে হেসে উঠতেন। চেয়ারম্যান, গানম্যান পৌঁছে গেছে!

চেয়ারম্যান।। ইন্সপেক্টর আপনি কি ভুল বকছেন? এখানে কেউ আসেনি, তাহলে তো আমরা দেখতুম?

ইন্সপেক্টর।। এসেছিল, বিলিভ মি, গানম্যান এসেছিল, আর্মড্। আহা, কাল সেই দারুণ খেলাটা শুরু হবে। প্রেতের বুক থেকে রক্ত ছিট্‌কে দু-এক ফোঁটা উঁচু চাঁদটাতেও লেগে যেতে পারে। আওয়ার ভিক্‌ট্রি মার্ক।

চেয়ারম্যান।। আবার রক্ত! রক্ত বড় বীভৎস, ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর।। (*হেসে ওঠে*) এ্যাঁ? ইউ শেকি ওল্ডম্যান। চলুন, চলুন।

[*হাসতে হাসতে ইন্সপেক্টর চেয়ারম্যানকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বজ্রপাতের শব্দ। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। বিদ্যুৎচমকে দেখা গেল টিয়েপাখিটা দাঁড়ে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। ঝড়ের হাওয়ায় দাঁড়টা দারুণ দুলছে। একটু পরে শান্তা ঢুকলেন। ওর হাতে মুখে বৃষ্টির ফোঁটা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্তরাল-এর প্রেতকে ডাকল*]

শান্তা।। কই আসুন। ওরা সবাই চলে গেছে। ছাদ থেকে ঝড়টা কী চমৎকার লালচে লাগছে। যেন সব কিছুকে উড়িয়ে দেবে? আসুন, ভিতরে আসুন।

প্রেত।। আমি আসব না। এই ঝড় আমি বুঝি না, কিংবা বুঝতে পেরে ভয় করছে। সেই বাতাস, একটা লাল গোলাপের বুক থেকে লাফিয়ে ওঠা সেই বাতাস!

শান্তা।। আমি কিন্তু ঠিক হাত ধরে-টেনে আনব। (*প্রেত ঝুঁকে স্থির হয়ে দাঁড়ায়*) কি রকম দাঁড়িয়েছে দেখ, যেন কাঠের পুতুল? খরগোসটা ধরতে তো বেশ ছেলেমানুষের মত ছুটছিলেন। আমার কিন্তু বেশ লাগছিল।

প্রেত।। কেন?

শান্তা।। আমি যে জিতে গেছি তা বুঝতে পেরে। (*হেসে*) আমার একটা ভূত ধরা খাঁচা আছে। আপনি কিন্তু তাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন। যে খরগোস ধরতে ছোটে, তার মধ্যে খুশি এসেছে, মজা এসেছে, প্রাণ এসেছে, সে কখনও মরে গিয়ে প্রেত নয়।

প্রেত।। আপনার প্রেত-ধরা খাঁচাটা কোথায় জানেন?

শান্তা।। কোথায়?

প্রেত।। আপনার হাতে, মুখে চোখে, বুকে, কথায়, চলায়, হৃদয়ের মায়ায়। আমি হয়তা অদ্ভুত বেঁচে উঠলাম। এখন বাঁচার পরে আবার ভয়—যদি আবার মরে যেতে হয়!

শান্তা।। আমি মন্ত্র পড়ে বাঁচব।

প্রেত।। কোন্ মন্ত্র?

শান্তা।। ডাকিনী মন্ত্র নয় নিশ্চয়ই।

প্রেত।। আমি যাই।

শান্তা।। কেন?

প্রেত।। এখানে এলে আমার মনে হয়, আমি পুরোপুরি একটা বিশাল জালের মধ্যে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি। আমার পথ নেই, কোন পথ নেই। আপনি কেন আমাকে বারবার এখানে নিয়ে আসেন? কেন? কেন? কিসের লোভ আপনার এই ভাঙা পাখির বাসার ছাদটায়?

শান্তা।। সত্যি, একটা ভীষণ লোভ! এখানকার একজন মানুষ আমাদের বিচার করছে। ওদের বিশ্রী পায়ের ছাপ সমস্ত ছাদটাকে যেন কদাকার করে তুলেছে। আমরা এখানে হাঁটব, দৌড়ব, ছেলেমানুষের মত গড়িয়ে গড়িয়ে ওদের সব নোংরা ছাপ মুছে ফেলব। আর যদি তাতেও দাগগুলো না ওঠে—

প্রেত।। কোনও দাগই সহজে ওঠে না।

শান্তা।। ওঠে। যদি এভাবে না ওঠে—ভীষণ পাপে এই ছাদ, ছাদের মরচে পড়া বিকট সিংহাসনটা ফেটে ফেটে ভাঙবে। আকাশে যেমন ঝড় উঠেছে, মাটির তলা থেকে তেমনি ঝড় উঠবে, আমাদের নিশ্বাসের ঝড়!

প্রেত।। আপনার কথায় আমি কেমন ভয় পাচ্ছি। চারদিকের আলো মেঘটায় কী ভীষণ ঢেকে আসছে। শাদা আলো কমে আসছে।

[*আলো কমতে থাকে*]

শান্তা।। আলো কমছে না। এতোদিনকার রুগ্ন আলোটা ধীরে ধীরে মরছে।

প্রেত।। শান্তা, আলো কী ভয়ানক কমছে।

[*আলো আরো কমল*]

শান্তা।। কমছে না, বিশ্রী চারদিকটা সরে সরে যাচ্ছে।

প্রেত।। শান্তা, সব কিছু সরে সরে কেবল তোমাকে কাছে দেখছি। শান্তা, কেবল তুমি। (*সব আলো নিভে গেল। কেবল দরজার কাছের একটুকরো আলোয় শান্তা। অন্ধকারে প্রেত বলছে*) শান্তা, তুমি এতো সুন্দর কেন? আমার হাত-পা তারের মত বেজে উঠছে কেন? শান্তা, সুখ কাকে বলে আমার মনে পড়ছে, উল্লাস মনে পড়ছে। দুঃখ মনে পড়ছে। আমার সব মনে পড়ছে। শান্তা, শান্তা! (*ঘোড়ার পায়ের তীব্র শব্দ*) শান্তা, ও কিসের শব্দ . . . বাতাসটাকে নখে দাঁতে ছিঁড়েখুঁড়ে ও কিসের শব্দ?

শান্তা।। একটা বিকট মানুষ ঘোড়ায় চেপে হয়ত এখানেই আসছে। তুমি যাও, লোকটাকে আমি মুখোমুখি দেখব। ইন্সপেক্টর কি চায়, আমি শুনব।

প্রেত।। কি চায়?

শান্তা।। তুমি যাও। শব্দটা এগুচ্ছে। লোকটা এক্ষুণি উঠে আসবে। তুমি যাও। এদিক দিয়ে চলে যাও।

প্রেত।। না, আমি যাব না।

শান্তা।। এই জোর তোমাকে কে শেখাল?

প্রেত।। তোমার সেই মন্ত্র।

শান্তা।। আমার মন্ত্র তো ঐ লোকটা বোঝে না। তুমি যাও। যাও। ওরা তোমাকে মারতে চায়। তুমি যাও।

[*প্রেত চলে যায়। মল্লিক ঢোকে, হাতে বায়নোকুলার*]

শান্তা।। আপনি?

মল্লিক।। জানতাম আপনাকে এখানেই পাব।

শান্তা।। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম, ইন্সপেক্টর।

মল্লিক।। ইন্সপেক্টরকে গাড়িতে যেতে হয়েছে। ঝড়ের হাওয়া আর মেঘের গর্জনে ওর ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে হঠাৎ জঙ্গলের দিকে দৌড়ে পালিয়েছে। এখন ওটা চারদিকে পাগলের মত ছুটছে। ভাবলাম, আপনার একা একা ফেরা হয়ত ঠিক হবে না।

শান্তা।। ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে? বেশ মজার খবরটা কিন্তু, তাই না?

মল্লিক।। পাগলের মত উদ্দাম ঘোড়াটা দেখলে আপনার ভয় করত।

শান্তা।। ভয় করবে না, দারুণ ভাল লাগবে। অদ্ভুত ভাল লাগছে আমার! মল্লিকবাবু, ঘোড়াটা আপনাদের হারিয়ে দিল। সকলের আগে ঐ নির্বোধ প্রাণীটাই কিন্তু প্রথম ইন্সপেক্টরকে ছেড়ে পালাল কিংবা বিদ্রোহে বিচ্ছিন্ন হল। আপনারা হেরে গেলেন!

মল্লিক।। মিস লাহিড়ী, আপনি কিরকম অদ্ভুত হাসছেন।

শান্তা।। অদ্ভুত ভাল লাগছে যে! মল্লিকবাবু, আপনার বায়নোকুলারটা দিন না। আপনার পাখিটাকে এবার দেখব, ভীষণ খুশিতে দেখব—খুশির চোখ ছাড়া কেউ কি পাখি দেখতে পায়, দিন।

মল্লিক।। পাখিটাকে আপনি কি করে দেখবেন। মেঘের অন্ধকারে বারান্দাটা ঢেকে আছে।

শান্তা।। মল্লিকবাবু, আমি দেখতে পাচ্ছি, বিদ্যুতের আলোয় সবুজ ছোট্ট ডানাটা হঠাৎ হঠাৎ কি সুন্দব জ্বলে উঠছে। পাখিটাকে ভীষণ ভাল লাগছে আমার, দারুণ ভাল লাগছে। আমি অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি!

[*বিদ্যুতের চমক, ঝড় আর মেঘের গর্জনের মধ্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।*]

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যপট। পড়ন্ত বিকেল। আকাশ মৃদু লাল। ছাদে একা ইন্সপেক্টর রাইফেল বাইরের দিকে কিছু তাক করছে। অল্পক্ষণ পরে চেয়ারম্যান ধীর পায়ে ঢোকেন।]

চেয়ারম্যান।। ইন্সপেক্টর নাকি?

ইন্সপেক্টর।। (*ভয়ানক চমকে ভাঙা তীব্র গলায় আর্তনাদের মত শব্দ ক'রে পিছনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে যায়*) কে?

চেয়ারম্যান।। (*অবাক*) কি হল? ভয় পেলেন নাকি?

ইন্সপেক্টর।। ভয় নয়, চমকে উঠেছি। বাইরে খরগোসটাকে তাক করছিলাম, ঠিক তক্ষুণি আপনি ডাকলেন কিংবা খরগোসটা হঠাৎ মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল —দুটো ঘটনা এতো বিশ্রীভাবে মিলে গেল . . . চমকে উঠলাম।

চেয়ারম্যান।। বিশ্রীভাবে মরার হাত থেকে খরগোসটা কিন্তু বাঁচল। গানম্যান এসেছে?

ইন্সপেক্টর।। ওরা সিঁড়ির ধারটার কোণে এসে লুকিয়ে থাকবে। আর যদি প্রয়োজন হয় এই বন্দুকটাই আজকের শুভকাজটা সম্পন্ন করবে।

চেয়ারম্যান।। (*ঘড়ি দেখে*) ওদের তো আসবার প্রায় সময় হয়ে এল।

ইন্সপেক্টর।। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রেতও এখানে এসে উপস্থিত হচ্ছে, আর তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে নিশ্চিহ্ন হবে।

চেয়ারম্যান।। যদি সত্যি করেই সে স্পিরিট হয়ে থাকে তাহলে তো বন্দুকের শব্দেই মিলিয়ে যাবে।

ইন্সপেক্টর।। তখন সে অন্তত বুঝবে, তার গতিবিধি এখানে নিরাপদ বা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। আর প্রেত যদি মানুষের ছদ্মবেশ ধ'রে এতোসব কাণ্ড করে থাকে সেই ছদ্মবেশটা এখানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকবে।

[*নোটবুক হাতে রাধাগোবিন্দ ঢোকে*]

রাধাগোবিন্দ।। একটা বেলুনওয়ালা যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর।। দেখে যাও। (*চেয়ারম্যানকে*) আমাদের যুদ্ধ আসলে একটা ইভ্ল্ পাওয়ারের বিরুদ্ধে। একটা অমঙ্গলে ভালবাসার দুঃস্বপ্ন বিনাশের জন্য।

রাধাগোবিন্দ।। গোলাপী বেলুনটা ফেটে গেল।

ইন্সপেক্টর।। সব কিছু দেখে যাও।

চেয়ারম্যান।। তাহলে বলছেন, আমরা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

ইন্সপেক্টর।। নিশ্চয়ই। এবং আজই প্রেতকে আমরা মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ভয়ংকরতা থেকে নিষ্কৃতিই আমার অ্যাড্মিনস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য।

রাধাগোবিন্দ।। গাছ যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান।। গাছ যাবে কি করে? গাছের নিশ্চয়ই পা নেই?

রাধাগোবিন্দ।। গোরুর গাড়িতে ক'রে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর।। নোট করে যাও।

চেয়ারম্যান।। আমার কি রকম ঘাম হচ্ছে। এই প্রথম আমি একটা মৃত্যুদৃশ্যের সাক্ষী

হচ্ছি। একটা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি। ইন্সপেক্টর, কাল সমস্তটা রাত ঘুমোতে পারিনি। নিজের ছায়া দেখেও চমকে উঠেছি। আমার কিছু একটা হয়েছে।

ইন্সপেক্টর।। এটা আপনার বয়স, নার্ভের অসুখ। কেন বুঝতে পারছেন না চেয়ারম্যান, আমাদের আজকের সমস্যা কেবল লোকাল নয়, কেবল ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনালও নয়—ইউনিভার্সাল।

চেয়ারম্যান।। আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন।

ইন্সপেক্টর।। হয়ত নয়, সুনিশ্চিতভাবেই ঠিক।

চেয়ারম্যান।। কৌতূহল আর ভয়ে আমি কিরকম চঞ্চল হয়ে পড়ছি।

ইন্সপেক্টর।। কিন্তু আপনাকে স্থির থাকতে হবে। আপনি ভাবতে পারেন যদি এই প্রেতকে আমরা বিলুপ্ত করতে না পারি, যদি এই প্রেতের অনুপ্রবেশ আমরা রোধ করতে না পারি, ওরা ক্রমশ একের পর এক সংখ্যায় বেড়ে যাবে। ওদেরই সন্তান-সন্ততি বংশ-পরিবার একজোট হয়ে সমস্ত দেশটায় কেমন একটা নতুন কলোনি বসিয়ে ফেলবে। এরা নাগরিক হবে, হয়তো ভোটের অধিকার পাবে। আর যেহেতু জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যা বেশি, ওরাই হবে মেজরিটি— মনে রাখবেন এর পরিনাম চূড়ান্ত বিপজ্জনক।

চেয়ারম্যান।। তাহলে তো দেখছি আমাদের সঙ্গে একটা ভয়াবহ ব্যবধান গড়ে উঠবে তখন!

ইন্সপেক্টর।। ইয়েস, এবং কয়েকবছর নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গণতন্ত্রের আইনসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে প্রত্যেকটা ইলেকশনে জিতবে, দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন প্রেত, প্রধানমন্ত্রী প্রেত, হাইকোর্টের বিচারপতি, উকিল সব ভূত . . .

চেয়ারম্যান।। ঠিক বলেছেন। তখন ওদের রাজত্বে আমাদেরই চাকরবাকর হয়ে যেতে হবে হয়ত, আর্যদের আক্রমণে দ্রাবিড়দের মত।

ইন্সপেক্টর।। এই গোস্টগুলোকে আপনি আর্য ভাবছেন? তুলনার লোভে? ছি! ছি! আমার বাবা একজন হিসটোরিয়ান, ইতিহাসের অবমাননা আমার লাগে!

চেয়ারম্যান।। আপনাকে আঘাত দেবার জন্য বলিনি। জাস্ট একটা ইমোশন—

ইন্সপেক্টর।। ইমোশন চেক্ করতে হবে।

চেয়ারম্যান।। ঠিক বলেছেন। আমি যেন চোখের সামনে সংখ্যাগরিস্ট প্রেতসমাজকে রাজদণ্ড হাতে দেখতে পাচ্ছি!

ইন্সপেক্টর।। ওদের রাজদণ্ড হাতে দেখতে পাচ্ছি—মানে? আপনার কি ধারণা আমরা হেরে যাব?

চেয়ারম্যান।। (*ঘাবড়ে গিয়ে*) না, জিতব।

ইন্সপেক্টর।। তাহলে? তাহলে চোখের সামনে ওদের রাজত্ব দেখছেন কেমন করে?

চেয়ারম্যান।। না মানে . . . আবেগ দিয়ে বলতে গিয়ে কেমন করে একটা উপমা এসে গেল।

ইন্সপেক্টর।। একটু আগে আবেগ কন্ট্রোল করার কথা হল না? আশ্চর্য, তার ওপর আপনি উপমা যোগ করলেন! আপনি ভাবতে পারেন, আপনার ভয় সত্য হয়ে দাঁড়ালে আমাদের অবস্থা কি হবে? প্রেতসমাজের দরজার এক কোণে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে বসে থাকব . . . ডেথ-সারটিফিকেট থাকবে না . . . কেউ মরলে একটা পাসপোর্ট পেয়ে

যাবে, সঙ্গে সঙ্গে গোস্ট কলোনিতে চলে যাবে . . . পথে বালক, কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধ, মেয়ে, পুরুষ, অসংখ্য প্রেত . . . আর তার মধ্যে দিয়ে আমরা কুয়াশা ঠেলে অন্ধের মত ভয়ে ভয়ে এগুব। . . . তখন হাত থেকে লাঠিটুকু কেড়ে নিলেই হয়েছে আর কি!

চেয়ারম্যান॥ আমার গায়ে দেখুন, দেখুন কী রকম কাঁটা দিয়ে উঠছে।

ইন্সপেক্টর॥ এখনো কাঁটা দেবার সময় হয় নি।

চেয়ারম্যান॥ কিন্তু আমার দিচ্ছে।

ইন্সপেক্টব॥ সম্ভবত এই পৃথিবীতে আপনি আমাদের মত বাঁদর থেকে না এসে শজারু থেকে এসেছেন, তাই আপনার গায়ে এতো ঘনঘন কাঁটা দেয়।

চেয়ারম্যান॥ হতে পারে। শজারু! আর একটা ভয়ের ব্যাপার আছে ইন্সপেক্টর, প্রেত সব জানতে পারে। ওদের রাজত্বে আমাদের সব গোপনতা ধরা পড়ে যাবে। আপনার বুক পকেটের চিঠি . . .

ইন্সপেক্টর॥ জানেন, চিঠির ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত ছিল।

চেয়ারম্যান॥ সম্ভবত ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেলে কি করব? তা ছাড়া ঐ চিঠি বাদেও ধরুন অফিসের বাঁ হাতের ব্যাপারে আমার মিউনিসিপ্যালিটির হিসেবের খাতা—সব ফাঁস হয়ে যাবে। গোপনতার কোন দরকার নেই বলেই হয়ত প্রত্যেক বাড়ি থেকে পর্দা তুলে ফেলা হবে, সমস্ত বাড়িটাই তখন মাঠের মত ফাঁকা! দরজা, জানালা সব বেআইনি হয়ে যাবে। ভাবতে পারেন . . . আমার গায়ে কাঁটা (*ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে*) না দিচ্ছে না।

রাধাগোবিন্দ॥ একটা মৃতদেহ আসছে স্যার।

চেয়ারম্যান॥ (*প্রচণ্ড ভয় পেয়ে*) হেঁটে?

রাধাগোবিন্দ॥ না তো। মানুষের কাঁধে।

চেয়ারম্যান॥ তাইতো আসবে। আচ্ছা আহাম্মক তো!

ইন্সপেক্টর॥ যা আসে স্রেফ্ টুকে যাও।

রাধাগোবিন্দ॥ টুকছি স্যার।

ইন্সপেক্টর॥ বেশ।

রাধাগোবিন্দ॥ একটা পাখি উড়ল।

ইন্সপেক্টর॥ উড়ে যেতে দাও।

রাধাগোবিন্দ॥ আবার ঘুরল।

চেয়ারম্যান॥ চোখ বন্ধ করে থাকুন না।

ইন্সপেক্টর॥ না না, অবজার্ভ কর। (*চেয়ারম্যানকে*) কাজেই বুঝতে পারছেন, আমাদের আজকের মিশনটা খুব শক্ত মনে সাকসেসফুল করে তুলতে হবে।

রাধাগোবিন্দ॥ পাখিটা ঘুরছে।

ইন্সপেক্টর॥ (*বিরক্ত*) পথ দেখ। পথের দিকে তাকাও।

রাধাগোবিন্দ॥ পাখিটা পথে বসল স্যার।

চেয়ারম্যান॥ ঢিল মেরে ওড়ান না।

রাধাগোবিন্দ॥ তাহলে তো আবার উড়বে।

ইন্সপেক্টর॥ হুঁ। পাখিটাও আসলে অলৌকিক বাতাসের খপ্পরে পড়েছে।

চেয়ারম্যান।। বাঁচার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে আসছে। আমরা বোধহয় চারদিকটাকে খেপিয়ে তুলছি।

ইন্সপেক্টর।। আজ এখানে এই অলৌকিকের মৃত্যু হবে।

চেয়ারম্যান।। একজন বন্দুকধারী লোক লুকিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে কিনা দেখলেন?

রাধাগোবিন্দ।। দেখিনি স্যার।

চেয়ারম্যান।। গানম্যান কি সত্যিই আসবে ইন্সপেক্টর?

ইন্সপেক্টর।। অবশ্যই আসবে। আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। আর ঠিক সময়ে গুলি ছুঁড়বে।

চেয়ারম্যান।। (*আতঙ্কিত*) তাহলে আসবেই?

ইন্সপেক্টর।। নিশ্চয়ই। ওরা আমাদের শবসাধনার তালবেতাল। যা বলব শুনবে।

রাধাগোবিন্দ।। স্যার পাখিটা উড়ে গেছে স্যার।

চেয়ারম্যান।। বাঁচা গেছে।

ইন্সপেক্টর।। চেয়াম্যান। ঐ গানম্যান আমার শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমি সমস্ত মানুষের হয়ে প্রেতকে, স্পিরিট অফ্ ডার্কনেস্কে এখন চ্যালেঞ্জ করতে পারছি। সমস্ত অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ শক্তির জোরে এবং মানুষের নিয়মের শক্তিতে আমি প্রেতকে অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করছি। এই শেষবারের মত স্পিরিট এখানে আসবে। তারপর চিরকালের মত বিদায় নেবে।

রাধাগোবিন্দ।। (*উচ্ছ্বসিত*) আসছে!

চেয়ারম্যান।। (*আর্তকণ্ঠে*) কে?

রাধাগোবিন্দ।। মিস লাহিড়ী।

ইন্সপেক্টর।। সঙ্গে?

রাধাগোবিন্দ।। ডাক্তারবাবু।

চেয়ারম্যান।। তাহলে আমাদের স্পিরিট?

ইন্সপেক্টর।। (*ঘড়ি দেখে*) না, স্পিরিট আর কিছুকাল পরে আসবে। পারহ্যাপ্স্ হি উইল কাম অ্যালোন। ডাক্তার আমাদের প্ল্যান সবই জানে। ওরা ঢোকার আগে চলুন আমরা লুকিয়ে পড়ি। বি কুইক।

[মুহূর্তের মধ্যে সকলে লুকিয়ে পড়ে একটু পরে ডাক্তার আর শান্তা আসে]

শান্তা।। ডাক্তারবাবু সত্যিই কি ও আসবে?

ডাক্তার।। আসবেই। তোমাকে ওর দরকার।

শান্তা।। আমার কেমন অদ্ভুত লাগছে। এক এক সময় সন্দেহ হয় ওর ভেতরটাকে সত্যি সত্যি আমি ছুঁতে পেরেছি কি না। ওর বদল কতোদিন স্থায়ী তাও বুঝতে পারি না।

ডাক্তার।। ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করাই তো জীবন। তবে আমরা যখন বাঁচতে চাই, চারদিকের শত্রুতা প্রখর হয়ে ওঠে।

শান্তা।। আমি এতোসব বুঝতাম না। কিন্তু এখন বুঝি। কিন্তু ডাক্তারবাবু, এই শত্রুতাই বা জিতবে কেন?

ডাক্তার।। তোমাকে একটা কথা আমার জানানো দরকার। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ শান্তা, তোমাকে ঘিরে বিরাট এক ষড়যন্ত্র চলছে। তুমি হয়ত আজকেই সেই বিকট অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হবে।

শান্তা।। আমি আর ভয় পাব না, ডাক্তারবাবু। এখন আর ভয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাক্তার।। তুমি চলে যাবে শান্তা?

শান্তা।। কোথায়?

ডাক্তার।। এখান থেকে অন্য যে কোনও কোথাও?

শান্তা।। (*ম্লান হেসে*) তাতে লাভ? যেখানেই যাই, এই পৃথিবীই তো আছে। কয়েকটা লোভী মানুষের অন্যায় অহংকারী আইনের বিচার তো আছে! আমি যাব না। সব দেখব। (*দরজার বাইরে শব্দ হল*) ও এসেছে।

ডাক্তার।। আমি বাইরে যাচ্ছি।

শান্তা।। আপনি থাকুন। আপনি ওকে দেখুন।

ডাক্তার।। আমি থাকলে ও ঠিক স্বাভাবিক হতে পারবে না। আমি পরে আসব। তুমি একা থাক। শান্তা, শেষবার বলছি, তুমি এক্ষুণি পারলে চলে যাও। এখান থেকে যাও।

ইন্সপেক্টর।। তা আর হয় না ডাক্তারবাবু।

[*ডাক্তার অন্য দরজা দিয়ে চলে গেলেন। কিছুকাল নিস্তব্ধ*]

শান্তা।। এস, কেউ নেই এখানে।

[*মল্লিকবাবু ঢুকলেন। হাতে গ্লাভস্, বনেদি ছড়ি, ওভারকোট গায়ে, পায়ে নাগরা*]

শান্তা।। (*অবাক*) একি, আপনি?

মল্লিক।। হ্যাঁ, আমি মিস্ লাহিড়ী।

শান্তা।। কিন্তু—

মল্লিক।। জানি, এখুনি প্রেত এখানে আসবে। তার আগে আমি একবার না এসে পারলাম না, মিস্ লাহিড়ী। আপনি কি সত্যি প্রেতকে ভালবাসেন?

শান্তা।। বাসি।

মল্লিক।। আমিও তো প্রেত মিস্ লাহিড়ী?

শান্তা।। আপনি।

মল্লিক।। হ্যাঁ, আমি। প্রেত মানেই তো মৃত, অতীত। আমরা অনেকেই তো মরা অতীত নিয়ে চলি। হাতের এই ছড়ি আমার প্রপিতামহের, ওভারকোট ঠাকুর্দার, গ্লাভ্স্ আমার বাবার। নাগরাই জুতো দাদুর। শরীরের রক্ত বাবা আর মায়ের দেওয়া, চিন্তা পূর্বপুরুষ মানুষের, নিশ্বাস প্রাচীন পৃথিবীর বাতাসের। আমার নিজের বলতে কত সামান্য বলুন।

শান্তা।। আমি আপনাকে বুঝি। বুঝি কি একটা কষ্ট আছে আপনার।

মল্লিক।। শুধু বুঝলে হয় না মিস্ লাহিড়ী, আপনি বিশ্বাস করুন। সমস্ত অতীত দিয়ে আমি তৈরী। অতীত একটা প্রেত, আমাদের মধ্যে বহুকাল বসে। আমি ভাবিনি এতো। হঠাৎ কাল মনে হল। আপনি তাহলে আমাকে আপন ভাবেন না কেন? এই এখানে

আমার অতীত পূর্বপুরুষেরা সব হয়ত দাঁড়িয়ে আছেন—আমি প্রেতের মধ্যে হাঁটি, ঘুমাই—আমি কি কিছু ভুল বলছি, মিস লাহিড়ী?

শান্তা॥ কিন্তু আপনার সব শূন্য হয়ে যায়নি। আপনি সব পথ ভুলে যাননি। হেঁটে হেঁটে অন্তত কোথাও পৌছতে পারেন। কিন্তু ঐ মানুষটা নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত ছায়ামাত্র ভেবে বসে আছে, একটু আশ্রয় ছাড়া ও হয়ত একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।

মল্লিক॥ কিন্তু সম্পূর্ণ মৃতের সঙ্গে মেলা যায় না, মিস্ লাহিড়ী, আমি প্রেতের মধ্যেও জীবিত। আমি অন্তত ফিরতে পারি, ও কোনকালে পারবে না।

শান্তা॥ পারবে। পারছে।

মল্লিক॥ যে কেবল ছায়া, তার হাত ধরা যায় না। কোন স্পর্শ নেই তার। স্পর্শে কতো রকম সুখ।

শান্তা॥ ঐ ছায়া দিয়ে তৈরী হাতের মধ্যে রক্ত আসবে, শিরা-উপশিরায় সুখ বইতে থাকবে।

মল্লিক॥ ওর হৃদয়ও ছায়া, মিস্ লাহিড়ী।

শান্তা॥ আপনারা জানেন না ওর হৃদয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। ওর চোখ খুঁজতে শুরু করেছে। হাত কিছু ধরতে চাইছে।

মল্লিক॥ কিন্তু চারদিকের পৃথিবী যদি না বোঝে? যদি শত্রুতা করে? যদি সব ধ্বংস করে দেয়?

শান্তা॥ আপনারা সবাই মিলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

মল্লিক॥ যে ভালবাসা সবাই স্পষ্ট বোঝে না, চায় না, তার, চারদিকে শত্রু আসে। ওরা নিজেদের নিয়মটাকে জেতাতে চায়। আর সবকিছুকেই অশুভ ভাবে, বিপজ্জনক ভাবে।

শান্তা॥ আপনি তো বুঝেছেন।

মল্লিক॥ শুধু বুঝলে হয় না, বিশ্বাস চাই। আমার পুরো বিশ্বাস নেই।

শান্তা॥ তাহলে আপনিও আমার শত্রু?

মল্লিক॥ হয়ত। আপনার ধ্বংস জানলেও কেন জানি না, আমি নিষ্ক্রিয়। শত্রুর দলে কিভাবে যেন আমার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে।

শান্তা॥ আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন না?

মল্লিক॥ যদি এই মুহূর্তেই আপনাকে নিয়ে পালাতে পারি, তাহলেই কেবল আপনাকে রক্ষা করা যায়। মিস লাহিড়ী, এই ভয়ংকর জালের বাইরে একবার নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করব। আপনি যাবেন?

শান্তা॥ তা কি করে সম্ভব?

মল্লিক॥ সম্ভব।

শান্তা॥ না না, তা হয় না।

মল্লিক॥ পরিচিত জীবনের মধ্যেও সুখ আছে। আসলে তো আমরা সুখই চাই। তাই না?

শান্তা॥ এ সব বলবেন না আপনি। আমি নিজের সম্পর্কে ভেবেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

মল্লিক॥ তাহলে আমি যাই?

শান্তা।। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই খারাপ ভাবছেন?

মল্লিক।। আপনাকে আমি যে খারাপ ভাবতে পারি না। পারলে হয়ত সুখ ছিল।

[সঙ্গে সঙ্গে ঘরে একটা তীব্র নীল আলো ভেসে এল। নানা রঙের আলো কেঁপে উঠল]

নেপথ্যে প্রেত।। শান্তা!

[মল্লিক চলে যাওয়া পর্যন্ত প্রেত নেপথ্যে কথা বলবে]

শান্তা।। *(বিদ্যুৎবেগে ঘুরে তাকায়)* এস, ভেতরে এস।

প্রেত।। না, এখানে তুমি একা থাকবে, ওকে যেতে বল।

মল্লিক।। আপনি কি আমাকে ভয় পান?

প্রেত।। ভয় আমি কাউকে পাই না। শান্তাকে আমি একা চাই।

মল্লিক।। হয়ত শান্তা ভুল করছে। ওকে আমার রক্ষা করা দরকার।

শান্তা।। আমি ভুল করছি না।

প্রেত ।। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি বহুকাল ধরে বিরক্ত। হয়ত আপনার সঙ্গে আমি রূঢ় ব্যবহার করে বসতে পারি। আপনি চলে যান।

মল্লিক।। আপনার মুখোমুখি হয়ে আমি কথা বলতে চাই। আমাকে ভয় কেন?

শান্তা।। মল্লিকবাবু আপনি ওকে আসতে দিন।

প্রেত।। আজ আমি কেবল শান্তার সঙ্গে কথা বলব। আমি অনেক কিছু বুঝতে চাই। আমার বোঝা সম্পূর্ণ না হলে, বিশ্বাস করুন, আপনাদের সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। সেটাই আমার ভুল হবে।

মল্লিক।। যদি আমি না যাই?

প্রেত।। আমি একা নই। আমার সঙ্গে অসংখ্য অশরীরী, অসংখ্য মৃত আত্মা। ওরা সকলে জীবনে ফিরে আসতে চাইছে, প্রচণ্ড শক্তি ওদের। আপনি পারবেন না। আমাকে আসতে দিন, আপনি চলে যান।

শান্তা।। ওর দরকার আমাকে। ওকে আসতে দিন।

মল্লিক।। প্রেত একটা জীবন ভোগ করে মরে গেছে, দ্বিতীয় জন্মের পাওনা চাইতে এসেছে, আমার এ জন্মের পাওনাই বাকি। আমার দাবিই খাঁটি। আমি যাব কেন?

প্রেত।। একটা জীবনও আমি ভোগ করতে পারিনি। যা কিছু স্পর্শ করেছি সব আমার জিভ তেতো করে দিয়েছে। হাতের আঙুল পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার চোখ রৌদ্র লেগে শাদা হয়ে গেছে। আমি চাই। ভয়ানকভাবে চাই। আমাকে আসতে দিন।

শান্তা। আপনি ওকে আসতে দিন!

মল্লিক।। *(হতাশভাবে)* বেশ, কিন্তু আপনার বিপদ আপনাকে মারতে আসছে। মিস্ লাহিড়ী, আমি বাঁচাতে চেষ্টা করেও পারলাম্ না। চলি।

[মল্লিক চলে গেল। ধীরে ধীরে প্রেত ঢুকল। নীল আলো তীব্রতর হল]

প্রেত।। শান্তা, সমস্ত পথে আমি অনেক অশুভ দৃশ্য দেখেছি। আমাদের চারদিকে হয়ত সর্বনাশ অপেক্ষা করে আছে।

শান্তা।। আমার ভাল লাগছে। বাঁচার জন্য তোমার ইচ্ছে জাগছে, মরতে তোমার ভয়।

প্রেত।। মরে গিয়ে আবার বাঁচা সুন্দর। রেজারেকশন অ্যাণ্ড দ্য লাইফ। যেন বরফের একটা জামা গায়ে ছিলাম এতোদিন। কে যেন ঘুমের মধ্যে খুলে নিয়েছে। উষ্ণ স্নেহ পশমের পোশাকের মত জড়িয়ে আছে। আমার হাতের মধ্যে আলো, ছায়া লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকছে। মানুষের ভিড় কি বিচিত্র কল্লোলে ডাকে। শান্তা, আমি ভালবাসতে পারব, ভালবাসতে চাই।

শান্তা।। প্রেত ধরার কলে তোমাকে কেমন চমৎকার বন্দী করে নিলাম।

প্রেত।। তোমার বুকের মধ্যে অসামান্য ছড়ানো হৃদয়। সেখানে আমি শৈশবের স্বপ্ন নিয়ে খেলতে চাই। আমার এতো খেলা বাকি ছিল আমি জানতুম না। জানতুম না কেন?

শান্তা।। এখন জানছ?

প্রেত।। পৃথিবীটা আমাকে এতো জ্বালিয়েছে! আমি এক সময় মরে গিয়ে বেঁচেছিলাম। এখন একটা ছবির কথা মনে পড়ছে। মাটি থেকে চাঁদ পর্যন্ত এক দীর্ঘতম সিঁড়ি, গেট অফ হেভেন! দৌড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না? আমার সব ভাল লাগছে—এই আলো-বাতাস-জ্যোৎস্না-অন্ধকার—সব।

শান্তা।। আর আমি?

প্রেত।। তুমি, তোমার মন, মনের ভিতরের আলো; চোখ, চোখের ভিতরের আলো; চিবুক, চিবুকের চারপাশের আলো! তুমি কেবল আলো, আলো আর আলো! আমি কি ভীষণ অন্ধকারে ছিলাম। আসলে আমার সব কিছু তীব্র। যখন শূন্য ছিলাম, নিজেকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেবেছি, অর্থহীন মৃত্যু ভেবেছি। এখন তোমাকে ভাল লাগছে—নিদারুণ ভাল লাগছে।

শান্তা।। এতো ভাল লাগা ছিল কোথায়?

প্রেত।। জানতুম না।

শান্তা।। যদি আবার সব যায়?

প্রেত।। কেন যাবে?

শান্তা।। আমাদের যদি বাঁচতে বাধা দেয়? মরতে ভাল লাগবে?

প্রেত।। কারুর মরতে ভাল লাগে না। তুমি বাঁচতে চাও না?

শান্তা।। চাই। বাঁচা কী নিদারুণ ভাল! (*একটু থেমে*) কিন্তু একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তুমি জান না। একটু একটু করে হয়ত সর্বনাশ আমাদের দিকে এগোচ্ছে!

প্রেত।। আমি তোমাকে কোনদিন ছুঁইনি। তোমাকে ছুঁয়ে দেব? তোমার হাতখানি ধরলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, স্পর্শ বাঁচার কবচ। তোমার হাতটা আমার কাছে দাও।

শান্তা।। এখন নয়। যখন সব কাছে আসে, আমার সব যাবার ভয় করে। তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে কারা যেন অসহ্য আক্রোশে আমাদের ধ্বংস করতে আসবে। আমার ভয় করছে, কারা যেন আমাদের সহ্য করতে পারছে না।

প্রেত।। কি দোষ আমাদের?

শান্তা।। যে ভালবাসা আমাদের অভিভাবকদের পছন্দ নয়, তাকে তারা মারতে চায়। ওদের কাছে তুমি অর্থহীন মৃত একটা অশুভ সংক্রামক প্রেতমাত্র। তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে ওরা হিংস্র হয়ে উঠবে। ওরা তখন ভীষণ রাগে যা খুশি তাই করতে পারে।

প্রেত।। তোমার হাত-মুখ-মন ভালবাসায় এতো নিষ্পাপ সুন্দর, ছুঁয়ে দিলে শুধু আমার নয়, সমস্ত পৃথিবীর পুণ্য। (*শান্তার হাত ধরল*) পাঁচটা আঙুলে পাঁচটা নদীর মত সুখ।

[*মাথা নিচু ক'রে শান্তার হাতে মাথা রাখতেই তীব্র গুলির শব্দ। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে লোকটি দৌড়ে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তকাল বিমূঢ় হয়ে শান্তাও ছুটে গেল। ডাক্তার দৌড়ে ঢুকল*]

ডাক্তার।। শান্তা, শান্তা!

[*একই দিকে ছুটে গেল। বীভৎস উল্লাসে ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এল*]

ইন্সপেক্টর।। (*হাসতে হাসতে*) ভিক্‌ট্রি, ভিক্‌ট্রি! কাম ইন মাই ফ্রেণ্ডস্—দি ডেভিল ইজ্ আউট— আমরা জিতে গেছি! কাম ইন, আহ্‌হা, বন্দুকেব মাত্র একটা গুলিতে সমাজ একজন অপরাধীর হাত থেকে বাঁচল, মিস্ লাহিড়ী একটা বীভৎস অবসেসন থেকে মুক্তি পেলেন। আর গোটা অঞ্চলটা একটা ভৌতিক ছায়ার আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেল। ভাবতে পারেন, মাত্র একটা গুলি! হাঃ হাঃ দি ডেভিল ইজ্ আউট! উই মাস্ট কনগ্র্যাচুলেট আওয়ার গানম্যান . . . থ্রি চিয়ার্স ফর গানম্যান—হিপ হিপ (*সকলকে দেখে*) হেই— আর য়্যু অল ডেড অ্যাণ্ড সাইলেন্ট স্ট্যাটুজ্? য়্যু . . . স্পিক আউট, প্লিজ্ স্পিক আউট—

চেয়ারম্যান।। ইন্সক্টর!

ইন্সপেক্টর।। ইয়েস?

চেয়ারম্যান।। আমি কিন্তু দেখেছি।

ইন্সপেক্টর।। কি?

চেয়ারম্যান।। আপনি ঐ বন্দুকটা তুলে ধরলেন। কোন গানম্যান ছিল না। আমি বাধা দিইনি— হাত টেনে ধরিনি—

ইন্সপেক্টর।। বিলিভ মি, গানম্যান আমাদের মধ্যে ছিল।

চেয়ারম্যান।। (*খাঁচার কোণের দিকে তাকিয়ে*) কে?

ইন্সপেক্টর।। কোথায়?

চেয়ারম্যান।। ঐ ওখানে। কে যেন আমাকে দেখছে! কে যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

ইন্সপেক্টর।। কে, কে ওখানে? য়্যু কাম আউট। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

মল্লিক।। আমি যাব না।

ইন্সপেক্টর।। কেন?

মল্লিক।। আমার ভয় করছে।

ইন্সপেক্টর।। আমার সঙ্গে বন্দুক রয়েছে? ভয় কি?

মল্লিক।। নিজের বাড়িটাকেই আমার ভয়। ইন্সপেক্টর, আপনার বন্দুকের শব্দে আমার খাঁচার পাখিটার মত আমি আঁতকে উঠেছিলাম। ছোটবেলায় আমাদের নাটমন্দিরের সোনার গম্বুজেও এমনি একটা বিকট বাজ পড়েছিল। আপনি আমার সেই ছোটবেলার ভয়টা মনে পড়িয়ে দিলেন কেন? কেন?

ইন্সপেক্টর।। বাট, উই আর অল ফ্রেণ্ডস্। (*ডাক্তারের শ্বাসকষ্টের শব্দে ফিরে*) একি! ডক্টর,. ডক্টর!

ডাক্তার।। (*অনেক কষ্টে গলায় আটকানো স্টেথোটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে*) উঃ! এ স্নেক! টাচ ইট এ্যাণ্ড ইট উইল বাইট। ময়ালের মত আমাকে শেষ করে ফেলছিল!

চেয়ারম্যান।। ঐ দেখুন, এদিকে তাকিয়ে আছে . . . আমাদের দেখছে।

ইন্সপেক্টর।। য়্যু দ্য ম্যান অফ ডার্কনেস, কাম আউট।

শান্তা।। (*নিঃশব্দে শান্ত পায়ে ঢোকে*) ইন্সপেক্টর!

ইন্সপেক্টর।। (*চমকে*) কে?

শান্তা।। ভয় পেলেন?

ইন্সপেক্টর।। না, ভয় নয়, চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু আপনি এখনো যাননি?

শান্তা।। চলে যাবার আগে আপনাদের একবার দেখতে এলাম। ইন্সপেক্টর, কার্নিশের পাশে এতোক্ষণ একটা ঠাণ্ডা শরীর ছুঁয়েছিলাম। আমি কাঁদিনি, ভয় করেনি। একটা মৃতদেহ ছুঁয়ে মানুষ কতো শক্ত হয়ে যেতে পারে আপনি বুঝবেন না। এতো শক্ত, আপনার ঐ বন্দুকের গুলিও ঠিক্‌রে আসবে।

ইন্সপেক্টর।। কি আশ্চর্য আপনি কেন বুঝতে পারছেন না মিস্ লাহিড়ী, বন্দুকের গুলি আসলে একটা মহান গর্জন, আমাদের জয়ের তোপধ্বনি।

শান্তা।। আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি। শেষবারের মত ও একটা কথা স্পষ্ট বলতে পেরেছিল—'মৃত্যুও ছাড়েনা, বন্দুকের থেকেও তার গর্জন আরও কঠোর'।

চেয়ারম্যান, মল্লিক, ডাক্তার।। "মৃত্যুও ছাড়ে না, বন্দুকের থেকেও তার গর্জন আরও কঠোর"।

শান্তা।। আপনার কি ভয় করছে ইন্সপেক্টর?

ইন্সপেক্টর।। ভয়?

চেয়ারম্যান, মল্লিক, ডাক্তার।। "মৃত্যুও ছাড়ে না, বন্দুকের থেকেও তার গর্জন আরও কঠোর"।

[*শান্তা হেসে ওঠে*]

ইন্সপেক্টর।। আপনি হাসছেন কেন?

শান্তা।। আপনার ভয় পাওয়া চোখ দুটো দেখে। ইন্সপেক্টর, আমি চলে গেলেও এই হাসিটা রেখে যাব। আপনার ঐ ঝাপসা চোখ আর ভয় পাওয়া হাত দুটো এই ভাঙা বাড়িটার দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে কেমন করে নেমে যাবে আমি দেখব। আপনি হঠাৎ পিছ্‌লে পড়ে গেলে একটা হাসি শুনবেন, ওটা আমার— চলি। মল্লিকবাবু আপনার বাগান থেকে কয়েকটা ফুল নেব! মৃত্যুও বালকের মত। ওকে সাজিয়ে না দিলে যদি অভিমান করে।

[*শান্তা চলে যায়*]

ইন্সপেক্টর।। মিস্ লাহিড়ী, শুনুন।

চেয়ারম্যান, মল্লিক, ডাক্তার।। "মৃত্যুও ছাড়ে না, বন্দুকের থেকেও তার গর্জন আরও কঠোর"।

ইন্সপেক্টর।। ডাক্তারবাবু, চেয়ারম্যান মল্লিকবাবু—উঃ, আপনারাও সব প্রেতের প্রভাবে পড়েছেন— ওহ্, হোয়াট এ ফল মাই ফ্রেণ্ডস্!

চেয়ারম্যান।। আমি বাইরে যাব! মানুষের চোখ এড়িয়ে কেমন করে বাইরে যাব?

ইন্সপেক্টর।। মিথ্যে ভয় আপনাকে মারছে চেয়ারম্যান। কেউ তাকিয়ে নেই। কেবল আমরা, উই দ্য ভিক্টরস্।

চেয়ারম্যান।। আছে। অসংখ্য চোখ . . . কী ভয়ংকর দৃষ্টি! (*বেরিয়ে গিয়ে আতঙ্কিত ফিরে আসে*) ডাক্তার আমার সমস্ত জামাকাপড়ে রক্ত . . .

ইন্সপেক্টর।। দুঃস্বপ্নে আপনি মারা যাবেন চেয়ারম্যান।

চেয়ার।। এতো রক্ত! আমাকে একা একা মুছতে হবে।

[*যেতে যেতে মূর্তি*]

ডাক্তার।। আমিও যাব ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর।। কোথায়?

ডাক্তার।। জানি না। ঐ বিশ্রী সাপটার কাছ থেকে পালাতে চাই। ওর দাঁতে ভয়ংকর বিষ। না, আমার মুখের দিকে তাকাবেন না, মুখোশটা বড় বিকট।

[*মুখ ঢাকতে গিয়ে মূর্তি*]

ইন্সপেক্টর।। (*মল্লিককে চলে যেতে দেখে*) মল্লিকবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?

মল্লিক।। আমার পাখিটার কাছে ইন্সপেক্টর। আমি মনে করতে পারছি না পাখিরা কেমন করে ওড়ে। শেষ সবুজ পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে দেখতে হবে।

[*পাখি ওড়াতে গিয়ে মূর্তি*]

ইন্সপেক্টর।। মল্লিকবাবু, চেয়ারম্যান, ডক্টর—য়্যু, য়্যু হ্যাভ বিট্রেড় মি। দস্তুরমত আমাদের জয়ের পতাকাটা আপনারা দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ছেন . . . য়্যু হ্যাভ বিট্রেড় মি!

[*কেঁদে ফেলে। উদ্ভ্রান্ত রাধাগোবিন্দ ঢোকে*]

রাধাগোবিন্দ।। স্যার।

ইন্সপেক্টর।। কে?

রাধাগোবিন্দ।। স্যার, আমার পেন্সিলটা খুঁজে পাচ্ছি না স্যার। আমি কেমন করে নোট করব?

ইন্সপেক্টর।। গেট আউট!

[*পেন্সিল খুঁজতে খুঁজতে রাধাগোবিন্দ চলে যায়। শান্তা ফুল হাতে ঢোকে*]

ইন্সপেক্টর।। ওকি! আপনার হাতে ওগুলো কি?

শান্তা।। আলো, অনেকগুলো আলো, মৃত্যুকে পাহারা দেবার আলো।

[*শান্তা চলে যায়*]

ইন্সপেক্টর।। একি এতো অন্ধকার লাগছে কেন? ছাদটা খাঁচার মত আমাকে ঘিরে ধরছে! অন্ধকার বাড়ছে! কেমন করে বাইবে যাব? কে আছ, একটা আলো, একটা লণ্ঠন, একটা আলো . . .

দ্বীপের রাজা

চরিত্র লিপি

নাবিক

দ্বীপবাসীগণ

মোড়ল

চন্দন

ঝুমকো

গুণিন

চৌকিদার

দোলন

রঙন

সৈনিকগণ

সাগর

চিকিৎসক

পূজারী

অন্যান্য

প্রস্তাবনা

একদল দ্বীপবাসী মেয়েপুরুষের আনন্দোচ্ছল অভিব্যক্তি। শক্তি আর সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ প্রায় নাচের ভঙ্গিতে দৃশ্যময় হবে। ওদের কণ্ঠনিঃসৃত গুঞ্জনে এই স্বপ্ন আর সাহসের উদাত্ত গভীর কম্পন।

সমস্ত দ্বীপবাসীকে বিস্মিত করে এরোপ্লেনের গর্জন তীব্র হয়ে ওঠে। নাচের তাল কেটে যায় তাদের।

একটা বিস্ফোরণ হয়।

হতচকিত দ্বীপবাসীরা ভয়ে আর বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। ধূম্রকুণ্ডলীর ছায়ায় মূর্তিগুলি আরও ছায়া হতে থাকে। আলোছায়ার মধ্যে চলমান নৃত্যময় মূর্তিগুলি প্রার্থনার মত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে যায়।

—পর্দা—

প্রথম অঙ্ক

[একটা ডমরুধ্বনির মত বাজনা ক্রমশঃ নিখাদে পৌঁছতে থাকে—পর্দা খুলে যায়। মঞ্চে নাবিকবুড়ো ডমরু বাজাচ্ছে। তার সামনে ছবির বাক্স। কাচের খোপে চোখ রেখে দেখছে দ্বীপবাসীরা।]

নাবিক।। নাবিক বুড়োর নতুন যাদু - সাতসাগরের হরেক ছবি, হাঙর কুমীর দত্যি তিমি - আকাশখানা যাচ্ছে চুরি। আকাশখানা চুরি যাচ্ছে গো...তিমি মাছে হাঁ করে সাত রাজ্য গিলছে...বনমানুষ ফুল চিবোচ্ছে...এক নজর দেখে নেবেতো এসো...ছবিগুলো দৌড় লাগাচ্ছে...ছবির খেলা শুরু হল...একনজর দেখে নেবেতো এসো গো।

[ডমরু বাজিয়ে ছবি ঘোরায়]

নাবিক বুড়োর নতুন যাদু—সাতসাগরের হরেক ছবি। আকাশ কালো করে শকুন উড়ছে...শকুন নয়গো—লড়াইয়ে যাচ্ছে দানোর রথ...ছবি ঘুরল...রথের পেট থেকে আগুনের গোলা নামছে...মানুষ পোড়া ধোঁয়া উঠছে...গাছপালার ছাই উড়ছে...পোড়ামাটির শ্মশান দেখগো - পোড়ামাটির শ্মশান দেখো।

প্রথম।। তোমার ছবি দেখে ভয় করছে নাবিকবুড়ো—আমি দেখব না।

[সবাই একে একে সরে যায়]

দ্বিতীয়।। সাতসাগরের ছবি দেখাবে বলে লড়াইয়ের ছবি দেখাচ্ছো কেন? মানুষপোড়া শ্মশানের ধোঁয়া লেগে আমার চোখ জ্বলছে।

তৃতীয়।। নাবিকবুড়ো, সমুদ্দুরের ছবি দেখাও-নীলজল আর রঙিন রঙিন মাছ-সাদা রঙের শঙ্খ আর জলের নীচে লুকনো সবুজ ফুল পাতা।

চতুর্থ।। সাতসাগরের নাবিক তুমি - কত চওড়া আকাশ দেখেছ, কত বড় লম্বা সমুদ্দুর দেখেছ - তার বদলে কিনা শ্মশানের ধোঁয়া? আমরা দেখব না!

নাবিক।। আকাশখানাতো তোমাদের চোখের মণিতে ভাসছে গো, সাত সমুদ্দুরতো তোমাদের বুকে পেখম মেলে দুলছে...এই দ্বীপে এসে বাঁচতে চাইছে। তাইতো নাবিক বুড়ো দ্বীপের মাটিতে ফিরে এল...ধোঁয়ায় আমারও চোখ জ্বলছে। ভয় বিপদের কথা জানতে হয়গো...ভিনদেশের ডাঙার মানুষগুলো হাঙরের দাঁতে রক্তে মাখামাখি হচ্ছে...তিমি মাছটা সিংহাসনে বসে হাঁ মেলে দিচ্ছে...জলের জানোয়ার ডাঙায় উঠেছে, বনের জানোয়ারের সঙ্গে মিতালি পাতাচ্ছে...বাইরে মানুষগুলো ছটফট করছে, দম আটকে মরছে...ভয় বিপদের কথা জানতে হয়গো।

প্রথম।। আমাদের আকাশে যে-রথের গাড়িটা শকুনের মত উড়ছে ওটা কাদের নাবিকবুড়ো?

দ্বিতীয়।। ঐ শকুনটার পেটে আগুনের গোলা লুকনো নেইতো?

তৃতীয়।। ভিন দেশের সেপাই এসে তাঁবু ফেলছে, তাঁবুর মধ্যে কি আছে নাবিক বুড়ো?

নাবিক।। অতো কথার উত্তর জানিনে ভাই, কেবল আকাশে শকুনটাকে দেখলে চোখটা পুড়তে থাকে। ঐ যে মোড়লবুড়ো আসছে, ওকে জিগ্যেস করো। মেলায় যাব

যাদুর খেলায় ভিড় লেগে যাবে ওখানে। আবার বলি, ভয় বিপদের কথা জানতে হয়গো...। নাবিক বুড়োর নতুন যাদু...

[বলতে বলতে যন্ত্র কাঁধে নাবিকের প্রস্থান]

[মোড়লবুড়ো প্রবেশ করে]

চতুর্থ॥ মোড়লবুড়ো, ভিনদেশী সেপাইদের আমরা তাড়িয়ে দেব,...ওদের তাঁবুগুলো আমাদের মাটি ঢেকে দিচ্ছে।

মোড়ল॥ ওরা বলছে, ওদের নাকি কি হারিয়েছে এই দ্বীপটায়। খুঁজছে, পেলেই চলে যাবে।

প্রথম॥ কি হারিয়েছে ওদের? মাথার ওপর দানোর রথটা লাল চোখ মেলে কি যেন খোঁজে, কি খুঁজছে গো?

মোড়ল॥ বলছে, আগে থেকে বলা বারণ।

দ্বিতীয়॥ তোমাকেও বলবে না?

মোড়ল॥ আমাকেই আগে বলবে।

[দূর থেকে একটা কোলাহল নিকটবর্তী হয়]

মোড়ল॥ পাহাড়তলীর লোকগুলো এত সোরগোল তুলে আসছে কেন?

[কয়েকজন ছুটে বাইরে যায়—। দ্বীপবাসী প্রবেশ করে]

দ্বীপবাসী॥ মোড়লবুড়ো! মোড়লবুড়ো!!

মোড়ল॥ কি রে—কি হল?

দ্বীপবাসী॥ চন্দনকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সবাই মিলে ওকে ধরে নিয়ে আসছে।

মোড়ল॥ অনেক মাছ মেরে নৌকো বোঝাই করে ফিরছে তাহলে বল। মরদের ব্যাটা, ঝড় ঝাপ্টা, হাঙর কুমীর ওর কি করবে? আমি জানতাম, জোয়ারে ভেসে যাবার ছেলে-ও নয়। ঝুমকো খবরটা পেয়েছে?

দ্বীপবাসী॥ ও মাছ মারতেই যায়নি মোড়ল, তা জোয়ারে ভেসে যাবে কিগো। ওর মধ্যে শয়তান ঢুকেছে! সেপাইদের তাঁবুগুলো রয়েছে...ওর মধ্যে লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ নেশা করে বাইরে বেড়িয়ে আসতেইতো ধরা পড়ল।

মোড়ল॥ ভিনদেশের সেপাইদের তাঁবুর মধ্যে লুকিয়ে ছিল! কি আছে ওখানে? কিসের নেশা?

[চন্দনকে সবাই ধরে নিয়ে আসে]

চন্দন॥ ছাড়্-ছাড় বলছি...ছেড়ে দে...আমাকে ছেড়ে দাও।

মোড়ল॥ ওকে ছেড়ে দে।

[চন্দনকে সবাই ছেড়ে দেয়]

মোড়ল॥ তুই মাছ মারতে যাসনি? গাঁ সুদ্ধ লোককে ধোঁকা দিয়ে, বৌ-বেটাকে লুকিয়ে কোথায় ছিলি তুই?

চন্দন॥ লুকোব কেন? মন চাইল...তাঁবুতে গেলাম। মনখান-কি আমি গাঁয়ের মানুষদের কাছে বেচে দিয়েছি?

প্রথম॥ রাঙা চোখ দেখাস না চন্দন, ভিনদেশী সেপাইদের কাছে নেশা গিলে তুই মোড়লের মুখের ওপর গলা তুলছিস?

দ্বিতীয়॥ সেপাইরা ওর কানে মন্তর দিয়েছে মোড়ল। দেখছো না—নতুন কথা শিখেছে...নতুন রকম রাগ শিখেছে।

চন্দন॥ মন্তর নেব...বেশ করব! আমার মন্তরের ওস্তাদ আমি বেছে নেব!

মোড়ল॥ গুণিনকে খবর পাঠা...শয়তান ওকে ভর করেছে, মন্ত্র পড়ে নামাতে হবে।

[দ্বীপবাসীর প্রস্থান]

চন্দন॥ তোমরা জোর করে আমার কাঁধে শয়তান চাপাচ্ছ। আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। ঝুমকো আর আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাব। তোমাদের গোলামি করে কে থাকতে চায়!

দ্বিতীয়॥ মুখ সামলে কথা বল চন্দন! দ্বীপের নিন্দে রটালে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব!

তৃতীয়॥ সাতপুরুষের মাটির গায়ে থুথু ছেটালে, যেখানেই যাস তোর মাথায় বাজ পড়বে বলছি।

চতুর্থ॥ এখানকার পাহাড় সমুদ্দুর তোকে অভিসম্পাত করবে।

চন্দন॥ আমি কাউকে ভয় পাইনা। ওদের আকাশের রথটায় চেপে উড়াল দেব, কে চায় তোদের মাটিতে পা রাখতে, আমি মেঘের কাছ দিয়ে উড়ব...তোদের নাগালের অনেক উঁচুতে। মাথা উঁচু করে আমাকে দেখবি। আমি থুথু ছেটালে তোদের গায়ে পডবে, তোদের একটা কথাও আমার কানে পৌঁছবে না।

প্রথম॥ চন্দন! মোড়লবুড়ো তুমি সরে যাও, ও কতবড় মরদের বেটা হয়েছে একবার দেখব! পাপকথা যাতে আর মুখে না আনতে পারে তার জন্য ওর টুঁটিটা চেপে ধরে ওকে বুঝিয়ে দেব কোন পাপের কি শাস্তি!

[চন্দন অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়ায়]

চন্দন॥ সাম্মল! সামাল বলছি!!

দ্বিতীয়॥ চন্দন!

চতুর্থ॥ চন্দন!

তৃতীয়॥ চন্দন!!!

প্রথম॥ চন্দন!!!!

[নেপথ্যে ঝুমকোর কণ্ঠ - চন্দন - চন্দন - চন্দন।]

[ঝুমকো প্রবেশ করে]

ঝুমকো॥ চন্দন! চন্দন বেঁচে আছে! চন্দন-চন্দন! একি তোমার হাতে ওটা কি?

চন্দন॥ তুই ঘরে যা ঝুমকো...কত বড় মরদ ওরা আমি দেখে নেবো। দ্বীপের মাটিতে জানোয়ারের রক্ত ছড়াবো...এই জানোয়ারগুলোর রক্ত!

মোড়ল॥ চন্দন হাতের ওটা ফেলে দে!

চন্দন॥ না!

ঝুমকো॥ কি হয়েছে মোড়ল...লড়াই বাধল কেন? কি করেছে ও, বল কি করেছে?

প্রথম॥ শয়তান ওর ওপর ভর করেছে। ও ভিনদেশী সেপাইদের দলে ভিড়ে পালাবে বলছে।

ঝুমকো॥ দ্বীপ ছেড়ে কোন দেশে যাবে তুমি...কে এসব মন্ত্র দিল তোমাকে?

চন্দন ।। তোকেও নিয়ে যাব।

ঝুমকো ।। এসব কথা কে শেখাল তোমাকে?

/ নেপথ্যে গুণিনের কণ্ঠ - ওঁ হ্রং ক্লীং মৎ স্বাহা -/

/ গুণিন প্রবেশ করে /

মোড়ল ।। এই যে গুণিন এসে গেছে।

চন্দন ।। কেউ আসবে না আমার কাছে...কেউ না। ঠিক খুন হয়ে যাবে!

ঝুমকো ।। চন্দন!

মোড়ল ।। ওটা ফেলেদে...

চন্দন ।। না...

মোড়ল ।। ফেলেদে...

চন্দন ।। না-এসো না...বলছি...না...

/ মোড়ল এগিয়ে যায় চন্দনের দিকে -
চন্দন মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে /

মোড়ল ।। চন্দন—আয়।

চন্দন ।। আমি কিছু করিনি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি কেবল ওদের অদ্ভুত রকম তাঁবুটা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও মোড়ল বুড়ো।

মোড়ল ।। আয় আমার সাথে।

/ মোড়ল চন্দনকে গুণিনের কাছে নিয়ে আসে। /

গুণিন ।। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো, যেন এই দ্বীপটাকে ও দেখছে না, আর কোথাও পালাবে বলে চোরা পথ খুঁজছে।

মোড়ল ।। এই গোটা দ্বীপটাকেই দানোয় পেয়েছে। স্বপ্নের দ্বীপটা যেন হঠাৎ ভয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইছে, আমাদের স্বপ্নের পালক মুকুট থেকে খুলে খুলে পড়ে যায়, পোশাকের রঙ আগের মত তেমন মানায় না, পা ফেললে ভয় ভয় করে! চন্দনের মত গোটা দ্বীপটাকেই দানোয় পেয়েছে।

দ্বিতীয় ।। গুণিনকে বল মোড়ল, ওর ধুলো আর মন্তরে আমরা বাঁচব।

মোড়ল ।। গুণিন! তোমার মন্ত্রপড়া ধুলো ছিটিয়ে দেবে ওর গায়ে, যদি চিৎকার করে ওঠে ওর ভিতরটা টের পাওয়া যাবে।

গুণিন ।। শয়তান এই দ্বীপটায় রাতের অন্ধকারে হাঁটে। আকাশের ওই বিদঘুটে রথটা বোধহয় ওটাকে অন্ধকারে নামিয়ে দিয়েছে। আমি টের পাই মোড়লবুড়ো, শয়তানের নিঃশাসে আমার লাঠিটা আরও বেঁকে গেছে, আগুনের ধুনো ছুঁড়লে শ্মশানের গন্ধ পাই, বাতাসে একটা গুমরানো কান্না ইনিয়ে বিনিয়ে ভেসে বেড়ায়!

/ গুণিন বোঝা থেকে উপকরণ বার করে,
প্লেনের শব্দ শোনা যায় /

প্রথম ।। ঐ ডানাওয়ালা দানোর রথটা শয়তানটাকে এই দ্বীপে নিয়ে এসেছে...কি বিশ্রী বিকট শব্দ!

দ্বিতীয় ।। কোথাও যেন একটা লুকানো মড়া পচে গিয়ে ফুলছে...শকুনগুলো ঝাঁক বেঁধে খুঁজছে।

তৃতীয়।। নদীর ধারে ওরা নেমে এসে আরও অনেকগুলো তাঁবু ফেলেছে, মোড়লবুড়ো। সমস্ত দ্বীপটায় যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, যেন ওদের কিছু হারিয়েছে। ভয়ানক দরকারী কিছু।

চতুর্থ।। চন্দন ঐ দানোর রথে ওদের সঙ্গে পালিয়ে যাবে ভেবেছিল। শয়তানের আত্মাটা ওর ভেতর থেকে তাড়াতেই হবে।

প্রথম।। ওদের মতোই তা না হলে উড়ন্ত শকুনের পেটে ভয়ঙ্কর সব গোলা লুকিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তারপর কোথাও টুপ করে ফেলে দিয়ে আগুনের টকটকে লাল জিভ দিয়ে চেটে চেটে সব নিশ্চিহ্ন করে যাবে।

[নেপথ্যে চৌকিদারের কণ্ঠ - জাগো - জাগো -]

মোড়ল।। ওই যে চৌকিদার আসছে। ওর কাছে হয়তো নতুন কোনও খবর আছে।

চতুর্থ।। চৌকিদার যেন কিসের ভারে দিন দিন নুয়ে পড়ছে...ঝুঁকে পড়ছে, মোড়লবুড়ো।

মোড়ল।। ও যে সবকিছু লুকনো ভয়ঙ্করকে দেখছে। দেখার ভারটা বড় চাপ দেয় রে।

ঝুমকো।। মোড়লবুড়ো ওকে ছেড়ে দাও। ও আমার কাছে থাকলে ঠিক ভাল হয়ে যাবে। আমি ওকে ভাল করে দেব। তাঁবুর লোকগুলোর কাছে আর কখনও যাবে না। আমার কথা শুনবে...আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি।

চন্দন।। তুই সরে যা ঝুমকো। আমি দেশান্তরে যাবই যাব। যখন ফিরে আসব...তোর দুহাত ভরে সোনা এনে দেব।

ঝুমকো।। দেশান্তরটা কোথায় গো? সেটা কোন দেশ?

মোড়ল।। ও তোকে ছেড়ে ভিনদেশী সেপাইদের দলে নাম লিখিয়ে সোনা খুঁজতে যাবে। কথাটা বুঝলি এবার?

ঝুমকো।। আমাদের ফেলে যেতে পারবে? সোনার কত দাম গো?

দ্বিতীয়।। যখন আত্মাটাকে দুষমনে পায়...তখন মানুষের চেয়ে সোনার দাম বাড়তে থাকে।

চন্দন।। ঘরকুনো মানুষগুলো কেবল পণ্ডিতের মত কথা কয় ; বুকের পাটা যার, রাজ্য তার।

ঝুমকো।। শহুরেদের রথে চেপে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়লে মনটা তোমার শান্তি পাবে? এই মাটি হাতে তুলে ছাই ভেবে ছুঁড়ে ফেলতে পার? এই মাথার ওপরে আকাশখানা পাথর মেরে ভাঙলে সুখ পাবে? মাঠে ঘাটে আমাদের সাতপুরুষের আশীর্বাদ পিছনে ফেলে পালালে পাঁচ গায়ের বাতাসটা রাক্ষসের মত তোমায় তাড়িয়ে ফিরবে না?

চন্দন।। থাম, তুই থাম ঝুমকো!

[নেপথ্যে চৌকিদাব-জাগো-জাগো-জাগো]

[দোলনকে নিয়ে রঙন প্রবেশ করে]

দোলন।। আমি মন্ত্রপড়া দেখব।

রঙন।। না ছোটদের দেখতে নেই, ভয় পাবি, আমার সঙ্গে আয় বলছি।

দোলন।। না আমি দেখব।

রঙন।। দোলন! ফিরে আয় বলছি—ফিরে আয়। কথা না শুনলে কিন্তু রঙিনপাতার মুকুট বানিয়ে দেব না।

মোড়ল॥ ও এখানে থাক রঙন। পৃথিবীটা ছোটদের, আমরা কেবল ওদের গুছিয়ে দিতে পারি। ও দেখুক-সব কিছু দেখুক। দানোটাকে ভাল করে চিনে নিক। চন্দনকে মাঝে রেখে তোমরা ঘিরে বোস, গুণিন ওর গায়ে মন্ত্র পড়ে ধুলো ছড়িয়ে দেবে। গুণিন...

চন্দন॥ কিন্তু আমার যে লাগবে, ধুলো লেগে সমস্ত শরীরটা পুড়ে উঠবে। আমার রক্ত জ্বলে উঠবে। গুণিন আমাকে ছেড়ে দাও...আমাকে ছেড়ে দাও মোড়লবুড়ো...আমার ভয় করছে।

ঝুমকো॥ আমি এখান থেকে চলে যাই মোড়লবুড়ো, আমি দেখতে পারব না।

মোড়ল॥ সবাই থাকবে। গুণিন! ওর ভয় দেখে আমার ভাল লাগছে, ভিতরের লোভটা ধরা পড়ার ভয়ে আঁৎকে উঠছে।

[গুণিন আগুনে ধুনো দেয়। ঝুমকো চলে যায়।]

গুণিন॥ এখন কোথায় আছ চন্দন?

চন্দন॥ এই স্বপ্নের দ্বীপে।

গুণিন॥ কোথায় ছিলে?

চন্দন॥ উঃ!

গুণিন॥ লোভের জন্য এই দ্বীপের থেকে পালিয়ে পালিয়ে কোথায় ছিলে?

চন্দন॥ শয়তানের তাঁবুর ভিতরে, চুঁয়ে পড়ে নষ্ট জমানো কালো রক্তের মত বিশ্রী পাঁকে... নোংরা কাদায়। আমার সমস্ত গায়ে কাদা!

[গুণিন ঝাঁটা দিয়ে আঘাত করে]

গুণিন॥ এই কাদা ভাল লাগে?

চন্দন॥ না, ভাল লাগে না! আমাকে মেরো না, আমার গায়ের কাদার বিশ্রী গন্ধে আমার বমি পাচ্ছে।

গুণিন॥ চন্দন!

চন্দন॥ উঁ!

গুণিন॥ ঐ সৈন্যগুলো কি খুঁজছে এখানে?

চন্দন॥ জানি না।

গুণিন॥ ওরা কি খুঁজছে?

চন্দন॥ জানিনা।

গুণিন॥ তুমি জান।

চন্দন॥ না!

গুণিন॥ হ্যাঁ! বল কি খুঁজছে ওরা? এখনও দানোটা একে ছুঁয়ে আছে। ওরা কি খুঁজছে? বল—

চন্দন॥ জানিনা—আমি জানিনা—আমাকে বলেনি।

[চৌকিদার প্রবেশ করে]

চৌকিদার॥ আমি জানি কি খুঁজছে।

সকলে॥ কি?—কি?

মোড়ল॥ কি খুঁজছে?

চৌকিদার।। শয়তানের উড়ন্ত রথটা থেকে কয়েকটা ভয়ঙ্কর গোলা এই দ্বীপটায় নেমে এসেছে। ওদের বলতে শুনেছি, একটা মাত্র গোলা আমাদের দ্বীপটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। শয়তান আগুনের গোলা পায়ে করে সারা পৃথিবীটায় খেলছে, এবার আমাদের শান্ত মাটিতে ওটা গড়াতে গড়াতে হঠাৎ আগুনের ফণার মত ফুঁসে উঠতে চাইছে।

রঙন।। কিন্তু কী দোষ করেছি আমরা মোড়লবুড়ো?

সকলে।। কি দোষ আমাদের?

মোড়ল।। অন্যের দোষ আমাদের মাথায় বজ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে।

প্রথম।। না আমরা কিছুতেই এভাবে মরব না।

চৌকিদার।। যুদ্ধে জিতলে তবে তো বাঁচবে।

দ্বিতীয়।। আমাদের এই দ্বীপ শক্ত স্বাধীন মাটিতে তৈরী। আমরা যুদ্ধ চাইনা।

চৌকিদার।। ওরা চায়, যুদ্ধ হতেই হবে।

দ্বিতীয়।। আমরা হার মানবনা।

প্রথম।। আমাদের চারিদিকে ঠাণ্ডা সরল জল, মাথার উপর উদার নিষ্পাপ আকাশ, চাঁদ আর সূর্য্যের দোলনা বেঁধে আমাদের শিশুরা খেলতে চায়। আমরা তো কোনও দোষ করিনি—কারও অনিষ্ট করিনি, আমাদের উপর রাক্ষুসে শকুনগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে কেন?

চৌকিদার।। আমি যখন পুরনো গাছগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াই, পাতাগুলো ফিসফিস করে বলে, আমাদের সবুজ কমে যাচ্ছে চৌকিদার; শিকড়গুলো মাটির জলে শ্বাসকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে পিপাসায় মরে যাচ্ছি চৌকিদার। ফুলগুলো বোঁটায় কাঁপতে কাঁপতে বলে, ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছি চৌকিদার। পথে পথে নতুন পায়ের ছাপ- –শয়তানের মত উল্টানো, নখের আঁচড়ে মাটিতে যেন রক্ত চিনচিন করে ফুটছে। আমাদের দ্বীপটা একদিন হয়তো জলে তলিয়ে যাবে। আমাদের নৌকোগুলো কারা যেন ফুটো করে দিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়।। আমরা সাঁতার কেটে পার হব।

মোড়ল।। আমাদের হাতের আঙুল কেটে দেবে, পায়ের পাতা পুড়িয়ে দেবে।

[দূরে গুলির শব্দ হয়]

দ্বিতীয়।। ঐ যে কি বিশ্রী শব্দ!

রঙন।। সেপাইরা আমাদের পাখি মারছে মোড়লবুড়ো!

দ্বিতীয়।। যখন বাড়ির পাশ দিয়ে ভারী জুতোর শব্দ করে সেপাইদের দলটা বিদঘুটে অস্ত্র উঁচিয়ে হেঁটে যায়, আমার ভয় করে-ছেলেটা আঁৎকে ওঠে। মনে হয়, এই দ্বীপটা ওরা ভয় দেখিয়ে কিনে নিচ্ছে। ঘরের লণ্ঠন ওদের নিঃশ্বাসে যেন নিভে যাবে।

[ঝুমকো দৌড়ে ঢুকল]

ঝুমকো।। মোড়লবুড়ো পালাও। এখান থেকে সবাই মিলে সরে যাও—সেই সেপাইরা আসছে। কি নোংরা বিশ্রী হাসি ওদের। আগুন ছুঁড়ে আমাদের বিলের পাখি মারল, চড়ায় লাল লাল রক্ত বালিতে এখনও আটকে আছে। আমার ভয় করছে মোড়লবুড়ো। চল এখান থেকে—চল চন্দন। কি বিশ্রী ওদের হাতের অস্ত্রটা।

মোড়ল॥ পালিয়ে বাঁচা যায়না ঝুমকো। সরতে সরতে কোথায় যাব? জায়গা ফুরিয়ে যাবে। যাও, তোমরা যাও—আমি দেখছি ওদের।

প্রথম॥ তোমাকে একা রেখে আমরা যাব না মোড়লবুড়ো।

মোড়ল॥ তোমরা যাও। চৌকিদার, ওদের নিয়ে যাও। ঝুমকো, চন্দনকে ঘরে নিয়ে যা, চোখে চোখে রাখবি। যাও তোমরা। গুণিন চন্দনের হাতে শিকড় বেঁধে দেবে, ভাল হয়ে যাবে।

ঝুমকো॥ আমি ওর হাতের শিকড় কোনদিন খুলতে দেব না।

মোড়ল॥ পিতামহ বৃক্ষের শিকড়—ওকে ভাল হতেই হবে।

[মোড়ল ব্যতীত সবাই চলে যায়—একদল মাতাল সৈনিক প্রবেশ করে হাসতে হাসতে]

১ম সৈনিক॥ যেন বুনো বাঘ দেখে সবাই পালাল। তুমি কে হে বীর সিংহ, গলিত নখ দন্ত অথচ বেশ তাজা ফুলনো ফাঁপানো কেশর। রোমাঞ্চ জাগছে, কে হে তুমি? দ্বীপের রাজা নাকি?

মোড়ল॥ আমাদের এখানে কেউ প্রজা নেই। তোমাদের কাণ্ডটা দেখছি।

২য় সৈনিক॥ দ্যাখো-শুনে শুনে দ্যাখো, পছন্দ মত মিলিয়ে নাও। কেমন? কি মিলছে?

১ম সৈনিক॥ আমি কিন্তু আঁকা ছবি। আমার নিজের চেহারাটা ঘষে ঘষে মুছে ওরা আমাকে ইচ্ছেমত এঁকেছে।

মোড়ল॥ কি চাও তোমরা?

১ম সৈনিক॥ একটু রঙিনজল। সমুদ্দুরের নয়, বোতলে দম আটকানো রঙিন জল। বেশ মাছের মত ভাসব। সত্যি, আমার সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে—রঙ্গীন জলে ডুবে যেতে চাইছি।

২য় সৈনিক॥ আমি কিছু চাইনা বুড়ো বাবা, বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আমার একটা পোষা কাঠবিড়াল ছিল। আমার আর কেউ নেইগো! ঐ দ্যাখো বাচ্চা ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে আছে। এসো-এসোনা, কাঠবিড়ালী দেব-কাঠবিড়ালী। আরে ভয় কিগো, আমিও তোমার মত ছোট্ট ছিলাম, নরম নরম হাত পা ছিল, চোখে জল ছিল, খিলখিল করে হাসতাম। ও কি পালাচ্ছ কেন? পালিয়ে গেল!

মোড়ল॥ তোমার মুখেব দাগটা মুছে না গেলে ও আসবে না।

২য় সৈনিক॥ এটা যে গোলায় পোড়া দাগ—ওঠে না, অনেক ঘষেছি কিছুতেই ওঠে না।

[৩য় সৈনিক মার্চ করতে থাকে]

৩য় সৈনিক॥ কে?

৪র্থ সৈনিক॥ কিছু করার নেই, যা বলবে তাই করব, গোলা ছুঁড়তে বললে গোলা ছুঁড়ব, হাঁটতে বল হাঁটব, বসতে বললে বসব। আমরা কিছু জানিনা হে, কথা শুনি আর কাজ করি। আর হ্যাঁ, ওকে সেলাম ঠুকি।

মোড়ল॥ কাকে?

১ম সৈনিক॥ ওকে।

মোড়ল॥ কাকে?

৪র্থ সৈনিক।। বললুমতো ওকে, মানে তাকে ; মানে কাকে,-কাকে?
২য় সৈনিক।। তাকে।
মোড়ল।। কে সে? পরিচয়-?
৪র্থ সৈনিক।। কে জানে-জানি না।
মোড়ল।। সে কি!
৪র্থ সৈনিক।। ও হ্যাঁ, সেই সিংহাসনটাকে। এবার তোমার হাতের লাঠিটা নিয়ে চোখের সামনে থেকে কেটে পড় না বাবাজী। দাবার বোড়ের মত নড়ছি চড়ছি, আমার দিকে অমন কটমট করে তাকিয়ে কি হবেটা বল? আমি জানি আমার শিং হচ্ছে, আমি নিজেই জানি। যাওনা বাবা, নির্জনে বসে গিলে নিই।

[মোড়ল প্রস্থান করে]

২য় সৈনিক।। হাতের উল্কিটা অত কি দেখছিস?
১ম সৈনিক।। মেয়েটার চোখটাই আমায় জ্বালায়। মদ খেলে বলে খেওনা। গোলা কাঁধে আকাশে উড়লে বলে পালিয়ে এস। রাত্তিরে মুখের কাছে চুপটি করে চোখ মেলে চেয়ে থেকে বলে, তুমি যে ফিরবে বলেছিলে?
৩য় সৈনিক।। তা ফিরে যা না।
১ম সৈনিক।। মজা কি জানিস, আমার রক্তের মধ্যে আর একটা কি ঢুকেছে, সেটা শেকল দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে। ওরা আমাকে এত করে মুছল কিন্তু উল্কিটা কিছুতেই মুছতে পারেনি, ভাগ্যিস!

[৩য় জন মার্চ করতে থাকে]

৪র্থ সৈনিক।। আমি ভাবছি, এখানে থেকে যাব। গাছপালার রঙ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এখানকার মানুষগুলোর চোখে মুখে গায়ে চলে এসেছে। আমি এই বসলুম এখানে, হাজার বছরেও নড়ব না—আর নড়ছিনা বাবা হুঁ - হুঁ আমার শিকড় গজাবে, তারপর...তারপর রঙে চঙে বেশ একটা সুন্দর ফুলপাতাওয়ালা গাছ হয়ে যাব।

[প্রথম হঠাৎ তৃতীয়'র জামা চেপে ধরে]

১ম সৈনিক।। আর একবার -আর একবার যদি বাঁ পা ডান পা করেছিস তো তোকে কামড়ে দেব। তোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব-কুকুরের মুখে ছুঁড়ে দেব...হাড়গোড় চিবিয়ে চিবিয়ে খাব।
৩য় সৈনিক।। ওকে দ্যাখ—
১ম সৈনিক।। আমার মাথা ঘুরছে ; ভেতর কাঁপছে, আমি আর একটু খাব।
৪র্থ সৈনিক।। হয়েছে, এবার ওঠ, এখুনি ওদিকে ডাক পড়বে। ঘোরটা কাটিয়ে নে।
১ম সৈনিক।। না আমি আরো খাব...অনেকটা খাব।
সবাই।। আচ্ছা-যা-ঠিক আছে।

[সকলে মদ খায়]

১ম সৈনিক।। আমি স্বাধীন হয়ে গেছি...আঙুলগুলো এবার বেশ নড়ছ তো বাবা! যা বলব ধরতে পারবে? কষে মুঠো করতে পারবে? আচ্ছা-ধরতো বাবা নিজের গলাটা। ধরনা-ধর-ধরেছ-ধর-হ্যাঁ।

[নিজের গলা চেপে ধরে]

আচ্ছা এবার চাপ দাও দুহাতে—এ্যাঁই! দাও-দাও-আক-আক্-ক্!

সবাই।। হে-ই-ই!

[সবাই ছাড়িয়ে দেয়]

১ম সৈনিক।। খবরদার, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের কেউ নই, আমি পালাব, আমি আমার হাতের এই উল্কিটা নিয়ে নিশ্চয়ই পালাব, পালাবই আমি...ভদ্রলোকের এক কথা...ঠিক পালিয়ে যাব...এই উল্কিটার কাছে।

২য় সৈনিক।। এটার মাথায় জল ঢেলে দাওতো, যাতে মাতালটা সাঁতার কেটে ফিরতে পারে।

[সবাই একসাথে ওয়াটার বট্‌ল্ উপুড় করে শূন্য দেখে হেসে ওঠে।]

চল আমরা এগোই-ও রঙিন জলে সাঁতরে আমাদের ধরবে।

সবাই।। আমরা সাঁতার কাটব-রঙিন জলে...আমরা সাঁতার কাটব...মাছের মত আমরা সাঁতার কাটব!

[সবাই হেসে প্রস্থান করে]

১ম সৈনিক।। আরে! এই! আমাকে একা রেখে কোথায় যাচ্ছ? আমিও যাব। একা একা যে আমার ভয় করে - হাতের উল্কিটা ঘামে ভিজে যেন উঠে যেতে চায়। আমাকে ফেলে যেওনা...নিয়ে যাও...আমিও যাব। আরে আমার পা...আমার পা কোথায় গেল? আমার কি যেন একটা হচ্ছে!

[উল্লসিত সাগর প্রবেশ করে]

সাগর।। আমি রাজা, বনের রাজা, দ্বীপের রাজা। আমার গান করতে ইচ্ছে করছে, নাচতে ইচ্ছে করছে, হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে ওই উঁচু আকাশটা ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

১ম সৈনিক।। কে হে তুমি? অ্যাই দ্যাখ্ - ঘুরতে ঘুরতে দম যে ফুরিয়ে ফেলবে। কোথাকার রাজা বললে?

সাগর।। বললুম না, বনের রাজা। আজ এই একটু আগে আমি রাজা হয়েছি। আর যেইমাত্র রাজা হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ফুটফুটে মেয়ে চুপিচুপি রাণী হয়ে গেল। রঙন—আমার রঙন!

১ম সৈনিক।। একটু খাবে নাকি ভাই। তাহলে রাজা থেকে সম্রাট, আর তারপর সম্রাট থেকে একবারে সেই জগদীশ্বর। কিন্তু নেশাটি ভাঙলেই আবার সেই বাঁ-পা আর ডান-পা।

সাগর।। এই শোন না—জান আমি একটা দারুণ কাজ করেছি। আমি তোমাদের বানানো উঁচু বিকট বিশ্রী পাহাড়টার চূড়ায় লাথি মেরে কি প্রচণ্ড মজা পেয়েছি। আমি কি করেছি তোমাদের বলব না, না তোমাদের কাউকে বলব না। যখন এই দ্বীপের সবাইকে বলব ওরা আমায় নিয়ে বিরাট ভোজ দেবে, হ্যাঁ সারারাত ধরে নাচ হবে, গান হবে—আমরা আনন্দের ঘোরে কেউ ঘুমোবই না। রাজার মুকুট পরব মাথায়, আর রঙন—না রঙনের কথা আমি কাউকে বলব না—বলব, কেবল আমার রঙনকেই বলব।

১ম সৈনিক॥ লোকটার দেখছি আমার চেয়ে বেশি নেশা হয়েছে। একটু জল ঢালব নাকি মাথায়—অ্যাঁ?

সাগর॥ তোমরা সবাই মিলে কি খুঁজছ আমি জানি।

১ম সৈনিক॥ কী জান, কী খুঁজছি আমরা?

সাগর॥ একটা হারিয়ে যাওয়া গোলা—একটা নোংরা, ভয়ঙ্কর মানুষখেকো গোলা।

১ম সৈনিক॥ কোথায় দেখলে?

সাগর॥ তোমরা কেউ সেটা খুঁজে পাওনিতো? খাল বিল জঙ্গল চষে ফেলেও পাওনি আমি জানি।

১ম সৈনিক॥ তুমি কোথায় দেখলে আমাকে বল? আমি ওদের বলে দিলে একটা মোটা বকশিস্ পাব হয়তো। তুমি আমাকে বল-বল আমাকে। আমার নেশা কেটে গেছে —আমি ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব।

সাগর॥ আমি ঐ গোলাটাকে কি করেছি শুনলে তোমার বিশ্বাসই হবে না। আমি, শুধু আমিই প্রথম পেরেছি। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে না, রঙন কিন্তু বুঝবে, কেবল রঙন বুঝতে পারবে। ঠিক আমারই মতো বুঝবে।

১ম সৈনিক॥ ঠিক আছে বাবা, আমি চলি, অন্তত তোমার কথাটা কর্তাদের জানালেও ছোটখাট কিছু একটা মিলতেও পারে—বলা যায় না। চলি হে। কেমন? চললাম।

[প্রথম সৈনিক প্রস্থান করে]

সাগর॥ রঙন! রঙন!! রঙন!!!

[রঙন প্রবেশ করে]

রঙন॥ কি! চেঁচিয়ে যে আকাশ ভেঙে ফেলবে। আমি কি শুনতে পাইনা, মরেছি নাকি?

সাগর॥ তোমাকে যে ডাকছি তা আমি সবাইকে শোনাতে চাই-সব্বাইকে।

রঙন॥ তা না হলে সবাই মিলে তোমাকে পাগল বলবে কেন?

সাগর॥ তুমি জাননা রঙন—এখন আমি ডাকলে ওরা সকলে তোমাকে দোলায় করে নিয়ে আসবে।

রঙন॥ ওঃ! কেন, তুমি কে?

সাগর॥ আমি? আমি বনের রাজা - দ্বীপের রাজা। আর আমি যেই রাজা সঙ্গে সঙ্গে তুমি রাণী, ভীষণ সুন্দর ছোট্ট একটা রাণী।

রঙন॥ কে রাজা করল তোমাকে?

সাগর॥ আমি নিজে। জান, কাউকে বলিনি—এইখানে ভিতরে লুকিয়ে রেখেছি। কেবল তোমাকে বলব বলে। তুমি যেই খুশি হবে-হাসবে-অমনি গাছ ফুল পাতা আলো আকাশ সব কিন্তু আমাকে রাজা-রাজা বলে চেঁচিয়ে ডাকবে...মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে। দোলন কোথায়?

রঙন॥ খেলছে। দুর! কি করেছ তা বলছনা, কেবল অন্য কথা বলে যাচ্ছ!

সাগর॥ রঙন এই দ্বীপে অনেক সৈনিক এসেছে তাই না?

রঙন॥ হুঁ, এসেছেই তো।

সাগর॥ কেন জান?

রঙন॥ তা আমি কি করে জানব? চৌকিদার বলছিল ভয়ানক একটা গোলা এখানে পড়ে

আছে, আর ওরা তাই খুজছে। সমস্ত ক্ষেতগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে এমন করেছে, দেখলে কান্না পায়। এখন সমুদ্রের তলায় কেমন অদ্ভুত পোশাক পরে সৈন্যগুলো নেমে গিয়ে খুঁজছে।

সাগর।। আমি নিজে দেখেছি রঙন - শয়তানের উড়ন্ত রথটায় যেই আগুন লাগল- তক্ষুণি সাদা রঙের একটা ছাতার মত থলিতে করে কি সব কয়েকটা নামতে লাগল। ওর প্রত্যেকটাতে গোলা ছিল। যে লোকটা চালাচ্ছিল সে মরল, আর ঐ বিদঘুটে গোলাগুলো বাঁচল। ওর একটা ফাটলে এক একটা দ্বীপ গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমি, রঙন - আমি টম্যাটো ক্ষেতের মধ্যে একটা গোলা দেখতে পেয়েছি। আমি - আমি ছাড়া কেউ জানে না।

রঙন।। ঐ জিনিশ - ঐ ভয়ানক জিনিশটার কাছে তুমি গেলে! কাছে গিয়ে দেখলে! তুমি কিগো!

সাগর।। হ্যাঁ গেলুম। তরমুজের মত অর্ধেকটা ফাটা—চকচকে গোলমত একটা জিনিশ, মনে হল শয়তানের কাটা মুণ্ডু ওঁৎ পেতে পড়ে আছে। মনে হল হাজার হাজার মানুষ গিলে খাবে বলে একটু যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। যতবার তাকাচ্ছি, ততবার সমস্ত রক্ত রাগে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আমি আস্তে আস্তে কাছে গেলুম, তারপর পায়ে সমস্ত রাগ আর ঘেন্না জড়ো করে একটা লাথি মারলুম।

রঙন।। তুমি ঐ দানোটার কাটা মুণ্ডুতে লাথি মারলে! যদি ফেটে যেত!

সাগর।। হুঁ! ফাটলেই হল! আমার কি কম দাম, সবাই বলে পাগলা সাগর, ক্ষেতে সব্বাইর সঙ্গে হৈ চৈ করে কাজ করি, দোলন সোনাকে কাঁধে তুলে নাচি - তোমাকে ভীষণ ভালবাসি - আমি এতো তাড়াতাড়ি মরব কেন?

রঙন।। আহা, তুমি মববে না এটা যেন ঐ রাক্ষসটা ভেবে চিন্তে চলবে। ওর কোন ভাবনা নেই। ওটা রাক্ষস। রাক্ষস কখনও অন্যের কথা ভাবে না।

সাগর।। ভাবনা তাহলে আমারও নেই। রঙন, ঐ বিদঘুটে গোলার ফাটা চেহারাটা দেখে আমার দারুণ ঘেন্না করছিল। তাইতো আমি লাথি মারলুম, ঘেন্নায় থুতু দিলুম, তারপর পা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে জলে ঠেলে ফেলে দিলাম। জানো রঙন, এই পৃথিবীতে আমি, আমিই প্রথম ওই গোলার গায়ে লাথি মেরেছি। আমি এই বিরাট পৃথিবীটায় প্রথম লাথি মেরেছি। তাইতো আমার থেকে বড় কেউ নেই, কেউ বড় নেই...আমি দ্বীপের রাজা, বনের রাজা, আমি রঙনের রাজা।

রঙন।। শোন, মোড়লবুড়োকে সব বোলো, কিন্তু তুমি রঙনের রাজা এসব যেন আবার বলে বোসো না, তোমার তো কোনও বুদ্ধি নেই।

সাগর।। বেশ করব বলব, আমার যা খুশি তাই বলব।

রঙন।। তাহলে তোমাকে ছেড়ে ঘর ছেড়ে দেখো ঠিক চলে যাব। আমারও যা খুশি করব।

সাগর।। ঘর কেন, বল রাজবাড়ি, আচ্ছা রঙন দ্বীপের সকলে যখন ব্যাপারটা শুনবে, তখন কেমন মজা হবে বল তো, ওরা সবাই আমাকে বিরাট বীর ভাববে তাই না?

রঙন।। হ্যাঁ। দাঁড়াও আমি সব্বাইকে খবরটা দিয়ে আসি।

সাগর।। রঙন!
রঙন।। কি বলছ গো?
সাগর।। তুমি একটু আমার কাছে এসে দাঁড়াও।
রঙন।। না দাঁড়াব না।
সাগর।। তাহলে আমি দৌড়ে তোমাকে ধরব। তুমি যত ছুটবে, আমিও তত ছুটব। সক্কলে দেখবে—বেশ ভাল হবে!
রঙন।। ইস্!
সাগর।। তোমাকে আমার দারুণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে!
রঙন।। হঠাৎ-হঠাৎ তোমার এমন সব খেয়াল হয় না!
সাগর।। হঠাৎ-হঠাৎ নয়, আমি রাজা হলুম যে, রাজার পাওনা?
রঙন।। রাণীর পাওনা থেকে নিয়ে নিও।...আমি যাই, সব্বাইকে খবরটা দিতে হবে না বুঝি! এই জান, সকলের আগে না দোলনকে বলব—সবার আগে।
সাগর।। বেশ যাও।
রঙন।। শেষে সত্যি সত্যি তুমি আমার পেছনে দৌড়েবে না তো? তুমি সব পার!
সাগর।। হু দৌড়তেও পারি—খুশি হলেই পাবি।
রঙন।। উঁ! দেখি কেমন ধরতে পার?
সাগর।। দেখবে?
রঙন।। হ্যাঁ এই তো যাচ্ছি।

*[রঙন দৌড়লে সাগর গিয়ে ধরে ফেলে—তাকে কাছে টেনে আনে—খুশিতে দুজনেই একসাথে হেসে ওঠে—
চৌকিদারের শঙ্খধ্বনি শোনা যায়—
নেপথ্যে—জাগো-জাগো—জাগো!]*

রঙন।। এই চৌকিদার! আমি যাই—
সাগর।। তাতে কি?
রঙন।। যাঃ!

[রঙন হাত ছাড়িয়ে চলে যায়]
[নেপথ্যে-জাগো-জাগো-জাগো!]
[সাগর কান পেতে শোনে]

সাগর।। চৌকিদার, আমি জেগে আছি। আমি তো জেগেই আছি।
চৌকিদার।। হ্যাঁ দ্বীপের রাজা জেগে আছে—জেগে আছে।

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সাগরের বাড়ীর সামনে। দরজা বন্ধ]

১ম।। সাগর, সাগর! রঙন আছ? দোলন! ঘরতো ভিতর থেকে বন্ধ—হল কি?

ঝুমকো।। রঙন, এই রঙন! দরজা খোলনা রে! সভায় এতক্ষণ লোক জমে গেছে। কিরে দ্বীপের রাজাকে সাজিয়ে দিচ্ছিস নাকি?

চন্দন।। সাগরকে যে ফুলের মালাটা দেবে, ওটা আমি একবার গলায় পরে দেখব, কেমন দেখায়। ফুলের মালায় আমায় বড় মানায় গো!

ঝুমকো।। আহাঃ! নিজের গলায় পাবার তো যোগ্যতা নেই—।

চন্দন।। শয়তানটা আমাকে ছেড়ে গেছে, এবার ওই গোলাটা পেলে আমিও দু'পায়ে লাথি মারব, মরা ব্যাঙের মত বাঁ হাতে তুলে ঘুরিয়ে সমুদ্রে ছুড়ে দেব।

ঝুমকো।। তোমার বীরত্ব আমার জানা আছে, টিকটিকি দেখলে কুমীরের ভয়ে আঁতকে ওঠো—।

চন্দন।। যাঃ, তুমি তো সব জান!

ঝুমকো।। জানিই তো!

২য়।। এই দ্বীপে নাকি আরও গোলা কোথাও লুকিয়ে আছে, ওরা খুঁজে পাচ্ছে না, পারিসতো দেখনা—কিন্তু সকলের আগে আমাদের সাগর ভাইতো লাথিটা মারল, প্রথম পাওনাটা ওর—

৩য়।। দেখ ভাই, সভাই কর আর যাই কর, ভোজের ব্যাপারটা যেন বেশ সরগর হয়! জিভটা কেবল কথা বলবার জন্য নয়—তোমরা সব এত ভুল বোঝ!

২য়।। খাবার জিনিশ দেখলে তোর সমস্ত শরীরটাই একটা লম্বা জিভের মত চকচক করে ওঠে।

৩য়।। উদরটাই আসল রে। উদর কথাটা ঔদার্য্য শব্দ থেকে এসেছে, হুঁ, শাস্ত্রতো পড়িস নি, আর খাদ্যের অভাব থেকে খেদ!

১ম।। যা বলেছিস আমাদের লেখাপড়া জ্ঞান নেই যে!

[৪র্থ শাঁখ ও ফুল নিয়ে এল]

৪র্থ।। কি হল তোদের? ওদিকে সভার লোক উঠে যেতে শুরু করেছে। সাগরকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাবে বলে এসে এখানে বসে বসে বুঝি সব গল্পে মেতেছ, অ্যাঁ?

ঝুমকো।। না, না, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ যে!

৪র্থ।। তা ডাক না—দরজায় ধাক্কা দে। কদিন ধরে এত নাচ-গানের হুল্লোড় হল, হয়তো ক্লান্ত হয়ে বেমালুম ঘুমুচ্ছে। কালতো হঠাৎ শুয়ে পড়েছিল শিমূলতলায়, বলছিল যে মাথা ঘুরছে।

৩য়।। সত্যি, মুখখানাও কেমন কালো হয়ে গেছে—সেদিনতো গানের পালা থেকে উঠে এল।

২য়।। টেনে ঘুমুচ্ছে হয়ত, রঙনকে তো একটু আগে দেখলুম মোড়লপাড়ার দিকে এগুচ্ছে।

১ম॥ চেঁচিয়ে ডাকি তবে—সাগর, সাগর!

[দরজা খুলে পূজারী ঠাকুর এল]

ঝুমকো॥ পুজোরি ঠাকুর, তুমি এখানে? কি হয়েছে সাগরের?

পূজারী॥ আকাশের ঐ পশ্চিমকোণের মেঘখানা দেবতার লাল চোখের আগুন লেগে জ্বলছে।

১ম॥ কেন, দেবতার কোপ পড়েছে কেন ঠাকুর?

পূজারী॥ পাপ, পাপ ঢুকেছে দ্বীপে। সাবধান, সকলে সাবধান।

২য়॥ ঠাকুর, তোমার মুখ কেমন যেন গম্ভীর!

পূজারী॥ দেবতার থানে যাবি সব, শান্তি জল ছিটিয়ে দেব।

ঝুমকো॥ এখানে এসেছিলে কেন?

পূজারী॥ রঙনের ডাকে এসেছিলুম—সাগরের মাথায় দেবতার ফুল ছোঁয়াতে, হাতে শিকড় বেঁধে দিতে।

চন্দন॥ কেন? কি হয়েছে ওর?

পূজারী॥ শরীরটা সুয্যিঠাকুরের রাগে পুড়ে ওঠা পাথরের মত গরম। বিড়বিড় কি সব বকছে, পেটের ভেতর থেকে উগরে আসতে চাইছে সব কিছু। দেবতার মন্তর দেওয়া শিকড়টা হাতে বেঁধে দিলাম, সেটা কালো হয়ে উঠল-ফুলটা মাথায় দেওয়া মাত্র শুকিয়ে মুষড়ে পড়ল। কি যেন হয়েছে সাগরের বুঝতে পারছি না। যাচ্ছি দেবতার থানে—হত্যে দেব—জিগ্যেস করে জানব—আমাকে জানতেই হবে। তোরা কিন্তু সবাই সাবধানে থাক—সাবধান—সাবধান।

[পূজারী চলে যায়]

ঝুমকো॥ কি হল বলতো?

চন্দন॥ জানিনা।

৪র্থ॥ ডাক ওকে।

২য়॥ চেঁচিয়ে ডাকা যাক্।

১ম॥ সাগর—সাগর—সাগরভাই

[রুগ্ন সাগর বাইরে এসে দাঁড়ায়]

চন্দন॥ কি হয়েছে তোর সাগর? এরকম দেখাচ্ছে কেন?

সাগর॥ আমি—আমি আর বাঁচব নারে চন্দন। মরে যাব আমি।

ঝুমকো॥ কোন শত্তুর বলে একথা? কি হয়েছে? কই রঙন কোথায়?

সাগর॥ গুণিনের কাছে গেছে। আমার—ওঃ—

[বমি পায় সাগরের]

১ম॥ হঠাৎ শরীরটা তোর খারাপ হল কি করে?

সাগর॥ ঐ শয়ত্বানের কাটা মুণ্ডুটায় লাথি মারার পরের রাত্তির থেকেই কী একটা হল ; ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—বমি পাচ্ছে আমার ; রক্ত কালো হয়ে যাচ্ছে। শরীরের ভিতরটা কালো হয়ে যাচ্ছে। বুকে-পেটে কি ভীষণ ব্যথা করছে।

২য়॥ এস, সাগরকে ধরে এনে বসাই।

১ম॥ আয়।

সাগর।। না কেউ ছোঁবে না আমাকে, কেউ এসনা। শয়তানের আত্মা আমার মধ্যে ভর করেছে। শয়তানটা ভিতরে ঢুকে আমাকে মারতে চায়। আমি—আমি দোলনকেও ছুঁইনি, ছুঁতে দিইনি আমাকে, কেবল রঙনটা কিছু শুনল না। দানোটা বোধহয় ওকেও—হ্যাঁ, ওকেও ছাড়বে না।

৩য়।। মোড়লবুড়োকে এক্ষুনি খবরটা দেওয়া দরকার।

৪র্থ।। সভা তাহলে আর হল না।

চন্দন।। কিসের সভা!

১ম।। যাকে নিয়ে সভা তার কথাইতো আগে ভাবতে হবে।

[দোলনকে নিয়ে রঙন এল]

ঝুমকো।। গুণিন এল, রঙন?

রঙন।। আসছে, কিন্তু ওর একি হল রে ঝুমকো?

সাগর।। শয়তান! দানোর দৃষ্টি! গুণিনকে ডাকো, গুণিনকে দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে আমার ভিতর থেকে আপদটাকে তাড়াতে হবে। ওঃ আমার ভীষণ বমি পাচ্ছে ; রঙন, রঙন! উঃ, পেটের ভিতরটায় কী ভীষণ ব্যথা।

দোলন।। মা-মাগো, বাবার কি হয়েছে?

সাগর।। ওকে তোমরা আসতে দিওনা—আমার কাছে আসতে দিওনা।

রঙন।। তুই ওকে দেখ্ ঝুমকো।

৪র্থ।। গুণিনকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয়। আর যা, মোড়লবুড়োকে খবরটা দে।

[১ম দ্রুত চলে যায়।
ঝুমকো দোলনকে কোলে নেয়]

দোলন।। না, আমি যাব, ঘরে যাব। মার কাছে যাব—বাবা!

ঝুমকো।। একটু আমার কাছে থাক, দোলন। লক্ষীটি, সোনা আমার। আমি তোকে খেলনা দেব, ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুন্দর ময়ূরপঙ্খী নৌকো বানিয়ে দেব।

দোলন।। চাইনা—আমি কিছু চাইনা। আমি বাবার কাছে যাব।

২য়।। ওকে একটু বাইরে নিয়ে যা ঝুমকো।

দোলন।। আমি যাব না--যাব না—যাব না আমি!

[গুণিন এল]

গুণিন।। রঙ্গন, রঙন! সাগরকে নিয়ে আয় এখানে।

[সাগরকে নিয়ে এল রঙন]

সাগব।। গুণিন ভাই, দানোয় আমাব বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি মরে যাব! আমার বমি পাচ্ছে। শরীরের ভেতরটা কালো হয়ে যাচ্ছে। আমি তাকালে আগের মতো আর দেখতে পাই না। আচ্ছা গাছপালার রঙ কি কালো হয়ে যাচ্ছে? আকাশ কি কালো মেঘে ঢেকে গেছে গুণিন ভাই?

গুণিন।। এখানে বস সাগর।

[আগুনে ধুনো দিলে কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে]

সাগর।। আমি দেখতে পাচ্ছি, ঐ ধোঁয়ার মধ্যে শয়তান একটা কালো সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে ফণা তুলছে ; তোমরা পালাও, পালাও সবাই। উঃ, কি ভয়ঙ্কর উঁচু ফণা

তুলছে। আকাশটাকে পর্যন্ত ছোবল দিয়ে বিষাক্ত করে দেবে। দ্বীপটা কি কালো ছিল গুণিন ভাই! মাটি কি সুন্দর ছিল! সাপটা এখন রাজত্ব করছে, এই মাটিতে কালো বিশ্রী শরীরটা পাকিয়ে পাকিয়ে চলছে, দুলছে, দুলে দুলে এই দ্বীপের সিংহাসন দখল করবে—চড়ে বসবে। আমি দ্বীপের রাজা, আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে!

গুণিন।। একেবারে চুপ কর সাগর।

[মন্ত্রপড়া ধুলোব আঘাতে সাগর আর্ত চিৎকার করে বসে পড়ে]

রঙন।। ওর বড় কষ্ট হচ্ছে—অসুখের শরীরে ভীষণ কষ্ট ওর, গুণিন ভাই।

গুণিন।। অসুখ সারানোর ওষুধ যে তেতোই হয়। ওর ভেতরের শয়তানটা কি বলে শুনতে হবে যে। সাগর, এখন কোথায় আছ?

সাগর।। এই দ্বীপ—আমার সোনার দ্বীপে।

গুণিন।। তোর শরীরে কে ঢুকেছে, শয়তান?

সাগর।। না।

[গুণিন ঝাঁটার আঘাত করে—রঙন বাধা দিতে চায়—ঝুমকো ওকে ধরে]

রঙন।। গুণিন ভাই, ওর লাগছে?

গুণিন।। তোর শরীরে কে ঢুকেছে? শয়তান? কে তুই? বল তুই কে?

সাগর।। শয়তানের পাপ।

গুণিন।। তুই কেন এসেছিস?

[সাগর হাসতে থাকে]

গুণিন।।-কে তুই!

সাগর।। বললাম না শয়তানের পাপ।

গুণিন।। সাগরের ভেতর ঢুকেছিস কেন?

সাগর।। নিযে যাব বলে। সাগরকে নিয়ে যাব।

রঙন।। মাগো!

গুণিন।। কোথায় নিযে যাবি?

সাগর।। এই দ্বীপের থেকে। বাতাসের কাছ থেকে। আকাশের কাছ থেকে। বহুদূরে—অনেক দুরে।

গুণিন।। কেন? কি দোষ করেছে সাগর?

সাগর।। আমার গায়ে ওব পায়ের ছাপ লেগেছে। আমি সহ্য করি না। কিছুতেই সহ্য করি না। কখনও সহ্য করিনা আমি— *[হাসি]*

গুণিন।। তুই চলে যা।

[সাগর হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়]

গুণিন।। সাগরকে ছেড়ে চলে যা!

[সাগর অবসন্ন হয়ে পড়ে]

গুণিন॥ ওর ভিতরের এই বিশ্রী হাসিটাকে তাড়াতে হবে।

[সাগর আবার হাসতে থাকে]

সাগর॥ আমি তোদের তাড়াব। সাগরকে নিয়ে যাব।

রঙন॥ আমি চলে যাচ্ছি গুণিন ভাই। আমি আর শুনতে পাচ্ছি না—শুনতে পারছি না।

[নেপথ্যে মোড়ল—রঙন, রঙন—
১ম ও মোড়লের প্রবেশ]

মোড়ল॥ কি হল সাগরের?

গুণিন॥ শয়তানটা ওর ভেতরে ঢুকে পরে ওকে মারছে। কষ্ট দিচ্ছে। বিকট হাসছে।

রঙন॥ কি হবে মোড়ল বুড়ো?

মোড়ল॥ ভয় পাসনে। সব ঠিক হবে। চৌকিদার এসেছিল আমার কাছে। আমাদের সকলের বিপদ রঙন—সবাই-এর বিপদ।

১ম॥ কিসের বিপদ মোড়লবুড়ো?

মোড়ল॥ হয়তো আমাদের এই দ্বীপ ছেড়ে পালাতে হবে।

সবাই॥ সে কি!

[সাগর হাসতে থাকে]

২য়॥ কি বলছ?

৩য়॥ আমাদের সাতপুরুষের মাটি আমরা পিছনে ফেলে পালিয়ে যাব?

৪র্থ॥ ঐ সেপাইগুলো বোধহয় রাজত্ব করবে?

ঝুমকো॥ আমি জানতাম, ওরা সব দানোর চর। ধীরে ধীরে আমাদের সব গিলে খাবে। আমাদের সব কিছু ছারখার করে দেবে।

১ম॥ স্বপ্নের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঐ শয়তানের রথটা বিরাট ডানা মেলে আমাকে কি ভীষণ তাড়া করেছিল।

রঙন॥ কেন, আমরা চলে যাব কেন?

সাগর॥ *(হেসে)* আমি জানি—সব জানি—কেন চলে যেতে হবে—আমি জানি।

গুণিন॥ সাগর।

সাগর॥ কিন্তু আমি যাব না—যাবই না—কিছুতেই যাব না। গুণিন ভাই, আমি ছোটবেলায় এই ধুলোতে খেলেছি, এই আকাশের বৃষ্টি আমার গায়ে লেগেছে, মাঠের ফসলের মত জল মাটির মধ্যে থেকে আমি বড় হয়েছি। আমাকে এই দ্বীপ থেকে ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে কোথায় ফেলবে? আমি যাব না—যেতে পারব না।

ঝুমকো॥ ঐ সেপাইগুলো এলে ওদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব। আমরা চাই না—ওদের চাই না।

[নেপথ্যে চৌকিদার-জাগো-জাগো]

মোড়ল॥ ঐ যে চৌকিদার আসছে।

[চৌকিদার এল]

মোড়ল॥ চৌকিদার কোনও নতুন খবর পেলে?

১ম॥ আমাদের এই দ্বীপ ছেড়ে কেন পালাতে হবে চৌকিদার?

২য়॥ কিন্তু কেন--কেন পালাব?

[সাগর হাসতে থাকে]

চৌকিদার।। এই দ্বীপের সমস্ত মাটিটা কাঁপছে। আমি হাঁটলে টের পাই। মানুষগুলোর স্বপ্নে ভয়ের হাওয়া ঢুকেছে। গাছের তলায় নাচের আসর বসলে মাদলটা এক এক সময় ভুল শব্দে বেজে ওঠে, পায়ের তাল থরথর করে কাঁপে। তাকাও চারিদিকে, কি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাই না। কে যেন বুকে চুমুক লাগিয়ে রক্ত শুষছে, অবশ লাগে না?

চন্দন।। কেন এমন হল চৌকিদার?

চৌকিদার।। আমাদের চলে যাবার সময় হয়েছে, আমাদের যেতে হবে। এই দ্বীপটা হয়তো বাঁচবে না।

১ম।। কেন বাঁচবে না, সে কথাটাই তো তুমি বলছ না।

চৌকিদার।। আমার মনে হচ্ছে। আমি টের পাই।

২য়।। তোমার তো ভুলও হতে পারে।

চৌকিদার।। *[হেসে]* আমি যাচ্ছি। আমাকে ঘুরে ঘুরে সব জানতে হবে।

*[সাগর ভীষণ কাশতে থাকে—
প্লেনের শব্দ হয়]*

সাগর।। শয়তান! দানোর রথ! ওর পেটের মধ্যে ঐ গোলাগুলো লুকনো। আকাশে যে লাথি পৌঁছয় না। ঐ শকুনটার হাড় পাঁজর যদি গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম! কিন্তু আমার দিনতো ফুরিয়ে এল!

রঙন।। তুমি শান্ত হও—চল ঘরে, চল।

সাগর।। দোলন কোথায়?

রঙন।। ঐ তো ঝুমকোর কাছে, দেখতে পাচ্ছ না?

সাগর।। রঙন-রঙন, আমি-আমি চোখে কম দেখছি রঙন।

রঙন।। ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসব?

সাগর।। না—না-না! শয়তানের নিশ্বাস যেন ওর গায়ে না লাগে। ও আমার রাঙা মাটির ফুল, বাগানের হাওয়ায় খেলবে, আমাদের নরম ঘাসগুলোয় পা ফেলে ছুটবে। জান রঙন, আমি যখন এই মাটিতে মিশে যাব, মাটির তলায় কচি পায়ের শব্দ ঘুঙুরের মত বাজবে, আমি শুনব।

মোড়ল।। ঘরে যা সাগর—। দোলন ভাল থাকবে—খুব ভাল থাকবে।

[নাবিক বুড়ো ছবির বাক্স নিয়ে ভিতরে আসে]

নাবিক।। নাবিক বুড়োর নতুন যাদু—সাতসাগরে—কিগো ধমক খেয়ে চুপ করে আছ? —জানি গো জানি, আমি সব জানি—সাতসাগরের ঢেউ লেগে আছে হাড়-পাঁজরে, হাঙরের দাঁত ভেঙে আছে বুকের কোণটায়—সাগরের অসুখ আমি জানি।

ঝুমকো।। কি অসুখ?

নাবিক।। সাগরের একটা ছবি এঁকে নেব, দ্বীপ থেকে যাবার সময় হল ; আমার যাদুর বাক্সটা নিয়ে দেশ দেশান্তরে যাব—সাগরের ছবিটা দেখাব। সবুজ দ্বীপটা কেমন দাঁনোর দাঁতে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে সকলকে ডেকে দেখাব।

১ম।। নাবিক বুড়ো, তুমি তাহলে ঠিক জান, কি অসুখ করেছে সাগরের।

নাবিক।। এই অসুখের অনেক ছবি আমি নানান দেশে কুড়িয়ে পেয়েছি গো। যাদুর খেলায় এই ছবিগুলো সাজিয়ে এনেছি, দেখবে যদি চোখ রাখ—ভয় বিপদের কথা জানতে হয়গো। নাবিক বুড়োর যাদুর খেলা, এস না চোখ রাখ—দেখ—

[চন্দন, ১ম ও ২য় দেখতে থাকে]

নাবিক।। দেশখানা দ্যাখো, দানোর খেলায় ছারখার। গোলা নিয়ে শয়তানের খেলা, মাঠ জঙ্গল জ্বলে গেছে গো, মানুষ জ্বলে ছাই গো।

[সবাই চোখ সরিয়ে নেয়]

চন্দন।। এ কাদের ছবি নাবিক বুড়ো, হাত নেই, পা নেই, চোখ পুড়ে গলে গেছে।

১ম।। বাচ্চা ছেলেটার চোখ দুটো কেবল গর্ত হয়ে আছে।

২য়।। এই ভাঙাচোরা, পচে-গলে যাওয়া মানুষগুলোকে কোন শকুনে ঠুকরে খেল নাবিক বুড়ো?

নাবিক।। শয়তানের গোলা ওদের দেশটায় গড়িয়ে পড়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে চেটে খাচ্ছে মানুষজন, জিভ বের করে মুখে পুরছে সাতপুরুষের মাটি। নরকগো-নরক-নরকের রাজা তাঁবু ফেলেছে সব দেশে। তাইতো বলি ভয়-বিপদের কথা জানতে হয় গো!

চন্দন।। তোমাদের এ ছবি আমরা আর দেখব না। ভয় দেখানো ছবি দেখাচ্ছ তুমি। সাতসাগরের নীল ঢেউগুলো আনলে না কেন ছবিতে—চোখ জুড়িয়ে যেত। নানা দেশের নীল আকাশখানা এঁকে আনলে না কেন—মুখে বুকে রঙ মেখে রঙিন হয়ে যেতাম।

নাবিক।। সব চুরি যাচ্ছে যে—আকাশ বাতাশ সব শয়তানের তাঁবু চুরি করে নিচ্ছে। আমারও দ্বীপ ছেড়ে যাবার সময় হল গো। যাওয়ার আগে সাগরের একখানা ছবি এঁকে নেব। দেশ দেশান্তরের লোকদের দেখাতে হবে। সবাইকে আবার বলি—ভয় বিপদের কথা জানতে হয় গো—আচ্ছা চলি। নাবিক বুড়োর নতুন খেলা...

[নাবিক বুড়ো চলে যায়]

মোড়ল।। নাবিক বুড়োও দ্বীপ ছাড়ার পরোয়ানা পেয়েছে।

[দূর থেকে মার্চের শব্দ ভেসে আসে]

সাগর।। ঐ ঐ সেই দানোর পায়ের শব্দ। ওরা আসছে! আমি ওদের দেখব না। আমি তাকাব না ওদের দিকে।

[চোখ ঢাকে দু'হাতে]

ঝুমকো।। আমরা ওদের ঢুকতে দেবনা এখানে।

১ম।। ওদের পা লেগে মাটি নোংরা হয়ে যাচ্ছে।

৪র্থ।। এরপর আমার কুড়ুলটা সঙ্গে নিয়ে চলব, ওদের রক্তপাতে পাপ নেই।

মোড়ল।। দেখাই যাকনা কেন আসছে।

[দুজন সৈনিক সহ চিকিৎসক এল]

২য়।। ও কী! একটা ভয়ঙ্কর বিকট যন্ত্র এনে তোমরা বাইরে রেখেছ কেন? কি চাও তোমরা?

৪র্থ।। কি চাই এখানে? আমরা আর কাউকে ভয় করি না। কি বিশ্রী বীভৎস ওই যন্ত্রটা।

১ম।। গোটা দেশটা তোমাদের পায়ের ভারে টলছে। যেখান থেকে এসেছ চলে যাও তোমরা। কে চায় তোমাদের—কে চায়! শয়তানের হাতের মত একটা কালো লম্বা কাঁটা ঐ যন্ত্রটায়?

৩য়।। তোমরা কেন এসেছে, আমরা তোমাদের ডাকিনি। যন্ত্রটাতে ভয়ঙ্কর লাল চোখের মত কি একটা জ্বলছে। যেন একটা একচোখো শয়তান।

চিকিৎসক।। আমি চিকিৎসক। আমাকে ভয় নেই। আমি সেবা করি।

ঝুমকো।। তুমি শয়তানের সেবা কর। আমাদের কাছে এসেছ কেন? ঐ যন্ত্রটা এনেছ কেন?

চিকিৎসক।। আমি অসুখের চিকিৎসা করি। সে যারই হোক। ঐ যন্ত্রটায় কোন ভয় নেই।

রঙন।। তোমরা এখানে অসুখ নিয়ে এসেছ। ঐ যন্ত্রটায় আরও অসুখ ছড়াবে।

চিকিৎসক।। যন্ত্রমাত্রই খারাপ নয়।

সাগর।। বেরিয়ে যাও তোমরা, বেরিয়ে যাও। তোমাদের সাধের গোলাটায় আমিই প্রথম লাথি মেরেছি, আমি কাউকে ভয় করি না, না কাউকে না। আমি তোমাদের গায়ে থুতু দেব। আমি চেঁচিয়ে তাড়িয়ে দেব। আঃ, তোমাদের দানোর মুণ্ডুটা আমাকে একটু একটু করে খাচ্ছে—আর শোধ নিচ্ছে। আঃ, শয়তানটা দাঁতে চিবোচ্ছে আমার ভিতরটা—দাঁতের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? শোনা যাচ্ছে? তবু আমি দ্বীপের রাজা, এখনো জোর আছে আমার। আমাদের সিংহাসন থেকে তোমাদের সাপটা টেনে নামাব।

চিকিৎসক।। আমি চিকিৎসক। তোমাদের দরকারেই এসেছি আমি।

সবাই।। না চাই না।

৩য়।। চাই না তোমাদের কোন দরকার।

৪র্থ।। যন্ত্রটা নিয়ে সরে পড়।

চন্দন।। শয়তানের খেলনাটা নিয়ে যাও।

১ম।। নইলে ওটা আমরা ভেঙে ফেলব।

সবাই।। হ্যাঁ, ভেঙে ফেলব।

ঝুমকো।। তোমাদের মনে বিষ, ওষুধে বিষ—তোমাদের যন্ত্রেও বিষ।

চিকিৎসক।। ওষুধে বিষ থাকে না। যন্ত্রটা তোমাদের উপকারে এনেছি।

৪র্থ।। তোমাদের মনের বিষ ওষুধে ঢুকেছে—মনের বিষ যন্ত্রেও ঢুকেছে।

চিকিৎসক।। আমি ওকে পরীক্ষা না করলে তোমরা সবাই মরবে।

৩য়।। মরি মরব। তোমার হাতে মরব না—তুমি পালাও এখন থেকে।

সবাই।। চলে যাও তোমরা।

চিকিৎসক।। তোমরা শোন—আমাকে তাড়িয়ে দিও না। আমি চিকিৎসক, আমি কারও শত্রু নই। ওকে পরীক্ষায় বাধা দিও না। মৃত্যুকে আমি চিনি।

চন্দন।। তোমার সঙ্গীদের আমি চিনি। ওরা মানুষ মারে। গোলা কোলে নিয়ে শয়তানের রথে ওড়ে। ওরা আমাকেও দলে টানতে চেয়েছিল, পারেনি। ওরা সব শয়তানের চর। ওদের দেখলে আমার রক্ত ক্ষেপে ওঠে।

চিকিৎসক।। বেশ ওরা না হয় চলে যাবে। কিন্তু ওকে পরীক্ষা করা আমার দরকার।

[সবাই প্রতিবাদে মুখর হয়]

মোড়ল ॥ চুপ কর সবাই। কি পরীক্ষা করবে তুমি? আমাদের গুণিন ওকে পরীক্ষা করেছে।

চিকিৎসক ॥ আমার অন্য পরীক্ষা। লোকটি যে গোলায় পা দিয়েছে সেটা বিপজ্জনক। ঐ গোলাটা ফাটা ছিল। ওর ভেতরের বিষাক্ত চূর্ণ ওকে ছুঁয়ে দিলে—সে ভয়ঙ্কর। এখনই ওকে পরীক্ষা করা দরকার।

সবাই ॥ না।

মোড়ল ॥ থাম। বেশ তোমার ঐ সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে কেবল তুমি পরীক্ষা করতে পারে। তারপর তুমিও চলে যাবে।

চিকিৎসক ॥ কেবল ঐ যন্ত্রটা থাকবে, ওটা পরীক্ষার যন্ত্র-নির্দোষ।

ঝুমকো ॥ বেশ, তোমার কাজ চটপট সেরে চলে যাবে।

চিকিৎসক ॥ যন্ত্রটার সামনে ওকে যেতে হবে। যন্ত্রটায় একটা কাঁটা আছে। ও ওটার সামনে দাঁড়ালে বোঝা যাবে গোলাটা থেকে কতখানি মৃত্যুবিষ ওর দেহে ঢুকেছে। গোলার বিষাক্ত ধোঁয়া ওর দেহে ঢুকলে অনিবার্য মৃত্যু। কাঁটা যত দ্রুত তত তীব্র বিষের ক্রিয়া ওর মধ্যে। সৈন্যরা তোমরা চলে যাও। কই হে ওঠ—যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। উঠে দাঁড়াও।

সাগর ॥ না, আমি উঠব না। আমি তোমাদের কথা শুনব না। আমি কিছুতেই উঠব না।

চিকিৎসক ॥ ওঠ। যাও। বাঁচার জন্যে যাও।

সাগর ॥ তোমাদের দয়ায় বাঁচতে চাই না আমি। উঠব না।

মোড়ল ॥ ওঠ সাগর।

[ক'জন সাগরকে ধরতে যায়]

চিকিৎসক ॥ না। কেউ ছোঁবে না ওকে। ওর দেহ বিষাক্ত হলে যে ওকে ছোঁবে তার দেহেও মৃত্যুবিষ ছড়িয়ে পড়বে।

সাগর ॥ কিন্তু রঙন, রঙন আমাকে ধরেছে। আমি ওকে অনেক নিষেধ করেছিলাম। তবু, তবু ও শোনেনি। আমি বলেছিলাম—আমার ভেতর শয়তান ঢুকেছে, আমার কাছে এস না—রঙন শোনেনি—এই প্রথম ও আমার কথা রাখেনি।

রঙন ॥ আমি কেমন করে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকব গো। কত কষ্টে দোলনকে দূরে রেখেছি।

চিকিৎসক ॥ যন্ত্রটার একবারে কাছে যাও। পায়ের কাছের কাঠটায় পা রাখবে। যাও।

[সাগর চলে যায়, একটা যান্ত্রিক শব্দ তীব্রতর হয়]

সবাই ॥ ইস্!

রঙন ॥ *[আর্ত চিৎকার]* ঘুরছে, কাঁটাটা ঘুরছে—কী-ভীষণ ঘুরছে কাঁটাটা।

[সাগর ভিতরে আসে]

সাগর ॥ আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি না—আমি জানতাম, জানতাম—দানোটার পা ঐ কাঁটাটার ভেতরে ভয়ঙ্কর আনন্দে নেচে উঠবে। রঙন, আমি জানতাম—আমি জানতাম, মোড়ল বুড়ো!

চিকিৎসক ॥ *[রঙনকে]* যাও; তুমি দাঁড়াও।

রঙন।। না আমি যাব না। আমি জানি ঐ কাঁটাটা নড়ে উঠবে—ভীষণ নড়বে। আমি জানি আমরা মরে যাব!

চিকিৎসক।। যাও!

রঙন।। না!

মোড়ল।। যা রঙন।

[রঙন যন্ত্রে দাঁড়ালে আগের শব্দ হয়]

সাগর।। *[আর্ত চীৎকার]* আমার চোখের দৃষ্টি কেন একবারে ফুরিয়ে গেল না। কাঁটাটা ঘুরল। আমি মেরেছি সবাইকে—সবাইকে মেরেছি আমি। পালাও—তোমরা সবাই পালাও। আমি ছুঁয়ে দিলে তোমরা মরবে। আমি মরণ—আমি মৃত্যু—আমি যম! আমি দ্বীপের রাজা নই, মৃত্যুর রাজা—আমি শনি—আমি যম! কিন্তু এ আমি চাইনি —এতো চাইনি আমি!

[রঙন ধীর পায়ে সাগরের কাছে আসে]

রঙন।। এখন আমি তোমার কাছে থাকব। আর কেউ আমাকে সরে যেতে বলবে না। দেখ একদিন বলেছিলাম না—যদি মরি—দুজনে একসঙ্গে মরব। শোন-তোমরা দোলনকে যন্ত্রের সামনে নিও না—আমি ওকে ছুঁয়েছি যে। যদি কাঁটাটা নড়ে ওঠে! না না, ওকে যন্ত্রের কাছে নিয়ে যেও না মোড়ল বুড়ো। সইতে পারব না—আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

চিকিৎসক।। কিন্তু ওকেও পরীক্ষা করা দরকার।

রঙন।। না, কখনও না। ঝুমকো তুই রেখে দে ওকে, আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। ঘুমন্ত দোলনকে জাগাস না। ও যেন জানতেও না পারে। তুই তো—না না তুই তোর কাছে রাখ—ওকে নিয়ে নে—একবারে দিয়ে দিলাম তোকে। আমি দেখতে পারব না—পারব না।

মোড়ল।। ওকে ছেড়ে দে ঝুমকো!

[ঝুমকো দোলনকে ছেড়ে দেয়]

রঙন।। ঝুমকো তুই ভয় পাচ্ছিস, দোলন তবে কার কাছে থাকবে, কার কাছে? আমি ছুঁতে পারব না। ও ছুঁতে পারবে না, তোরা কেউ ছুঁবি না—কি হবে দোলনের —বল-ওর কি কেউ থাকবে না?

মোড়ল।। ওকে পরীক্ষা করুক চিকিৎসক। ও যদি সত্যি বিষাক্ত হয়, তাহলে ওকে ছুঁয়ে সবার মরা ঠিক নয়। শোন রঙন, তোর ভয় করছে পরীক্ষা করতে, বেশ আমি নিয়ে যাচ্ছি। ওর পরীক্ষা দরকার—ওর নিজের জন্য, সবার জন্য দরকার।

রঙন।। মোড়ল বুড়ো, দোলন আমার কোলে কোলে থেকেছে এই বিষ যদি ওর শরীরে ঢুকে থাকে। তোমরা ওকে বাঁচাতে চেষ্টা কোরো।

সাগর।। ঐ ভয়ঙ্কর কাটা মুণ্ডুটা নিপাত না গেলে আমরা কেউ বাঁচব না—কেউ না।

চিকিৎসক।। চলি তবে। ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করিয়ে নেবে, দরকার হলে এক্ষুনি।

[চিকিৎসক চলে যায়]

মোড়ল।। দোলনকে পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাচ্ছি রঙন। চললাম রে সাগর।

[মোড়ল দোলনকে নিয়ে যায় সবাই একে একে যায়]

ঝুমকো।। যাচ্ছিরে।

চন্দন।। সাগর!

[শোকাভিভূত অবস্থায় সবাই যায়]

রঙন।। দোলন! না! দোলন ঘুমাচ্ছে। দোলন কিছু জানে না—দোলনকে তোমরা কেউ কিছু জানতে দিও না—ও কিছু জানে না।

সাগর।। আকাশটা কেমন ফাঁকা লাগছে!

[প্লেনের শব্দ হয়]

ঐ সেই দানোর রথ—শয়তানের রথ। ওরা আসছে। রঙন—রঙন ওরা দোলনকে নিয়ে যেতে আসছে! দোলন, দোলন!

রঙন।। এই চুপ, চেঁচিও না, দোলনের ঘুম ভেঙে যাবে!

[প্লেনের শব্দ বাড়তে থাকে]

[নেপথ্যে চৌকিদার—জাগো-জাগো-জাগো]

সাগর ও রঙন।। চৌকিদার আমরা জেগে আছি, আমরা জেগে আছি চৌকিদার।

পর্দা

তৃতীয় অঙ্ক

[প্রচণ্ড প্লেনের শব্দ। কোলাহল মুখরিত স্থান। সবাই টিনের খাবার খাচ্ছে]

ঝুমকো।। খাব না, ওদের টিনের খাবার, ছোঁব না আমি। থু—থুঃ।

চন্দন।। ঝুমকো, কি করছিস ঝুমকো? টিনের খাবার ফেলে দিচ্ছিস? এ তো আমাদের বাগানের ফল নয়। ক্ষেতের ফসল নয়, ঘরে বানানো খাবারও নয় যে বিষ হয়ে যাবে। যা—খেয়ে নে। না খেলে মরে যাবি তুই।

ঝুমকো।। যে ধানক্ষেতটায় সেই গোলাটা ফেটে গিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিষ ছড়াচ্ছিল —সেখানে গিয়ে তাকাতে আমার বুকটা শুকিয়ে গেল। চোখটা জ্বালা করে জল ভরে গেল। কিছু নেই। ধানগুলো মরে গিয়ে মাঠটা শ্মশানের মত শুকনো—খাঁ খাঁ করছে। পাশের টমাটো ক্ষেত পচে কী ভীষণ দুর্গন্ধ। আমরাও সবাই ওইরকম পচে যাব—। ঐ রকম জঘন্য দুর্গন্ধ উঠবে গা থেকে।

৪র্থ দ্বী:বা:।। আমার গরুর বাঁটটায় মুখ দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে আছে বাছুরটা। অনেকদিন ভালো করে খাইনি রে চন্দন। সারা দেশটা—অ্যাঁ দেশটা কি হয়ে গেল। কৌটার বাইরে এলেই বিষ। আমাদেরও দুমড়ে মুচড়ে কৌটোয় পুরে রাখতে হবে। চমৎকার!

১ম।। আমাদের দ্বীপের মাটি তুলে তুলে সাগরের জলে ফেলে দিচ্ছে। চোখের সামনে সাতপুরুষের মাটি নোনা জলে ধুয়ে খাচ্ছে। আমাদের পায়ের ছাপ সুখ দুঃখের ধুলোবালি সব হারিয়ে যাচ্ছে!

৩য়।। বাগানে শাক সব্জী, তরিতরকারি সব পচছে। পাকা টমেটোগুলো পচে গলে কি বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এ গন্ধ আমরা চিনিনা।

২য়।। ওদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ তো পেয়েছ।

৩য়।। ক্ষতিপূরণ। টাকা নিয়ে—সোনার জন্যে দেশটা পচতে দিবি? সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পচে গলে নষ্ট গন্ধ হয়ে যাচ্ছে সব। আমি দেখতে চাই না—চোখ বন্ধ করে থাকি। আমার ভীষণ কান্না পায়।

ঝুমকো।। এখানে আমাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। সাগর আর রঙনের মত একটা কুঁড়ে ঘরে একা একা থাকতে হবে। নিঃস্ব হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সমস্ত শরীরটা পচতে থাকবে, একটু একটু করে মরব—উঃ!

চন্দন।। সাগরের চোখটা আর তেমন দেখতেই পায় না।

২য়।। রঙনকে দুর থেকে দেখলুম—মনে হল প্রেত।

ঝুমকো।। দোলন দোলন বলে চেঁচাতে রঙন রোজ মাঝ রাত্তিরে মোড়ল বুড়োর বাড়ির দিকে ছুটে যায়। দূর থেকে কান পেতে শোনে, ছেলেটার গলা শোনা যায় কিনা।

২য়।। আমার কেমন যেন ভয় করছে।

[গুণিন একটা কৌটো এনে খেতে থাকে]

৩য়।। এই যে গুণিন ভাই, তুমিও শয়তানের পেসাদ খাচ্ছো? গাছের ফল আর মাটির ফসলের ভুত তাড়াতে পারলে না?

গুণিন।। না!

৪র্থ।। কেন কি হল?

গুণিন।। কে যেন আমার সমস্ত মন্ত্র ভুলিয়ে দিচ্ছে। আমার ভয় করছে। অজানা প্রেত আমার ভিতরে ঢুকে মন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। তবে তাড়াব—একদিন সব তাড়াব।

[নেপথ্যে রঙন—দোলন-দোলন-দোলন]

ঝুমকো।। রঙন-রঙনটা মরে না কেন? মরলেই ভাল-মরুক ও।

[দোলনকে নিয়ে মোড়ল বুড়ো এল]

মোড়ল।। ঝুমকো তুই একে নিয়ে যা—তোর ঘরে নিয়ে রাখ। রঙনটার মাথা কেমন যেন হয়ে গেছে। ও আমার জানলায় উঁকি দিচ্ছিল—পাগলের মত হাসছে, দোলন দোলন বলে চিৎকার করছে।

[গুণিন একধারে কি বকে]

১ম।। গুণিনকে দেখ, মন্তর ভুলে গিয়ে কেমন পাতাছাড়া মড়া গাছের মত খাঁখাঁ করছে। কি সব যেন বকছে বিড়বিড় করে। কি বকছ?

গুণিন।। শয়তানটা এবার আমার কাঁধে ভর করেছে। তোমরা কেউ একজন বড় গুণিনকে ডাকো। আমার গায়ে ধুলো ছিটিয়ে দেবে। টাটকা মাটির ছোঁয়ায় আবার বেঁচে উঠব আমি।

[চলে যায়]

দোলন।। মা! মার কাছে যাব, মার কাছে যেতে দিচ্ছনা কেন আমাকে?

ঝুমকো।। দোলন সোনা, একটুখানি আমার কাছে থাক।

দোলন।। না থাকব না। মা—মা গো!

ঝুমকো।। লক্ষীটি কাঁদে না। তুমি আমার ঘরে ঘুমুবে—তোমার মা বাবা এসে নিয়ে যাবে।

দোলন ॥ কখন?

ঝুমকো ॥ এই তো।

মোড়ল ॥ ওকে নিয়ে যা।

ঝুমকো ॥ চল, চল আমার সঙ্গে।

[ওরা চলে যায়]

মোড়ল ॥ ছেলেটা বেঁচে যাবে হয়তো। চিকিৎসক বলেছে মারাত্মক নয়। অল্প চিকিৎসায় বেঁচে যাবে।

৪র্থ ॥ রঙনেরও বমি হচ্ছে। সাগরের মত ওর শরীরটাও ভয়ঙ্কর প্রেতের মত হয়ে গেছে। ওরা বাঁচবে না।

৩য় ॥ সকলের কাছ থেকে ওরকম লুকিয়ে থাকলে মানুষ এমনিতেই মরে যায়। কি ভয়ঙ্কর একা ওরা।

মোড়ল ॥ সাগর আর রঙনের মত সমস্ত দ্বীপটা বিষাক্ত হয়ে গেছে। এই দ্বীপ আবার ফুলে ফলে ভরে উঠবে কিন্তু ওরা দুজন আর দেখতে পাবে না। আমরা আবার বীজ পুঁতব, গাছ হবে। নতুন টাটকা ফল হবে। বৃষ্টিতে ধুয়ে ধুয়ে মাটিতে শয়তান আর শত্রুর পায়ের ছাপ মুছে যাবে। সব আবার ঠিক হবে। তোরা পারবি না? কিন্তু ওরা—ওরা দুজনে?

৩য় ॥ পারব মোড়ল বুড়ো। এ যাত্রা যদি বাঁচি তবে ঠিক পারব। এই দ্বীপটা থেকে যদি কেউ না তাড়ায় তবে ঠিক পারব।

সবাই ॥ ঠিক পারব।

৪র্থ ॥ শুধু কোনমতে বাঁচতে হবে এখন।

সবাই ॥ হ্যাঁ।

[এক দ্বীপবাসী ছুটে এল]

দ্বী:বা: ॥ মোড়ল বুড়ো—সবাই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে!

২য় ॥ সে কি?

চন্দন ॥ কি হয়েছে?

মোড়ল ॥ পালাচ্ছে কেন? কিসের জন্যে?

দ্বী:বা: ॥ তাঁবুর সেপাইরা পথে পথে বলে যাচ্ছে, এক্ষুণি পালাতে হবে। একটা গোলা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা এতদিন খুঁজেও পায়নি। যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে—দ্বীপটা উড়ে যাবে।

চন্দন ॥ কি বলছিস?

দ্বী:বা: ॥ আমি যাচ্ছি—পালাবার ব্যবস্থা করিগে।

[চলে গেল—অন্য একজন ঢুকল]

অন্যজন ॥ মোড়ল বুড়ো, জান?

মোড়ল ॥ শুনেছি।

অন্যজন ॥ ওরা পর্যন্ত তাঁবু গুটিয়ে পালাচ্ছে, আমাদের কি হবে?

মোড়ল ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরা যায় না। আমাদেরও পালাতে হবে। দিন এলে আবার ফিরব।

[ঝুমকো এলো]

ঝুমকো।। একি শুনছি গো—সবাই পালাচ্ছে?

চন্দন।। হ্যাঁ, আমাদেরও চলে যেতে হবে।

ঝুমকো।। না, আমার ঘর ফেলে আমি যাব না। আমরা দু'জনে মিলে খড় দিয়ে চালা ছেয়েছি। উঠোনে ফুলের বাগান করেছি। তোমার মায়া নেই?

চন্দন।। আছে, কিন্তু—

মোড়ল।। সব ফেলে পালাতে হবে। ফিরে এসে যদি ওদের পাই ভাল, না পেলে সহ্য করব। চৌকিদার অনেক আগে এ খবর দিয়েছিল। আমি বিশ্বাস করতে চাই নি। ইচ্ছে করেনি! এখন বিশ্বাস করতে হল।

২য়।। এখন আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে পালাতে হবে।

[এক জন দ্বীপবাসী আসে]

দ্বী:বা: ।। মোড়ল বুড়ো, পূজারী ঠাকুর আসছে। ওর হাতে একটা কুড়ুল। এতক্ষণ দেবতার স্থানে যে গাছটা, যাতে দেবতার বাসস্থান ছিল, সেই গাছটা কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলেছে।

[সবাই ভীত শব্দ করে]

সবাই।। এ্যাঁ!

অন্যজন।। যাই, দেখে আসি।

দ্বী:বা: ।। চল তবে।

[দুজনে চলে যায়]

১ম।। দেবতার বৃক্ষ কেটেছে। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল—

২য়।। বাজ পড়বে। সাগরটা ক্ষেপে গিয়ে দ্বীপটা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

৩য়।। দেবতার রাগে আমাদের বংশ শেষ হয়ে যাবে।

[হাতে কুড়ুল পূজারী আসে]

পূজারী।। এই যে সবাই আছে। মোড়ল, দ্যাখো দেবতার গৃহে কুড়ুল মারলুম। সারা দেহটা কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছি। দেবতা কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে। তার গায়ে আঁচড় অবধি লাগল না। গায়ে লাগলে তো কুড়ুলে রক্ত লেগে থাকতো বল—অ্যাঁ। নাকি দেবতা রক্তহীন।

মোড়ল।। কি বলছ তুমি পূজারী ঠাকুর? দেবতাকে অশ্রদ্ধা কোরনা—বলতে নেই।

পূজারী।। দেবতা নেই মোড়ল। না হলে হাত জোর করে যখন দ্বীপটাকে বাঁচাতে বললুম তখন সে সাড়া দিল না কেন? আসলে কি জান—শয়তানের ভয়ে পচে যাবার ভয়ে—দেবতাও এ দ্বীপ ছেড়ে পালিয়েছে। কোথাও লুকিয়েছে। এমন ভয় পাওয়া দেবতা নিয়ে আমার কি হবে—ভিতু দেবতা! হুঁ, তবে আমিও ওকে তাড়া করব! এই কুড়ুলের ভয়ে দেখো, ও ঠিক একদিন সামনে এসে দাঁড়াবে। ওকে আমি জিজ্ঞেস করব—হ্যাঁ, এই কুড়ুলটা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করব—দুঃখের সময় তুমি কোথায় পালাও? আমরা তোমার কে? এতদিনের পুজো খেয়ে তুমি নিমক ভুললে কেন? দাঁড়াও। ওকে আমি খুঁজে আনছি। তারপর বিচার হবে। আসছি।

[চলে যায়]

মোড়ল।। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পূজারী ঠাকুরের মাথায়ও গোলমাল হয়েছে।

দুর্লক্ষণ, দেবতার কোপ পড়েছে। সাবধান-সব সাবধান।

চন্দন।। চল ঝুমকো পালাতেই যখন হবে—চল গুছিয়ে নিইগে।

[চৌকিদার এল]

চৌকিদার।। কি কি গুছোবে? এতো ওদের তাঁবু নয়, গোটালেই ঢুকে গেল। গোটা দ্বীপটাকে কেমন করে গুছিয়ে নেবে? কেমন করে এখানকার খেলাধুলো গুছিয়ে সঙ্গে নেবে? আমাদের এতোদিনের হাসিকান্না কোন কোন পুঁটলিতে বেঁধে নেবে? চুরি হয়ে গেলাম—আমরা সবাই চুরি হয়ে গেলাম!

মোড়ল।। সবাই চলতে আরম্ভ করেছে, তাই না চৌকিদার?

চৌকিদার।। সবাই। এতক্ষণে ঘাটে ভিড় জমে গেছে, নৌকো বোঝাই। ওদের দানোর উড়ন্ত শকুনগুলো পর্যন্ত পালাচ্ছে। ঘাট দ্বীপের লোকে ভরে গেছে। দ্বীপের লোকে ভরে গেছে। মাটি থেকে শিকড় ছেঁড়া কি ভীষণ শুকনো মানুষগুলো।

[পাখির খাঁচা নিয়ে দ্বীপবাসী এল]

দ্বী:বা:।। কেবল আমার পাখিটাকে নিয়ে যাব মোড়ল। আর কেউ নেই আমার, কিছু নেই।

২য়।। চল মোড়ল বুড়ো। গোলাটা হয়তো শয়তানের পায়ে ধাক্কা খেয়ে এক্ষুনি ফেটে যাবে। আমাদের দ্বীপের ঠাকুরের থানে মোষ কেটে পুজো দিয়েছিলাম। তাই হয়ত এখনো দারুণ শব্দ করে গোলাটা ফেটে যায় নি। চল পালাই। সময় থাকতে পালাই মোড়ল বুড়ো।

[প্লেনের শব্দ]

ঝুমকো।। আর কিছুই নেব না, কেবল আমার উঠোনের ফুল গাছের একটা ডাল নেব।

চন্দন।। সে তো দুদিনে শুকিয়ে যাবে।

চৌকিদার।। তারপর সেই শুকনো ফুলের গন্ধ স্বপ্নের মধ্যে ভয় হয়ে থাকবে।

মোড়ল।। চল। এখানকার মাটি পুড়ে গিয়ে মরুভূমির বালি হয়ে খাবার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

[নাবিক বুড়ো আসে]

নাবিক।। মোড়ল বুড়ো আমিও তোমাদের ভেলায় একটু ঠাঁই করে নেব। তোমরা পাশের দ্বীপে গিয়ে উঠবে আমি দ্বীপ দ্বীপান্তরে চলে যাব।

মোড়ল।। আমাদের ফেলে তুমি চলে যাবে নাবিক বুড়ো?

নাবিক।। ঘর ছাড়া মানুষগুলোর ছবি এঁকে নিয়েছি। দেশ দেশান্তরের মানুষজনকে দেখাতে হবে তো। সেই ঠাণ্ডা জল আর ঠাণ্ডা আকাশের ছবি দেখাব। ঘরে ফেরার ছবি দেখবে দ্বীপের মানুষ। তুমি যাবে না মোড়লবুড়ো?

মোড়ল।। সবাইকে বুকে আগলে দ্বীপ ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে। সাগর-রঙন—এদের প্রাণটা কেঁদে কেঁদে একদিন নিভে যাবে। কিন্তু ফুরিয়ে যাবে না নাবিক বুড়ো। ওদের প্রাণটা হাওয়ার গায়ে মিশে মিশে থাকবে। নতুন পাতা ফুটলে দুলিয়ে দেবে। মাটির ঘাসে সবুজ রস কলস করে এনে ঠেলে দেবে।

[পূজারী ঢোকে]

পূজারী।। মোড়ল বুড়ো, তোমাদের ভেলায়, আমায় একটু জায়গা দিও। আমি যাব। দেবতা নেই—খুঁজে পাইনি কিন্তু তোমরা তো আছ। দেখো আমি একজন নতুন দেবতা খুঁজে বার করব—এই দ্বীপের তলায় ঠিক এনে বসাব। আবার পুজো হবে—মন্ত্র

পড়ব—হত্যে দেব, সবাই দণ্ডি কাটবে। কুড়ুলটাও সঙ্গে নিচ্ছি—শত্রু তাড়ানো অস্ত্র-—সঙ্গে থাকা ভাল, নিয়ে যাব। কই চল। চল সব।

মোড়ল॥ চল চলরে—সবাই চল। ভেলায় করে ভাসতে ভাসতে আমাদের সাধের দ্বীপটা আমরা দেখব। আমার আত্মাকে এখানে রেখে গেলাম। আবার একদিন ভাসতে ভাসতে এসে ছুঁয়ে দেব আমার সাত পুরুষের মাটি। আবার হাসব, আনন্দ করব —চল—চল সবাই।—

[সবাই চলে যায়]

[নেপথ্যে রঙন—দোলন-দোলন]

[সাগর আব রঙন প্রবেশ করে]

সাগর॥ দ্বীপটা একবারে ফাঁকা হয়ে গেল রঙন। সবাই চলে গেল। আমাদের আর কেউ ভয় পাবে না। রঙন এখন আমি সত্যিই দ্বীপের রাজা। বনের রাজা।

রঙন॥ একবারটি দোলনকে কেউ দেখতেও দিলে না।

সাগর॥ ভালই হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু, ও থাক, আমাদের চোখের বাইরেই থাক।

রঙন॥ আমরা একটু একটু করে ধীরে ধীরে মরে যাব।

সাগর॥ একটু একটু করে, ধীরে ধীরে।

রঙন॥ তুমি আর আমি—

সাগর॥ হ্যাঁ, এই দ্বীপের মাটিতে দ্বীপের রাজা মরে যাবে—মাটিতে মিশে যাব আমরা রঙন। আমাদের মৃতদেহের নষ্ট গন্ধে এখানকার মাটি কি আরও পচে উঠবে? আমাদের মাটি আমাদের চেনে—এই মাটি আমাদের ফেলবে না।

রঙন॥ বনের রাজা বনের রাণী মরে যাবে—কে দেখবে এদের মরে যাওয়া?

[চৌকিদার প্রবেশ করে]

চৌকিদার॥ আমি দেখব, রঙন। আমি চৌকিদার। আমাকে যে থাকতেই হবে। আজন্মের দ্বীপটাকে একা রেখে গেলে—এর আকাশ, মাটি, গাছপালা যে ভয় পাবে। আমি তোমাকে দেখব সাগর।

সাগর॥ আঃ। চৌকিদার আমি নিশ্চিন্ত। আমি তো দেখি না। চোখে একদম দেখতে পাই না। কিন্তু তুমি দেখো—আমি না দেখতে পেলেও তোমরা আমায় দেখো—চৌকিদার।

চৌকিদার॥ নিশ্চয়ই দেখব। আমি দেখব—সমুদ্র দেখবে—আকাশ বাতাস সবাই দেখবে তোমার মরে যাওয়া।—আমি অন্ধকারে হেঁটে যাব। লণ্ঠনটা উচিয়ে বলব—জাগো-জাগো-জাগো...কোথায় যেন মাটিটা আৎকে কেঁপে উঠল। থরথর করে কাঁপছে, চলি।

[চৌকিদার চলে যায়]

রঙন॥ দোলনকে শেষবারের মত দেখতে পেলাম না!

সাগর॥ ছিঃ কাঁদে না। কাঁদতে নেই। দ্বীপের রাজা, দ্বীপের রাণীকে কাঁদতে নেই। আমরা কাঁদব না। কেঁদো না রঙন-দ্যাখো—আমি গান গাইছি।

[সাগর ধীরে ধীরে গলায় সুর তোলে—
রঙনও যোগ দেয়]

পর্দা

সিংহাসনের ক্ষয়রোগ

চরিত্র লিপি

জীবনলাল

চিত্রলেখা

দুর্গশাসক

সৈন্যাধ্যক্ষ

পল্লীসেবক

বার্তা-অধিকর্তা

বৈজ্ঞানিক

চিত্রকর

রাণী

১ম দৃশ্য

সকাল ১০টা

[*একটি প্রাচীন দুর্গের কক্ষ। উপকরণ ও আসবাবপত্র দুর্গের অনুকূল। মঞ্চের মধ্যবিন্দুতে পুরনো আমলের পালকে সাজানো ঢোলক কাঁধে একটি লোক, তরুণ। ওর মুখে নানারকম রঙ। পোশাক বহুবর্ণের। নাম জীবনলাল।*

একটু দূরে সরল মুখের চিত্রলেখা, রাণীর পরিচারিকা। ওর হাসিতে স্নেহ, চোখ সকৌতুক। সে বিপুল উৎসাহে জীবনলালের বাজনা শুনছে।]

জীবনলাল।। চিত্রলেখা বলি?

চিত্রলেখা।। বল।

জীবনলাল।। (*ঢোলকে শব্দ তুলে*) জনতাগণ!

চিত্রলেখা।। জনতাগণ নয়, বল—জনতা, হে সমবেত জনতা!

জীবললাল।। হে সমাহিত জনতা!

চিত্রলেখা।। জনতা আর সমাহিত নেই গো। ওরা ঢাল তলোয়ার নিয়ে এ-রাজ্যের অন্ধকারে পা টিপে টিপে হাঁটছে, এ দুর্গের কাউকে ছাড়বে না। একা পেলে তোমার মুণ্ডটি পর্যন্ত বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তুলে নেবে।

জীবনলাল।। দুর্গশাসক আমাকে সমাহিত জনতা বলতেই শিখিয়েছে, চিত্রলেখা। আমি যে শেখা কথা বলি। আর এই দুর্গটায় যখন পা রাখি, মনের কথা মনের মধ্যে লুকোই। কেবল তোমাকে দেখলে বুকের মধ্যেটায় আর একটা জীবনলাল কথা ব'লে ওঠে। আ— ! আকাশটার দিকে একপলক দেখো চিত্রলেখা, চিত্রলেখা! মণিমুক্তোর সাগর গো! সাগরের তো চাবি নেই, সব ক'খানা দরজা খোলা! আহা-আহা-তুমি কেন আগলখোলা সাগর হওনা?

চিত্রলেখা।। রঙ্গ রাখো। ঢোলক বাজিয়ে যেটা বলবে, এই বেলা চেঁচিয়ে রপ্ত করে নাও। নয়তো রাণীর আদেশে জল্লাদের হাতে মরবে।

জীবনলাল।। রাণীর আদেশের উপরেও একটা আদেশ আছে, আমি সেখানকার মানুষ। তোমাকে একটা কথা বলি চিত্রলেখা, বড় গোপন কথা—যদি হঠাৎ টের পাও, গোলামিটা আমার ঝুটা বেশ, হঠাৎ হাঁক দিয়ে উঠলে বন কাঁপানো বাঘটার মত লাফ দিয়ে উঠতে পারি, তখন আমাকে চিনতে পারবে?

চিত্রলেখা।। তুমি যদি আমাকে চিনতে পার, আমি কেন চিনবনা? এখন রাণীর আদেশটা ব'লে রপ্ত করে নাও।

জীবনলাল।। চিত্রলেখা, বলি?

চিত্রলেখা।। বল।

জীবনলাল।। (*ঢোলক তুমুল বাজিয়ে*) পুরবাসীগণ! আগামী পূর্ণিমায় রাণীর আদেশে এই দুর্গের বহুমূল্য পুষ্পোদ্যান নীলাম ডাকা হবে। এর সমস্ত অর্থ দেশবাসীর কল্যাণে রাণী দান করবেন। আগামী পূর্ণিমায় চিত্রলেখা, সব ফুল নীলাম হবে না, আমি সেই কাঁচা সোনা রঙয়ের চন্দ্রমুখী ফুলটা তোমার জন্যে ঠিক তুলে রাখব।

চিত্রলেখা।। মনের কথা মুখে না বললে শান্তি হয়না বুঝি?

জীবনলাল।। বুকের মধ্যে বৃষ্টি জমলে মেঘটাও তো গুড়গুড় ডেকে ওঠে, বৃষ্টিও

তো মেঘের কথা গো। মেঘটাকে তো ধমক দাও না?

চিত্রলেখা।। যাকে পারি তাকে দিই।

জীবনলাল।। ধমক বড় ভাল গো, ভোরবেলা আঁধার ঠেলে আলো ফুটে যেই একটা ধমক দিল, বুঁজে থাকা ফুলের কুঁড়িটা কেমন ছটফটিয়ে তাড়াতাড়ি ফুটে ওঠে!

চিত্রলেখা।। তোমায় দেখছি, রাজকবি হ'লে মানাতো। ঐ শোন, সেই শকুনটা আসছে, পালাই। দুর্গশাসকের সামনে যেন আবার কাব্য ক'রতে বোসনা। হাতের চাবুকটা ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না। তুমি ঢোলকে বাজনা তোল, আমার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবে।

[*দারুণ জোরে ঢোলক বাজায়। চিত্রলেখা চলে যায়।*]

জীবনলাল।। (*চিৎকার ক'রে*) পুরবাসীগণ! আগামী পূর্ণিমায় রাণীর আদেশে এই দুর্গের বহুমূল্য পুষ্পোদ্যান নীলাম ডাকা হবে। এর সমস্ত অর্থ দেশবাসীর কল্যাণে রাণী দান ক'রবেন। পুরবাসীগণ—

[*দুর্গশাসক এল। আধুনিক পোশাক। মুখচোখ সপ্রতিভ আচরণে ব্যস্ত।*]

দুর্গশাসক।। রাণীর খাসমহলটাকে দেখছি নিজের খাসমহল বানিয়ে তুলছ! দুর্গের দেউড়িতে গিয়ে চেঁচাও। আর শোন, নানারকম অঙ্গভঙ্গি ক'রে নাচবে, যাতে চারপাশে লোক জমে। ঘোষণাটা সবাইকে জানানো চাই।

জীবনলাল।। লোক জানবে না হুজুর—সারা রাজ্যের মাণিকতুল্য ফুল নীলাম হ'চ্ছে। চাঁদ নক্ষত্র পর্যন্ত ঢোলক শুনে হুতাশ করবে।

দুর্গশাসক।। তোমার গায়ের এই পোশাকটাতেই তোমাকে মানায়, কথা সাজালে মানায় না। যাও, সমস্ত নগরে ঢোলক দাও।

জীবনলাল।। যাই হুজুর। সবাই ঢোলক শুনবে হুজুর, আমার বুড়ো দাদামশায় ছাড়া। বুড়োটা কানে শোনেনা। বড়ো ধূর্ত লোক। লোকে বলে, ঠাকুরের কাছে বর চেয়ে কালা হয়েছে।

দুর্গশাসক।। মনে হচ্ছে ধূর্ততা তোমারও কিছু কম নেই। ঠিক আছে, যাও।

[*জীবনলাল চলে যায়, আবার আসে।*]

জীবনলাল।। হুজুর!

দুর্গশাসক।। ফিরে এলে যে, জনতার চিৎকারে ভয় পেলে? অপদার্থ!

জীবনলাল।। হুজুর, ওরা আপনার কুশপুত্তলিকা দাহ ক'রছে। বলছে ঢোলক বাজালে পোড়া ছাই মুখে মাখিয়ে দেবে, ঢোলক কেড়ে নেবে।

দুর্গশাসক।। ছাই মাখানো পোড়া মুখটা নিয়ে তখন আমার কাছে দাঁড়াবে, আমি কাছে গিয়ে দেখব ছাইয়ের রঙটা কেমন, ছাই ওড়ানোর মন্ত্র আমি জানি, যাও! (*জীবনলাল চলে যায়। দুর্গশাসক ঘন্টা বাজায়, চিত্রলেখা আসে।*)

দুর্গশাসক।। রাণীকে সংবাদ দাও, আমি এসেছি! আমাদের বিজ্ঞানাচার্যও আসছেন, বার্তা অধিকর্তাও ওঁর সঙ্গে রয়েছেন। যাও।

[*চিত্রলেখা চলে যায়। সৈন্যাধ্যক্ষ আসে।*]

সৈন্যাধ্যক্ষ।। আপনার কুশপুত্তলিকা দাহ করার মত ওদের এই ধৃষ্টতা আমি মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করে দিতে পারি। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আমি অপমানিত বোধ ক'রছি। আপনি আদেশ দিন।

দুর্গশাসক ॥ রাণী আজ যখন এই দুর্গে এসেছেন, আদেশটা তাঁর কাছ থেকে নেওয়াই উচিত হবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ ॥ যেখানে আপনিই ক্ষমতাসম্পন্ন, সেখানে রাণীর জন্য আদেশের অপেক্ষা শাসনে দ্বিধা এবং আলস্য এনে দিতে পারে।

দুর্গশাসক ॥ রাণীর আদেশ একটা কূটনৈতিক সৌজন্য মাত্র। ওটি দরকার।

সৈন্যাধ্যক্ষ ॥ জনতা ইতিমধ্যেই আমাদের দুর্বল ভাবছে।

দুর্গশাসক ॥ ওটা ওদের দুর্বলতা। ভাবতে দাও। ওরা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠছে, তাই না? যার গলায় ফাঁসের দড়িটা পরিয়ে দেওয়া হয়, সে যত ছটফট করে, দড়িটা আরো কেটে কেটে গলায় চাপ দেয়। ফাঁসের দড়িটা না ফসকায়—বিপদটা ওখানে। ওঁরা আসছেন।

[*সৈন্যাধক্ষ চ'লে যায়। বিপর্যস্তভাবে পল্লীসেবক ঢোকে।*]

দুর্গশাসক ॥ পল্লীসেবক একা যে—ওরা সব কোথায়?

পল্লীসেবক ॥ জনতা, হুজুর, ওঁদের ঘিরে ধরেছে হুজুর। *ঠেলে ঠুলে* আসছেন। আমি হুজুর পল্লীর সেবক, পায়ে হাঁটা মানুষ, ঠাকুরের নাম জপ্‌তে জপতে কোনমতে ত'রে এলুম। (*রেগে*) নাস্তিক হুজুর, সমস্ত জনতা নরকে পচবে হুজুর। আমার কপালের চন্দনের তিলকটা হুজুর ঘষে *ঠেলে* চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে! এর কি বিহিত হবে না হুজুর, (*প্রণাম*) ঠাকুর কি মুখ বুজে দেখবেন? ঠাকুরও হয়েছেন তেমনি। বসি। পা কাঁপছে হুজুর। বসি?

দুর্গশাসক ॥ বসুন।

পল্লীসেবক ॥ ওরা আসার আগে ছোট্ট ক'রে বলে রাখি হুজুর। দক্ষিণ গাঁয়ে সাঁকো সারানোর ভারটা যখন আমায় কৃপা ক'রে দিচ্ছেন, ওর মেরামতির খরচটা হুজুর একটু বেশি ক'রে ধরবেন—ওই ওরা আসছেন. আমি বসছি। হুজুর কি শুনেছেন?

দুর্গশাসক ॥ শুনেছি।

[*বৈজ্ঞানিক এবং বার্তা-অধিকর্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ ঢোকে*]

বৈজ্ঞানিক ॥ একজন বৈজ্ঞানিক, হ্যাঁ একজন বৈজ্ঞানিককে যখন দেশের বর্বর মানুষ অপমান করতে সাহস পায়, তখন বুঝবেন, সভ্যতার প্রাণক্রিয়া, তার উদজান, অম্লজান সব ফুরিয়ে যাচ্ছে। আপনি কাগজের লোক—এ সংবাদটা ছাপুন। যখন শ্রদ্ধা চলে যায়, কী থাকে?

বার্তা-অধিকর্তা ॥ আমার কাগজ আছে, আমি সব ছাপব। আজকের সংবাদ সব ছাপব।

দুর্গশাসক ॥ আমি শুনেছি, এর যথোচিত ব্যবস্থা হ'বে। আপনারা দেশের শ্রদ্ধেয় সুধীজন—অন্তত আমরা সেটা বুঝতে চেষ্টা করব।

বার্তা-অধিকর্তা ॥ (*পল্লীসেবককে*) এই যে আপনি ; লাফ দিয়ে ওরকম ইঁদুরের মত পালালেন কেন,—বলুন তো? একটা সংঘবদ্ধতা বোধ নেই?

পল্লীসেবক ॥ মানে তখন মাথার ঠিক ছিলনা। ঠাকুর কানে কানে বললেন—সেবক পালা, এই বেলা পালা।

বৈজ্ঞানিক ॥ ঠাকুর বললেন? আমি বিজ্ঞানের লোক। ঠাকুর বলেননি—নিজের দুর্বল

হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনেছেন। বুঝেছেন?

পল্লীসেবক॥ তা' হবে।

বার্তা-অধিকর্তা॥ যাক্‌গে, আমাদের কাজের কথায় চলে আসাটাই দরকার। রাণী কি অসুস্থ? সভায় নেই।

দুর্গশাসক॥ সভা শুরু হবার আগে একটা কূটনৈতিক রহস্য হয়তো আপনাদের কাছে প্রকাশ করা আমার কর্তব্য—কিন্তু স্থানটি সম্ভবত যথেষ্ট উপযোগী নয়, যে কোন মুহূর্তে রাণী এসে পড়তে পারেন।

পল্লীসেবক॥ আমি দ্বাররক্ষীর কাজ করছি, আপনি বলুন—না হলে না-শোনা পর্যন্ত বড় অধৈর্য থাকতে হ'বে।

[*দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়*]

বার্তা-অধিকর্তা॥ এ রাজ্যের পুরনো রাজার যে পরিণতি ঘটেছিল, রাণীর ক্ষেত্রেও কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে? বার্তাজীবী হিসেবে সংবাদটি চাঞ্চল্যকর এবং অর্থকরী। রাণী কি তবে—

দুর্গশাসক॥ রাণী আসলে মৃত, বহুকাল মৃত। আপনারা সবাই যাকে দেখেন তিনি কেবল একটি সম্রাজ্ঞীর ছায়ামূর্তি। ছায়াটি এত লোভনীয়, সুন্দর—মৃত বলে ভাবতেও তাই ইচ্ছে হয়না।

বৈজ্ঞানিক॥ রাণী মৃত? বৈজ্ঞানিক হিসেবে ব্যাপারটার সঠিক রহস্য আমার বোঝা দরকার।

বার্তা-অধিকর্তা॥ বার্তা অধিকর্তা হিসেবে এ সংবাদটিও মূল্যবান—

দুর্গশাসক॥ কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশের ঘটনা এ নয়, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন? এটা আমাদের গোপন সংবাদ! কেবল আমরাই জানব।

পল্লীসেবক॥ আমার কিন্তু কেমন ভৌতিক লাগছে। দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে বসব?

দুর্গশাসক॥ বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে ভৌতিক। রাণী প্রকৃতই মৃত। আপনার আমার মধ্যেই ওঁর যাবতীয় শক্তি, এর বাইরে ওঁর কোনও ক্ষমতাই নেই। তাই রাণী থেকেও নেই। আমরাও আমাদের ক্ষমতার একটা লোভনীয় এবং সম্মোহনের রূপ বাইরে কোথাও পুঞ্জীভূত দেখতে চাই—রাণী আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষার রমণী মূর্তি। ওঁর অঙ্গুলিহেলনে আমাদেরই শক্তি সংকেতময় হয়ে ওঠে, রাণীর ভ্রূকুঞ্চনে আমাদেরই অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়, রাণীর উল্লাস আমাদেরই একটা জটিল রহস্যময় পিপাসা। রাণী একটি দর্পণ এবং দর্পণ নিশ্চয়ই জীবন্ত নয়? ওঁর মধ্যে তাকিয়ে আমরা আমাদের মুখ-চোখ সাজিয়ে নিই। আমাদের শাসনযন্ত্রের যদি একটা রমণী মূর্তিতে ছবি আঁকা হয়, রাণী সেই ছবি। তবে অতি মূল্যবান ছবি। ছবিটা উজ্জ্বল রাখা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

পল্লীসেবক॥ সম্ভবত রাণী আসছেন।

দুর্গশাসক॥ আপনারা দয়া করে কিছুকাল বাইরের বিশ্রাম-কক্ষে অপেক্ষা করুন—আজকের সভা সম্পর্কে দু-একটা কথা রাণীর সঙ্গে পূর্বাহ্নে বলে নেওয়া দরকার। রাণী বিষয়টি সম্পর্কে কোন কূটনৈতিক চিন্তা প্রথমত কেবল আমার সঙ্গেই ক'রতে চাইতে পারেন।

[*জনতার চিৎকার*]

পল্লীসেবক।। হুজুর ঈশ্বরের কানে বোধহয় তালা লেগে গেছে, না হলে এই নাস্তিকদের চিৎকার নিশ্চয়ই শুনতেন।

বার্তা-অধিকর্তা।। চলুন।

পল্লীসেবক।। ঠাকুর যদি একটা ভূমিকম্প, নিদেন বন্যাও সৃষ্টি করতেন—এই দুর্বিনীতেরা পেটের জ্বালায় আওয়াজ ছেড়ে দুর্গের দরজায় এসে আছড়ে পড়ত।

বৈজ্ঞানিক।। চলুন। ইচ্ছেমতো কি সব হয়? দুঃখ করবেন না—জেনে রাখুন, ঈশ্বর লাগে না। বিজ্ঞানের ইচ্ছায় বন্যাও বানানো যায়।

বার্তা-অধিকর্তা।। ওঁর সংবাদ আর ছবি কতো চিত্তাকর্ষক বলুন। কাগজ তখন যা কাটেনা!

পল্লীসেবক।। তা-ছাড়া বাঁধ-সাঁকো এ সব বানানোর সুযোগটাও-তো মেলে। ঈশ্বর যদি একটু বুঝে চলতেন।

দুর্গশাসক।। রাণী আসছেন। আপনারা বিশ্রামে যান।

[*সবাই বেরিয়ে যায়। রাণী ঢোকে। গর্বিত, তীক্ষ্ণ মুখে রূপের সঙ্গে জটিল রহস্য মিশে আছে। ওর হাসি বিদ্রূপ বলে ভ্রম হ'তে পারে। রাণীর মাথায় মুকুট থাকবে। রাজকীয় পোশাক*]

দুর্গশাসক।। বাইরের কুৎসিত কোলাহলে রাণী সম্ভবত বিরক্ত। কিন্তু এর জন্য দায়ী নিঃসন্দেহে রাণী স্বয়ং।

রাণী।। রাণীকে দায়ী করার মতো দুঃসাহস তোমার আছে ভেবে ভাল লাগছে। তুমি জান, সাহসী ধৃষ্টতা আমার বড় প্রিয় লাগে।

দুর্গশাসক।। কিন্তু তোমার জন্যে ওদের এই অপমান পর্যন্ত আমাকে সহ্য করতে হ'চ্ছে।

রাণী।। সকলের আড়ালে আমারই একজন দুর্গশাসক আমাকে 'তুমি' বলার দাক্ষিণ্য পায় ব'লে কিছু অতিরিক্ত সহ্যগুণ অবশ্যই তার থাকা দরকার। বিনামূল্যের বস্তুই তো সস্তা।

দুর্গশাসক।। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করছে—একি কেবল আমার অপমান? রাণীর অমর্য্যাদা হচ্ছে না? রাজ্যের অপমান নয়?

রাণী।। কিন্তু আগুন জ্বেলে ওদের এই খেলার একটা অদ্ভুত রূপ আছে—দেখতে বেশ লাগছিল আমার। শত্রুর রাগী চোখদুটো না দেখলে যুদ্ধটা ঠিক রূপবান হয় না। আমার প্রতিপক্ষ তাহলে বিনাশের তাপে যথাযোগ্য সুন্দর হয়ে উঠছে? ভাল।

দুর্গশাসক।। আগুনকে সাহস দিলে সে বড় ভয়ঙ্কর।

রাণী।। ওদের যেটুকু আগুন তা ওই খড়ের পুতুলটা পুড়িয়ে ফুরিয়ে যাকনা।

দুর্গশাসক।। কিন্তু ওর স্ফুলিঙ্গগুলো বাতাসে উড়ছে।

রাণী।। বাতাস বশ কর। তর্জনীর ইশারায় অবাধ্য বাতাসকে ক্রীতদাসের মতো চালাতে পারলেই তো তুমি আমার যোগ্য অনুচর। তোমার যোগ্যতায় আমাকে খুশি কর।

দুর্গশাসক।। কিন্তু তুমিই আমাকে নিষেধ করেছ ওদের উপর কোনও রকম আক্রমণ চালাতে। সমস্ত রক্ষী আমারই মত অসহিষ্ণু হ'য়ে রয়েছে।

রাণী।। ওদের একটু ছেড়ে দিয়ে দেখ না, ওদের চোখ কতটা জ্বলতে পারে? চিনে নেবার জন্যেও কিছুটা ছেড়ে দিতে হয়। তোমাকে আমার কূটনীতি শেখানো বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। সে যাক, ওরা উৎসব করুক—আমি আনন্দ করি, তুমি সহ্য করো। আর যথাসম্ভব নিস্পৃহভাবে আমাদের সভার কাজটা শেষ করে ফেলি। ওরা এসেছে?

দুর্গশাসক।। বাইরে অপেক্ষা করছে। ওদের আসতে বল। আর লক্ষ্য রেখো, কেউ যেন এদিক দিয়ে না চলাফেরা করে (*চিত্রলেখা চলে যায়। রাণী জানালা দিয়ে দেখে।*)

রাণী।। তোমার কুশপুত্তলীর পোড়া শরীরটাকে ঝড়ের বাতাস জানোয়ারের মত কামড়াচ্ছে। আগুন নিভে গেছে, কিন্তু বাতাস ওর ভস্মগুলোকেও ছাড়ছে না। যেন বুনো নখে ছিঁড়ছে। দেখবে এস। আমার কিন্তু মায়া হচ্ছে! (*অল্প হেসে তাকায়*)

দুর্গশাসক।। রাণীর দৃষ্টির সহানুভূতিই যথেষ্ট।

রাণী।। একটা প্রাচীন উষ্মা আজও যেন কোথাও বাঁচিয়ে রেখেছো? সহানুভূতি! শব্দটার কামড়ে পৃথিবী সব থেকে রক্তাক্ত। সহানুভূতি অক্ষরের শিরোভূষণ। গ্রহণ আর বর্জনের মধ্যে সহানুভূতি একটা অর্থহীন অসহায় শব্দ। হয় হাত বাড়িয়ে তুলে নাও, নয়তো ছুঁড়ে ফেলো। মাঝখানে কিছু নেই।

দুর্গশাসক।। হাত বাড়ালেই কি সবসময় তুলে নেওয়া সম্ভব? রাণী সম্ভবত আমাকে হাত গুটিয়ে নিতে দেখেনি। আমার বাড়িয়ে রাখা হাতের একটা অর্থ রাণী বুঝতে চায়না। রাণী আমার প্রার্থনায় এখনো বিমুখ।

রাণী।। সম্ভবত রাণী আজকের আকাশের মত একটা ঝড়কেই চিরকাল ভালোবেসেছিল। কেবল ঝড়ের উদ্দাম রূপ দেখে নয়—ঝড়টাকে চাবুক মেরে, কিংবা জাদুকরীর ছলনায় জড়িয়ে ধরে বশ করার সুখে। তুমি ঝড় হয়ে ওঠো, আমার চাবুকটাকে দাঁতে কামড়ে কেড়ে নাও। দেখো, প্রার্থনা পূর্ণ হয় কি না!

দুর্গশাসক।। রাণীর একজন রাজা ছিল। আর সেই রাজা কিন্তু ঝড় বুঝত না।

রাণী।। তাই সে আমার পাশে আর নেই। নিয়তি চায় না বলেই হয়তো তাকে চলে যেতে হল। কিংবা—

দুর্গশাসক।। বর্বর জনতা তাকে মেরেছে। নিযতি! রাণীর এই ব্যক্তিগত দার্শনিকতা রাজহত্যার কারণটাকে কি লঘু করে তোলে না?

রাণী।। লঘু গুরুর বিচার আমিই করব। এ রাজ্য আমার—তুমি শুধু কর্তব্য করবে—আমাকে আমি ছাড়া কেউ উত্তেজিত ক'রতে পারে না, সম্ভবত এটা তোমার জানা আছে। তাছাড়া রাজহত্যার প্রসঙ্গটা সম্ভবত নানা কারণে আমাদের দুজনের কাছেই প্রিয় নয়। (*এদের প্রহরীকে উপেক্ষা করে চিত্রকর ঢোকে*)

চিত্রকর।। রাণীকে জানাতে চাই, এভাবে না এসে আমার উপায় ছিল না।

দুর্গশাসক।। রাণীর কক্ষে বলপূর্বক ঢুকে পড়ার সমুচিত শাস্তি বিধান ছাড়াও আমাদের উপায় নেই।

রাণী।। বিশ্রামকক্ষের উপস্থিত অভ্যাগতদের আসতে বল।

চিত্রকর।। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

রাণী।। অবশ্যই থাকবে। নিতান্ত দৈহিক শক্তি দেখাতে এখানে আসোনি—সেটুকু আমি

বুঝি। দেহের জোরে দুর্গ-রক্ষীর সঙ্গে তুমি পারতে না, অতিরিক্ত একটা আবেগে তুমি জিতেছ। এই বলবান আবেগ জানবার ইচ্ছে আমার আছে বৈকি।

চিত্রকর।। মহারাণীকে ধন্যবাদ। এ ভাবে আসার প্রয়োজন হত না, যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দুর্গশাসক রক্ষা করতেন। উনি বারবার এই প্রয়োজন প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দুর্গশাসক।। আমার বিবেচনায় এই চিত্রকরের সাক্ষাতের আবেদন তেমন গুরুতর বিবেচিত হয়নি। সবরকম আবেগ রাণী পর্যন্ত পৌঁছলে অহেতুক ব্যস্ততায় উনি বিব্রত হবেন।

চিত্রকর।। দুর্গশাসকের বিচার ক্ষমতায় আমার আস্থা নেই।

দুর্গশাসক।। তোমার উক্তি নিতান্ত দুর্বিনীত। আশা করব নম্রতা শেখানো তোমাকে প্রয়োজন করবে না।

চিত্রকর।। আমার শিক্ষক আমি নিজেই নির্বাচন করি--সহযোগিতা এক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত। আমি রাণীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

রাণী।। দুর্গশাসক, সম্ভবত ওর বক্তব্যটা আগে বলতে দেওয়া যেতে পারে।

দুর্গশাসক।। আগে এর দুর্বিনয়ের বিচার প্রয়োজন।

রাণী।। হবে। কি বলতে চাও তুমি?

চিত্রকর।। ফুলবাগানটা নীলাম চলবে না।

রাণী।। ওটা আমার বাগান।

চিত্রকর।। কিন্তু ওর ফুলগুলো আমাদের মাটির। ওর রং আমাদের দৃষ্টির বন্ধু, গন্ধ বহুকালের আত্মীয়। হাওয়ায় যখন ডালপালা দুলে ওঠে—আমাদের বুকের মধ্যে কতকাল ধরে তার ঢেউ জাগছে। ওই বাগান ভেঙে ওখানে অন্য কিছু করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে—আমরা টের পেয়েছি। এ এক ধরণের ঘাতকতা, আমরা মানবনা।

দুর্গশাসক।। 'আমরা' কারা?

চিত্রকর।। আমি রাণীর সঙ্গে কথা বলছি।

রাণী।। দুর্গশাসক আমার হয়েই প্রশ্ন করেছেন।

চিত্রকর।। আমরা, মানে এখানকার মানুষ।

দুর্গশাসক।। আমারাও এখানকার মানুষ।

চিত্রকব।। সেটা আমাদের বিশ্বাস্য নয়। যা বিশ্বাসের বাইরে তাকে আমরা সন্দেহ করি।

দুর্গশাসক।। তোমাদের বিশ্বাস বালকের যুক্তি নিয়ে চলে।

চিত্রকর।। এই বালকদের যুক্তি এবং শক্তি সম্পূর্ণ তারুণ্যের।

দুর্গশাসক।। তাহলে এই তরুণ পক্ককেশ এবং কুটিল বুদ্ধিতে অভিসন্ধিপরায়ণ।

চিত্রকর।। এরপর আমি কেবল রাণীর প্রশ্নেরই উত্তর দেব।

রাণী।। দুর্গশাসক, এর সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি।

দুর্গশাসক।। নিজেকে দায়িত্বহীন রাখার থেকে, দূরে থাকাই সম্ভবত আমার পক্ষে সম্মানের কাজ।

রাণী।। দুর্গশাসককে অপমানের শাস্তি আমিই বিবেচনা করব।

চিত্রকর।। কাউকে অসম্মান করা আমার অভিপ্রেত নয়—আমি কেবল আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। ঐ ফুলগুলো আমাদের মাটির উৎসব। আমাদের উৎসব আমরা ভাঙতে দিতে চাই না। চলি।

রাণী।। দাঁড়াও। তোমার কাঁধের থলির ভিতর থেকে কিছু আঁকা ছবি দেখা যাচ্ছে, তুমি কি চিত্রকর?

চিত্রকর।। রাণীর আমন্ত্রণে নানা স্থানের শিল্পী এসে ফুলবাগানের ছবি আঁকছে—তার সবকটিই ছবিই মিথ্যে, কারণ ওরা এখানকার কেউ নয়—পুরস্কারের লোভে আঁকা। আমি নিজের খুশিমতো এঁকেছি—এগুলো আমার। এর মূল্য জানিনা।

রাণী।। তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা কর, তোমাকে ডাকব। আমার অনুরোধ।

[*চিত্রকর চলে যায়, বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিরা আসে।*]

বৈজ্ঞানিক।। বাইরের কোলাহলে রাণী নিশ্চিতই সভায় স্বস্তিবোধ করবেন না।

রাণী।। কোলাহলে আমি বিচলিত নই। আপনারা সভা শুরু করতে পারেন।

পল্লীসেবক।। পল্লীর একজন দীন সেবকের একটি আর্জি আছে—গাঁয়ের মানুষগুলো রাণীকে দেখতে চাইছে। তবে ওদের হাতে একটা দাবিপত্র থাকায়, সুকৌশলে এড়িয়ে গেছি।

রাণী।। রাণী এ অঞ্চলে ভ্রমণে এসেছে। ওরাতো আমাকে দেখতে চাইবেই। রাণী তাই এখানে রাণীর মতোই সেজে এসেছে। মুকুট পর্যন্ত খোলে নি।

সৈন্যাধক্ষ।। বাইরের জনতাও রাণীকে খুঁজছে। দুর্গের মধ্যেও ঢুকতে চেষ্টা করছে। সম্ভবত ওদের কাছে গোপন অস্ত্র রয়েছে।

দুর্গশাসক।। আমার রক্ষীবাহিনী যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো। মুহূর্তে সমস্ত উত্তেজিত জনতা জঘন্যতম শাস্তি পেতে পারতো, কিন্তু কেন জানি না রাণী তা চান না।

রাণী।। রাণী আপাতত তা চান না।

বৈজ্ঞানিক।। রাণীর অনুমতি নিয়ে সভার কাজ দ্রুত আরম্ভ করাটাই সম্ভবত উচিত হবে। আজকের সভার মূল উদ্দেশ্য রাণীর জানা আছে। তবে, আমাদের পরিকল্পনাটি রাণীকে খুলে বলা হয়নি। দুর্গশাসক বুঝিয়ে বলুন। আমার ফেরার সময় হয়ে আসছে। আমার একটা পোষা কুকুর আছে, ওকে খাওয়াবার সময় হয়ে এল। জন্তু জানোয়ারের ক্ষিদে নিতান্ত বিশুদ্ধ—জনতার শক্তির মতো কূটনীতি জড়িত নয়।

দুর্গশাসক।। রাণীর ফুলবাগানটা নীলামের জন্য নগরে ঢোল দেবার যে ব্যবস্থা আমি করেছি—তারই সূত্র ধরে আজকের সভার কাজটা শুরু হতে পারে।

বার্তা-অধিকর্তা।। নীলাম থেকে আমরাই কেউ রাণীর ঐ বাগানটা কিনে নেব। বাগানটা আমাদেরই থাকবে—আর ঐ নীলামের টাকা রাণী জনসাধারণকে দান করবেন।

সৈন্যাধক্ষ।। ঘোষণায় এটা জানানো হয়েছে।

পল্লীসেবক।। এতে প্রমাণিত হবে, রাণী বিলাস চান না, বরঞ্চ সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে।

বার্তা-অধিকর্তা।। দেশের যখন সংকট তখন পুষ্পচর্চ্চা নিশ্চয়ই বিলাস। সংবাদপত্রে রাণীর এই হৃদয়বত্তা চমৎকার প্রচার করা যাবে।

বৈজ্ঞানিক।। ঠিক—ফুল হচ্ছে, আমাদের কর্মশক্তির সঙ্গে আলস্যের অবাঞ্ছিত মিলনের অবৈধ সন্তান।

সৈন্যাধক্ষ।। তাছাড়া এই ফুলবাগানটার সঙ্গে দেশের মানুষের এত বন্ধুত্ব, এক এক সময় আমার মনে হয় ফুলবাগানটাও ওদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছে। ওটা কেটে ফেলাই সংগত।

রাণী।। ফুলবাগানটা কেটে যে গবেষণাগারটা আপনারা তৈরী করবেন—সেটা কি আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে?

দুর্গশাসক।। বৈজ্ঞানিকের ধারণা, সফল হবে।

রাণী।। ধারণা!

বৈজ্ঞানিক।। বিশ্বাসও বলতে পারেন, দৃঢ় বিশ্বাস। আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কারের সূত্র তৈরী করেছি। যন্ত্রটা একটা সচিত্র বেতার যন্ত্রের মতো দেখতে। ওটা চালালেই একদল উদ্ভট ভয়ংকর জানোয়ারের মতো প্রাণী দেখা যাবে। ধরুন, ওগুলো পৃথিবীর নিকটতম কোন গ্রহ-উপগ্রহ থেকে নেমে এসেছে। ওদের উদ্দেশ্য, এই অঞ্চলটা অধিকার করা। এখন ওরা ক্রমশ বেশী সংখ্যায় নেমে চারদিকে ছড়াচ্ছে, দলে ভারী হ'য়ে সংঘবদ্ধ অবস্থায় আমাদের তাড়িয়ে সব কিছু দখল নেবে।

বার্তা-অধিকর্তা।। আমাকে কাগজে এই ভয়ংকর উপগ্রহ আক্রমণের সংবাদ ছেপে এ-অঞ্চলটাকে উদ্ধারের কথা ঘোষণা করতে হবে। এখানকার জনতাকে বোঝাতে হবে, সভ্যতা, স্থিতিস্থাপকতা বিপন্ন।

সৈন্যাধক্ষ।। আমাদের সমূহ বিনাশ আসন্ন।

পল্লীসেবক।। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মানুষের সরল মনে সংবাদপত্র যখন বোঝাতে অক্ষম, আমি তাদের সুনিশ্চিত বোঝাবার চেষ্টা করব। এটা শুধু পল্লীসেবকের বৃত্তি নয়, এটা আমার জীবন-পণ আদর্শ। জানেন, আমি নাটমন্দিরের দেবতাকে জাগ্রত প্রমাণ করিয়েছি —দেখবেন, ঠাকুরের কৃপায় ওদের বোঝাতেও আমি সফল হব।

সৈন্যাধক্ষ।। সৈন্যদের বোঝানো খুব কঠিন হবে না।

বৈজ্ঞানিক।। এখন এই প্রাণীগুলো আমাদের তৈরী যন্ত্রে আঁকা ছবিতে প্রচার করা হবে। যন্ত্রের সূক্ষ্মতা এবং সংবাদপত্রের প্রচার সমস্ত ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।

রাণী।। আপনাদের বিশ্বাস আমরা সফল হব?

দুর্গশাসক।। সুনিশ্চিত! যে সব জনতা বিপুল বিক্ষোভে রাণীর মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁকে সিংহাসন থেকে নির্বাসিত করতে চায়, তারা আকস্মিক কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ে বিদ্রোহ থেকে থমকে দাঁড়াবে।

সৈন্যাধক্ষ।। তারপরেই, নিজেদের সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজশক্তির সঙ্গে নিছক বাঁচার খাতিরে যোগ দেবে।

দুর্গশাসক।। ওদের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ অত্যন্ত চতুর পন্থায় স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক।। আর ঐ যন্ত্র বিপুল প্রয়োজনে অসংখ্য বিক্রী হতে থাকবে।

পল্লীসেবক।। তাতে আমাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ফুলেফেঁপে উঠবে।

বার্তা-অধিকর্তা।। ভয় থেকেই অর্থের আমদানি বেশি, এতো সহজ বাণিজ্যিক সত্য।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। এবং আমাদের এ অঞ্চলে রক্তচক্ষু জনতা ভীত-ভিক্ষুকের অসহায় দৃষ্টি নিয়ে রাজদ্বারে কৃপাপ্রার্থী হ'বে।

দুর্গশাসক।। ওদের বিদ্রোহ নিরস্ত্র, আমাদের প্রশাসন বিজয়ী এবং রাণীর মুকুটে আরও কয়েকটি উজ্জ্বল মণিরত্ন। পরিকল্পনাটি অভিনব সন্দেহ নেই। আশা করি, রাণী অনুমোদন করবেন।

পল্লীসেবক।। আমরা তো অবশ্যই মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

রাণী।। কিন্তু—সেই অদ্ভুত এবং ভয়ংকর প্রাণীগুলোর ছবি এখনও আমি দেখিনি!

দুর্গশাসক।। তার জন্য চিত্রকর ডাকা হ'য়েছে। রাণীর ইচ্ছাক্রমেই যে ফুলবাগানটি নীলাম করা হবে, তার ছবি এঁকে রাজ-প্রদর্শনীতে রাখার জন্য বহু শিল্পী এখানে উপস্থিত। আমাদের আসল উদ্দেশ্য, বুঝতেই পারছেন, ঐ বাগান আঁকা নয়—ঐ ভয়ংকর প্রাণীদের ছবি এঁকে নেওয়া। মূল উদ্দেশ্যটা সর্বসাধারণের চোখের আড়ালে রাখার জন্যই এই কৌশল।

রাণী।। আমাদের দুর্গশাসকের মৌলিক শঠতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় (*হাততালি*)

দুর্গশাসক।। এই মৌলিক শঠতাই সুপ্রাচীন দুর্গে ফাটল ধরাতে দেয়না।

বৈজ্ঞানিক।। এবং দুর্গমকে অধিকারে সমর্থ হয়। (*সকলের হাততালি*)

রাণী।। আপনাদের জয়লাভই আমার কাম্য। কারণ তাতেই আমার মুকুটের মুক্তোগুলো অহঙ্কারী হয়ে উঠবে। দুর্গশাসকের শঠতাকে আমি অভিনন্দন জানাতে চেয়েছি বলেই মৌলিক শঠতা বলছি।

দুর্গশাসক।। রাণীর অভিনন্দনই আমাদের উদ্দীপনা।

বার্তা-অধিকর্তা।। এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস, অত্যন্ত দ্রুত আমরা সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

পল্লীসেবক।। কিন্তু ছবিগুলো—?

বৈজ্ঞানিক।। হ্যাঁ, সকলের আগে আমার ছবিগুলোর প্রয়োজন।

দুর্গশাসক।। নিশ্চয়ই। আমাদের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীকে ডাকছি।

[*হাততালি দিতে যায়, রাণী বাধা দেয়*]

রাণী।। না, যে চিত্রকর শক্তিকে হারিয়ে দুর্গে ঢুকেছে, তাকে ডাকুন।

দুর্গশাসক।। সেকি?

বৈজ্ঞানিক।। কাকে?

পল্লীসেবক।। ঐ উটকো—

সৈন্যাধক্ষ।। অপরিচিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে—?

দুর্গশাসক।। এ-ব্যাপারে আমাদের অনুগত হতে পারে, এ রকম শিল্পী'র উপরেই কাজের ভারটা দেওয়া প্রয়োজন।

বার্তা-অধিকর্তা।। সমস্ত কৌশলটির সারমর্ম ঐ জনতাদের বংশধর শিল্পীটি যে কোনও মুহূর্তে ফাঁস করে দিতে পারে।

দুর্গশাসক।। মহিমময়ী রাণীকে এ-আশ্বাস আমরা দিতে পারি যে, সবদিকে সতর্কতা বজায় রেখেই আমরা পরিকল্পনাটি ক'রেছিলাম।

রাণী।। বুঝেছি। তবু আবারও বলি আপনারা জয়লাভ করুন। তবে আমাকেও সঙ্গী

হিসেবে বিশ্বাস করুন। আমি একটা খেলা জানি, আপনারা দেখুন।...ওকে আনুন এখানে।

[*দুর্গশাসক সৈন্যাধ্যক্ষকে ইশারা করে, সৈন্যাধ্যক্ষ পল্লীসেবক'কে ইশারা জানায়। পল্লীসেবক বেরিয়ে যায় অপ্রসন্ন মুখে। রাণী রহস্যময় হাসে*]

রাণী।। খেলাটা আপনারা দেখুন। দুর্গে বেআইনি অনুপ্রবেশ, রক্ষীকে উপেক্ষা, আর দুর্গশাসকের অপমানের দণ্ড তার প্রাপ্য। দণ্ড আর পুরস্কারের বিপরীত দোলায় ওকে কেমন দোলাই দেখুন না। (*পল্লীসেবক আর চিত্রকর ঢোকে*)

চিত্রকর।। (*সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে*) নমস্কার। আমার প্রয়োজনে যখন এসেছিলাম, তার অর্থ বুঝতাম—কিন্তু আপনাদের প্রয়োজনে আমাকে এখন ডাকছেন বলেই প্রয়োজনটা আমার কাছে সন্দেহজনক।

দুর্গশাসক।। সন্দেহ? রাণী আদেশের পরিবর্তে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—তোমার কৃতার্থ থাকা উচিত।

চিত্রকর।। অপরের অহেতুক ধৃষ্টতা সহ্য করার শিক্ষা আমি পাইনি—এ কথাটা দুর্গশাসককে জানিয়ে রাখা ভাল মনে করছি।

দুর্গশাসক।। তোমার সাহস আমাকে অবাক করছে!

চিত্রকর।। আমার আসার উদ্দেশ্যটাও তাই।

দুর্গশাসক।। রাণী কি নীরব থাকবেন?

রাণী।। রাণী যখন নীরব থাকে, তখন রাণী কিছু ভাবে। ওর সঙ্গে আমি কথা বলছি।

চিত্রকর।। দুর্গশাসক বড়জোর আমাকে কারারুদ্ধ করতে পারেন। নিষ্ঠুর কোনও শাস্তি দেবার বিশ্রী ক্ষমতাও আপনার আছে। সেসব জেনেই আমি এসেছি। সম্ভবত আপনি হতাশ হচ্ছেন।

রাণী।। চিত্রকর! আমার সামনে দাঁড়িয়ে কোন রাজ-অমাত্যের সমালোচনা আমি বেশি সময় সহ্য করিনা।

চিত্রকর।। সমালোচনার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।

রাণী।। কিন্তু তোমাকে অনিচ্ছুকও মনে হচ্ছে না।

চিত্রকর।। রাণী উত্তেজিত হচ্ছেন।

রাণী।। এবার কি রাণীর সমালোচনা? (*হেসে*) দুর্গশাসক, দেখো দেখো, দুর্গের দেওয়ালে কত কালের কত রাজা রাণীর বিস্ফারিত চোখ আমার কত সহ্য দেখছে। (*চিত্রকরকে*) ওরা কি বলছে জান?

চিত্রকর।। জানি।

রাণী।। জান? (*হেসে*) এই অবাধ্য প্রাণীটিকে আমাকে উপহার দাও। রাণী আজও মৃগয়া ভালবাসে।

চিত্রকর।। আমি যেতে পারি?

রাণী।। মৃগয়ার কথা শুনে ভয় পেলে?

চিত্রকর।। না। এখানে থাকতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

রাণী।। দাঁড়াও। চিত্রকর হিসাবে তোমার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে। কিছু আগে তুমি বলেছিল তোমার কাছে এই বাগানের আঁকা কিছু ফুল আছে। একজন দর্শক হিসেবে তুমি কি আমাকে অযোগ্য ভাববে?

চিত্রকর।। (*সরল মুখে*) ছবি দেখাতে আমার ভাল লাগে। আমি তখন অনেক রাগ ভুলে যাই, জানেন?

দুর্গশাসক।। ছবিগুলো রাণীকে দেখান।

[*সহজ ভঙ্গিতে চিত্রকর রাণীকে কয়েকটি চিত্র এগিয়ে দিল। রাণী মগ্ন দৃষ্টিতে দেখল*]

চিত্রকর।। (*মুখে বালকের মত হাসি*) ফুলবাগান আমার শৈশবের বন্ধু : আমি চিনি বলেই আঁকতে পেরেছি। ফুলের অনেক অদৃশ্য রঙিন পাপড়ি থাকে, বন্ধু ছাড়া আর কারোর কাছে ওগুলো মেলে ওঠেনা।

[*রাণী তাকাল, মৃদু হাসল*]

রাণী।। বাতাসের দোলায় গাছগুলোর যে চঞ্চলতা, ছবিতে তার ঢেউ থাকবে না?

চিত্রকর।। যদি কারোর মুঠোয় বাতাস থাকে সে ওই ছবিটির দিকে দুহাত ছড়িয়ে দিলেই বাগানটা দুলে উঠবে। (*সবাই হেসে ওঠে*) প্রমাণ হয়ে যাক্। আপনাদের মধ্যে এক এক করে এগিয়ে এসে দুর্গের এই জানালাটা খুলে যিনি হাওয়াকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে পারবেন, তাঁর সম্মানে ফুলগুলো যথার্থই দুলবে, গন্ধ উড়তে থাকবে, রঙগুলো সম্মিলিত সুরে বেজে উঠবে।

দুর্গশাসক।। শিল্পীকে কথা বলতে দিলেই সে তার বাতুলতা প্রমাণ করে।

বৈজ্ঞানিক।। গবেষণায় এও প্রমাণিত হবে, শিল্পীদের স্বাভাবিক মানুষদের থেকে অতিরিক্ত একটা উত্তেজক স্নায়ু থাকে। যার মধ্যে দিয়ে একধরণের অকেজো বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। ওটা অস্ত্রোপচার করে বাদ দিলেই শারীরিক কুশল।

বার্তা-অধিকর্তা।। আমাদের কাগজে অবশ্য ছবি ছাপতে হয়, তবে সূক্ষ্ম সতর্কতায় আমাদের প্রয়োজনের বাইরে তাকে বেরুতে দিই না। ছবির স্বাধীনতাহরণের মধ্যে একধরনের বৈজ্ঞানিক শিল্পবোধ রয়েছে।

চিত্রকর।। মহারাণীকে অনুরোধ করছি, আপনি জানালাটা খুলে দিন, দেখা যাক অলৌকিক ঘটে কিনা।

রাণী।। আমি গবাক্ষ খুলে দিলে বাতাসের বদলে যদি ঝড় ঢোকে?

চিত্রকর।। তাহলে ঐ ফুলের সঙ্গে ঝড়ের একটা মরণপণ যুদ্ধ চল্‌বে—দেখা যাক কে জেতে?

রাণী।। সে যুদ্ধ জানালা বন্ধ থাকলেও চলবে। আমি সেই রণশব্দ শুনেছি, এই দুর্গের পাথরে তার রণন। আমার রক্তে তার প্রতিধ্বনি—আমি শুনেছি। একসময় তাই বড় উদাসীন লাগে।

চিত্রকর।। বাঃ! আমি এই মুহূর্তে রাণীর একটি আলেখ্য রচনা করতে অনুমতি চাইছি। শুধু আপনাকে একটু একা হতে হবে। আপনার ললাটে একটি আশ্চর্য স্বেদবিন্দু রয়েছে—মুক্তোর মুকুটের নিচে, ভারসাম্য ভেঙে যাওয়া দুটি উড়ন্ত উদ্‌ভ্রান্ত দীর্ঘ ভ্রূ চিহ্নের সামান্য উপরে, একটি শ্রমে মন্থর স্বেদবিন্দু। ...আপনার মুখ আমাকে আঁকতে দিন।

রাণী।। চিত্রকর, তোমাকে অন্য একটি চিত্র আঁকার জন্য ওঁরা বলবেন। আর তার পারিশ্রমিক আমার ললাটের এই স্বেদবিন্দু। তুমি নিজের হাতে মুছে দিতে পারবে। রাণীর ললাট বিধাতা ছাড়া কেউ স্পর্শের অধিকার পায় না।

চিত্রকর।। কী সেই চিত্র?

রাণী।। দুর্গশাসক ওকে বুঝিয়ে বল।

দুর্গশাসক।। খুবই সহজ চিত্র। আমাদের একটি উদ্ভট এবং ভয়ংকর প্রাণীর ছবি এঁকে দিতে হবে।

রাণী।। স্মরণ রেখো, আমার ললাটের স্বেদবিন্দুটি এর উপহার। শুকিয়ে যাবার আগে তোমাকে রাজী হতে হবে।

চিত্রকর।। (*ব্যস্তভাবে নিজের কাগজপত্র খোঁজে*) একসময় ওরকম অনেক ভয়ংকর ছবি আমি এঁকেছিলাম, দুঃস্বপ্নের ছবি। ...একটু অপেক্ষা করুন আমার কাছে রয়েছে...দুঃস্বপ্ন সহজে যে কাছছাড়া হয় না। (*বের করে*) এই যে দেখুন, কী বিকট, কী কুৎসিত! ছবিগুলো যেন সাবধান হতে বলছে।

[*রাণী দেখে, দুর্গশাসককে দেয়। সবাই দেখে। কারোরই মনঃপূত হয়নি*]

রাণী।। সম্ভবত আপনাদের মনঃপূত হয়নি। এগুলো যথাযোগ্য ভয়ংকর নয়।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। নাঃ, প্রাণীগুলো এমন হবে যাতে মনে হয়, এরা একটা ভিন্নগ্রহের ঘাতক। একটা জঘন্য জঙ্গলে এরা জন্মেছে, ছুঁয়ে দিলে নিঃশ্বাস বিষাক্ত হবে।

বৈজ্ঞানিক।। আবার, পুরনো অতিকায় জন্তু না এঁকে, ততোধিক হিংস্র চরিত্র ফোটাতে হবে!

বার্তা-অধিকর্তা।। অর্থাৎ লুপ্ত বর্বর জানোয়ারদের সঙ্গে চরিত্রের মিল রেখে ভবিষ্যৎ শত্রুর বিকট চেহারা আঁকতে হবে।

চিত্রকর।। কিন্তু কি হবে এই ছবিতে? পুষ্পোদ্যানের ছবি আমি কী যত্নে এঁকেছিলাম। কি হবে এই ভয়ংকর ছবি দিয়ে, কি হবে?

রাণী।। রাণীর ললাটের স্বেদবিন্দু এর উপহার। ললাট স্পর্শমাত্র বিধাতার আঙুল তোমার হয়ে উঠবে—এই হবে।

চিত্রকর।। আমি কি প্রলুব্ধ হচ্ছি?

রাণী।। একি তোমার আকস্মিক স্বগতোক্তি?

চিত্রকর।। কেন?

রাণী।। (*রহস্যময় হেসে*) না হলে, রাণী বড় নিষ্ঠুর। রাণী লুব্ধকে স্নেহ করে কিন্তু যে প্রলুব্ধ সচেতন, আত্মসমালোচক, তাকে দণ্ড দেয়। কি চাও—দণ্ড না উপহার? কাগজ, তুলি, রঙ্ সব-কিছু সাজিয়ে নাও, ভাবতে থাকো কি চাও? দণ্ড না উপহার? তুলিটা হাতে তুলে নাও। (*চিত্রকর সম্মোহিতের মত তাই করে*) রঙের বাটিটায় ডুবিয়ে দাও। (*শিল্পী তাই করে*) কাগজ তোমার হাতের কাছে। আরম্ভ কর। প্রথম চিন্তা, দ্বিতীয় ছবি, তৃতীয় পুরস্কার। ভাব।

[*শিল্পী সবার মুখ দেখতে দেখতে উদ্দীপ্ত হয়। দ্রুত আঁকতে থাকে। অন্য মুখ সব পাথর। ছবি শেষ হয়*]

চিত্রকর।। আমি পেরেছি। আমি নিশ্চিত পেরেছি। দেখুন, দেখুন।

[*রাণীর কাছে ব্যগ্র বাড়িয়ে দেয়। রাণীর মুখে প্রসন্ন হাসি। দুর্গশাসকের হাতে দেয়। সবার মুখে ক্লেদাক্ত হাসি।*]

রাণী॥ তুমি পেরেছো! পেরেছো!

দুর্গশাসক॥ আমি সঠিক বুঝেছিলাম প্রকৃত শক্তি রয়েছে এই তরুণের। এ-ই সেই ভয়ঙ্কর চিত্র। আমাদের জয়ধ্বনি।

বৈজ্ঞানিক॥ সম্ভবত এই তরুণ যোগ্য রাজ-চিত্রকর।

বার্তা-অধিকর্তা। একদিন আমার সংবাদপত্রের প্রধান স্তম্ভটি আপনার প্রশস্তিতে তৈরী হ'বে।

পল্লীসেবক॥ আমি শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করব, সাধু, সাধু!

রাণী॥ নতুন রেখা, নতুন রঙ। আমাদের চোখের সামনে তোমার আর একবার জন্ম হল—যেন জন্মান্তর না হয়।

দুর্গশাসক॥ এবার বোধহয় জানালা খুলে দিলে ঝড়ের হাওয়া ঢুকবে। আর এই আঁকা প্রাণীটা নড়ে উঠবে—আশ্চর্য জীবন্ত!

পল্লীসেবক॥ তাহলে আমি চলে গেলেই জানালাটা খুলবেন।

বৈজ্ঞানিক॥ নিশ্চয়ই শিল্পীর সেই অতিরিক্ত স্নায়ুটি ছিঁড়ে গিয়ে আপনি একটি স্বাধীন আর স্বাভাবিক মানুষ হ'য়ে উঠেছেন। তাই এ ছবি সম্ভব হল। এবার শুরু হ'বে আমার যন্ত্র নির্মাণের কাজ।

পল্লীসেবক॥ আর সেই যন্ত্রের কাজও চলবে যন্ত্রের মত। উৎসাহে কেমন শীত-শীত বোধ ক'রছি।

বার্তা-অধিকর্তা॥ তারপর থেকেই সংবাদপত্রের যন্ত্রগুলো দানবের মতো পরিশ্রমে চতুর্দিক জয় করতে থাকবে।

রাণী॥ আঁকতে কষ্ট হল না তো তোমার! ঝড়ের মত তোমার তুলি চলেছে, উন্মাদের মত রঙগুলো মারপিট করে যেন নিজেরাই ছবি হয়ে উঠেছে।

চিত্রকর॥ একটুও কষ্ট হয়নি আমার। আপনাদের নীরব মুখগুলোই আমার প্রেরণার সর্বস্ব। একটু ভালো ক'রে আপনারা ছবিটা দেখুন, কি সহজ পদ্ধতি। বিষয় পরিকল্পনায় আমার কত ঋণ। দেখুন, দেখুন, ছবিটা। আপনাদের কারুর চোখ, কারুর মুখ, কারুর হাত, কারুর চোয়াল একটু বাড়িয়ে কমিয়ে এই ভয়ংকর মূর্তিটা কি সহজে হয়ে গেল। এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি প্রাচীন বিকট প্রাণীদের পুরনো চামড়া, বাঁকানো প্রখর নখ, মেলে ধরা দাঁত ; আর চোখের মণিদুটো এঁকেছি রাণীর মুকুটের মুক্তো দুটি বসিয়ে। দেখুন, দেখুন, যেন চেনাই যাচ্ছেনা, একটুকরো খুনী আগুনের মত জ্বলছে, ভয়ংকর জ্বলছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ॥ চমৎকার! সমস্ত পৃথিবীতে যে প্রাণী সন্ত্রাস এনে দেবে, তার পরিচালক আমরা, তাই এই ছবিতে আমাদের একটা ভূমিকা থাকার প্রয়োজন ছিল বলছ তো?

বৈজ্ঞানিক॥ (*অশ্লীল শব্দে হেসে*) তার মানে আমাদেরই ভয় পাবে নির্বোধ জনতা।

বার্তা-অধিকর্তা॥ অর্থাৎ আমরাই আমাদের জেতাব।

রাণী॥ আমার মুকুটটি আপনাদের যথার্থ সাহায্য করল বলুন?

দুর্গশাসক॥ ওটি আমাদেরও চোখের মণি।

পল্লীসেবক॥ হেঁ, হেঁ, আমাদের সবার।

রাণী॥ (*শিল্পীকে*) তাহলে আপাতত আমাদের কাজ শেষ। তোমারও।

চিত্রকর।। রাণীর কাছে আমার উপহার পাওনা রয়েছে।

রাণী।। (*অদ্ভুত হেসে*) নির্বোধ! তুমি রং চিনেছ, রেখার মূল্য চিনেছ—সময়ের অর্থ বোঝনি। কতক্ষণে স্বেদ শুকিয়ে যায়, তুমি জান না। (*হেসে ওঠে*) তাকিয়ে দেখ, স্বেদবিন্দু কখন শুকিয়ে গেছে। যে মুহূর্তে তোমার চিত্র রচনা শেষ হল, সেই মুহূর্তে স্বেদবিন্দু পলায়ন করেছে। চিত্রলেখা, চিত্রলেখা—(*চিত্রলেখা আসে*) ওকে আমার একটি মণিময় বলয় এনে দে। (*চিত্রলেখা চলে যায়*) আপাতত এই তোমার পুরস্কার। এখন থেকে তুমি এই দুর্গের একটি সুসজ্জিত কক্ষে থাকবে—আর যতো প্রয়োজন এই চিত্র রচনা ক'রে দেবে।

চিত্রকর।। রাণী আমাকে প্রতারণা করলেন।

রাণী।। ভয় নেই, যদি ললাটে স্বেদবিন্দু আবার দেখা দেয়, তোমার কাছে আমি যাব—আমি প্রতারণা করিনা। আপনারা যান, ওকে যথাযোগ্য সমাদরে বিশ্রামের আয়োজন করে দিন। (*সবাই চলে গেল। জীবনলাল আসে*) জীবনলাল, আজকে আমি নিজেই হাসছি.—তোমাকে হাসাতে হবে না, তোমার ছুটি, ছুটি। ও হ্যাঁ—ফুলবাগানের নীলাম জানিয়ে যে ঢোলক দেবে তার সঙ্গে (*পুষ্পোদ্যানের ছবিটা তুলে*) এই পুষ্পোদ্যানের ছবিটারও নীলাম হবে জানিয়ে দিও। তুমি ঢোলকে আওয়াজ তুলে চিৎকার ক'রে বলতে থাক, আমি ভিতর থেকে শুনব আর ভীষণ হাসব। তোমার ছুটি, ছুটি।

[*রাণী চলে যায়। চিত্রলেখা চলে যেতে চায়, জীবনলাল ওকে ধরে*]

জীবনলাল।। চিত্রলেখা, এখানকার বাতাস যেন জমাট বেঁধে আছে। কেন চিত্রলেখা?

চিত্রলেখা।। রাণীমার গোপন সভায় দুর্গের সব জানালা যে বন্ধ।

জীবনলাল।। আমাদের তো গোপন সভা নেই, তুমি খুলে দাও।

চিত্রলেখা।। তার আগে তুমি ঢোলকে আওয়াজ তোল—যা বলবার বলা অভ্যাস কর।

জীবনলাল।। না। এবার এ ছবিটাও নীলাম হবে। চিত্রলেখা, এরপর নীল রং-এর আকাশখানাও কবে যেন নীলাম করে নেবে—কোথায় তাকাব আমরা? ওঃ। গরম যেন জমাট হয়ে পুড়ছে, জানালাটা খুলে দাও। (*চিত্রলেখা জানালা খুলে দেয়। জীবনলাল ছবিটা তুলে নেয়*)

জীবনলাল।। আঃ। দুর্গের জানালা দিয়ে বাতাস এল। চিত্রলেখা, দেখো—দেখো, রং তুলিতে আঁকা গাছগুলো যেন হাওয়ায় দুলছে। ফুলের বড় প্রাণ গো, মরা কাগজেও দুলে দুলে মাথা নাড়ে।

চিত্রলেখা।। কথা পেলে কাজ ভোলো কেন ভোলা মানুষ। ঢোলকে আওয়াজ তোল, যা বলবার চেঁচিয়ে বল।

জীবনলাল।। চিত্রলেখা, বলি?

চিত্রলেখা।। বল—(*বিপুল শব্দে ঢোলক বাজিয়ে নিয়ে*)

জীবনলাল।। পুরবাসীগণ—

২য় দৃশ্য

[*দুর্গের পূর্বপরিচিত সেই কক্ষ। গবাক্ষের পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে মৃত রাজার একটি বৃহৎ আলেখ্য। বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে শিকারের নিবিষ্ট ভঙ্গিতে আঁকা। বাইরে বিপুল কোলাহল। জীবনলাল ঢোকে। সন্তর্পণে চারিদিকে তাকায়। রাজার ছবিটার মুখোমুখি দাঁড়ায়।*]

জীবনলাল।। রাজাবাবু গো, তোমার রাজ্যে ঝড় উঠেছে। বেঁচে থাকলে হাতের ঐ অস্তরটা জানলা দিয়ে বাইরের হতভাগা মানুষগুলোর দিকে ঘুরিয়ে দিতে। মানুষগুলো বাঘের মত রুখে রোষ করছে। রক্ত চোখ, চাবুক খেয়ে গায়ে আবার ডোরা ডোরা দাগ হয়েছে।—কথা তো বলছে না যেন বন কাঁপানো ডাক তুলছে। একবার দেখো না গো রাজাবাবু, দিনকাল কেমন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বদলাচ্ছে। এতো কথা বললুম, ছোটি মুখের বড় কথা—জল্লাদ ডেকে মাথা কাটার হুকুম দিলে না? মরা কাগজের ছবি যে গো তুমি, ছবি যে চোখ তুলতে জানে না, আওয়াজ করে না। এ দুর্গটাও কবে ছবি হয়ে যাবে গো! রাজত্বে বড় ভাবনা রাজাবাবু। আমারও ভাবনা আছে, সে জানে ঐ চিত্রলেখা, বনের হরিণ—না কি গো মনের হরিণ?

[*দরজার কাছে যায়। গুণে গুণে তিনটি টোকা দেয়। সরে আসে। চিত্রলেখা যেন গোটা পৃথিবীটাকে লুকিয়ে আসে।*]

চিত্রলেখা।। এই, যখন-তখন ডাকো কেন, যখন-তখন ডাকো কেন, যখন-তখন ডাকো কেন?

জীবনলাল।। যখন-তখন মেঘের রঙটা বদলায় কেন? যখন-তখন ফুলগুলো নড়ে ওঠে কেন? মনের যখন-তখন নেই গো চিত্রলেখা—মন একটা রূপোর ঘণ্টা—ওটা আপনি বাজে, আপনি থামে; রাজার পেয়াদা হুকুম করলেও থামে না, বাজতে বললে বাজে না।

চিত্রলেখা।। (*মুখ কৌতুক সুন্দর*) বললুম একটা কথা, শুনিয়ে দিলে দশকাহন।

জীবনলাল।। উঠল এক ফোঁটা চাঁদ. ভেসে গেল জগৎখান; শিউলি গাছে একটি নাড়া, উঠোন ভরা ফুল। ওদের দোষ দাওনা? আমি তো রাণীর বাড়ির পোষা ভিখিরি।

চিত্রলেখা।। রাণীমার কাছে এসব কাব্যি কর না? বোকা পেয়ে খুব শোনাচ্ছ।

জীবনলাল।। বোকা না হলে আমায় যে ধরে ফেলবে।

চিত্রলেখা।। কি ধরে ফেলব?

জীবনলাল।। যা আমি লুকিয়ে বেড়াই।

চিত্রলেখা।। তুমি আবার লুকোতে জান নাকি? কি লুকোও?

জীবনলাল।। তোমাকে আমি ভালবাসিনা—এই কথাটা লুকোই।

চিত্রলেখা।। জিভে তোমার যেমন মিষ্টি কথা আসে, তেমনি মিথ্যে আসে। এই, বল কি লুকোও?

জীবনলাল।। একটা কথা লুকোই চিত্রলেখা, তা এখন তোমাকে বলব না।

চিত্রলেখা।। আমাকে বলবে না?

জীবনলাল।। বলব, তবে এখন না। সে ঐ ঝড়ের কথা।

চিত্রলেখা।। তার মানে ঝড় নিয়ে তোমার রাঙানো-বানানো কাব্য।

জীবনলাল॥ কাব্য, তবে তার আওয়াজ আলাদা, পদের ঝংকার আলাদা। বাইরের মানুষগুলো বৈজ্ঞানিকের কারখানার চারদিকে লাল লাল মেঘ মাথায় করে এনে ঝড় বানাচ্ছে, দেখছো না—ও হল রক্তমেঘের কাব্য।

চিত্রলেখা॥ তোমার কথার মানে বুঝি না গো, কিন্তু বলতে বলতে তোমার মুখটা কেমন পাথরের মত শক্ত হল। আমার ভয় করে। চোখ দুটো অতো লাল কেন?

জীবনলাল॥ রাঙা মেঘের আঁচ লেগেছে। মিথ্যে একটা যন্ত্র বানিয়ে ওরা কেমন সবাইকে জুজু'র ভয় দেখাবে ভেবেছে। কাগজে দেখছো না, কত ভয়ের ছবি, ভয়ের গন্ধ। দেশের মানুষ আজকাল সব টের পায়, ভাঙা বুকটা নিঃশ্বাসে ফুলিয়ে রুখে দাঁড়ায়। আমার বুকের মধ্যে আর একটা জীবনলাল ঢোলক বাজায় আর বলে—পুরবাসীগণ, সিঁদুরে মেঘ উঠেছে,—বরণডালা সাজাও।

[বাইরের কোলাহল ভেদ ক'রে সমবেত ঢাকের শব্দ]

চিত্রলেখা॥ হঠাৎ ও কিসের বাজনা?

জীবনলাল॥ ভুলে গেলে আজ যে পুজো।

চিত্রলেখা॥ পুজো? কিসের পুজো?

জীবনলাল॥ সেটা বোঝা যাবে বলিদানের সময়।

চিত্রলেখা॥ তুমি কি ওদের দলে?

জীবনলাল॥ জীবনলাল জীবন চেনে—জীবনটা যে দিকে ঢেউ তুলবে সে দিকে পানসী ভাসাবো।

চিত্রলেখা॥ কোনও ঘাটে নৌকো বাঁধবে না?

জীবনলাল॥ না, নৌকো আমি বাঁধব না; শুধু কুলের ধারে এসে ঢোলক বাজিয়ে হাঁক দেব—জলে বড় সুখের টান গো, ঘাটের মেয়ে, সাগর থেকে জল নেবে তো এস।

[নেপথ্যে রাণীর কণ্ঠ; চিত্রলেখা, চিত্রলেখা!]

চিত্রলেখা॥ পালাও, রাণীমা আসছেন। যাই রাণীমা।

জীবনলাল॥ যাচ্ছি। আবার আসব। দরজায় গুনে গুনে তিনটি ঘণ্টি দেব। সংকেতটা ভুলে যেও না।

চিত্রলেখা॥ তুমিও সেয়ানা হলে?

জীবনলাল॥ তুমি সেয়ানা হলে যে প্রাণে বাঁচি চিত্রলেখা। তিনটে ঘণ্টিতে বড় সময় নেয়—একটিতে কেন দরজা খোলনা? যাই।

[জীবনলাল চলে যায়। রাণীর প্রবেশ। একটু চিন্তিত। ভ্রূ-কুঞ্চনে জটিল বিরক্তির আভাস।]

রাণী॥ কে গেল? জীবনলাল? চোরের মত পালাল কেন?

চিত্রলেখা॥ আপনাকে ও ভয় পায়।

রাণী॥ তোকে পায়না?

চিত্রলেখা॥ উঁহু।

রাণী॥ কেন?

চিত্রলেখা॥ আমার সঙ্গে যে ওর মেলে। আমরা এক গাঁয়ের মানুষ। ওরও ঘর পোড়া, আমারও সাতকুলে কেউ নেই।

রাণী।। তুই ছাড়া ওর অন্য টানও আছে। তুই বুঝবি না।

চিত্রলেখা।। ও লোক বড় ভাল, রাণীমা।

রাণী।। আমাকে আর দুটো দিন দেখতে দে চিত্রলেখা। তুই বড় বোকা মেয়ে। আর বোকা ছাড়া কাউকে আমার কাছে রাখি না। বুদ্ধি মনে এলেই তাড়িয়ে দি।

[বাইরে ঢাকের শব্দটা আবার তীব্র হ'য়ে ওঠে। রাণী কানে হাত চাপা দেয়]

রাণী।। আঃ। আমার সহ্য বড় বেশি চিত্রলেখা। ওর থেকেও প্রচণ্ড শব্দ আমার রক্ষীরা শোনাতে পারে। ওদের হাতে অস্ত্র থাকে—ওগুলো আজও ভয়ানক শব্দ জানে। আমার সহ্য বড় বেশি। কিন্তু আমার ভিতরে কোথায় যেন একটা সহ্যের শিরা ছিঁড়ে যেতে চাইছে—সে রক্তে আমি তো ভিজবনা চিত্রলেখা ; ওদের ঐ ঢোলকগুলো ভিজে ভিজে রঙিন হ'বে।

চিত্রলেখা।। ওটা পুজোর বাজনা, রাণীমা।

রাণী।। বাজনাটা পুজোর, কিন্তু যে কাঠি দিয়ে ওরা বাজাচ্ছে সেগুলো বড় সন্দেহজনক। যে গলায় ওরা ফূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠছে তার শব্দ দেবতার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য নয়, এই দুর্গটা ফাটিয়ে দেবার অভিসন্ধিতে চতুর *(ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা মূল্যবান চেয়ারে বসে পড়ে রাণী। মাথাটাকে এলিয়ে দেয়।)*

রাণী।। জানালাটা বন্ধ করে দে, চিত্রলেখা।

[চিত্রলেখা জানালাটা বন্ধ করতে এগোয়]

থাক, খোলাই থাক। চিত্রলেখা, আকাশের রঙটা কেমন রে?

চিত্রলেখা।। সিঁদুরে মেঘ উঠেছে রাণীমা, ঝড়ের হাওয়া দিচ্ছে।

রাণী।। ঝড়টাকে আমি ডেকেছি, চিত্রলেখা। আমি হাত নেড়ে ডাকতেই বুঝি এল। ওরা আমার কথা শোনে। আর যদি অবাধ্য হয় *(উঠে দাঁড়ায়)* আমার হাতের চাবুকটা ক্ষেপে ওঠে—বাতাসের গায়ে নীল নীল দাগ ফেলে চাবুকটা পাগলের মত আছড়াতে থাকে। *(জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়। হঠাৎ ঘুরে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে)* ঝড় দেখলে তোর ভয় করে?

চিত্রলেখা।। ভীষণ ভয় করে রাণীমা।

রাণী।। তুই দেখছি ভীতু গাছগুলোর মত? ডালপালা মুছড়ে খাবার ভয়, ভেঙে যাবার ভয়, বিদ্যুতের আগুনে পুড়ে যাবার ভয়। দ্যাখ, দ্যাখ—বাইরে তাকিয়ে দ্যাখ, বাতাসের কী বলবান যুদ্ধ। ঝড় আমার ভৃত্য, ক্রীতদাস। একটু ক্লান্ত হলেই ইচ্ছে হয় ঘোড়া ছুটিয়ে চাবুক মেরে ঝড়টাকে ক্ষেপিয়ে তুলি। ইচ্ছে করে আমি আকাশটাকে শাসন করি, ঝড়টাকে বাড়িয়ে দি, গাছপালা ভাঙার শব্দে পাখিগুলো ঘুম ছেড়ে অসহায় উড়াল দিলে হাততালিতে দুর্গটাকে দুলিয়ে দি। চিত্রলেখা, বিদ্যুতের আগুন দিয়ে কেউ আমাকে একটা আংটি বানিয়ে দিলে, সে কারিগরটাকে আমার দুর্গটা উপহার দিতাম। চিত্রলেখা, আমার মনোমত গয়না নেইরে।

[ব্যস্তভাবে দুর্গশাসক ঢুকে ওদের দেখে থমকে যায়। রাণী চিত্রলেখাকে চলে যেতে বলে ইশারায়। দুর্গশাসককে বসার ইঙ্গিত জানায়। চিত্রলেখা চলে যায়। দুর্গশাসকের হাততালিতে অপেক্ষমান ব্যক্তিরা এসে রাণীর ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করে। কিছুকাল সবাই রহস্যময় স্তব্ধতায় স্থির।]

দুর্গশাসক।। অসময়ে রাণীকে বিরক্ত না করে উপায় ছিল না।

রাণী।। আমি তোমাকে প্রয়োজন বোধ করছিলাম।

দুর্গশাসক।। তাহলে আমি যথাসময়ে এসেছি। কিন্তু রাণীকে অতি দ্রুত প্রয়োজনটা জানানো দরকার।

রাণী।। জানি, বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রটা তৈরীতে বিঘ্ন হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক।। আমি কিন্তু যত্নে ও পরিশ্রমে ত্রুটি করিনি।

বার্তা-অধিকর্তা।। সংবাদপত্রে আমি প্রবল উৎসাহে যন্ত্রটার চরিত্র এবং উদ্দেশ্য ফলাও করে প্রচার ক'রে যাচ্ছি।

রাণী।। ফলাফল একেবারে অশুভও নয়।

দুর্গশাসক।। তবে কি করে জানিনা, যন্ত্রটা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের কৌশলমাত্র—

রাণী।। এ সংবাদটা বিদ্রোহী জনতার এক অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে—

দুর্গশাসক।। হ্যাঁ, ওরা বিরুদ্ধ প্রচার চালিয়ে—

রাণী।। পুরবাসীদের সচেতন করে তুলছে—

দুর্গশাসক।। হ্যাঁ—

বৈজ্ঞানিক।। ঠিক—

সৈন্যাধ্যক্ষ।। তাই—

বার্তা-অধিকর্তা।। ঠিক তাই—

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর]

রাণী।। এ তো হবেই। সমস্ত কিছুই প্রতিযোগিতা। ওদের আর আমাদের প্রতিযোগিতার খেলা।

বার্তা-অধিকর্তা।। আজকের সংবাদপত্রে বৈজ্ঞানিকের তৈরি যন্ত্রের একটা ছবি পর্য্যন্ত ছাপা হয়েছে। সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের নিজস্ব ঘোষণা। বহু ভীত লোক আমাদের কর্মকেন্দ্রে সাক্ষাৎকারের জন্য আসছে। তাদের বোঝাচ্ছি। বশ করছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। আর ভয়কে বশ করা সহজ।

দুর্গশাসক।। কিন্তু জনতা গবেষণা কেন্দ্র আর কারখানা কর্মীদের পর্যন্ত হাত করবার চেষ্টা করছে। এটা বিপজ্জনক। আমাদের কর্মীদের ওরা প্রভাবিত করলে, সমস্ত গোপনতা ফাঁস হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক।। সে কারণেই কর্মীদের নিজস্ব লোক ভেবে আস্থা না পাওয়া পর্যন্ত কাজ এগুতে পারছে না।

বার্তা-অধিকর্তা।। কেবলমাত্র সংবাদপত্রই এ পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আমাদেব যন্ত্র দিয়ে যা নেই আমরা তার অস্তিত্ব প্রমাণ করছি, যা আছে তাকে শূন্য বলে বিশ্বাস করাচ্ছি।

রাণী।। বিজ্ঞানের চাতুর্য্য এবং সংবাদ-যন্ত্রের ধূর্ত বিচক্ষণতা—এই দুটো ব্যাপারকে দুর্গশাসক অতি দ্রুত সামঞ্জস্যে নিয়ে আসবে—এটাই রাণীর কাম্য।

দুর্গশাসক।। কিন্তু উত্তেজিত জনতাকে নতি স্বীকার না করালে আমাদের কাজ মন্থর হতে বাধ্য। আমাদের বিশ্বাস করাতে হবে যে, এই যন্ত্র দেশের শত্রুকে চিনিয়ে দেবার

জন্য তৈরী হচ্ছে। এবং এই দেশকল্যাণমূলক ব্রতপালনে যারা প্রতিবন্ধক তারাই স্বদেশদ্রোহী। অতএব দেশ-সংরক্ষণবিধির জোরে বিদ্রোহী শীর্ষস্থানীয়দের অবিলম্বে কারারুদ্ধ করা দরকার।

বার্তা-অধিকর্তা।। ঐ প্রধানদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেই সাধারণ মানুষকে অতি সহজেই আমাদের ভীতিকর যন্ত্র বিক্রি ক'রে বিভ্রান্ত ক'রতে পারব।

রাণী।। যে ক'জনকে শীর্ষ নেতা বলে চিহ্নিত করা আছে, তার বাইরে কোনও নেতা নেই? তাছাড়া নেতৃত্ব যদি নেতার অভাব থেকেই জন্মায়? এতে কি নতুন নেতা সৃষ্টির সুবিধা করে দেব না?

দুর্গশাসক।। রাণীর প্রশ্ন নিতান্ত মূল্যবান। একারণেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে আমাদের পা ফেলতে হবে। কঠোর আর দমনমূলক সন্ত্রাস বিস্তার যত নিখুঁত হবে, ততোই আমরা এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ খোলা পাব।

বার্তা-অধিকর্তা।। আমরা দুর্গশাসকের অভিরুচির সঙ্গে একমত।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। আর দুর্গশাসকের কিছু অতিরিক্ত স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে এ ব্যাপারে।

রাণী।। সৈন্যাধ্যক্ষের মুখে দুর্গশাসকের অতিরিক্ত স্বাধীনতার কথা শুনলে মনে হয়, দুজনেই দুজনকে বড় বেশি আপন ভাবতে চাইছেন। আর এ জাতীয় আপনতাবোধের রাজনৈতিক নাম দলবদ্ধতা। খুব সন্দেহজনক।

দুর্গশাসক।। রাণীর সন্দেহ অমূলক ও অসম্মানজনক। সৈন্যাধ্যক্ষ প্রশাসনিক স্বার্থে যুক্তিপূর্ণ মত জানিয়েছে মাত্র।

রাণী।। অপূর্ব! দুর্গশাসক অমনি সৈন্যাধ্যক্ষের উত্তেজিত আবেগ সমর্থন করছে উত্তেজনাও কিন্তু বিচার সাপেক্ষ।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। কোনওরকম উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রস্তাব আমি করিনি।

বার্তা-অধিকর্তা।। আমাদের নিজেদেব মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে আমরা কিন্তু উদ্দেশ্যের পথ হারিয়ে ফেলব।

দুর্গশাসক।। আমি আবারও বলছি, রাণীর সন্দেহ অসম্মানজনক। একজন সৎ অমাত্য সম্পর্কে এ জাতীয় মন্তব্য বিপত্তিকর।

রাণী।। দুর্গশাসক দেখছি বড় সহজেই উত্তেজিত। আমি শুধু একটা কূটনৈতিক সত্যের কথাই বলছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কিছুটা আঘাত দিয়ে আপনাদের ভেতরকার ফাঁপা উত্তেজনার মানুষটা কতটা নির্বোধের মত উঁচুতে ওঠে, কৌশলে লক্ষ্য করছিলাম। ...আপনাদের ভিতরকার উত্তেজনায় আপনারা একচক্ষু প্রাণীর মত অর্ধ-অন্ধ। ...আপনারা এত ভেবেছেন, কিন্তু এটা ভাবেন নি কি করে আমাদের পরিকল্পনা বাইরের কিছু লোকের কাছে ফাঁস হয়? ...আমি যদি আপনাদের সন্দেহ করি? *(সবার মধ্যে গুঞ্জন ওঠে)*

দুর্গশাসক।। আমরা? অসম্ভব!

সৈন্যাধ্যক্ষ।। রাণীর নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছি!

বৈজ্ঞানিক।। আমরা স্বপ্নে পর্যন্ত রাণীর আজ্ঞা মেনে চলি।

বার্তা-অধিকর্তা।। আমাদের সংবাদ-পত্রের অর্থই রাণীর অভিরুচির সার্থক রূপায়ণ।

রাণী।। জানি। আমি জানি আপনারা সন্দেহের অতীত। কিন্তু আপনাদের উত্তেজনা কিছু বেশি। তাই চোখটাও কিছু কম দেখে। তাই আপনারা দেখতে পাননি কে আমাদের গোপন কৌশল বাইরে ফাঁস করল। আপনারা ছাড়া সন্দেহের কারণ হতে পারি আমি। কারণ, পরিকল্পনাটা আমি জানি। আপনারা আমাকে সন্দেহ করতে পারেন।

দুর্গশাসক।। আমাদের সুকৌশল বৃত্তের বাইরে একটি লোকই রয়েছে—সে ঐ চিত্রকর।

বৈজ্ঞানিক।। কিন্তু সে তো দুর্গের থেকে বেরোতে পারে না।

বার্তা-অধিকর্তা।। জনতার সঙ্গে তার সংযোগ একটুও নেই।

রাণী।। কিন্তু সংবাদ পৌঁছেছে। অর্থাৎ এই দুর্গ আমাদের অদৃশ্য একটি চক্রান্তের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে সম্ভবত একটি ছায়ামূর্তি নীরবে আমাদের অলক্ষ্যে হাঁটছে। এই দুর্গের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে বাইরে বাইরে পাঠাচ্ছে। চিত্রকর দুর্গের ভিতর অন্তরীণ। কিন্তু তার উদ্দেশ্য আর অভিসন্ধি আমরা বন্দী করতে পারিনি।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। আমরা ওকে সরিয়ে দিলে কেউ টের পাবে না।

বার্তা-অধিকর্তা।। সরিয়ে দেবার সংবাদটা আমি সুকৌশলে নিরাপদ দায়িত্বে প্রকাশ করবার ভরসা রাখি।

বৈজ্ঞানিক।। বীজাণুর শিকড় সমূলে উৎপাটনই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

রাণী।। না। তাহলে পরিণাম শুভ হবে না। চিত্রকরের বিলোপ প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকার নিতে পারে। কারণ, আগেই বলেছি, এখানকার যাবতীয় সংবাদ বাইরে যাচ্ছে।

দুর্গশাসক।। তাহলে সেই গুপ্তচরকে খুঁজে বার করাই আমাদের প্রধান এবং প্রথম কাজ।

বার্তা-অধিকর্তা।। সম্ভবত, সেই গুপ্তচরকে রাণী চেনেন?

রাণী।। আমি অনুমান করি।

বৈজ্ঞানিক।। রাণীর অনুমানই প্রমাণ।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। সেই অনুমানের সূত্র ধরে আমরা এগোব।

রাণী।। রাণীর সম্পর্কে যদি আপনাদের আস্থা প্রকৃতই এত শ্রদ্ধেয়, তাহলে আমার পরিকল্পনাতেই বিষয়টা পরিচালিত হোক।

দুর্গশাসক।। রাণীর চিন্তা-প্রণালী জানবার একটি কৌতূহল জানাচ্ছি।

রাণী।। রাণীর ইচ্ছে চিত্রকরকে নিশ্চিহ্ন না করা, বরং তাকে রাণীর আরো ঘনিষ্ঠ করে রাখা।

বার্তা-অধিকর্তা।। কিন্তু তাতে রাণীর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ।। চিত্রকর একটা বিশেষ অভিসন্ধি নিয়ে আছে বলেই তো আমাদের বিশ্বাস।

রাণী।। রাণীর ক্ষতির প্রতিরোধ রাণীই করবে। আমি চাই লোকটিকে বশীভূত করতে, এতটা বশীভূত, যাতে চিত্রকর নিজেই নিজের বিপক্ষে চলে যায়।

দুর্গশাসক।। রাণী কোনও পন্থা ভেবেছেন?

রাণী।। এর আচার গোপন, সাংকেতিক এবং গূঢ়। আপনারা কেবল প্রতিক্রিয়া দেখবেন, ক্রিয়া অন্তরালে।

বৈজ্ঞানিক।। রাণী কি শত্রুকে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন না?

বার্তা-অধিকর্তা।। শত্রু কতখানি বিশ্বাস্য?

দুর্গশাসক।। রাণীর বশীকরণে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

রাণী।। দুর্গশাসক সম্ভবত রাণীকে অধিক জানে, তার জ্ঞানকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। ...আমাদের রক্ষীরা যেখানে যথেষ্ট নয়, অস্ত্র যেখানে যথেষ্ট শাণিত নয়, সেখানে আমাকে সম্মোহনের যাদুদণ্ডটি হাতে তুলে নিতে হবে। স্থূল মণিমুক্তোর প্রলোভন নয়, মুক্তোর রঙিন আভায় আলস্য ছড়িয়ে হাতছানি দিতে হবে। যেখানে আমার যুক্তি পঙ্গু হবে সেখানে দুটি চোখ রূপোলি পাখার মত দুলিয়ে দিতে হবে। সেই সোনার পাহাড়টা তিলতিল করে গড়তে হবে, যার প্রতিটি ধাপে পা ফেলতে ওর লোভ হবে, এবং ধীরে ধীরে চুড়োয় উঠলেই আমাদের দুর্গের বিজয় শঙ্খটি বিপুল আনন্দে বেজে উঠবে। মানে আপনাদের অভিপ্রেত বিজয় হল, আমাকে কয়েকটি স্বেদবিন্দুর পরিশ্রম সহ্য করতে হবে।...ঠিক আছে, আপনারা এখন যেতে পারেন। আমি প্রস্তুত থাকব।

[*ওরা চলে যায়। চিত্রলেখা আসে*]

চিত্রলেখা।। রাণীমা, ঝড়টা আস্তে আস্তে বাড়ছে।

রাণী।। তুই ঘুমোতে যা চিত্রলেখা। আর শোন, জীবনলালকে ব'লে দিস— চিত্রকরকে দেখাশোনা করার ওর আর কোন প্রয়োজন নেই। চিত্রকরের বন্ধকক্ষে মুহূর্তের জন্য গেলেও জীবনলাল ভয়ংকর শাস্তি পাবে। ...যা এ ঘরে আমি একা থাকব, এমনকি না ডাকলে তুই পর্যন্ত ঢুকবি না। যা!

[*চিত্রলেখা চলে যায়। রাণী দরজা বন্ধ করে। মুহূর্তকাল ঝড় দেখে। মুখে বিদ্যুতের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দ্রুত দেয়ালে পিঠ দিয়ে সকৌতুকে হাসতে থাকে। আস্তে আস্তে রাজার ছবিটার কাছে এসে হাসিতে হিল্লোলিত মুখে তাকায়।*]

রাণী।। ঝড়টা কি হিংসুক দেখলে? হাত বাড়াতেই আমাকে জড়িয়ে যেন বিপুল টানে বাইরে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। কি বলবান লোভ বল? ওতো জানেনা, এই কক্ষে এখন আমরা দুজনে ধীরে ধীরে একটা নির্জন ঝড় বানাব। কই, নেমে এস, আমি কিন্তু দু'বার ডাকব না। ও, হাত বাড়িয়ে দিতে হবে? তুমি তো রাজা, সিংহের মত তরুণ উল্লাসে লাফ দিয়ে নামো। যেন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামছ! হ্যাঁ, ঠিক আমার কাছটিতে নামবে। আমি গুনছি, এক, দুই, তিন।

[*যেন রাজা ঝাঁপিয়ে পড়ল, এ-রকম কাল্পনিক বিশ্বাসে নেমে পড়ার জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল*]

নাও, এবার আমার হাতটা ধর।

[*এখানকার রাণীর অভিনয় সব সময়েই অদৃশ্য রাজাকে জীবন্ত কল্পনা করে। রাণী রাজার হাত ধরে টেবিলের ধারে চেয়ারে বসায়। নিজে অন্য প্রান্তে বসে। দূর থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। রাণী ক্ষণকাল চিন্তিত হয়ে স্বাভাবিক হয়।*]

বাইরেব ঐ শব্দটা শুনে অত চিন্তিত হয়ে পড়লে যে! তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। যে জনতা তোমাকে মেরেছে, আমাদের রক্ষীরা তাদের শায়েস্তা করতেই তো গোলা ছুঁড়ছে। ওকি, উঠছ কেন? (*রাণীও উঠে*) জনতা তোমাকে মারেনি? আমি কি মিথ্যে

বলছি? (*গম্ভীর গলায়*) যাবার আগে একটা কথা শুনে রাখো, জনতাই তোমাকে মেরেছে—একথা আমার নিজের মনকে পর্যন্ত আমি বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছি। আমি রাণী, রাজনীতির বাইরে পা ফেললেই আমি একজন তুচ্ছ গৃহবধূ মাত্র। অথচ মাথার মুকুটটা পরে নিলে আকাশটা পর্য্যন্ত মাথা নুইয়ে কুর্ণিশ জানায়। তোমার মৃত্যু রহস্য আমি তোমাকে পর্যন্ত জানাতে পারব না—তুমি দুঃখ কোরোনা। এস, আমরা মুখোমুখি বসি, দাবার ঘুঁটির চাল ভাবতে ভাবতে আমার মুখের উপর তোমার চোখ থেমে যাবে। এস, বোস এসে। এই তো, লক্ষ্মী রাজা, বাধ্য রাজা—আমার কথা শুনলে, ছোট্ট ছেলেটির মতো এসে বসলে...দাঁড়াও, আমি ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে দিচ্ছি। (*সাজাতে থাকে*) ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে তোমার সেই প্রিয় জিনিশটি তো এখনো দেওয়া হয়নি, আগে নিয়ে আসি, তুমি, তুমি ততক্ষণে সাজাতে থাকো।

[রাণী প্রায় দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়েই ফিরে আসে। হাতে মদের বোতল, গ্লাস।]

এই প্রিয় পানীয়টা তুমি আনিয়েছিলে—একটি ফোঁটাও স্পর্শ করতে পারনি। (*এগিয়ে দেয়*) নাও, খেয়ে ফেল। (*বাইরে গুলির শব্দ*) তোমার পানসভার সম্মানে বাইরে তোপধ্বনি হচ্ছে! (*গ্লাসটা টেবিলে রাখে*) এইবার, কি চাও তুমি? আমাকে? না ঐ গুলির শব্দে ঘুলিয়ে ওঠা ঝড়ের আকাশ, না এই দুর্গের গোপন অন্ধকার...প্রিয়তম অন্ধকার, খল অন্ধকার। ...জানো, তোমার পিপাসা আমি বুঝি, আমার পিপাসা দিয়ে বুঝি। তুমি একবার উঠে এস, এক মুহূর্ত অন্তত এই রাণীত্বের শক্ত খোলসটার বাইরে নিয়ে যাও। দুর্গের কঠিন পাথরের চেয়ে শক্ত এই রাণীর পোশাক—দিনের পর দিন আমার গায়ে কেটে বসেছে। তুমি জান একটা পোশাক একটু একটু করে কি ভাবে একটা হৃদয়কে সম্পূর্ণ গ্রাস করে? এই পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে আমার শৈশব আমাকে খুঁজে পায় না। বাল্য নয়, যৌবনও চিনতে পারে না। এক মুহূর্তের জন্য সকলের চোখের আড়ালে (*রাণী কাল্পনিক রাজার খুব কাছে যায়*) আমার এই পোশাকটা তোমার তলোয়ার দিয়ে বিদ্ধ কর, ছিন্ন কর—একটা ভীষণ সুন্দর নগ্নতায় আমাকে উদ্ধার কর।

[আবার-গুলির শব্দ। বাইরে কোলাহল। রাণীর মুখ চিন্তিত। হঠাৎ চিত্রলেখা প্রবেশ করে]

চিত্রলেখা।। রাণীমা!

রাণী।। চিত্রলেখা, তোকে এখানে আসতে আমি নিষেধ করেছিলাম। তোর স্মৃতি কি দুর্বল হল, নাকি তোর হঠাৎ সাহসে আমাকে দুর্বল ভাবছিস?

চিত্রলেখা।। আমি না এসে পারলাম না। দুর্গশাসক একটা ভয়ের খবর জানাল, আপনাকে না জানানো আমার পক্ষে আরো বড় অন্যায় হত। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

রাণী।। দুর্গশাসক কি সংবাদ পাঠিয়েছে?

চিত্রলেখা।। চিত্রকর বন্দীকক্ষ থেকে পালিয়েছে।

রাণী।। পালিয়েছে! কি করে পালায়? চতুর্দিকে দুর্গের বেষ্টনী, রক্ষী-বাহিনী সতর্ক—কি করে পালায়?

চিত্রলেখা।। রক্ষী-বাহিনী ওর পিছু পিছু তাড়া করেছিল—অদ্ভুত কৌশলে পালিয়েছে।

রাণী।। দুর্গশাসককে এতটা অপদার্থ আমি ভাবিনি।

[*অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দুর্গশাসক ঢুকল। চিত্রলেখা চলে যায়*]

রাণী।। চিত্রকর কি করে পালায়?

দুর্গশাসক।। আমি আমার ত্রুটি স্বীকার করছি। কিন্তু বন্দীকক্ষ থেকে পালালেও এই দুর্গের বাইরে যেতে পারেনি। কোথাও সে লুকিয়ে আছে। রাণীকে আক্রমণ করাও ওর উদ্দেশ্য হতে পারে। রাণীর আদেশ পেলে, আমরা দুর্গটা অনুসন্ধান করি। রাণীর কক্ষের বাইরে আমি রক্ষীর ব্যবস্থাও করছি।

রাণী।। আপাতত কিছুরই প্রয়োজন নেই। চিত্রকর যদি পালিয়ে থাকে, তাহলে...তাহলে পরিণামটা বুঝতে পার? ওকে আমার চাই।—তুমি ওর অনুসন্ধান কর।

দুর্গশাসক।। কিন্তু রাণী সম্ভবত এতটা সাহসী না হলেই ভাল ছিল। অনাবশ্যক মনে হলেও রক্ষী প্রহরায় থাকলে ক্ষতি তো নেই।

রাণী।। তুমি যাও।

দুর্গশাসক।। বেশ। পরবর্তী সংবাদ যথাসময়ে পাঠাব।

[*দুর্গশাসক যেতে থাকে*]

রাণী।। শোন, তোমার রক্ষীদের আমার প্রয়োজন না থাকার একটা বড় কারণ—রাণীর অপর নাম অবিশ্বাস। তোমারই অনুগত রক্ষী শিকার থেকে দুর্গে ফিরে আসতে রাজার সঙ্গে ছিল। ক্ষিপ্ত জনতার হাতে রাজার মৃত্যু—ব্যাপারটা যোগ্য বিচক্ষণতায় সাজিয়ে তুমি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়ই দিয়েছিলে।

দুর্গশাসক।। রাজার ভ্রান্ত নীতি সর্বনাশ ডেকে আনছিল। রাজাকে বহুবার সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। যা করা হয়েছে, নিতান্ত বিবেচনার ফলেই করা হয়েছে। রাজাকে নয়, একটা ভ্রান্ত নীতিকে হত্যা করা হয়েছে—এটাই যথার্থ রাজকর্তব্য।

রাণী।। রাণীর কক্ষদ্বারে প্রহরী নিয়োগে অনুরূপ কোন সূক্ষ্ম রাজকর্তব্য সাধনের তৎপরতা আছে কিনা—সেটাও আমার জানা প্রয়োজন। বলেছি, রাণীর অন্য নাম অবিশ্বাস।

দুর্গশাসক।। রাণীর এ জাতীয় চিন্তা নিতান্তই যুক্তিবিরোধী। সম্ভব রাণী মানসিকভাবে স্থির নয়। তাই অদ্ভুত চিন্তায় তিনি নিজেকে অহেতুক চঞ্চল করছেন। রাণীর প্রতি দুর্গশাসকের বাধ্যতা রাজত্ব ছাড়িয়েও অনেকখানি—এখানেই আমি অপরাধী।

রাণী।। শাস্তি চাও?

দুর্গশাসক।। আপাতত জনতাকে শাস্তি দেওয়াই আমার প্রশাসনিক দায়িত্ব। চলি।

[*দুর্গশাসক চলে যায়। রাণী রাজার কাছে যায়*]

রাণী।। (*ছবিটাকে লক্ষ্য করে*) অদ্ভুত চতুর কিন্তু তুমি। সকলের অলক্ষ্যে ঠিক ছবির মধ্যে এসে লুকিয়েছ। দুর্গশাসককে কোন্ দণ্ড দেবে? এখন কিন্তু দণ্ডদানের কর্ত্রী আমি —কারণ আমি রাণী, রাজা এ রাজ্যে একটি অপ্রচলিত বিস্মৃতপ্রায় শব্দ। (*বাইরে গুলির শব্দ। কয়েকবার*) সমস্ত সৈন্য জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক। মারমুখি শব্দে আকাশটা নড়ে উঠুক। এই বিপুল তরঙ্গ আমার রাণীর সিংহাসনটা উঁচু, আরো উঁচু ক'রে তোলে।

...তবু, রাণীর পোশাকই আমাকে ভীষণ জড়িয়ে ধরে মারে। জান, আমার হৃদয়টা যেন হাজার পাহাড়ের পাথর দিয়ে চাপা পড়ে যায়। এই ভাল, চিত্রলেখা, চিত্রলেখা—(*চিত্রলেখা আসে*) চিত্রলেখা, আমার মুকুটটা নিয়ে আয় ; মুক্তো বসানো আমার প্রিয় পোশাকগুলো আন, পোশাকে-মুকুটে আমাকে ঢেকে দে—যেন আমাকে আর বিন্দুমাত্র দেখা না যায়। রাণী যেন নিজের হৃদয়টাকে দেখতে না পায়। সব আয়নাগুলো ভেঙে দে, যদি আমার মুখ ছাড়া হঠাৎ অন্য কোনো ছবি জেগে ওঠে।

চিত্রলেখা॥ রাণীমা, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, রাণীমা।

রাণী॥ ঠিক আছে, তুই যা।

[চিত্রলেখা চলে যায়। রাণী ক্লান্ত হয়ে টেবিলে মাথা নামায়। হঠাৎ জানলা দিয়ে চিত্রকর বৃষ্টিতে ভিজে এসে উপস্থিত হয়। চিত্রকর ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, অদ্ভুত অবশ দৃষ্টিতে রাণীকে দেখে। তারপর জানলার গায়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। রাণী ওকে দৌড়ে ধরে চেয়ারে এনে বসায়। চিত্রকর কষ্টে চোখ খোলে।]

রাণী॥ এত ক্লান্ত কেন? অনেকটা পথ ওরা তাড়া করেছে তো? একি, কনুইয়ের কাছ থেকে যে রক্ত পড়ছে। ...সমস্ত ঘরটায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়েছ।

[একটা কিছু দিয়ে রক্ত মুছতে থাকে]

এর আগে আমার শিকারের রক্ত কোনকালে আমি মুছিনি। দ্যাখো, একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখো।

[চিত্রকরের কাঁধে ঝাঁকুনি দেয়]

কথা বল, কথা বল, ঝড় গর্জন করে বলে আমার ভাল লাগে। পাহাড় শব্দ করেনা বলেই বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে দিতে চাই। কি চাও, মৃত্যু? দুর্গশাসকের হাত থেকে এবার তোমাকে বাঁচানো আমার পক্ষেও সম্ভব হবে না। এবার রাণীর বিচারে তোমার মৃত্যু ঘোষণাও স্বাভাবিক। কথা বল! কথা বল! দাঁড়াও আগে হাতটা বেঁধে দিই।

[রাণী পাশের কুঠরি থেকে বড় রুমাল এনে চিত্রকরের ক্ষত বেঁধে দেয়। বাইরে থেকে বিউগিল-এর শব্দ শোনা যায়]

রাণী॥ সম্ভবত দুর্গশাসক। আপাতত তোমাকে লুকোনো প্রয়োজন। ওঠো, পাশের কুঠরিতে তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। যন্ত্রণায় বিন্দুমাত্র শব্দ করবে না। বুঝতে পারছ? মৃতের মত চুপ থাকবে। একেবারে শান্ত।

[রাণী বেশ কষ্টে ও যত্নে চিত্রকরকে পাশের কুঠরিতে রেখে আসে। ফিরে এসে ঘরের চারধার লক্ষ্য করে। টেবিলে একটা ধারালো ছুরি দেখতে পায়। তুলে দেখে, বিচিত্র হাসে। রাজার ছবির দিকে দেখে]

রাণী॥ দ্যাখো, চিত্রকরের এই ছুরিটা সফল হলে আমিও তোমার পাশে আর একটা ছবি হয়ে যেতাম। তাই চাও? কি ভাবছ? আজ হোক, কাল হোক, আমরা তো নিতান্তই ছবি? এই চিত্রকর কি আমার মৃত্যুর ছবি আঁকতেই এসেছিল? আমি ওকে বাঁচাচ্ছি কেন, ভাবছ? দেখো, তুমি দেখো। রাণী এক-একসময় হঠাৎ তার নিজের হৃদয়টার দিকে তাকায়। এই নিষিদ্ধ দৃষ্টি বড় ভয়ংকর। এর পরিণাম আমিও জানিনা।

[রাণী ছুরিটা বুকের মধ্যে রেখে দেয়। রাণী

ঘন্টিতে শব্দ করে। দুর্গশাসক ঢোকে]

দুর্গশাসক।। দ্বিতীয়বার রাণীকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম। এই দুর্গের কক্ষগুলো অনুসন্ধানের জন্য রাণীর অনুমতি চাইছি। অন্য সব দিক আমরা দেখেছি।

রাণী।। আমি একা থাকতে চাই।

দুর্গশাসক।। আমরা যথাসাধ্য দ্রুত কর্তব্য সমাধা করব।

রাণী।। তার পরেও যদি চিত্রকরকে না পাও?

দুর্গশাসক।। আমি স্বীকার করব, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সে অসাধ্য সাধন করেছে। তবে ধরা সে পড়বেই।

রাণী।। আপাতত তুমি নিরস্ত থাক। কেবলমাত্র দুর্গ রক্ষা কর। জনতাকে যেভাবে হোক দমনে রাখ। চিত্রকরের ভার আমার উপর। আমিই তাকে নতুন জালে আবদ্ধ করব।

দুর্গশাসক।। তবু, রাণীর কাছে, আর একবার এই দুর্গের প্রতিটি কক্ষ অনুসন্ধানের অনুমতি চাইছি। আমাদের ধারণা, চিত্রকর এই দুর্গে—রাণীরই কোনো ব্যক্তিগত কক্ষে আত্মগোপন করে আছে।

রাণী।। তাহলে বুঝব, আমার কাছাকাছিই আছে। ওকে ধরার পরিশ্রম খুব একটা হবে না। ঠিক আছে, তুমি যাও।

দুর্গশাসক।। দুর্গের অলিন্দে সন্দেহজনক কাউকে লক্ষ্য করে আমাদের একজন প্রহরী গুলিও করেছিল,—অবশ্য গুলিবিদ্ধ কোনো লোকের অস্ফুট চিৎকারও সে শোনেনি। তার লক্ষ্য বিফলও হ'তে পারে, কিম্বা প্রকৃতই কেউ ছিল না। আমার এত কথা বলার কারণ, রাণীকে এই দুর্গে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। দুর্গের এই গবাক্ষটা আমি বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছি।

রাণী।। বাইরের ঝড় থেমে গেছে—গবাক্ষটা এখন অর্থহীন। বন্ধই থাকুক।

দুর্গশাসক।। আমাদের প্রিয় রাণীকে আর একবার সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়ে আমি যাচ্ছি।

রাণী।। সতর্কতা আমার চরিত্র।

[দুর্গশাসক দরজা বন্ধ করে চলে যায়। রাণী গোপন কুঠরির কাছে আসে]

রাণী।। নির্ভয়ে বেরিয়ে এস। নির্ভয়ে। রাণী তৃতীয়বারের বেশী নির্দেশ জানে না। বেরিয়ে এস।

[শরীরে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে চিত্রকর প্রবেশ করে। দুর্গের দেয়ালে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়]

রাণী।। সুন্দর! রাণী বাধ্যকে বড় ভালবাসে। আমি বুঝি, তোমার এতটা ক্লান্তি কেবল শরীরের নয়। তোমার অদৃশ্য স্নায়ুগুলো কিছু একটা বলবার বিস্ফোরণের জন্য অস্থির। তোমার হাত একটা শাণিত ছুরি মুঠোয় ধরে আমার দিকে আসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি জানি, তুমি জনতার বন্ধু, সেবক। এগিয়ে এস, আমি তোমাকে সাহায্য করব। এত দ্বিধা কেন? বাইরের ঝোড়ো মেঘের বিদ্যুৎ তোমাকে এ ঘরে ছিটকে ছড়িয়ে দিয়েছে—তুমি বজ্রের গর্জনে ফেটে পড়। আমি একজন বীরকে উন্মত্ত ছুরি হাতে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখতে চাই।

[চিত্রকর গোপন ছুরিটা খোঁজে। রাণী ওর হাতে ছুরিটা দেয়। চিত্রকর দ্রুত মুঠোয় নিয়ে কাঁপতে থাকে। দৃষ্টি প্রখর থাকে]

রাণী।। তোমার মুঠো, তোমার চোখ, শক্তিতে নড়ে উঠেছে। এইবার দুটো পায়ে ক্ষিপ্রতা নিয়ে এস। বুকে প্রচণ্ড সাহস জমিয়ে তোল—ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এস। এক একটা মুহূর্তে মৃত্যুকে আমার প্রয়োজন মনে হয়—তুমি আমার মৃত্যু হয়ে এস। এক একটা সময়, আমার রাণীর পোশাক, মুকুট আর ঐশ্বর্য ছিঁড়েখুঁড়ে, আমার হৃদয়টা খুঁজি—ছুরির ফলা দিয়ে আমার হৃদয়টাকে চিনিয়ে দাও। আমার মণিহারে একটা সুবর্ণশঙ্খ রয়েছে, এটায় চুমুক দিলে ভিতরের বিষ রক্তে মিশে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে ডেকে আনবে। কিন্তু দ্রুত একটা মৃত্যুর লোভ কার না রক্তে ঘোরে! তুমি এগিয়ে এস, আমি প্রস্তুত।

[চিত্রকরের ঠোঁট নড়ে, সে কিছু বলতে গিয়েও পারে না]

রাণী।। কথা বল। আমার আদেশ, কথা বল। চিৎকার কর। তোমার স্তব্ধতা তোমার শিরা শরীর পুড়িয়ে আগুনের মত জ্বলছে। বাঁচার জন্যে কথা বল।

[চিত্রকর দেয়ালে পিঠ রেখে ভীষণ ক্লান্তিতে বসে পড়ে। ধীরে ধীরে বিপুল কষ্টে ওঠে।]

রাণী।। বুঝেছি—তুমি সময় চাও। আমাকে মারবার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি, ভিন্ন সময়ের কথা ভাবছ। আমি বুঝি—হঠাৎ উন্মত্ততায় ছুরিকাঘাত বীরের কাজ নয়। শান্ত হাতে, সংকল্পের অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে এসে হত্যা চাও। সেই স্থির সংকল্পে পৌছবার জন্য তোমার রক্ত-মাংস-হৃদয় একটা যুদ্ধে জিততে সময় চাইছে। তাই হবে, তোমাকে আমি সময় দিলাম। তুমি বীর হও, একটা বিদ্যুতে জড়ানো শান্ত ঝড় হও। তোমাকে সময় দিলাম। ঐ কুঠরিতে যাও। নিজে হেঁটে যাও।

[চিত্রকর বাঘের মত এগোয়। অসহায় আর করুণ মুখ। রাণীর মুখে বিচিত্র আর জটিল হাসি। চিত্রকর চলে যেতেই রাণী শব্দ করে হেসে ওঠে। গবাক্ষ খুলে দেয়।]

রাণী।। (*রাজার আলেখ্য'র দিকে তাকিয়ে*) ঘটনাটা তোমার চোখের সামনেই ঘটতে দিলাম। আজ তোমার জন্মদিন। ঘটনাটা তোমার জন্মদিনের উপহার। পরের দৃশ্য, পরবর্তী মুহূর্তে।...দ্যাখো, ঝড় থেমে গেছে। বাইরের আকাশ কী ভীষণ ক্লান্ত, গাছগুলো কী গভীর শান্ত। পৃথিবীর যেন ঘুম পাচ্ছে। এবার আমি অতিকায় রাণী হব। দীর্ঘ সোনার হাত বাড়িয়ে ঐ চিত্রকরের দুটো চোখ তুলে এনে আমার মুকুটে মণিখণ্ডের মত বসাব, ওর হৃদয় পাদুকার মতো পায়ে নিয়ে হাঁটব। ওকে আমি রাণীর পোশাক দিয়ে চোখ বেঁধে অন্ধ ক'রে দেব। আর ঐ অন্ধ চিৎকার ক'রে বলবে, সুখ, এইতো সুখ!

[গোপন কুঠরির থেকে চিত্রকর ক্লান্ত হয়ে ছুরি হাতে ফিরে আসে। রাণীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এগোতে থাকে। রাণীর কাছাকাছি গিয়ে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। রাণী স্থির ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে।]

রাণী।। আমি প্রস্তুত আছি।

[চিত্রকর ছুরি তোলে। উত্তেজনায় কাঁপে। ভীষণ কষ্টে মুখটা ফেটে

যেতে চায়। হঠাৎ রাণীর পায়ের কাছে অবশ হয়ে পড়ে যায়। রাণী শান্ত দৃষ্টিতে দেখে। মুখে গর্বিত ও রহস্যময় হাসি ফোটে। চিত্রকর মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে।]

রাণী।। বড় পিপাসায় অস্থির একটা প্রজাপতি সেজে ও আমার খাঁচায় উড়ে এল। এবার আমি ওর ডানায় রঙ করব, রঙিন সুতো বেঁধে যেমন খুশি ওড়াব!

দ্বিতীয় প্রবাহের অন্ধকার

৩য় দৃশ্য

[*মঞ্চ পূর্ববৎ। চিত্রকর একটি চিত্র রচনায় নিমগ্ন। জীবনলাল সন্তর্পণে ঢোকে। চিত্রকর দেখতে পায় না।*]

জীবনলাল।। (*চাপা গলায়*) চিত্রকর! (*চিত্রকর ঘুরে তাকায়*)

চিত্রকর।। কে? ওঃ, জীবনলাল।

জীবনলাল।। ভয় পেলে নাকি চিত্রকর? এতদিন জীবনলালই সবাইকে ভয় পেত। এখন দেখছি জীবনলালকেও কেউ কেউ ভয় পেতে শুরু করেছে। এই নাও, নির্দেশটি চটপট পড়ে আমায় ফেরৎ দাও।

চিত্রকর।। ওতে কি লেখা আছে আমি জানি।

জীবনলাল।। কিছু নতুন কথা আছে, পড়ে দ্যাখো।

[*চিত্রকর পত্র নিয়ে পড়ে। মুখ চিন্তিত লাগে। জীবনলাল পত্রটি নিয়ে লুকিয়ে ফেলে অদ্ভুতভাবে।*]

জীবনলাল।। খুব তাড়াতাড়ি, চিত্রকর। যে গাছ উপড়ে ফেলবে তার শিকড় বেশি করে ছড়াতে দিওনা। এই নাও।

[*একটি ছুরি এগিয়ে দেয়।*]

চিত্রকর।। ওর কোন প্রয়োজন নেই জীবনলাল। আমার সঙ্গেই আছে। রাণী কেড়ে নেয়না। অস্ত্রটা আমার হাতেই থাকতে দিচ্ছে। ওদের বোলো, আমি ভুলিনি। তুমি যাও জীবনলাল। আমার কাছে তোমাকে দেখলে রাণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। তোমাকে বলে রাখি, রাণী তোমাকে সন্দেহ করে।

জীবনলাল।। চিত্রকর, সাজে আমি রাণীর ভাঁড়, ভাবে আমি আউল-বাউল, কিন্তু কাজের বেলায় শক্ত মানুষ। আমি রীতিমতো একজন প্রহরী বসিয়ে এখানে ঢুকেছি। দেখবে? (*জীবনলাল দরজায় একটি টোকা দেয়। চিত্রলেখা ঢোকে।*)

চিত্রলেখা।। কই, এখনো তোমার কথা হল না?

জীবনলাল।। এই আমাদের প্রহরী।

চিত্রলেখা।। (*জীবনলালের হাতে ছুরি দেখে*) ওকি, তোমার হাতে অস্ত্র যে?

জীবনলাল।। ছুরিটা সিঁদুর মাখতে চায় চিত্রলেখা। আকাশটাও সিঁদুর মেখেছে। কনে

বধূ ঘরে তোলার লগন এল। ওদের ভয় দেখানো যন্ত্রটা আর ভেল্কি দেখাতে পারবেনা। ওদের সব ফাঁস হয়ে গেছে। এবার আমরা বাতাস কাঁপিয়ে এগুচ্ছি চিত্রলেখা। এই দুর্গটা আমাদের ভয়ে কাঁপছে। শীগগরিই ফেটে ফুটে ভেঙে পড়বে। চল বেরিয়ে পড়ি।

চিত্রলেখা।। তোমার মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে, তুমি যখন আড়ালে আমার সঙ্গে কথা বল আমার ভয় করে। কোত্থেকে যেন আগুন এসে তোমরা চোখের কোণে লাফিয়ে ওঠে। একা একা তুমি কোথায় যাও—দূর থেকে আমার ভয় করে।

জীবনলাল।। কাছে এলেই তো ভয় ভাঙে। ঢোলকে আওয়াজ তুলব—তুমি চেঁচিয়ে বলবে—পুরবাসীগণ, সিঁদুরে মেঘ উঠেছে, বরণডালা সাজাও। চলি চিত্রলেখা। এবার দুর্গের বাইরে, আড়ালে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব। সজাগ থেক। (*জীবনলাল চলে যায়।*)

চিত্রলেখা।। শোন, শোন—বুঝলাম না কথাটা।

চিত্রকর।। তোমাকে নিয়ে যেতে একটা পাল্কি আসবে চিত্রলেখা। পাল্কি চিরকাল আসে। কিন্তু অনেক সময় শূন্যও ফিরে যায়। আমার ভয় করে।

চিত্রলেখা।। তোমাদের কথা আমাকে যেন কোথায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। তুমি বোঝ কোথায়?

চিত্রকর।। হয়তো বুঝিনা। বুঝলে আমার অস্ত্রটাও কিছু একটু করত। পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে দিনরাত হাঁপাতো না।

চিত্রলেখা।। তোমার কাছেও অস্ত্র রয়েছে? কি চাও তোমরা?

চিত্রকর।। আমাকে এত শক্ত প্রশ্ন কোরোনা চিত্রলেখা। তুমি যাও, তুমি যাও চিত্রলেখা।

চিত্রলেখা।। আমি কি করব? আমার তো পথ চেনা নেই? তুমি জান চিত্রকর, জীবনলাল আমাকে কোথায় ডাকছে?

চিত্রকর।। হয়তো পথ চেনাতেই ও তোমাকে ডাকছে। চিত্রলেখা, তুমি হয়তো অন্তত একটা পথ পাবে, আমি পথ থেকে সরে সরে যাচ্ছি। আমি নিজেকেই বুঝিনা। আমার বিচার হয়তো ভয়ংকর। ...তুমি যাও চিত্রলেখা, রাণী আসছে। তুমি যাও।

[*বাইরে কোলাহল কখনো তীব্র, মৃদু। চিত্রলেখা দ্রুত চলে যায়। চিত্রকর ছবিটায় অন্যমনস্ক রঙ লাগায়, বিমর্ষ তাকিয়ে থাকে। তারপর ধাক্কা দিয়ে ইজেল থেকে ক্যানভাসটা ফেলে দেয়। রাণী ঢোকে। হাতে একটা রিভলবার। চিত্রকরের দিকে লক্ষ্য। চিত্রকর তাকিয়ে ভয়ে চমকে ওঠে।*]

চিত্রকর।। ওকি?

রাণী।। একটা অস্ত্র। আমাকে যে কোন একটা লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। তাকিয়ে দেখ, আমার ললাটে তোমার সেই প্রিয় স্বেদবিন্দু। যখন এই স্বেদবিন্দু জেগে ওঠে আমাকে একটা লক্ষ্য বেছে নিতে হয়। লক্ষ্য বিদ্ধ হলেই আমার জয়, নিশানা ভ্রষ্ট হলেই মৃত্যু।

চিত্রকর।। আমিই কি রাণীর লক্ষ্যবিন্দু?

রাণী।। জানিনা, সাক্ষীও হতে পার। আমার আর একবার বেঁচে ওঠা কিংবা মৃত্যুর সাক্ষী। বাইরে কোলাহল শুনতে পাচ্ছ?

চিত্রকর।। পাচ্ছি।

রাণী॥কাদের কোলাহল?

চিত্রকর॥ জনতার।

রাণী॥ বলতে পার আমাদের আশ্চর্য পরাজয়ের। আমাদের শেষ মুহূর্ত পৌঁছে গেছে! তাই এখন আমাকে লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। ছবিটা ছিঁড়ে ফেললে যে?

চিত্রকর॥ আমি স্থৈর্য খুঁজে পাচ্ছি না। আমার আঙুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয় ; আমার রক্তের নিচের শিকড় ঘুণপোকায় অস্থির কামড়ে কাটছে। রক্তক্ষরণের ব্যাধি আমাকে নিদ্রায়-জাগরণে ভয় দেখায়।

রাণী॥ নিরাময় চাও?

চিত্রকর॥ ব্যাধির নিরাময় কে না চায়?

রাণী॥ আমার ললাটে স্বেদবিন্দু মুছে দিতে পারবে? ঐ স্বেদকণার স্পর্শে তোমার মুক্তি।

চিত্রকর॥ তারপর!

রাণী॥ তারপর এই দুর্গ ছেড়ে আমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাব। সঙ্গে থাকবে তুমি। তুমি হবে রাজচিত্রকর। রাণী যখনই ভ্রমণে আসে সে তার মুখমণ্ডল মুছে নেবার জন্য রেশমী বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজন বোধ করে। তুমি রেশম সুতোর বস্ত্রখণ্ডের মত আমার ললাটের স্বেদ শুষে নেবে। তুমি আমাকে আরাম দিতে পার। এই তোমার উপহার।

চিত্রকর॥ কিন্তু এতে কি আমার উদ্ধার আছে? সম্পূর্ণ উদ্ধার?

রাণী॥ উদ্ধার? (*হেসে ওঠে*) বিলাসই উদ্ধার, বিশ্রামই উদ্ধার, ভিতরের রক্তের তরঙ্গ আরও রক্তিম করে তুললেই উদ্ধার। তুমি এই আনন্দ চাও না?

[*বাইরে কোলাহল তীব্র হয়ে ওঠে, কোলাহল বিশৃঙ্খল শব্দে আরও অস্থির হয়ে ওঠে। রাণীর মুখে চিন্তার রেখা ফোটে। চিত্রকর গবাক্ষের দিকে যেতে চায়।*]

রাণী॥ গবাক্ষের দিকে যাবে না।

[*চিত্রকর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে*]

রাণী॥ আমার কাছে এসে দাঁড়াও, আমার মুখের দিকে স্থির তাকাও। দৃষ্টিকে এত ঘন করে তোল যাতে বাইরের সব কোলাহল মুছে যায়। শুধু একটি কোলাহল। রক্তের, সুখের, ঐশ্বর্য্যের। ওরা কি চায়, জান?

চিত্রকর॥ না।

রাণী॥ ওরা তোমাকে চায়। তুমি মূল্যবান বলে তোমাকে চায় না। তুমি আমাদের হয়ে যাচ্ছ বলে তোমাকে চায়। সমস্ত পৃথিবীতে সবাই কেবল নিজেদের লোক হারাবার ভয়ে অস্থির। তোমাকে আমি মূল্যবান করে দিয়েছি, তোমার মাথায় একটা দামী মুকুট পরিয়ে দিয়েছি—কৃতঘ্ন হ'য়ো না। আরো কাছে এসো, তাকাও আমার দিকে।

চিত্রকর॥ কিন্তু ওদের কোলাহল কেবল আমাকে নিয়ে নয়, ওর অনেক অর্থ। দুর্গের সিংহাসনের বহুদিনের পাপ ওদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

রাণী॥ তোমার রক্ত এখনও ওদের শিরা থেকে বইছে। আমাকে নতুন শিরা-উপশিরায় নতুন করে সাজতে হবে। তুমি ওদেরই নির্দেশে আমাকে মারতে এসেছিলে, তাই না?

চিত্রকর।। হ্যাঁ।

রাণী।। নিজের নির্দেশে মারতে আসনি কেন?

চিত্রকর।। আমরা সবাই এক নির্দেশে মিলেছিলাম।

রাণী।। তাহলে তোমার দ্বিধা কেন? কেন তুমি আমাকে হত্যা করোনি?

চিত্রকর।। আমাকে প্রশ্ন করবেন না। (*কিছু সময় স্থির থেকে*) রাণী, আমি যখন প্রথম ঢুকি, আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল, শরীর যন্ত্রণায় প্রায় অবশ। কিন্তু তার জন্যেই আমি ক্লান্ত ছিলাম না, আমার চুপ করে থাকার পিছনে একটা ভয়ঙ্কর ভয় ছিল। আমার স্পন্দন এত সশব্দ ছিল যে, আমি আপনার সব কথা পর্যন্ত শুনতে পাইনি।...আমি বাইরের অন্ধকার থেকে আসিনি, আমার ভিতরের অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসেছি। আমার হাতের ছুরিটা হয়তো নিজের লোভের বুকে সবেগে বসিয়ে দেবার জন্যেই এসেছিলাম। আমি রাণীর রহস্যময় মুখের দিকে ধাবিত হয়েছিলাম—আমার লুব্ধতা বুঝে কে যেন আমাকে একটা রঙের বাটিতে ডুবে গিয়ে শ্বাসকষ্টে মরতে বলছিল।

রাণী।। ঠিক। তুমি তোমার অভীষ্টে পৌঁছে গেছ। রাণী তোমার কাছে। রাণী তোমাকে উপহার দিতে ইচ্ছুক। রঙের বাটি জোয়ার তুলে এল, তোমার পাল ওড়ানো নৌকো কোথায়? সব নিয়ে সুখের মরণে ডুববে এস।

চিত্রকর।। কিন্তু আমি এখনো যে দু-জন। আমার দুটো ভাগ জুড়ে নেই—আমি দু-খণ্ড, দুখণ্ড। আমার একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে বাকিটা ঐ জনসমুদ্রে ছুঁড়ে দিন।

রাণী।। ওরা ঐ খণ্ড মাংসের টুকরো নিয়ে কি করবে?

চিত্রকর।। যা খুশি। ছিঁড়ুক, রাখুক—ওদের পাওনা ওরা নিয়ে নিক, আমি ফাঁকি দেব কেমন করে?

রাণী।। কিন্তু আমি অর্ধেক নিই না, পুরো চাই। আমি তোমাকে পুরো করতে চাই।

চিত্রকর।। এখন আমি যে কোনো ভাবে পুরো হলেই বাঁচি। যে আমাকে পুরো করে দেবে, আমি তার।

রাণী।। যে তোমার কাছে আছে সে-ই তো প্রথম সুযোগ পাবে। অর্থাৎ রাণী প্রথম পরীক্ষার সুবিধে পেল। আমি তোমার দু-খণ্ড জুড়ে দেব। রাণী জিততে চায়।

চিত্রকর।। তাহলে কি রাণী জেতার পরীক্ষায় আমায় চাইছে?

রাণী।। প্রথমে বিজয়, তারপর সিদ্ধান্ত। রাণী যা জিতে পায়, তা রাণী ছাড়ে না।

[*নেপথ্যে বিউগলের শব্দ*]

বোধহয় দুর্গশাসক, তুমি পাশের কক্ষে যাও।

[*চিত্রকর চলে যায়। দুর্গশাসক ঢোকে। ব্যস্ত, বিব্রত।*]

রাণী।। মনে হচ্ছে একটা দুঃসময় চলছে।

দুর্গশাসক।। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ হবে, ভাবিনি।

রাণী।। শুধু পরিকল্পনাই নয়, তোমরাই ব্যর্থ। ব্যর্থ, অথচ মিথ্যে দম্ভে হাস্যকর।

দুর্গশাসক।। ব্যর্থতা শাসন যন্ত্রে অভিনব নয়। তবে তা স্থায়ী হলেই দুঃসময়। এটা সাময়িক এবং আঞ্চলিক। রাণীর দুর্গের সাময়িক পতন, তারে সম্পূর্ণ রাজ্যের পতনকে বোঝায় না।

রাণী॥ তবে এটা একটা সামগ্রিক পতনের ইঙ্গিত সন্দেহ নেই।

দুর্গশাসক॥ আমরা ও ভাবে ভাবতে চাই না।

রাণী॥ এভাবে ভাবতে না চাইলে ধূর্ত শক্তির দরকার।

দুর্গশাসক॥ আমরা শক্তি সংগ্রহ করব।

রাণী॥ ভিখারির কণ্ঠস্বর শুনছি। বাইরের ওদের গর্জন আরও কতো বলিষ্ঠ। আমাদের ওরা বুদ্ধিতে হারিয়েছে। কৌশল ফাঁস করে নিজেদের আরো কৌশলী প্রমাণ করেছে। এখন ওরা কি চায়?

দুর্গশাসক॥ দুর্গটা ওরা ঘিরে ফেলেছে।

রাণী॥ তোমার সৈন্য-বাহিনী?

দুর্গশাসক॥ সৈন্যের থেকে ওদের জনতার সংখ্যা এখন ঢের বেশি।

রাণী॥ কিন্তু শক্তি কি ওদের বেশি?

দুর্গশাসক॥ আমার নিজের শক্তিতে যথেষ্ট আস্থা রয়েছে, সৈন্যদলের মনোবল তেমন নেই।

রাণী॥ চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার! ধন্য তোমার আস্ফালন!

দুর্গশাসক॥ রাণীর অপবাদ আপাতত গ্রহণ করতে আমি বাধ্য। কিন্তু তর্কের চেয়ে কর্তব্য এখন বড়। ... রাণীকে অতি দ্রুত এই দুর্গ ত্যাগ করতে হবে।

রাণী॥ অসম্ভব! অপমান নিয়ে আমি ফিরি না। আমার মণিহারের এই সুবর্ণ-শঙ্খটির ভিতর বিষ রয়েছে, পান করলে অন্তত দম্ভ বাঁচে। শৃগালের জীবন চাও? অরণ্যে পালিয়ে বাঁচো।

দুর্গশাসক॥ কিন্তু রাণীর ব্যক্তিগত দম্ভের থেকেও আমাদের সিংহাসন অধিক মূল্যবান। যতদিন সিংহাসন বাঁচে, ততদিন আধিপত্যের সুযোগও বাঁচে। রাণী সিংহাসনকে দুর্বল করার অধিকার রাখেন না। রাণীর মৃত্যুবাসনাও একটা উৎকট ব্যাধি।

রাণী॥ ভয় হয় সিংহাসনটাও ব্যাধির কবলে পড়েছে কি না। পরীক্ষা করে দেখেছো? রাজবদ্যি ডাকো; সিংহাসনের গজদন্ত, মণি, মুক্তো, স্বর্ণখণ্ড সবকিছু পরীক্ষিত হোক—তারপর ব্যাধির অনুসন্ধান কোরো।

দুর্গশাসক॥ আপাতত সময় আমাদের হাতে নিতান্ত কম। আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সিংহাসনটা নির্বিঘ্নে নিয়ে যাওয়াই আশু কর্তব্য। দ্বিতীয়ত সিংহাসনের চিকিৎসা।

রাণী॥ অর্থাৎ, প্রথম পলায়ন, দ্বিতীয়ত অপমান নিরাময়ের চেষ্টা।

দুর্গশাসক॥ এই দুর্গ থেকে রাণীকে নিরাপদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আমি করেছি। বৈজ্ঞানিক এবং বার্তা-অধিকর্তা জনতার হাতে অবরুদ্ধ। ওদের ফেলেই আমাদের যেতে হবে। এ ব্যবস্থা কি নির্দয়?

রাণী॥ প্রয়োজন নির্দয়তা বোঝেনা।

দুর্গশাসক॥ রাণীর সঙ্গে একমত হয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি। তাহলে বাকি ব্যবস্থা আমি সম্পূর্ণ করছি।

রাণী॥ কিন্তু ফিরতে হবে পরাজিতের মতো?

দুর্গশাসক।। অনুমতি নিয়ে রাণীর সমালোচনার অধিকার চাইছি। যদিও প্রসঙ্গটি ভিন্ন।

রাণী।। বল।

দুর্গশাসক।। রাণী সম্ভবত সবসময়েই লোক চিনতে পারেন না—জীবনলাল এবং চিত্রলেখা তার প্রমাণ।

রাণী।। চিত্রলেখা? জীবনলালকে আমি টের পেয়েছিলাম। কিন্তু চিত্রলেখা—? ওকি দুর্গে নেই?

দুর্গশাসক।। চিত্রলেখা কৌশলে দুর্গ ত্যাগ করেছে।

রাণী।। কৌশলে? বল, তোমাদের অকৌশলের সুযোগে।

দুর্গশাসক।। চিত্রলেখাকে আমরা সন্দেহ্ করিনি। সম্ভব ছিল না।

রাণী।। চিত্রলেখা চলে গেল! দুর্গশাসক, এটা সব থেকে দুঃসংবাদ। তোমার সিংহাসনের চিকিৎসায় এই অভিজ্ঞতাটি মনে রেখো। জনতার রক্ত যার শিরায়, সে জনতার রক্তেই বাঁচে। খাঁচার পাখিগুলোর সোনার আপেলে অরুচি হচ্ছে, বনের পোকায় কাটা নষ্ট ফলের লোভে উড়ছে।

দুর্গশাসক।। মানুষ দুর্ভোগ ভালবেসে কি করে মূর্খ হয় এ তারও দৃষ্টান্ত।

রাণী।। খাঁচায় আর একটি পাখি আছে। আপাতত শেষ পাখি।

দুর্গশাসক।। এই শেষ সময়, সোনার আপেলের পরিবর্তে হয়তো বিষফলই ওর যোগ্য আহার। রাণী, আর ভুল নয়!

রাণী।। না। ওকে আমি সরিয়ে দিতে চাইনা।

দুর্গশাসক।। রাণী অহেতুক দয়াবতী। অতি দ্রুত আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রাণী।। আমি অন্তত একবার জিততে চাই। নিজের রাজ্যে অন্তত একটি বিজয় সংবাদ নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সোনার খাঁচার পাখিটা আমার রাজদরবারে দুলতে থাকবে।

দুর্গশাসক।। রাণী আবার খাঁচায় ভুল পাখি পুষছেন।

রাণী।। তাহলে ওকে উড়িয়ে দাও, বনে ফিরে যাক।

দুর্গশাসক।। অসম্ভব। ওর বিনাশই ওর শেষ উড়ে যাওয়া।

রাণী।। তাতে তোমার জনতা আরো অশান্ত হবে। বার্তা-অধিকর্তা আর বৈজ্ঞানিকও একই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে। ওকে আমাদের করে নাও, জনতা তার একজন প্রতিনিধির পরাজয় দেখুক।

দুর্গশাসক।। কিন্তু চিত্রকর আমাদের শত্রু। দুর্গে থেকেও সে শত্রুদের গোপন তথ্য বাইরে ফাঁস করেছে।

রাণী।। সে ভার আমার। আমার এটিই দুর্গের শেষ খেলা।

দুর্গশাসক।। কিন্তু সময় যে আর নেই। খেলা বড় সময় কাড়ে।

রাণী।। আমার খেলার সময়ও খুব কম। আশ্চর্য! আমিও কি ক্লান্ত বোধ করছি? আমার সেই মাতাল ঝড়টা কোথায় যায়?

দুর্গশাসক।। রাণী তাহলে প্রস্তুত থাকবেন। অতি সত্বর আমি ফিরছি। রক্ষীর বন্দোবস্ত সঠিক হলেই গুপ্ত পথ দিয়ে আমরা চলে যাব, রাণী। এ আমার অনুরোধ।

রাণী॥ ঠিক আছে তুমি যাও। সব অনুরোধই আমার বিবেচ্য।

[দুর্গশাসক চলে যায়। রাণী পাশের কক্ষের কাছে আসে। কোলাহল তীব্র ভাবে ভেসে আসে। রাণী ক্লান্তি সরিয়ে নিজেকে প্রখর করে তোলে।]

রাণী॥ চিত্রকর, চিত্রকর!

[চিত্রকর আসে।]

চিত্রকর॥ রাণীকে হঠাৎ যেন অবসন্ন দেখাচ্ছে? মুখের লাল আভাটা যেন জোর করে খুঁচিয়ে তোলা একটা ক্লান্ত আগুন।

রাণী॥ মুখের আভা মুখেই যেমন খুশি থাক। তুমি এতকাল আলেখ্য নির্মাণ করেছ। তোমাকে আজ অন্য কাজ দেব।

চিত্রকর॥ কি কাজ?

রাণী॥ বাইরের কোলাহল শুনছ? রাজ্যে যখন এ'রকম কোলাহল হয়, আমি রাজ সঙ্গীতজ্ঞকে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আদেশ করি। আমার উত্তেজিত স্নায়ু বিশ্রাম পায়। এখানে রাজসঙ্গীতজ্ঞ আসেনি, তুমি আমাকে কাব্য পড়ে শোনাবে। গ্রন্থখানা তুলে নাও—নিশ্চয়ই অচেনা গ্রন্থ নয়—ওর যে অংশ তোমাকে কণ্ঠস্থ করতে বলেছিলাম—সে অংশটি আমরা অভিনয় করব।

চিত্রকর॥ অভিনয়!

রাণী॥ অভিনয় না বলে যদি হৃদয়ের নতুন মুক্তি ভাব, আমি সুখীই হব। তোমার কণ্ঠস্বর সুখকর। আমাকে সুখী কর। ঐ গ্রন্থখানা তুলে নাও। (*চিত্রকর বই খোলে।*) যেখানে গৌতমের অবর্তমানে ইন্দ্র গৌতম সেজে আশ্রমে উপস্থিত, সে জায়গাটা পড়বে। অহল্যার উক্তি আমার মনে আছে। ওটা আমিই বলব। কল্পনা কর, দুর্গের দেওয়ালের রাজা গৌতম অবর্তমান, ঐ রাজার মূর্তি ধরে যেন তুমি এসেছ—ছদ্মবেশী ইন্দ্র। আমি অহল্যা। এ অহল্যা নতুন। আমার আদেশে রাজকবির রচিত। অভিনয় শুরু হোক। সূচনা অংশ পড়, তারপর তোমার প্রথম উক্তি।

চিত্রকর॥ এটা কি রাণীর আদেশ না অনুরোধ?

রাণী॥ ভাব, অনুরোধ—হ্যাঁ অনুরোধ, অনুরোধ!

চিত্রকর॥ রাণীর অনুরোধ অভিনব।

রাণী॥ রাণী চিরকাল অভিনব। চিত্রকর, আমার সময় বড় কম, আমার অনুরোধ রাখ। (*চিত্রকর পড়ে*)

চিত্রকর॥ আশ্রম গৃহপ্রান্তে গৌতম-বেশী ইন্দ্র কমণ্ডলু হাতে উপস্থিত। স্নান অসম্পূর্ণ রেখেই নদীতীর থেকে হঠাৎ ফিরেছে। বিপর্যস্ত কণ্ঠে বলে অহল্যা, অহল্যা!

রাণী॥ তপোধন! একি স্নান অসমাপ্ত কেন?
পথে কোন অমঙ্গল? অশুভ সংকেত?
ঋষিবর, স্নান অসম্পূর্ণ রেখে ফেরোনি কখনো,
কেন মুখ আরক্তিম, দেহ অসহিষ্ণু, রূঢ়?
কেন ক্লিষ্ট লাগে ধ্যানস্নিগ্ধ মহৎ নয়ন?

চিত্রকর॥ ক্লিষ্ট সুনিশ্চিত। অশুভ সঙ্কেতও আছে

তবে তা নিজের রক্তে—আকস্মিক জলস্তম্ভ
নড়ে ওঠে বুকের ভিতর, দেহে যেন দন্ত রাখে
দুরন্ত মর্কট। অহল্যা, আমার রক্ত শুদ্ধ নয়—
বড় বেশী ক্ষুধাতুর। স্নানে শান্ত হয় আপামর প্রাণী
আমি ফিরে আসি গৃহে; মনে হয় অহল্যা দামিনী
অধিক প্রশান্তি জানে। অহল্যার রম্যদেহ
তরঙ্গিত সাগর আমার। আলিঙ্গনে পিষ্ট ফুল
ভেসে যাক্ উম্মাদ ফেনায়। অহল্যা, মিনতি—
আমাকে শয়ন দাও, রমণীর উদ্‌ভ্রান্ত শয়ন।

রাণী॥ অকস্মাৎ, কেমন বাসনা নিয়ে এলে ঋষিবর?
আমি কি ফিরাতে পারি, তপোধন প্রার্থনা তোমার?
এই দেহ যদি পুষ্পসার, তোমার উম্মদ স্পর্শে
জন্মে পরিমল। তব আলিঙ্গনে রক্ত-মেঘ উৎপন্ন আকাশে,
নক্ষত্র বিচূর্ণ হয় আনন্দিত স্পর্শের প্রহারে!
যদি সরোবর ভেবে স্নান অসমাপ্ত রেখে এসে থাকো
তরঙ্গ ঢালিয়া দিব তরঙ্গের 'পরে। সেই স্নান হোক্—
দুই হাতে স্পর্শ কর কল্লোলিত জল।

[রাণী চিত্রকরের হাত বিলাসিনীর ভঙ্গিতে গিয়ে স্পর্শ করে, চিত্রকর শরীরে চমকে ওঠে। রাণী মদির পদক্ষেপে চিত্রকরকে আকর্ষণ করে আনে। নিজে বসে, চিত্রকর বেশ কাছাকাছি দাঁড়ায়। চিত্রকরের মধ্যে অস্বস্তি।]

রাণী॥ চিত্রকর, এত অস্বস্তি কেন? গৌতমের ছদ্মবেশটা কি অস্বস্তিকর? ছদ্মবেশ খুলে ইন্দ্রের প্রবল ক্ষুধা নিয়ে এলেও এ অহল্যা বিরূপ হবে না। আমি এই নতুন অহল্যার ভূমিকা বলছি, নিজের অংশে সতর্ক থেকো। যথাস্থানে কাব্যসম্মত যথাবিধি আচরণ অনুসরণ করবে।

[চিত্রকর কাব্যগ্রন্থের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

ঋষিবর, রমণীর দেহ প্রস্তুতে কি বেলা লাগে,
স্পর্শে দেহ গড়ে ওঠে, নড়ে ওঠে রক্তের কণিকা
(*কণ্ঠ তীব্র করে*) ঋষিবর, ঋষিত্ব হনন কর সোনার কুঠারে।

[চিত্রকর ধীরে রাণীর মুখ ধরে দুহাতে। হাত কাঁপে, মুখ বিপর্যস্ত।]

রাণী॥ (*চিত্রকরের কাঁধে দু-হাত জড়িয়ে দেয়*) তপোধন, তুমি কি প্রকৃত ঋষি গৌতম সাধক?

চিত্রকর॥ (*ছিটকে সরে গিয়ে*) আমি ইন্দ্র। বিকট ক্ষুধায়, হিংসায়, জ্বালায় ছদ্মবেশ সু-সহ লেগেছে। আমি চাই, আমি চাই।

রাণী॥ যদি চাই, ছিটকে অত দূরে কেন? গ্রন্থের নির্দেশ অনুসরণ কর।

[খুব মৃদুভাবে চিত্রকর কাছে আসে। দু-হাতে রাণীর মুখ ধরে।

রাণী ওর কাঁধ মালার মত জড়িয়ে ধরে।]

রাণী।। তুমি ইন্দ্র জেনেছি অনেক আগে,—রমণী অনেক চায়। ব্যভিচার, বলশালী হলে রমণীর রক্তে লাল বাড়ে। আরো সঙ্গোপন কিছু জ্ঞান আছে, শোন—

[রাণী নিজের মাথা ঘনিষ্ঠভাবে চিত্রকরের বুকে রাখে। চিত্রকর নিজেকে ছিন্ন করে। দেয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাতে থাকে। রাণী রহস্যময় হাসে।]

রাণী।। চিত্রকর, আমি এই দুর্গ ছেড়ে এক্ষুণি চলে যাব। তুমি যাবে তো? কথা বল। দ্যাখো। আমার ললাটের স্বেদ এখনো রয়েছে, যদি মুছে দিতে চাও, অমন পালাও কেন? তোমার দু-খণ্ড দেহ জুড়ে নেবে না? আমার কাছে সোনার সুগন্ধ সুতো আছে, কাছে এস—তোমার দু-টুকরো শরীর আমি সুন্দর মসৃণ জুড়ে দেব। আসবে?

চিত্রকর।। অসম্ভব। আমি যে গবাক্ষ দিয়ে এসেছি, সেই গবাক্ষ দিয়ে চলে যাব।

রাণী।। কোথায়?

চিত্রকর।। যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে। আপাতত এক অস্পষ্টতায়, হয়তো বা নিষ্ঠুর কোনও স্পষ্টতায়।

রাণী।। (*ক্ষুব্ধ মুখে*) অর্থাৎ সেই জনতার কাছে? তুমি আমাকে শেষ অপমান করতে চাও! আমার সোনার খাঁচাটা শূন্য রেখে আমি কেমন ক'রে ফিরব?

চিত্রকর।। জনতাও আমাকে নেবে না। আমি চতুর্দিকে পাপ করেছি। ওরা আমাকে পাঠিয়েছে। ওদের কাছে আমার বিচার বাকি। আর যতক্ষণ রাণীর মুখ আমার মধ্যে রাণীর সিংহাসনের মত ভেঙে ভেঙে না পড়ে, আমার বিচার শেষ হবে না। আমি যাব।

রাণী।। এই মুহূর্তে আমার মুঠো বড় অসতর্ক, হয়তো বা অন্যমনস্ক। কিন্তু—(*রাণী অদ্ভুত হেসে ওঠে। বাইরে তীব্র কোলাহল। গবাক্ষ দিয়ে চিত্রকর অতি মন্থর চলে যায়।*)

রাণী।। (*অসহিষ্ণু*) চিত্রকর! (*ক্লান্ত গলায়*) জনতার রক্ত জনতার কাছেই ফেরে চিত্রলেখা। কোথায় চিত্রলেখা? কে আছ? আমার সোনার খাঁচাটা নিয়ে এস, আমি দেখি। আমার সোনার খাঁচা।

[দুর্গশাসক ঢোকে। সুন্দর সেজেছে। হাতে একটা প্রস্ফুটিত গোলাপ।]

রাণী।। একি? দুর্গশাসক যে উৎসবের সাজে? পরাজয়ের উৎসব?

দুর্গশাসক।। মিলনের উৎসব।

রাণী।। মিলন? জনতার সঙ্গে তোমার?

দুগশাসক।। রাণীর সঙ্গে আমার।

রাণী।। এই অসময়ে?

দুর্গ।। মিলনটা বহুকালের। আজ অনুষ্ঠান।

রাণী।। (*রাজার ছবি দেখিয়ে*) কিন্তু ঐ ছবিটা কি একে অবৈধ বলবে না?

দুর্গশাসক।। সিংহাসনের সঙ্গে শাসকের মিলনই সত্য—আমাকে বাদ দিয়ে সিংহাসনটা খেলনা মাত্র। রাণীর বিলাস আর মোহ দুর্গশাসকের সঙ্গে বহুকালের অবৈধ সম্পর্কে বাঁধা।—রাজা মাঝপথের একটা ভুল নীতি। আমি যদি ভুল করি আমিও ছবি হব।

রাণী।। কিন্তু রাজা আমাদের দলত্যাগ করেনি।

দুর্গশাসক।। নীতির ভুলই দলত্যাগ। কিন্তু রাণী ওসব কথা থাক। আজ আমার কাছে এসো, আজ আমাদের মিলন, বাইরে অশ্ব অপেক্ষা করছে। আজ আমাদের মধুযামিনী। (*দুজনে দুজনকে ধরে উদ্‌ভ্রান্ত হাসে*)

রাণী।। দুর্গশাসক, আমার খাঁচাটার শেষ পাখিটাও ছেড়ে দিলুম। ছেড়ে না দিলে কূটনীতিতে আবার ভুল হত। শেষ মুহূর্তেও বুদ্ধি বিসর্জন দিচ্ছি না। ও কি! আমার হাতের অদৃশ্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছ মনে হচ্ছে, পাখী হতে চাও নাকি? তুমি অন্তত একদিক থেকে ভাল।—রক্তে তোমার পালিয়ে যাওয়ার উল্টো স্রোত নেই। (*আদরের গলায়*) আমার পোষা পাখি, আমার বাধ্য পাখি। ...একি, দুর্গের আলো, আলো নিভে যাচ্ছে—

দুর্গশাসক।। রাণী এই মুহূর্তে দুর্গ ত্যাগ না করলে সর্বনাশ। জনতা দুর্গটা ঘিরে ফেলেছে।

রাণী।। কিন্তু এভাবে কতগুলো দুর্গ থেকে পালাব দুর্গশাসক?

দুর্গশাসক।। আমি ধৈর্য ভুলে যেতে চাই না—এই পথে রাণী, পরিখার গোপন পথে।

রাণী।। হাত ধর, বড় অন্ধকার—এই অন্ধকারেই আমাদের মধুযামিনী—

দুর্গ।। মধুযামিনী—

[*দুজনে উদ্‌ভ্রান্ত হাসতে হাসতে চলে যায়। বাইরের কোলাহল তীব্র হতে হতে এগিয়ে আসে। দূরের মশালের আলোয় দুর্গটা লাল হতে হতে কাঁপতে থাকে। জীবনলাল আর চিত্রলেখা দৌড়ে আসে। চিত্রলেখা দরজার গোড়ায় দাঁড়ায়। জীবনলাল মঞ্চে ঢুকে প্রচণ্ড জোরে ঢোলক বাজায়। মুখ উদ্দীপ্ত।*]

জীবনলাল।। পুরবাসীগণ। ...সিঁদুরে মেঘ দেখে কালাপাহাড় দুর্গটা বড় ভয় পেয়েছে গো। সোনার বরণ ফুলবাগানটা আকাশে যেন লাফিয়ে উঠে নীল নক্ষত্রে জ্বলছে। সিঁদুরে মেঘে ফুল ফুটেছে—বরণডালা সাজাও—

[*জীবনলালেব ঢোলকের শব্দে স্বর মেলায় আরও ঢোলের শব্দ। দ্রুত ঢোলকের শব্দের মধ্যে পর্দা নেমে আসে।*]

যবনিকা

নিষাদ

চরিত্র লিপি

দিবাকর
প্রথম সাংবাদিক
দ্বিতীয় সাংবাদিক
প্রৌঢ়
বেলুনওয়ালা
প্রথম তরুণ
দ্বিতীয় তরুণ
তৃতীয় তরুণ
ম্যাজিসিয়ান
প্রভু, লতা

প্রথম অঙ্ক

[পার্কের একটা বেঞ্চিতে দিবাকর শুয়ে আছে। বুকের উপর খবরের কাগজ। দুজন সাংবাদিক ক্যামেরা কাঁধে প্রায় ছুটে আসে। দিবাকরের কাছে গিয়ে নানাভাবে লক্ষ করে।]

প্রথম।। দেখলে তো, খবরটা মিথ্যে নয়। (*ঘড়িটা দেখে*) মরবে বলেছে, মরেছে। তাছাড়া সময়রক্ষার ব্যাপারে ভেরি পাংচুয়াল—বেঁচে থাকলে লাইফে উন্নতি করত। (*শয়ান লোকটির উদ্দেশে*) ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ! (*ছবি তোলে*) কই, ছবি নাও!

দ্বিতীয়।। মরেছে কি করে বুঝলে?

প্রথম।। মরেনি কি করে বুঝলে?

দ্বিতীয়।। রীতিমতো নিঃশ্বাস পড়ছে।

প্রথম।। আজকাল মরা মানুষের নিঃশ্বাস ফেলার ক্ষমতা বাড়ছে। চারদিকে যারা নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই কি সত্যি সত্যি বেঁচে আছে?

দ্বিতীয়।। কিন্তু কিভাবে মরল! দ্যাখোতো গলায় কোন ফাঁসের দাগ আছে কিনা? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের ক্যামেরায় অদ্ভুত সব ছবি ধরা পড়েছিল—পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের গলার ঠিক কাছটাতে অদৃশ্য ফাঁস ঝুলছে—অনেক অনেক। হয়তো ওর গলাটা তার কোন একটায় আটকে গেছে।

প্রথম।। তার মানে আত্মহত্যা।

দ্বিতীয়।। মোটেই না। ক্যামেরায় যারা ঐ ফাঁসগুলো ঝুলিয়ে দেয় তাদের ছবিও ধরা আছে।

প্রথম।। চুপ কর।

দ্বিতীয়।। কেন চুপ করব?

প্রথম।। I say, shut up.

দ্বিতীয়।। কেন?

প্রথম।। কারণ ওর গলায় ফাঁসের দাগ নেই।

দ্বিতীয়।। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটায় দাগটা ধরা পড়তে পারে। ওটা বের কর।

প্রথম।। সঙ্গে নেই।

দ্বিতীয়।। কেন?

প্রথম।। সঙ্গে না থাকার নির্দেশ আছে। আমি নির্দেশ অমান্য করতে চাইনা। তোমারটা কোথায়?

দ্বিতীয়।। পিকপকেট হয়েছে!

প্রথম।। ভেরি গুড। ওর গলায় ফাঁসের দাগ নেই। ওর চোখ দুটো দ্যাখো—বুজে আছে। তার মানে তাকাতে ভয়। সোজা তাকাতে ভয়। পৃথিবীর মুখোমুখি তাকাতে স্নায়ুগুলোর ভীষণ ভয়—তার মানে স্নায়ুযুদ্ধে মারা গেছে।

দ্বিতীয়।। ওর পায়ের পাতা দুটো দ্যাখোতো—বিষাক্ত পেরেক ফুটে মারা যেতে পারে। যারা জোরে পা ফেলে এগুতে চায়, চারপাশটাকে ভালবাসতে চায় তাদের পায়ের তলায় আঁচমকা পেরেক ফুটছে। যিশুকে যে-কটা পেরেক দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে।

প্রথম।। অসম্ভব! সে সব পেরেক গুঁড়িয়ে বুলেটের মশলা তৈরী হচ্ছে। একটাও পড়ে নেই।

দ্বিতীয়।। বুকের উপর একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে—লোকটি খবরের কাগজ চাপা পড়ে মারা যায়নি তো?

প্রথম।। খবরের কাগজের ওজন কতোটা হবে?

দ্বিতীয়।। কাগজের থেকে খবরের ওজন কোটিগুণ ভারি।

প্রথম।। ঠিক বুকের উপর কাগজটা পড়ে আছে, তার মানে ওখানে একটা ভারি ওজনের খবর আছে। (*উঁকি মেরে দুজনে দেখতে থাকে*) ট্যাক্সি চাপা পড়ে মৃত্যু এরকম কি একটা লেখা আছে।

দ্বিতীয়।। কথাটা ট্যাক্সি না হয়ে 'ট্যাক্স চাপা পড়ে মৃত্যু'—তাও হতে পারে। তাছাড়া এ-দুয়ের মধ্যে খুব তফাৎও নেই।

প্রথম।। তার মানে মরাটা খুবই সহজ ব্যাপার এবং সহজভাবেই মরেছে।

দ্বিতীয়।। কিন্তু ও বাঁচতে চেয়েছিল!

প্রথম।। বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না, বাঁচতে জানা চাই। মূর্খের কপালে মরণ খোদাই করা থাকে। বোকা লোকটা মরে বেঁচেছে।

দ্বিতীয়।। সেরকম বোকা ও নয়। ভুল করতে পারে, আবার সুযোগ পেলে ভুলটা শুধরে নিতেও জানে।

প্রথম।। ওকে আবার বেঁচে ওঠার সুযোগ দিলে ঠিক গুটিসুটি মরার দিকে এগিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়।। মরতে ও চাইবে না।

প্রথম।। ও মরবে—একটু একটু করে মরবে।

দ্বিতীয়।। ও বাঁচবে—একটু একটু করে বাঁচবে।

প্রথম।। ওকে বাঁচার সুযোগ দেওয়ার অর্থ মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি।

দ্বিতীয়।। ওকে বাঁচার সুযোগ দেওয়ার অর্থ বাঁচার উদ্যম!

প্রথম।। কে ঠিক ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পার।

প্রথম।। But he is dead, কি করে উত্তর দেবে।

দ্বিতীয়।। মৃত্যু উত্তর দেয়। মানে কথা না বলাই মৃত্যুর উত্তর। আর যদি কথা বলে, তাহলে ও বেঁচে আছে।

প্রথম।। কথা বললেই বাঁচার প্রমাণ নয়।

দ্বিতীয়।। কথার মতো কথা বললেই বাঁচার প্রমাণ হয়। এই যে শুনুন, আপনি কি আবার সুযোগ পেলে বাঁচার জন্য রুখে উঠতে পারবেন?

প্রথম।। No Reply.

দ্বিতীয়।। আপনি কি আবার সুযোগ পেলে বাঁচার জন্য রুখে উঠতে পারবেন?

[*দিবাকর ধড়মড়িয়ে উঠে ঘাড় তুলে তাকায়। চোখে বিস্ময়*]

দিবাকর।। কিছু বলছেন?

দ্বিতীয়।। আপনি কি বেঁচে উঠলেন, না মরেনইনি?

দিবাকর।। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

প্রথম।। কিন্তু আপনার যে মরার কথা ছিল!

দিবাকর।। মরার কথা ছিল মানে? কোন দুঃখে মরব?

দ্বিতীয়।। রাইট!

প্রথম।। দুঃখে নয়, যাস্ট মরা আর কি—এ রকমই তো খবর পাঠিয়েছিলেন।

দিবাকর।। খবর? আমি? কি দায় পড়েছে মশাই।

দ্বিতীয়।। আপনার নাম দিবাকর?

দিবাকর।। দিবাকর রায়।

প্রথম।। তবে তো আপনারই মরার কথা। আজ বারটা পঞ্চান্নতে আপনার মরার কথা ছিল। আর এই অ্যাটেম্পটা ফেইল করলে তার খানিক বাদেই মরবেন।

দিবাকর।। দয়া করে এখন বিদেয় হ'ন—মরলে আসবেন।

প্রথম।। যাক্! তাহলে মরছেন।

দ্বিতীয়।। মরতেই বা কেন যাবেন? বাঁচুন। শুনুন আপনাকে একটা গোপন কথা বলে যাচ্ছি। আপনি মরলে, তারপর বাঁচার চান্স পাবেন। এরকম বেঁচে ওঠার দুটো চান্স আপনি পাবেন। তৃতীয়বার মরলে—নিজের চেষ্টায় বাঁচলে বাঁচলেন—নয়ত মরেই গেলেন।

দিবাকর।। তাহলে একবারের জায়গায় তিনবার মরতে পারব বলছেন। ভাল। তবে এই সুযোগটা কে দিচ্ছেন?

দ্বিতীয়।। আপনি যে চান্স পাচ্ছেন, সে সুযোগ কেউ দিচ্ছে না—আপনি সুযোগ নিয়েই জন্মেছেন। তাছাড়া এটা আপনার ট্রাডিশনেও আছে।

দিবাকর।। আমার বাবাতো দেখলুম একবারই মরলেন—আবার ফিরবেন?

প্রথম।। আজ্ঞে না, ওটা নিশ্চিত ওঁর লাস্ট চান্স ছিল।

দিবাকর।। ও।

দ্বিতীয়।। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বারংবার মরেছেন এবং বেঁচেছেন। আপনার বাবা এখানে থাকলে 'ডিনাই' করতে পারতেন না।

প্রথম।। আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

দিবাকর।। বোঝাতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।

প্রথম।। কি বুঝলেন বলুনতো?

দিবাকর।। বুঝলাম, আমার ঘুম এখনো ভাঙেনি—আমি পার্কের বেঞ্চিতে এখনো প্রচণ্ড ঘুমোচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখছি।

দ্বিতীয়।। স্বপ্ন দেখছেন?

দিবাকর।। আলবৎ।

প্রথম।। প্রমাণ?

দিবাকর।। ঘুমের প্রমাণ না জাগলে দেওয়া যায়না।

প্রথম।। যদি আর না জাগেন?

দিবাকর।। তাহলে বুঝব মরে গেছি!

প্রথম।। আর এই দুই-এর মাঝামাঝি কিছু নেই? জেগে থাকা আর ঘুমের মাঝামাঝি?

দিবাকর।। মশাই জ্বালাবেন না তো—আমি জানি না।

প্রথম।। সেজন্যই জানছেন।

দিবাকর।। আচ্ছা ঝামেলা তো! আমার এসব জানার দরকার নেই!

প্রথম।। কিন্তু আপনি জানতে বাধ্য হবেন। একটু বাদেই যখন প্রথমবার মরবেন তখন বুঝবেন।

দ্বিতীয়।। অবশ্য চেষ্টা করলে মরার হাত থেকে বাঁচতেও পারেন।

প্রথম।। অসম্ভব, ওকে মরতেই হবে।

দ্বিতীয়।। কিন্তু সে মৃত্যুটাকে রুখবার চেষ্টা করতে পারে।

প্রথম।। হয় না, ওর থেকে মৃত্যুর শক্তি অনেক বেশি। মৃত্যু ওর পালাবার রাস্তা। ও পালাতে চায়।

[*দিবাকর বিরক্তিতে কান ঢেকে মাথা গুঁজে বসে থাকে*]

দ্বিতীয়।। তাই বলে পালাবে কেন, পালিয়ে যাওয়াটা কোন পথ নয়।

প্রথম।। পালাবে মানে, মেনে নেবে।

দ্বিতীয়।। মেনে নেয়াই তো মৃত্যু।

প্রথম।। এই মৃত্যু থেকে ওর উদ্ধার নেই।

দ্বিতীয়।। এটা নিশ্চয়ই নিয়তি নয়।

প্রথম।। লোকটি দুর্বল, তাই এটা ওর নিয়তি।

দ্বিতীয়।। আমাদের উচিত ওকে বাঁচতে সাহায্য করা।

প্রথম।। অসম্ভব।

দ্বিতীয়।। কেন?

প্রথম।। বাঁচতে হলে নিজের চেষ্টায় ওকে বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয়।। কিন্তু দু'বার ওকে আমরা বাঁচার সুযোগ দিচ্ছি।

প্রথম।। তৃতীয়বার ওকে নিজে নিজে বাঁচতে হবে—নাহলেই শেষ।

[*দিবাকর ক্ষিপ্তের মতো উঠে দাঁড়ায়*]

দিবাকর।। কি পেয়েছেন আপনারা—কান ঝালাপালা হয়ে গেল! আশ্চর্য! দুপুরের পার্কে দুজন বিধাতা পুরুষের ডিবেট! আমাকে ছেড়ে দিন—আমার যা হবার তা হবে। দয়া করে কেটে পড়ুন তো। দেশটাও হয়েছে তেমনি, অন্তত পাগলা গারদের গেটগুলো শক্ত করে বানানো উচিত। ঝামেলা—কোত্থেকে জ্বালাতে এলেন বলুন তো!

দ্বিতীয়।। আমরা সাংবাদিক।

দিবাকর।। সাংবাদিক?

দ্বিতীয়।। সংবাদ সংগ্রহ করি, জমাই এবং প্রকাশ করি।

প্রথম।। আমরা চলে যাচ্ছি।

দিবাকর।। শুনে ইচ্ছে করছে, আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি।

দ্বিতীয়।। আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

দিবাকর।। মনে আছে—আমি এক্ষুণি মরব।

দ্বিতীয়।। কিন্তু দু'বার বাঁচার সুযোগ দেওয়া হবে, তৃতীয়বার বাঁচার সুযোগ আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে।

প্রথম।। নতুবা শেষ মত্যু।

দিবাকর।। ধন্যবাদ।। আগে দু'বার তো মরি। আপনারা কেটে প'ড়ে আমাকে উদ্ধার করুন।

প্রথম।। কি নিরুদ্বেগে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে!

দিবাকর।। মৃত্যু না মশাই, হেসে খেলে বাঁচার জন্য অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে আজকে এই পার্কেই আমি কাউকে পেয়ে যাব। কিছু একটা পেয়ে যাব! তাকিয়েই বলে উঠব—ইউরেকা, ইউরেকা!

প্রথম।। তাহলেও যাবার আগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য—মৃত্যু আসছে।

প্রথম।। (*মঞ্চের সামনে এগিয়ে স্বগতোক্তির মত*) এই মৃত্যু আমাদের সকলের চেনা।

দ্বিতীয়।। (*মঞ্চের সামনে এগিয়ে স্বগতোক্তির মত*) উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই মৃত্যুর নাম ভ্রান্তি।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই মৃত্যুর নাম পতন, এই মৃত্যুর নাম পতন।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই মৃত্যুর নাম প্রলোভন, প্রলোভন, প্রলোভন।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব, সম্ভব।

প্রথম।। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, পতন থেকে পতন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়।। জাগরণ, জাগরণ, উদ্ধার।

[*দুজন মঞ্চের দুদিক দিয়ে শান্ত চলে যায়।*]

দিবাকর।। (*দূরে তাকিয়ে*) এই বেলুন, এই যে বেলুনওয়ালা! এদিকে, ইধার।

[*অনেক বেলুন নিয়ে লোকটি ঢোকে।*]

দিবাকর।। (*পকেট থেকে ব্যাগ বের করে*) দাঁড়াও, গুণে দেখি কত আছে।

বেলুনওয়ালা।। কটা দেব?

দিবাকর।। কত আছে দেখি। (গুণে) চোদ্দ টাকার বেলুন দাও।

বেলুনওয়ালা।। কি বললেন?

দিবাকর।। চোদ্দ টাকার বেলুন। (*লোকটা চলে যেতে থাকে*) কি হে হলটা কি? (*লোকটা দাঁড়াল*) দুজন বিধাতা পুরুষ পার্কে এসে বলে গেল, এক্ষুণি মরে যাব। ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি ঘটে, তার আগে পয়সাগুলো ফুরিয়ে রাখি—নয়ত চোরে এসে যে ঘাঁটাঘাটি করবে—সে এক ঝকমারি! ফোলাও, চোদ্দ টাকার বেলুন ফুলিয়ে যাও। চটপট ফোলাও, আমার হয়ে আসছে...চোদ্দ টাকার বেলুন ফোলাও।

[*লোকটি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৌড়ে পালায়।*]

দিবাকর।। (*চেঁচিয়ে*) ভয় পাবার কি হল, আমি তো এখনো মরিনি রে বাপু।

[*বেঞ্চিতে দিবাকর শুয়ে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাতা মাথায় চলে যেতে যেতে তাকায়।*]

দিবাকর।। আচ্ছা, ছাতা মাথায় দিয়েছেন কেন বলুনতো, বৃষ্টি পড়ছে, না রোদ?

ভদ্রলোক।। ইয়ার্কি হচ্ছে, ফচ্‌কে ছোকরা। (*একটু এগিয়ে*) বৃষ্টি আসছে।

দিবাকর।। আমারও মৃত্যু আসছে।

ভদ্রলোক।। জ্বর আসছে শুনেছি, মৃত্যু আসছে আবার কি কথা!

দিবাকর।। বিধাতাপুরুষ বলে গিয়েছেন, আমি মরব। আচ্ছা, আমি কি বেঁচে আছি?

ভদ্রলোক।। ফুঃ, আমি কি নিজেই বেঁচে আছি!

[*একটি মেয়ে ঢোকে। ব্যস্ত।*]

দিবাকর।। (*আপনমনে একটু চেঁচিয়ে*) ইউরেকা, ইউরেকা!

ভদ্রলোক।। এর নাম মৃত্যু! মোহন মৃত্যু! মরণবে তুহুঁ মম শ্যাম সমান। কেচ্ছা! ছোঃ!

[*চলে যায়। মেয়েটি কিছু খুঁজতে থাকে।*]

দিবাকর।। বৃষ্টি আসবে। (*মেয়েটি খুঁজতেই থাকে*) শুনছেন, বৃষ্টি আসবে।

মেয়েটি।। হুঁ।

দিবাকর।। ছাতা নেইতো সঙ্গে।

মেয়েটি।। (*খুঁজতে খুঁজতে না তাকিয়ে*) তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।

দিবাকর।। তাহলে এইবেলা চলে যান।

মেয়েটি।। আমি উপদেশ খুঁজছি না, অন্য কিছু খুঁজছি।

দিবাকর।। বিধাতাপুরুষ কি আপনাকে কিছু খুঁজতে বলে গেছে?

মেয়েটি।। (*বিরক্তভাবে তাকিয়ে*) কে?

দিবাকর।। বিধাতাপুরুষ—দুজন। সঙ্গে ক্যামেরা, আপনাকে কিছু দৈববানী করেছে?

মেয়েটি।। কী এলোমেলো বকছেন!

দিবাকর।। মরবার আগে মানুষ কত রকম বকে, আমি তো তবু কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি।

মেয়েটি।। (*সভয়*) মরবার আগে মানে!

দিবাকর।। সেরকমই তো শুনছি। জোর গুজব, আমি নাকি এক্ষুণি মরব।

মেয়েটি।। ভাল।

[*দিবাকর আপনমনে একটু শব্দ করেই হাসে।*]

মেয়েটি।। হাসছেন কেন?

দিবাকর।। আপনার নির্লিপ্তি দেখে। আমি বলে মরতে চলেছি, আর আপনি বলছেন, 'ভাল'। না মরা পর্যন্ত মৃত্যু ব্যাপারটাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় না। খানিকটা হাসির ব্যাপার বইকি! (*দিবাকর উঠে খুঁজতে থাকে*) পেলেন?

মেয়েটি।। উঁহু।

দিবাকর।। আপনি বাঁ দিকটায় দেখুন, আমি এদিকটা খুঁজছি। যে আগে পাব চেঁচিয়ে উঠব, ইউরেকা! (*একটু বাদেই দিবাকর খুঁজতে খুঁজতে চেঁচিয়ে ওঠে*) ইউরেকা!

মেয়েটি।। কি হল?

দিবাকর।। বুঝলেন, বুকের মধ্য থেকে কে যেন আমাকে বলল, তুমি কিছু পেয়েছ, চ্যাঁচাও, দিবাকর; চেঁচিয়ে বল, 'ইউরেকা'।

মেয়েটি।। আপনি কি খুঁজছেন?

দিবাকব।। জানিনা তো, আপনাকে হেল্প করছি।

মেয়েটি।। আমি কি খুঁজছি, আপনি জানেন?

দিবাকর।। (*সরল মুখে*) না।

মেয়েটি।। তাহলে স্থির হয়ে বসুন।

দিবাকর।। আপনাকে হেল্প করছি ভাবতে বেশ লাগছিল।

মেয়েটি।। কেন?

দিবাকর।। এমনি। এক এক সময় নদীর পার দিয়ে অকারণ এমনি হেঁটে যেতে যেরকম ভাল লাগে সেরকম। তখন মনে হয় না, জলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছি? তখন তো জল চটে যায়না অথচ আপনি চটে যাচ্ছেন।

মেয়েটি।। মাঝ দুপুরে কবিতা!

দিবাকর।। হ্যাঁ, মাঝ আকাশে যেমন চাঁদ।

মেয়েটি।। আপনি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন?

দিবাকর।। আমাকে নিয়ে দেশ-জোড়া কৌতুক চলছে, আপনাকে নিয়ে কেন কৌতুক করতে যাব।

মেয়েটি।। আমার জন্য আপনাকে কিছু খুঁজতে হবে না।

দিবাকর।। আমি বসব?

মেয়েটি।। যা খুশি।

দিবাকর।। আপনিও বসুন।

মেয়েটি।। কেন?

দিবাকর।। একটু রেস্ট নিয়ে দুজনে মিলে আবার খুঁজব। আমার মাথা ঘুরছে। আমি মরে যাব তো, বোধহয় তার সিমটম শুরু হচ্ছে। মরবার আগে দু'চারটি কথা বলতে কার না লোভ হয়! বসব?

মেয়েটি।। (*বিরক্ত মুখে*) বসুন।

দিবাকর।। আপনার কথামতো বসলুম তো, বেশ লাগছে। বাধ্যবাধকতার মধ্যে, বুঝলেন, জীবনীশক্তি থাকে। অবেলায় এসব বুঝছি।

[*মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে আর একটা বেঞ্চিতে বসে।*]

হ্যাঁ, একটু রেস্ট নিয়ে নিন। জানেন—

মেয়েটি।। আপনার কোনও কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই।

দিবাকর।। ধৈর্য কারই-বা আছে, আমারও কি ছাই আছে নাকি? ইচ্ছে করে পরম ধৈর্যে আপনাকে চুপ করে একটু দেখি। আর তক্ষুনি একটা ভণ্ডুলে হওয়া এসে চারদিকে তোলপাড় শুরু করে। অথচ গাছের একটা ফল দেখুন, একটি কথা পর্যন্ত না বলে ধীরে ধীরে রসে ভরে ওঠে। আমরা শিখতেই চাইনা, মিথ্যে মিথ্যে দেখি। আপনাকে চুপচাপ একটু দেখব?

মেয়েটি।। অসহ্য!

দিবাকর।। সবতাতে চটে যাচ্ছেন, একটা কিছুতো আমাকে করতেই হবে। তাহলে আপনি যা খুঁজছেন, সেটাই না হয় খুঁজছি।

মেয়েটি।। আপনি থামবেন! আমার মাথা ধরে গেল! আমি কি খুঁজছি, আপনি জানেন?

দিবাকর।। জানি।

মেয়েটি ॥ বলুন, কি খুঁজছি?

দিবাকর ॥ আপনি খুঁজছেন, সবাই খোঁজে—পেয়ে গেলেই বুঝবেন কি খুঁজছেন। আমিও তো খুঁজছিলাম—আপনাকে পেয়ে গেলাম।

মেয়েটা ॥ উঠি। আমার পার্সটা হারিয়ে ফেলেছি। ভাবলাম এখানে হয়তো পড়েছে। ও পাবনা। ব্যাগ থেকে কেউ তুলে নিয়েছে হয়তো।

দিবাকর ॥ আমার কাছে চোদ্দ টাকা আছে, নেবেন?

মেয়েটি ॥ আমি কেন নিতে যাব? *(মেঘ ডেকে ওঠে)* বৃষ্টি হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পালাই এইবেলা।

[*মেয়েটি উঠে এগোয়।*]

দিবাকর ॥ দাঁড়ান, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দি।

মেয়েটি ॥ না না, কোন দরকার হবে না।

[*দিবাকর অল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসে!*]

মেয়েটি ॥ কি হল? পায়ে ঝিন ঝিন ধরেছে তো, আমারও হয়।

দিবাকর ॥ ঝিন্‌ঝিন্‌ ধরেনি।

মেয়েটি ॥ ব্বাঃ, খুঁড়িয়ে চলছেন যে!

দিবাকর ॥ আমার এরকম হয়।

মেয়েটি ॥ কি হয়?—মাঝে মাঝে খোঁড়া হয়ে যান!

দিবাকর ॥ না মানে—আপনার দিকে মুখ করে হাঁটলে খোঁড়াচ্ছি—কিন্তু আপনার দিকে উল্টোমুখে হাঁটলে সোজা হাঁটছি। দেখুন—

[*এবার সে সহজ ভঙ্গিতে মেয়েটিকে পিছন করে হাঁটে। মেয়েটি বিমূঢ় চোখে লক্ষ করে।*]

দিবাকর ॥ অথচ ইচ্ছে করে এরকম করছিনা, সত্যি সত্যি হয়ে যাচ্ছে। তবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময় আপনার দিকে ঠিক ভাবে হাঁটতে পারব।

মেয়েটি ॥ *(অসহায় ভঙ্গিতে)* ভালো। আচ্ছা চলি।

[*দিবাকর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওর দিয়ে এগোয়*]

মেয়েটি ॥ কি আশ্চর্য! আপনি এভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসবেন নাকি? সমস্ত রাস্তায় ভিড় জমাতে চান? কি পেয়েছেন আপনি? আমাকে যেতে দিন।

দিবাকর ॥ আমি কেবল আপনার চলে যাওয়াটা দেখব বলে আসছিলাম।

মেয়েটি ॥ দয়া করে বসে দেখুন।

দিবাকর ॥ একটা অনুরোধ করব? আপনি যদি আমার চোখটা বেঁধে রেখে যান —তাহলে আর তাকাতে হয়না, তাকিয়ে থেকে সঙ্গে যাবার সুবিধে থাকে না। চোখটা বেঁধে দিন না!

মেয়েটি ॥ চোখ বাঁধা অবস্থায় এখানে বসে থাকবেন?

দিবাকর ॥ কত বছর চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলাম, এইতো খোলা হল। আপনি বেঁধে দিলেই আবার যে কে সেই। চোখে দেখতে না পেলে হঠাৎ-হঠাৎ ইউরেকা বলে চেঁচিয়েও উঠব না! ভেতরটা শান্ত থাকবে—বেঁচে যাব।

মেয়েটি ॥ রুমাল-টুমাল থাকলে দিন, কেউ আসার আগেই বেঁধে পালাই। আবার

চোখ বেঁধে যেন অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে পিছু নেবেন না! কই রুমালটা দিন?

দিবাকর।। রুমাল? দেখছি।

[পকেট খুঁজতে থাকে]

দিবাকর।। খোঁড়া হব না কেন বলুন, ভালবাসা পুরো না হলে কোন আপন-লাগা মেয়ের দিকে হাঁটলে হাঁটাটা কি সঠিক হয়? ভালবাসা পেলেই না সুন্দর সহজ হাঁটা। আমার অভাবটা বোঝাবার জন্য এরকম হেঁটে আপনাকে ভেতরের কষ্টটা বোঝাতে চেয়েছি। আসলে কষ্টটা পায়ের নয়, ভিতরের। একটা কৌশলে আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি।

মেয়েটি।। বক্তৃতা থামিয়ে রুমাল থাকলে দিন।

দিবাকর।। কোথায় যে ফেললাম। একটা কাজ করুন না, আপনার আঁচলটা দিয়ে বেঁধে দিন।

মেয়েটি।। আঁচল দিয়ে বাঁধলে তো আমাকে এখানে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে! কী বুদ্ধি আপনার! চলে যাব কেমন করে?

দিবাকর।। চলে যাবেন কেন? আপনাকে আমি দেখতে না পেলেই তো চলে যাওয়া হল।

মেয়েটি।। ঐতো আপনার পকেটে রুমাল। ইচ্ছে করে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, না?

[মেয়েটি রুমালটা নেয়]

মেয়েটি।। সত্যি সত্যি বেঁধে দেব?

দিবাকর।। যদি সত্যি সত্যি আপনি যেতে চান, বাঁধুন।

[মেয়েটি বাঁধতে চেষ্টা করে। চাবদিক তাকায়। একদল ছেলে পেছন দিক থেকে ঢোকে।]

প্রথম ছেলেটি।। একটু পাশ কাটিয়ে চল হে, এখানে কানামাছি খেলা হচ্ছে—ছুঁয়ে দিলেই চোর দিতে হবে।

[মেয়েটি রুমালটা মুঠো করে নেয়। বিব্রত। বেঞ্চিটায় ধুপ করে বসে-পড়ে। দিবাকর চুপচাপ কাগজটা দ্যাখে]

দ্বিতীয় ছেলেটি।। এক কপি বসে দিবে নাকি রে? কোথায় বসব? পার্ক-ময়দানগুলো যে সব জোড়া।

তৃতীয় ছেলেটি।। পায়রার ঝাঁক ইজারা নিয়েছে বাপ! চল, নিজের ধান্ধায় তেল দাও। কই চ। *(দ্বিতীয়র হাত ধরে টানে)*

দ্বিতীয় ছেলেটি।। *(এতক্ষণ একদৃষ্টে ওদের ভুরু তুলে দেখছিল)* না, মাইরি একটু শুটিং দেখব!

প্রথম ছেলেটি।। শুটিং দেখবে! এসব মেলা দেখোনা—পেরাণে দমকল ঢুকে যাবে! পারতো এ-বাড়ি ও-বাড়ির খুপড়ি থেকে আঁকসি মেরে একটি পায়রা নাব্বে নে এস, তাপ্পর এখেনে ফিট হয়ে বকবকুম বকবকুম—চাইলে যাও।

তৃতীয় ছেলেটি।। *(দ্বিতীয়র গাল টিপে)* শালা, প্রেম চেগেছে...নাগর আমার কেষ্টচন্দ্র...না খেয়ে শালার কোমরটি দ্যাখ্ সরু হতে হতে যেন নটরাজের ডমরুটি...মেয়েছেলের কথা ভুলে শালা দলাদলা মাখন খা—আগে শালা ভিটামিন,

তারপরে গিয়ে তোমার ইয়ে—(*মেঘ ডাকে*) চ চ—এক্ষুনি জল নামবে—ভিজে শ্যাওলা হয়ে যাবি।

প্রথম ছেলেটি ॥ (*যেতে যেতে ওদের শুনিয়ে*) শ্রীরাধিকা আর ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের জল বৃষ্টিতে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিদেন হাঁচি দেবার সংবাদও আমরা পাইনি। সুতরাং আগামী বৃষ্টিতে এই বৃন্দাবনে তোমরা দুটিতে কানামাছি খেলা শুরু করতে পার।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ছেলেটি ॥ টা-টা, টা-টা, টা-টা! (*চলে যায়*)

মেয়েটি ॥ আপনার জন্য কি রকম অপমানিত হলাম। ছিঃ ছিঃ! তাছাড়া আপনি না একজন পুরুষ, একটা ধমক পর্যন্ত ওদের দেবার সাহস হল না?

দিবাকর ॥ ওরা কি একটাও ভুল কথা বলেছে?

মেয়েটি ॥ ওদের ভঙ্গি? গলার স্বর?

দিবাকর ॥ আসলে আমি খুব সাহসী নই।

মেয়েটি ॥ ছিঃ! আমি এক্ষুনি চলে যেতাম কিন্তু ঐ ছেলেগুলো ঠিক আমাকে নিয়ে মজা করবে। কি বিশ্রী সব আপনার খেয়াল। সত্যিই তো বয়স্ক একটা লোক, দুপুরের পার্কে তার চোখে রুমাল বাঁধছি! আমি নিজেই এত নির্বোধ! এত লজ্জা করছে!

দিবাকর ॥ দুজনে মিলে খানিকটা নির্বোধ হওয়া গেল আর কি! জানেন, সত্যি আমার সাহস নেই, স্বভাবে সেরকম একটা দাপট নেই, কোন জোরালো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য—না কিছুই নেই। এসব আমার পাওনা ছিল। মাঝখান থেকে আপনি একটু ভাগ নিলেন। এতে আপনার লোকসান ঠিকই তবে আমি কিঞ্চিৎ হাল্কা হলাম।

মেয়েটি ॥ কী যুক্তি! অপমান ভাগ করলে ওজনে বাড়ে, কমে না—এটুকু না বোঝার ভান করবেন না।

দিবাকর ॥ সারা জীবনে থাকার মধ্যে ঐ অপমানটুকুই সম্বল—আমার কি আর কিছু আছে?

মেয়েটি ॥ নিশ্চয়ই আছে।

দিবাকর ॥ আছে। আমার অভাব আছে, দুঃখ আছে। হাজার চেষ্টা করেও দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াবার মত অক্ষমতা আছে।

মেয়েটি ॥ আপনার এই 'আছে'—ওতো নেই-এর লিস্টি। যাচ্ছি।

দিবাকর ॥ যাবেন?

[*বাইরে থেকে একটা গলা শোনা যায়— 'যাবেন না যাবেন না'*]

মেয়েটি ॥ কে?

দিবাকর ॥ দৈববাণী, একটু থেমে সবটা শুনে যান।

মেয়েটি ॥ অসম্ভব! আমাকে উঠতেই হবে।

[*বাইরে থেকে—'রেলিংটা টপকেই চলে আসছি, যাবেন না।' অদ্ভুত পোশাকে একটি লোক ঢোকে।*]

লোকটি ॥ এসে পড়েছি।

মেয়েটি ॥ সেতো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

লোকটি ॥ কিন্তু চোখের সামনে সেই অনাগত জগৎটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন

না। এই শূন্য বাতাসে অদৃশ্য ফুল ভেসে আসছে দেখতে পাচ্ছেন না, আপনাদের ঘিরে একটি মৃদঙ্গ ঘুরে ঘুরে বাজছে, শুনতে পাচ্ছেন না। আমি এইসব দেখাতে পারি, শোনাতে পারি—আমি একজন ম্যাজিসিয়ান।

দিবাকর।। তা-ই বলুন। বোধহয় আপনাকেই খুঁজছিলাম।

মেয়েটি।। আপনি যাদুবিদ্যা দেখুন, বাড়িতে এতক্ষণ আমাকে খুঁজতে থানায় খবর দিয়েছে।

ম্যাজিসিয়ান।। বাড়ির লোক আপনাকে খুঁজছে, কিন্তু আপনি যা খুঁজছেন তাতো থানায় পাবেননা—আমার কাছে আছে, এই যাদুদণ্ডে আছে। আপনার বুকের ভিতর কোন ফুল ফুটতে চাইছে? গোলাপ? মোটেই না—পাতা মেলে হাত বাড়াচ্ছে সবুজ বরণ একটি মিষ্টি লতা, মনের মতো গাছ চাইছে, জড়িয়ে উঠবে—রোদে-চাঁদে চিক্‌চিক করবে, হাওয়ায় দুলবে নোলকের মতো। ঠিক বলিনি? লতাখানি বাড়তে লেগেছে, গাছ চাইতো? গাছ দেব গো, গাছ দেব। এই ছুঁয়ে দিলাম হতচ্ছাড়া লোকটাকে (*দিবাকরকে যাদুদণ্ড দিয়ে ছুঁয়ে দেয়, ও কেঁপে ওঠে —কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে ওঠে। চোখ স্বপ্নাভ*) গাছ হচ্ছে, লোকটা গাছ হচ্ছে। (*মেয়েটিকে ছুঁয়ে দেয় যাদুদণ্ড দিয়ে, মেয়েটি স্বপ্নে আর্দ্র হয়ে ওঠে। চতুর্দিকের আলো নীলাভ হয়ে যায়*) এই ছুঁয়ে দিলাম মেয়েটিকে, নাম কি তোমাব?

মেয়েটি।। (*আচ্ছন্ন গলায়*) লতা!

ম্যাজিসিয়ান।। (*দিবাকরের দিকে সম্মোহিত করার দৃষ্টিতে তাকায়*) কি দেখছ চোখে? আমার চোখের থেকে রঙ লাফিয়ে তোমার গায়ে উঠছে, শিরায় বইছে। লতাখানি ডাল ছুঁয়েছে (*দিবাকর আচ্ছন্নের মতো নড়ে ওঠে, লতা নরম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়*) এবার লতায় পাতায় একটু কানাকানি কর, আড়াল হই —সময়মত হাজির হব। যাদুদণ্ডে অনেক আছে, অনেক দেব। আড়াল হই। লতাখানি দুলছে যে, ও গাছ, ডালখানা বাড়িয়ে ধর। (*দিবাকর লতাব হাত ধরে*) আড়াল হই

(*যাদুদণ্ডটা ওদের উপর ঘুরিয়ে নেয়*) দিন ঘুরছে, বছর ঘুরছে। লতাপাতার কানাকানি থামছে নাতো! চলি।

[*ম্যাজিসিয়ান চলে যায়।*]

দিবাকর।। লতা!

লতা।। বল।

দিবাকর।। কতদিন হয়ে গেল, আমাদের একটা ডিসিশনে আসা উচিত। আমি হয়ত বড় একজন কেউকেটা হতে পারব না—কিন্তু কোনমতে সংসার চালাবার অভাব হবে না।

লতা।। আমরাতো বেশি কিছু চাই না। মাত্র তো দুটি লোক—হাসতে হাসতে ভোর হয়ে যাবে। জান, পৃথিবীটায় এত বেশি লোক না—যতক্ষণ না সরে এসে মাত্র দুজন হচ্ছি, ততক্ষণ সুখটাকেই চেনা যায় না।

দিবাকর।। কিন্তু ছোট্ট ঘরটার বাইরে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না?

লতা।। আগে নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে নাও। এতেই দেখবে দিন ফুরিয়ে চুলে পাক ধরবে।

[*শোভাযাত্রা-শ্লোগানের শব্দ*]

দিবাকর ॥ আমি যে কতরকম ভাবতুম। কত মানুষের মধ্যে ছিলাম, কতরকম দুঃখ দেখেছি, কতরকম অভাব! বাঁচার জন্য কি প্রাণপণ লড়াই। হাত গুটিয়ে নিলে যদি পাপ হয়?

লতা ॥ এই সব এলোমেলো ভাব বলেইতো তোমার সুখ নেই; সুখ বানিয়ে নিতে হয়, বুঝলে? নিজেকে সুখ না দিলে পাপ হয় না? দুজনের সংসার কি দুজনের থাকে, সে দায়িত্বটা ভুলছ কেন—হাত গুটিয়ে থাকার জো-টি আছে নাকি?

দিবাকর ॥ আগে তাকালে অনেক দূর দেখতাম—আকাশের অনেকখানি, অনেক দূরের অনেক মানুষ—চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে!

লতা ॥ আমার মুখের দিকে তাকাও। আমি কি তোমাকে ঠকাতে পারি?

দিবাকর ॥ (*দু'হাতে মুখখানা ধরে*) না তুমি আমাকে জিতিয়ে দেবে—অনেক বড় জিত (*বাইরে থেকে ম্যাজিসিয়ানের গলা—বড়, অনেক বড় জিত*) এবার প্রত্যেকের কথা যেন ছড়ার ছন্দে উচ্চারিত হবে।)

[*ম্যাজিসিয়ান দূরে এসে দাঁড়ায়*]

ম্যাজিসিয়ান ॥ কি জিততে চাও? জিতে নেবার ধনটি কি—সুখ? কেমন ঘরে থাকে সুখ?

লতা ॥ পাতার কুটির।

ম্যাজিসিয়ান ॥ কেমন পাতা?

দিবাকর ॥ সবুজ পাতা, শান্ত পাতা; সুখী পাতা।

ম্যাজিসিয়ান ॥ একটি খুঁটি হোকনা সোনায় মোড়া।

লতা ॥ পাব কোথায়?

ম্যাজিসিয়ান ॥ যাদুকরের দণ্ডে আছে। চালায় যদি রূপোর পাত বসানো যায়?

দিবাকর ॥ কোথায় পাব?

ম্যাজিসিয়ান ॥ যাদুকরের দণ্ডে আছে! পা বাড়ালেই আছে।

দিবাকর ॥ কোথায় পা বাড়াব?

ম্যাজিসিয়ান ॥ সেই সিঁড়িটার দিকে।

লতা ॥ কোন সিঁড়ি?

ম্যাজিসিয়ান ॥ ঐ মহামান্য সিঁড়ি, ভাগ্যবিধাতার সিঁড়ি, কিংখাপ-মখমলে মোড়া, মাণিক্যের ফুল বসানো—প্রভু নেমে আসেন, চোখে করুণা, মুঠোয় আশীর্বাদ।

দিবাকর ॥ কোথায় প্রভু?

লতা ॥ সিঁড়িতো দেখতে পাচ্ছিনা।

ম্যাজিসিয়ান ॥ আগে মনটা তৈরী কর, তারপর আমি যাদুকাঠি নাড়ব তবে তো প্রভু নেমে আসবেন। যাদুদণ্ডে অনেক আছে।

দিবাকর ॥ মন আমার তৈরী।

ম্যাজিসিয়ান ॥ কি চাইবে?

দিবাকর ॥ (*লতাকে দেখিয়ে*) ও যা চাইবে, তাই।

লতা ॥ কি আর চাইব? আপনিইতো বললেন—পাতার কুটিরটা সোনার খুঁটিতে দামী

হয়ে উঠবে, মাথায় থাকবে রূপোর ছাদ। আমাদের ছোট্ট সংসারটায় সুখ আসুক, সম্পদ আসুক—মানুষ আর কি চায়?

ম্যাজিসিয়ান॥ (*দিবাকরকে*) তুমি কিছু বলবে না?

দিবাকর॥ ওর সুখ আমার থেকে আলাদা নয়।

ম্যাজিসিয়ান॥ ভাগ্যবিধাতা তোমাকে সব দেবেন, কেবল মূল্য হিসেবে চাইবেন বশ্যতা। মানে প্রভুর কথামত চলবে এইমাত্র।

লতা॥ এইটুকুতে এতো পাব?

ম্যাজিসিয়ান॥ এইটুকুতে এতো! তা নইলে আর ভাগ্যবিধাতা কেন! প্রভুর অসীম করুণা! প্রভুর একটা বিরাট কারখানা আছে, তুমি হবে সেখানকার পদস্থ কর্মী, প্রচুর মাইনে। মাইনে ছাড়াও আরো। ঘর ভরে উঠবে সম্পদে। কেবল প্রভুর কথামতো চলবে, বাধ্য হবে। এইটুকু। রাজী?

দুজনে॥ রাজী।

ম্যাজিসিয়ান॥ তাহলে ঐ এলেন প্রভু, ভাগ্যবিধাতা। ঐ, ঐ যে দাঁড়িয়ে।

[*ম্যাজিসিয়ান যাদুদণ্ড মঞ্চের এক কোণে নির্দেশ করতে মুহূর্তের অন্ধকাব। আলো জ্বলতে মূল্যবান পোশাকে আধুনিকভাবে সজ্জিত একজন হাস্যমুখ প্রৌঢ়কে দেখা গেল। হাতে চমৎকার শৌখীন স্টিক। ওরা দুজন সশ্রদ্ধভাবে এগিয়ে যায়।*]

প্রভু॥ কি চাও?

দিবাকর॥ আপনি তো সবই জানেন।

প্রভু॥ পারবে?

লতা॥ ঠিক পারবে প্রভু। ও ইচ্ছে করলে সব পারে। ও পারবে।

প্রভু॥ একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে. ত্যাগেই ভোগের পথ। পারবে?

দিবাকর॥ কি ত্যাগ করতে হবে?

প্রভু॥ তোমার এই জীবনটার মধ্যে বাজে মানুষের জন্য যে বাজে ভাবনা সেটা ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে নির্মাণ কর, তারপর জগৎ নির্মাণ। বুঝলে?

দিবাকর॥ কিন্তু জগৎটাকেই যদি তারপর ভুলে যাই।

প্রভু॥তার বদলে, তোমাকে আর একটা জগৎ দিচ্ছি, সোনা রূপোয় চকচকে জগৎ। উঠে এস, সিঁড়ি দিয়ে দুজনে উঠে এস।

দিবাকর॥ কিন্তু প্রভু!

প্রভু॥ কাতরতা বন্ধন—আত্মার শত্রু, উঠে এস।

লতা॥ কই ওঠো। ওঠোনা!

[*লতা কোণে সিঁড়িতে এক ধাপ উঠে যায়। হাত ধরে দিবাকরকে টানে। দিবাকর এক ধাপ ওঠে।*]

প্রভু॥ যাদুকর, তোমার শেষ খেলা দেখাও।

[*যাদুকর একখানা তরবারি বের করে*]

দিবাকর॥ (*সভয়*) ওকি?

লতা।। আপনার হাতে ওটা কেন?

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুদণ্ডে অনেক থাকে। যাদুকরের তরবারি।

দিবাকর।। কেন? আমার দিকে এগিয়ে আনছেন কেন?

লতা।। (*দিবাকরকে আঁকড়ে ধরে*) না, না—সরিয়ে নিন, ওকে বাঁচতে দিন, ও মরবে কেন?

প্রভু।। মরণ নয় মা, মরার খেলা। একটা নতুন জীবনে যাচ্ছে তো, ওকে পুরনো জীবনটা পিছনে ফেলে যেতে হবে—মরণ নয়, মরার খেলা। এটা একটা আচার মাত্র, ভয় পেওনা। এই মৃত্যু তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবে।

[*যাদুকর তলোয়ারটা দিবাকরের দিকে এগিয়ে আনে। আলো কমতে থাকে। কেবল দিবাকরের ভয়ার্ত মুখটা দেখা যায়।*]

দিবাকর।। না, না—আমার ভয় করছে।

[*ম্যাজিসিয়ান তলোয়ারটা দিবাকরের বুকে বসিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে। প্রভু রহস্যময় মুখে নিঃশব্দে হাসে। লতা কান্নায় ভেঙে পড়ে।*]

প্রভু।। কাঁদছ কেন? রক্ত পড়তে দাও। দেহের ভুল রক্ত চলে যাচ্ছে, নতুন রক্ত আসবে। মৃত্যু নয় গো—এবার সব পাবে। যাদুকরের তলোয়ারে মরেনা—মরার খেলা। এবার ও আমার পথে ঠিক পা ফেলে যাবে। চল।

লতা।। (*বিষণ্ন মুখ তুলে*) ওকে নিয়ে যাব?

প্রভু।। চল, ও আসবে। একটু অবসন্ন মাত্র—ওর নতুন জীবনটা আসতে একটু সময় দাও। চল। পুরনো জগতের পুরনো ভাবনা, রাস্তার মানুষের জন্য ভাবনা, নিজের দম্ভের কথাবার্তা—সব পিছে পড়ে থাক, মা—ও আসছে আমার পথে, অর্থের পথে, কৌলিন্যের পথে—নতুন জগতে। চল মা! ও আসছে।

[*আস্তে আস্তে ওরা চলে যায়। কেবল দিবাকর ঐভাবেই থাকে। সাংবাদিক দুজন মঞ্চে দুদিক থেকে এসে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।*]

প্রথম।। এই মৃত্যু আমাদের সকলের চেনা।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই মৃত্যুর নাম ভ্রান্তি।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই মৃত্যুর নাম পতন, পতন।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব।

প্রথম।। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, পতন থেকে পতন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়।। জাগরণ, জাগরণ, উদ্ধার।

প্রথম।। প্রথম মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সুযোগ।

দ্বিতীয়।। দ্বিতীয় সুযোগ।

[*দু'জন দুইপ্রান্ত দিয়ে মৌন হয়ে চলে যায়। পর্দা পড়ে।*]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। দিবাকর একটা এক্স-রে প্লেট পরীক্ষা করছে। পিছন দিক থেকে লতা ঢোকে। একটুকাল দিবাকরকে লক্ষ করে, ও ফিরে তাকায় না। লতা কোন কথা না বলে একটা চেয়ারে বসে। মুহূর্তকাল স্তব্ধতা। লতার মুখটা গম্ভীর, ক্রমশ গাম্ভীর্য বেশি মনে হয়।]

লতা।। ঘরে একজন লোক রয়েছে, সময় পেলে অন্তত একবার তাকিও!

দিবাকর।। (*না তাকিয়ে*) না তাকিয়েও টের পাওয়া যায়, বুঝলে—তুমি যেই ঘরে পা রাখো বাতাসে ছোট ছোট রূপোর ঘণ্টা বাজতে থাকে, ওরা আমার গুপ্তচর, তুমি এলেই জানান দেয়।

লতা।। দেখছতো এক্স-রে প্লেট, এতো কবিত্ব আসে কোত্থেকে?

দিবাকর।। কবিত্ব কি আর আসে, তুমি আঁচলে বেঁধে নিয়ে আস।

লতা।। (*শক্ত গলায়*) তুমি কি আমার দিকে তাকাবে না বলে পণ করেছ?

দিবাকর।। তাকালে যে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। (*তাকিয়ে*) কি কাণ্ড! তোমাকে যা লাগছে না! চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

লতা।। বাজে বকা দয়া করে থামাবে? বানানো কথা যত কম বলা যায়, পরিশ্রম তত বাঁচে।

দিবাকর।। এসব পরিশ্রম আলাদা মেজাজের ; একটা ফুল কত পরিশ্রমে ফোটে বলত, অথচ এক ফোঁটা কষ্টের ঘাম নেই কোথাও।

লতা।। আমি একটা দরকারি কথা বলতে এসেছিলাম।

দিবাকর।। বলে ফেল।

লতা।। ব্যাপারটা অতো হাল্কা নয়।

দিবাকর।। কি আশ্চর্য, আগে বলবে তো, তারপর প্রয়োজনে গম্ভীর হওয়া যাবে।

লতা।। এমন ভঙ্গিতে কথা বলছ, যেন তুমি কিচ্ছু জান না!

দিবাকর।। তুমি কি বলতে এসেছ আমি কি করে জানব?

লতা।। জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে আসনি তুমি?

দিবাকর।। জ্যোতিষবাবু, মানে আমার ভাগ্যবিধাতা, প্রভু!

লতা।। যখন ওঁর চাকরি নিয়েছিলে, কই তখন তো এতো ঠাট্টা ছিল না তোমার গলায়! ঝগড়া করতে গেলে কেন?

দিবাকর।। ওকে ঝগড়া বলে না!

লতা।। কি বলে?

দিবাকর।। মতপার্থক্য।

লতা।। উনি ওটাকে ঝগড়াই ভেবেছেন।

দিবাকর।। ওঁর ভাবনার দায়িত্ব আমি নিতে যাব কেন?

লতা।। এর পরিণাম ভেবেছ, তোমার চাকরিটা থাকবে?

দিবাকর।। ওঁর চাকরি উনি ফিরিয়ে নিলে আমি কি করতে পারি। তবে ব্যাপারটা তাহলে সহজে মিটবে না, ওঁর কারখানার অনেকেই আমাকে ভালোবাসে, ওরা ছেড়ে কথা কইবে না।

লতা।। অর্থাৎ তোমার দল আছে—এই দল পাকানোটাই তোমার বিরু… ওঁর অভিযোগ। তুমি চাকরি করছ, চাকরি করবে। কী দায় পড়েছে তোমার অন্যদের নিয়ে জোট পাকিয়ে হট্টগোল করার—তাতে তোমার কিছু মাইনে বাড়বে?

দিবাকর।। আমি তো কোন হট্টগোল করিনি!

লতা।। করনি সেটা জ্যোতিষবাবুকে বোঝাও। তা না তুমি এমন সব কথা বলে এসেছ যাতে তোমাকে আরো ভুল বোঝে।

দিবাকর।। ভুল উনি আমাকে বুঝতেনই।

লতা।। তবু তোমার গোঁ ছাড়বে না। ওকে তুমি বুঝিয়ে বল, তোমার সঙ্গে কারুর তেমন সংশ্রব নেই। আর কোনও সংশ্রব রাখারই বা কি দরকার? এখন তোমার কোনও অশান্তি নেই, তেমন অভাবও নেই। যে-লোকটা এতো দিল, তার বদলে কিছুটা কৃতজ্ঞতা তিনি আশা করতে পারেন না?

দিবাকর।। কৃতজ্ঞতা তিনি চান না, তিনি চান বশ্যতা। দ্যাখো লতা, আমাকে যতটা বিক্রী করা সম্ভব, করেছি—আমি আর পারব না! লোকটা আমাকে জুতোর মত পায়ে গলিয়ে যেমন খুশি হাঁটবে, আর পায়ের তলায় থেকে আমি ধুলো মেখে ধন্য হতে থাকব—এতোটা অসহ্য!

লতা।। কিন্তু কিছু তো উনি চাইবেন?

দিবাকর।। বলছি তো, কত দেব? আমার আর কিছু নেই, আমি দেউলে, ব্যস্! এই শরীরটা আর তার মধ্যে এক ছিটে মন পড়ে আছে, যদি বল ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি, লোকটা কাদা পায়ে মাড়িয়ে যাক।

লতা।। উনি আমাকে ফোন করেছিলেন—সংবাদটা তোমাকে দিয়েই রাখি। তোমার জ্বালাময়ী ভাষণ খবরটা শুনে কতটা প্রখর হয় শুনে যাই। তোমার চাকরিটা আর থাকছে না। কই, বক্তৃতা শুরু কর!

দিবাকর।। বক্তৃতার কি আছে! আবার আগের মত থাকব!

লতা।। আগের মতটা কি থাকা ছিল?

দিবাকর।। হয়ত ছিল না।

লতা।। শোন, যেজন্য এসেছিলাম—তুমি এক্ষুণি একবার ওঁর কাছে যাবে। এখনও হয়ত একটা পথ খোলা আছে। চল আমার সঙ্গে। একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়—এই ছোট্ট কথাটা কেন যে বোঝ না! কোন কথা শুনব না, আগে আমার সঙ্গে চল, তারপর অন্য কথা।

দিবাকর।। আমাকে নিয়ে গেলে তোমার সম্মান বাড়বে?

লতা।। আগে বাঁচা, তারপরে সম্মান। চল।

দিবাকর।। আমার চরিত্রটাই এরকম লতা—লড়াইটা কোথায় বুঝি, আরম্ভটাও বুঝি—কেবল এগিয়ে যাওয়াটা বুঝি না।

লতা।। বড় বড় কথা না বলে, চটপট তৈরী হয়ে নাও। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাও একটা লড়াই। চল, চল।

[*দিবাকব টেবিলটা গোছাতে থাকে।*]

লতা।। হ্যাঁ শোন, কোন বাড়ি গেলে কয়েকটা জিনিশ ইচ্ছে না থাকলেও করতে

হয়। তুমি যেখানেই যাও এত গুম হয়ে থাক! জ্যোতিষবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে হেসে দু'চারটে কথা বলবে। এককালে উনি সুন্দরী ছিলেন, এখনো তাকালেই চোখে পড়ে—এটা বলবে। ওর ছোট মেয়েটার গাল নেড়ে একটু আদর করবে; বলবে, 'বেশ স্মার্ট হয়েছে।' আর ওদের কুকুরটাকে একটু কোলের কাছে নিয়ে, সেরা জাতের কুকুর-টুকুর এইরকম কিছু একটা বলবে। মনে থাকবে? তোমাকে এরকম পাখি পড়িয়ে কতদিন চালাব—একটু স্বাধীন হও না!

দিবাকর॥ হব।

লতা॥ আর হয়েছ! কই চল?

দিবাকর॥ ওঃ হো, তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

লতা॥ কেন?

দিবাকর॥ বাইরে দুজন পেশেন্ট বসিয়ে রেখেছি। একদম ভুলেই গেছি, দেখলে?

লতা॥ পরে দেখলে হয় না?

দিবাকর॥ বসিয়ে রেখেছি যে!

লতা॥ কতক্ষণ লাগবে?

দিবাকর॥ এক্ষুণি হয়ে যাবে।

লতা॥ আমি পাশের ঘবে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি কোরো কিন্তু।

দিবাকর॥ ঠিক আছে।

[লতা পাশের ঘরে চলে যায়। কলিংবেল টেপে। একজন বেয়ারা ঢোকে]

দিবাকর॥ ডাকো।

[বেয়ারাটি চলে যায়। একজন তরুণ ছেলে ঢোকে। প্রথম দৃশ্যে পার্কে যাদের দেখা গেছে, তাদের মধ্যে একজন।]

দিবাকর॥ বসুন।

[ছেলেটি বসে। বসে চোখটা পিট্‌পিট্‌ করতে থাকে। দিবাকর লক্ষ্য করতেই নিঃশব্দে হাসে ছেলেটি।]

দিবাকর॥ চোখ পিট্‌পিট্‌ করছেন কেন?

প্রথম॥ এই রোগটা দেখাবার জন্যই এসেছি, ডাক্তারবাবু।

দিবাকর॥ কদ্দিন ধরে এরকম হচ্ছে?

প্রথম॥ চার দিন হবে। হ্যাঁ চার দিন।

দিবাকর॥ হঠাৎ? না কোন অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছিল? কোন রকম আঘাত?

প্রথম॥ ও-সব কিছু না, স্যার। সম্ভবত ফুড পয়েজন থেকে রোগটা আমদানি হয়েছে।

দিবাকর॥ ফুড পয়েজন থেকে চোখ *পিট্‌পিট্‌!*

প্রথম॥ মানে, ওরকম বলা যায় আর কি—একসঙ্গে অনেকের হয়েছে কিনা। বাইরে আরো দুএকজন এসেছে। ধীরে ধীরে দেখবেন সবাই আসবে।

দিবাকর॥ সকলেই চোখ পিট্‌ পিট্‌ করছে?

প্রথম।। না ঠিক তা নয়, এক এক জনের এক এক রকম হচ্ছে। তবে রোগটা এসেছে একই জায়গা আর একই সময় থেকে।

দিবাকর। ব্যাপারটা বেশ ইনটেরেস্টিং মনে হচ্ছে।

প্রথম।। আপনার স্যার ইনটেরেষ্টিং লাগছে, এদিকে চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে টায়ার্ড হয়ে পড়ছি!

দিবাকর।। না, মানে ঘটনাটা মজার, রোগটা নিশ্চয়ই কষ্টকব।

প্রথম।। ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে স্যার, আমরা ক্লাবের অনেকে মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। যে-কজন সিনেমা দেখেছি, প্রায় সকলের এক এক ধরণের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ফিল্ম তো স্যার, একধরণের কালচারাল ফুড, তাই ফুড পয়েজন বলছিলাম।

দিবাকর।। সন্দেহ নেই ফুড পয়েজন। আচ্ছা, আপনারা টিকেট পেলেন কি করে, হলের কর্মচারীরা তো ধর্মঘট করেছে—হল'তো বন্ধ।

প্রথম।। কয়েকটা হল খুলে রেখেছে, ক্লাবে বিনে পয়সায় টিকিটও কিছু এসে গিয়েছিল। আমরা দু'একজন অবশ্য কেটেছি।

দিবাকর।। কেউ বাধা দেয়নি?

প্রথম।। না। তাছাড়া দলবল মিলে গেছি, কে আওয়াজ তুলবে, স্যার! হপ্তার পর হপ্তা ছবি না দেখে আত্মা যেন ঘুমে বালিশ খুঁজছিল—আড়াই ঘণ্টা তবু একটু হাই ভেঙে আসা গেল! কে জানত ঐ ফিল্ম দেখে চোখের পাতা কত্থক নাচতে শুরু করবে।

দিবাকর।। দেখি আপনার চোখটা?

[*দুটো চোখ পরীক্ষা করে। টর্চ জ্বেলে দেখে।*]

প্রথম।। আলো ফেলবেন না স্যার, আলো ফেলবেন না! (*চোখ বুজে*) আলো পড়লে মনে হয় কে যেন চোখে গরম বালি ঘষে দিচ্ছে। যা জ্বলছে না! (*চোখ মুছে*) এঃ, জল গড়াচ্ছে!

[*অতি কষ্টে তাকিয়ে চোখ পিটপিট্ করতে থাকে*]

দিবাকর।। আচ্ছা, যখন আপনি কাউণ্টারে গেলেন তখন ভিড় ছিল?

প্রথম।। একদম না—কাউণ্টার হাততালি দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

দিবাকর।। কাউণ্টারের কাছে গিয়ে কি করলেন?

প্রথম।। ঘুলঘুলি দিয়ে টাকা সমেত হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম।

দিবাকর।। কি দেখলেন?

প্রথম।। কাউণ্টারের ভিতর-ঘরে বুক অবধি একজন লোক।

দিবাকর।। আর কি দেখলেন?

প্রথম।। টিকিটের একটা প্ল্যান।

দিবাকর।। আর কিছু?

প্রথম।। একটা রঙিন পেন্সিল।

দিবাকর।। আর?

প্রথম।। ডেটস্ট্যাম্প।

দিবাকর।। আর?

প্রথম।। আ-র, হ্যাঁ দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার—গণেশ আঁকা, শ্রীদুর্গার কোলে বসে।

দিবাকর।। দেয়ালের বাইরে কিছু দেখলেন?

প্রথম।। সে কি ডাক্তারবাবু, দেয়ালের বাইরে চোখ যাবে কি করে?

দিবাকর।। ভাল করে ভেবে দেখুন, টিকিট কাটার সময় ঘরের দেয়ালের বাইরে কিছু চোখে পড়ছিল?

প্রথম।। সেরেছে, উকিলের মতো প্রশ্ন করছেন যে! সব গুলিয়ে যাচ্ছে! না, স্যার কিছু দেখিনি—দেয়াল ফুটো করার মতো আমার দিব্যচক্ষু বাবা মা দেননি। খুব মামুলি চোখ, স্যার।

দিবাকর।। আপনার কাছ থেকে কাউন্টারের ভদ্রলোকের দূরত্ব কত ছিল?

প্রথম।। তা এক ফুট হবে।

দিবাকর।। দেয়ালের দূরত্ব?

প্রথম।। গজকাঠি নিয়ে তো যাইনি স্যার।

দিবাকর।। অনুমান?

প্রথম।। তা *(চোখ ঘুরিয়ে একটা মাপ আন্দাজ করে)* ছ-সাত ফুট হবে।

দিবাকর।। সাত ফুট দূরের দেয়ালটা ছাড়া টিকেট কাটার সময় তার বাইরে কিছু দেখতে পাননি?

প্রথম।। না।

দিবাকর।। তার মানে আপনি সাত ফিটের বেশি দূরের কিছু দেখতে পান না?

প্রথম।। দেখতে পাইনা মানে, দেয়াল থাকলে চোখ দেয়ালে ঠেকে যায়। সকলেরই যায়।

দিবাকর।। আচ্ছা দেয়াল ডিঙিয়ে টিকিট কাটার সময় আপনি দেখতে পাননি সেই হলের কয়েকজন কর্মচারী যারা ধর্মঘট করছে, দূর থেকে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে? আপনি, একজন যুবক, আপনার সহযোগিতা ছাড়া ওরা জিততে পারে না বলে আকুল ভাবে তাকিয়ে আছে। আপনি যেইমাত্র টিকিট কাটলেন, দেখতে পাননি, ওদের পরিবারের একটা বাচ্চা ছেলের রুগ্‌ণ বুকে দম আটকে এল, বাচ্চাটা কেঁদে উঠল,...বাচ্চাটার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন টিকিট কাটার সময়?

প্রথম।। *(হতবুদ্ধি)* না!

দিবাকর।। দেখি আপনার চোখটা? *(পরীক্ষা করল)* আপনি শর্ট সাইটেড় হয়ে যাচ্ছেন। একটু কম দেখতে শুরু করেছেন। এটা সেরে গেলেই চোখ পিটপিট্ করা থেমে যাবে। আচ্ছা, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। আর কাউকে পাঠিয়ে দিন।

প্রথম।। ওষুধ-টষুধ কিছু?

দিবাকর।। হবে। আপনি আর একদিন আসুন, ভেবে দেখতে হবে একটু।

প্রথম।। কাল আসিঁ?

দিবাকর।। আসুন।

[চলে যায়। দ্বিতীয় তরুণ ঢোকে। একেও আমরা প্রথম দৃশ্যে দেখেছি। লোকটি অল্প হাঁপাচ্ছে।

এসেই ধুপ্ করে বসে পড়ে।]

দিবাকর।। হাঁপাচ্ছেন কেন?

দ্বিতীয়।। সেই ফুড পয়েজন। সবইতো শুনেছেন। আমাকে একটু কথা কম বলাবেন ডাক্তারবাবু। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে! সিনেমাটা দেখতে গিয়েই কাল হল। নেশা মাত্রই বদ—তা সিনেমারই হোক আর মদ মেয়ে...গাঁজারই হোক। আমাদের ফ্যামিলিতে—

দিবাকর।। কথা আপনি নিজেই বেশি বলছেন।

দ্বিতীয়।। একটু বাধা দেবেন ডাক্তারবাবু—বুকে এতো লাগছে, যত কম কথা বলব ততই শান্তি। কিন্তু নিজেকে বোঝানোই—

দিবাকর।। বুকটা দেখব আপনার।

দ্বিতীয়।। দেখুন, মানে দেখাবার জন্যই তো আসা। আমাদের—

দিবাকর।। (*স্টেথোসকোপটা লাগায়*) চুপ করুন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন।

দ্বিতীয়।। নিঃশ্বাস আর কোত্থেকে নেব—কটা নিঃশ্বাসই বা আর বাকি আছে—হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ফুরিয়ে এনেছি!

দিবাকর।। কথা বলবেন না।

দ্বিতীয়।। না বলব না।—(*পকেট থেকে কলমটা বের করে কামড়ে মুখটা বন্ধ রাখে*)

দিবাকর।। ভেতরে কি রকম হচ্ছে?

দ্বিতীয়।। (*কলমটা নামিয়ে*) যাতা ডাক্তারবাবু, যেন বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। বেড়ালটা বেরুবে?

দিবাকর।। বেরুবে।

দ্বিতীয়।। বাঁচা যায়।

দিবাকর।। আচ্ছা, যখন টিকিট কাটছিলেন তখন আপনার কেমন লাগছিল?

দ্বিতীয়।। ভাল। বেশ ফুরফুরে।

দিবাকর।। টিকিটটা হাতে পাবার পর কি ভাবলেন?

দ্বিতীয়।। অনেকদিন বাদে শো দেখতে পাব ভেবে বেশ লাগছিল।

দিবাকর।। হলে ঢোকার আগে কি করলেন?

দ্বিতীয়।। ঘড়িটা দেখলাম—শো আরম্ভ হতে দশ মিনিট বাকি ছিল, সিগ্রেট কিনতে গেলাম। পানের দোকানে একটা গান হচ্ছিল। চেনা গান, গুনগুনিয়ে গলা মেলাচ্ছিলুম।

দিবাকর।। তারপর?

দ্বিতীয়।। পান কিনলাম। তিলাপাতি আর লালবাবা জরদা মেশানো মিঠেপাতা পান—রসে মুখটা টলটল করছিল, বুকপকেটে গোলাপি টিকিট, ঘড়ির কাঁটাটা একটু একটু করে এগুচ্ছে—সব মিলিয়ে স্যার, যেন একটা অর্কেস্ট্রা! মনের মধ্যে যেন একটা গুনগুন করে গান জাগছিল, কানের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

দিবাকর।। কানে আর কোন শব্দ আসছিল? আর কোন কথা? কোন আর্তনাদ? তিরস্কার? দীর্ঘশ্বাস? কান্না? অনুনয়?

দ্বিতীয়।। সে কি বলছেন, স্যার। ওসব শুনতে যাব কেন?

দিবাকর ।। ঠিক আছে—দেখি বুকটা? (*বুক পরীক্ষা করে*) এক্স-রে করতে হবে—আপনার হার্টটা একটু একটু করে ছোট হচ্ছে!

দ্বিতীয় ।। কি বলছেন, একি সম্ভব নাকি, স্যার?

দিবাকর ।। আপনার হৃদয়ের জায়গা কমে আসছে আর কি। এটা ঘটলে হার্ট প্রকৃতই ছোট হয়ে যায়! একটা প্লেট নিন।

দ্বিতীয় ।। কি ঝক্কিরে বাবা! গচ্চায় পড়লুম দেখছি। সারবে তো?

দিবাকর ।। নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয় ।। ওষুধ-টষুধ?

দিবাকর ।। বললুমতো আগে একটা এক্স-রে প্লেট নিতে হবে।

দ্বিতীয় ।। তাহলে তা-ই নিচ্ছি। ওটা নিয়ে আসব তাহলে?

দিবাকর ।। তাই আসুন।

[*দিবাকর পাশের ঘরের দিকে এগোয়। অন্য প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় সাংবাদিক ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে।*]

দ্বিতীয় ।। যাবেন না। শুনুন, যাবেন না।

[*দিবাকর ফিরে তাকায়। বিস্মিত মুখ।*]

দিবাকর ।। আপনি?

দ্বিতীয় ।। সাংবাদিক। এক মিনিট, একটা ছবি নেব আপনার।

দিবাকর ।। হঠাৎ ছবি নেবার জন্য আমার চেম্বারে ঢুকে পড়লেন, এতটা বিখ্যাত হয়ে পড়লাম কখন?

দ্বিতীয় ।। আপনার প্রথম মৃত্যুর পর বেঁচে উঠে দ্বিতীয়বার না মরে বাঁচতে চাইছেন, এই শুভ লক্ষণটা ছবিতে তুলে রাখতে চাইছি।

দিবাকর ।। এলোমেলো কথা শুনবার সময় নেই আমার, আপনি দয়া করে আসুন। নমস্কার।

দ্বিতীয় ।। কোথায় যাবেন?

দিবাকর ।। নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নে আপনার কোন অধিকার নেই!

দ্বিতীয় ।। পাশের ঘরে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন—তাঁর সঙ্গে আপনি হারানো চাকরিটা ফিরে পেতে যাচ্ছেন, তাই তো? কিন্তু এই তো ভাল—আপনার পেশেন্ট, তাদের চিকিৎসা—খারাপ কি?

দিবাকর ।। আপনি না গেলে, আর কোন শোভন ব্যবহার আশা করবেন না।

দ্বিতীয় ।। লতার সঙ্গে এক্ষুণি যাবেন না। একটু ভাবুন।

দিবাকর ।। কোথায় কি হচ্ছে, কে কোথায় আছে—সব সংবাদই রাখেন দেখছি!

দ্বিতীয় ।। বলেছি তো, আমি সাংবাদিক। খবর আমাকে রাখতে হয়।

দিবাকর ।। ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে, আপনি এখানে বসে থাকতে পারেন।

দ্বিতীয় ।। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে।

দিবাকর ।। কার জন্য?

দ্বিতীয় ।। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

দিবাকর।। মানে?

দ্বিতীয়।। এই তো সময়! একটা সঠিক পথে আপনি পা দিয়েছেন—যে খাঁচাটায় আপনি ধরা পড়তে যাচ্ছেন, গাড়িটা আপনাকে তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। চিরকাল একটা গাড়ি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে থাকে, হর্ন দেয়। চলে আসুন। আপনি গাড়িটার হর্ন শুনতে পাচ্ছেন না—গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে আছে। চলে আসুন, কী ভীষণ হর্নটা বাজছে!

[*দিবাকর দুই কান ঢেকে মুখে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে।*]

দিবাকর।। (*প্রায় ফেটে পড়ে*) চুপ করুন! (*ক্লান্ত গলায়*) লতাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

দ্বিতীয়।। ওকে নিয়েই চলুন।

দিবাকর।। না, এখনও তা সম্ভব নয়। আমি সময় চাই, বুঝতে চাই।

দ্বিতীয়।। কিন্তু মৃত্যু এগুচ্ছে—ওর হাতে অনেক অস্ত্র, অনেক লোভ।

(*বাইরে থেকে লতার গলা—'হল তোমার'?*)

আমি লুকিয়ে থাকছি, আপনি ওঁকে বোঝান।

(*ইজিচেয়ারটার আড়ালে দ্বিতীয় সাংবাদিক লুকোয়। প্রথম সাংবাদিক ঢোকে—ব্যস্ত।*)

দিবাকর।। আপনি?

প্রথম।। সাংবাদিক। শুনুন, হাতে আমার বিন্দুমাত্র সময় নেই—হ্যাঁ,...আগে আপনার একটা ছবি নিয়ে নিচ্ছি।

[*হতচকিত দিবাকরের মুখের নিচে বসে ছবি নেয়।*]

দিবাকর।। আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, কি ব্যাপার বলুন তো?

প্রথম।। বুঝতে না-পারা মুখের একটু ছবি নিলাম। হ্যাঁ, যে কথাটি বলে যাব—সেটা আগে বলেই ফেলি। আপনার দ্বিতীয়বারের মৃত্যু প্রায় তৈরী।

দিবাকর।। কার মৃত্যু?

প্রথম।। আপনার। দ্বিতীয় মৃত্যু। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। হর্নটা শুনতে পাচ্ছেন, স্টার্ট দেওয়ার শব্দ।

দিবাকর।। গাড়ি! কেন?

প্রথম।। ব্বাঃ, কেন? মৃতদেহটা বয়ে নেবার জন্য কিছু চাই তো? তাহলে আপনি প্রস্তুত? ও-ঘরে লতা অপেক্ষা করছেন, উনি আপনার মৃত্যুর উইটনেস্ হবেন। থ্যাঙ্কিউ —পা ফেলে পাশের ঘরের দিকে এগোন।

দিবাকর।। আপনি আমাকে উত্তেজিত করছেন—দয়া করে আপনি বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান!

প্রথম।। পা ফেলে পাশের ঘরের দিকে এগোন, নিজেকে আজকে আরো সাজিয়ে নিন —গাড়িটা হর্ন দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন, স্টার্ট দিয়েছে—আপনাকে ডাকছে। পাশের ঘরটার দিকে এগিয়ে যান।

[*দিবাকর প্রথম সাংবাদিকের কথার মধ্যেই সম্মোহিতের মত লতার ঘরটার দিকে দু'হাতে মাথাটা চেপে অস্থির মুখে এগুচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মিলিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘুরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সাংবাদিকের দিকে তাকায়।*]

দিবাকর॥ (*ক্রুদ্ধ গলায়*) আমি কোনওদিকে যাব না—এইখানে, ঠিক দুদিকের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। কাউকে ভয় পাই না! (*তারপর ভেঙে পড়ে*) লতা—আমি কিছু বুঝতে পারছিনা—কিছু বুঝতে পারছিনা!

[*লতা ছুটে আসে। দিবাকরকে ধরে*]

লতা॥ কি হল, তোমার।

দিবাকর॥ কিছু না।

[*দিবাকর চেয়ারটায় বসে। ক্লান্ত। লুকনো সাংবাদিক এগিয়ে আসে। দুজন সাংবাদিক মৌনভাবে দর্শকদের দিকে মুখ করে মঞ্চের দুই প্রান্তে দাঁড়ায়। লতা কাউকে ফোনে কিছু বলতে থাকে। দিবাকর শরীরটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকায়—অর্থহীন, শূন্য দৃষ্টি।*]

প্রথম॥ এই স্থবিরতার নাম মৃত্যু।

দ্বিতীয়॥ উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম॥ এই ক্লান্তির নাম পতন।

দ্বিতীয়॥ উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম॥ প্রলোভন থেকে প্রলোভন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়॥ উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম॥ দ্বিতীয় মৃত্যুর পদশব্দ।

দ্বিতীয়॥ উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম॥ দ্বিতীয় মৃত্যুর পদশব্দ, এই ঘরে—এই অন্ধকারে।

দ্বিতীয়॥ এই ঘরে, এই অন্ধকারে। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব।

[*সাংবাদিক দুজন মৌনভাবে দুই প্রান্ত দিয়ে চলে যায়।*]

লতা॥ কি হয়েছে তোমার বলতো? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

দিবাকর॥ কিছু না—কিছু হয়নি। লতা, একটা মানুষ যদি দরজার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভুলে যায়, ভিতরে যাবে, না বাইরে যাবে; যদি স্থির করতে না পারে, সে বাঁচতে চায়, না মরতে? যদি তাকিয়ে বুঝতে না পারে, এখন দুপুর না মাঝরাত-—তখন সে নিজেকে নিয়ে কি করবে বলতে পার?

লতা॥ তোমাকে কথায় পেলে না, একবিন্দু যদি তোমাকে বোঝা যায়। একটু চুপ করে বোস। আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করেছি।

দিবাকর॥ এটা ডাক্তারের ব্যাপারই নয়, লতা। ডাক্তার যখন বলবে বেঁচে আছি,

ঠিক তখনি হয়ত আর আমি বেঁচে নেই। দুটো গাড়ি দুদিকে থেকে হর্ন বাজিয়ে ডাকছে —কোন দিকে আমি যাব?

লতা॥ আচ্ছা, তুমি যদি এভাবে কথা বল, আমার ভাল লাগে? এসব শুনলে আমার কষ্ট হয় না বুঝি? আমার কষ্ট হয়, তুমি তো কখনো তা চাও না।

দিবাকর॥ তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য কিছু বলছি না, লতা। হঠাৎ অদ্ভুত সব কথা মনে আসছে। ছোটবেলায় গাঁয়ে যাত্রায় একজন রামকে দেখেছিলাম—হাতে একটা হীরের আঙটি, হীরেটা আলো লেগে ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছিল। ঐ প্রথম একবার আমার চোর হতে ইচ্ছে করেছিল। হিরেটা থেকে ছিট্‌কে আসা আলো আমার চোখের মণিতে যেন মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। আজ বুঝি, ওটা নকল। কিন্তু ওর ঠিক্‌রোনো আলো তো নকল নয়। হঠাৎ-হঠাৎ আজ ঐ হীরেটা আমার কাছে গড়িয়ে আসে, কতরকম আলো হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে —আমি অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে এগোই। কোথায় যেন হঠাৎ লুকিয়ে পড়ে। কখনো দেখি, তোমার মধ্যে জ্বলছে, কখনো আমার মুঠোর মধ্যে ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে, কখনো দূর থেকে সুতোয় দুলতে দুলতে একটা ভয়ংকর হাসি লোভ দেখাতে থাকে। আমার সব গোলমাল হয়ে যায়—খাঁটি না নকল বুঝতে পারি না। শুধু মনে হয়, ঐখানে আমার নিয়তি!

লতা॥ হিরেটা তোমার বন্ধু, ছোটবেলার বন্ধু। চারদিকে যখন অন্ধকার ও তোমাকে আলো দেখায়। বলতে চায়, আমি আছি, আমাকে ভুলে যেও না।

দিবাকর॥ কিন্তু সব সময় যে দেখতে পাই না?

লতা॥ তুমি কি সব সময় আমাকে দ্যাখো? যখন দেখতে পাও না, তখনো কি আমি থাকছি না? এইতো আমি, আমি আছি।

দিবাকর॥ তোমাকে আমি বুঝি, তারপর?

লতা॥ তারপর আবার কি? অত ভেবনাতো। ভেবে ভেবেইতো কষ্ট পাও। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি! তোমার মাথায় আমি যখন হাত রাখব, আমার হাতটা ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকবে না—কোন ভাবনা না, চিন্তা না—কেউ না, কিছু না। জানতো আমি ভীষণ হিংসুক।

দিবাকর॥ জ্যোতিষবাবুর কাছে যাবে না?

লতা॥ সে আমি একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নেব। এক্ষুণি গেলে তুমি যে কি সব বিড়বিড় করে বকতে থাকবে, তার মাথামুণ্ডু কেউ বুঝবে? আগেতো তুমি, তারপরেতো চাকরি—তাই না? তখন অত রেগে গিয়েছিলাম বলে কি সত্যি সত্যি আমি রাগী মেয়ে নাকি? তোমার সুখ হোক, শান্তি আসুক, ঐশ্বর্য হোক, আমি চাইব না? তোমাকে একটা ভীষণ জমকালো রাজার মত ভাবতে আমার ভাল লাগে না বুঝি! আর তুমি তখন এমন ভাব, যেন আমি একটা লোভী মেয়ে। আমি বলি তোমাকে,—এটা দাও, ওটা দাও? (*দিবাকরের মাথাটা নেড়ে দিয়ে*) কি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

দিবাকর॥ (*মৃদু হেসে*) শুনছি।

লতা॥ ছাই শুনছ, একটু আদর দিলেই তোমার ঘুম পায়।

দিবাকর॥ তুমি যদি ঘুম ডেকে নিয়ে আস, ঘুমোব না!

লতা॥ (*হাত সরিয়ে নেয়। মিষ্টি গলায় বলে*) নাও, ওঠ। এবার এই চেম্বার থেকে

সোজা বাড়ি যাবে। চান করে খাবে—তারপর চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়বে। আর যেই ঘুমোবে আমি তোমার বালিশের নিচে সেই হিরেটা লুকিয়ে রেখে দিয়ে আসব।

দিবাকর।। আর স্বপ্নের মধ্যে ঝিক্‌ঝিক্ করতে থাকবে। হিরের রঙ লেগে স্বপ্নটা কেমন রং-এর হবে ভাব। এক এক সময় ইচ্ছে করে, এমনি একটা দারুণ জীবনের মধ্যে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর উঠব না।

লতা।। তারপর ডুব দিয়েই বলতে থাকবে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে! তাই না?

দিবাকর।। তেমনি একটা মনের মত স্বপ্নের জীবন যদি আসে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারব!

লতা।। মনের মত জীবনে কি থাকে?

[*ওদের দুজনের কথাবার্তার এই মুহূর্ত থেকে আলো ক্রমশ স্বপ্নময় হবে।*]

দিবাকর।। কেবল শান্তি, ভীষণ শান্তি!

লতা।। (*ওর মুখ মধুর দেখায়*) আর সুখ, কেবল সুখ!

দিবাকর।। আমরা তখন এতো হাল্কা, যেন একটা ছোট্ট ফুল আমাদের মাথায় তুলে দুলতে পারে।

লতা।। ছোট্ট ফুল ; কিন্তু পাপড়ি হবে হাজারখানা।

দিবাকর।। গন্ধ?

লতা।। গন্ধ হবে গায়ের জামা—কেবল দুজন পরব, আর কাউকে দেব না।

দিবাকর।। যদি পালাতে চায় গন্ধ ; যদি সুখ বলে, একটু উড়াল দেব ; শান্তি যদি বলে, একটু বিদেশ ঘুরে আসি?

লতা।। তাহলে দুয়ারে বসাব রক্ষী, সে পাহারা দেবে।

দিবাকর।। যদি জানলা গলে পালায়?

লতা।। উঁচু দেওয়াল আর দেউড়িতে চারদিক থাকবে ঘেরা।

দিবাকর।। ছোট্ট ঘরটা দেয়াল-দেউড়ির বাঁধন-কষণে হাঁপিয়ে উঠবে না?

লতা।। কেন ঘরটা হবে সাতমহলা।

দিবাকর।। সাতমহলা প্রাসাদটা কে বানাবে?

লতা।। সুখ-সাগরের রাজমিস্ত্রী।

দিবাকর।। সুখের বাড়িটা যদি নড়বড়ে হয়?

লতা।। মিস্ত্রীটাকে ধমক দেব।

দিবাকর।। মিস্ত্রী যদি বলে, যেমন মজুরি তেমন বাড়ি। পাওনা বাড়াও, শক্ত মহল বানিয়ে দেব।

লতা।। দশ ঘড়া মোহর দেব, রক্তমুখী হীরা দেব।

দিবাকর।। কোথায় হীরে?

লতা।। হীরে খুঁজলে, হীরে মিলবে।

দিবাকর।। নকল রাজার নকল হীরে?

লতা।। আসল হীরে চিনতে হবে।

দিবাকর।। কে জহুরি?

[আলো ইতিমধ্যে গভীর স্বপ্নময় উঠেছে। দিবাকরের কথাটি শেষ হতেই দূর থেকে ম্যাজিসিয়ানের গলা—'জহুরি আছে'।]

দিবাকর।। কে কথা কয়?

লতা।। সেই জহুরি।

দিবাকর।। কোন জহুরি?

লতা।। যার থলেতে হিরে, মুঠোয় হীরে—খাঁটি হীরে চেনার দু'খানি চোখ তার জ্বলছে।

দিবাকর।। আমাদের দেবে কেন?

লতা।। সাতমহলা বাড়ি চাই যে, দিতেই হবে।

দিবাকর।। যাদুকরের দণ্ড দেবে?

লতা।। পেলেই হল।

দিবাকর।। কই, যাদুকর?

লতা।। ডাকতে হবে।

[ম্যাজিসিয়ান যাদু-কাঠি হাতে ঢুকে পড়ে।]

ম্যাজিসিয়ান।। ডাকতে হবে কেন? বুকের মধ্যে 'সুখ চাই গো' বলে ভাবনা জাগালেই বান্দা হাজির। কি চাই? যাদুদণ্ডে অনেক আছে। সাতমহলা বাড়ি চাই তো?

লতা।। কোথায় পাব?

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুদণ্ডে অনেক আছে। (*দিবাকরকে*) মুখ বুজে কেন—কি চাই?

দিবাকর।। শান্তি চাই।

ম্যাজিসিয়ান।। দুটি পথের মাঝের পথখানি বেছে নিয়ে পা চালিয়ে হাঁটো।

দিবাকর।। কোনদিকে যাব?

ম্যাজিসিয়ান।। যে দিকে দুচোখ যায়।

দিবাকর।। দু'চোখ যে দুই দিকে যায়।

ম্যাজিসিয়ান।। কিগো মেয়ে, দুই চোখের মালিক!—চোখের রশি আলগা কেন? দুই চোখ যে দুই দিকে যায়। সাতমহলা বাড়ির দিকে রাঙা-ভাঙা পথখানি দেখাও।

লতা।। পথখানি কই? দেখছি না তো?

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুকরের রঙিন আয়না—দুজন দুটি মুঠোয় ধর ; ইচ্ছা সুখের ছায়া পড়বে, বুকের মধ্যে গোপন পাখি ডানা মেলে বাইরে আসবে। মুঠোর মধ্যে আয়না ধর।

[দুজনের হাতে দুখানি কাল্পনিক আয়না দেয়। ওরা এমনভাবে মুঠোয় নিয়ে দেখে যেন সত্যি কোন আয়না। ওদের চোখ বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ তাকিয়ে আয়নার ভিতরে কিছু খুঁজে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করে।]

ম্যাজিসিয়ান।। মুঠোর মধ্যে রঙিন আয়না। রঙিন কাচে কিসের ছায়া?

দিবাকর।। দুটি চোখের দুটি মণি—দুই বাগানের দুইটি পাখি—উড়াল দিচ্ছে দুই আকাশে।

লতা॥ দুটি চোখের দুটি মণি—উড়ে বসছে একটি ডালে।

ম্যাজিসিয়ান॥ কেমন ডাল?

লতা॥ হীরামতি ফল ঝুলছে, চিকণ চিকণ পাতা যেন রূপোর ঝালর।

ম্যাজিসিয়ান॥ রূপোর ঝালর ঘণ্টা বাজায়?

লতা॥ ভীষণ জোরে ঘণ্টা বাজায়।

দিবাকর॥ শুনছিনা, শুনছিনা!

লতা॥ ঘণ্টা বাজছে, ভীষণ জোরে।

দিবাকর॥ (*দারুণ কষ্টে অস্থির হয়ে*) শুনছিনা, শুনছিনা!

ম্যাজিসিয়ান॥ একটু এগোও, ছুঁয়ে থাক গাছের শাখা—শুনতে পাবে।

দিবাকর॥ দুটি চোখের দুটি মণি, দুদিক যাচ্ছে—দেখছিনা, দেখছিনা!

ম্যাজিসিয়ান॥ একটু এগোও।

দিবাকর॥ দু'খানি পা দুদিকে যাচ্ছে—চলছিনা, চলছিনা!

ম্যাজিসিয়ান॥ দু'হাত মেলে বাতাস ধর—উড়ে যাবে।

দিবাকর॥ দু'খানি হাত দুদিকে যাচ্ছে—আঙুল কিছু ধরছেনা, ধরছেনা!

লতা॥ উড়াল দেওয়া হাত দু'খানা জুড়ে দিন না।

ম্যাজিসিয়ান॥ সবই প্রভুর ইচ্ছা মতন, প্রভু পারেন।

দিবাকর॥ প্রভুর রাজ্য থেকে আমি নির্বাসিত।

ম্যাজিসিয়ান॥ কেন তুমি নিয়ম ভাঙলে?

দিবাকর॥ বশ্যতা কি নিযম নাকি? গা পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়! জলের দামে আত্মা বিকোয়। পারছিনা, পারছিনা!

ম্যাজিসিয়ান॥ সুখের সাতটা মহল জুড়ে থাকতে গেলে, মানতে হবে।

দিবাকর॥ পারবনা, পারছিনা!

ম্যাজিসিয়ান॥ (*এবার সহজ গদ্যে কথা বলে*) এবার যদি নতুন ভাগ্যবিধাতা আসে, নতুন খবর নেয়? স্বপ্ন ফুরোয় না। এবার আরো বড় স্বপ্ন, এবার পাবে আরো অনেক বড় হীরে!

দুজনে॥ হীরে!

ম্যাজিসিয়ান॥ নানা রঙের আলো ঠিকরোচ্ছে—নানা বরণ সুখ উতল দিচ্ছে হীরের গায়ে।

লতা॥ কে দেবে এই হীরে?

ম্যাজিসিয়ান॥ ভাগ্যবিধাতা।

লতা॥ ভাগ্যবিধাতা যে তার বদলে অনেক চাইবে?

ম্যাজিসিয়ান॥ এবার দেবে যে অনেক বেশি। এবার ভাগ্যবিধাতা আর আগের মানুষ নয় গো, তোমাকে নিয়ে যাবে দেশান্তরে।

লতা॥ দেশান্তরে কেন? আমি কি একা থাকব? ওকি ফিরবে না?

ম্যাজিসিয়ান॥ যখন ফিরবে তখন রাজার বেশ—সাতমহলা বাড়ি ছাড়া মানাবেই না—সঙ্গে নিয়ে আসবে রাণীর মুকুট। এসব কি চাওনা নাকি?

দিবাকর॥ দেশান্তরে কি আছে?

ম্যাজিসিয়ান।। ভাগ্যবিধাতা তোমাকে আরো বড় করে গড়ে দেবে। চিকিৎসকের নামের পাশে অর্জন করে আসবে অনেক খেতাব। চিকিৎসাই তো তোমার ধর্ম—তবে কেন আরো জ্ঞান নেবে না? দীক্ষা চাইগো। রোগী নিয়ে কি সব ভাবছ—আরো বড় ভাবনা আছে। আগেতো নিজের গড়ন, মানুষ গড়া পরের কথা।

দিবাকর।। নিজের ঘরে নিজেই যদি চাপা পড়ি, সাতমহলা বাড়ি যদি মাথায় পড়ে?

ম্যাজিসিয়ান।। শক্ত করে বাড়ি বানাও।

লতা।। খিলানগুলো দেখে শুনে তবেই যাব।

ম্যাজিসিয়ান।। এবার দুজন দুটি মুঠোর আয়না দ্যাখো—রঙিন কাচে কিসের ছায়া?

লতা।। সাতমহলা বাড়ির ছায়া। ছাদের চুড়োয় রাণীর মুকুট!

দিবাকর।। দুটি দিকের দুটি চক্ষু—ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে। দু'খানি পা মিলে গিয়ে হাঁটতে চাইছে, দু'দিক থেকে দু'খানি হাত ফিরে আসছে।

ম্যাজিসিয়ান।। তাহলে ভাগ্যবিধাতার আসবার সময় হল। তৈরী হয়ে নাও। তাকাও আয়নাব দিকে, প্রভু আসছেন, ভাগ্যবিধাতা আসছেন।

[*দুজনে আয়নার দিকে তাকায়। নিচের সংলাপ ওরা আয়নার দিকে তাকিয়ে বলবে।*]

লতা।। আসছে!

দিবাকর।। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন!

[*ওদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো কমতে থাকবে।*]

লতা।। খুব চেনা-চেনা লাগছে।

দিবাকর।। এতো আমার সেই আগের প্রভু—দেখতে যে একই রকম।

ম্যাজিসিয়ান।। সব ভাগ্যবিধাতা একরকম দেখতে—কেবল ক্ষমতার তফাৎ।

লতা।। মুখে কি সুন্দর হাসি!

দিবাকর।। আমাকে যেন কি বলতে চাইছে।

লতা।। সঙ্গে দুজন কে, যেন দুটো প্রাণী? মানুষ তো নয়?

ম্যাজিসিয়ান।। মানুষ, বড় বাধ্য মানুষ।

দিবাকর।। মানুষ দুটোর গলায় কি পরানো?

ম্যাজিসিয়ান।। মালা, প্রভুর কৃপার মালা।

দিবাকর।। ওদের প্রভু যেন কি খেতে দিচ্ছেন।

লতা।। ওবা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মহানন্দে খাচ্ছে।

ম্যাজিসিয়ান।। প্রভুর দেওয়া আহার, ভাগ্যবিধাতার প্রসাদ।

[*আলো কমে কমে অন্ধকার*]

ম্যাজিসিয়ান।। (*অন্ধকারের ভিতর থেকে*) ঐ এলেন প্রভু! তাকাও, প্রভুর সাথে হেঁটে হেঁটে এগোও। দেশান্তরের পথিক হও। ঐ এলেন প্রভু!

[*মঞ্চের একটা কোণে লাল আলোর মধ্যে প্রথম দৃশ্যের প্রভু। এবার মূল্যবান স্যুটে তার ঔজ্জ্বল্য ও ঐশ্বর্য অনেক বেশি লাগছে। এক হাতে একটি*

মূল্যবান স্টিক দোলাচ্ছেন, অন্য হাতে একটা কুকুর-বাঁধা চামড়ার বকলশ। ওর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে সেই প্রথম দৃশ্যের দুজন তরুণ। প্রভুর পায়ে পোষা কুকুরের মত সুখে আলগোছে গাল ঘষছে। গলায় একটা করে চামড়ার বেল্ট মালার মত। প্রভু একখানা বিস্কুট ধরে আছেন। ওরা মুখ উঁচু করে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। প্রভু অমায়িক হাসছেন।]

প্রভু॥ (*মধুর হেসে*) এস।

দিবাকর॥ কোথায়?

প্রভু॥ দেশান্তর।

লতা॥ আপনার হাতে ওটা কি?

[প্রভু উত্তর না দিয়ে কেবল রহস্যময় হাসেন।]

দিবাকর॥ হাতে ওটা কি?

প্রভু॥ মৃতদেহ বেঁধে নেবার শেকল।

লতা॥ (*সভয়*) কার মৃতদেহ?

দিবাকর॥ মৃতদের দেখছি না, কার মৃতদেহ?

[প্রভু উত্তর না দিয়ে রহস্যময় হাসেন।]

ম্যাজিসিয়ান॥ তোমার মৃতদেহ।

লতা॥ কি বলছেন?

দিবাকর॥ আমি মরব কেন? আমি বেঁচে আছি।

ম্যাজিসিয়ান॥ নতুন করে বাঁচতে হলে, পুরনো মানুষটাকে মারতে হয়। যেসব ভুলভ্রান্তি ছিল তাকে মেরে ফেলেই না প্রভুর কৃপা লাভ।

প্রভু॥ যাদুকর, তোমার শেষ খেলা দেখাও।

ম্যাজিসিয়ান॥ (*প্রথম দৃশ্যের সেই তলোয়ার হঠাৎ বের করে*) এতো মরণ নয় গো, মরার খেলা—আচার মাত্র।

দিবাকর॥ না, না—আমি মরবনা!

লতা॥ সরিয়ে নিন, তলোয়ারটা সরিয়ে নিন।

প্রভু॥ তুমি সরে দাঁড়াও মা, সহ্য কর—এতো মরণ নয় গো, আচার মাত্র। পুরনো ভুল রক্ত নিয়ে চলতে কষ্ট হবে যে! (*মানুষ দুটোকে বিস্কুট এগিয়ে দেয়*) না হয়, একটু চোখ ঢেকে দাঁড়াও।

দিবাকর॥ না—আমি পালিয়ে যাব!

[সমস্ত ঘরে দিবাকর পিছু হটে হটে সরতে থাকে—বুকের কাছে ম্যাজিসিয়ানের তরবারি অনুসরণ করে। একবার মঞ্চটা গোলাকার ঘুরে দিবাকর চেঁচিয়ে ওঠে।]

দিবাকর॥ (*চেঁচিয়ে*) ভয়ংকর গোল চারিদিকটা, আমি কোনদিক দিয়ে পালাব? সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন!

লতা।। সরিয়ে নিন! (*কান্নায় ভেঙে*) সরিয়ে নিন!

[*ম্যাজিসিয়ান তরবারি ওর বুকে বসিয়ে দেয়। দিবাকর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ে প্রভুর পায়ের কাছে। আর্তনাদ তুলে লতা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদে।*]

প্রভু।। কান্না কেন? ডার্লিং, উঠে এস। ও আসবে—নতুন রক্তে ভরাট হয়ে ও ঠিক আসবে। উঠে এস, ডার্লিং!

[*প্রভু লতার হাত ধরে তোলে। ওর চোখ বিমূঢ়*]

প্রভু।। কাম অন্, ডার্লিং—কাম অন্!

[*প্রভু লতার শিথিল হাত ধরে মঞ্চের বাইরে চলে যায়। পিছনে তরুণ দুজন এবং ম্যাজিসিয়ান। দ্রুত ব্যস্ত দুজন সাংবাদিক প্রবেশ করে।*]

প্রথম।। (*দিবাকরকে দেখিয়ে*) দেশান্তরে যাচ্ছে—ওর বিদায়কালের ছবিটা এস তুলে নি।

[*দুজনে ছবি নেয়*]

দ্বিতীয়।। মরতে ও চায়নি।

প্রথম।। মরতে বাধাও দেয়নি।

দ্বিতীয়।। বাধা দেবার চেষ্টা করেছে।

প্রথম।। কাতরতা বাধা দেওয়া নয়।

দ্বিতীয়।। ওর শক্তি আসছিল।

প্রথম।। শক্তি আসার মুহূর্তেই মৃত্যু খড়্গ তোলে।

দ্বিতীয়।। আর একবার, আর একবার ওর বাঁচার সুযোগ আছে।

প্রথম।। এই শেষ, নিজের চেষ্টায় ওকে বাঁচতে হবে। এই শেষ।

[*দুজন মঞ্চের দুই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়।*]

প্রথম।। (*স্বগতোক্তির মত*) এই মৃত্যু আমাদের চেনা।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, পতন থেকে পতন।

দ্বিতীয়।। মৃত্যু থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে জাগরণ।

প্রথম।। পতন থেকে পতন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

[*ওরা নীরবে দু'প্রান্ত দিয়ে চলে যায়।*]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

[*এই দৃশ্যের ক্রিয়াকাণ্ড অনুযায়ী পরিচালক মঞ্চের অভ্যন্তর পরিকল্পনা করবেন। নিছক প্রয়োজনীয় আসবাব এবং অন্যান্য উপকরণের নির্দেশ নাটকের ভিতরে আছে। কেবল মঞ্চের যে কোন স্থানে একটা বড় ঘড়ি থাকবে। যাতে দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, এটা দর্শকদের*

চোখে পড়ে। ঘড়িটা ওভাবেই সময় নির্দেশ করে দীর্ঘকাল থাকবে। সূচনায় একটি সমৃদ্ধ কক্ষে দিবাকর ও লতা দুই প্রান্তে বসে আছে। দুজনেই নিজেদের মধ্যে অবলুপ্ত। এমনভাবে সংলাপ শুরু হবে—যেন কেউ কাউকে শোনাতে চাইছে না, নিজেকেই বলছে। লতা একটা ছোট উলের রঙিন জামা বুনছে।]

দিবাকর।। খোকা ফিরেছে?

লতা।। (*যেন শুনতে পায়নি*) খোকা ফিরেছে?

দুজনে।। (*একটু চেঁচিয়ে*) খোকা ফিরেছে?

[*দিবাকর চুরুট টানছে, লতা উল বুনছে। কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন। এমতাবস্থায় মুহূর্তকাল চুপচাপ। বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ। হর্ন বাজে*]

দিবাকর।। খোকা ফিরল।

লতা।। খোকা তো গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি।

দিবাকর।। পাশের বাড়িতে কেউ ফিরল।

লতা।। আমাদের পাশে তো কোন বাড়ি নেই।

দিবাকর।। কেউ পাশের পার্কে এল।

লতা।। পার্ক কোথায় দেখলে?

দিবাকর।। না, কেউ গাড়িটা পার্ক করল।

লতা।। কোথায়?

দিবাকর।। আমাদের পাশের বাড়িতে।

লতা।। আমাদের পাশে তো কোন বাড়ি নেই।

দিবাকর।। কেউ পাশের পার্কে এল।

লতা।। পার্ক কোথায় দেখলে?

দিবাকর।। না কেউ গাড়িটা পার্ক করল।

লতা।। কোথায়?

দিবাকর।। খোকা কোথায় কি করে বলব?

লতা।। খোকার জামাটা হয়ে এসেছে।

দিবাকর।। এসেছে? কোথায়?

লতা।। আর একটু বাকি।

দিবাকর।। আর কত বাকি, কতদিন হয়ে গেল!

লতা।। এইতো আর একটু!

দিবাকর।। আর কত? খোকাটা এরকম হল কেন?

লতা।। যেমন করে বুনেছি সেরকম তো হবে।

দিবাকর।। (*এই প্রথম তাকাল*) ওতো কেবল বলে, তোমার জামাটা গায়ে লাগছেই না।

লতা।। (*এই প্রথম তাকিয়ে*) আসলে তুমি এমন একটা রঙ বেছে এনেছ, ওটাই ওর অপছন্দ।

দিবাকর।। মাপ নিয়ে বুনতে হয়।

লতা।। মন বুঝে রঙ খুঁজতে হয়।

দিবাকর।। খোকার মাপ কত জান?

লতা।। দু'ফুট তিন ইঞ্চি।

দিবাকর।। তাই?

লতা।। তুমি যে দু'ফুট তিন ইঞ্চি খোকার জন্য লাল রঙের জুতো আনলে?

দিবাকর।। সেতো ছোট খোকার?

লতা।। আমাদের কটা খোকা?

দিবাকর।। ও! কে যেন বলল, দুজন।

লতা।। দু'ফুট তিন ইঞ্চি। (*ছোট উলের জামাটা তুলে দেখে। মুখে প্রসন্নতা*) ছোট্ট জামা কত মিষ্টি বল!

দিবাকর।। খোকা মিষ্টি ভালবাসে না।

[*দুজনে আবার আত্মস্থ।*]

লতা।। খোকা ফিরতে ভালবাসে না।

দিবাকর।। কতদিন হল—খোকা কি ফিরবে?

লতা।। খোকা ফিরতে ভালবাসে না।

দিবাকর।। খোকা আমাদের ভালবাসে না।

লতা।। খোকা আমাদের ভালবাসে না।

দিবাকর।। খোকা ফিরতে ভালবাসে না।

লতা।। খোকা ফিরেছে?

দিবাকর।। খোকা ফিরেছে?

দুজনে।। (*একসঙ্গে, একটু চেঁচিয়ে*) খোকা ফিরেছে? খোকা! খোকা!

[*ফোন বেজে ওঠে। শব্দ করে বাজতে থাকে। দিবাকর ফোনের কাছে যায়। ফোনটা তোলে।*]

দিবাকর।। খবর পেলেন? কতদিন তো হল—খোকা কি ফিরবে না?

[*লতা কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।*]

লতা।। (*ফোন ছাড়াই বলে*) কতদিন তো হল—খোকা কি ফিরবে না?

[*দিবাকর ফোন রেখে দেয়*]

দিবাকর।। (*টেবিলে একটা প্যাকেট দেখিয়ে*) ওর জন্য নতুন একটা নরম বালিশ এনেছি, বিছানায় পেতে রাখ—এসে দেখেই বেশ খুশি হবে।

[*লতা প্যাকেটটা খোলে। একটা বাচ্চা ছেলের মাপে খুব ছোট্ট বালিশ।*]

লতা।। (*বেশ খুশি*) সত্যি এই রঙটা ওর ঠিক পছন্দ হবে। (*হঠাৎ কি মনে করে*) এই যা! ওর প্যান্টটাতো লণ্ড্রি পাঠানো হল না। সেই থেকে এখানে ফেলে রেখেছি। (*একটা বয়স্ক ছেলের প্যান্ট মেঝে থেকে তুলে ধরে*) এটা এক্ষুণি পাঠিয়ে দিতে হবে! যা জেদি ছেলে না তোমার, অন্যটা হলে চলবে না—এটা পরেই ওর কলেজ যাওয়া চাই!

দিবাকর।। বালিশটা বড় সুন্দর হয়েছে, তাই না?

লতা।। ছোট্ট মাথাটা দিয়ে ঘুমোলে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে দেখব! যাবে?

দিবাকর।। ওর ঘরে ঢুকলে যদি পায়ের শব্দে জেগে ওঠে, জানলা দিয়ে লুকিয়ে তাকাব।

লতা।। ঠিক বলেছ। দাঁড়াও, প্যাণ্টটা লণ্ড্রিতে দেবার বন্দোবস্ত করে আসি।

[*লতা চলে যায়। দুজন ব্যস্ত সাংবাদিক প্রবেশ করে। দিবাকরের ছবি নেয়।*]

দিবাকর।। আপনারা?

প্রথম।। সাংবাদিক।

দ্বিতীয়।। আপনার ছেলের জন্মদিনে আপনার ছবি নিতে এসেছি।

দিবাকর।। বরঞ্চ খোকার ছবিটাই ওর জন্মদিনে নেওয়া ভাল দেখায়।

প্রথম।। খোকা কোথায়?

দিবাকর।। খোকার জন্যই তো বসে আছি।

দ্বিতীয়।। খোকা কোথায়?

দিবাকর।। (*বিষণ্ণ*) হয়ত খোকা আর ফিরবে না! জানতাম, ও ফিরবে না!

প্রথম।। খোকা কোথায় গেল?

দিবাকর।। জানি না—তবে আমাদের কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে।

দ্বিতীয়।। কতদিন হল ও চলে গেছে?

দিবাকর।। জানি না—একটু একটু করে কখন চলে গেছে। একটু একটু করে রং উঠে যেতে যেতে শাদা কাগজটা ফেলে রেখে যেমন একটা ছবি পালিয়ে যায়, তেমনি।

প্রথম।। বাধা দেননি কেন?

দিবাকর।। উপায় ছিল না—উঠোন ছেড়ে যখন রোদটা একটু একটু করে সরে যায়, সেকি বেঁধে ধরে রাখা যায়!

দ্বিতীয়।। কেন পালাল?

দিবাকর।। জানিনা, বোঁটা থেকে ফুল কেন পাপড়ি আলগা করে উড়াল দেয়, জানি না।

প্রথম।। কিন্তু আপনারাই দায়ী।

দ্বিতীয়।। আপনাদের রক্তে ওর জন্ম—সেই রক্ত ওর পছন্দ নয়।

প্রথম।। সেই অপরিষ্কার রক্ত ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করার লোভে হয়ত কোথাও দূরে পালিয়েছে।

দিবাকর।। আমার রক্ত আমি দেখতে পাই না, কোথাও কেটে না গেলে দেখতে পাই না!

দ্বিতীয়।। কোথাও ক্ষত নেই আপনার?

দিবাকর।। আছে, আছে, বিশাল ক্ষত! চুপ। লতা শুনতে পাবে! আমরা কাউকে বলি না —ভীষণ দুরারোগ্য ক্ষত আমরা লুকিয়ে রাখি—বলি না।

প্রথম।। সেই ক্ষতস্থান দেখান, আমরা তার ছবি নেব। (*দ্বিতীয়কে*) রেডি?

দ্বিতীয়।। (*ক্যামেরা প্রস্তুত করে*) রেডি।

প্রথম॥ ক্ষতস্থান দেখান—তার ভেতর থেকে গড়ানো রক্তের ছবি নেব।

দ্বিতীয়॥ ওর রং কেমন, কি তার ভাষা—সব সংবাদ চাই আমাদের। দেখান।

দিবাকর॥ (*বুক চেপে ধরে চিৎকার করে*) না!

প্রথম॥ দেখান।

দিবাকর॥ (*বুক চেপে পিছোতে পিছোতে*) না! আমি একজন ভদ্রলোক, একজন প্রতিষ্ঠিত লোক—আমাকে এভাবে নগ্ন হতে বলবেন না। আমার বুক মোটা কাপড়ে জড়িয়ে ঢাকা—দয়া করে খুলতে বলবেন না। রক্তের মত নগ্ন, উলঙ্গ কিছু নেই। আপনারা ছবি নেবেন না! দয়া করে যেমন আছি, তেমনি থাকতে দিন। আমাকে বাঁচান!

দ্বিতীয়॥ আপনার ঐ ক্ষতস্থানের মলিন রক্তের দুর্গন্ধে আপনার খোকা পালিয়েছে।

প্রথম॥ ওকে ঘরছাড়া করতে বাধ্য করেছেন।

দ্বিতীয়॥ আপনি অপরাধী!

প্রথম॥ আপনি ঘাতক।

দিবাকর॥ (*বিপর্যস্ত*) না, না, বিশ্বাস করুন—বুকের এখানটায় দুবার ভয়ানক জোরে একটা অস্ত্র আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি—বিকট ঘা হয়ে আছে, পৃথিবীতে এতো রৌদ্র, সেই ভেজা গলিত ক্ষত কিছুতেই শুকোচ্ছে না, আমি কী করব! আমি লুকিয়ে রাখি, লতা লুকিয়ে রাখে—খোকা দেখতে পায়নি, ও জানে না।

দ্বিতীয়॥ জানে। সমস্ত ঘরে ঐ গলিত ক্ষতের দুর্গন্ধ!

প্রথম॥ ঘরের বাতাসে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝুলে আছে।

দ্বিতীয়॥ আপনার ব্যাধিগ্রস্ত আঙুলে ওকে জড়িয়ে আদর করেছেন।

প্রথম॥ আপনার নিজের পৃথিবীতে ওকে জোর করে টেনে আনতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়॥ ওর সমস্ত শরীরে নিষ্ঠুর দড়ি দিয়ে বেঁধে টানার অসংখ্য দাগ আছে।

দিবাকর॥ কিন্তু ও তো নিজের পথেই হাঁটছে।

প্রথম॥ আপনাব দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে তবে হাঁটছে। কিন্তু বেঁধে রাখার কাটা দাগগুলো ওকে দীর্ঘদিন কষ্টে পাগল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়॥ ও যখন ঘুমিয়েছে--আপান আর আপনার স্ত্রী ওর আত্মা নীলাম ডেকে বেচে দিতে চেয়েছেন।

প্রথম॥ ভীষণ হাতুড়ির শব্দে ওর বারবার ঘুম ভেঙে যেত।

দ্বিতীয়॥ দর কষাকষির শব্দে ওর কান বধির হয়ে আসছিল।

দিবাকর॥ কিন্তু সেতো ওর উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য। সেকি পাপ?

প্রথম॥ আপনার মঙ্গল, ওর মঙ্গল নয়।

দিবাকর॥ কিন্তু ও আমার সন্তান—আমার রক্ত, ওর রক্ত।

দ্বিতীয়॥ ওর বুকের দোলার সঙ্গে আপনার রক্তের মিল নেই।

প্রথম॥ আপনার বক্ত গলিত গন্ধের মত বাতাসে ঝুলছে।

দ্বিতীয়॥ আপনার রক্তে সমস্ত ঘর দুর্গন্ধ।

প্রথম॥ আপনি আর কোনক্রমে এখন ওর পিতা নন।

দিবাকর॥ কি বলছেন আপনারা।—খোকা আমাব ছেলে, আমার!

দ্বিতীয়॥ আপনি আপনার ছেলেকে চেনেন না।

দিবাকর।। চিনি। আমার কাছে এনে দাঁড় করান, আমি দেখা মাত্র চিনব।

প্রথম।। দৃষ্টিশক্তি দিয়ে চেনা যায় না।

দ্বিতীয়।। আপনার কাছে থাকতে চাইলেই, ও আপনার ছেলে। ও থাকেনি কেন?

দিবাকর।। (*অবসন্ন*) জানি না। কিন্তু ও চলে গেছে বলে আমার কষ্ট হয়—ভীষণ কষ্ট। ঘড়ির কাঁটায় এক একটা মিনিট এগুচ্ছে, আর আমার ভিতরটা যেন ওর জন্য কাঁপছে। সময়টা যেন আমাকে কামড়ে দাঁত ফুটিয়ে ঘড়ির কাঁটায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আমার বুকের মধ্যে ঘড়ির কাঁটাটা ফুটে গিয়ে টিক্‌টিক শব্দ করছে। খোকা না এলে, এই সময়, সময়ের ধারালো দাঁতে আমি ছিঁড়ে যাব। আমি ওকে ভালবাসি, ওর মায়ের মত ভালবাসি।

প্রথম।। ভালবাসলে খোকা ফিরবে।

দিবাকর।। ফিরবে!

প্রথম।। ভালবাসা ভুল না হলে ফিরবে।

দ্বিতীয়।। ভালবাসা সংস্কার না হলে ফিরবে।

প্রথম।। ভালবাসা অভ্যাস না হলে ফিরবে।

দ্বিতীয়।। ভালবাসা ভুল আবেগ না হলে ফিরবে।

দিবাকর।। (*উত্তেজিত*) কখন? কখন ফিরবে খোকা?

দ্বিতীয়।। কিন্তু আপনার চোখ ক্লান্ত!

প্রথম।। আপনি নুয়ে পড়ছেন।

দিবাকর।। খোকাকে দেখে যেতে পারব?

দ্বিতীয়।। তাহলে আপনি জানেন, মৃত্যু আসছে।

দিবাকর।। না, আমি জানতে চাই না।

প্রথম।। কিন্তু মৃত্যু আসতে চায়, চাইছে।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই সেই তৃতীয় মৃত্যু, নিজেকে বাঁচাতে হবে—আর সুযোগ নেই—শেষ বাঁচা।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

[*ওরা দু'জন মঞ্চের সম্মুখভাগে আসে।*]

প্রথম।। মৃত্যু প্রস্তুত।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। এই মৃত্যুর নাম, বিনাশ।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব।

[*দুজন দুইপ্রান্ত দিয়ে মৌনভাবে মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকে চলে যায়।*]

দিবাকর।। খোকা, লতা!—সবাই টের পেয়ে গেছে! (*সেই প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের তরুণ ছেলেদুটি প্রবেশ করে। ছিম্‌ছাম্ প্যান্ট-শার্টে বেশ মার্জিত দর্শন। ওদের হাতে স্টেথোস্‌কোপ।*)

প্রথম।। স্যার, কাল আপনাকে রিসেপশন দেয়া হবে, মনে করিয়ে দিতে এলাম।

দিবাকর।। মনে আছে। আজ হলে ভাল হত—কালকে...কালকে কোথায় থাকব!

কালকে ও সময়টায় কোন কাজ রাখবেন না।

প্রথম।। স্যার, আপনার অ্যাডভাইসে সেই কমপ্লেক্স কেসটায় চমৎকার ফল পেয়েছি স্যার।

দিবাকর।। থ্যাঙ্কিউ।

দ্বিতীয়।। স্যার, আমার সেই ফরেন ট্রেনিং-এর ব্যাপারটা...আপনাকে বিরক্ত করছি, স্যার। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আপনি স্যার একটু রেকমেণ্ড করলেই—

দিবাকর।। মনে আছে।

প্রথম।। আমি স্যার, পাসপোর্ট পেয়ে গেছি। ওখানকার হসপিটালে ডেট্ জানিয়ে দিয়েছি।

দিবাকর।। উইশ ইওর সাকসেস।

প্রথম।। আপনার পায়ের ধুলোতেই স্যার হল, আপনার আশীর্বাদেই সব হবে।

দিবাকর।। তোমরা ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরছিলে?

দ্বিতীয়।। ঠিক আছে, আপনাকে আর ডিসটার্ব করবনা—আমরা যাচ্ছি।

প্রথম।। কালকের ব্যাপারটা যেন ভুলবেন না, স্যার—আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

দিবাকর।। (*অন্যমনস্কভাবে*) কাল? কোথায় আসবে! আচ্ছা—এস একবার।

দ্বিতীয়।। তাহলে চলি, স্যার।

[*দুজনে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। দিবাকর ওদের মাথায় হাত রাখে। দৃষ্টি অন্যমনস্ক—যেন বহুদূরে কিছু দেখছে। ওরা চলে যায়। ঘরের আলো রহস্যময় হয়ে ওঠে। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত দিবাকর ফোনটা তোলে, ডায়াল না করেই কানের কাছে তোলে। কিছু শুনতে পায়, মুখটা ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। শুনতে থাকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকে —'লতা! লতা!' লতা প্রায় ছুটে আসে।*]

লতা।। কি হল!

[*আস্তে আস্তে দিবাকর ফোনটা রাখে। নিঃশব্দে এসে চেয়ারে বসে।*]

লতা।। কি হল বল না?

[*হঠাৎ ব্যস্তভাবে ফোনটার কাছে দিবাকর দৌড়ে আসে। ডায়াল করে। লতা বিমূঢ়ের মত ওকে লক্ষ করে।*]

দিবাকর।। (*ফোনটা তুলে*) হ্যালো, পুলিশ স্টেশন! না-না দেরী করা সম্ভব নয়, যে কোন অফিসারকে ডেকে দিন। হ্যালো, হ্যালো...শুনতে পাচ্ছেন...কি আশ্চর্য! লাইনটা কেটে গেল কি করে!

লতা।। কি হয়েছে বল না? এরকম পাগলের মত করছ কেন? খোকা...

[*দিবাকর হাতে তুলে ওকে থামতে বলে। আবার ডায়াল করে।*]

দিবাকর।। (*ফোনটা তুলে*) হ্যালো, পুলিশ স্টেশন? হ্যাঁ, শুনুন, ভয়ানক জরুরি—শুনছেন? কি আশ্চর্য! আবার লাইনটা কেটে গেল! বুঝলে লতা, কেউ টের পেয়েছে, আমি ফোন করছি...কিন্তু আমাকে খবরটা দিতেই হবে।

[*ফোনটা রেখে ভাবতে থাকে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। দ্রুত ধরে দিবাকর।*]

দিবাকর।। হ্যালো, হ্যাঁ—আমি, ড. দিবাকর রায় বলছি। কিন্তু কেন? আমাকে থানায় জানাতেই হবে ; এটা, এটা একটা স্যোশাল রেসপন্‌সিবিলিটি, আমাকে নিষেধ করবেন না। কি আশ্চর্য! আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? কিন্তু...কিন্তু...আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ভাবছি। (*ঘড়ির দিকে তাকিয়ে*) কিন্তু আর যে সময় নেই! ঠিক আছে, আপাতত রেখে দিচ্ছি!

[*ফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল কিছু ভাবে। চকিতে ঘড়িটার দিকে তাকায়*]

দিবাকর।। সর্বনাশ! আর মোটে পাঁচ মিনিট বাকি দশটা বাজতে!

লতা।। কি হয়েছে বলবে তো!

দিবাকর।। লতা, ঠিক দশটা বাজলেই একটা খুন হবে।

লতা।। খুন হবে?

দিবাকর।। হ্যাঁ, আমি একটা দরকারে ফোনটা তুলতেই ফোনের ভিতর দু'দিক থেকে কতগুলো রহস্যময় কথা চলছে শুনলাম। একটা খুনের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল। খুনটা হবে আজ, ঠিক দশটায়।

লতা।। কে? কে খুন হবে?

দিবাকর।। চিনি না।

লতা।। চেন না—তুমি তার কি করতে পার?

দিবাকর।। শুনে ফেলেছি—আমার একটা দায়িত্ব নেই? থানায় খবর দেওয়া দরকার।

লতা।। থানায় তো ফোন করছিলে।

দিবাকর।। যতবার ফোন করছি, ততবার কে লাইনটা কেটে দিচ্ছে।

লতা।। গাড়িটা নিয়ে থানায় চলে যাও। কাছেই তো!

দিবাকর।। ঠিক দশটায় খুন হবে। মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

লতা।। চল, আমরা পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যেতে পারব।

দিবাকর।। কিন্তু ওদের বেরুতে বেরুতে সময় পেরিয়ে যাবে। কোন লাভ নেই! তাছাড়া এইমাত্র এসব ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমাকে কে যেন নিষেধ করল —আমাকে ভয় দেখাল। (*বসে পড়ে*) আশ্চর্য! আমরা জানি, একটা খুন হতে চলেছে, অথচ আমরা কিছু করতে পারছি না। এতো খারাপ লাগছে!

লতা।। বড়দাকে একটা ফোন করব?

দিবাকর।। কোন লাভ নেই। সময় নেই।

লতা।। কোথায়? খুনটা হবে কোথায়?

দিবাকর।। বাড়িটা লাল রঙের।

লতা।। কোন রাস্তায়?

দিবাকর।। ওরা বলেনি, তবে বাড়িটার পাশে একটা ভাঙা রেলওয়ে ব্রিজ আছে।

লতা।।(*ভীত ও ব্যগ্র গলায়*) আর?

দিবাকর।। বাড়ির সামনে একটা গ্যাসপোস্ট।

লতা।। আমাদের বাড়ির সামনেইতো একটা গ্যাসপোস্ট আছে।

দিবাকর।। (*ভীত*) আমাদের বাড়ির রঙ?

লতা।। লাল। জানলা দিয়ে ভাঙা ব্রিজটা দেখা যায়। বাড়িটার কোন তলায় খুন হবে?

দিবাকর।। চারতলায়।

লতা।। *(ভয়ে ভেঙে পড়ে)* আমরা চারতলায় রয়েছি। চারতলার কোন ঘরে?

দিবাকর।। বলল মাঝের ঘরে।

লতা।। তাহলে...তাহলে কে খুন হচ্ছে?

দিবাকর।। একজন প্রৌঢ়।

লতা।। *(দিবাকরকে দেখে, প্রায় অবসন্ন গলায়)* না, না হতে পারে না!

দিবাকর।। জামাটা খুলে দেখ, সেই লোকটির পিঠে একটা লাল জড়ুল আছে।

লতা।। না তুমি জামাটা খুলবে না। জামা খুলবে না তুমি।

[*লতা কান্নায় ভেঙে পড়ে*]

দিবাকর।। *(বিষণ্ণ হেসে)* আর কিছু করার নেই, লতা। উদ্ধার নেই—অসম্ভব।

লতা।। *(মুখটা তুলে)* চল, এক্ষুণি আমরা এখান থেকে পালাই।

দিবাকর।। কোথায়?

লতা।। যে কোন কোথাও। চল, এখান থেকে চল, এখান থেকে চল, এক্ষুণি। আর সময় নেই ; চল, চল!

দিবাকর।। আর সময় নেই, লতা।

লতা।। আছে, আছে তুমি চ-লো। *(দিবাকরের হাত ধরে টেনে)* চ-লো।

[*ফোনটা বেজে ওঠে। দিবাকর বিপর্যস্ত ভাবে ফোনটা ধরে। শুনতে থাকে। শব্দ করে রেখে দেয়।*]

দিবাকর।। লতা আমাদের আর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

লতা।। কেন?

দিবাকর।। ওরা এই বাড়িতেই আছে। আমাদের উপর লক্ষ রাখছে। বাইরে বেরুতে গেলেও নিস্তার নেই। লোকটা ক্রমশ এই ঘরের দিকে এগুচ্ছে।

[*ঘরের আলোটা কিছু কমে আসে।*]

লতা।। আমার ভয় করছে। আমরা কোথায় যাব!

দিবাকর।। লতা, তুমি এ-ঘর থেকে চলে যাও। তুমি সহ্য করতে পারবে না, তুমি ভিতরে যাও।

লতা।। না, আমি যাব না।

দিবাকর।। আর সময় নেই, তুমি যাও। আমি, আমি একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। লতা, আমার সমস্ত শরীরটা যেন একটা শেষ আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার ভয় কমে যাচ্ছে। যেন একটা পাওনা হাত পেতে নিতে যাচ্ছি। আমার নিস্তার নেই। তুমি যাও।

লতা।। না ; আমরা দুজনে থাকব।

দিবাকর।। আর খোকা!

লতা।। আমাদের ভাগ্য, খোকা আমাদের কাছে নেই।

দিবাকর।। খোকাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল। তুমি বলে দিও।

লতা।। তুমি না থাকলে, আমি থাকব ভেবেছ!

দিবাকর।। খোকা আছে, তোমাকে থাকতে হবে।

লতা।। চারদিকটা কেমন অন্ধকার লাগছে!

দিবাকর।। (*কান পেতে শুনে*) একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

লতা।। আমি শুনতে চাই না।

দিবাকর।। এই অন্ধকার আমি চিনি, লতা! দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটা ভয়ংকর ফাঁসের মত এই অন্ধকার গলা জড়িয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে আনে। এই অন্ধকার মুঠো করে ধরা যায়, হাতের রেখাগুলো ছারখার করে তখন পোড়াতে থাকে, চোখের মণিতে লেগে দৃষ্টি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়--এই অন্ধকার হাতে পায়ে নিঃশ্বাসে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার ভয় হয়।

[*দিবাকবের কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বাড়তে থাকে।*]

লতা।। (*প্রায় চিৎকার করে*) কি অন্ধকার! আমি তোমাকে ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না!

দিবাকর।। কিন্তু অন্ধকারে পায়ের শব্দ শোনা যায়, আমি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

লতা।। খোকা! খোকা এলে আমি কি বলব?

দিবাকর।। খোকা বুঝবে। সব বুঝবে।

লতা।। কিন্তু আমি যে কিছু বুঝব না!

দিবাকর।। খোকা বোঝাবে।

লতা।। আমি সব কিছু বুঝতে পারি না, চাই না।

[*কড়া নড়ে ওঠে। দুজনে চমকে ওদিকে তাকায়।*]

লতা।। চুপ কর, আমি দরজা বন্ধ করে দেব।

দিবাকর।। আমরা আগে থেকে বন্ধ রাখতে ভুলে গেছি। দরজার দিকে এগুলেই হয়ত আরো রেগে ওরা তোমাকেও রেহাই দেবে না।

লতা।। তাহলেও আমি দরজা বন্ধ করতে যাব।

[*লতা দরজার দিকে সাবধানে এগোতেই দরজাটা খুলে যায়। কাউকে দেখা যায় না। লতা পিছিয়ে গিয়ে দিবাকরকে আড়াল করে দাঁড়ায়। দরজা দিয়ে একটা বন্দুকের নল কেবল একটু একটু করে ঘরে ঢুকে স্থির হয়ে থাকে। ভয়ানক স্তব্ধতা।*]

নেপথ্য কণ্ঠ।। আপনারা সরে দাঁড়ান! হাত তুলে দুদিকে সরে যান!

দিবাকর।। (*নিজে হাত তোলে*) লতা, সরে দাঁড়াও।

লতা।। (*আকুল কণ্ঠে*) না, আমি সরব না।

নেপথ্য কণ্ঠ।। শেষবার বলছি, সরে দাঁড়ান!

দিবাকর।। (*আদেশের গলায়*) লতা! বলছি, সরে দাঁড়াও। আমার শেষ অনুরোধ, সরে দাঁড়াও।

[*দিবাকর লতাকে প্রায় জোর করে পিছনে ঠেলে সামনের দিকে আসে। লতা বসে পড়ে প্রচণ্ড কেঁদে ওঠে। দিবাকরের মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে*]

দিবাকর।। আমি প্রস্তুত।

নেপথ্য কণ্ঠ।। আমিও প্রস্তুত। কোন শেষ বাসনা আছে?

দিবাকর।। খোকা, একবার খোকাকে দেখতে চাই।

[*বন্দুক ওদের দিকে নির্দেশ করে একজন তরুণ ছেলে ঘরে ঢোকে। চরিত্রটিকে পূর্বে দেখা যায়নি। ওর মুখ গম্ভীর। ধীর পায়ে এগোয়। দিবাকর এবং লতা মুহূর্তকাল বিমূঢ়ের মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।*]

লতা।। খোকা! দেখছ, আমাদের খোকা!

দিবাকর।। ওর ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।

লতা।। খোকা বন্দুকটা সরিয়ে নে খোকা, খোকা! খোকা!

খোকা।। কেউ একপা'ও নড়বেনা।

লতা।। তুই আমাদের ছেলে খোকা, আমি তোর মা, (*দিবাকরকে দেখিয়ে*) তোর বাবা। কি হয়েছে তোর? এরকম করছিস কেন? কি করেছি আমরা—কি হয়েছে তোর বল?

খোকা।। ক্ষিধে পেয়েছে।

লতা।। ক্ষিধে পেয়েছে?

খোকা।। দশটায় খেয়ে বেরিয়েছি, ক্ষিধে পেয়েছে। খেতে দাও। (*বলেই হো হো করে হেসে ওঠে। বন্দুকটা চেয়ারের উপর রেখে দেয়)* দুজন বুড়োবুড়ি, এত ভিতু না তোমরা। আমার হাতে বন্দুক দেখলেও এতো ভয়।

দিবাকর।। কোথায় পেলি বন্দুক?

লতা।। এরকম কেউ ভয় দেখায়, হতচ্ছাড়া ছেলে!

দিবাকর।। বন্দুক কোথায় পেলে?

খোকা।। রাজেন কাকাকে লাইসেন্স রিনিউ করতে দিয়েছিলে না, উনি আসছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হতে দিয়ে দিলেন। পরে আসবেন। ভাবলুম বন্দুকটা নিয়ে মজা করি। এতটা ভয় পাবে ভাবিনি।

লতা।। যাক্‌গে, কি ফাঁড়াটাই না কেটেছে!

[*দিবাকর ঘড়িটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। খোকাও ওদিকে তাকায়। লতাও।*]

লতা।। দশটা বাজতে এখনো যে বাকি আছে! (*সভয়*) দেখেছ, এখনও দশটা বাজেনি।

খোকা।। (*নিজের ঘড়িটা দেখে*) দশটা কাল বাজবে! একটা অচল ঘড়ি ঘরে টাঙিয়ে রাখলে ঐ হয়। এখন পুরো সাড়ে দশটা!

দিবাকর।। সাড়ে দশ!

লতা।। তোর ঘড়ি ঠিক চলছে?

খোকা।। একদম ঠিক।

[*এগিয়ে গিয়ে ঘড়িটা মিলিয়ে চালিয়ে দেয়।*]

লতা।। আর কোন ভয় নেই।

খোকা।। কিসের ভয়?

দিবাকর।। ঘড়িটা বন্ধ ছিল বলে—মানে, তুই কি কোন ফোন করেছিলি?

খোকা।। না।

লতা।। মজা করার জন্য নিশ্চয়ই ফোনে ভয় দেখাচ্ছিলি?

খোকা।। না না, কোথায় ফোন করলুম।

দিবাকর।। দশটা বেজেছে। লতা, ওকে খেতে দাও। বন্ধ ঘড়িটাকে আমরা আর বিশ্বাস করব না।

লতা।। এবার থেকে খোকার ঘড়িটার সঙ্গে রোজ মিলিয়ে চালিও তো। এখন এত ভাল লাগছে। তোমার?

দিবাকর।। খোকাও ফিরল।

খোকা।। এমন ভাবে কথা বলছ, যেন আমি দশ বছর পরে বাড়ি ফিরলাম। এক এক সময় তোমরা এমন কর! কলেজেও কি যাব না? তোমাদের তো বলেই গেলুম। কলেজ থেকে ফিরে আমাদের একটা মিটিং আছে—ওসব চুকিয়ে ফিরব।

দিবাকর।। মিটিং-এর কথা তুমি আমাকে বলনি।

খোকা।। তুমি একঘন্টা ধরে আমাকে উপদেশ দিয়ে কলেজটা লেট করাবে বলেই বলিনি।

দিবাকর।। এবার থেকে বোলো, লেট হবে না।

খোকা।। বেশ লিবারাল হয়ে পড়ছ কিন্তু বাবা?

লতা।। নাও আর কোন তর্ক নয়, সোজা হাত মুখ ধুয়ে নাও গিয়ে। এক্ষুণি খেয়ে নেবে। বাইরে কিছু খেলেই তো পারতিস। দেখেছ, মুখটা শুকিয়ে কতোটুকু হয়ে গেছে!

দিবাকর।। খায়নি কি আর—চা কফির সমুদ্দর গিলে ফিরছে। হ্যাঁ শোন—ঐ মেয়েটির যেন কি নাম?

লতা।। মিনু, (*ছেলের দিকে সকৌতুক হেসে*) কিরে মিনু তো?

দিবাকর।। এক্ষুণি ফোন করে দাও। কাল্ ঘুম ভেঙে উঠলেই চলে আসবে।

খোকা।। কোথায়?

দিবাকর।। এ-বাড়িতে। এখানে খাবে।

খোকা।। হঠাৎ!

দিবাকর।। কাল আমার জন্মদিন।

খোকা।। হ্যাঁ! তোমার জন্মদিন যেন আমি জানি না?

দিবাকর।। ঐ একটা উপলক্ষ ভাবা গেল আরকি, এক্ষুণি ফোন করে দাও। ও খাবে ব্যস্। যাও।

খোকা।। (*যেতে যেতে*) তাই বলে মিনুকে যেন সত্যি সত্যি বোলনা, তোমার জন্মদিন, ও ঠিক তারিখটা কিন্তু জানে।

দিবাকর।। ঠিক আছে, তাহলে বোলো, স্বাধীনতা দিবস।

খোকা।। স্বাধীনতা দিবস!

দিবাকর।। হ্যাঁ, তোমার স্বাধীনতা দিবস।

লতা।। বকবক না করে, ওকে হাত মুখটা ধুতে দেবে না কি!

খোকা।। হাত মুখ ধোব কি—বাবা যেরকম হু'হু' করে উদার হয়ে যাচ্ছেন। ঘুমটা হলে হয়!

লতা।। তুই যাতো! খাবার তৈরী আছে—তোর হয়ে গেলেই ডাকবি। যা।

[*খোকা চলে যায়।*]

লতা।। দেখলে, খোকা কেমন বাঁচিয়ে দিল আমাদের।

দিবাকর।। শাস্ত্রে বলে, সন্তানই পিতার মুক্তি,—জীবিতকালে রক্ষা করে, মৃতদেহে মুখাগ্নি করে দেহকে বিশুদ্ধ করে, পিণ্ডদান করে আবদ্ধ আত্মাকে মুক্তি দেয়। ইহকাল পরকাল—সন্তানই পথ দেখায়। ও ওর কাজ করেছে।

লতা।। খোকা আসছে জেনেই না—ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল, কিছুতেই দশটা বাজতে দেয়নি।

দিবাকর।। ঘড়িটা বন্ধ, খোকাই কিন্তু প্রথম বুঝল।

লতা।। খোকা থাকতে আমরা এভাবে মরতে পারি? কে মারে আমাদের!

দিবাকর।। কালকে মিনুকে বেশ ভাল করে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াও। শোন, চালতের ডাল করবে—ওটা তুমি দারুণ রাধতে।

লতা।। একটা কচি লাউ এনো তো। নিজে বাজারে যাবে—সঙ্গে চিংড়ি মাছ আনবে। ভাবছিলাম লাউ চিংড়ি করব।

দিবাকর।। মাছের মাথা দিয়ে সোনামুগের ডাল কর না।

লতা।। ভাল বেসন আনবে, সঙ্গে বেগুন ভাজব।

দিবাকর।। কেন বড়িভাজা!

লতা।। খোকা বড়ি ভাজা ভীষণ ভালবাসে। ভাল দেখে আনবে। মাসকলাই ডালেব বড়ি আনবে—বেশ নরম আর ধবধবে।

দিবাকর।। আচ্ছা, এখানে ঢেঁকির শাক পাওয়া যায়, দেশে খেতাম।

লতা।। খুঁজে দেখ, পেয়ে যাবে। আবার বুড়ো বুড়ো শাক এনোনা—ডগাটা ভেঙে দেখবে, কচি কিনা।

দিবাকর।। একটু পিঠে করনা, পাটিসাপ্টা—আজ রাত্রে আতপ চাল ভিজিয়ে রাখো।

লতা।। তোমাকে আর রান্না শেখাতে হবে না। বেঁচে উঠে লোভে একেবারে জিভ ভিজিয়ে তুলছ।

দিবাকর।। খোকাতো এসব বেশি খায়না বলেই—

লতা।। নিজের লোভটাও কিন্তু তোমার খুব ঢাকা থাকছে না।

দিবাকর।। আসলে বেশ লাগছে, বুঝলে? গান করব?

লতা।। তাহলেই হয়েছে! আমাকে না আবার নাচতে বল!

দিবাকর।। দাওনা নেচে।

[*দুজনে হেসে ওঠে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা রঙিন হতে থাকে। ওদের পিছনে ম্যাজিসিয়ান এসে দাঁড়ায়। ওরা দেখতে পায় না।*]

ম্যাজিসিয়ান।। (*পিছন থেকে*) সাতমহলা বাড়ির মানুষ দুটো যে সোনালি রূপোলি ঢেউ তুলে হাসছে।

[*লতা আর দিবাকর দুজনেই ফিরে তাকায়*]

লতা।। কাল আপনার নেমন্তন্ন।

ম্যাজিসিয়ান।। কোথায়?

দিবাকর।। এই ঘরে।

ম্যাজিসিয়ান।। রূপোর থালায়, না সোনার থালায়?

লতা।। জলে-ধোয়া মিষ্টি সবুজ কলার পাতায়।

ম্যাজিসিয়ান।। ষোল ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেবার জন্য ষোল বাটি পাশে থাকবে?

দিবাকর।। কলার পাতায় সবই ধরে।

লতা।। (*এগিয়ে গিয়ে*) বড়ি ভাজা, লাউ চিংড়ি!

দিবারক।। (*এগিয়ে গিয়ে বালকের মত*) ঢেঁকির শাক আর বেগুন ভাজা।

লতা।। সোনামুগের ডালে থাকবে মাছের মাথা।

দিবাকর।। সবার শেষে পাটিসাপ্টা!

লতা।। কালকে আসুন।

দিবাকর।। সাতমহলা বাড়ির থেকে কলাপাতায় অনেক স্বাদ!

লতা।। সোনার থামে হিরের জরি!—অনেক ভাল ডালের বড়ি। কালকে আসুন।

ম্যাজিসিয়ান।। (*মুখ অন্যমনস্ক*) আমার যে ভাই অনেক কাজ।

দিবাকর।। তলোয়ারটা রেখে আসবেন—নতুন নতুন মানুষ থাকবে, ওরা ওসব দেখতে চায় না।

লতা।। যাদুদণ্ডটাকে রাখবেন থলের মধ্যে।

দিবাকর।। উঠোনটাতে যেটুকু মাটি, ভাল করে কুপিয়ে দেব।

লতা।। যাদুদণ্ডে নাড়া দিয়ে একটি রাঙা ফুল ফোটাবেন।

দিবাকর।। চারদিকে তার সবুজ পাতা।

লতা।। কালকে আসুন।

ম্যাজিসিয়ান।। (*চিন্তিত মুখ*) আমার যে ভাই অনেক কাজ। যেতে হচ্ছে।

লতা।। কালকে একটু সময় করুন।

ম্যাজিসিয়ান।। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি—সবই দেখি ওলট-পালট্। ভাবতে হচ্ছে। বাইরে আছি। একটু বাদে বলে যাচ্ছি।

[*ম্যাজিসিয়ান যে-দিক দিয়ে খোকা ঘরের ভিতর গেছে সেদিক দিয়ে চলে যেতে থাকে।*]

লতা।। ওদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

দিবাকর।। ও-ঘরে তো খোকা থাকে।

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুদণ্ডে অনেক আছে, খোকা কিছু চাইতে পারে।

লতা।। না না, খোকা নিজের মত নিজে আছে, ওর কাছে যাবেন কেন?

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুদণ্ডে অনেক আছে। তরুণ রক্ত, নানা রঙের নেশার ভক্ত। দে· হচ্ছে।

দিবাকর।। অনেক নিয়ে আমরা কাঙাল, খোকা থাকবে সহজ স্বাধীন

ম্যাজিসিয়ান।। খোকার কথা খোকাই বলুক।

লতা।। খোকা আমার নিজের ছেলে, আঁচল ঘিরে আড়াল দেব—দুষ্টু হাওয়া দূরে ঠেলব।

দিবাকর।। আমরা এখন সাতমহলার রাজাও নই, রাণীও নই—খোকার ঘরের দ্বাররক্ষী। (*ম্যাজিসিয়ান একটু এগোতেই*) এই হুঁশিয়ার, কে যায় থামো!

[*ম্যাজিসিয়ান থামে।*]

লতা।। খোকা আমার খেতে বসবে—বাইরে হটো!

দিবাকর।। বাইরে হটো!

ম্যাজিসিয়ান।। বাইরে আছি, খোকার খাওয়া হয়ে গেলে, আস্তে ডেকো। কথা আছে।

[*ম্যাজিসিয়ান বাইরে যাবার দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।*]

দিবাকর।। ম্যাজিসিয়ান খোকাকে চায়। বুঝেছ লতা, আমাদের আর দাম নেই ওর কাছে, আমাদের কিছু দিতেও চায়না। এবার খোকাকে চায়।

লতা।। আমরা ঘরে ঢুকতে দিলে তো!

দিবাকর।। ঘরের বাইরে যদি পিছু নেয়?

লতা।। খোকাকে সাবধান করে দেব!

দিবাকর।। খোকা নিজেই সাবধান। তাহলেও আমাদের তো দায়িত্ব আছে। খোকা আমাদের বাঁচাবে, আমরা খোকাকে বাঁচাব না? দুর্গা পূজায় শত্রুবলির কথা মনে পড়ে? খড়াতুলে শত্রুবলি হয়। আমরাও শত্রুবলি দেব। শাস্ত্রে আছে। পারবে?

লতা।। পারব।

দিবাকর।। যাদুকরকে ডাক। তুমি ওকে মুগ্ধ করবে—এতোদিন আমাদের মুগ্ধ করেছে—এবার ওর মুগ্ধ হবার পালা। তুমি মেয়ে, তেমার যাদুদণ্ডেও কম নেই। রূপকথায় ডাইনির হাত পা টিপে দিতে দিতে রাজকন্যা যেমন করে ওর মরণের খবরটা নিয়ে নিত তেমনি করে জেনে নাও। তারপর আমি সাতহাত জলের নিচে ডুব দিয়ে ওর প্রাণ ভোমরাটাকে দু'খণ্ড করে ফেলব। ওকে ডাকো, আমি আড়াল থেকে শুনছি।

[*দিবাকর লুকিয়ে থাকে।*]

লতা।। (*দরজার কাছে গিয়ে*) যাদুকর, যাদুকর!

[*যাদুকর ঢুকে পড়ে।*]

যাদুকর।। বান্দা হাজির। গলা শুনে মনে হচ্ছে ভুল ভেঙেছে! আর একটি কই?

লতা।। উল্টো-পাল্টা কথা বলছে—বিদেয় করে কাছে ডাকছি। খোকা আমার রাজার ছেলে, কি ধন দেবে?

ম্যাজিসিয়ান।। যে যা চাইবে, সবাই পাবে। প্রভুর কাছে সবই থাকে। কেবল প্রভুর কাছে একটু বাধ্য থাকবে।

লতা।। আমরাও তো বাধ্য ছিলাম।

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুদণ্ড তাই তো দিল। খোকা কোথায়?

লতা।। খেয়ে আসছে।

ম্যাজিসিয়ান।। খোকার পিতা হঠাৎ যেন বিগড়ে যাচ্ছে?

লতা।। পাগল মানুষ, অনেক পেয়ে মাথা গেছে—ঘুম পাড়িয়ে একলা আছি। আমরা দুজন মিলেমিশে খোকার রাজ্যপাট সাজাব। রাজি?

ম্যাজিসিয়ান।। সঠিক রাজি। তবে একটু তাড়াতাড়ি। (*থলে থেকে একটা ঘুঙুর বের করে*) রূপোর ঘুঙুর। যেই বাজাব, খোকার রক্তে বেজে উঠবে লক্ষ ভ্রমর, ফুলের গন্ধে মাতাল হবে— ফুলটা হবে হীরামতির। বুকে জাগুক রঙিন নেশা, চোখে ফুটবে লাল পিপাসা—এটা চাইবে, ওটা চাইবে, প্রভুর কাছে হেঁটে হেঁটে সঠিক দেখো চলে আসবে!

লতা।। যাদুকর, তোমার কত বয়স হল?

ম্যাজিসিয়ান।। হিসেব নেই গো।

লতা।। মনে হচ্ছে অনেক বুড়ো।

ম্যাজিসিয়ান।। যাদুদণ্ড অনেক কালের; বলতে পার, অনেক বুড়ো।

লতা।। মরে গেলে খোকার ছেলে, নাতি, নাতনি—ওদের কি উপায় হবে! ভাবতে গেলে ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপে।

ম্যাজিসিয়ান।। মিথ্যে ভয়ে মরছ কেন? আমার কি আর মরণ আছে—মরব কেন? নানান দিকে নানান কাজে ব্যস্ত—বুড়ো হবার সময় পাইনে।

লতা।। তবে তুমি অমর নাকি?

ম্যাজিসিয়ান।। বলতে পার।

লতা।। থলের মধ্যে কি কি আছে— সারা সময় আগলে থাক? ভার লাগে না? দাও না একটু ধরে থাকি, খানিক সময় হাল্কা হবে, আরাম চাই তো!

[*থলেটা ধরতে যায় লতা। যাদুকর যেন ছিটকে পিছিয়ে যায়।*]

ম্যাজিসিয়ান।। একি করছ! থলের মধ্যে সোনার আপেল, নড়লে চড়লে বুকে লাগে!

লতা।। সোনার আপেল! দাওনা দেখি।

ম্যাজিসিয়ান।। নিরেট সোনা, নরম সোনা—তরল রসের সোনার আপেল। সবাই খুঁজছে সোনার আপেল। লোভের রসে, নেশার রসে, টাপুরটুপুর সুখের রসে সোনারবরণ মিষ্টি আপেল।

লতা।। দাও না একটু খেয়ে দেখি? আধখানা দাও?

ম্যাজিসিয়ান।। কি সর্বনাশ! সোনার আপেল দুভাগ হলে সবই গেল। ওটাইতো প্রাণ —ওটা ভাঙলে আমিও ভাঙা, দু'খান হলে আমিও দু'খান। ওটি আমার সঙ্গে থাকে; দেওয়া যায় না।

লতা।। আমার হাতে দাও না—আমি খোকার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। নেশা লাগবে—আস্তে আস্তে হেঁটে আসবে। যাদুদণ্ড নেড়ে ওকে বশ মানাবে।

ম্যাজিসিয়ান।। সোনার আপেল দেওয়া যায়না। যেখানে যাই সেখানে ওর ছায়া পড়ে। এই ঘরেতেও ছায়া আছে। আমি কেবল ছায়া বিলোই, (*হঠাৎ যাদুদণ্ডটা নেড়ে খোকার ঘরের দিকে দণ্ডটা নিবদ্ধ করে*) ঐতো ছায়া, সোনার আপেল ছায়া ফেলল—খোকার ঘরের কাছে দুলছে, দুয়ার ধরে কেঁপে উঠছে—আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকবে। এবার চলি।

[*ম্যাজিসিয়ান চলে যায়। দিবাকর আসে।*]

দিবাকর।। কোথায় ছায়া?

লতা।। ঐতো, দ্যাখো—খোকার দরজার কাছে (*উইংসের ভিতরের দিকে দর্শকের অগোচর কোন স্থানে আঙুল নির্দেশ করে*)। একটা সোনার আপেলের ছায়া, খোকাকে লোভ দেখাবার জন্য দুলছে, যেন রঙের মায়ায় মন ভোলাবার জন্য রূপসী সেজে আছে। কি ভয়ংকর নেশা করেছে ছায়াটা, দ্যাখো!

দিবাকর।। (*একটা ছুরি বের করে*) লতা, যাদুকর হাতছাড়া হল, কিন্তু ঐ ছায়াটা

—এস ওটার বুকে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিই। রূপকথার সেই সাত হাত জলের নিচে ডাইনীর প্রাণভোমরাটার মত কেটে দু'খান করি।

লতা।। কিন্তু আপেলটাতো ও নিয়ে গেছে—ওটাই তো আসল প্রাণ।

দিবাকর।। এই বাড়িতে এটাই ওর প্রাণের ছায়া। অস্ত্রটা ঐ সোনার আপেলের ছায়াটার বুকে বসলেই এ বাড়িতে ওর খেলা শেষ! দূর থেকে একটা বিকট শব্দ শুনবে। সেই আছড়ে পড়া ডাইনির চিৎকার!

লতা।। কিন্তু কি সুন্দর রঙ, দ্যাখো!

দিবাকর।। দু'চোখ ঢাকো। *(ছুরিটা নিয়ে ছায়াটার দিকে এগোয়)* দুচোখ ঢাকো। শত্রু-বলি! দশভূজার পায়ে শত্রুবলি! বলির বাজনা বাজাও!

[দুর্গাপূজার বলির বাদ্য বেজে ওঠে। মঞ্চের আলো ভয় ও স্বপ্নের ব্যঞ্জনা ফোটাবে। বাজনাটা ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠতে তাকে। সেই মুহূর্তে দিবাকরের ছুরি সমেত হাতটা আলো-অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে উঠে ছায়াটার উপর ঝাঁপিয়ে উড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বলির বাজনা তীব্রতম হয়ে উঠল। লতা চোখ খুলে দেখে। মুখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দূর থেকে প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ উঠে থেমে যায়। বাজনা থামে।]

দিবাকর।। শত্রুবলি!! বল, আমি কেমন বীর?

লতা।।(*উৎফুল্ল*) তুমি একটা দারুণ বীর, বিশাল বীর!

খোকা।। (*নেপথ্যে*) মা—

লতা।। খোকা ডাকছে। আমি যাচ্ছি। চল।

[লতা চলে যায়। দিবাকর পিছে পিছে যেতে থাকে। সাংবাদিক দুজন ঢোকে।]

প্রথম।। এক মিনিট!

[দিবাকর ঘুরে দাঁড়ায়।]

দ্বিতীয়।। ছবি নেব।

[দুজনে ছবি নিতে থাকে।]

দিবাকর।। খোকা খেতে বসেছে, আমি যাব।

প্রথম।। যেতে পাবেন। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে একটা গ্রুপ ছবি নেব।

দিবাকর।। আমাদের সকলের এক সঙ্গে ছবি। খুব ভাল। আমরা প্রস্তুত।

[দিবাকর চলে যায়। ওরা ভিতরের দিকে মুখ রেখে ছবি তোলে। তারপর মঞ্চের সামনের দিকে দু'জন দুই প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।]

প্রথম।। (*স্বগতোক্তির মত*) প্রলোভন থেকে পতন, পতন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়।। (*স্বগতোক্তির মত*) উদ্ধার সম্ভব। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। পতন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে উদ্ধার।

দ্বিতীয়।। উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম।। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব।

দুজনে।। (*একসঙ্গে*) উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

[পর্দা পড়ে। অন্ধকারের মধ্যে কিছুকাল সেই পূর্বের বলির বাজনা বাজতে থাকে।]

বাঘবন্দী

চরিত্র লিপি

রাণা (পরে শিব)
দীপা (পরে উমা)
টুনু
বিল্টু
যুবক
বিচারক
জোনাকি
প্রহরীদ্বয়
লোকটি
মরুৎ
ইন্দ্র
যম
বৃহস্পতি
বরুণ
ব্রহ্মা
ইভ্
আদম
দেবদূতগণ
সদাপ্রভু
নাগ

প্রথম দৃশ্য

[*সাজানো-গোছানো মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘর। ঘরে রয়েছে তরুণ-বয়স্ক রাণা, পাজামা পাঞ্জাবী গায়ে। ডিশ থেকে মশলা মুখে ফেলে চিবুচ্ছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট মুখে নেয়। দেশলাই খুঁজে পায়না।*]

রাণা।। দীপা, এই দীপা—আমার দেশলাই কি হল?

(*নেপথ্যে*) যাই—

রাণা।। (*বিরক্ত। আপনমনে*) সব সময় আমার দেশলাইটা রান্নাঘরে নিয়ে যাবে।

[*দীপা দেশলাইটা নিয়ে ঢোকে।*]

দীপা।। নাও।

রাণা।। আমার দেশলাই রান্নাঘরে কেন থাকবে?

দীপা।। রান্নাঘরের দেশলাইটা খুঁজে না পেলে কি করব? ঠাণ্ডা খাবার দিলে ভাল লাগত কি? (*রাণা দেশলাইটা খুলে দীপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে*). . .কি? (*রাণা হাতটা বাড়িয়ে দেয়। দীপা জিভ কাটে*) তুমি ওরকম তাড়া দিলে বলেইতো. . . দাও—

রাণা।। আমি তাড়া দিলাম বলে দেশলাই জিরে হয়ে গেল!

দীপা।। বলছি তো ভুল হয়ে গেছে—দাওনা—

রাণা।। কেন? কাঁচা জিরে চিবিয়ে শুয়ে পড়ি। বিবাহের পর এতকাল কাটিয়া গিয়াছে —এর মধ্যে রান্নাঘরটুকু পর্যন্ত গুছোতে পারলে না?

দীপা।। টুকিটাকি জিনিশ রাখবার জন্য ছোট ছোট কয়েকটা প্লাস্টিকের কৌটা কিনে আনতে কতোবার বলেছি—এনেছ?

রাণা।। প্লাস্টিকের কৌটো?

দীপা।। হ্যাঁগো মশাই—

রাণা।। বলেছিলে বটে। বড্ড ভুলে যাচ্ছি-আজকাল।

দীপা।। আমি দোকানে গেলেও তো তখন আবার বলবে রাস্তায় গোলমাল চলছে। গুলি, ছুরি—বেরুতেও দেবেনা—কথাও শোনাবে।

রাণা।। যাক্‌গে, দেশলাইটা নিয়ে এস।

[*দীপা অপরাধী মুখে দেশলাইটা নিয়ে এসে রাণার হাতে দেয়। রাণা বাক্সটা খুলে আবার দীপার দিকে তাকায়। দীপা কাঁচুমাচু মুখে বলে*]

দীপা।। ঐ তো ছিল।

রাণা।। একটা। একটা কাঠি, তাও আধভাঙা!

দীপা।। মাত্র তিনটে না চারটে কাঠি ছিল মোটে। সবগুলো তো জ্বলে না, ভেঙে পড়ে যায়। আমি কি করব।

রাণা।। (*কাঠিটা তুলে*) ইনি যদি না জ্বলেন?

দীপা।। (*সরল মুখে*) আমারও তো দুটো জ্বলেনি। দ্যাখো, এই দেশলাই নিয়েই আমি

যা একটু গোলমাল করি কিন্তু বাকি সব?. . . আর সবাই যখন ঘরে ঢুকেই ঘর সাজানোর প্রশংসা করে—তখন?. . . দাঁড়াওনা অ্যাপ্লিকের কাজ করে যা একখানা রেডিওর ঢাকনা করেছি না—কিছুতেই দেখাবোনা. . . দেখলে একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হবে। (*রাণা তাকিয়ে থাকে*). . . কি?

রাণা ॥ হাঁ করে তাকিয়ে আছি!

দীপা ॥ কেন?

রাণা ॥ বোঝনা! উঃ কি কপাল করেছি! সুন্দর বউ হলে কি কম জ্বালা। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের বউকে নিয়েই পালাই।. . . যাবে নাকি?

দীপা ॥ কি হচ্ছে. . .?

রাণা ॥ সোজা কথায় নিজের মতিগতি খুব ভাল ঠেকছে না।

দীপা ॥ বাজে বোকোনা তো...

[*ডোর বেল বাজে*]

দীপা ॥ এতো রাত্তিরে আবার কে এল?

রাণা ॥ একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণে বেলটা বেজে উঠল, কপালও করেছি—

[*দরজা খুলতে যায়—*]

দীপা ॥ আগেই দরজা খুলছ? কে জিজ্ঞেস কর।

রাণা ॥ কে? (*সাড়া নেই*)

দীপা ॥ বাড়ি নিলে সেই একতলায়। বদমায়েসি করে যে যখন খুশি বেলটা বাজিয়ে যাবে।

রাণা ॥ *কে?* (*সাড়া নেই*) কাল বেলটা খুলে রাখব বুঝলে? মনে করিয়ে দিও তো।

[*বেল বাজে*]

দীপা ॥ কি আশ্চর্য!

রাণা ॥ কে?

দীপা ॥ আচ্ছা আপনি সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

[*দরজায় আঘাতের শব্দ*]

রাণা ॥ ব্যাপারটা কি বলতো?

দীপা ॥ (*রাণাকে*) এই, ও ঘরের জানলা দিয়ে মিলনদের ডেকে একবার বল না—মাঝরাত্তিরে কি আপদ বলতো।

(*নেপথ্যে কণ্ঠ*) ॥ আশ্চর্য্য! কি হল! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

রাণা ॥ সরে পড়বেন, না লোকজন ডাকব?

(*নেপথ্যে*) ॥ এই দীপা, আমি টুনুদা।

রাণা ॥ টুনু!

দীপা ॥ টুনুদা—আরে দরজাটা খোল। (*দীপা রাণাকে ঠেলে নিয়ে যায়। দরজা খুলতে একটা ব্যাগ কাঁধে টুনু ঢোকে। মুখে সিগ্রেট। তরুণ—রাণার বয়সী*)

রাণা ॥ কিরে! এসময় তুই কোত্থেকে এলি?

দীপা ॥ আজকালকার দিনে এতো রাত্তিরে কেউ বেরোয়? এ পাড়াটা কি রকম হয়ে আছে জান?

টুনু।। সব পাড়ারই একই হাল।

রাণা।। (*টুনুর সিগ্রেটের দিকে তাকিয়ে*) তোর দেশলাইটা কোথায় রে?

টুনু।। কেন?

রাণা।। (*নিজের দেশলাইটা বের করে*) কয়েকটা কাঠি ছাড়তো? (*টুনু দেশলাইটা রাণাকে দেয়*)

দীপা।। আচ্ছা তুমি কি বলতো, ঢুকতে না ঢুকতেই তোমার দেশলাইটা বড় হল? একটু বসতে পর্যন্ত সময় দিলে না?

রাণা।। একবার যখন ঢুকে পড়েছে তখন কি আর দাঁড়িয়ে রাত কাটাবে। তুই না বাঁচিয়েছিস—really, এতোবড় রাত্তির, শালা একটা দেশলাই কাঠি capital, মেজাজের কি থাকে বল? ওরা কী বুঝবে?

টুনু।। বিয়ের পরেও সিগরেটটা তাহলে ছাড়িস নি?

দীপা।। ছাড়বে কি? আরও বেড়েছে।

[*টুনু ব্যাগটা রেখে বসে*]

রাণা।। বাড়বেনা! Frustration! তিনদিন আমাকে ঘরে আটক করে রেখেছে।

টুনু।। কেন?

দীপা।। কি করে বেরুবে। পাড়ায় খুনোখুনি, পুলিশ, গুলি—কি হয়নি। অর্ধেক ছেলে পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। উঃ, যা গেছে না, দুটো দিন তবু একটু চুপচাপ—আর এর মধ্যে তুমি এলে—

রানা।। শুধু আসা নয়। বাইরে দাঁড়িয়ে আবার মস্করা। শালা! তুমি শালা গোড়ায় তোমার নামটা বলতে পারলে না!

দীপা।। আচ্ছা তুমি এরকম 'শালা শালা' করছ কেন বলতো?

রাণা।। শালাকে শালা বলেছি, দোষটা কি করলাম? তোমার মামাতো ভাই কি আমার জ্যাঠা হবে? (*টুনু মৃদু হাসে, দীপার সঙ্গে রাণাও হেসে ওঠে। রাণা হঠাৎ টুনুকে*) ঠিক সময় মনে পড়েছে। এই ওঠ, ওঠ, বেরো আমার বাড়ি থেকে। (*দীপাকে*) ধরতো, শালাকে ঠেলে বাইরে বার কর। (*টুনুকে ঠেলতে থাকে।*)

টুনু।। কি হয়েছেটা কি রে বাবা?

দীপা।। (*পেছন থেকে রাণাকে টানতে টানতে*) আরে এই ঠেলছ কেন? মাথা খারাপ হল নাকি তোমার?

রাণা।। (*টুনুকে*) আমাদের বিয়েটা দিলি তুই। অথচ তুই নিজে বিয়েতে এলি না। অ্যাদ্দিন বাদে মাঝরাত্তিরে এসে উদয় হলেন! তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকা উচিত? নিজে ভেবে দ্যাখ।

দীপা।। সত্যি টুনুদা, এটা তুমি এতো খারাপ করেছ না। আমি মনে মনে একেবারে ঠিক করে রেখেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে একটা কথা নয়, একটা এ নয়, মানে তোমার সঙ্গে সব চুকে গেল।

রানা।। চিরকাল এইরকম! মাঝরাত্তিরে উদয় হলেন!

[*টুনুকে একটু ভাবিত লাগে*]

টুনু।। আসতে হল।

রাণা।। কি একটা ভাবছিস?

টুনু।। (*চারদিকে তাকায়*) ভাবছি না—দেখছি।

দীপা।। কি?

টুনু।। তোদের। তোদের ঘর-সংসার।

দীপা।। কেমন দেখছ?

টুনু।। ভাল।

রাণা।। ব্যস্!

দীপা।। কি রকম ভাল সেটা বল?

রাণা।। মানে, জাঁকিয়ে তারিফ কর। সংসারটি ওনারই রচনা তো!

টুনু।। ঝল্‌মল্ করছে।

দীপা।। শুনলে?

টুনু।। আচ্ছা রাণা, তুই আর লিখছিস না?

রাণা।। চিঠিপত্র লিখি। অফিসের ফাইলে লিখি।

টুনু।। ছেড়ে দিলি!

রাণা।। ধুর!

দীপা।। কত বলি জান—কোন কিছুতে গা নেইতো।

টুনু।। পত্রপত্রিকায় খুঁজি তোর লেখা, দেখিনা। আফশোষ হয়। লেখায় ধার ছিল। জ্বালা ছিল। একটা রাগ ছিল। মানুষের উপর দরদ ছিল।

রাণা।। এতো ছিল!

টুনু।। হ্যাঁ, এতো ছিল! আর এতোকিছু তুই বিসর্জন দিয়েছিস। কেন? ঝলমলে সংসার. . . আর কিছুর দরকার নেই, না?

রাণা।। এক সময় ওসব লেখা যেত. . . এখন দেখছিস তো চারদিকটা—রিস্কি।

টুনু।। ব্যস, দমে গেলি!

দীপা।। তা কি করবে?

টুনু।। চুপ কর! ডিফেণ্ড করিস না! দুটোয় একেবারে গোল্লায় গেছিস!

রাণা।। তাই?

টুনু।। বিপুল এসে দু'দিন তোদের কাছে থেকে গেছে— দু'দিনেই তোদের টের পেয়েছ।

রাণা।। কি টের পেয়েছে?

টুনু।। যা পাবার। (*রাণাকে*) দে দেশলাইটা দে। (*জোরে শব্দ করে দেশলাই জ্বালায়। সিগ্রেটে আগুন দেয়*) সেই গাড্ডা ; সেই ফুল তুলে মালা গাঁথা। সেই ওগো আর হ্যাঁগোর পুরনো ডুয়েট। তারপর অয়েলক্লথের পাশে ফিডিং বটল—এসব আমি ভাবিনি। ভাবলে নিজে এগিয়ে বিয়ে দিতুম না। ঘরখানা সাজিয়েছ যেন ফুলসজ্জা! অথচ তোরা এরকম ছিলিস না।

রাণা।। এত চটছিস্ কেন?

টুনু।। গুলির আওয়াজ, ছুরির রক্ত, পুলিশের গাড়ি, পাড়ার অর্ধেক ছেলে বেপাত্তা ওগো-হ্যাঁগোর ডুয়েটের সঙ্গে এসব মিলে মিশে যে কোরাসটা হচ্ছে সেটা কান পেতে

কোনওদিন শুনেছ? নিজের ঘরখানার মধ্যে তার তালটা কেমন করে দেবে সেটা একটুও ভাবো?

দীপা।। হঠাৎ এমন ঝাঁঝালো হয়ে উঠলে? তুমি কি ধমকাবে বলে এলে নাকি?

টুনু।। যে বিপুল তোদের এখানে কদিন আগে এসেছিল, তোদের সঙ্গে খেয়েছে, হেসেছে, তোদের কাছ থেকে টাকা ধার করে মায়ের চশমার পাওয়ার বদলে নিয়ে গেছে —সেই বিপুল আজ নেই।

রাণা।। বিপুল নেই?

দীপা।। বিপুলদা—

টুনু।। হ্যাঁ, চোখ ভেজাবিনা দীপা—না তাকে পুলিশে মারেনি। মেরেছে তারই মতো একটা ছেলে, এই দেশে যাদের দুজনের দুঃখ সমান সমান, দুজনের বঞ্চনা সমান সমান, তাদের শত্রু হবার কথা ছিলনা—তাদের বন্ধু হবার কথা ছিল, কথা ছিলো দুজনের বঞ্চনার কষ্ট মিলেমিশে একটা জোরালো কিছু হবে—হলনা, হচ্ছেনা।

রাণা।। বিপুল—নেই!

দীপা।। দেশটাকে ভালবাসার এই ফল!

টুনু।। সোনার টুকরো সব ছেলে, ছেলেদের নিয়ে যে কি হচ্ছে! ঘর সাজাবার আগে নিজের ছেলেটাকে কেমন করে সাজাবি ভেবে না রাখলে হয়তো ঠকে যাবি দীপা।

দীপা।। চারদিকটা দেখি, নিজেদের কথা ভাবি. . . এক এক সময় আমার কেমন ভয় করে।

রাণা।। তুই না এলেই ভাল করতিস টুনু, একরকম তো ভালই ছিলাম।

টুনু।। আমি তো থাকতে আসিনি। আমার এই ব্যাগটা রাখতে এসেছি। এক্ষুণি চলে যাব। (*ওরা তাকায়*) হ্যাঁ, এক্ষুণি। দেরী করা যাবে না। ধর এটা।

রাণা।। কি আছে ওতে?

টুনু।। যাই থাক। সাবধানে রাখবি।

দীপা।। বিপুলদার সঙ্গেও একটা ব্যাগ ছিল, খুব সাবধানে রাখত।

টুনু।। বিপুল নেই, কিন্তু সেই ব্যাগটা থেকে গেছে। চিনতে পারছিস না—এটা রেখে দে। ব্যাগটা বিপুলের।

দীপা।। কি আছে ওতে?

টুনু।। আমি চলে গেলে খুলে দেখিস। সাবধানে রাখবি। কাল পরশু যখন হয় এসে নিয়ে যাব। আর যদি না আসি—সাবধানে রাখবি। চলি। (*টুনু চলে যায়। মুহূর্ত কাল পরে ওরা ব্যাগ থেকে একটা বন্দুক বের করে। অন্ধকার। অন্ধকার সরে যেতে মঞ্চে রাণার হাতে ব্যাগটা। চারদিকে অন্ধকার। মৃদু আলোর বৃত্তে দীপা ও রাণা দর্শকের মুখোমুখি।*)

দীপা।। টুনুদা সেই যে গেল. . .

রাণা।। আর আসেনি।

দীপা।। আমরা দু'টি প্রাণী রোজ অপেক্ষা করে থাকতাম।

রাণা।। টুনু এল না। এই ব্যাগটা আমরা সাবধানেই রেখেছি।

দীপা।। ঘরে মাত্র দু'টি প্রাণী আর একটি ব্যাগ—ব্যাগের মধ্যে একটা অস্ত্র।

রাণা ।। তার মানে, কোন এক শত্রুর মুখোমুখি হবার একটি অস্ত্র।

দীপা ।। দু'টি নির্বিবাদী সংসারী মানুষ। আমাদের উপর হঠাৎ একি দায়িত্ব?

রাণা ।। এ কোন নাটক? এক সময় লিখতাম। মনের মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু ভিড় করে আসে। লিখতে ইচ্ছে করে, ভাবতে ইচ্ছে করে—

দীপা এবং রাণা ।। হ্যাঁ, এমন একটা নাটক যা এখানে এই ঘরে হতে পারে, ঘটতে পারে, হতে পারতো, ঘটতে পারতো. . .

[*হঠাৎ দরজায় সজোরে ধাক্কা দিয়ে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে ঢোকে। রাণা ঘুরে তাকায়। আতঙ্কিত। ছেলেটির মুখ চোখ আতঙ্কে থমথমে। এরা কিছু বোঝার আগেই ছেলেটি দৌড়ে ভিতরে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে তাকায়। রাণাকে বলে—*]

বিল্টু ।। বাবা, কেউ এলে বোলো আমি বাড়ি ফিরিনি। আমি ভেতরে গিয়ে লুকোচ্ছি। আর শোন মা, ওরা যদি জোর করে ভেতরে ঢুকতে চায় আমাকে জানাবে, যেমন করে হোক সরে পড়ব।

[*ছেলেটি কথা শেষ করেই ভেতরে যেতে চেষ্টা করে। রাণা বাধা দেয়।*]

রাণা ।। শুনুন।

বিল্টু ।। আমাকে ডাকছ বাবা?

দীপা ।। (*হতভম্ব*) আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে, বাবা বলছেন কাকে?

[*দীপা কথা শেষ করে রাণার দিকে এক পা এগোয়।*]

ছেলেটি ।। (*বিস্মিত।*) কি বলছ মা!

[*দীপার দিকে এক পা এগোয়।*]

দীপা ।। (*বিপন্ন*) শুনছ!

ছেলেটি ।। বুঝতে পারছনা কেন এক্ষুণি আমার লুকিয়ে থাকা দরকার। ওঃহো, দরজাটা খোলা রয়েছে—

[*দৌড়ে দরজাটা বন্ধ করতে যায়*]

রাণা ।। খবরদার, দরজা বন্ধ করবেন না। আপনি বেরিয়ে যান, তারপর আমরাই বন্ধ করতে পারব।

[*ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ায়। কথা বলতে বলতে দীপার দিকে এগোয়। দীপা রাণার দিকে। রাণা টেবিলের দিকে।*]

বিল্টু ।। তোমরা কি আরম্ভ করলে? 'আপনি' করে বলছ, যেন চিনতেই পারছন—অদ্ভুত সব কথা বলছ—মা, তুমিও আমাকে চিনতে পারছনা, সত্যি চিনতে পারছনা বাবা?

রাণা ।। দেখুন, প্রতিকথায় ওরকম সোহাগের পিতৃসম্ভাষণ করে পায়ের রক্ত মাথায় ওঠাবেন না। ভদ্রভাবে বলছি, চলে যান।

বিল্টু ।। আশ্চর্য! একটা মানুষের জীবন তোমাদের কাছে কিছুই না? তোমাদের চোখের

সামনে কেউ এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাক, যা খুশি করুক, ভাল লাগবে? (*বিল্টু দীপার দিকে এগোয়*) তোমরা একটা আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তৈরী করলে মা!

দীপা।। আপনি কিন্তু আবার মা বলে ডাকছেন?

[*দীপা পাশে রাণাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজার ভঙ্গিতে দরজার দিকে পিছিয়ে আসে। রাণা সামনের দিকে।*]

বিল্টু।। ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি বাবা।

[*বিল্টু দরজার দিকে এগোয়*]

(*নেপথ্যে*)।। আসতে পারি?

[*বিল্টু 'না' বলে দ্রুত পিছিয়ে আসে। রাণা 'কে' বলে এগিয়ে যায়। দীপা যেখানে ছিল সেখান থেকে উদ্বিগ্ন ভাবে দু'পা এগিয়ে আসে। 'আসতে পারি', 'না', 'কে' এবং সেইসঙ্গে ওদের গতিবিধি সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় একই সঙ্গে হয়।*]

বিল্টু।। (*আর্তস্বর*) না—ওর হাতে আমাকে তুলে দিওনা! দয়া করে আমাকে ভেতরে লুকোতে দাও!

[*দ্রুত ভেতরে চলে যায়। দীপা, রাণা দুজনেই হতভম্ব অবস্থায় দরজার দিকে এগিয়ে এসে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। একটি যুবক প্রবেশ করে। অন্যমনস্ক, অগোছালো এবং খানিকটা উদাসীন। ছেলেটির দিকে ওরা ফিরে তাকায়। দীপার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই একটা ভয়সূচক শব্দ বেরিয়ে আসে। যুবকটি নিঃশব্দে সমস্ত ঘরটায় চোখ বোলায়। তারপর ওদের দিকে পেছন ফিরে মঞ্চের একেবারে সামনে খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকারের ভেতর দাঁড়ায়।*]

যুবক।। টুনু নামে কোনও ছেলে এখানে এসেছিল?

[*দীপা-রাণা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।*]

রাণা।। আপনি কে?

যুবক।। আমার প্রশ্নের উত্তর এটা নয়। টুনু এসেছিল?

রাণা।। আপনি কে?

যুবক।। (*নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরে ওদের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। নিচু শব্দে হাসে, আবার ঘুরে দাঁড়ায়*) নাম বললে চিনবেন না। আমার জীবনটাও অন্যরকম, চিনবেন না। কাজেই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করে লাভ নেই। টুনু এসেছিল?

[*আবার দীপা-রাণা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।*]

দীপা।। এসেছিল।

যুবক।। ঘরে আছে?

রাণা।। একটু আগে চলে গেছে।

যুবক ।। কোথায় গেল?

দীপা ।। (*ভয়ে ভয়ে কি বলবে ভাবে। যুবক আবার ওদের দিকে ঘোরে। দীপা চমকে উঠে বলে*) জানি না—

যুবক ।। উত্তরটা নির্ভরযোগ্য বলে ভাবতে পারি?

রাণা ।। আপনার ইচ্ছে।

(*যুবক একটু তাকিয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে হাসে। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।*]

যুবক ।। এতোক্ষণ কি ওর সঙ্গেই আপনারা কথা বলছিলেন?

রাণা ।। প্রায় জেরা করে যাচ্ছেন?

যুবক ।। আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আমি ষোলআনা নিয়ে যাব। কো-অপারেট করুন। আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি। সময়টা খুব ভাল নয়। তাছাড়া আমার জিদটাও একেকসময় বড় রুক্ষ হয়ে ওঠে।

দীপা ।। ভয় দেখাচ্ছেন?

যুবক ।। একটুও নয়। তবে সঙ্গত কারণেই ভয় পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনাদের ছেলেটি সম্ভবত ভেতরে কোথাও লুকিয়ে আছে।

রাণা ।। আমাদের কোনো ছেলে নেই।

যুবক ।। টুনুর সঙ্গে আপনার ছেলের সম্পর্কটা কি রকম?

দীপা ।। আপনার কি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও নেই। আমাদের অতোবড় ছেলে কি করে হয়?

রাণা ।। আপনারা কি দল বেঁধে আমাদের বিরক্ত করে মজা পাচ্ছেন?

যুবক ।। (*নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ায়। চুপ। হাঁটতে আরম্ভ করে। ওদের চোখে চোখ রেখে। মাঝরাস্তা থেকে হঠাৎ ঘুরে যায়। আবার জায়গায় ফিরে আসে। শান্তকণ্ঠে*) আপনাদের ছেলেটিকে ডাকুন।

রাণা ।। (*একটু পরে—*) আশ্চর্য্য তো, আপনি কি. . .

[*কথা শেষ করার আগেই যুবক মাথা ঘোরায়। রাণা থেমে যায়। দীপা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। যুবকটি দীপাকে বলে—*]

যুবক ।। কি দেখছেন?

দীপা ।। (*না তাকিয়ে*) যা খুশি—

যুবক ।। (*কথা বলতে বলতে এগোয়*) এমন জানালা কি সত্যি হয়—তাকালে যা খুশি তাই দেখব?

[*দীপা মুখ ঘোরায়। অস্বস্তিবোধ করে।*]

রাণা ।। এবার আপনি এঘর থেকে না গেলে—

যুবক ।। বুঝেছি, আপনি জানালা দিয়ে আকাশের ঐ তারাগুলো দেখছেন। মাটিতে টপটপ করে রক্ত পড়ছে অথচ আকাশে তারাগুলো কি সুন্দর জ্বলছে, ঠিক আপনাদের মতো। বিল্টু বড্ড দেরী করছে, বিল্টু!. . . আচ্ছা, কটা তারা জমালে একটা আকাশ পাওয়া যায় বলতে পারেন? কতটুকু সুখ জমালে এই গোটা পৃথিবীর দুঃখ আপনারা

ভুলে যেতে পারেন? আশ্চর্য একটা প্রশ্নের উত্তরও আপনারা দিচ্ছেন না। বিল্টু, আর এক মিনিটও সময় নেই, আমাদের। বিল্টু!! বি-ল্টু!!!

[নিস্তব্ধতা। সম্মোহিতের মতো বিল্টু বেরিয়ে আসে। দরজায় দাঁড়ায়। অসহায় চোখ। দীপা-রাণা বিচলিত। হঠাৎ বিল্টু আর্তনাদ করে ওঠে]

বিল্টু॥ না—না—আমি যাবনা। আমাকে তোমরা যেতে দিওনা। মা,. . . বাবা. . . আমি কি তোমাদের কেউ না? অন্তত আমি একটা মানুষ. . .

[যুবকটি ঘুরে বিল্টুর দিকে তাকায়। চোখে মুখে সমস্ত অবয়বে যন্ত্রণার ছাপ। বিল্টুর চোখে চোখ রেখে দু'তিন পা এগোয়—হঠাৎ আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে।]

যুবক॥ যেতে তোমাকে হবেই। তুমি বোধহয় ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছ বিল্টু। ওরা বলছেন, তুমি ওদের ছেলে নও। চল—

রাণা॥ (*একটু পরে*) ওকে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন?

দীপা॥ আমাদের কাছে এসে ও আশ্রয় নিয়েছে, আমরা এভাবে ছাড়তে পারিনা। জোর করে কেন নিয়ে যাবেন?

[যুবকটি আবার ঘুরে দাঁড়ায়। দীপার দিকে তাকিয়ে ধীরভাবে এগিয়ে আসে। দীপার সামনে এসে নিঃশব্দে হাসে।]

যুবক॥ আপনারাই বা জোর করে কেন আশ্রয় দেবেন? যে কেঁদে ওঠে, আশ্রয়টা কি সবসময় তারই পাওনা হয়? ওর আগে যদি আমি কেঁদে উঠতাম? ওর আগে যদি আমি আসতাম? (*আবার হাসে*) চল, বিল্টু।

[বিল্টু ক্রমশ দীপার দিকে সরে আসে।]

বিল্টু॥ না...আমার ভয় করছে—আমার. . . আমার ঘুম পাচ্ছে।

[হাঁটু গেড়ে বসে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে দেয়।]

দীপা॥ অন্তত দয়া করেও ওকে ছেড়ে দিন। দেখছেন না ও কেমন করছে. . . দাঁড়াতে পারছে না—সমস্ত শরীরটা কাঁপছে।

যুবক॥ একটা বড় ঢেউ ওঠার আগেও তো জলটা কাঁপে। এতোদিন ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে, চুলে আঙুল ছড়িয়ে, মশারির ধারগুলো গুঁজে দিয়ে, একটা খাঁচায় নিজের ঘুমন্ত ছেলেটিকে পুরে রেখেছেন। ঘুম, ঘুম আর ঘুম! কতোকাল আর ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন? বিল্টু. . .

[বসে বিল্টুর পিঠে হাত রাখে।]

রাণা॥ দেখুন, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার. . . এসব অনুযোগের কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছিনা।

[যুবক রাণার দিকে তাকায়।]

যুবক॥ (*পিঠে হাত রাখা অবস্থায়*) একসময় এ-সব কিছুরই উত্তর পাবেন। মনে হচ্ছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। তবে ও জেগে উঠলে আপনারা অবাক হবেন। তখন ও একটা ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠবে। ও ভাঙবে, ও চাইবে ও

কাড়বে। একিরে বিল্টু, তুই ঘুমোচ্ছিস? (*জামা ধরে তোলে*) You coward! get up... বিল্টু, এই বিল্টু, ঐ দ্যাখ, সেই আকাশটা—তোর সেই আকাশটারে... একদিন বলেছিলি, আঙুল তুলে ওর গায়ে তোর নাম লিখবি, পৃথিবীর সবাই দেখবে—কই তাকা—You fool! get up! (*বিল্টুকে ঝাঁকানি দেয়—পড়ে যায়*) একি বিল্টু, তোর সবকটা আঙুল থেকে টপটপ্ করে রক্ত পড়ছে। হাতটা তোল, চাঁদের ওপর হাতের পাঞ্জা চেপে ধর। একটা চমৎকার পোস্টার মনে হবে। দ্যাখ, বিল্টু—সমস্ত অন্ধকার চুরমার করে পোস্টারটা কেমন জ্বলে উঠতে চাইছে। (*হঠাৎ একটা সাইরেন বেজে ওঠে। সবাই সচকিত*) যা ভেবেছি শব্দটা যেন ওঁৎ পেতে ছিল। বিল্টু শুনছিস—কতবার বললাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়। তোর বাবা-মা তোকে চায় না, বেরিয়ে চল।

[*আবার সাইরেন। আলো একটু কমে যায়।*]

দীপা॥ কি বিশ্রী শব্দ!

রাণা॥ হঠাৎ এসব কি আরম্ভ হল?

যুবক॥ আরম্ভ অনেকদিন থেকেই হয়েছে। আজ হঠাৎ কানে গেল। কোর্ট বসছে। শব্দটা কোর্ট বসার আগে এরকম বেজে ওঠে। বিল্টু... তুই তাহলে যাচ্ছিস না...ঠিক আছে আমি একাই যাচ্ছি...

[*যাওয়ার জন্য এগোয়। আলো কমে।*]

দীপা॥ আচ্ছা এটা কিসের কোর্ট?

রাণা॥ বললেন, কোর্ট বসছে—একথা কেন? কি বলতে চান?

যুবক॥ (*দাঁড়ায়, কিন্তু মুখ না ঘুরিয়ে কথা বলে*) এক্ষুণি টের পাবেন।

রাণা॥ কাদের কোর্ট?

যুবক॥ (*মুখ ঘুরিয়ে। হেসে*) বিচারের কর্তা যারা। (*আলো আরও কম*)

দীপা॥ কেমন বিচারক?

যুবক॥ যেমন দেশ, যেমন বিধি। আপনারাই তো আজ সাক্ষী কিংবা অভিযুক্ত...

[*চলে যায়। দীপা—রাণা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।*
আলো আরও কমে যায়।]

রাণা॥ সাক্ষী—

দীপা॥ অভিযুক্ত—

বিল্টু॥ কোর্ট এগিয়ে আসছে...আমি কোথায় যাব? ঘুমের মধ্যে আমি হাঁটতে পারছিনা—কিন্তু (*টলতে টলতে ওঠে। অন্ধের মতো হাঁটতে আরম্ভ করে।*) কিন্তু... আঃ...

[*হাই ওঠে। ক্রমশ অন্ধকারে কোথায় মিশে যায়।*
বিল্টু হাঁটার সময় থেকেই মঞ্চের ডানদিকের
অংশ যা এতোক্ষণ অন্ধকারে ছিল, একটু
একটু করে আলোকিত হতে থাকে।
নেপথ্যে বিচারক এবং জোনাকির আগমনের
শব্দ শোনা যায়। ওরা এসে পড়ে।]

বিচারক॥ *আসুন বসুন তাড়াতাড়ি*
হাকিম মশাই ব্যস্ত ভারি
চোখ পাকালে দমাদ্দম

পা পিছলে আলুর দম
চোখ নামালে মিষ্টি কুল
সখের বাগান গোলাপফুল।

জোনাকি।। হাকিম হাজির—

[*দুজনে এতক্ষণ মুখোশ পরে ছিল। এইবার মুখোশ খুলে হাতে নিয়ে কথা বলে*]

বিচারক।। এই তো এসে গেছি। বিচারক হাজির—

[*বিচারক সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটু উঁচু মঞ্চের আসনে বসে। জোনাকিও আরেক পাশের সিঁড়ি দিয়ে নিজের আসনে যায়। বিচারক পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে এবং অতিকষ্টে পড়ে।*]

বিচারক।। ঠিক জায়গায় এসেছি তো। কি Handwriting! গুষ্টিরপিণ্ডি! জোনাকি—এটাই তো আদালত? ছিরিছাঁদ দেখলে তো পিত্তি চমকে ওঠে। একগ্লাস জল দাও জোনাকি—(*জোনাকি—মুখ ঘুরিয়ে বসে*) *কি হল জোনাকি? উঃ—রাগ হয়েছে! আবার ডাকছি—আয়রে আমার পানের খিলি, মুস্কিপাতি রসের খিলি—(জোনাকি শিহরণে শরীর নাড়িয়ে সাড়া দেয়)*

জোনাকি।। দেখুন আমি উকিল—হ্যাঁ। আড়ালে যা খুশী বলুন, Publicly insult করবেন না। এমনভাবে আদেশ করছেন যেন আমি নিতাইয়ের মা।

বিচারক।। আদেশ ভাবছ কেন? আদর করে চাইছিতো। (*হঠাৎ দীপা-রাণাকে দেখে*) ওরা দু'টি দাঁড়িয়ে?

জোনাকি।। ওমা—আপনি যেন কি—ওরাই তো আজকের case-টার পার্টি।

বিচারক।। ও—তা বসে দিন—দাঁইড়ে কেন? বসে দিন। (*পকেট থেকে একটা ছাপানো কার্ড বের করে জল ঢাকে*)—বুঝলে কিনা জোনাকি, দীনেশের শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নের চিঠিটা দিয়েই জলটা ঢাকলুম। দীনেশ বেঁচে থাকলে Protest করত। যেখানেই বিচারে গেছি হতচ্ছাড়াটা কেবলই Protest করেছে। এবার ঠিক করেছি কেউ Protest করলেই ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে দেব। . . . তা একটু ফুলটুল রাখনি—জুঁই, বেলি, শুঁকে সময় কাটতো। ন্যাড়াবোঁচা আদালতে মন টেঁকে।

(*আচমকা গান গেয়ে ওঠে—*)

উড়ু উড়ু মনটি আমার খাঁচায় বেঁধেনে
রঙ বেরঙের প্রজাপতি মাতাল করেছে। . . . বাউল।

বিচারের আগে বাউল গাইলে মনটা শুদ্ধ হয় আরকি—সেই লাটসাহেবের আমল থেকে বিচার করছি, একি আজকের যজমানি। মেডেল পেয়েছি অনেক।

[*বুকে অঙ্গুলিনির্দেশে ঝোলানো মেডেল দেখায়।*]

রাণা।। আমাদের কাজটা কি তাতো ঠিক বুঝতে পারছিনা।

জোনাকি।। কাজটা এখুনি টের পেতেন। বিচার শুরু হয়ে যেত। বিচারে দুজন উকিল চাইতো—আমিতো এ পক্ষের—তা আপনাদের পক্ষে তো একটা যাহোক্ চাই—তাই—মিলর্ড, একটা উকিল রিকুইজিশন করুন।

বিচারক।। কেন তুমি কি কচ্ছ?

জোনাকি।। আমিতো এ পক্ষে—বিরোধীপক্ষেও তো একজন চাই—না'লে একতরফা দেখাবেনা?

বিচারক।। হুঁ—বাইরে গে দাঁড়াও তো, যেটারে সামনে পাবে ধরে নে এস। কোর্টের বাইরে সব ব্যাটা তলায় তলায় বিরোধীপক্ষ, বুয়েছ। যাও, পাকড়ে আন।

[*জোনাকি "ধুধ্ধুড়ি নেড়ে দেব" গাইতে গাইতে চলে যায়। বিচারক পলকহীন দীপার দিকে তাকিয়ে থাকে। দীপা অস্বস্তি কাটানোর জন্য অবশেষে বলে*]

দীপা।। জুরিদের ডাকেন নি?

বিচারক।। না। আমার নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে। জুরি দিয়ে কি হবে! পাঁচ পাবলিকে বিচারের কি বোঝে?

রাণা।। এটা কি বিধিসংগত কথা হল?

বিচারক।। বিধিসংগত! এটা দেখছি দীনেশের বংশ! Is that your property? ওসব বিধি-ফিধি আমার ভাল্লাগেনা—

[*আবাব গান—*]

নিজের হাতে গড়লে বিধি, বিধি ভাল্লাগে না আর
ময়রা কভু নিজ মিষ্টি করেনা আহার—ভোলা মনরে—
—বাউল!

দীপা।। এটি সম্ভবত বাউল নয়।

বিচারক।। এটি সম্ভবত বাউল নয়? ঐ যে 'মনরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'মন' থাকলেই বাউল। (*গেলাশ তুলে খেতে গিয়ে দেখে গেলাশ প্রায় ফাঁকা*) জোনাকিটা - —আবার. . . দুঃশালা! কাজের সময় চট্‌পটে হবি তো. . . আমার পক্ষের উকিলটি বড্ড গেঁতো আছে।

রাণা।। বিচারকের পক্ষের উকিল?

বিচারক।। কেন?—আমি বুঝি এলেবেলে? আমার পক্ষে কেউ থাকবেনা—না? জরুর থাকবে। (*ফোনের শব্দ। ফোনটা ধরে*) হ্যাঁলো, হ্যাঁলো,—হ্যাঁগো, বিচার বসছে। এ্যাঁ? হ্যাঁগো, এই নিয়ে দশনম্বর হ্যাপা সামলাচ্ছি।—তা—তোমরা কেমন চালাচ্ছ—বিচার?. . . কি করছে? মাথা তুলছে? মারো কুঁদো. . . কুঁদো, কুঁদো-হ্যাঁগো শান্তিরক্ষার সমাধান— কুঁদো। (*খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে*) ছিটোও, ছিটোও শান্তিজল, . . . কি বললে? বাইরের চাঁদের আলোটা দেখে মনটা কেমন খুনসুটি খুনসুটি করছে?...ওরম করে বোলো না মাইরি. . . আমোদে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এখানটা চুকিয়েই যাচ্ছি। টা টা, টা—টা (*রিসিভারটাকে দুহাতে প্রায় পিষতে পিষতে দীপার দিকে তাকিয়ে।*) উড়ু উড়ু, মনটি আমার—পালা বেশ জমেছে না গো?

[*বাইরে থেকে জোনকির গলা শোনা যায়। জোনাকি বাচ্ছা মেয়েদের মতো নাচতে নাচতে ঢোকে। পেছনে দুজন প্রহরী একজন লোককে টানতে টানতে নিয়ে আসে।*]

জোনাকি।। মিলর্ড, পেয়ে গেছি! মিলর্ড, পেয়ে গেছি! মিলর্ড, বাজারে যেছিল, আসতে চেছিল না. . .

[*বিচারক ধমকায়। জোনাকি থেমে যায়।*]

লোকটি।। এসব কি হচ্ছে? জবরদস্তি নাকি? এখানে নিয়ে এলেন কেন?

বিচারক।। কেন? তুমি উকিল হবে গো! বিরোধীপক্ষের উকিল। একটু বাধ্য থাক সোনা।

লোকটি।। উকিল? সেকি? আমি বাজারে যাচ্ছি। (*হাতে থলে। এই থলেটাই পরে বিল্টুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে*) আর দেখুন, ও সব সোনা-ফোনা বলবেন না! তাছাড়া বাধ্যই বা থাকব কেন?

বিচার।। আমি বলছি তাই থাকবে।

লোকটি।। কেন?

বিচারক।। (*পুলকিত*) প্রতিটি কথায় একটি করে 'কেন'— তার মানে একেবার সাচ্চা বিরোধী পক্ষ—ওর গায়ে উকিলের সামলা চাপা।

[*রক্ষীরা জোর করে সামলা পরায়।*
চ্যাঁচামেচি, ধস্তাধস্তি, টানাটানি
চলতে থাকে।]

লোকটি।। জুলুম করছেন আপনারা—কি চান?

বিচারক।। চু-উ-উ-উ-প! অর্ডার অর্ডার! কোর্টে শান্তি না এলে কাজ চালানো যায় না।

লোকটি।। আমার গা থেকে যদি এসব খুলে না দেন, আমি কিন্তু নিজেই জোর করে খুলে ফেলব।

বিচারক।। এ্যাই, বলেছি না—অর্ডার অর্ডার!

লোকটি।। যতো সব জুলুমবাজ! (*খুলতে চেষ্টা করে*)

বিচারক।। Charge (*দুজন রক্ষী ওকে মারে। লোকটি পড়ে যায়। জোনাকি বাঁশি বাজায়। বিচারক হিংস্রভাবে হাতুড়িটা নিয়ে নেমে আসে*)

লোকটি।। ভয়ানক অন্যায় করছেন! আমি প্রতিবাদ করছি।

বিচারক।। দীনেশের ঝাড়বংশ!—কোর্টের শান্তিভঙ্গ হ'চ্ছে চেঁচিয়ে?—মার কুঁদো—(*বিচারক নিজেই হাতুড়িটা ওর মাথায় ওপর রেখে*) মাথা তুললেই মুণ্ডুটা ঘা মেরে চানাচুর করে দেব! ওঠ, ওঠ (*লোকটি ভয়ে ভয়ে ওঠে*) এই হাতুড়ি সরাচ্ছি—কিন্তু মনে রেখ, ওটা মাথার ওপরেই রইল।. . . দেখলে তো কোর্ট কেমন চুপচাপ?

জোনাকি।। (*দীপা-রাণাকে*) দেখলেন তো—একেই বলে টেক্‌নিক্! শান্তিরক্ষার টেক্‌নিক্। একি আজকের যজমানি. . . আমাদের পূর্বপুরুষেরা সব বড় বড় জজ ছিলেন। জজ তো নয় যেন জুজু—আমরাও কম যাইনা। আমরা দুটিতে আজ জুজুবুড়ি-জুজুবুড়ি খেলব!

দীপা।। আপনাদের দুটিতে দেখছি খুব ভাব।

জোনাকি।। না আ-আ-আ-আ! মাঝে মধ্যে আড়ি করে দি! তবে এইভাব—এই ডাব, এই ডাব এই ভাব, এই আরকি—(*রাণাকে*) আপনারা দু'টিতে আড়ি-আড়ি-ভাব-ভাব খেলেন না?

রাণা॥ এই বয়সে?

বিচারক॥ ন্যাকামির আবার বয়স কিরে?

জোনাকি॥ ইঁ—ইঁ ঢ্যামনা!

বিচারক॥ আমাদের গুরুভাই এমন জাঁদরেল ন্যাকা না, দেশে দেশে গোলা ছুঁড়ে গুঁড়ো করছে অথচ শান্তি পুরস্কারে নোবল্ কমিটিতে নাম উঠেছে।

লোকটি॥ আপনাদেরও উঠবে।

জোনাকি॥ এটাও মাইরি ন্যাকামি করছে—(*লোকটির কাছে এসে উবু হয়ে বসে*) এই ওখেনে আমাদের নাম উঠবে কেন? আমরা হচ্ছি পুঁটি আর ওরা কাদ্‌লা। একই family বলে এক আসনে বসাবেন না।

লোকটি॥ আমি বসাবার কে বলুন?

বিচারক॥ তুমি শালা একটি বিচ্ছু। চুম্মেরে বস!—বিচার শুরু কর জোনাকি।

জোনাকি॥ বিল্টু বসু। বিল্টু বসু, বিল্টু বসু। (*বিল্টু আসে*)

বিচারক॥ এই যো, ছেলেটাকে চিনতে পার? (*দীপা-রাণা মাথা নাড়ে*) ইতি উতি ঘুরঘুর করছিল—নজরে ঠেকতেই তুলে নিয়েছি। ওকে আমি নিচ্ছি, পুষ্যি নিচ্ছি।

জোনাকি॥ কচি তাজা ছেলে দেখলেই মিলর্ড পুষ্যি নিয়ে নেয়। আজকাল তো যার যতো পুষ্যি—তার তত যজমানির জোর।

বিচারক॥ ছেলেটাকে পুষ্যি নেব, মা?

দীপা॥ সে আপনার ইচ্ছে!

বিচারক॥ তুমি কি বল, হ্যাঁগো ছেলের বাপ?

রাণা॥ আপনার মর্জি!

বিচারক॥ ও বিরোধী পক্ষ, ছেলেটাকে যে চাইগো।

লোকটি॥ 'চাই'না বলে 'দাও' বললেই তো পারেন।

বিচারক॥ তুই কি বলিস্ বিল্টে?

বিল্টু॥ আমার নাম বিল্টু।

বিচারক॥ ছেলে শৌখিন আছে, নামটা একটু তোব্‌ড়ালেই লাগছে। কি বলিস্ বি...ল্...টু!

বিল্টু॥ আমি যা বলব তাকি আপনাদের পছন্দ হবে? পছন্দ করার মালিক তো আপনি—

জোনাকি॥ তার মানে, হুজুর—সর্বসম্মতিক্রমে ছেলেটা আপনার হয়ে গেল।

বিচারক॥ হয়ে গেল? তোমারও দেখছি মাথাটা মোটা হ'চ্ছে। এই সর্বসম্মতির ফলটা বোঝ? এদের নষ্টামোটা ধরতে পারছ না? পাবলিকের কাছে এর ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে? বিনা বিচারে ছেলেটা আমার থলেতে চলে এল। পাবলিক একে আমাদের কারসাজি ভাববে না? এরা বিচারটাকে অ্যাভয়েড করছে। (*নেমে এসে*) বিচার নেই—না? ডিমোক্র্যাসির কণ্ঠরোধ হচ্ছে? আমাকে ডিমোক্র্যাটিকালি এগুতে না দিলে তোদের প্রত্যেকটাকে কুঁদো মারব! মার কুঁদো—মার—(*রক্ষীরা ধীর পদক্ষেপে সশস্ত্র এগোয়*). . . ভিটেয় ঘুঘু ছেড়ে দে. . . মার, মার কুঁদো। (*রক্ষীদের বর্বরতার মূকাভিনয়। এদের আর্তনাদ*)

সবাই।। বিচার—বিচার করুন!

বিচারক।। বিচার শুরু হোক। বিচার চাইছে যখন শুরু করা যাক।

জোনাকি।। সব পজিশন নিন্। বিল্টু কাঠগোড়ায়, (*দীপা-রাণাকে*) আপনারা সাক্ষী। আমরা দুজন উকিল—দু'ধারে। আর উনি আমাদের মাথায় উপর। আজ যা ফাইট্ দেব না! কাগজে হেডলাইন চাই—হ্যাঁ!

বিচারক।। (*বিরোধী পক্ষের উকিলকে*) নাও, সওয়াল শুরু কর।

লোকটি।। কিন্তু মানে. . . আমি তো কিছুই জানি না।

লোকটি।। ওকে একটু prompt কর জোনাকি।

লোকটি।। কিন্তু আমি prompt শুনে কেন বলব?

বিচারক।। বিচারটা কে করছে? আমি না তুমি? আমি যেমন করে সাজাব বিচার ঠিক তেমনি করে হবে। prompt কর।

জোনাকি।। বলুন, বিল্টু তুমি কাদের ছেলে? বল, কাদের ছেলে?

লোকটি।। বিল্টু তুমি কাদের ছেলে? বল, কাদের ছেলে?

বিল্টু।। ওঁরা আমার বাবা, আমার মা।

জোনাকি।। (*দীপা-রাণাকে*) বলুন, খোকা খোকা—বিল্টু বিল্টু সোনা, আমাদের শূন্য কোলে ফিরে আয় বাছা।

দীপা।। কিন্তু ওতো আমাদের ছেলে নয়।

বিচারক।। তাতে কি?

রাণা।। কোর্টের কাছে মিথ্যে বলব?

বিচারক।। যা বলছি তাই বলবি—সত্যি মিথ্যে বিচারের ভার তো আমার। ছেলেটার দুটো রেজিস্টার্ড বাবা-মা না পেলে পুষ্যি নেব কার কাছ থেকে? বল্!

জোনাকি।। খোকা খোকা—বিল্টু—বিল্টু সোনা, আমাদের শূন্য কোলে ফিরে আয় বাছা—

দীপা।। ঐ রকম সুর করে বলব? নাটুকে শোনাচ্ছে না?

লোকটি।। ওঁরা না হয় ওঁদের মতো করেই বলুন না।

বিচারক।। (*ভেঙচিয়ে*). . . অ্যাডভাইস দিচ্ছে! দুজনে মিলে কোরাসে বল্।

জোনাকি।। বলে দিন। ঝামেলা কচ্ছেন কেন? বলুন।

দীপা-রাণা।। খোকা খোকা—বিলটু বিলটু সোনা, আমাদের শূন্য কোলে ফিরে আয় বাছা!

লোকটি। তাহলে এবার আমি চলি?

বিচারক।। কেন?

লোকটি। ওরা তো স্বীকার করে নিলেন, বিল্টু এদের ছেলে।

[*কথা শেষ করেই লোকটি চলে যেতে থাকে। বিচারক হঠাৎ ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারে।*]

বিচারক।। এই এই এই এই এই—

জোনাকি।। (*কিছু না বুঝে*) এই এই এই এই—

লোকটি।। (*আচমকা চ্যাঁচামেচিতে ঘাবড়ে গিয়ে*) এই এই এই এই—

বিচারক।। এই যা! অ জোনাকি, বড্ড তাড়াহুড়ো হ'য়ে গেল—পাঁচ পাবলিকের 'ডাউট্' হবে যে! একটু টেনে বাড়াও—কেমন খিঁচ রয়ে গেল।

জোনাকি।। ডাউট রয়েতো যাবেই। পুষ্যি চাই, পুষ্যি চাই বলে হড়বড়িয়ে হাতখানা যে বাড়িয়ে দিলেন! পেটেতো খিদে চাপতে পারেন না। (*দীপাদের*) শুনুন গোড়াতে অস্বীকার করুন যে ও আপনাদের ছেলে।

রাণা।। তাই তো করেছিলাম।

জোনাকি।। ওটাই রিপিট্ করবেন। (*লোকটিকে*) আর শুনুন, আপনি প্রমাণ করবেন, বিল্টু ওদের ছেলে। শেষতক্ আপনারাও মেনে নেবেন। ব্যাস্ । এবার চলুক।

বিচারক।। এবার চলুক।

লোকটি।। বিল্টু আপনাদের ছেলে?

দীপা।। অতোবড় ছেলে আমাদের কি করে হয়?

লোকটি।। কিন্তু আপনারাও তো একদিন জনক-জননী হবেন। ভূমিষ্ঠ হবে যে জাতক, সেওতো একদিন এতো বড়ো হবে। কল্পনা করুন না—ভবিষ্যতের সেই ছেলেটি আপনাদের মুখোমুখি। ভবিষ্যতের মুখ স্পষ্ট চেনা যায়না তাই আপনারাও বিল্টুকে চিনতে পারছেন না।

রাণা।। সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা ভেবে নিলে অবিশ্যি—

দীপা।। কিন্তু আমাদের কল্পনাতো আমাদের কাছে চেনা চেনা লাগবে?

লোকটি।। একদিন কিন্তু ও আপনাদের কল্পনার মধ্যেই ছিল। সে ওর শৈশব আর বাল্যের কথা। তখন নিজদের পছন্দমতো ওর চোখ এঁকেছিলেন, মুখ এঁকেছিলেন।

রাণা।। নিজের ছেলেকে নিজের মতো করেই তো মানুষ গড়তে চায়।

লোকটি।। অথচ নিজের ছেলেকে স্বচ্ছন্দে আপনি একদল ছেলেধরার খপ্পরে তুলে দিতে চাইছেন। ওকে আগলে ধরুন। বলুন, ও আপনাদের ছেলে।

জোনাকি।। হুজুর আপনাকে ছেলেধরা বলছে!

বিচারক।। বেশ করছে! শালা—নালিশ না করে উল্টো চাপ মারতে পার না? ঢেঁড়সের জাত! পাল্টা মার—শুয়োর কোথাকার!

জোনাকি।। বিচারককে অশোভন শব্দে অলঙ্কৃত স্যরি কলঙ্কিত করে আদালতের অবমানা হচ্ছে! Objection-objecion!

বিচারক।। সাসটেইন্ড।

জোনাকি।। এই sunstained হবার ফলটুকু বুঝবেন'খন--নিন চালান।

লোকটি।। আপনাদের ঘরে যেটুকু বাতাস, ছোট্ট বিল্টুকে তার বেশি আপনারা দিতে চাননি, অথচ বাইরে বাতাসটা তখন ঝড় তুলবে বলে সময় গুনছে। আপনাদের চার দেওয়ালের মধ্যে যেটুকু আলো তার বেশি ছোট্ট বিল্টুকে আপনারা দেখতে দেননি। অথচ বাইরের আলো তখন রাগে-গর্জনে আগুন হয়ে ওঠার মুহূর্ত গুনছে। আপনাদের একটা ফ্রিজ আছে, তাইনা?

দীপা।। হ্যাঁ, আছে।

লোকটি।। এই বিল্টুই সেই ফ্রিজটা। আপনারা ওকে ঠাণ্ডা ক'রে ক'রে হিম করে দিয়েছেন। বাইরের তাপে আপনাদের ভয়। অথচ ঘরে যে বরফের পাহাড় হচ্ছে আপনারা কিছু টের পেলেন না।

রাণা।। এসব আপনার অনুমান। নিজেদের মনের মতো করে গড়লেই সন্তান বরফের টুক্‌রো হয়ে যায়?

দীপা।। আমাদের ভালবাসা, আমার নিজের ছেলেকে যে ভালবাসা দেব তার কোনও তাপ নেই?

লোকটি।। (*দীপাকে*) আপনার গর্ভে ওর একটা মুখ গড়ে উঠেছে। আর পৃথিবীর গর্ভে ওর আর একটা মুখ গড়ে উঠতে চায়। আপনারা তা চাননি। বিল্টু দ্বিতীয়বার জন্মাল না। বিল্টুর তাকাবার চোখ এল, পৃথিবীকে দেখবার মতো চোখের মণিটা এলনা। আপনাদের গলা জড়িয়ে ধরার হাত হল, দুনিয়াটকে মুঠো করার আঙুল হল না। আপনারা ওকে কোলে নিয়ে কেবল আদর করলেন এসব কিচ্ছু টের পেলেন না।

রাণা।। আমাদের ঘরটা কি দুনিয়া ছাড়া কিছু?

দীপা।। আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে বাইরের কোনো মিল নেই বলতে চান?

লোকটি।। পৃথিবীটাকে ছেঁটে-ছুটে বড্ড ছোট্ট করে নিয়েছেন। নিজেদের মাপে যেমন জামা পরেন, দুনিয়াটাও আপনাদের কাছে তেমনি। অথচ বিল্টু মাঝে মধ্যে ওর জামাটা ছিঁড়তে চেয়েছে কারণ পৃথিবীর সব সন্তান তাই-ই চায়, চাইবে, চাইতে হবে। বিশ্বাস না হয় সাক্ষী হিসেবে সেই ছোট্ট বিল্টুকে জিজ্ঞেস করুন।

জোনাকি।। কাকে?

লোকটি।। ছোট্ট বিল্টুকে। যে আপনাদের সংসারে একটি দশ বছরের বালক। স্কুলে পড়ে আর বাড়ি ফেরে। বাইরে যার মিশতে বারণ, কারণ বাইরের হাওয়াটা দামাল। যে মাঠে খেলতে পায়না—বারান্দায় বাবার সঙ্গে বল পেটাপিটি খেলে। আমার সেই ছোট্ট সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করুন, আমার কথার সত্যতা টের পাবেন।

জোনাকি।। স্যার, একটা কুচো ছেলে রিকুইজিশান করুন।

বিচারক।। নিজে খোঁজ। এখানে বসে বসে তোমার ফুটফরমাস খাটব না?

লোকটি।। দরকার নেই। বিল্টুই ছোটবেলায় ফিরে যাবে। ও নয়-দশ বছরের ছেলে হয়ে সাক্ষী দেবে।

জোনাকি।। অতোবড় ছেলে বাচ্চা সাজবে?

লোকটি।। সাজবে, যুবক ছেলে থিয়েটারে বুড়ো সাজে না? দয়া করে আপনারা সবাই মেনে নিন। এ ব্যাপারে আমি বিচারকের নির্দেশ চাইছি।

বিচারক।। চলুক।

লোকটি।। ঠিক আছে, আপনারা মনে করুন এই ছেলেটির নাম বিল্টু। বিল্টু স্কুলে যাচ্ছে। তার বয়স দশ।

রাণা।। পিঠে স্কুলের ব্যাগ, বিল্টু স্কুলে যাচ্ছে। আমাদের রক্ত, আমাদের ইচ্ছে—সাধের মধ্যে এরকম একটা বিল্টু কিন্তু ছিল।

দীপা।। আমি মাথা আঁচড়ে দিচ্ছি, টিফিন-বাক্সে খাবার, মিষ্টি মুখটা। বড় বড় দুটো চোখ। আমাদের রক্ত আমাদের ইচ্ছে সাধের মধ্যে এরকম একটা বিল্টু সত্যি কিন্তু ছিল।

রাণা।। খেলনা নিয়ে আমাকে ডাকে,ওর সঙ্গে খেলতে হবে, পার্কে ওর পিছেপিছে ছুটছি—এরকম একটা বিল্টুকে আমরা চিনি।

দীপা।। আমরা গলাটা না জড়ালে ওর ঘুম হবে না। ওর কচি মুখের অদ্ভুত নিশ্বাস। এরকম একটা ছোট্ট বিল্টুকে আমরা চিনি।

লোকটি।। তাহলে বিল্টু সেই ছোটবেলায় ফিরে যাক্। দেখুন চিনতে পারেন কিনা। বিল্টু তুমি নয়-দশ বছরের বাচ্চা হয়ে যাও। কি, পারবে না?

বিল্টু।। কিন্তু সবসময় ওঁরা আমাকে চিনতে পারেন না। একটু আগেও চিনতে চাননি।

লোকটি।। আর একবার চেষ্টা কর—ওরা পারবেন, ঠিক চিনবেন। ছোট্ট একটা বিল্টু হতে তুমি পারবে না?

বিল্টু।। না পারার কি আছে? আমি স্রেফ্ অ্যাক্টিং করে যাব। থিয়েটারে তো সব ধরে নিতে হয়। ধরে নিন, আমি ছোট্টটি। ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। (*লোকটি নিজের ব্যাগ ওর পিঠে ঝুলিয়ে দেয়*)

বিল্টু।। মামুনি, চুল আঁচড়ে দাও। ও মামুনি. . . ওঃ আঙুল চোষার অভ্যেস ছিল। (*আঙুল চোষে*) মামুনি ইস্কুলে দেরী হয়ে যাবে। হেডস্যার বকুনি দেবে মামুনি।

লোকটি।। (দীপাকে) কই, চুল আঁচড়ে দিন।

দীপা।। কী বলছেন, এতোবড় ঢ্যাঙা ছেলেকে ছোট্ট খোকা ভাবব কি করে? যা হাসি পাচ্ছে!

লোকটি।। হাসির ব্যাপার নয়। ও তো না—হেসে করছে।

রাণা।। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।

দীপা।। চিরুনিটা কোথায় গো? (*রাণা পকেট থেকে চিরুনি বের করে দেয়*) বারণ করেছিনা আঙুল চুষবেনা!

বিল্টু।। চুষব!

দীপা।। (*হাতটা নামিয়ে দেয়*) না চুষবেনা, একদম চুষবেনা!

বিল্টু।। বাপ—এই বাপি!

রাণা।। বাপি ডাকটা আমার ঠিক—মানে কিরকম. . . পছন্দ হয় না।

বিচারক।। আবার পছন্দ! বাপিই ডাকবে! ডাক্, বাপি ডাক্!

বিল্টু।। বাপি, মামুনি আমায় বকছে বাপি। আমি ইস্কুল থেকে আর বাড়ি ফিরব না। ঠিক গ্যাঙে মিশে যাব।

রাণা।। কোথায় মিশে যাবে?

বিল্টু।। ছেলেদের গ্যাঙ আছে। সেই গ্যাঙে।

দীপা।। আচ্ছা এইসব কথা কিন্তু এ বয়সে ঠিক. . . মানে-বড্ড পাকা পাকা শোনাচ্ছেনা?

লোকটি।। তাতো শোনাবেই। কথাগুলো বলছে যে একটা পাকা বয়সের লোক। একটা শিশুর সমস্যা, মতামত শিশু কোনদিন বলার সুযোগ পায় না। কারণ তার বয়সটাই allow করবে না। একজন বয়স্ক লোক যখন শিশুর পার্ট করে তখন সে সুযোগটা আমরা নিতে পারি। সে শিশু-অথচ বয়স্ক। কাঁচা অথচ পাকা। ব্যাপারটা এভাবে ধরলে কিন্তু সমস্যা মিটে যায়।

বিল্টু।। কি গো বাপি, তালে গ্যাঙে ভিড়ে যাই? যাচ্ছি কিন্তু—যাই?

দীপা।। কেন, কি মধু আছে ওখানে?

বিল্টু।। ওদের সঙ্গে .থাকব। তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে যাব।

রাণা।। তুমি বড় হও। লেখা পড়াশেখো, তখন তুমি ঠিক বড়লোক হবে।

বিচারক।। ছেলে ambitions আছে। ভুঁয়ে পা ঠেকিয়েই ট্যাকা খুঁজছে। জোনাকি, এ যে আমাব বুকের ধন।

বিল্টু।। মামুনি, তখন আমি সত্যি সত্যি বড়লোক হব?

দীপা।। সত্যি সত্যি হবে।

বিল্টু।। ভক্কি দিচ্ছনা তো?

রাণা।। ওরকম ভাষায় কথা বলে না!

বিল্টু।। ভাষাটাষায় গুলি মার। বড়লোক হব কি না বল। বল বলছি—না হলে কিন্তু দাঁতে কেটে শাড়ি ছিঁড়ে দেব। বল—(*শাড়িতে দাঁত বসায়*) বল—

দীপা।। আরে বড়লোক হবে বলছি তো!

বিল্টু।। (*তালি দিয়ে*) কি মজা বড়লোক হব। কী মজা।

বিচারক।। কি উচ্চাশা! সোনা ছেলে! দেখো জোনকি, সোনা খোকাটা কেমন তালে বাড়ছে! (*তরতর করে নেমে এসে বিল্টুর গালে একটি চুমু খায়।*) মান্তু ছেলে, মিত্তি ছেলে!

বিল্টু।। (*প্রায় কেঁদে*) হামি খেল! মামুনি বুড়োটা গালে হামি খেল!

দীপা।। এটা কি করছেন?

বিচারক।। ওর কথাগুলো একেবারে চিৎমহলে গিয়ে টঙ্কার তুলে দিল ভাই। হামি -তে দোষ কি? শিশুর গাল-তো।

জোনাকি। তাছাড়া ফিমেল তো নয়।

বিল্টু।। বাপি, লোকটাকে বকে দাও বাপি!

রাণা।। না খোকন, উনি বিচারক, আমাদের কর্তা, ধমকালে কোর্টের অপমান হবে।

বিল্টু।। সাহস নেই, বল। বাচ্চা পেয়ে আমাকে বেশ পট্টি দিচ্ছ, আসল জায়গায় সবাই ভক্ত হরিদাস!

দীপা।। দেখুন আপনার কথার সঙ্গে তো মিলছে না—গোড়া থেকেই একটা বখা ছেলে এনে হাজির করলেন। আমাদের রুচির সঙ্গে তো এর কোন মিল নেই।

রাণা।। আমাদের মতো করে ওকে গড়তে দিন। আমাদের প্রভাবটা দেখান।

লোকটি।। Good। ভেবে ভাল লাগছে, যে পথে বিল্টু যাচ্ছিল, তা আপনাদের মনঃপূত নয়। ঠিক আছে অন্যভাবে দেখা যাক। বিল্টু অন্যপথে হাঁটুক।

বিল্টু।। অন্যপথ? যে পথেই হাঁটি আমাকে তো পা বাড়াতেই হবে। আর বাড়াতেই তো বিচারকের কাঠগোড়াটা পথ আগলে দাঁড়ায়! ওটাকে আমি ভাঙতে চাই। ওখান থেকে বিচারককে টেনে নামিয়ে এই কাঠগড়াটায় দাঁড় করাতে ইচ্ছে করে, রক্ষীগুলোকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

বিচারক।। জোনাকি! সেয়ানা ছেলের জিভটাকে টেনে সোজা করতে হচ্ছে—ওকে ধরে আন। (*রক্ষীরা এগোয়*)

উকিল।। আপনাদের ছেলেটিকে বাঁচান।

দীপা।। ওকে ছেড়ে দিন, আমরা বোঝাব।

রাণা।। আমরা কথা দিচ্ছি ও আমাদের কথা শুনবে— ওকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন।

[রক্ষীরা বিল্টুকে ঘিরে ধরে। বিল্টু ক্রমশ নিদ্রাতুর হয়ে পড়ে।]

জোনাকি ।। হুজুর গুটিয়ে ফেলুন। এটার তো হয়ে এসেছে। (*বিচারক হাত নাড়তেই রক্ষীরা ফিরে যায়। দীপা-রাণা বিল্টুকে আগলে ধরে*) ধাতে যখন সয়না—কি দরকার এসব। একলাইন আউড়েই মানিক আমার নেতিয়ে পড়েছে। ভয়ের কিছু নেই হুজুর। জেগে উঠছে।

[*বিল্টু ধীরে তাকায়*]

বিল্টু ।। রাগটা আমার জেগে থাকতে পারছে না কেন? আমার পাশে যেন কাদের খুঁজছি। কারা যেন আমাকে জাগিয়ে রাখতো, জাগিয়ে রাখার কথা বলতো. . . মা. . .বাবা, আমার ঘুম পায় কেন? তোমরা আমাকে জাগিয়ে রাখ—আমার পথ কোথায়, কোনদিকে? চোখ বুজে আসছে কেন? মাগো—মাগো তোমরা কোথায়, কোনদিকে?

দীপা ।। এই তো খোকা তুই আমার কাছে।

রাণা ।। ভয় কিরে এই তো আমরা।

লোকটি ।। মহামান্য বিচারক, মা-বাবা তাঁদের সন্তানকে আগলে ধরেছেন। বিল্টু যে ওদের ছেলে তাতে নিশ্চয়ই এখন আপনার আর কোনো সন্দেহ নেই।

বিচারক ।। চোপ-শালা! শুঁড়ির সাক্ষী। আমি আমার রায় দিচ্ছি। মা তার ছেলেকে ঘুম পাড়াবে, বাবা চৌকি দেবে। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে ছেলে ওদের। জাগলেই আমার।

রাণা ।। (*বিল্টুকে*) শোন, শোন, না ঘুমুলে তোমাকে যে আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না। মা ঘুম পাড়ানি গান গাইবে—ছেলে ঘুমুল পাড়া জুড়োল. . .

বিল্টু ।। . . . দেশজুড়ে তারপর বর্গীর ঘোড়া ছুটবে. . .মা গো, তবু আমার ঘুম পায় কেন?

বিচারক ।। জ্বালাতুনে ছেলে তো বড্ড বাচাল! হাড় ভেঙে দিতে হয়! দেব ঠুকে সাত বছর। জোনাকি!

[*জোনাকি হাতুড়ি এগিয়ে দেয়*]

দীপা ।। ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়, শীগ্গির ঘুমোও। ঐ দ্যাখ জুজুবুড়ো আসছে! ওরে বাবা, কতো বড় দাঁত! কতো লম্বা হাত! একটানে তোমাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নেবে। শীগগির ঘুমোও।

বিল্টু ।। ন্না—

রাণা ।। আবার কথা বলে! ঐ দ্যাখ হাতে কি? ও বাবা, কতোবড় গদা!

বিচারক ।। (*ভয় দেখানোর মতো ভয়ঙ্কর গলায়*) আসব নাকি? মাথা গুঁড়িয়ে দেব?

দীপা ।। (*পিঠে থাবড়ে*) চোখ বোজো। চোখ বোজ! জুজু আসছে। ঘুমোলে কিছু বলবে না। আর না ঘুমোলেই ধরে নিয়ে যাবে।

বিচারক ।। এই ধরলুম! কি ঘুমিয়েছে? ধরলাম কিন্তু!

[*একটা ভয়ঙ্কর মুখোশ আঁটে বিচারক*]

দীপা ।। না-না কেউ ধরবেনা। খোকা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে পড়েছে। (*বিল্টুর পিঠে হাত বোলায়। বিল্টু ঘুমিয়ে পড়ে*) খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে। ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখি চোখ, হ্যাঁ—ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে।

বিচারক ।। বেশ করেছে। এবার উকিলগণ বিদেয় হও।

[*জোনাকি ও লোকটির প্রস্থান*]

রাণা ।। ওকে নিয়ে যাব তো?

বিচারক ।। কোথায়?

দীপা ।। বাড়িতে।

বিচারক ।। যখনই জাগবে আর বেয়াড়া বেয়াড়া কথা বলবে এমনি ঘুম পাড়াতে পারবে তো?

দীপা ।। ঠিক ঘুম পাড়িয়ে দেব।

বিচারক ।। দুজনে কথা দিচ্ছ?

রাণা ।। দিচ্ছি।

নেপথ্যে ।। (*হঠাৎ*) বিল্টু!!

বিচারক ।। কে? বাচ্চার ঘুমটা ভাঙাচ্ছে কে? জোনাকি—

[*উঠে দাঁড়ায় বিচারক*]

জোনাকি ।। (*দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকে*) একটা বদরাগী ছেলে হুজুর। *ঠেলেঠুলে* কোর্টে ঢুকে পড়েছে। বিল্টুকে নিয়ে যাবে বলছে।

[*২য় ছেলেটি দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়*]

বিচারক ।। কেন হে, কি বৃত্তান্ত?

২য় যুবক ।। সবাই মিলে ওকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। তাকি হয়? তাই ওকে নিয়ে যাব। বিল্টু—

[*২য় যুবক দু'পা এগোয়*]

বিচারক ।। (*সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে*) ফের ডাকে! দেখছনা ঘুমোচ্ছে। আমরা পাহারা দিচ্ছি। ফের চেঁচিয়েছ কি গর্দান।

রাণা ।। শুনুন, উনি রায় দিয়েছেন, বিল্টু এখন ঘুমোবে। উনি আমাদের বিচারক।

২য় যুবক ।। আপনাদের বিচারক। আমাদের নয়।

দীপা ।। ও জেগে উঠলে উনি ভীষণ চটে যাবেন। ওঁকে চটানো ঠিক হবেনা।

২য় যুবক ।। কিন্তু ওকে না জাগালে আমরাও যে ভীষণ চটে যাব।

বিচারক ।। সেই একগুঁয়েমি! বলেছিনা—ও ঘুমোলে ওদের, জেগে উঠলেই আমি নিয়ে যাব, ব্যস্ কোনই কথা নয়। (*চেঁচিয়ে*) এ ছেলে আমার!

২য় যুবক ।। এ ছেলে আমাদের! আমরা ছাড়ব না। পৃথিবীর সমস্ত ঘুমটাকে আমরা জোরে নাড়া দেব। অনেকগুলো হাত চাই আমাদের। আমরা কাউকে ছাড়ব না। বাতাস আটকাবেন না। ঝড়ে ভেঙে পড়বেন। বিল্টুকে দরকার। ও আমাদের। বিল্টু—

বিচারক ।। আবার বলছি ঘুম ভাঙিও না।

দীপা ।। বিল্টু আমাদের। আপনারা কেন কাড়াকাড়ি করে নেবেন?

রানা ।। আশ্চর্য। আমাদের ছেলে অথচ আমাদের দাবি আপনারা কেউ মানবেন না?

২য় যুবক ।। আপনাদের জোর থাকে আপনারা নিয়ে নিন। আমার জোর থাকলে আমি নেব।

বিচারক ।। জোরের দেমাক দেখিও না ছোকরা।

২য় যুবক ।। আবার বলছি বাধা দেবেন না। (*বিল্টুর কাছে যায়*) বিল্টু!

বিচারক ।। শাট আপ!

[*বিল্টু একটু নড়ে। গোঙায়। সবাই চুপ ক'রে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে। বিল্টু ধীরে ধীরে তাকায়। ঠোঁট নড়ে, কিছু শোনা যায় না। সবাই ঝুঁকে পড়ে*]

রাণা।। ও হয়তো কিছু বলছে। বিল্টু জোরে বল।

দীপা।। নিশ্চয়ই বাড়ি যেতে চাইছে। খোকা আমার হাত ধর খোকা।

২য় যুবক।। আমরা ডেকেছি, ও শুনতে পেয়েছে। বিল্টু এদিকে আয়। আমরা এদিকে, বিল্টু।

বিচারক।। অসম্ভব, ও আমার সঙ্গে যাবে। এই যে, এদিকে এস গোপাল।

রাণা।। বিল্টু জোরে বল।

২য় যুবক।। বিল্টু এদিকে আয়।

বিচারক।। লাউডার, লাউডার।

দীপা।। খোকা এদিকে আয়।

২য় যুবক।। বিল্টু এদিকে।

রাণা।। জোরে বল বিল্টু।

বিচারক।। লাউডার-লাউডার—

[*সকলের মধ্যে হঠাৎ মাইক্রোফোনে বিল্টুর গলা—*]

বিল্টু।। আঃ থামো! কতো দিক কতো পথ কতো ডাক। সবাই মিলে আমাকে ডাকছ। কিন্তু আমি কার কাছে যাব? আমি চেঁচিয়ে কোন কথা বলব? এত কথা চারদিকে, কিন্তু আমার নিজের কথা কেন একটিও মুঠোয় নেই। মা, তুমি দেখ, আমার ঠোঁটের সাথে কথা মিলছেনা। বাবা, আমি শব্দ ধার করে কথা শোনাচ্ছি। আমি হাত তুলি, কিন্তু নামাতে পারিনা। যতো হাঁটি ততো পথ হারাই, যতো পথ হারাই—ততো পথ বেড়ে যায়। কি ভীষণ ক্লান্তি! আমার ঘুম পায় মা! আর এই ঘুমের মধ্যে আমাকে নিয়ে কী দারুণ কাড়াকাড়ি। আমি কার মা? আমি কোথায় যাব মা? আমার পথ? গর্ভ থেকে পৃথিবী কিন্তু তারপর? এবার আমাকে কাদের হাতে তুলে দিলে? কাদের হাতে তুলে দিলে তোমার সুখ, মা?

[**অন্ধকার**]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ আলোকিত হলে রাণাকে দেখা যায়। রানা দর্শক সমাজের উদ্দেশ্যে বলে—]

রাণা।। সমাজ এবং রাষ্ট্রের দূষিত রক্তে পুষ্ট প্রভুরা চায় নতুন প্রজন্মকে তাদের দিকে টেনে নিত নইলে তাদের স্বার্থের সিংহাসনে ক্ষয়রোগ ধরবে। শুভ-শক্তির যাত্রা পথে

নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা সমবেত হোক— দেশের অপশক্তি তা চাইতে পারে না। তাই বিল্টুকে ওরা দখল করতে চেয়েছে। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধের জন্য শুভ ও সঠিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাবা-মায়েরও একটা ভূমিকা থাকে যাতে তাদের সন্তান বিভ্রান্ত না হয়, বিপথে পদক্ষেপ না করে। বিল্টুর বাবা-মায়ের ভূমিকায় এই কর্তব্য আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। অন্যায় চক্রান্ত এবং শঠতার বিরুদ্ধে রুখে উঠতে পারিনি। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে অনুরূপ একটি চক্রান্ত ঘটেছিল বলে ভাবা যেতে পারে। সেখানে ভবিষ্যৎ সন্তানের পিতা মহাদেব এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন—যার পরিণাম মদন-ভস্ম। প্রাসঙ্গিক মনে করে তাই এই পৌরাণিক বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মঞ্চে উপস্থিত করতে চাইছি।

[*মঞ্চের আলো সরে যায়। অন্ধকারে রাণাও চলে যায়। একটা বাদ্যধ্বনি শোনা যায়। সর্বজনীন পুজোর প্রচলিত বাজনা। ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা ইত্যাদি ধরে ধীরে কমে আসে এবং শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। তিনবার শঙ্খধ্বনির পর মঞ্চে আলো জ্বলে উঠবে। কয়েকটি চালচিত্রে ইন্দ্র যম দেবতাদি বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। প্রত্যেকের হাতে সোমপাত্র। এরা সোমরসে চুমুক দিচ্ছেন, শিরে করাঘাত করছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন। ইন্দ্র একেবারে নেশায় মুহ্যমান। এসময়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মরুৎ প্রবেশ করে।*]

মরুৎ ॥ দেবরাজ! দেবরাজ! (*কেউ দৃক্‌পাত করেনা*) কি আশ্চর্য! চরম বিপদ্‌কালেও দেবগণ সোমরসে আচ্ছন্ন! দেবরাজ ইন্দ্র! (*ইন্দ্র নিশ্চল*) আচার্য বৃহস্পতিস্পতি? (*বৃহস্পতিস্পতি নেশার্দ্র ভ্রূকুটি করে*) কালান্তক যম ! (*যম মাথা নাড়ে*) জলাধিপতি বরুণ! (*বরুণ কেঁদে ওঠে*) একি! দানব তারকাসুরের আক্রমণে স্বর্গ বিপর্যস্ত, দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হতে চলেছেন, অথচ এখনো এঁরা নেশায় অবিচল!

যম ॥ কে? কে কথা বলে! আমাদের নেশাচ্ছন্ন মনে ক'রে কোন অধম আমাদের চরিত্রহনন করছে?

বৃহস্পতি ॥ একটু শোক প্রকাশ করব তারও উপায় নেই।

বরুণ ॥ নাম বল, ভাল করে চোখ চাইতে পারছিনে।

মরুৎ ॥ আমি মরুৎ। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচর।

ইন্দ্র ॥ মরুৎ? কি সংবাদ মরুৎ! স্বর্গের অবস্থা কি?

মরুৎ ॥ স্বর্গের এই সিংহাসন সম্ভবত আর কিছুকালের মধ্যেই দানব তারকাসুরের অধিকারে আসবে।

ইন্দ্র ॥ স্তব্ধ হও মরুৎ!

মরুৎ ॥ আমি স্তব্ধ হলেও তারকাসুরের অস্ত্রতো স্তব্ধ হবে না। নন্দনকাননে এখন দানব সৈন্যের শিবির।

বৃহস্পতি ॥ কি বলছ?

মরুৎ ॥ বহু দেবসৈন্য পাতালে পলায়ন করেছে। নাগরিকদের ক্রন্দনে স্বর্গ বিপর্যস্ত।

যম ॥ নাগরিকদের কথা ছাড় মরুৎ—কাঁদতে পেলে ওদের আর কিচ্ছু চাইনা।

বরুণ। যদি আমাদের দেবসভা রক্ষা পায় তবেই ওদের কথা ভাবা যাবে।

মরুৎ ॥ দেব-কোষাগার লুণ্ঠিত।

ইন্দ্র ॥ কোষাগার লুণ্ঠিত হলে আর কি থাকে মরুৎ? আমরা যে এবার নিঃস্ব হলাম।

মরুৎ।। দানব সৈন্য অতঃপর আপনাদের ঘেরাও করবে।

ইন্দ্র।। আমার পালাবার পথ অবরুদ্ধ নয়তো?

বরুণ।। দেবরাজ আপনি একা পালাবেন? আমাদের কি হবে?

ইন্দ্র।। যদি সম্ভব হয়—তোমাদের একদিন আমি ঠিক উদ্ধার করব। চল মরুৎ, সুড়ঙ্গ-দ্বারে আমাকে নিয়ে চল।

বৃহস্পতি।। আমরা বড় একা হয়ে পড়ব ইন্দ্র!

ইন্দ্র।। একা! আমি একা পালাচ্ছিনা, সঙ্গে কাউকে চেয়েছি? এখনও পৌরুষ বিসর্জন দেইনি।

মরুৎ।। দেবরাজ! একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন না?

সবাই।। ইন্দ্র, হ্যাঁ শেষ চেষ্টা. . .

ইন্দ্র।। শেষ চেষ্টার কি সময় আছে মরুৎ?

মরুৎ।। সম্পূর্ণ স্বর্গ অধিকারে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। দেখুন কেউ যদি কোনও উপায় করতে পারেন।

ইন্দ্র।। উপায়? কে উপায় করবে?

বৃহস্পতি।। মহাদেব।

ইন্দ্র।। কিন্তু মহাদেবের প্রাধান্য তাতে বেড়ে যাবে না!

যম।। এই সঙ্কটকালে স্বর্গরাজ্য রক্ষা করাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত নয় কি?

ইন্দ্র।। মহাদেবকে আমাদের দলে কোনদিন পেয়েছ?

যম।। স্বর্গের গদিতে তো উনি বসতে চান না।

বৃহস্পতি।। ঠিক আছে চল পিতামহ ব্রহ্মা কি বলেন শুনি।

যম।। তারকাসুরের আক্রমণ থেকে স্বর্গরক্ষার মন্ত্র ব্রহ্মাই জানাতে পারেন।

বরুণ।। তাহলে এই ডেপুটেশন ব্রহ্মার সমীপে প্রার্থনা জানাতে একমত তো?

সকলে।। নিশ্চয়।

বৃহস্পতি।। দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মা সম্পর্কে কোনও বিরূপতা নেই তো?

ইন্দ্র।। দ্যাখো, কি আছে না আছে তাকি আর তোমাদের অজানা—এ ব্যাপারে কোন প্রকার 'মন্তব্য করিব না।' নো কমেন্ট। (*মরুৎ কে*) তুমি এবার যাও মরুৎ। তবে এটুকু আমাকে দুঃখের সঙ্গে মানতে হয় যে, স্বর্গের রাজা হলে ব্রহ্মার ইচ্ছার বাইরে কাজ করা দুঃসাধ্য। সিংহাসন রক্ষার জন্য, স্বর্গে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য এটুকু বশ্যতা আমার প্রয়োজন।

যম।। সাধু! সাধু!

ইন্দ্র।। আর আমার সিংহাসন যদি কায়েম থাকে তোমাদের চিত্ত কি প্রফুল্ল নয়?

বৃহস্পতি।। এতে আর লুকোছাপার কি আছে?

ইন্দ্র।। অতএব আমরা এই ডেপুটেশনে একজোট হলাম।

বরুণ।। জোটবন্ধন-ই সিদ্ধির উপায়।

ইন্দ্র।। তাহলে ব্রহ্মার সমীপে যাচ্ছি। ডেপুটেশন, মুখ বিষণ্ণ কর।

[*তথাকরণ।*]

ইন্দ্র।। ব্রহ্মাকে দ্রব করার জন্য আমরা তাঁর স্তুতি দিয়ে শুরু করব। কারণ স্তুতিই

হচ্ছে কার্যসিদ্ধির আদি মন্ত্র। বিশেষত আমরা সকলেই জানি, যিনি যতোবড় দেবতা তিনি ততো স্তুতির ভক্ত।

বৃহ।। প্রথমে ইন্দ্র স্তুতি গাইবে—আমরা দোহার গাইব।

[ইন্দ্র গলা ঝেড়ে নেয়। উর্দ্ধের কার্টেনের আড়ালে দেখা দেয় চতুর্মুখ ব্রহ্মা। চারজন অভিনেতার চারটি মাথা চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে চতুর্মুখের রূপ ধারণ করবে। তাদের মেকআপ একই রকম। তারা প্রয়োজন হলে আলাদা হতে পারে, আবার পরিকল্পনা মতো একত্রিত হবে। তাদের বুকের কাছ থেকে কার্টেন নেমে গেছে। প্রথম মুখ চতুর্মুখের প্রধান মুখ।]

ইন্দ্র।। (*পাঁচালির সুরে*)

তুমি যে পিতার পিতা পূজ্য পিতামহ।
ভজনে পূজনে জপি তোমারে প্রত্যহ।।

(*দুলে দুলে সমবেত কণ্ঠে*)

দেবগণ।। ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা; ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা।

ইন্দ্র।। ধন দন্ত সিংহাসন প্রমোদ পূজায়
ছিলাম পরম যত্নে তোমার কৃপায়।।

দেবগণ।। ওম, ব্রহ্মা, ব্রহ্মা; ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা।

ইন্দ্র।। প্রবল তারকদৈত্য স্বর্গ নিল কেড়ে।
রত্নের ভাণ্ডার ছেড়ে বাঁচি কি প্রকারে?

দেবগণ।। ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা; ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা।

ইন্দ্র।। চক্ষু মেলি দেখ এবে বিধি হইল বাম।
করতল হ'তে খসে প্রিয় স্বর্গধাম।।

দেবগণ।। ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা; ওম ব্রহ্মা ব্রহ্মা।

ইন্দ্র।। মারিলে মারিতে পার, রাখিলে রাখিও।
স্বর্গে বড় মজা ছিল ভাবিয়া দেখিও।।

দেবগণ।। ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা; ওম্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা।

[ব্রহ্মা নির্বিকার। ওরা মুহূর্তকাল ওঁর মুদিত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

বৃহস্পতি।। এখনো মেলে না চক্ষু বিপদ বিষম,
বুড়ো বয়সে ভীমরতি হইল নাকি, যম?

যম।। স্তুতি কর, স্তুতি কর, স্তুতিই মোক্ষম।
আহার রোচেনা ভাল নুন হইলে কম।।

দেবগণ।। (*ধীর থেকে দ্রুতলয়ে কয়েকবার*) হে ভগবান, হে নিরঞ্জন, হে পরাৎপর, হে অপরূপ!

ইন্দ্র।। বিপদ্‌বারণ সর্বভূতাশ্রয় সর্ব নিয়মের নিয়ন্তা—তেনাকে স্তুতিতে ভাসিয়ে দাও!

[দ্রুতলয়ে বারবার দেবতাগণ স্তুতি করে]

দেবগণ।। হে ভগবান, হে নিরঞ্জন, হে পরাৎপর, হে অপরূপ—

[*ক্রমশ হাঁপিয়ে পড়ে*]

বৃহস্পতি।। বরুণ, দম যে ফুরিয়ে এলো বরুণ! একবার পিতামহের চারধারের মুণ্ডুগুলো ঘুরে দেখ না। দাদু একটিও যে চোখ খুলছে না।

[*বরুণ ঘুরে দেখতে থাকে সন্তর্পণে। পিছনে যায়—*]

বরুণ।। (*উৎফুল্ল*) পিছন দিকের মুণ্ডুর একটি চোখ খুলে টুলটুল করে তাকাচ্ছেন!

ইন্দ্র।। প্রণিপাত হও, প্রণিপাত হও! বিপদবারণ পিতামহের নয়ন মুকুলিত হচ্ছে! মুকুলিত হচ্ছে!

[*ব্রহ্মার সবকটি চোখ খুলে যায়—একই সঙ্গে চারটি মুখ একটু একটু করে পূর্ণ হাসিতে বিকশিত হয়। ১নং মুখটি প্রথমে কথা বলে। বাঁদিকে ২য়, দক্ষিণ ৩য় এবং পশ্চাতের চতুর্থ মুখ হাসিটি ধারণ করে থাকে। চতুর্থ মুখটি বেরিয়ে এসে তার হাসিটি দেখিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়।*]

১ম মুখ।। সুস্বাগতম্। সবদিক মঙ্গল তো?

[*হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে দেবতাগণ*]

১ম মুখ।। তোমরা না দেবতা! ছিঃ, ফুঁপিয়ে কাঁদেনা, কাঁদেনা বলছি!

[*কান্না আরও বেড়ে যায়*]

২য়।। (*গম্ভীর হয়ে*) কাওয়ার্ড!

৩য়।। (*বিরক্ত*) ছেলেমানুষি হচ্ছে না!

৪র্থ।। (*ক্রুদ্ধ*) এসব হচ্ছেটা কি, অ্যাঁ?

১ম।। তাকাও! (*সবাই তাকায়*) একি! হিমক্লিষ্ট প্রকাশাণি জ্যোতীংষিব মুখানিবঃ।

ইন্দ্র।। বাংলায় বলুন।

১ম।। বৃহস্পতি, অনুবাদ করে বল।

বৃহস্পতি।। পিতামহ বলছেন, হিমক্লিষ্ট নক্ষত্ররাজির ন্যায় আজ তোমাদের মুখ মলিন দেখাইতেছে কেন?

ইন্দ্র।। আপনি তো অন্তর্যামী! কি বলব সবই তো জানেন।

[*সবকটি মুখ মধ্যস্থলের মুখের কানের কাছে গিয়ে দ্রুত ঠোঁট নেড়ে কিছু ব'লে নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসে।*]

১ম।। হুঁ, বুঝতে পারছি। এই স্বর্গরাজ্যে তোমরা নিজেদের অধিকার হারাতে চলেছ। নইলে ইন্দ্র, তোমার ইন্দ্রধনুর কোণগুলো বেঁকে যাবে কেন? বরুণের প্রধান আয়ুধপাশ আহতবীর্য কাল-সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হবে কেন? যমের দণ্ড অনলহীন অঙ্গারের মতো ম্রিয়মান কেন? বুঝতে পারছি, সাগরগামী জলস্রোত অকস্মাৎ বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছে। একটু ঝেড়ে কাশ তো ইন্দ্র।

ইন্দ্র।। ঠাকুর্দা—

১ম।। (*ক্রুদ্ধ*) এটা একটা ডেপুটেশন! সম্বোধনগুলোয় অতো গলে পড়া আহ্লাদে-পনা এনো না! ধ্যানের মধ্যে শুনলাম, কোনটা যেন আবার ন্যাকাগলায় দাদু বলে ডাকছে! ধ্যান যদি পুরো ভাঙত—!

যম॥ সারারাত ঘুমোইনি পিতামহ, মাথার ঠিক নেই।

১ম॥ একরাত ঘুমোওনি তাতেই এই! আর আমাকে দেখ, চারিদিকে মাথা গিজ গিজ করছে। একটা দিনও মনের সুখে কাত হয়ে ঘুমুতে পেরেছি?

বরুণ॥ সবই অদৃষ্ট পিতামহ!

ইন্দ্র॥ বুড়োবয়সে তিলোত্তমাকে চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়েই তো এই বিপদ হল। কামজয় করা দেবেরও অসাধ্য, পিতামহ।

২য়॥ এ যে উপদেশ দেয়!

৩য়॥ ছোকরার দেখছি জিভ গজিয়েছে!

৪র্থ॥ কামের কথাটা তুলছে কে, অ্যাঁ—

১ম॥ কামের কথাটা তুলছে কে, অ্যাঁ? উপদেশ দিচ্ছ! আমাকে? তুমি? জিভ গছিয়েছে বুঝি? তুমি ছোকরা তিলোত্তমাকে দেখে সহস্র চক্ষু হয়েছ! গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে ঠকিয়ে ভোগ করেছ বলে মুনির শাপে তোমার অণ্ড খসে পড়েছিল না!

২য়॥ হিয়ার, হিয়ার—

ইন্দ্র॥ এসব কি বলছেন? যতো বয়স বাড়ছে মুখ ততো আলগা হচ্ছে?

১ম॥ ভুল বলছি? এসব কথা কার জানতে বাকি আছে? রামায়ণ পড়ে দেখ, সব লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, ডিবচ্ কাঁহেকা—

ইন্দ্র॥ আপনি আবার খিস্তি করছেন! একটা স্থানকাল জ্ঞান নেই! এ একটা ডেপুটেশন—পাঁচজন গণ্যমান্য লোক রয়েছেন—তাছাড়া দেশের এই অবস্থা! বুড়ো হয়েছেন বাতাসে?

বৃহস্পতি॥ ইন্দ্র!

ইন্দ্র॥ রাখতো! ব্রহ্মা কে? ছিলেন পঞ্চমুখ, ঐ মুখ খারাপ করেছিলেন বলেই মহাদেব একটি মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভুলে যাননি বোধহয়?

যম॥ ইন্দ্র! এটা কি বিবাদের সময়?

ইন্দ্র॥ না, না, আমার এমনিতে মাথা গরম হয় না বুঝলে?

বরুণ॥ বয়োজ্যেষ্ঠ, না হয় দু'কথা বলেছে—এ সময়ে গায়ে মাখবে?

যম॥ উনি আমাদের বকেন না? সয়ে নিতে হয়।

২য়॥ মুখ বুজে থাকার সময় নয় এটা।

৩য়॥ চেপে ধরতে হবে।

৪র্থ॥ সকলের সামনে নাজেহাল করে ছাড়তে হবে তাকে! বড্ড বাড় বেড়েছে ইন্দ্রটার!

১ম॥ ইন্দ্র! বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার! সাধে কি স্বর্গ ছারখার হচ্ছে! সব তোমার দোষে! তোমাকে চিনতে বাকি আছে! শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যে তপস্বী ইন্দ্রত্ব লাভ করতে চেয়েছে, তুমি সিংহাসনের লোভে এ পথে সকলের বিঘ্ন সৃষ্টি করনি? ব্রজধামে যেই তোমার পপুলারিটি কমে যাচ্ছিল, কেষ্টকে ওরা নেতা করেছিল, তুমি সেখানে ঝড় বৃষ্টি প্লাবন আননি? কেষ্ট গিরিগোবর্ধন আঙুলে তুলে তবে না ওদের বাঁচায়! ইন্দ্রত্বে বড় মোহ তোমার, বড় দম্ভ! দুর্বাশার মালা প্রত্যাখ্যান করে অভিশাপে রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে সামান্য গব্য ঘৃতের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছ! কে বাঁচাল তোমায়? পাষণ্ড না হলে এতো দুর্মুখ হয়? আমি ওয়াক-আউট করছি!

২য়॥ হিয়ার, হিয়ার।

৩য়॥ রাইটলি সার্ভড্।

বৃহস্পতি॥ পিতামহ! ইন্দ্র অবুঝ, তরুণ।

যম॥ ইন্দ্র, ক্ষমা চাও। ক্ষমা চাও।

[*ইন্দ্র বরুণের দিকে তাকায়*]

বরুণ॥ যাও, পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও।

বৃহস্পতি॥ মুখ গোমড়া করে থাকেনা! মিটিয়ে ফেল। ঝগড়া করবে, না রাজ্যটা রাখবে? যাও ক্ষমা চাও।

ইন্দ্র॥ (*অভিমান নিয়ে*) সব দোষ আমার, না? এই যে তারকাসুর এল, স্বর্গ লণ্ডভণ্ড, অত্যাচারে দেবলোক ছারখার হচ্ছে, আমাদের তাড়িয়ে সব কেড়ে নিতে চলেছে—সেই তারকাসুরকে কি আমি ডেকে এনেছি না ঐ পিতামহের লাইসেন্সে ওর আজ এই দাপট?

১ম॥ তারকাসুর নষ্টামো করছে তার আমি কি করব? আমার কথায় করছে?

ইন্দ্র॥ নিশ্চয়।

১ম॥ প্রমাণ করতে পারবে?

ইন্দ্র॥ আমি কালিদাস রেফার করব। যা বললুম একথা কলিদাসের কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গের ৫৫ নং শ্লোকে লিখিত নেই? সেখানে উনি বলেছেন, ইতঃ স দৈত্য : প্রাপ্ত শ্রীর্ণেও এবাইতি ক্ষয়ম। বিষ বৃক্ষহসি সংবর্দ্ধ স্বয়ং ছেত্তুম্‌সাম্প্রতম্।

১ম॥ বাংলায় বল।

বৃহস্পতি॥ কথাটার মানে হচ্ছে, পিতামহ বলেছেন—কালিদাসের কাব্যেই আছে-—"সেই তারক দৈত্য আমার বরেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং নিজে যাহাকে একবার বাড়াইয়াছি, তাহাকে আর নিজ হাতেই সংহার করিতে চাই না, আর সেটা ভাল দেখায় না। কেহ যদি গাছ লাগায় তা বিষবৃক্ষ হলেও কি তাকে কাটিতে পারে?

ইন্দ্র। সবাই শুনলে? (*ব্রহ্মাকে*) কালিদাসের 'কুমার সম্ভবে' আপনি নিজে কনফেস করেছেন, ঐ তারকাসুর আপনার লাইসেন্সে এরকম হয়েছে!

১ম॥ এটা তোমার অনুবাদ?

বৃহস্পতি॥ আজ্ঞে না, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বসুমতী গ্রন্থাবলী থেকে আহৃত।

১ম॥ তাই বল!

ইন্দ্র॥ তাই বলো মানে?

১ম॥ স্ক্যান্ডাল! আমরা দেবতা; আর একশ্রেণীর মানুষের ধর্ম হচ্ছে আমাদের ক্রিটিসাইজ করা। কালিদাস টপ সিক্রেট ডাইভালজ করেছে। মানুষ বলেই ওটার সংযম নেই—বিট্রেয়ার কাঁহেকা!

ইন্দ্র॥ মানুষের পুজো আপনি খান না?

ব্রহ্মা॥ চারটে মুখ বলে একা খাইনা, তোমরাও কেউ নিখাকি নও। পুজো দিচ্ছে তাই খাচ্ছি। যারা পুজো দেয় তারা আমাদের লোক। আর যারা ক্রি—টি—সা—ই—জ করে তারা নাস্তিক, পাষণ্ড, নরাধম। রাজত্ব করছ! ভেড়া না হলে এটুকু বোঝনা, নেদুস কাঁহেকা।

ইন্দ্র।। আবার মুখ খারাপ করছেন! বিপদে পড়েছি বলে যা খুশি তাই বলবেন? আমাকে মুখ করে তো আর রাজ্যটা রাখতে পারবেন না! ভরাডুবি হলে আপনিও তল পাবেন না।

যম।। আপনি কিন্তু ইন্দ্রকে একটু বেশি বকছেন পিতামহ। এ সময়ে আমাদের একটু বুঝেশুনে চলতে হবে।

১ম।। তুমি থাম! নিজের মাকে লাথি মেরে তোর পায়ে কুষ্ঠ হয়েছিল! পুঁজে-পোকায় তোর পায়ে দুর্গন্ধ হত! আজও তুই লেংচে হাঁটিস! মোষের পিঠ ছাড়া গতর নাড়াতে পারিস না! খোঁড়া আমাকে চলতে শেখাচ্ছে!

বরুণ।। অন্তত এখনতো ইন্দ্র আমাদের সকলের স্বার্থ নিয়েই বিচলিত।

১ম।। বরুণ, স্বার্থ চেনাস না আমাকে। পরস্ত্রী চুরি করার বেলায় কার স্বার্থ দেখেছিলি? ঋষির বউটাকে জলে ডুব মেরে ঢলাঢলি করেছিলি, ঋষি তোকে রাগে গিলে ফেলেছিল না? উগরে বমি করল, তুই বেরিয়ে এলি। গায়ে তোর বমির গন্ধ—আমাকে কিছু শেখাতে আসবি না!

বৃহস্পতি।। আপনাকে ইন্দ্র মান্য করে বলেইনা একছুটে আপনার শরণাপন্ন হয়েছে।

১ম।। এটা কে? বুড়ো-হাবড়া—গোঁসাই পুরুতটা আবার দেবসমাজে ভিড়েছে। ওরে তুই যে দেবতা নোস, সেটা ভুলে যাস না বেস্পতি!

২য়।। এবার মিষ্টি কথা।

৩য়।। অধিক চাপে গাজন নষ্ট। এবার একটু মিষ্টি কথা বলা দরকার।

৪র্থ।। চালটা বদলাতে হয়। ধমকগুলো বড্ড কড়া ডোজের হয়ে যাচ্ছে।

১ম।। *(স্নেহময়, বিগলিত প্রসন্নতা মাখানো মুখে)* ওরে বকব কাকে? বকব কাকে? না, আপন যে—তাকে। তাইনা? তোরা ছাড়া আমার কে আছে বল? বকতেও তোরা, দিতে থুতেও তোরা। ভুলে যা। পুত্রগণ, এস চোখ বুজে আমরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করি। তাপ জুড়িয়ে যাক । *(দু'হাতে বুকে জড়িয়ে)* আয়, আয়! *(সকলে মনে মনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। নিজের বুকেই নিজেরা মুহূর্তকাল জড়িয়ে থাকে। ব্রহ্মা হাত আলগা করে)* ব্যস! মিলমিশ হল তো? এবার ভাব, তারকের কেস্‌টা কিভাবে মেটানো যায়। না, কথাটা ঠিক। —আমার আদরেই ওটা বাঁদর হয়েছে। কি করব? তপে-জপে ওটা এমন ন্যাওটা হয়ে উঠল—বর না দিয়ে উপায় ছিল না। তা সে যাই হোক, ভয়ের কিছু নেই, স্বর্গ-তোমাদেরই থাকবে। তারককে কি করে ঠাণ্ডা করতে হয় আমার জানা আছে। একটু সময় দাও, সব হচ্ছে।

যম।। কিন্তু পিতামহ আমরা যে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না।

বরুণ।। শত্রুতো আর অপেক্ষা করবে না।

১ম।। তাও বটে। আচ্ছা একটু চিন্তা করে দেখি।

[*তিনটি মুখ ভাসতে ভাসতে জোট পাকিয়ে নীরবে কিসব বলে। তারপর আবার মুখগুলো মিলে যায়।*]

বৃহস্পতি।। যা করবার এখনই করুন পিতামহ।

ইন্দ্র।। আপনি ছাড়া সংকটকালে আর কে উপায় বাতলে দেবে বলুন।

১ম।। এক কাজ কর, মহাদেবর কাছে যাও। হিমাদ্রির সানুদেশে ত্রিপুরারি ধ্যান

করছেন। ওঁর সমাধি-নিশ্চল হৃদয় দ্রবীভূত কর। ত্রিলোক সুন্দরী উমা তাঁর সেবা করছেন। উমার রূপের দ্বারা ওর চিত্ত বিচলিত করতে হবে। তার ফলে ওদের মিলনে উমার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সেই কুমারই তোমাদের বাঁচাবে। যাও পিনাকপাণির ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য জাগাও।

যম॥ কিন্তু পিতামহ রুদ্রদেবের হৃদয় চাঞ্চল্য জাগানো কি সম্ভব হবে?

বরুণ॥ নন্দন-কানন, ইন্দ্রপুরী, সোমরস, নর্তকী, অপ্সরী, কিচ্ছুটিতে নেশা নেই —একে বাগে আনা কি সহজ হবে?

বৃহস্পতি॥ কোনো চাঞ্চল্য নেই। স্থানু টাইটেল পেয়ে বসে আছে।

ইন্দ্র॥ আমাদের দলের সঙ্গে আঁতাত পর্যন্ত রাখতে চায় না।

ব্রহ্মা॥ দলছাড়া বলেই তো দলে টানবি।

বরুণ॥ কিন্তু টের পেলে যে অনর্থ বাঁধবে।

ব্রহ্মা॥ টের পেতে দিবি কেন? অমরাবতীর সুধা পান করাবি, পারিজাতের পাপড়ি নাকে ঠেকাবি। কাৎ না হয়ে যায়? নিজেদের গা ভর্তি গয়না তুলবি, এর বৌ, ওর ঝির চোখ টিপে ধরবি আর পা টিপে টিপে কাজ হাসিল করতে পারবি না?

যম॥ আপনার ভরসা পেলে সব পারব।

বৃহস্পতি॥ কি করতে হবে বলুন, এসময় প্রাণপাত করব।

ব্রহ্মা॥ এতদিন যা করেছিস, তাই করবি—এক অনবদ্য চক্রান্তের আয়োজন করতে হবে।

ইন্দ্র॥ চক্রান্ত? সে কেন পারব না?

ব্রহ্মা॥ অ্যাঁ, এটি বেশ রপ্ত করেছ বলেই তো এ লাইনে গেলুম।

ইন্দ্র॥ শুধু আমায় দুষছেন—কোন দেবতা চক্রান্ত করেনি বলুন? চক্রান্ত ছাড়া এই দেবতাগিরি কারো দু'দিন টিকতো?

বৃহস্পতি॥ কাউকে কটাক্ষ কোরোনা, ইন্দ্র।

যম॥ কথাটায় বিদ্রুপ আছে, উচিত কথা বলনি।

বরুণ॥ আমরাতো তোমাকে খুঁচিয়ে কথা বলিনা।

ব্রহ্মা॥ এই দ্যাখো—এসময় নিজেরা নিজেদের গালে ঠোনা মেরে দাঁতে ব্যথা করবি? তবে বেড়ালের মতো আঁচড়া-আঁচড়ি কর—আমি উঠি।

ইন্দ্র॥ আমি অনুতপ্ত। আপনি যাবেন না পিতামহ! চক্রান্তটি খুলে বলুন।

ব্রহ্মা॥ চক্রান্তটি ঘটবে অন্ধকারে।

ইন্দ্র॥ তাহলে Black-out করে দি?

ব্রহ্মা॥ এ অন্যরকম অন্ধকার—গর্ভের অন্ধকার।

বৃহস্পতি॥ গর্ভ?

যম॥ কার গর্ভ?

বরুণ॥ গর্ভের ভিতরে চক্রান্ত? অনবদ্য, অনবদ্য।

ব্রহ্মা॥ খুশি তো?

ইন্দ্র॥ নারীগর্ভের ভিতর চক্রান্ত! আঃ চক্রান্তটি বেশ রসালো মনে হচ্ছে।

বৃহস্পতি॥ আগে শুনতে দাও সবটা—

ব্রহ্মা।। গর্ভে কি জন্মায়? না, সন্তান। আর সন্তানই হচ্ছে জনবল। স্বর্গরক্ষা করতে গেলে জনবল চাইতো? বাঁচতে হলে তোদের জনবল চাইতো? তাই সমস্ত গর্ভের সন্তানের দিকে হাত বাড়িয়ে দে। গর্ভ দখল কর। সবকটা গর্ভের সন্তানের হাতে তোদের পতাকা ধরিয়ে দে। তবেই ব্রহ্মাণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হল! শত্রু বিনাশ সম্পূর্ণ হল।

ইন্দ্র।। গর্ভে তো আমাদের শত্রুও জন্মাতে পারে!

ব্রহ্মা।। সেই জন্যেই তো গর্ভ দখল করবি—কী বোঝালুমরে ভেড়া! দরকারে ঐ গর্ভ নষ্ট করবি, দরকারে মুঠো করবি। কংশের মতো গর্ভ থেকে সন্তান টেনে এনে আছড়ে মারবি, আবার প্রয়োজনে উমা মহেশ্বরকে বশীভূত করে গর্ভে পছন্দমতো সন্তান এনে হাত করবি। যা উমা-মহেশ্বরকে কামে জর্জর করে তোল। ওদের ছেলেটাই তোদের বাঁচাবে। সার কথা বল্লাম বাকিটুকু নিজেরা ম্যানেজ করগে। আমি অন্তর্হিত হচ্ছি, ফুস্।

[*কার্টেনের অন্তরালে ব্রহ্মা অদৃশ্য হয়*]

ইন্দ্র।। পিতামহ! পিতামহ!

বরুণ।। দ্যাখো কাণ্ড—এখন কি অন্তর্হিত হবার সময়?

যম।। মহাদেবকে কামে আচ্ছন্ন করা কি সহজ কথা—দাদুতো বলেই খালাস।

বৃহস্পতি।। দাদু-দাদু করিসনে। বুড়ো অন্তর্যামী—আড়ি পাতার অভ্যাস আছে। গর্ভ বিজয় আমাদের করতেই হবে।

যম।। ইন্দ্র, পারবে তো?

ইন্দ্র।। গর্ভ দখলে আনা আমার কাছে খুব দুরূহ নয়, যম। রমণীর গর্ভনাশ করা সহজ কিন্তু উমার গর্ভে আমাদের দরকারের সন্তানটিকে কি করে আনাতে পারি সেটাই ভাবনা।

বৃহস্পতি।। আচ্ছা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই মদন আমাদের সহায় হতে পারে।

বরুণ।। মদনের পুষ্পশরের আঘাতে যে কামানল—তাতে সুনিশ্চিত বিরূপাক্ষের পক্ষচ্ছেদ হবে।

যম।। যথার্থ বলেছ!

বৃহস্পতি।। এইবার ওকে টিট্ করা যাবে! বাঘছালে ভেড়ার ছাপ মেরে দেব!

[*সমবেত উল্লাসধ্বনি*]

বৃহস্পতি।। মন মন্থন করে বলেই মদনের অন্য নাম মন্মথ।

যম।। মত্ত করে বলেই মদন।

বরুণ।। আর মহাদেবের দর্পচূর্ণ করে ওর নাম হবে কন্দর্প।

ইন্দ্র।। এ-এক অনবদ্য চক্রান্ত।

বৃহস্পতি।। গর্ভ দখলের অভিযান!

যম।। গর্ভ নির্মাণের অভিযান!

বরুণ।। গর্ভ সংগ্রহের অভিযান!

দেবগণ।। মদন! মদন!

[*দেবগণ অদৃশ্য। অন্ধকার*]

বিল্টুর কথা।। (*অন্ধকারে মাইক্রোফোনে*) 'মা আমার পথ? গর্ভ থেকে পৃথিবী কিন্তু তারপর? এবার আমাকে কাদের হাতে তুলে দিলে? কাদের হাতে তুলে দিলে তোমার সুখ—মা?'

[*আলো ফুটতে থাকে। শিবকে ধ্যানস্থ দেখা যায়। উমা পা টিপে টিপে শিবের পিছনে এসে চোখ টিপে ধরতে মঞ্চ মুহূর্তে আবার অন্ধকার*]

[*শিবের ভূমিকায় রাণা, উমার ভূমিকায় দীপা*]

শিব॥ (*অন্ধকারে*) কে?

[*অন্ধকারে তৃতীয় নয়নের জায়গায় একটা ছোট চোখ জ্বলে উঠল।*]

পার্বতী॥ (*অন্ধকারে*) আমি পার্বতী মহেশ্বর।

[*আলো জ্বলে মহাদেবের চোখ থেকে পার্বতী হাত সরাতে*]

পার্বতী॥ চতুর্দিক হঠাৎ অন্ধকার হল কেন মহেশ্বর?

শিব॥ তুমি আমার দুই চোখ আবৃত করেছিলে তাই সমস্ত চরাচর আলোকশূন্য হয়েছিল।

পার্বতী॥ বৃষভানু, আমার চাপল্য ক্ষমা কর।

শিব॥ এ তোমার সজ্ঞান অপরাধ নয়, পার্বতী।

পার্বতী॥ প্রভু, ভালবেসে যদি কৌতুকে তোমার নয়ন আবৃত করি তবে সেই কৌতুক কি অপরাধ?

শিব॥ পার্বতী, আমার এই নয়ন, এই দৃষ্টি, সমস্ত চরাচরের মঙ্গলের জন্য সদাসর্বদা উম্মীলিত। ভালবাসা এই দৃষ্টিকে আরো সজাগ রাখে। দৃষ্টিপাতকে আচ্ছন্ন করে যে ভালবাসা, তা অন্ধকার ডেকে আনে। যে মুহূর্তে তুমি আমার চোখ ঢেকেছ, অন্ধকারের উদয় হয়েছে। আমি অন্ধকারে অসহিষ্ণু, তাই আমার তৃতীয় নয়ন ললাটে জন্ম নিল।

পার্বতী॥ আশ্চর্য! সত্যিই তো তোমার ললাটে তৃতীয় নয়ন শোভা পাচ্ছে। কী জ্যোতির্ময়!

শিব॥ এ জ্যোতির অপর নাম অগ্নি। আলো প্রতিহত হলে আমি অগ্নি নিক্ষেপ করি।

পার্বতী॥ দেব, আমাদের সন্তান যেন এই আলো আর অগ্নি শিরোধার্য করে জন্ম নেয়।

শিব॥ যদি সন্তানে অভিলাষ কর, গর্ভভূমি রাখ অমলিন। ইচ্ছাকে রাখো সুন্দরের মুখোমুখি, তারপর সন্তানকে সম্প্রদান করো এই চরাচরের শুভ কর্মে।

পার্বতী॥ গর্ভ আলোকিত হোক। ইচ্ছা মূর্তিমান হোক।

শিব॥ কিন্তু সাবধান। চতুর্দিক দেখ—কাম প্রসারিত হাতে চাইছে ঐ সন্তান, ঐশ্বর্য্যের রথ খুঁজছে ঐ সন্তান, দম্ভের নিশান খুঁজছে ঐ সন্তান—তুমি কার হাতে ওকে তুল দেবে? পার্বতী, তোমার নয়ন মুদিতে কর—তোমার ধ্যান তোমাকে স্পষ্ট করুক।

[*এঁরা ধ্যানস্থ হয়। মঞ্চের এই অংশের আলো কমতে থাকে এবং অন্য অংশে আলো বাড়তে থাকে। দেবগণ মদন সহ সন্তর্পণে প্রবেশ করে।*]

ইন্দ্র॥ মদন আর কালক্ষেপ নয়। (*মদন ফুলধনুতে কুসুমশর সংযোজন করে*) নিধন করা সহজ কিন্তু হৃদয়হরণ করা বড় কঠিন।

[*মদন চিন্তিত*]

বৃহস্পতি।। মদন—পারবে তো?

মদন।। এতোদিন তো পেরে এসেছি সখা। তবে কথা বলতে বলতে শিবের তৃতীয় নয়নের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি, ভাবনা জাগছে। মহেশ্বরকে দেখেছ? বায়ু প্রচার-বর্জিত নিশ্চল শিখার মতো ধ্যানস্থ। কোনওমতে আমাদের ষড়যন্ত্র টের পেলেই তৃতীয় নয়নে ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠবে।

বরুণ।। মকরকেতন, কন্দর্প ভীত?

মদন।। ভয়ের কথা নয় সখা, সতর্কতার কথা বলছি।

যম।। আমাদের সমস্ত শক্তি তোমার কার্যে যুক্ত হবে।

ইন্দ্র।। মন্মথ, যদিও তুমি একাই সহস্র, তবু তোমার প্রিয় সহচর বসন্ত যে নিজে থেকেই তোমার সহায় হবে একথা কে না জানে।

বৃহস্পতি।। আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে তখন বাতাস আপনি এসে মিলিত হয়।

বরুণ।। যেখানে মদন সেখানেই বসন্ত।

যম।। যাও মদন, বসন্তকে তোমার সহায় পাবে।

[*মদন এতোক্ষণ মহাদেবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এইকথার পর দেবতাদের দিকে তাকায়*]

ইন্দ্র।। এবার অগ্রসর হও।

বরুণ।। আমরা অন্তরালে আছি।

[*মদন সন্তর্পণে এগোয়। দেবগণ আড়ালে যায়। ফুলধনু হাতে শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।*]

ইন্দ্র।। মদনের সম্মোহন বাণ যেই লক্ষ স্থির করবে, বসন্ত মায়ানৃত্যে চতুর্দিক দুলিয়ে দেবে।

যম।। আর সেই আলোড়নে একটি বীজ ধীরে ধীরে গর্ভে মুকুলিত হবে।

বরুণ।। বীজ কিংবা স্বর্গে আমাদের আধিপত্যের কবচ।

[*বসন্তরাগের বাদ্যধ্বনি ঝঙ্কার তোলে। মহাদেব একটু নড়ে ওঠেন।*]

ইন্দ্র।। ওষুধ গিলবে, টনক নড়ছে।

সকলে।। (*চাপা গলায়*) নড়ছে. . . নড়ছে. . . মহাদেব নড়ে উঠলেন।

ব্রহ্মা।। ওরে কামোত্তেজনা চক্রান্তের মতো সুখকর না, চক্রান্ত কামোত্তেজনার মতো সুখকর-—আমি বুঝতে পারিনারে। ঐ দ্যাখ্ এবার পিনাকপানির দিকে মদন সম্মোহন বান মারছে।

সকলে।। মারছে, মারছে—(*ধ্বনি ও আলোর চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স-এ মদন শিবের দিকে বাণ ছোড়ার চরম মুহূর্তে পৌঁছয়। শিব রোষরক্ত চোখে চতুর্দিক তাকায়। শব্দ থেমে যায়। মদন ভীতভাবে লুকোতে চেষ্টা করে। দেবতারা অন্তর্হিত। শিবের চোখে মদন ধরা পড়ে।*)

শিব।। কে? কে ওখানে?

মদন।। বিরূপাক্ষ, আমি মদন। পুরুষোত্তম, আমাকে দগ্ধ করবেন না।

শিব।। অসম্ভব। তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে চক্রান্ত নিশ্চিহ্ন হোক। আমার তৃতীয় নয়ন

প্রজ্বলিত হচ্ছে, ভস্মাবৃত মৃত্যুই তোমার নিয়তি। (*ললাটে তৃতীয় চোখের জায়গায় বন্দুক রেখে গুলি করেন। মদন লুটিয়ে পড়ে।*)

[*মঞ্চ অন্ধকার হয়।*]

তৃতীয় দৃশ্য

[আলোকিত হয়ে ওঠে মঞ্চ। রাণা এসে দাঁড়ায়। দর্শকসমাজকে উদ্দেশ করে রাণা বলে—]

রাণা ॥ মহাদেব-পার্বতীর মতো আমরা যখন শঠতা এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে উঠি তখনই সমাজের অশুভ অধীশ্বরগণ আরও কুটিল, আরও নির্মম হয়ে ওঠে। তারা অপশক্তির সূক্ষ্ম অস্ত্রপ্রয়োগের চিন্তা করেন তখন। মানুষের মঙ্গলের ছলে সুকৌশলে আমাদের মন যাতে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে, যাতে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে না পারে, যাতে মানুষের মনটাকে নিস্তেজ করে, বশীভূত করে রাখা যায় সে-ব্যাপারে তৎপর হয়। জ্ঞান-বুদ্ধিহীন অজ্ঞতার মধ্যে মানুষকে অনুগত করে রাখতে পারলেই তাদের প্রভুত্ব বজায় থাকে। তাই মানুষের জ্ঞানের জাগরণ রোধ করে রাখাই তাদের অভিপ্রায় হয়ে ওঠে। বাইবেল বর্ণিত সদাপ্রভু ঈশ্বরও আদি মানব-মানবী আদম এবং ইভ্‌কে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আহার করতে নিষেধ করেছিলেন। নাটকের এই শেষ পর্যায়ে আমরা এই বৃত্তান্তটিই নিজেদের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করতে চলেছি।

[*মঞ্চ অন্ধকার হলে রাণা চলে যায়। মঞ্চে আবার আলো আসে। মঞ্চের বাঁদিকে রঙিন আলো। বাজনার তালে তালে ইভ্ আসে। সঙ্গে আদম একটা অচেনা বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতা করছে। দুজনের চোখেমুখে খুশির জোয়ার। হঠাৎ একটা ডাক ভেসে আসে "ইভ্! ইভ্!" ইভ্ ডাক শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। চারদিকে কান পাতে।*]

ইভ্ ॥ আদম। তুমি শুনতে পেয়েছে? আবার আমার নাম ধরে কেউ ডাকল।

আদম ॥ হয়তো ঈশ্বর—

ইভ্ ॥ না আদম। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আমি চিনি। এ বড় বিচিত্র ডাক। যখনই আমরা দু'জন ঈশ্বরবন্দনায় নৃত্য করি যেন বুকের ভেতর একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠে ডাকে —'ইভ্! ইভ্', পায়ের নিচের তৃণ সরিয়ে কে ডাকে—'ইভ্। ইভ্!' ঠিক পেছনে লুকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকে 'ইভ'—ঘুরে তাকাই, কেউ নেই—কে ডাকে 'আদম'?

[*আদম কিছু বলার আগেই আবার আদিনাগের ডাক শোনা যায়—'ই—ভ্।'*]

ইভ্। ঐ ঐ আবার ডাকল. . . শুনলে আদম—

আদম ॥ কই আমিতো কিছু. . . তুমি নিশ্চয়ই ভুল শুনেছ ইভ্। আচ্ছা, বেশ আমি বরং উদ্যানটা একবার ঘুরে দেখে আসছি।

[*আদম চলে যায়। ইভ্ কান পেতে ডাক শোনার চেষ্টা করে।*

কয়েক সেকেণ্ড পর সাইক্লোরামায় আদিনাগের অস্পষ্ট ছায়া দুলতে থাকে। ছায়া স্পষ্ট হতে থাকে—ইভ্ কিছু একটা অনুভব ক'রে সামনের দিক থেকে পেছনে মুখ ঘোরানোর জন্য ঘাড় ফেরায়—কিন্তু সম্পূর্ণ মুখ ঘারানোর আগেই খুব জোরে ঈশ্বরের আগমন-সূচক বাদ্যধ্বনি বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। একটু পরে আবার আলোকিত হয়। দেবদূতগণ সহ সদাপ্রভুর প্রবেশ। সদাপ্রভু স্মিত হাস্যে সবাইকে দেখেন। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে মুখ তোলেন। সকলে সমবেত কণ্ঠে ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করে।]

সমবেত ॥ হে সমুদয় প্রাণী / করতালি দাও /
আনন্দরবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। /
কেননা / পরাৎপর ঈশ্বর ভয়াবহ, /
তিনি অতিশয় উন্নত।
তাঁহার দূর্গসকল গণনা কর, / তাঁহার দৃঢ় প্রাচীরে / মনোযোগ কর।
তাঁহার অট্টালিক সকল সন্দর্শন কর। /
কেননা / এই ঈশ্বর / অনন্তকাল তরে আমাদের ঈশ্বর।
তিনি চিরকাল আমাদের পথপ্রদর্শক হইবেন।
হে ঈশ্বর / আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি।

[তূর্যধ্বনি]

দেবদূত এক ॥ ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন।

দুই ॥ আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতিসমূহ মুকুলিত হল। বাতাস সুগন্ধ হল—

তিন ॥ স্বর্গের চতুর্মুখ জলধারা—পীশোন, গীহোন, হিদ্দেকল আর ফারাতের জল বন্দনায় কল্লোলিত হল।

চার ॥ এবার সদাপ্রভু কিছু বলবেন।

[সদাপ্রভু গলা ঠিক করেন। হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্তন করেন। একজন দেবদূত দ্রুত ঈশ্বরের কাছে যান। দু'জনে কথা বলেন কিন্তু শোনা যায় না। মুখভঙ্গিতে বোঝা যায় ঈশ্বর ক্রুদ্ধ। মাঝে মাঝে ইডেনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করেন। অবশেষে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে আকাশের দিকে হাত তোলেন আবার বজ্রপাত হয়। দেবদূতগণ শঙ্কিত। ঈশ্বর ক্রমশ একটু কোমল হন।]

সদা ॥ দেবদূতগণ, আমি ক্রুদ্ধ কারণ আমি রেগে গিয়েছি কিংবা মাঝে মাঝে রাগতে হয় অথবা বসন্তের বাতাসটা জ্বালাচ্ছে কিংবা নৈশভোজন শরীরে গোলযোগ করছে অথবা তোমাদের কাজে দোষত্রুটি লক্ষ করেছি। ক্রুদ্ধ হওয়ার এতোগুলো কারণের কথা বললুম, এর মধ্যে সঠিক কারণটি ভেবে বল।

দেবতারা ॥ আমাদের কাজে দোষ ত্রুটি লক্ষ করেছেন, এটা একটা কারণ হতে পারে।

সদা।। (*সমস্ত মুখ নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত*). . . ফেলে ছড়িয়ে কথা বলার মধ্যে একটা আরাম আছে। ব্রহ্মাণ্ডের যতো কথা, যতো শব্দ সব আমার। আমি ছড়াব, তোমরা বেছে তুলবে। (*স্মিত হাসেন। নিজের অঙ্গুগুলিগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন*) ঠিক আছে, নিজেরাই বললে কর্তব্যে অবহেলা করেছ, একারণে শাস্তিস্বরূপ অলিম্পিয়াস পর্বতে শেকলে বেঁধে শকুন দিয়ে তোমাদের যকৃত উপড়ে নেওয়া হবে, না শকুনের চঞ্চুর আঘাতে চোখের মণি বিদ্ধ করা হবে। কোনটাতে আমার অধিক আনন্দ বলতো? (*সবাইকে ভীত দেখে ঈশ্বর অদ্ভুত হাসেন*) ভয় পেয়েছ? (*ওরা আরও ভীত। ঈশ্বর ঘুরে ঘুরে একবার ওদের, একবার নিজের অঙ্গুলি দেখেন আর নিঃশব্দে হাসেন। অবশেষে নিজের অঙ্গুলিগুলি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যান।*) ইডেনে একটা নতুন পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে!

১দেব।। আপনি সবই জানেন সদাপ্রভু।

সদা।। দেবরক্ষীদের প্রহরায় কাঁটাতারে ঘেরা ইডেনে পদচিহ্ন—

[*কথা শেষ না করে ২নং দেবদূতের দিকে তাকান।*]

২য় দেব।। ঘটনাটা অলৌকিক।

সদা।। (*সকলের দিকে মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে*) তাহলে কি আমার পায়ের ছাপ? আমি ছাড়া তো আর কিছুই অলৌকিক নয়।

সমবেত।। সদাপ্রভু!

সদা।। তাহলে কি আমিই অভিযুক্ত?

সমবেত।। সদাপ্রভু!

সদা।। ইডেনের সর্বত্র একটি অজানা পায়ের ছাপ! একটি ছাপের সঙ্গে অপরটি মেলেনা। এর থেকে কি বোঝা যায়? (*১ম দেবদূতের দিকে তাকান*)

১ম দেব।। আত্মগোপনের এক আশ্চর্য কৌশল কেউ আবিষ্কার করেছে।

সদা।। আবিষ্কার আমি ছাড়া কেউ করতে পারেনা। আমার রাজ্যে আমি ছাড়া আর কেউ কোন কৌশল টিঁকিয়ে রাখতে পারে না। এ কৌশলের কারণ কি?

সমবেত।। আমরা অল্পবুদ্ধি সদাপ্রভু, জ্ঞান আমাদের যৎসামান্য।

[*সবাই অধোবদন। সদাপ্রভু চঞ্চল*]

সদা।। আদম এবং ইভকে সুনিশ্চিত কেউ প্ররোচিত করছে। আমার সমস্ত অবরোধ ব্যবস্থা তোমাদের মূর্খতায় বিপর্যস্ত। ওরা নিষিদ্ধ ফলে যদি লুব্ধ হয়—(*একটু একটু করে অন্যমনস্ক হতে থাকেন*) যদি ইভ গর্ভের ভিতরটা ফাঁকা বোধ করে, যদি. . . সন্তান চায়. . . সেই সন্তান যদি আমাকে বিরক্ত করে?

২য় দেব।। আনন্দের কথা, এই অশুভ পদচিহ্ন ঈশ্বরের সৃষ্টি আদম এবং ইভ্‌কে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়নি।

সমবেত।। জ্ঞানবৃক্ষের ফলে ওদের বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, সদাপ্রভু।

[*সদাপ্রভু কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।*]

সদা।। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ওদের কাছে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি কারণ জ্ঞান প্রশ্ন করতে

শেখায়, এবং প্রশ্ন এমন একটি দানব যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায়। আমি এরকম যুদ্ধ ভালবাসিনা। জ্ঞান অহেতুক চাঞ্চল্যে সুখকে সংহার করে। সারল্যের বিনাশ ঘটায়। এর নাম পতন। তা আমি চাইনা। আমার সৃষ্টির পতন—অসম্ভব!

(আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান। একটি সুমধুর বাজনা শোনা যায়। কান পেতে শোনেন। নিজের অঙ্গুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। অবশেষে সম্মোহিতের মতো ধীরে ধীরে চলে যান। অন্য সকলেও অনুসরণ করে।

সবাই চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে আলোটা কমতে থাকে। মঞ্চের সম্মুখভাগ অন্ধকার হয়ে যায়। পেছনের মৃদু আলোতে সদাপ্রভু প্রবেশের আগে ইভ্‌কে যে অবস্থায় দেখা গিয়েছিল ঠিক সেই অবস্থায় দেখা যায়। ইতিমধ্যে আদিনাগ ইভের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আদিনাগের গতিভঙ্গি সর্পতুল্য)

নাগ।। ইভ্‌ ইভ্‌ ইভ! *(চমকে ওঠে ইভ্‌!)*

ইভ্‌।। কে? *(দুজনে একই সঙ্গে ঘুরে মুখোমুখি হয়। ইভ্‌ অস্ফুটে বলে)* কে?

নাগ।। এই উদ্যানে তোমাদের মতো আমিও একজন। আমি সর্প—আদিনাগ।

ইভ্‌।। তুমিই কি আমাকে ডাকছিলে? *(নাগ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়)* রোজ-রোজ তুমিই ডাক? *(নাগ আবার আগের মতো মাথা নাড়ে)* কাছে আস না কেন?

নাগ।। এই তো এলাম। সময় হতেই এলাম। আড়ালে থেকে আমি তোমাদের দেখি। দেখি, কেমন করে ঈশ্বরের বন্দনা কর, কেমন ভক্তিতে ঈশ্বরের পুজায় তোমাদের মাথা নুয়ে আসে; দেখি—কেমন সুখে ঈশ্বরের সেবায় তোমাদের দিন কাটে।

ইভ্‌।। ঈশ্বর আমাদের সেবায় খুশি হন। আমরাও খুশি হই। প্রত্যেকদিন ঈশ্বরের কাছে আমরা নৃত্য করি।

নাগ।। আর সেই নৃত্যের প্রত্যেকটি ভঙ্গির মধ্যে রয়েছে নিবেদন, প্রভুকে খুশি করার বিচিত্র ভঙ্গি, প্রভুকে মান্য করার নানারকম মুদ্রা—তাই না?

ইভ্‌।। তুমি বুঝি সব লুকিয়ে দ্যাখো?

নাগ।। হ্যাঁ দেখি, আর দেখে আপনমনে হাসি। হাসতে হাসতে রেগে উঠি। তারপর রেগে তোমাদের কাছে ছুটে এসে বলতে চাই—থামাও, এই নৃত্য থামাও। বন্ধ কর নাচ।

ইভ্‌।। কেন? এত রাগ হয় কেন তোমার?

নাগ।। ঈশ্বরের এই প্রভুত্ব আমার কাছে অসহ্য!

ইভ্‌।। কি বলছ তুমি?

নাগ। ঠিক বলি। তোমাদের এই সেবার নাম দাসত্ব!

ইভ।। দাসত্ব কি?

নাগ। তুমি তা বুঝবে না, ঈশ্বরের অদ্ভুত চক্রান্তে তোমাদের বিচারশক্তি হরণ করে নেওয়া হয়েছে। তোমাদের একটা দীর্ঘ ঘুমের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে না কোনদিন জাগতে হয়। জেগে উঠলেই যে চোখ মেলে দেখতে চাইবে—চেতনা প্রখর হতে থাকবে—নিজেদের দাসত্বে ঘৃণা আসবে। তখন রুখে উঠবে, প্রতিবাদ করবে, অমান্য করবে।

ইভ্‌।। এসব তুমি কি বলছ?

নাগ।। যা বলছি, তাকি কিছুই বুঝতে পারছ না?

ইভ্‌।। না।

নাগ।। অদ্ভুত! ইভ! দীর্ঘ, দীর্ঘকালের দাসত্ব, দিন রাত্রি প্রভু-সেবার কী বিকট পরিণাম তুমি! আচ্ছা ইভ, তুমি তো নৃত্য ভালবাস?

ইভ।। আদম, আমি, দুজনেই ভালবাসি।

নাগ।। কে শেখান?

ইভ।। সদাপ্রভু ঈশ্বর।

নাগ।। এই নৃত্যে তোমাদের বড় সুখ, তাই না ইভ্‌?

ইভ্‌।। ঈশ্বর আমাদের নৃত্য দেখেন, ঈশ্বরের সুখেই আমাদের সুখ।. . . আদিনাগ তুমি নৃত্য জাননা?

নাগ।। (*হেসে*) আমি একটা নতুন নৃত্য শিখেছি। এক অদ্ভুত নৃত্য। এই নৃত্য নিশ্বাসের মতো তোমার বুকের ভিতরে নিয়ে নিতে পার—তখন তুমি শিখবে এক অদৃশ্য নৃত্য। তুমি টের পাবে নৃত্যের এক একটা মুদ্রা তোমার চোখের তলায় জেগে উঠে বলছে, ইভ্‌, তুমি কি নতুন কিছু দেখছ? তোমার বুকের নিচে নৃত্যের এক একটা ঢেউ উঠে বলছে, ইভ্‌ নড়ে ওঠ, আর তোমার গর্ভে একটা নূপুর একা একা ঘুরতে ঘুরতে বলছে, ইভ্‌ তোমার গর্ভ বড় একা, বড় শূন্য। এ নৃত্য তোমাকে জাগিয়ে তোলার নৃত্য ইভ্‌, তোমাকে ভরিয়ে তোলার নৃত্য।

ইভ্‌।। (*প্রায় সম্মোহিত*) এই নৃত্য তোমাকে কে শেখাল আদিনাগ? ঈশ্বর?

নাগ।। কে ঈশ্বর?

ইভ্‌।। আমাদের সদাপ্রভু। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের সৃষ্টি করছেন, এই চরাচর রচনা করেছেন।

নাগ।। আমিও তো রচনা করেছি এই নৃত্য। আমিও তো একজন ঈশ্বর, ইভ্‌। ঈশ্বর কেন একা সৃষ্টি করবেন? তোমার ইচ্ছে করে না তুমি কিছু সৃষ্টি কর, নতুন কিছু শেখো —যা ঈশ্বর শেখাবেন না। আমি যদি একটা নৃত্য শেখাই তোমাকে, শিখবে?

ইভ।। শিখব?

নাগ।। ঈশ্বর তোমাকে ঘুমিয়ে থাকার নৃত্য শিখিয়েছেন, আমি শেখাব জেগে ওঠার নৃত্য। ঈশ্বর তোমাকে শিখিয়েছেন প্রভুর সেবায় নুয়ে পড়ার ভঙ্গি, আমি শেখাব নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার সুঠাম সাহস।

ইভ্‌।। তোমার ডাক যেমন অদ্ভুত, তেমনি তোমার কথা! আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা কিন্তু শুনতে ভাল লাগছে।

নাগ।। আচ্ছা ইভ, এই উদ্যানের কোনও ফল আহার করার অধিকার তোমাদের নেই —তাই না?

ইভ্‌।। কেন থাকবেনা? ঐ যে দেখছ জ্ঞানবৃক্ষ—ঐ একটা মাত্র গাছ আছে যার ফল আমরা খাইনা।

নাগ।। কেন?

ইভ্‌।। সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিষেধ।

নাগ।। কিন্তু কেন? কি এমন কারণ? তোমাদের হাতেই বাগানটা বেঁচে আছে। তোমরাই এই উদ্যানের পরিচর্যা কর অথচ তোমরাই এখানকার সব থেকে মিষ্টি ফলটা খেতে পারবে না?

[*ইভ্ অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে—*]

ইভ্।। (*হঠাৎ*) খুব মিষ্টি বুঝি? তুমি খেয়েছ?

নাগ।। তোমরা ছাড়া সবাই খেয়েছে। তোমরা বাদ পড়লে কেন?

ইভ্।। ব্বাঃ, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে বললাম।

নাগ।। কেন সেটা জানবে তো?

ইভ্।। ঐ ফল খেলে আমরা মরে যাব। ঈশ্বর বলেছেন ঐ গাছটা ছুঁলেও মরে যাব।

[*ভয়ঙ্কর জোরে সর্প হাসে। ইভ্ অবাক হয়।*]

ইভ্।। হাসছ কেন?

নাগ।। ফলটা খেলেই তোমরা মরে যাবে!. . . গাছটা ছুঁলেই মরে যাবে! অতো সুন্দর ফল, এতো মধুর রস! আমি খেয়েছি। অন্য দেবতারা খেয়েছে। কেউ মরলনা, মরবে তোমরা? তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে বুঝতে পারছ না?

ইভ্।। ঐ ফল খেলে কি হয়?

নাগ।। যে মুহূর্তে ঐ ফল খাবে তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তোমরাও ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠবে—বুঝতে পারবে, কোনটা ভাল—কোনটা মন্দ। ঐ ফল আহার কর—বুঝবে তোমরা স্বাধীন—সে এক নতুন সুখ ইভ!

ইভ্।। কিন্তু আমরা তো সুখেই আছি আদিনাগ।

নাগ।। না। সুখী ঈশ্বর! ঈশ্বরের সুখের ছায়ায় নিজেদের সুখী দেখছ। ঈশ্বরের এ সুখ তেমাদের ভুলিয়ে রাখার সুখ, ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফলের দিকে যাতে না হাত বাড়িয়ে দাও তার জন্য তোমাদের সুখের শেকল পরিয়ে ঈশ্বর বড় সুখী। ঐ শেকলটা ভাঙো, নষ্ট সুখ দু'পায়ে মাড়িয়ে ঐ গাছটার দিকে এগিয়ে যাও। স্বাধীন হও, ইভ।

ইভ।। স্বাধীন হওয়া কিরকম?

নাগ।। ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে বুঝবে কিরকম। বুঝবে ষড়যন্ত্রটা কেমন?

ইভ।। ষড়যন্ত্র কি?

নাগ।। ঐ ফল খেলেই বুঝবে। তোমার চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। তোমার উদর আছে, গর্ভ নেই। ঐ ফলের রস তোমার গর্ভে গিয়ে নামবে—তোমার রক্তমাংসের আলোড়নে ঐ গর্ভে আর একটা স্বাধীন পৃথিবীর অঙ্কুর জেগে উঠবে!

ইভ।। গর্ভ কি?

নাগ।। গর্ভ শরীরের ভিতর জেগে ওঠা বিপুল আর একটা আকাশ। গর্ভে সৃষ্টির সুখ। ইভ্ গর্ভে অহংকার, গর্ভে ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াবার উজ্জ্বল খড়্গ, তোমার সন্তান! ইভ্ আহার কর ঐ ফল। জ্ঞানী হও, ইভ্!

ইভ্।। চুপ (*ইভ্ অন্যমনস্ক, নাগ একাগ্র*)

নাগ।। ভয় পাচ্ছ ইভ্?

ইভ্।। যদি ঐ ফল স্পর্শমাত্র মৃত্যু হয়?

নাগ।। অসম্ভব। (*ইভ তাকায়*) অসম্ভব।

[*গাছটার দিকে কয়েক পা এগোয় ইভ্*]

ইভ্।। বৃক্ষ, পাতা ফলের কি আশ্চর্য গন্ধ! এই বৃক্ষের এতো কাছে আমি কোনো দিন আসিনি। বৃক্ষ যেন শাখা মেলে আমাকে টানছে! (*ঘুরে আদিনাগের দিকে তাকিয়ে*)

আদিনাগ, এ কেমন দৃশ্য! আমি জানতুম না! সমস্ত শরীর আমার অবশ হয়ে আসছে, আদিনাগ! আমি পারছি না! (*গাছের আরও কাছাকাছি ঘুরতে ঘুরতে*) যত কাছে যাই আমি যেন একটা মৃতদেহ ছেড়ে একটু একটু করে উঠে আসছি. . . চোখের মণিতে কি আমার তারকা খেলে উঠছে আদিনাগ?—এ কেমন আলো আমার দুহাত তুলে ধরেছে ঐ ফলের দিকে। ওর ভিতরের রস আমি দেখতে পাচ্ছি, রস নয়, যেন আলো—তুমুল আলো, (*নাগ পিছনে সরতে থাকে। একটু এগিয়ে ইভ্‌ থেমে যায়। হাঁপায়। পেছন দিকে তাকায়। নাগ এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে। ইভ্‌ আবার টলতে টলতে এগোতে থাকে। যতো এগোয় ততো, অস্থিরতা বাড়ে। নাগ অদৃশ্য হয় কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়*)

নাগ।। ইভ্‌, নির্ভয়ে স্পর্শ কর, আহার কর ঐ ফল।

[*ইভ্‌ ধীরে ধীরে গিয়ে গাছটা স্পর্শ করে। ফলের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। একটা প্রচণ্ড উজ্জ্বল সোনালী আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আস্তে আস্তে ইভের সমস্ত অস্তিত্বে একটা প্রখর উল্লাস, দৃঢ়তায় জ্বলে উঠতে থাকে*]

ইভ।। (*চিৎকার করে*) আদম! ঈশ্বর আমাদের প্রতারণা করেছেন। জ্ঞানবৃক্ষ স্পর্শ করলাম, আমি মরিনি!

[*ফল খাওয়ার একটা ভঙ্গি করে ইভ। একটু করে সর্বাঙ্গে একটা সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে। আদম ঢোকে*]

ইভ্‌।। আদম, সমস্ত ইডেন একটা বিশাল কারাগার, আদম, আমরা বন্দী ছিলাম। (*ইভ্‌কে ফল আহার করতে দেখে আদমের চোখ মুখ ভয়ার্ত। অস্ফুটে বলে—*)

ইভ্‌।। আদম—আদম, যে-বৃক্ষের ফল খেলে মৃত্যু সেই ফলের রস পান করে আমি বেঁচে আছি! ঈশ্বর কতোকাল আমাদের ঠকিয়ে এসেছেন ভাব, আদম! ঈশ্বর প্রবঞ্চক!

আদম।। (*ভয়ার্ত*) ইভ্‌—

ইভ্‌।। এই ফল আহার কর।

আদম।। (*পিছিয়ে এসে*) না, ইভ্‌! (*ইভ্‌ কাল্পনিক ফল হাতে একটু এগোয়। আদম সেইটুকু পিছোয়*) না! না! এগিও না, সরে যাও ইভ্‌!

ইভ্‌।। বেশ! আমাকে তুমি চাইলে না আদম! অথচ আমি তোমাক চাইছি। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেও তোমাকে চাইছি। এই ফলের রসে আমাদের ভালবাসার নতুন স্বর্গ। আদম আহার কর, আমি একা কেন এতো সুখে থাকব? তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করে সুখী হবে আদম!

আদম।। না ইভ। তা-কি হয় ইভ! আমাদের কি ভিন্ন পথ? ভিন্ন জীবন? দাও, ঐ ফল আমিও আহার করব। (*ইভ্‌ গাছটার কাছে যায়। ফলটি নিয়ে আহারের ভঙ্গি করে আদম। আদমের সর্বাঙ্গে সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে।*)

আদম।। একী! একটা ভীষণ কারাগারে আমরা মাত্র দুজন। এতকাল? এতকাল কি এখানেই ছিলাম? নাকি এই প্রথম চোখ মেলে দেখলাম। ইভ্‌ আমরা দুজন এই কারাগারে কি একা!

ইভ্।। আদম, আমরা কি সত্যি দুজন? (*আদম কিছু না বুঝে চুপ করে তাকিয়ে থাকে*) কান পাতো আমার গর্ভে, একটা আলোকিত পৃথিবীর করতালি শুনতে পাও? (*আদম ইভের গর্ভে কান পাতে, যেন শুনতে পায়। ঐ অবস্থাতেই মুখ তুলে ইভের দিকে তাকায়। মেঘগর্জন। আদম ইভ্‌কে কাছে টেনে নেয়। মেঘগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। আলো আসতে সদাপ্রভু প্রবেশ করে। কেমন বিপর্যস্ত। মেঘগর্জন। সঙ্গীরা সবাই শঙ্কিত*)

সদা।। মেঘগর্জন কেন? আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি?

এক।। না, সদাপ্রভু।

সমবেত।। আপনি উৎফুল্ল!

[*মেঘগর্জন। ঈশ্বর আকাশের দিকে তাকান।*]

সদা।। সূর্যটা কেমন ঝাপ্‌সা লাগছে না?

[*সবাই ওপরে তাকায়*]

চার।। নাতো। প্রখরভাবে জ্বলছে—

সদা।। আমার চোখ দুটো কি কম দেখছে? দেবদূত, আমি কি কম দেখছি?

তিন।। সে কি করে সম্ভব সদাপ্রভু?

সমবেত।। অসম্ভব। অসম্ভব।

সদা।। স্নায়ুমণ্ডলে এক অশুভ শিহরণ হল কেন? নাকি ব্রহ্মাণ্ডে কম্পন? নাকি আকাশে কোন নতুন নক্ষত্রের জন্য হচ্ছে, তারই কম্পন। নভোমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে যে গ্রহ নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করবে আমি তার পূর্বাভাষ পর্যন্ত দেখতে পেতাম।. . . দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্পষ্ট, পূর্ব নভঃস্থলী গর্ভের পূর্ণতায় স্ফীত। ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ দুটি নক্ষত্র আকাশে ফুটে উঠছে. . . দেবদূতগণ, সমস্ত গ্রহনক্ষত্র তোমাদের সকলের কাছে প্রকাশিত হবার আগে, সবার অলক্ষ্যে মাথা নত করে আমাকে বন্দনা করে। সে এক মনোহর উপভোগ (*সকলের দৃষ্টি সদাপ্রভুর মুখ ছুঁয়ে আকাশে যায়*) ঐ নবজাতক তারকা দুটি বন্দনায় নত হবে এক্ষুণি।. . . একি. . .? (*সদা প্রভু মুখ নামিয়ে নেয়, ভীত চাহনি*) নক্ষত্র দুটিতে ভ্রূকুটি কেন (*অন্য সবাই মুখ নামায়, সদাপ্রভুর দিকে তাকায়*) ঐ দুটি আলোকবিন্দুতে কাদের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল?

[*সদাপ্রভু বাদে সকলের চোখ আকাশে যায়। সদাপ্রভুর চিৎকারে অন্যান্যদের দৃষ্টি ওপর থেকে সদাপ্রভুর দিকে আসে। সদাপ্রভু আকাশে তাকিয়ে ডাকেন—'আদম! ইভ্!!' আদম ইভ্ প্রবেশ করার পর সদাপ্রভু ওপর থেকে মুখ নামিয়ে ওদের দিকে তাকান।*]

সদা।। একি! তোমাদের নগ্নতা? তোমাদের সারল্য? তোমরা কি আমার সমুখে নতজানু হতে ভুলে যাচ্ছ? এই অবাধ্যতা তোমাদের কে শেখাল?

ইভ্।। ঐ নিষিদ্ধ ফল।

সদা।। জ্ঞানবৃক্ষের ফল? কিন্তু ঐ ফল আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি—তোমরা কি বিস্মৃত হয়েছিলে?

আদম।। প্রতিমুহূর্তে আমাদের মনে ছিল।

সদা।। মনে ছিল? আশ্চর্য। এ কেমন কণ্ঠস্বর তোমাদের? (*নিজের অঙ্গুলি দেখতে থাকেন*) ঈশ্বরের এই পরমাশ্চর্য অঙ্গুলি অতি জাগ্রত. . . সৃষ্টিকালে কোনো অঙ্গুলি কি নিদ্রিত ছিল? (*জোরে মুঠো করে*) তাহলে কি. . . না—অসম্ভব!. . . কার পরামর্শে খেলে?

[*জ্ঞানবৃক্ষের তলায় আদিনাগকে দেখা যায়*]

নাগ।। আমার পরামর্শে।

সদা।। খল সর্প, প্রতারক দুষ্ট আত্মা! আমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হলে!

নাগ।। আপনার আশীর্বাদে আমি ক্লান্ত। বরং আপনার ক্রোধ আমাকে সুখকর উত্তেজনায় তৃপ্তি দেয়। আপনি সবকিছুর স্রষ্টা। কিন্তু আপনার ভেতর এই যে ক্রোধ তাঁর সৃষ্টিকর্তা কিন্তু আমি। ঈশ্বরের ওপর এই কর্তৃত্ব কিন্তু আমাকে কম তৃপ্তি দেয় না।

সদা।। দেবদূতগণ। দেবরক্ষীগণ। (*সঙ্গে সঙ্গে দুদিকের থেকে আরও চারজন দেবদূত প্রবেশ করে*) আদিনাগের বাকরুদ্ধ কর। (*তথাকরণ*) তুমি মর্ত্যে নির্বাসিত হলে। সারাজীবন বুকে হেঁটে চলবে। তোমার উত্থানশক্তি রহিত হল। (*আদম এবং ইভ়কে*) তোমরা কি অনুতপ্ত? (*ওরা চুপ*) আমার আদেশ অমান্য করেছ, তার জন্য কি তোমরা অনুতপ্ত?

আদম।। না—!

ইভ়।। আপনি আমাদের অসত্য বলেছেন, সদাপ্রভু।

আদম।। সাহস করে আমরা সত্যকে চিনেছি।

ইভ়।। সত্যের প্রতিবাদ করেছি।

সদা।। ঐ ফল তোমাদের উদ্ধত করে তুলেছে—

আদম।। ঐ ফল আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

সদা।। আমি তোমাদের অভিসম্পাত করব—তোমরা পৃথিবীতে নির্বাসিত হবে।

ইভ়। আমরা পৃথিবী জয় করব।

সদা।। নারী, তুমি অসহ্য যন্ত্রণা পাবে। এমনকি ঐ সাধের গর্ভেও যন্ত্রণা ভোগ করবে।

ইভ।। আমার সেই যন্ত্রণার মুক্তি দিতে ঐ গর্ভেই কেউ আসবে।

সদা।। পুরুষ, তুমি মরুভূমির দুঃসহ মাটিতে দাঁড়াবে! চিরকাল ঘর্মাক্ত হবে, ঘর্মাক্ত মুখে আহার খুঁজবে।

আদম।। ঐ ঘর্মপাতে আমাদের ক্ষেত উর্বর হবে। আমাদের সন্তান আমাদের স্বেদবিন্দু ভাগ করে নেবে।

সদা।। দেবদূতগণ, ওদের বিতাড়িত কর। নির্বাসিত কর। সরে যাও! দৃষ্টি সরিয়ে নাও।. . . কি দেখছ আমাকে? তাকিয়ে আছ কেন? আশ্চর্য! আশ্চর্য! একি, আমি কি উলঙ্গ? আমার ধমনীর রক্ত কি চায় ওরা দেখছে, আমার মুঠোর ভিতরের আকাশ দেখতে পাচ্ছে, আমার রাজদণ্ডের ভিতরে লুকনো খড়্গটা দেখতে পাচ্ছে! সিংহাসনের মণিমুক্তোর মধ্যে জমানো রক্ত দেখতে পাচ্ছে! দেবদূতগণ, আমাকে আবৃত কর—আমি কী ভীষণ উলঙ্গ! বস্ত্র, আমাকে বস্ত্র দাও। দেবদূতগণ, ওরা দেখছে! ওদের নির্বাসিত কর; আমাকে বস্ত্র দাও, আমাকে আবৃত কর. . .

[*বলতে বলতে যেন নগ্নতা ঢাকতে কুঁকড়ে বসে পড়েন সদাপ্রভু। মঞ্চ ধীরে অন্ধকার হয়।*]

ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা

চরিত্র লিপি

গুগলু

সুনীল

ইরা

চৌধুরী

হুর্‌রা

যুবক

ফান্টুস

জ্যাঠামণি

প্রথম দৃশ্য

[ঘরটিতে দুটি জানালা এবং দুটি দরজা। সব কটি পর্দাই নীল। দেয়ালে তরঙ্গিত সমুদ্রের একটা বড় ছবি। কোণের দিকে একটা ছোট্ট টেবিলে মাস্তুল উঁচোনো একট খেলনার জাহাজ। টেবিলের তিনদিকে তিনটে চেয়ার। বাঁ দিকেরটা লাল, ডান দিকেরটা ভীষণ সুন্দর সাজানো, পিছনের দিকেরটা শাদা। এক কোণে কালো-লালে মেশানো একটি চেয়ার। ভাইস ক্যাপ্টেন গুগলুর নেভি ড্রেস। মাঝ বয়সী, ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। বড় জুলপি। গুগলু ঘরটি পর্যবেক্ষণ করল। যেন সব ঠিক আছে এরকম ভাব মুখে ফুটল। ঘড়ির দিকে তাকাল। দূর থেকে সেতারের বাজনা ভেসে আসছে। বাইরে বেল বাজলো।]

গুগলু ।। ইয়েস, কাম ইন।

[*দু'হাতে দুটি সুদৃশ্য চামড়ার বাক্স এবং কাঁধে একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ নিয়ে সুনীল ঢুকল। স্মার্ট তরুণ। মুখ-চোখ কিছু ক্লান্ত। ঝুপ করে বাক্স দুটো রাখল। কাঁধের ব্যাগটা নামাল।*]

গুগলু ।। (*ব্যস্তভাবে*) আমি গুছিয়ে রাখছি।

[*গুছিয়ে এক ধারে রাখে*]

সুনীল ।। (*দরজার দিকে তাকিয়ে*) ইরা, ভিতরে এস। (*হাতে একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে ইরা ঢোকে। আধুনিক তরুণ বয়সের মেয়ে। নীল শাড়ি। ওরা ঘরটা দেখতে থাকে।*)

গুগলু ।। নিশ্চয় আপনাদের মনের মত হয়েছে?

ইরা ।। ঘরটা কেমন অদ্ভুত তাই না, বল?

সুনীল ।। একটা রাত্তির কোনমতে কাটিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা, তা ভূত-অদ্ভুত কিছু একটা হলেই হল। (*গুগলুকে*) আচ্ছা, স্টেশন থেকে খদ্দের ধরে আনবার জন্য আপনাদের হোটেল থেকে লোক পাঠাতে পারেন, আর একটা গাড়ি পাঠাতে পারেন না?

ইরা ।। আমি হাঁটতে হাঁটতে দু'বার বসে পড়েছি, জানেন।

গুগলু ।। কলকাতা শহরের মত এখানে তো ট্যাক্সি নেই। নিজের পা ছাড়া এখান হাঁটা চলার উপায় নেই। ক্যাপ্টেন হুররা বলেন—

ইরা ।। কে বলেন?

গুগলু ।। ক্যাপটেন হুররা—এ হোটেলের মালিক। আমি হচ্ছি ভাইস ক্যাপ্টেন গুগলু।

ইরা ।। (*হাসি থামিয়ে*) কিছু মনে করবেন না নামটা শুনে হঠাৎ হাসিই পায়, তাই না?

সুনীল ।। আমি ভেবেছিলাম, এ হোটেলের মালিক আপনি।

গুগলু ।। হোটেল বলবেন না, এ-ঘরটাকে বলবেন, 'কেবিন'। ক্যাপটেন হুররা তাই পছন্দ করেন। হোটেলটির নাম দিয়েছেন তিনি "সিন্ধু সহচর"। আমি বলি 'হুররা সি'।

সুনীল ।। সিন্ধুসহচর—মানে জাহাজ।

গুগলু ।। রাইট।

ইরা ।। বেশ কাব্যবোধ আছে ক্যাপটেন হুররার। তবে আপনার 'হুররা সি' নামটিও কিন্তু বেশ ভাল।

গুগলু ।। ঐ যে সেতার শুনছেন—ছাদে বসে ক্যাপ্‌টেন বাজাচ্ছেন। ওটা থামলেই উনি আপনাদের কুশল নিতে আসবেন।

[*দু'জনে বাজনাটা একটুকাল শোনে*]

সুনীল ।। গুণী লোক। পুরোদস্তুর আর্টিস্ট! এই বনজঙ্গল আর পাহাড়ে-জায়গায় সেতার শুনব, ভাবিনি।

গুগলু ।। অথচ তিনি একজন ডাকসাইটে ক্যাপটেন কয়েক শত কোটি দুর্দান্ত ঢেউকে ক্যাপ্‌টেন পরাস্ত করেছেন, কয়েক শত ঝড়ের হুমকিকে উনি ভ্রূকুটিতে উপেক্ষা করেছেন, সমুদ্রকে পায়ের তলায় রেখে দোল খেতে খেতে চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'হুর্‌রা'! সবাই তাই তাঁকে ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা বলে ডাকেন। তবে আমার নামটি যে কেন ভাইস ক্যাপটেন গুগলু হল, ঠিক বলতে পারব না। ক্যাপ্‌টেন বলেন, দ্যাটস্ এ সিক্রেট। উনি বলেন, একটা ফুলের পাপঁড়িতে কি করে অত রঙ আর কারুকার্য আসে—দ্যাটস্ এ সিক্রেট—জেনে লাভ নেই। আমিও ঘটাইনা। আই মাস্ট ওবে মাই ক্যাপ্‌টেন। স্যরি, চা খাবেন, না কফি?

সুনীল ।। কি খাবে?

ইরা ।। যা হয় একটা হলেই হবে। আপনার কথা শুনতেও খারাপ লাগছিল না।

গুগলু ।। চা কিংবা কফি—আপনাদের চয়েস। আমি কোনও দায়িত্ব নেবনা।

সুনীল ।। (*হেসে*) এর মধ্যে আবার দায়িত্বের কি আছে।

গুগলু ।। নিতান্ত চা কিংবা কফির ব্যাপারেও যদি আপনারা দুজনে মিলে কোন ডিসিশনে আসতে না পারেন—তাহলে ভেবে দেখুন—

ইরা ।। ঠিক আছে কফি আনুন।

গুগলু ।। উইথ মিল্ক অর ব্ল্যাক?

সুনীল ।। ব্ল্যাক উইথ লেমন্।

গুগলু ।। ব্ল্যাক উইথ লেমন্। অ্যানি স্ন্যাক্স্?

ইরা ।। কিচ্ছু না।

গুগলু ।। নেকেড কফি। (*নোটবুকে লিখতে থাকে*) কফি, ব্ল্যাক উইথ লেমন। নেকেড। সার্ভিং টাইম, ফাইভ মিনিটস্। হ্যাঁ, রাতে কি খাবেন?

সুনীল ।। (*বিরক্ত*) পরে বলছি।

গুগলু ।। থ্যাঙ্কিউ! পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাবেন।

[*চলে যেতে থাকে*]

ইরা ।। (*ঘরটা আর একবার দেখে, কি মনে ক'রে*) হ্যাঁ, শুনুন ভাই ক্যাপ্‌টেন গুগলু!

গুগলু ।। (*ফিরে*) বলুন।

ইরা ।। দেখুন, একটু ঘুমুতে তো হবে, খাট-টাট কিছু নেই? বড্ড টায়ার্ড লাগছে। দু'দিন ট্রেনে প্রায় ঘুমোইনি।

গুগলু ।। ক্যাপ্‌টেন হুররা বলছিলেন, আপনারা সারা রাত্তির জাগবেন।

সুনীল ।। ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা বলছিলেন মানে? আমরা ঘুমুব না জেগে থাকব তা জানবেন ক্যাপ্‌টেন হুররা? তিনি বলবেন!

গুগলু ।। আপনারা দুজনেই নীল পোশাক পরেছেন। ক্যাপ্‌টেনের কথায় টুইন ব্লু

—যমজ নীল। আর আজকে আপনারা সাগরের নীল জলের মত খুশি। সমুদ্র ঘুমোয় না—আপনারাও আজ ঘুমোবেন না। আর যদি আপনারা সমুদ্রেকে বিট্রে করতে চান, পাশের কেবিনে জায়গা তৈরী আছে। আপনাদের নিয়ে যাব। কফিটা নিয়ে আসছি। চল্লিশ সেকেণ্ড চলে গেল। এরপর কোন অর্ডার প্লেস করে পিছু ডাকবেন না। উই মুভ ইন ক্যালকুলেটেড টাইম। (*চলে যায়*)

[*ইরা খানিকক্ষণ গুগলুর চলে যাওয়া দেখে তার পর যেন অবশ শরীরে চেয়ারে বসে পড়ে*]

সুনীল॥ কি হল।

ইরা॥ বলতো, হাতির ক'টা পা?

সুনীল॥ মাথা খারাপ হল না কি তোমার? হাতির পা দিয়ে কি হবে!

ইরা॥ বল না?

সুনীল॥ চারটে।

ইরা॥ এই, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর? করনা?

সুনীল॥ তোমার কটা পা?

ইরা॥ দুটো। (*সুনীলের একটা হাত টেনে নিজের গলায় জড়িয়ে*) নাগো, স্বপ্ন দেখছিনা। এই ঘরটা, হুর্‌রা, গুগলু, ওর কথাবার্তা সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্ন দেখছি। কেমন অদ্ভুত, না? তোমার কিরকম লাগছেনা?

সুনীল॥ তা একটু লাগছে বৈকি। তবে স্বপ্ন দেখতেও আমার খারাপ লাগেনা। যদি সে স্বপ্নটায় তুমি আমি দুজনে থাকি।

ইরা॥ হয়েছে, কোনটা তোমার মনের কথা আর কোনটা মুখের—সে আমি ঠিকই টের পাই।

সুনীল॥ পাও? তাহলে বলতো, মনে আমার কোন কথা লুকনো?

ইরা॥ ভাবছ, বেশ ছিলুম, কোত্থেকে একটা আপদ জুটল।

সুনীল॥ কি রকম আপদ জুটল জান, একা একা হাঁটছিলুম মাথার ওপর কোত্থেকে এই এতোবড় একটা চাঁদ এসে জুটল। (*ইরার মুখটা পিছনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরে*) এই এতোবড় একটা চাঁদ।

ইরা॥ (*মগ্ন*) জান, এই কটা দিন দুজনে বেড়াতে এসে আমার মনে হচ্ছিল—দুজনে মিলে কি সুন্দর একটা জগৎ হয়, সেখানে আর কাউকে চাইনা। এতোবড় একটা পৃথিবী কোনও কাজেই লাগেনা।

সুনীল॥ পৃথিবীটা কিন্তু একসময় ঠিক দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, কি খবর?

ইরা॥ বলব, খবর খুব ভালো—তোমার কাজে যাও।

সুনীল॥ পৃথিবীটা বলবে, তোমাকে নিয়েই আমার কাজ।

ইরা॥ বলব, আমাদের ছেড়ে দাওনা বাপু। আমরা আমাদের মতো থাকি।

সুনীল॥ পৃথিবীটা বলবে, কোথায় থাকবে?

ইরা॥ এই পৃথিবীতে।

সুনীল ॥ (*হেসে উঠল*) দেখলে, পৃথিবীরই জিত। শেষ অবধি ওর কাছেই ফিরতে হল।

ইরা ॥ (*হাসি মুখে*) না, বলব—আমাদের পৃথিবীতে।

সুনীল ॥ চেঁচিয়ে বলতে পারবে?

ইরা ॥ পারবনা! পাহাড়টার উপর উঠে কিরকম চেঁচিয়েছিলুম?

সুনীল ॥ হ্যাঁ, পাহাড়টা একেবারে নড়ে উঠেছিল।

ইরা ॥ উঠেছিলই তো।

সুনীল ॥ ঠিক আছে, এবার তুমি ওঠতো—জামা কাপড়টা বদলে নাও, রাস্তার ধুলোবালিতে মাখামাখি হয়ে আছে। ওদিকে একটা কেবিন আছে বলছিলনা? যাও, ওঠো।

ইরা ॥ (*দাঁড়িয়ে*) দ্যাখো, আবার ক্যাপ্‌টেন হুররা যে শাড়িটা পরব তা পছন্দ করেন কিনা।

[*বেল বেজে ওঠে*]

বোধহয় হুররা—

সুনীল ॥ আসুন।

[*গুগলু ঢোকে*]

গুগলু ॥ কফি আসছে। একটা কথা মনে করিয়ে দিতে এলাম। ক্যাপ্‌টেন হুররার ইচ্ছে আপনাদের এই নীল পোশাক এক্ষুণি বদলাবেন না। উনি একবার দেখবেন। চলি।

[*গুগলু চলে যায়*]

সুনীল ॥ কি ব্যাপার বলতো? আমাদের সব ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। ক্যাপ্‌টেন হুররা দেখছি ভাবিয়ে তুলল।

ইরা ॥ একটা জিনিশ লক্ষ করেছ, যেই শাড়িটা বদলাবার কথা উঠল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঢুকে নিষেধ করল।

সুনীল ॥ তার মানে, আড়াল থেকে আমাদের কথা-বার্তা সব শুনছে, রীতিমত ওদের ওয়াচে রয়েছি, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এখনই ভাবিয়ে তুলেছে, এর পরের অধ্যায়টিতে কি ঘটবে কে জানে।

ইরা ॥ এখান থেকে চলে যাওয়া যায়না?

সুনীল ॥ এতো রাতে, এই দুর্গম জায়গা—যাবেটা কোথায়?

ইরা ॥ আস্তে বল, আড়াল থেকে হয়তো এ-সব কথাও শুনছে।

সুনীল ॥ শুনলে আর কি করে আটকাবে। ভাগ্যের উপর ছেড়ে দাও। যা হবার হবে, কাল ভোরেই দৌড় লাগাতে হবে। আর চন্দ্রনাথটাও তেমনি।

ইরা ॥ চন্দ্রনাথ থাকলে তো কোনো অসুবিধেই হতনা।

সুনীল ॥ হতনা কে বলতে পারে, হয়তো এর ডবল বিপদে পড়তুম। এরকম একটা উড়ুক্কে জায়গায় চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করে নিজে কিনা 'অ্যারেস্টেড' হয়ে বসে রইলেন। অ্যারেস্ট হবার আর সময় পেলনা।

ইরা ॥ সেটা কি ওর দোষ?

সুনীল ॥ (*ক্ষেপে*) অ্যারেস্টেড হল চন্দ্রনাথ, আর দোষটা আমার!

ইরা ॥ তা নয়, ওর সম্পর্কে একটা সহানুভূতি তো তোমার থাকবে।

সুনীল।। নিরাশ্রয় অবস্থায় এরকম একটা আজগুবি হোটেলে এসে পড়লে সহানুভূতিটা কিছুকাল চাপা থাকে, বুঝলে? আত্মপ্রতারণা করেতো কোনো লাভ নেই। (*একটু ভেবে*) তবে কপাল ঠুকে একটা রিস্ক নেওয়া যায়। নাঃ, তাও হয়না আমি একা হলে হত, সঙ্গে যে আবার একটি রমণী রত্ন।

ইরা।। তা রমণী-রত্নটিকে রক্ষা করার সামর্থ্য না থাকলে দিন-রাত পৌরুষের গর্বও কোরোনা।

সুনীল।। (*রাগের গলায়*) খালি চোর-ডাকাতের ভয়তো নয়। আমি স্টেশনে ফিরে যাবার কথা ভাবছিলাম। সে তো আর এখানে নয়। আমি সাহস করে তোমাকে নিয়ে বেরুতে পারব—পারবে অতটা হাঁটতে? দু'বারতো এখানে আসার সময় ঠ্যাং মুড়ে বসে পড়েছিলে!

ইরা।। এতো বিশ্রী হয়েছে না তোমার কথাবার্তা—বিপদ-আপদে মাথাতো ঠাণ্ডা রাখবে। ঠিক আছে, আমি পারব—চল।

সুনীল।। চল বললেই তো হয়না, সম্ভব-অসম্ভব আছে না একটা। আমার উপর জিতলেইতো হল না।

ইরা।। আমি যাবই। এখানে কিছুতে থাকব না। মনে হচ্ছে, খুবই গোলমেলে জায়গা।

সুনীল।। বড্ড জিদ কর তুমি—বড্ড জিদ কর!

ইরা।। (*একটা বাক্স তোলে*) হ্যাঁ, জিদ করেই যাব— তা নাহলে যাওয়া হবে না। এখনো তেমন রাত হয়নি। ওঠ।

সুনীল।। সত্যি সত্যি যাবে?

ইরা।। কথা না বাড়িয়ে যাবে তো চল।

সুনীল।। বেশ। (*ব্যাগটা কাঁধে তুলে নেয়*) দাঁড়াও। (*দরজায় উঁকি দিয়ে*) একটু দেখেনি কেউ আছে কিনা। বলাতো যায় না—হয়তো ক্যাপ্টেন হুররা চাননা, আমরা যাই। লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। (*কফি পট নিয়ে মিস্টার গুগলু ঢোকে। সুনীল চমকে পিছু হটে আসে।*)

গুগলু।। ক্যাপ্টেন হুররার সঙ্গে দেখা না করে দয়া করে চলে যাবেন না।

[*গুগলু শান্তভাবে কাপে কফি ঢালতে থাকে।*]

সুনীল।। আমরা চলে যাচ্ছিলাম কি করে জানলেন?

ইরা।। এখানে কি সব সময় আপনারা আড়ি পেতে থাকেন?

গুগলু।। (*শান্ত*) হাত থেকে বাক্সটা দয়া করে নামিয়ে রাখুন।

সুনীল।। (*ক্রুদ্ধ*) কেন?

গুগলু। বাঃ, কফি আনলুম যে। হাত বাড়িয়ে কাপটাতো নেবেন। হাতটা খালি রাখতে হবে না?

[*সুনীল বাক্সটা রাখে*]

সুনীল।। ও। (*কফির কাপটা নেয়*) আচ্ছা, আপনাদের ক্যাপ্টেন কি এখুনি আসবেন?

গুগলু।। আপনারা একটু রেস্ট নিন, উনি ঠিক সময়েই আসবেন।

ইরা।। আমরা এখানে আর রেস্ট নিচ্ছিনা।

গুগলু।। (*বিষণ্ণ*) কেন?

ইরা।। আমরা স্টেশনে ফিরে যাচ্ছি।

গুগলু।। এই দুর্গম পথে? তাছাড়া আপনারা চলে গেলে আমার কতো বড় ক্ষতি হবে জানেন? ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে দেখা হবার আগেই যদি কেউ চলে যান, ক্যাপ্‌টেনের ধারণা—আমার আপ্যায়নে ত্রুটি হয়েছে। তখন ক্যাপ্‌টেন আমাকে ক্ষমা করবেন না। জানেন, আমি বরখাস্ত হয়ে যাব। কিন্তু বরখাস্ত হয়ে গেলে কোথাও গিয়ে খেয়ে-পরে হয়তো বাঁচব, কিন্তু ক্যাপ্‌টেনকে ছাড়া আমি বাঁচব না। দয়া করে আপনারা যাবেন না!

সুনীল।। আপনার ক্যাপ্‌টেনকে আমরা জানিয়ে যাব যে, আপনার দিক থেকে কোন-রকম ত্রুটি হয়নি। এজায়গাটা নির্জন—অন্য কোথাও গেলে লোকজন অন্তত দেখতে পাব।

গুগলু।। একটা নির্জন জায়গা খুঁজছিলেন বলেই তো এখানে এলেন।

সুনীল।। (*ক্রুদ্ধ*) কি খুঁজছিলাম, না-খুঁজছিলাম সে সব দয়া করে আপনার কাছ থেকে না শুনলেও চলবে! ক্যাপ্‌টেনকে পাঠিয়ে দিন। আমরা ওকে জানিয়ে চলে যাচ্ছি।

গুগলু।। কিন্তু ক্যাপটেন এখন চোখে দূরবীন লাগিয়ে আকাশটা খুঁজছেন—একটু সময় নেবেন আসতে।

ইরা।। একবার নিচে নেমে এলে আকাশটাতো আর পালাবে না। গিয়ে বলুন, একবার এসেই চলে যাবেন।

গুগলু।। যাচ্ছি। কিন্তু দয়া করে আমাকে আপনারা বরখাস্ত করাবেন না। নির্জনতা যদি ভাল না লাগে, এখানে তো আরো সব বোর্ডার আছেন—অনেক যাত্রী এ-জাহাজে, তাদের সঙ্গে একটু গল্প করুন—সুন্দর সময় কেটে যাবে।

ইরা।। এখানে আরো লোক আছে?

গুগলু।। তাইতো বললাম। আচ্ছা আমি ক্যাপ্‌টেনকে খবর দিচ্ছি।

[*গুগলু চলে যায়*]

ইরা।। কি বলল, শুনেছ—এখানে নাকি আরো সব বোর্ডার আছে। ঢুকবার সময় দেখলেনা—একেবারে ফাঁকা যমপুরী।

সুনীল।। এখানকার কিছুই আমি এখন বিশ্বাস করিনা, অবিশ্বাসও করিনা। একটি আজব জায়গায় এসেছি।

ইরা।। কিন্তু, জানো, আর কোনো লোক এ-বাড়িতে আমি দেখিনি কিন্তু।

সুনীল।। কোথায় কে আছে, একবার দুদিকে চোখ বুলিয়ে হেঁটে এলেই কি সব জানা যায়। ক্যাপ্‌টেন আসুক—কথা বলে দেখা যাক। সেটি যে আবার কিরকম বস্তু কে জানে?

ইরা।। ভাইস ক্যাপ্‌টেনটিকে দেখেই বুঝছনা উনি কি হবেন!

[*দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।*]

সুনীল।। আসুন।

[*মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। চোখে গোল সেকেলে ধরণের চশমা। ধুতির সঙ্গে একটি ফতুয়া পরেছেন। আমুদে মুখ-ভাব নিয়ে ওদের যেন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ভদ্রলোক চৌধুরী নামে পরিচিত। ওর কথা-বলার ভঙ্গি কিছুটা রহস্যময়*]

সুনীল।। আপনিই এ-হোটেলের ক্যাপ্টেন?

চৌধুরী।। ক্যাপ্টেন? (*হো-হো করে হাসে*) সেই আধ-পাগলাটার সঙ্গে বুঝি এখনো দেখা হয়নি? না, ভাই—এখনো ক্যাপ্টেন হয়নি। ত্রিশ বছর ধরে সেই চৌধুরীবাবুই রয়ে গেলুন।

ইরা।। আপনিও এই হোটেলে উঠেছেন?

চৌধুরী।। না উঠে যাবটা কোথায়? এ-সব জায়গায় কি আর দশটা হোটেল-ডরমেটারি থাকে? খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ব ভাবছিলাম—হঠাৎ এ-ঘরে কিচিরমিচির শুনে বুঝলাম এ-ঘরে নতুন পাখি পড়েছে, খোঁজ-খবরটা নিয়ে যাই। রাত থাকতেইতো কাজে বেরুব, আর হয়তো দেখাই হবেনা।

ইরা।। আমরা তো চলে যাচ্ছিলাম।

চৌধুরী।। কেন?

ইরা।। মনে হচ্ছিল, আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। তাছাড়া এদের হাব-ভাবটাও যেন কিরকম সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। আসলে ঠিক থাকার মতো ভরসা পাচ্ছিলাম না।

চৌধুরী।। (*মুখটা চিন্তিত*) এর মধ্যেই তাহলে কিছুটা টের পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। নাঃ . . . এখানে এসে পড়ে ঠিক করেন নি। যাকগে, এখন আর উপায় কি। আমি পাশের ঘরে আছি, দরকার হলে ডাকবেন।

[*চৌধুরী উঠে দরজার দিকে এগুল।*]

ইরা।। আপনি যাচ্ছেন?

সুনীল।। আপনি যদি একটু খুলে বলেন—মানে বুঝতেই পারছেন, আমরা দুটো মানুষ. . . একেবারে অসহায় অবস্থায়—

[*চৌধুরী ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে তর্জনী রেখে রহস্যময়ভাবে চুপ করার সংকেত করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে আবার এসে বসল।*]

চৌধুরী।। দরজাটি বন্ধ না রেখে, এখানে কোনো কথাটি নয়।

ইরা।। জানেন, আমরা আপনি আসার আগে যা বলেছি ওরা সব আড়াল থেকে শুনেছে।

চৌধুরী।। দরজাটি তাই তো বন্ধ করলুম। এতেও ওদের সন্দেহ বাড়ল বই কমল না। তবু যতটা সেফ্ থাকা যায়, কি বলেন?

সুনীল।। এদের কি ব্যাপার বলুন তো?

চৌধুরী।। জায়গাটা রহস্যময়। ঐ ক্যাপ্টেন আর তার ভাইসটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে লোক আনেনা। স্টেশন থেকে ওরাই আপনাদের নিয়ে এল না আপনারা নিজেরা এলেন?

ইরা।। ঐ গুগল্ না কে—ঐ লোকটা আমাদের ভাল হোটেলের কথা বলে এখানে নিয়ে এসেছে।

চৌধুরী।। অমনি চলে এলেন?

সুনীল।। কি করব? এখানে আমার এক বন্ধু থাকত। একটা বাসা নিয়ে একা থাকত

—ওর চিঠি পেয়েই বেড়াতে এসেছিলাম। এসে দেখি ওর ঘরে তালা বন্ধ, সে নাকি অ্যারেস্টেড। কোথায় যাই? স্টেশনে গেলুম—সেখান থেকে এখানে।

ইরা॥ ভাবলাম, একটা রাত হোটেলে থেকে পরের দিন থানায় ওর খোঁজখবরটা নেব। খবরটা শুনে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না।

চৌধুরী॥ তা ঠিক। তবে রাতটা একটু সাবধানে থাকুন। ওরা আপনাদের কাছে যে কি চায় সেটাতো আর আমি বুঝব না—তবে যেচে ডেকে আনার পিছনে কোনও কারণ থাকতেই পারে।

সুনীল॥ আপনি কতদিন আছেন?

চৌধুরী॥ তা হপ্তাখানেক হবে।

ইরা॥ আপনাকে তো কিছু করছে না?

চৌধুরী॥ আমার আছেটা কি? পাখি নিয়ে কাজ করি—মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই নেই। ওদের পক্ষেও না—বিপক্ষেও না। আমাকেও আমল দেয়না, আমিও আমল দেইনা। কাজ শেষ হয়ে এসেছে, কাল-পরশুই ফিরে যাব।

সুনীল॥ এখানে কি কাজ আপনার?

চৌধুরী॥ ঐ যে বললুম কাজটি হচ্ছে পাখি ধরা তারপর উড়িয়ে দেয়া।

ইরা॥ সে কি রকম—এতো বেশ মজার কাজ দেখছি। উড়িয়েই যদি দেবেন, তো ধরছেন কেন?

চৌধুরী॥ ধরছি ওদের পায়ে নম্বর দিয়ে একটি আংটি পরিয়ে দেব বলে। এখানে এই সময় দেশ বিদেশের হাজার রকম পাখি আসে। আমরা জাল পেতে, ফাঁস ছড়িয়ে নানা ভ্যারাইটিজের পাখি ধরি। তাদের স্বভাব, আকৃতি, চালচলন, ফুড-হ্যাবিট সব নোট করে পায়ে একটা নম্বর লাগানো আংটি পরিয়ে উড়য়ে দেই। ওটা যখন অন্য কোন দেশে গিয়ে পড়বে সেখানকার পক্ষী-গবেষকরা ওকে ধরলে আমাদের জানাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওর হিস্ট্রি পাঠাব। ফলে পাখিটার গতিবিধি, কোন অসুখ করলে কোন দেশ থেকে কিভাবে সেটা ছড়ায়, কোন জলবায়ুতে কেমন থাকে, কোথায় কি রকম অ্যাডজাস্ট করে—এসব পুরো ডিটেলস তৈরি হয়। পক্ষী তত্ত্বের গবেষণার এটা একটা বিরাট কাজ।

ইরা॥ দারুণ মজার কাজ করেন তো?

চৌধুরী॥ ডুবে আছি তো এই নিয়েই। বুড়ো হয়ে গেলুম পাখির সঙ্গে ঘর করে। কবে না গায়ে পালক গজায়! এখন এমন হয়েছে—হঠাৎ—হঠাৎ কোন কোন মানুষের দিকে তাকালে কোন বিশেষ ধরনের পাখি বলে মনে হয়—স্বভাবে তো মিল থাকে।

ইরা॥ (*হেসে*) আমাদের নিশ্চয়ই পাখি মনে হচ্ছে না?

চৌধুরী॥ পাখির গন্ধ একটু পাচ্ছি বৈকি—তা না হলে এতক্ষণ বসে থাকার ধৈর্য কি আমার থাকতো। (*ইরাকে*) আপনাকে মনে হচ্ছে, ডানা গুটিয়ে বসে আছেন একটি রাণী পাখি। উড়ে উড়েও যেন সাধ মেটেনি।

সুনীল॥ ঠিকই বলেছেন, ও একটু রোম্যান্টিক প্রকৃতির।

চৌধুরী॥ আপনিও কম যান না। রাণী-পাখির গা ঘেঁসে চলে এক ধরণের পুরুষ পাখি! গলা-মিলিয়ে গান করে। দুটিতে ভারি মিল— কী ঠিক বলিনি?

ইরা॥ পাখির মতো অমন সুখে কি আর চিরটাকাল থাকা যায়? কতোরকম বিপদ-আপদ। দেখছেন তো এখানে এসে কিরকম সুখে আছি।

চৌধুরী॥ তবে হ্যাঁ, এদেরও শত্রু আছে। বড় চেহারার এক ধরণের ডাকাত-পাখি এদের ঠুকরে দিতে চায়। আমার কাছে এদের ছবি আছে। অনেক ছবি।

ইরা॥ আপনার সময় থাকলে এক সময় দেখব।

চৌধুরী॥ ছবি আমার সঙ্গেই থাকে। দাঁড়ান, একটা ছবি দেখাচ্ছি।

[*চৌধুরী একটা নোটবই খুলে ওদের উৎসুক চোখের সামনে মেলে ধরে। ওদের চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। মুখটা শক্ত হয়। মুখটা সরিয়ে আনে।*]

চৌধুরী॥ (*চোখের চশমাটা খুলে*) ছবি পেলেন না তো? আমার আইডেনটিটি কার্ডটা পড়ে দেখেছেন?

সুনীল॥ আপনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক?

চৌধুরী॥ চুপ! আপনাকে জানানো দরকার বলেই জানালাম। এ বাড়িতে কাউকে একথা জানাবেন না। জানালে আপনারা বিপদে পড়বেন! সাবধান!

ইরা॥ আমাদের সঙ্গে আপনার কি দরকার?

চৌধুরী॥ আজ সারাদিন আপনাদের পিছনে পিছনে ঘুরছি। এতোক্ষণে বসতে পারলাম। একটা জিনিশ আপনাদের কাছে চাই। পেলেই আমার কাজ শেষ।

সুনীল॥ কী চান আমাদের কাছে?

চৌধুরী॥ চন্দ্রনাথ বাবুর ডায়েরিটা আমাদের হাতে আছে। ওতে এক জায়গায় আপনাদের নাম লেখা আছে!

ইরা॥ থাকতে পারে। আমাদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল।

চৌধুরী॥ আপনাদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান চলত।

সুনীল॥ চলত।

চৌধুরী॥ চন্দ্রনাথবাবু কেন অ্যারেস্টেড হয়েছেন জানেন?

সুনীল॥ না; তবে ও রাজনীতি করত জানি। ও-সব ব্যাপারেই হবে। এমনিতে সৎ ছেলে।

চৌধুরী॥ এখানকার কয়লা খনির শ্রমিকদের রাজনীতির নামে ও উত্তেজিত করত এবং ভুল পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার পথ, ন্যায়ের পথ ছিলনা।

সুনীল॥ ওর ন্যায়-অন্যায় ও বুঝত—আমি ওর সব কিছু জানতাম না।

চৌধুরী॥ (*ইরাকে*) ও আপনাদের একটা ম্যাপ পাঠিয়েছিল?

ইরা॥ ম্যাপ?

চৌধুরী॥ হ্যাঁ, ম্যাপ—মানচিত্র।

সুনীল॥ না, এটা ভুল খবর।

চৌধুরী॥ ওর ডায়েরিতে আছে। ঐ ম্যাপটা আমাদের দরকার। ওর বিরুদ্ধে আমাদের কেসটায় ঐ ম্যাপটা চাই। আপনাদের ওটি দিতে হবে।

ইরা॥ আমরা কোন কালে কোনো ম্যাপ পাইনি।

চৌধুরী॥ লুকোলে ফল ভাল হবে না। আমরা খুঁজে বের করবই।

ইরা॥ (*হঠাৎ কি মনে করে*) ও হ্যাঁ, একটা চিঠিতে একবার একটা ম্যাপের কথা ছিল।

চৌধুরী ॥ বলুন।

সুনীল ॥ কি বলছ তুমি, কোথায় ম্যাপ?

ইরা ॥ (*সুনীলকে*) তোমায় মনে নেই, ও একবার চিঠিতে লিখল, তোমাদের একটা ম্যাপ পাঠাব— একটা নতুন দেশের ম্যাপ। তুমি বলেছিল, রাজনীতি করতে করতে চন্দ্রনাথ কবি হয়ে যাচ্ছে। মনে নেই?

চৌধুরী ॥ ম্যাপটার কি হল?

সুনীল ॥ (*যেন মনে পড়ে যায়। হেসে ফেলে*) ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। (*চৌধুরীকে*) সে একটা কথার কথা। আপনারা পুলিশের লোক একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে এতো বাড়িয়ে গম্ভীর করে দেখেন না।—ওটা কোনো ভাববার ব্যাপারই নয়।

চৌধুরী ॥ অনেক সামান্য ব্যাপার আমাদের অসামান্য খবর এনে দিয়েছে। ম্যাপটা কি করে পাব বলুন।

সুনীল ॥ কোথায় ম্যাপ? আমার দুজনে ঘর-সংসার করি, নিজেদের মত থাকি, তাই ও প্রায়ই চিঠিতে লিখত, যা সব রাজনীতি করিয়ে লোকেরা বলে—নিজেদের ছোট্ট গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এস। অনেক দায়িত্ব, অনেক-অনেক কাজ ইত্যাদি। তারই ফাঁকে এক জায়গায় লিখেছিল, তোমাদের একটা ম্যাপ পাঠাচ্ছি। নতুন একটা দেশের ম্যাপ। যেমন দুর্গম পর্বতকে জয় করতে হলে পাথরের রাজত্বের একটা মানচিত্র চাই, যেমন সমুদ্রেকে জয় করতে হলে ভয়ঙ্কর ঢেউ আর হাঙরের খবর দিয়ে বিপুল জলের একটা মানচিত্র চাই—তেমনি সমস্ত বাধা ঠেলে একটা সোনার দেশে পৌঁছতে হলে তার নতুন পথেরও একটা ম্যাপ চাই।

ইরা ॥ চন্দ্রনাথ এই মানচিত্রের কথা বলেছিল—এটা আসলে একটা আবেগের কথা।

সুনীল ॥ বস্তুত কোনও ম্যাপ নয়।

ইরা ॥ ও চাইত, আমরা এই ম্যাপটা ওর কাছে চাইব।

সুনীল ॥ কিংবা আমরাই তৈরী করে নেব।

চৌধুরী ॥ আপনাদের কি ধারণা, আপনাদের এসব কথায় আমি আশ্বস্ত হয়ে ম্যাপটা আর চাইব না। আপনারা যে কথা বললেন তাতেই কি বোঝায় না—এ ম্যাপটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। সোনার দেশের নামে দেশের সমস্ত প্রচলিত শৃঙ্খলা ভেঙে নতুনের নামে একটা তছনছে কাণ্ড শুরু করা? ম্যাপটা আমার চাই।

সুনীল ॥ যা বললাম, এর বেশি কিছু জানি না।

চৌধুরী ॥ উত্তর আমার কাছে সন্তোষজনক হল না।

সুনীল ॥ তাহলে আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমাদের অসাধ্য।

চৌধুরী ॥ আপনাদের আর একটু সময় দিলুম, আপনারা ভেবে দেখুন। আপাতত আমি যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, আমার সম্পর্কে কোনো খবর এখানকার কাউকে দেবেন না। —তাতে ফল কিন্তু ভাল হবে না! আপানারা ভাবুন। যাচ্ছি।

[*চৌধুরী চশমাটা পরে। চলে যায়।*]

সুনীল ॥ এ-তো ভাল আব্দার। একে কোত্থেকে ম্যাপ এনে দি বল তো?

ইরা ॥ আর এই ম্যাপটার জন্য সব সময় আমাদের ফলো করছে—না নিয়ে ছাড়বে না, জানতো।

সুনীল।। না নিয়ে ছাড়বে না।— এমন সব কথা বলনা যেন সত্যি সত্যিই আমরা ম্যাপ নিয়ে ঘুরছি। চন্দ্রনাথটা নেমন্তন্ন করে এমন একটা হুজ্জতে ফেলল।

ইরা।। এখানে এক মুহূর্তও আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না। কাউকে কিছু জানাতে হবে না—চলে যাচ্ছিলাম, চলেই যাব, যা থাকে কপালে, বেরিয়ে পড়ি।

[*গুগলু ঢোকে*]

গুগলু।। ক্যাপ্‌টেন হুররা আসছেন। (*চেঁচিয়ে*) হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা!

[*ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা ঢোকেন। নেভির পোশাক। কোন প্রকারেই ক্যাপ্‌টেন-সুলভ হাবভাব নয়। মাথায় টুপি আছে, কিন্তু পাজামা এবং পাঞ্জাবী পরেছেন। মধ্যবয়স। কিছু ভাবছেন। কারুর দিকে লক্ষ নেই। ওরা দুজন ওঁকে সবিস্ময়ে লক্ষ করছে। গুগলু ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুনীল দাঁতে নখ কাটছে*]

হুররা।। (*জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে*) মিঃ গুগলু?

গুগলু।। স্যার।

হুর্‌রা ।। সেই কালো পোকাটা দেখতে পাচ্ছ? নীল মেঘে যেন কামড় বসাতে চাইছে।

গুগলু।। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন, আপনার গেস্টরা অপেক্ষা করছেন।

হুর্‌রা।। (*ওদের দিকে না তাকিয়ে*) ভদ্রলোক দাঁত দিয়ে নখ কাটছেন, দৃশ্যটা বিরক্তিকর. . . এ অবস্থায় কি করে কথা বলব!

[*সুনীল দ্রুত হাতটা নামায়। হুর্‌রা সঙ্গে সঙ্গে ওদের দিকে তাকান। ওঁর সংলাপ কিছুটা দ্রুত উচ্চারিত*]

হুর্‌রা।। সত্যি দুঃখিত, একটু দেরী হয়ে গেল। এবং খুশি যেহেতু আপনাদের পোশাকে নীল রং দেখছি। এবং আরো খুশি হব যদি আপনারা নীল রঙের অনেক ঢেউ তুলতে পারেন।

সুনীল।। ঢেউ তোলার সময় নেই, আমরা চলে যাচ্ছি।

হুররা।। কোথায়?

সুনীল।। আপনার এই কেবিনের বাইরে, কোথাও ঠাঁই না হলে স্টেশনে। আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।

হুররা।। (*গম্ভীর*) মিঃ গুগলু!

গুগলু।। আমি আপ্যায়নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি।

হুর্‌রা।। মিঃ গুগলু, আমি কোনো উত্তর চাই না, কতো মাসের মাইনে পাবে কেবল সেটা জানতে চাই। ইউ আর ডিস্‌মিস্‌ড্। ক'মাসের মাইনে বাকি? তাড়াতাড়ি বল।

গুগলু ।। (*বিনীত*) মনে নেই, ক্যাপটেন।

হুর্‌রা।। মনে রাখার চেষ্টা করেছ?

গুগলু।। না, ক্যাপ্‌টেন।

হুর্‌রা।। অথচ একটা জার্নিতে সমুদ্রে কতটা ঢেউ দেখা যায় আমি গুণে গুণে মনে রাখতে চেষ্টা করতাম। জলের উপর থেকে সূর্যটা ভোরবেলা কতো হাজার রঙ ছড়িয়ে ওঠে আমি মনে রাখতে চাইতাম।

গুগলু॥ আপনি সব পারেন।

ইরা॥ আমরা চলে যাচ্ছি—এ ব্যাপারে ওর কোন দায়িত্ব নেই।

হুররা॥ এটা আমাদের বিজ্‌নেস টক।

সুনীল॥ (*বাক্সটা তুলে নিয়ে*) আপনাদের বিজ্‌নেস টক চালিয়ে যান, আমরাও এগুতে থাকি।

হুররা॥ মিঃ গুগলু!

গুগলু॥ ক্যাপ্‌টেন।

হুররা॥ এঁরা যাতে চলে যেতে না পারেন, সে ব্যবস্থা করা আছে?

গুগলু॥ হ্যাঁ, ক্যাপটেন।

হুররা॥ থ্যাঙ্কিউ। ইউ আর রি-অ্যাপয়েন্টেড।

গুগলু॥ থ্যাঙ্কিউ, ক্যাপ্‌টেন হুররা। হিপ হিপ হুররা, হিপ হিপ হুররা!

[*মাথা নিচু করে হুবরা অভিনন্দন গ্রহণ করল*]

সুনীল॥ আশ্চর্য! আপনি কি আমাদের এখানে আটকে রাখতে চান?

হুররা॥ কিছুকাল।

সুনীল॥ কি চান আমাদের কাছে?

হুররা॥ অতিথির সেবা।

সুনীল॥ ও-সব ঢং রাখুন! এ-সব ব্যবসা আর কদ্দিন চালাবেন? কী চান, তা খুলে বলুন।

ইরা॥ কি আবার চাইবে, যা আর সব ক্রিমিনালসরা চায়। যাবার ভাড়া রেখে, বাকিটা দিয়ে দাও, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। উঃ!

হুররা॥ মেয়েরা বড্ড হিসেবি,—যাবার ভাড়া রেখে, বাকিটা. . . মি গুগলু, ওঁদের খাবার রেডি?

হুররা॥ আপনারা দয়া করে খেয়ে নিন।

সুনীল॥ আমরা খাব না।

হুররা॥ সারারাত না খেয়ে থাকবেন?

ইরা॥ আমাদের খুশি।

হুররা॥ মিঃ গুগলু, তোমার মনে পড়ে, ওদের আগে যে দুজন এসেছিল, তারাও ঠিক এমনি ছোট্ট দুটি ছেলে-মেয়ের মত 'না-খাবোনা, না-খাবনা' বলছিল। অথচ তারপর?—

গুগলু॥ হো-হো ক'রে হাসল, চেয়ে নিয়ে আরো খেল—অমনি নীল রঙের শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বলেছিল, ক্যাপটেন হুররা, আপনি পান খান?

হুররা॥ আমি পান খাইনা। বলেছিলাম, না ভাই খাবনা।

গুগলু॥ লবঙ্গ খেলেন, একটা।

হুরবা॥ (*ভীষণ হেসে*) একটা নয়, দুটো—আবার হিসেবে ভুল করছ! (*হাসতে হাসতে*) মি গুগলু ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, বসতে বল। (*ক্ষিপ্ত*) বি ডিউটিফুল।

গুগলু॥ বসুন আপনারা।

[*ওরা পাথরের মতো স্থির*]

হুররা ॥ (*সেই হাসি আবার মুখে এনে*) যাবার সময় বাচ্চাদের মত হাত নেড়ে বলছিল, টা-টা-টা-টা (*ক্রুদ্ধ*) মিঃ গুগলু, ওরা বসেননি।

গুগলু ॥ দয়া করে বসুন।

সুনীল ॥ পাগলামোরও একটা সীমা থাকে।

ইরা ॥ বয়সের গাছপাথর নেই—দুজন আধ-বুড়োর এই রঙ্গ. . . ন্যাস্টি!

হুররা ॥ মেয়েরা বড্ড হিসেবি—'আধ-বুড়ো', মানে অর্দ্ধেক বুড়ো। কিংবা অর্ধেক যুবক, অর্দ্ধেক বুড়ো; নাকি. . . হিসেবটা কি হবে মিঃ গুগলু?

গুগলু ॥ মানে অর্দ্ধেক আগুন, অর্ধেক আলো—আধবুড়ো।

হুররা ॥ (*দারুণ হেসে*) দারুণ বলেছ, অর্ধেক আগুন অর্ধেক আলো—দুটোকে মিশিয়ে একটু ঝেঁকে দাও, হয়ে গেল আধবুড়ো।

সুনীল ॥ এ-সব ইয়ার্কি থামাবেন! অসহ্য!

হুররা ॥ (*গম্ভীর*) এই চেয়ারেই বসতে পারেন। তবে আগে আমি এই ঘরের আলো বদলে দিচ্ছি কারণ আমাদের জাহাজ—সিন্ধু সহচর—পাড় ছেড়ে সমুদ্রের অনেকটা ভিতরে চলে এসেছে। সমুদ্রের নীল ঢেউ-এর রঙ এসে পড়ছে ঘরে।

[*হুররা একটা বোতাম টেপে।*
ঘরটা নীলাভ হয়ে ওঠে।]

গুগলু ॥ কিরকম লাগছে?

ইরা ॥ (*বিরক্ত*) চমৎকার!

গুগলু ॥ (*সুনীলকে*) আপনার?

[*সুনীল উত্তর দেয় না*]

হুররা ॥ এবার কাজের কথায় আসা যাক। কি বলেন, কাজের কথায় আসছি?

সুনীল ॥ কেন? চালিয়ে যান না! শুনুন, খুব বেশি কিছু আমাদের কাছে নেই। (*ব্যাগটা ফের টেবিলে ছুঁড়ে দেয়*) এবার আমাদের দয়া করে বিদেয় দিন।

গুগলু ॥ কি করে যাবেন?

ইরা ॥ হেঁটে।

হুররা ॥ অথচ শহরে আজকাল কতো ট্যাক্সি। এক এক সময় মনে হয়, এরপর বেড়ালগুলোও ট্যাক্সি চেপে ইঁদুর মারতে যাবে। (*ভীষণ হাসে, গুগলুও যোগ দেয়*) কি রকম হিউমারটা করলুম, অ্যাঁ?

সুনীল ॥ (*চেঁচিয়ে*) থামুন। দরজা খোলার বন্দোবস্ত করুন।

হুররা ॥ দরজা খোলাই আছে।

ইরা ॥ (*দরজার কাছে গিয়ে*) খোলা! খোলা আছে।

[*ওরা জিনিশপত্র তুলে নিতে থাকে*]

হুররা ॥ এটা পড়ে রইল। (*ব্যাগটা ছুঁড়ে দিতে সুনীল ধরে ফেলে*) গুড!

সুনীল ॥ ধন্যবাদ!

হুররা ॥ ঘরটায় নতুন আলো এসেছে, এক্ষুণি তো যেতে পারবেন না। দরজাতো কবে থেকেই খোলা, বন্ধ মেইন গেট। ওটিতো খোলা হবেনা। টাকা পয়সা চাই না। ঝগড়াও না। এ রাত্তিরে কোথায় যাবেন। আপনারা আমার গেস্ট। ভয় নেই। রাত্তিরটা থাকুন, কাল না হয় কোথাও যাবেন।

ইরা।। এখানে এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই।

হুর্‌রা।। সময়টাতো কাটতে হবে। যেতে যখন পারছেন না।

সুনীল।। একে সময় কাটানো বলেনা।

হুর্‌রা।। কাটবে, চমৎকার সময় কাটবে। জিনিশপত্র নামিয়ে রাখুন। এতোরাত্রে কেউ যায়? ছেলেমানুষি হচ্ছে না?

ইরা।। যদি থাকতেই হয়, আমাদেব একা থাকতে দিন। (*জিনিশগুলো রাখে*) দয়া করে আর জ্বালাবেন না।

হুর্‌রা।। কিঃ গুগলু!

গুগলু।। স্যর!

হুর্‌রা।। এদের কেবিনে এঁরাই থাকবেন, নিশ্চয়ই এঁদের তাই জানিয়েছ। এঁরা একা থাকবেন, তাই না?

গুগলু।। সার্টেনলি স্যর।

হুর্‌রা।। আমি এক্ষুণি চলে যাব। কেবল কুশল নিতে আসা। আপনারা একাই থাকবেন।

সুনীল।। আপনার কুশলপর্ব সম্ভবত শেষ হয়েছে?

হুর্‌রা। এখনো রেগে আছেন, রাগটা মিটিয়ে যাই। আপনারা আমার অতিথি। অতিথিকে রাগাতে নেই।

ইরা।। কোনও প্রয়োজন নেই। এটা হোটেল, আপনি মালিক—আমরা কাস্টমার—এর বেশি কোনও সম্পর্ক নেই। এযাত্রা কাটলে, জীবনে আর হোটেল নয়।

হুর্‌রা।। কিন্তু এটা হোটেল নয়। এটা একটা জাহাজের কেবিন।

সুনীল।। হ্যাঁ, কেবিন। আমার ভুল ক্ষমা ক'রে বিদেয় হন।

হুর্‌রা।। এর নাম সিন্ধু সহচর

ইরা।। আমাদের সব মনে আছে। দয়া করে যান। হ্যাঁ, আমরা কিছু খাব না--আপনারা ঘুমিয়ে পড়ুন।

হুর্‌রা।। ঘুমুলে জাহাজটা কে চালাবে?

সুনীল।। ও আপনিই চলবে—জাহান্নামের রাস্তাটা ওর চেনা আছে।

হুর্‌রা।। (*আত্মমগ্ন*) কিন্তু জাহাজটা যাচ্ছে অদ্ভুত একটা দেশে। মাটি খুঁড়লে সোনা। হাত বাড়ালে বুকভরা বাতাস, আর চোখ তুললেই ঢেউ আর ঢেউ। কতোবার ভেবেছি, পূর্ণিমার চাঁদটাই যেন জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—যেদিকে আলোর ইচ্ছে, সেদিকেই জাহাজের পথ। মিঃ গুগলু, কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছে?

সুনীল।। (*বাক্সটা খুলে কিছু খুঁজতে খুঁজতে*) ওটা ঘুঘু। এখানে চরতে চাইছে।

ইরা।। আবার বাক্সটা খুলে ঘাঁটতে শুরু করলে কেন?

সুনীল।। তাসটা খুঁজছি। বসে বসে পেসেন্স খেলব, আর কি করব?

ইরা।। আমার বোনাটাও একটু বের করে রেখ না, তুমি বের করতে গিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করবে।

[*ইরা নিজে বাক্সটার কাছে বসে পড়ে।*]

হুর্‌রা।। (*মগ্ন*) মিঃ গুগলু, অনেক দূরে যেন পাখিটা বসল, কী রঙের পাখি?

গুগলু।। সেই নীল রঙের পাখিটা।

হুররা।। ঠিক বলেছ, নীল রঙের পাখিটা, রূপোর ঘন্টার মত গলার স্বর! গুগলু, চল আমরাও ছাদে যাই। সমুদ্রের কোথায় উড়ছে পাখিটা?

গুগলু।। জলের একটু উপরে।

হুররা।। ডানায় জল লাগছে?

গুগলু।। পায়ের নখে নীল-নীল জল লাগছে।

হুররা।। কটা পাখি?

গুগলু।। দুটো

হুররা।। কোত্থেকে এসেছে?

গুগলু।। অনেক দূর থেকে—

হুররা।। কোথায় যাবে?

গুগলু।। অদ্ভুত একটা দেশে। মাটি খুঁড়লে সোনা, হাত বাড়ালে বুক-ভরা বাতাস আর চোখ তুলতেই ঢেউ আর ঢেউ।

হুররা।। পাখিদুটো ডাকছে না কেন?

গুগলু।। পাখিদুটোর ডানায় জল লাগছে।

হুররা।। (*ধমকে*) মিঃ গুগলু, পাখিদুটো ডাকছে না কেন?

গুগলু।। (*দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে*) একটু ডাকুন, মানে কথা বলুন। প্লিজ।

সুনীল।। (*শক্ত গলায়*) দয়া করে বাইরে যাবেন। মানুষকে বিরক্ত করারও একটা মাত্রা থাকা উচিত।

ইরা।। এই আপনার অতিথিসেবার নমুনা। বিশ্রাম দূরের কথা, অন্তত নিজেদের মত তো একটু থাকব।

হুররা।। মিঃ গুগলু, ওদের বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া দরকার। আমরা কিছু বুঝিনা, সত্যি বুড়ো হচ্ছি, গুগলু।

সুনীল।। ব্যাপারটা বুঝলে কৃতার্থ হব।

হুররা।। ওদের বসবার জন্য দুটো মোড়া এনে দাও।

ইরা।। অনেক চেয়ার আছে, মোড়া—সিংহাসন কিচ্ছু চাই না।

হুররা।। তাহলে অন্তত এই চেয়ারগুলো বিশ্লেষণ করে দিয়ে যাই।

সুনীল ।। চেয়ারগুলো বিশ্লেষণ করবেন? আর একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল দেখছি।

হুররা।। মাত্র দু-মিনিট সময় নেব। মিঃ গুগলু, স্টার্ট।

[*গুগলু দ্রুত টেবিলটার কাছে যায়। সুদৃশা চেয়ারটি উঁচু করে ধরে*]

গুগলু।। চেয়ারটা দেখছেন? সুদৃশ্য। এর নাম ড্রিম-চেয়ার।

[*গুগলু চেয়ারটি নামিয়ে রাখে*]

হুররা।। এই কেবিনে এর আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকে এই চেয়ারে বসে কেমন স্বপ্নের আমেজ অনুভব করেছেন। এতে বসলে, আপনারাও স্বপ্ন দেখবেন।

গুগলু।। নানা ধরণের স্বপ্ন—কোনটা পেখম তোলা, কোনটা উড়াল দেয়া।

হুররা।। কোনটা মাটির অনেক নিচে একটা গোপন মাদলের তালে তালে নেচে ওঠার স্বপ্ন।

গুগলু।। (*২য় চেয়ারটি তুলে*) চেয়ারটা দেখছেন। এর নাম ডিবেট-সিট।

হুররা।। বসলেই তর্ক। তর্ক থেকে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে—

গুগলু।। ঝগড়া থেকে সুইসাইড—আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটতে পারে। তার জন্য (*উইংসের দিকে দেখিয়ে*) ওদিকে ভিতরে ছোট একটা কেবিন আছে, ওখানে আছে সুইসাইড-চেয়ার। এবং ঐ কোণে যেটা দেখছেন, (*মঞ্চের কোণে*) ওটার নাম ইলেকট্রিক-চেয়ার।

হুররা।। ওটায় বসলে মাঝে মধ্যে নিদারুণ শক্ খেতে হয়। নানা রকম শক্।

গুগলু।। আর ঐ শাদা রঙের চেয়ারটি জাজমেন্ট সিট। ওখান থেকে বিচার।

হুররা।। জাজমেন্ট সিট অব্ ক্যাপটেন হুররা। ওটি আমরা বিচারের সময় ব্যবহার করি।

গুগলু।। হিপ হিপ হুররা, হিপ হিপ হুর্‌রা!

[*হুর্‌রা মাথা নিচু করে অভিনন্দন গ্রহণ করেন*]

হুররা।। চলে যাবার আগে, আবার তাই জিজ্ঞেস করছি।—এসব চেয়ারেই বসবেন, না অন্য আসনের ব্যবস্থা করব?

সুনীল।। কিছু চাইনা আমরা মাটিতে বসে কাটিয়ে দেব।

ইরা।। মেঝেটার কোনও নাম নেই?

হুররা।। মাটির অন্য নাম সর্বংসহা। উনি সহ্য করবেন—অসহ্য লাগলে দাঁড় করিয়ে দেবেন—মাটির যা অভিরুচি। আমরা যাচ্ছি।

[*আগে আগে ক্যাপটেন হুররা চলতে থাকে পিছনে গুগলু। ওরা চলে যায়। ইরা গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।*]

সুনীল।। দরজাটা বন্ধ করে দিলে না?

ইরা।। এদিক থেকে বন্ধ করা যায় না।

সুনীল।। সব ব্যবস্থাই দেখছি পাকা!

ইরা।। ওঃ, এতক্ষণ আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটার পর একটা কি ঝামেলা চলছে বলত!

সুনীল।। বেড়াতে বেরুনোর সুখটা এবার বোঝ! বেশ ছিলাম বাড়িতে। চন্দ্রনাথের চিঠিটা পেয়ে তুমি এমন লাফাতে শুরু করলে!

ইরা।। দ্যাখ, দোষটা একা আমার উপর চাপিও না। তোমার নিজের ইচ্ছে ছিল না? তখন তো কবিত্বে একেবারে উথলে উঠেছিলে—পাহাড়, সবুজ বনের ঢেউ, রুপোলি নদী! আর এখন? হুররা, গুগলু, পাখি-ধরা গোয়েন্দা, কপালে আরও কি আছে কে জানে?

সুনীল।। যাকগে বাপু, ওসব আর ভাবতে পারছি না! (*হাই তোলে*) আমার জেনুইনলি ঘুম পাচ্ছে।

ইরা।। কেন, একটু আগে যে তাস বের করলে! (*ভীত গলায়*) শুলেই তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমার কিছুতে ঘুম আসবেনা। আমি একা-একা জাগতে পারবনা বলে রাখছি।

সুনীল।। (*ড্রিম-চেয়ারটার অজান্তে বসে। আড়মোড়া ভাঙে*) তুমিও ঘুমোও।

ইরা।। চোখ বুজলে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখব বলে রাখছি।

সুনীল।। একেবারে আদর্শ স্ত্রীর গলা বেরিয়ে পড়ল দেখছি।

ইরা।। আমি একা একা জাগব বুঝি!

সুনীল।। আরে ঘুমোচ্ছিনা, চোখটা শুধু বুজিয়ে রাখছি।

ইরা।। ঐ করতে করতেই নাক ডাকতে শুরু করবে।

সুনীল।। (*জানালার দিকে তাকিয়ে*) আরে, ও ব্যাটা কে?

[*ইরা ভয় পেয়ে দৌড়ে ওর কাছে আসে।*]

ইরা।। (*ভীত*) কে?

সুনীল।। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দ্যাখ—ড্যাব্‌ড্যাব করে ব্যাটা চেয়ে আছে।

ইরা।। (*তাকিয়ে*) কোথায়?

সুনীল।। ঐ যে আকাশে। ব্যাটা কি রকম গোলগাল হয়েছে দেখছ—নিশ্চয়ই পূর্ণিমা। ঐ যে চাঁদটা, আকাশ-জোড়া চাঁদটা, চোখেও পড়ছে না!

ইরা। ওঃ, এমন ভয় দ্যাখাও না! তুমি ছাড়া চাঁদকে ব্যাটা বলতে কাউকে শুনিনি। এমন অসভ্যের মত এক একটা শব্দ ব্যবহার কর!

সুনীল।। না সত্যি চাঁদটা দ্যাখো। মেজাজী আছে কিন্তু!

ইরা।। এই, একটা কি কাণ্ড হয়েছে জান? তুমি এই যে এতো কাব্য আউড়ে যাচ্ছ, এর কারণটা জান? তুমি যে চেয়ারটায় বসেছ—ওটা ড্রিম-চেয়ার।

সুনীল।। তাতে হয়েছে কি?

ইরা।। তোমাকে স্বপ্নে পেয়েছে।

সুনীল।। তোমাদের মেয়েদের সব কিছুতে এমন অন্ধ বিশ্বাস না!

ইরা।। (*সকৌতুক*) আমাদের না হয় অন্ধ বিশ্বাস কিন্তু তোমার হঠাৎ কেন এতো কবিত্ব এল সেটা ভাব? একটু বাদে চৌধুরীবাবু ম্যাপটা চাইতে আসবেন সেটা অবধি ভাবছ না?

সুনীল।। ব্যাপার কি জান, এখানে যতোক্ষণ আছি সমস্যার হাত থেকে কখনো নিস্তার মিলবেনা, তাই যেটুকু পাচ্ছি সেটুকু ছাড়ব কেন? চন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে —পৃথিবীতে যুদ্ধ করার জায়গা মেলে কিন্তু দুটো মানুষ কোথায়ও বসে দুটো মনের কথা বলার জায়গা খুঁজে পায় না।

ইরা।। এ জায়গাটা কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে খুব বেশি নিরাপদ নয়।

[*ইরা ডিবেট-চেয়ারটায় বসে পড়ে*]

সুনীল।। তুমি কিন্তু ডিবেট-চেয়ারটায় বসেছ

ইরা।। ওমা! তাই না কি?

[*ইরা দ্রুত উঠে পড়ে*]

সুনীল।। ভয় পেয়ে উঠলে মনে হচ্ছে! ক্যাপেটেন হুররার মন্ত্র দেখছি তোমাকে বেশ ঘায়েল করেছে। বোসই না চেয়ারটায়, দেখা যাক কি হয়।

ইরা।। নিজে তো বেশ ড্রিম-চেয়ারটায় বসে আছ! স্বার্থপর।

সুনীল।। ঠিক আছে, তুমি এটায় বস। আমি উঠছি।

ইরা।। তোমাকে উঠতে হবে না, আমি এটাতেই বসছি।

[*ইরা ডিবেট-সিটেই বসে।*]

সুনীল ॥ বুঝলে, অন্তত একটু বসতে পেরেও যা আরাম পাচ্ছি, স্বপ্নের থেকেও তা কম কি।

ইরা ॥ স্বপ্ন যদি আমাদের ইচ্ছেমত বাঁচত, তাহলে কি ভাল হত বল? স্বপ্নটা জন্মেই যেন ভুগতে শুরু করে, একদিন আর থাকে না। আমরা ওর একটা ছবি তুলি, আদর করে দেওয়ালে টাঙাই। কখন ওর গায়ে ধুলো জমে, কাঁচ ফেটে যায়, ছবিটা অস্পষ্ট হয়। আমাদের চোখের নজরও কমে আসে। একসময় নামিয়ে এনে দেখতে হয়—তাও কি দেখা যায়? অথচ ইচ্ছে করে, স্বপ্নটাকে আদর করে চিরটাকাল কোলে তুলে রাখি, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিই—শত্রু এলে তাড়িয়ে দেই—কার সাধ্য ওর গায়ে হাত দেয়। (*সুনীলকে চোখ বুজে থাকতে দেখে*) ও কি, ঘুমুলে নাকি?

সুনীল ॥ (*তন্দ্রা ভেঙে*) ঘুমোইনি, ক্লান্তিতে বোধহয় দু'মিনিট ফেন্ট হয়েছিলাম। (*চোখ রগড়ে মাথাটা ঝেঁকে*) একটা কাজ করবে? রাত্তিরটা যখন জাগতেই হবে—একটা খেলা শুরু করা যাক।

ইরা ॥ খেলা!

সুনীল ॥ খেলা মানে—তুমি তো ডিবেটচেয়ারে বসেছ একটা ডিবেট স্টার্ট করে দাও। অনেকটা সময় কেটে যাবে।

ইরা ॥ কি নিয়ে হবে? ডিবেট-টিবেট আমি পারি না।

সুনীল ॥ ঠিক পারবে। ধর, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব—তুমি উত্তর দেবে। আমি আবার চার্জ করব, তুমি পাল্টা চার্জ করবে—ডিবেট জমে উঠবে।

ইরা ॥ আচ্ছা প্রশ্নটা করতো—সোজা প্রশ্ন করবে।

সুনীল ॥ খুব সোজা। আচ্ছা চৌধুরীবাবু যে বলল, চন্দ্রনাথ একটা ম্যাপ পাঠিয়েছিল, সেটা কি সত্যি?

ইরা ॥ তুমি কি প্রশ্ন করলে না' নিজেই জিজ্ঞেস করছ?

সুনীল ॥ চন্দ্রনাথ কি তোমাকে কোনও ম্যাপ পাঠিয়েছিল?

ইরা ॥ পাঠালে তুমি জানতে না, আমি তোমাকে লুকোতে যাব কেন?

সুনীল ॥ লুকোবার কথা এখানে আসছে কেন? তুমি ভুলে যেতে পার।

ইরা ॥ আমি এরকম ভুলি না।

সুনীল ॥ হয়তো চন্দ্রনাথ ব্যাপারটা গোপন রাখার অনুরোধও তোমাকে করতে পারে।

ইরা ॥ আর অমনি আমি তোমার কাছে গোপন করলুম!

সুনীল ॥ তোমার অনেককালের বন্ধু—বন্ধুর কথা রাখাটা পাপ নয়।

ইরা ॥ মাঝেমধ্যে তোমার মনটা এরকম হয় কেন বলতো?—মনে মনে তুমি যেন প্রায়ই ভাব, চন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব কথা আমি তোমাকে বলিনা। ছিঃ!

সুনীল ॥ ম্যাপটা যদি চন্দ্রনাথ পাঠালই, তবে সেটা কোথায় গেল?

ইরা ॥ ম্যাপটাতো তোমাকেও পাঠাতে পারে? চৌধুরীবাবুর কাছে অতোসব বললে তুমিওতো আমাকে চেপে যেতে পার?

সুনীল ॥ তক্ষুণি তক্ষুণি যা মনে এসেছে বলে গেছি। ওর সঙ্গে ম্যাপটার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইরা ॥ আমি যদি বিশ্বাস না করি।

সুনীল।। *(উত্তেজিতভাবে)* তার মানে, চৌধুরীবাবুর মত তুমিও ভাবছ, ওটা আমি লুকিয়ে রেখেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করনা?

ইরা।। ও-সব রাজনীতির কথা, আমাকে বলার দরকার নেই ভেবেও না বলতে পার।

সুনীল।। আমি রাজনীতি করিনা—তোমাকে অন্তত জানাতাম।

ইরা।। তাহলে চন্দ্রনাথ ডায়েরিতে ও-কথা লিখল কেন?

সুনীল।। তা চন্দ্রনাথ ছাড়া সে কথা কে বলবে? ডায়েরিতে ওর ঐ লেখাটার জন্য আমাদের কতটা ভুগতে হতে পারে জান?

ইরা।। তার জন্য নিশ্চয়ই আমি দায়ী নই।

সুনীল।। চন্দ্রনাথ তোমার বন্ধু, খানিকটা সমালোচনা তোমাকে শুনতে হবে বৈকি।

ইরা।। এতদিন তো চন্দ্রনাথকে তোমার বন্ধু বলেও জানতাম। অবশ্য বন্ধুত্বটা যে মৌখিক তার বড় প্রমাণ এখানে এসেই পেয়েছি।

সুনীল।। কি প্রমাণ পেয়েছ?

ইরা।। ছেলেটা জেলে গেল কই এ-জন্য কোনরকম সহানুভূতি, দুঃখ একবারের জন্যও তো তোমার মুখে শুনলাম না!

সুনীল।। যেন তোমার মুখে দুঃখ-সহানুভূতির ঢেউ বয়ে গেছে।

ইরা।। আমি ইচ্ছে করেই চেপে গেছি। কারণ তোমার ওসব কথা ভাল লাগত না।

সুনীল।। তোমার মন অত্যন্ত ছোট বলেই, আমাকে এতো ছোট ভাবতে পারছ।

ইরা।। এরকম ভাবতে পারার অনেক প্রমাণই আমার হাতে আছে, তা তোমার অজানা নয়। সেগুলো মনে করিয়ে দিলে তোমার খুব তৃপ্তি হবে না। তুমি যে চন্দ্রনাথ চিঠি লিখতেই আমাকে নিয়ে এসে একটা উদারতার প্রমাণ রাখতে চেয়েছ—সেটুকু আমি বুঝি।

সুনীল।। দরকারের থেকে বড় বেশি বোঝ বলেই—বেশির ভাগ সময় তুমি ভুল বোঝ।

ইরা।। ঠিক আছে, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনা।

সুনীল।। তর্ক কোরোনা।

[*ইরা ডিবেট-চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়ায়*]

ইরা।। সব সময় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা তর্ক তুলবে—এতে কারুরই ভাল লাগেনা।

সুনীল।। তর্কটা করি না, এসে যায়।

ইরা।। আমরা এড়িয়ে যেতে পারি।

সুনীল।। এড়িয়ে যাওয়া মানে মুক্তি পাওয়া নয়।

ইরা।। অন্তত একধরণের শান্তিতো পাওয়া যায়।

সুনীল।। তুমি বড় অল্পে রফা করতে চাও।

ইরা।। আমার অল্পই ভাল।

সুনীল।। ঠিক আছে এবার থামতো—অনেক কথা বলেছ, যথেষ্ট বলেছ।

ইরা।। থামতে তো তুমি পার।

সুনীল।। ডিবেট-চেয়ার থেকে তুমি উঠে পড়েছ, সুতরাং তোমারই প্রথম তর্ক থামিয়ে দেবার কথা।

ইরা।। *(ইরার যেন মনে পড়ে যায়)* ওহো—ডিবেট-চেয়ারটা ছাড়াই বকে যাচ্ছি। চেয়ারটার কী প্রভাব দ্যাখ।

সুনীল।। লড়াইটা কিন্তু ভাল চালিয়ে গ্যাছো।

ইরা।। প্রত্যেক বাড়িতে যদি একটা এরকম চেয়ার থাকে, তাহলে সবকটা সংসার গোল্লায় যাবে।

সুনীল।। কেন?

ইরা।। দেখছনা কেমন সত্য কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চায়।

সুনীল।। তাহলে তুমি সত্যি কথাই বলতে চেয়েছিলে?

ইরা।। থামতো, অত কথা ভাল লাগেনা। আসল কথা, আমরা অনেকের থেকে সুখে আছি, থাকতে চাই, ব্যস। চন্দ্রনাথটা বোকা বলেই অ্যারেস্টেড হয়। অথচ একটা সুখের জীবন চাইলে ও পেতো। মাথায় দেশের ভাবনাটি ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গে যে নিজের ভাবনাটি খোয়াল—তা ওকে কে বোঝাবে?

সুনীল।। কিছু বোঝাতে হবেনা, আসলে ও নিজে যা ভাল বোঝে তাই করবে। মতামত দেবার তুমিই বা কে, আমিই বা কে? হ্যাঁ, শোন—আমাদের সঙ্গে কিছু খাবার তো আছে, অন্তত কিছু খেয়ে নিতে পার।

ইরা।। ঐ মিষ্টিফিষ্টি আমার ভাল লাগেনা।

সুনীল।। এখন নোন্‌তা জোটাব কোত্থেকে?

ইরা।। কিচ্ছু জোটাতে হবে না, নিজে খেয়ে নাওনা বাপু।

সুনীল।। থাক্‌গে—এক যাত্রায় পৃথক ফল, কি দরকার! তাছাড়া একা-একা—

ইরা।। ক্ষিধের সময় অতো প্রেম দেখাতে হবেনা। দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি তোমাকে। (*বেতের ঝুড়িটা থেকে একটা প্লাস্টিক প্লেট বের করে*) এখানে যে কোথায় কল-বাথরুম? প্লেট-গ্লাসগুলো একটু ধুয়ে তো নিতে হবে।

সুনীল।। আরে বাপু, রাখতো তুমি। উনুন সঙ্গে থাকলে, বোধ হয় ঘুঁটেও খুঁজতে শুরু করতে।

ইরা।। পাশে তো একটা ঘর আছে, দেখিনা গিয়ে।

সুনীল।। যাও। মাথায় কিছু একটা ঢুকলেতো কিছু শুনবেনা। (*ইরা পাশের ঘরে ঢুকেই একটা ভয়ার্ত শব্দ করে যেন ঘরে ছিটকে ফিরে আসে*)

সুনীল।। (*শঙ্কিত*) কি হল?

ইরা।। পাশের ঘরটার যেন কি নাম ছিল?

সুনীল।। সুইসাইড-কেবিন। নামটা মনে পড়ে যেতেই বুঝি লাফিয়ে চলে এলে? বিরাট সাহসী!

ইরা।। তা নয়—(*চোখ ঢেকে*) মাগো!

সুনীল।। কি হয়েছে? দাঁড়াও দেখছি।

ইরা।। একটা লোক বোধহয় মরে পড়ে আছে

সুনীল।। মরে পড়ে আছে?

ইরা।। কোথায় যে এসে পড়লাম! টেবিলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, পাশে একটা বই।

সুনীল।। ঘুমুতেও তো পারে?

ইরা।। সুইসাইড-কেবিনে কেউ ঘুমোয়?

[*একজন যুবক ছেলে ঐ-ঘর ত্থেকে একটা বই পড়তে পড়তে এ-ঘরে ঢোকে। পড়তে পড়তে হাঁটে। কারুর দিকে তাকায় না। মধ্যে মধ্যে বই থেকে চোখ তুলে চোখটা বুজে বিড়বিড় করে, যেন মুখস্ত আছে কিনা দেখে নেয়।*]

ইরা॥ (*আঙুল দিয়ে দেখিয়ে*) ঐ লোকটা। তাহলে বোধহয় সত্যি সত্যিই ঘুমোচ্ছিল।

সুনীল॥ ও-ঘরে ঢুকে বসেছিলেন কেন?

যুবক॥ বসেছিলাম না, শুয়েছিলাম। আপনাদের কথাবার্তা শুনছিলাম।

ইরা॥ অপরের কথা লুকিয়ে কেন শুনবেন?

যুবক॥ উপদেশ দেবেন নাতো—কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত বোঝার বয়স আমার হয়েছে। আজকের কাগজ দেখেছেন?

সুনীল॥ কেন?

যুবক॥ আমার কোন ছবি বেরিয়েছে কিনা দেখলেন?

সুনীল॥ খেয়াল করিনি।

যুবক॥ এই খেয়ালের অভাবেই মারা পড়বেন। আচ্ছা আর একবার ট্রাই করি গিয়ে। (*সুইসাইড-কেবিনের দিকে যায়*) আপনারা কথা বলুন, ওভারহিয়ার করতে আমার বেশ লাগে। খবরের কাগজে আমার মত ছবি দেখিয়ে যদি কেউ খুঁজতে আসে, বলবেন এখানে ওরকম দেখতে কেউ নেই।

[*ও-ঘরে অদৃশ্য হল।*]

সুনীল॥ কি রকম বুঝলে?

ইরা॥ সকাল অবধি আমি বাঁচব না।

সুনীল॥ সম্ভবত এটি আর একটি বোর্ডার। এখানকার সব বোর্ডার যদি একযোগে আসে তাহলে বোধহয় আমরাও এখানে চিরকালের মত বোর্ডার হয়ে থেকে যাব—বাড়ি-ঘর-আত্মীয়-স্বজনের নামধাম সব ভুলে যাব। (*বাইরে কলিংবেল বাজে*)

সুনীল॥ এ-আবার কে? (*আবার বেল বাজে*)

সুনীল॥ দেখি, এবার কে এলেন?

[*দরজা খুলতে হুর্‌রা এবং গুগলু ঢুকল*]

হুররা॥ সময়টা নিশ্চয়ই ভাল কেটেছে?

ইরা॥ চমৎকার!

হুররা॥ চেয়ারগুলো ডিসটার্ব করেনি?

সুনীল॥ মানে?

হুররা॥ বসে বসে তো ঘুমনো যায় না? একটু অশান্তি তো হবেই।

ইরা॥ চেয়ারগুলো সরিয়ে ফেলা যায় না?

হুররা॥ (*আদেশ*) মিঃ গুগলু। চেয়ারগুলো সরিয়ে ফেল (*গুগলু শুরু করে*) হ্যাঁ, কেবল জাজমেণ্ট সিটটা থাক। ওটার নিশ্চয়ই কোনও ব্যবহার হয়নি?

সুনীল॥ ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন দেখছি না। ওটাও সরিয়ে নিন।

হুররা॥ না, ওটা থাকবে। আমার দরকার। —একটু কাজে এসেছি।

ইরা।। আবার কাজ!

সুনীল।। আপনার কাজের কথাটা জানিয়ে তাহলে বিদেয় হন।

হুর্‌রা।। কাজটা আমার ঐ চেয়ারে বসেই ঘটবে। (*হাসি মুখে*) আমি বসছি।

গুগলু।। হিপ হিপ্‌ হুর্‌রা, হিপ হিপ্‌ হুর্‌রা। (*হুর্‌রা বসে*) আপনারা প্রস্তুত থাকুন। ক্যাপটেন হুররা জাজ্‌মেন্ট্‌-সিটে বসেছেন। হিপ্‌ হিপ্‌ হুররা।

হুররা।। মিঃ গুগলু, এখন আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? (*দুটো চোখে ভঙ্গি আনে*) কেমন দেখাচ্ছে?

গুগলু।। চোখদুটো স্যর?

হুর্‌রা।। 'চোখ দুটো' স্যর! আমার কি নাকমুখ-হাত-পা নেই?—সব মিলিয়ে কেমন দেখাচ্ছে?

গুগলু।। বিচারকের মত স্যর।

হুররা।। বিচারক কেমন দেখতে?

গুগলু।। ঠিক আপনার মত স্যর।

হুর্‌রা।। থ্যাঙ্কস! কি নিয়ে বিচার করব?

গুগলু।। আসামীদের নিয়ে স্যর!

হুর্‌রা।। আসামী ক'জন?

গুগলু।। দুজন, স্যর। একজন স্ত্রীলোক, আর একজন পুরুষ।

হুর্‌রা।। আসামী হাজির?

গুগলু।। (*চেঁচিয়ে*) আসামী হাজির! (*ওদের দুজনকে*) বলুন, হাজির।

ইরা।। বয়ে গেছে।

হুররা।। আসামী কি বলে?

গুগলু।। মেয়ে আসামী বলে, বয়ে গেছে স্যর।

হুর্‌রা।। ছেলে আসামী কি বলে?

গুগলু।। ছেলে আসামী কিছু বলে না, স্যর। (*সুনীলকে*) কিছু বলবেন? (*সুনীল চুপ*)

হুর্‌রা।। মিঃ গুগলু ওদের বাক্সটা টেবিলে রেখে দাও।

সুনীল।। না। আমাদের জিনিশ-পত্রে হাত দেবেন না।

হুররা।। মিঃ গুগলু! তাহলে ওটা খুলতে বল।

গুগলু।। খুলুন।

ইরা।। না।

হুর্‌রা।। (*অদ্ভুত হাসতে হাসতে*) প্রতিটি কথায় চমকে উঠছে, অ্যাঁ? গুগলু—এক একটা চার্জ কি রকম, দেখলে?

গুগলু।। এখনও তো চার্জ শুরু হয়নি, স্যর।

হুর্‌রা।। তাতো বটেই। (*গম্ভীর*) নাউ, চার্জ! (*সুনীলকে*) 'জীবন' কথাটার শেষ অক্ষর কেটে নিলে কি থাকে? (*সুনীল চুপ*) বলুন কি থাকে?

গুগলু।। 'জীব'।

হুর্‌রা।। থ্যাঙ্কিউ 'জীব'। (*ইরাকে*) জীবন কথাটা থেকে প্রথম অক্ষর কেটে দিলে কি থাকে?

ইরা।। জানিনা।

হুররা।। বলুন!

ইরা।। বন।

হুররা।। তাহলে জীবন কথাটার দু'ধার কেটে নিলে থাকে 'বন' আর 'জীব'। (*গুগলুকে*) দু'য়ে মিলিয়ে কি হয়?

গুগলু।। (*ক্লাসে উত্তর দেয়ার মত ভঙ্গিতে*) বন-জীব, কর্মধারয় সমাস মানে জীবনকে কাটছাঁট করলেই বনজীব। এবং স্যর—জীবনটাকে তাই গোটা করে নিতে হবে। মানে ব্যাকরণ তাই বলে।

হুররা।। বলতেই হবে। ওকে।

গুগলু।। হ্যাঁ, স্যর (*সুনীলকে দেখিয়ে*) ওকে জিজ্ঞেস করুন এবার! (*মুখে আনন্দ এনে হাত ঘষতে থাকে*) ওকে জিজ্ঞেস করুন!

হুররা।। (*সুনীলকে*) জীবনটার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন?

সুনীল।। কোনদিক দিয়ে ঢুকব?

হুররা।। তাইতো, কোন দিকে দিয়ে? (*ইরাকে*) বলুন, কটা দিক আছে? (*ইরা বিরক্ত। চুপ*)

গুগলু।। (*হাত ঘষতে ঘষতে*) আমি বলব স্যর?

হুররা।। বল।

গুগলু।। দুটো দিক আছে স্যর—সামনের দিক আর পিছনের দিক—মানে এগুনো আর পিছনো। এই দুটো দিক স্যর। মানুষ এই দুদিকে চলে।

হুররা।। আর কোনদিকে যে যায় না?

গুগলু।। নঞতৎপুরুষ সমাস, স্যর। (*ওদের দেখিয়ে*) মানে এরা। সামনেও এগুবেনা, পিছবেও না।

হুররা।। কোথায় থাকবে?

গুগলু।। দাঁড়িয়ে একটা জায়গায় ঘুরবে।

হুররা।। মাঝে মাঝে?

গুগলু।। চাঁদ দেখবে, স্বপ্ন দেখবে।

হুররা।। হঠাৎ হঠাৎ?

গুগলু।। তর্ক করবে।

হুররা।। তারপর?

গুগলু।। আবার দাঁড়িয়ে একটা জায়গায় ঘুরবে।

হুররা।। নেট রেজাল্ট?

গুগলু।। বুড়ো হওয়া।

হুররা।। শেষ কথা?

গুগলু।। মরে যাওয়া।

হুররা।। কি দাঁড়াল?

গুগলু।। পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর নিয়ম-রক্ষা।

হুররা।। শাস্তি?

গুগলু॥ শক ট্রিটমেন্ট।

হুররা॥ ইলেকট্রিক চেয়ারখানা আন। ওদের এক এক করে বসতে বল। (*গুগলু চেয়ারটা কাছে আনে। ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলে। বসেনা।*)

গুগলু॥ বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। মোটে সময় নেই আমাদের হাতে। (*ধমক*) বসুন!

ইরা॥ বসবনা। কি পেয়েছেন আপনারা?

হুররা॥ পাব কি আবার? মেজাজে আছেন—বিচারকের মুখোমুখি পড়তে হবে ভাবেননি তো কোনওদিন। সবাইকে একদিন বিচারকের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। সে সময়টা একটু খারাপতো লাগবেই। তাই বলে বিচারকতো ছেড়ে কথা কইবেন না। বসুন।

সুনীল॥ বলেছিতো, বসব না।

হুররা॥ বড্ড একগুঁয়ে তো! বেশ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিচারটা আপাতত চলুক। নাউ, চার্জ! আপনাদের বাক্সে একটা মানচিত্র আছে?

ইরা॥ না।

সুনীল॥ (*মুখে কষ্ট এনে*) এই মানচিত্রের প্রসঙ্গটা দয়া করে আমাদের ভুলতে দেবেন!

হুররা॥ মিঃ গুগলু লোকটির কষ্ট হচ্ছে। তার মানে কিছু ব্যাপার আছে। বলুন ম্যাপে কি আছে?

ইরা॥ বিশ্বাস করুন, আমাদের কাছে কোনও ম্যাপ নেই।

হুররা॥ (*সুনীলকে*) বলুন, ম্যাপে কি আছে?

সুনীল॥ একটা দেশের মানচিত্র, একটা নতুন পথের নির্দেশ।

হুররা॥ কেমন দেশ, কেমন পথ?

সুনীল॥ নতুন দেশ, নতুন পথ।

হুররা॥ হাত বাড়ালে বাতাস, মাটি খুঁড়লে সোনা?—তাই না?

সুনীল॥ হয়তো তাই।

হুররা॥ (*আনন্দিত*) গুগলু, বলিনি—জেরা কবলে সব বেরবে। দেখলে, পেয়ে গেছি। ওটা আমাদের চাই, তাই না?

গুগলু॥ নিশ্চয় চাই স্যর।

হুররা॥ কি রকম বের করে আনলুম?

গুগলু॥ দারুণ। হিপ হিপ হুররা! হিপ হিপ হুররা! কিন্তু স্যর ম্যাপটাতো এখনো আমরা হাতে পাই নি।

হুররা॥ এদের তো হাতে পেয়েছি। ধীরে ধীরে ওটিও পাব। ম্যাপটি বের করুন।

সুনীল॥ বলছি তো, আমাদের কাছে নেই।

হুররা॥ কোথায় গেল?

ইরা॥ কোনওকালেই আমাদের কাছে ছিল না।

হুররা॥ তাহলে ম্যাপের কথা বলছেন কি করে?

সুনীল॥ আমাদের এক বন্ধু চিঠিতে এরকম একটা কথা লিখেছিল।

হুররা॥ কোনো ম্যাপ পাঠায় নি?

ইরা॥ না।

হুররা॥ যদি আমি আপনাদের কাছ থেকে বের করতে পারি?

সুনীল।। পারবেন না। আমাদের সব কিছু সার্চ করে দেখতে পারেন।

হুর্‌রা।। আমার সার্চ ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। ব্যাগ বাক্স ছোঁব না, আপনাদের গায়েও কেউ হাত দেবে না—অথচ সার্চ হবে। জাহাজের তীব্র আলোর মত একটা ঝাঁঝালো লাইট রক্তের ভিতর ঢুকে পড়বে। তারপর সে কি ভয়ংকর খোজাখুঁজি শুরু করবে।

গুগলু।। এক্ষুণি শুরু করলে ওদের কষ্ট হবে ক্যাপ্টেন। আর একটু রেস্ট চাই না?

হুর্‌রা।। কিন্তু সময় যে কম। যদি জাহাজের বিপদ-সংকেতের ঘণ্টাটা বেজে ওঠে তাহলে যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ব। (*সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপদ-সংকেতের তীব্র ঘণ্টা বেজে ওঠে*)

হুররা।। মিঃ গুগলু! বিপদ-সংকেত! যে-যার কামরায় শান্ত হয়ে বসুন—ছুটোছুটি করবেন না। (*আলো নিভে যায়*) একি আলো নিভে গেল যে! গুগলু . . . গুগলু...জাহাজটা পথ দেখতে পাচ্ছে না। জাহাজটার সামনে আলো ধর—জাহাজটা অন্ধের মত জলে আছাড় খাবে, গুগলু আলো, আলো ধর।

[*অন্ধকারে পর্দা নেমে আসে*]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[*পর্দা উঠলে মঞ্চ অন্ধকাব। চৌধুরী একটি আলো নিয়ে প্রবেশ করে। পাশাপাশি দুটি চেয়ারে ইরা এবং সুনীলকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়—*]

চৌধুরী।। অন্ধকারে দুটিতে যে গুটিসুটি বসে। অন্ধকারের গোপন কাজটি শেষ না হলে কি আলো জ্বলবে? আসলে এটি একটি ঘুঘুর বাসা। আলো নেভানোর মানেটা কি আর বুঝিনা?

সুনীল।। আলো কি ওরা ইচ্ছে করে নিভিয়ে দিয়েছে?

চৌধুরী।। (*টেবিলে আলোটা রেখে, কাছে এসে*) বাক্সটা সাবধানে রেখেছেন তো?

ইরা।। কেন?

চৌধুরী।। ঐ ম্যাপটার কথা কারুর আর জানতে বাকি নেই। সকলের লোভ ওটার উপর। হোটেলের আলো নিভতেই এখানে একটি লোক ঢুকেছে। তার উদ্দেশ্যটা এখনো জানিনা তবে আমার নজরটা সজাগ রেখেছি। যতক্ষণ আছি ভয় নেই। তবে খুব সাবধানে থাকবেন।

সুনীল।। সত্যি, আমাদের বাক্সে ওসব কিছু নেই।

চৌধুরী।। তা বাক্স থেকে সরিয়ে রেখে ভালই করেছেন।

ইরা।। কোথাও কিছু সরাইনি আমরা! অহেতুক আমাদেরও বিব্রত করছেন, আপনাদেরও মিথ্যে ছোটাছুটি হচ্ছে।

চৌধুরী।। এক্ষুণি পেয়ে গেলে ভাল হত, না হলে সেই ছায়ার মত পিছুপিছু ঘুরতে হবে। সেটা কি আপনাদের পক্ষে কম জ্বালাতন! সকল সময় কেউ না কেউ চৌকি দিচ্ছে, সুযোগ পেলেই ঘরের এটা ঘাটবে, ওটা ঘাঁটবে—কী বিদঘুটে ব্যাপার ভাবুন? তার চেয়ে সহজ রাস্তায় চলে আসুন। আমাদের দু-পক্ষেরই শান্তি।

সুনীল।। আচ্ছা জ্বালাতন, যা আমাদের কাছে নেই, কোনকালে চোখেও দেখিনি—সে বস্তুটি আমি কি করে আপনার হাতে তুলে দেব বলুন তো?

চৌধুরী।। এখান থেকে যখন বাড়ি ফিরে যাবেন, সেখানেও একটি ছায়া আপনাদের ছাড়বে না। ওটি আমাদের চাই। চারদিকটা ভেঙেচুরে নতুন একটা দেশের মানচিত্র! কত বড় বিপজ্জনক জিনিশ ভাবুন। আমি হাল ছেড়ে দিলেই তো হল না—উপর-মহল ছাড়বে কেন? কাঁটা-তার দিয়ে ঘিরে ঘিরে এগুচ্ছে। কি দরকার খোঁচা খুঁচি খেয়ে—বেশতো আছেন, দুটি বক-বকুম্ পায়রা—ঝড়-ঝাপ্টায় অমন মিহি ডানা কেউ মেলতে চায়? তার থেকে রঙিন-রঙিন পালক গুঁজে নিন ডানায়, হাল্কা হাওয়ায় ঝিলিক দিয়ে উড়ুন। (*হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল মঞ্চে*)

ইরা।। আলো এসে গেছে। বাপরে—কতোক্ষণ অন্ধকারে ছিলুম। তার উপর এখানকার অন্ধকার।

চৌধুরী।। তাহলে ঐ কথাই রইল, আশা করছি জিনিশটি পাব, এখন উঠি। যাবার আগে একটি খবর দিচ্ছি। আলোটা কিন্তু আমিই নিভিয়েছিলাম।

সুনীল।। আপনি? কেন?

চৌধুরী।। (*রহস্যময় হেসে*) কারণ ছিল। জাহাজটা এখানে থেমে আছে—নোঙরের দড়িটা অন্ধকারে কেটে দিয়েছি।

ইরা।। কিন্তু এটাতো হোটেল।

চৌধুরী।। যদি জাহাজ হয়? এবার তার নোঙরটি ছিঁড়ে অন্যপথে চলছে। ক্যাপটেন যে-পথে চালাচ্ছে সেটি যে আমাদের পছন্দের পথ নয়। এবারে আমাদের পথে চলবে। আর হ্যাঁ, কম্পাসটিও গায়েব। ক্যাপটেন হুর্‌রা সারা জাহাজে কেবল খুঁজছে। দিক-ভুলো জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?

সুনীল।। আপনার এ-সব কাণ্ডকারখানা আমি ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেব।

চৌধুরী।। জানাতে দেব কেন? জানানোর পথ থাকলে কি আর আমি আপনাদের জানাতুম।

ইরা।। কেন কিসের ভয় আমাদের?

চৌধুরী।। সেই কাঁটা-তারের বেড়া। আমাদের ইচ্ছের বাইরে একটি পা বাড়ালেই কাঁটাটি বিঁধে যাবে। আচ্ছা!, এখনকার মত আসছি—দেখা হবে।

[*চলে যায়। আলোটা নিয়ে যায়*]

সুনীল।। বুঝলে, এটাকে হোটেলই বল বা জাহাজই ভাব—এটা ঠিক যে, এই লোকটি একটা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরা।। যেমন আমাদের জ্বালাচ্ছে তেমনি ক্যাপ্টেন হুররার উপরও ওর রাগ কম নয়।

সুনীল।। আমাদের কাছে না হয় একটা ম্যাপ খুঁজছে, কিন্তু হুর্‌রা? ওর কাছে কি চায়?

ইরা।। শুনলে না, জাহাজটা ওদের পথে চলছেনা, এটাই রাগ।

সুনীল।। কিন্তু সত্যি করেইতো আর এটা জাহাজ নয়। তবে আমরা জানিনা ইরা, হয়তো এই হোটেলটার একটা গতি আছে, একটা অদৃশ্য চাকায় পৃথিবীব গোপন জল কেটে কেটে এগুতে চাইছে। আর যারা যাত্রী, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলছে। ভেবে দ্যাখ,

আমরা দুজন প্রথম যখন এখানে এলাম তারপর থেকে এটুকু সময়ের মধ্যে আমরাও যেন অনেকটা ভেসে ভেসে এগিয়ে এসেছি। আমাদের মনটা কি সত্যি সত্যিই কিছুটা নড়েনি? আমরা যেন এই জাহাজটার ডেকে দাঁড়িয়ে একটা রহস্যময় রাত্রিতে একটার পর একটা নতুন দৃশ্য দেখছি। জলের ঢেউগুলো আমাদের ভিতরে ঢুকে আমাদের দোলাচ্ছে, নাড়াচ্ছে। আমাদের পুরনো ঘাটটা সরে সরে যাচ্ছে। আমরা যেন কোথায় যাচ্ছি! (*যেন আপন মনে*) ছোটবেলায় জাহাজে চাপার স্বপ্ন দেখতুম। নীল রঙের ছড়ানো জলের উপর চুপচাপ একটা জাহাজ। পৃথিবীর কোনও শব্দ সেখানে পৌঁছয়না, পথের এক বিন্দু ধুলো নেই সেখানে, একটা অদ্ভুত ভাসমান দ্বীপ। কিন্তু আমাদের জাহাজটা? এটা যেন জল ভেঙে যাচ্ছে না, মাটির উপর চাকা বসিয়ে ভয়ংকর শব্দ তুলে চলছে। এটা কেমন জাহাজ?

সুনীল।। এ-সব জাহাজ হয়তো মাটিতেও ডুবে যায়। পৃথিবীর মাটি জলের থেকে কম নিরাপদ নয়।

ইরা।। এ-সব কথা আমরা আগে বলতাম না।

সুনীল।। এ-সব জাহজে আগে চাপিনি।

ইরা।। কেন এলাম?

সুনীল।। পুবনো বাড়িটায় যে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

ইরা।। অন্তত নিশ্চিন্তে ছিলাম।

সুনীল।। চলে আসার হয়ত ওটাই কারণ। নিশ্চিন্ত জীবনটার কোথাও বোধহয় একটা ফাঁকি ছিল—ওর ফাঁকটা থেকে একটা হাত বাড়িয়ে কে যেন এক ধাক্কায় এখানে এনে ফেলল। এবার এই জাহাজের জীবন।

ইরা ।। কতোক্ষণ?

সুনীল।। তুমিও জাননা, আমিও না। জাহাজটাই আমাদের পথ। যদি এটা সত্যিই ভুল পথে যাচ্ছে--আমাদেব. উচিত ক্যাপটেনকে জানানো।

ইরা।। কিন্তু জানালে যে বিপদ আছে।

সুনীল।। না জানালেও কম বিপদ নয়।

[*বই হাতে সেই যুবক ছেলেটি ঢোকে। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উদাস শোনাবে। মুখের ভাব নির্বিকাব, চলা-ফেরা, বসা, খুব ধীর আর শান্ত।*]

যুবক।। আজকের কাগজটা আছে?

ইরা।। কাগজ? (*সুনীলকে*) কাগজটা এনেছিলে?

সুনীল।। সেই যে স্টেশনে ভদ্রলোককে পড়তে দিলাম, চেয়ে নিতে ভুলে গেছি।

যুবক।। আমার কোন ছবি বেরিয়েছে দেখলেন?

ইরা।। খেয়াল করি নি।

যুবক।। আমার নাম করে কেউ খুঁজতে এসেছিল?

সুনীল।। আপনার নামই জানি না। তাছাড়া আমাদের কাছে কেউ আসে নি।

যুবক।। আপনারা দেখতে পাবেন।

সুনীল॥ (*বিরক্ত*) কী দেখতে পাব?

যুবক॥ আপনাদের চোখের সামনে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

ইরা॥ কে?

যুবক॥ একটি বিষণ্ণ গোধূলি।

সুনীল॥ কে ধরে নিয়ে যাবে?

যুবক॥ একটি বিষণ্ণ গোধূলি—ঐ দেশে আমি মানুষ। যেখানে বৃষ্টি হলে সব ভেজে কেবল শুকনো বুকটা ভেজে না, রোদ্দুর উঠলে সব আলো হয় কেবল বুকের ভিতরটা অন্ধকার—আমি ওই দেশের মানুষ। আমাকে ওরা খুঁজতে আসবে। কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে খুঁজছে।

সুনীল॥ কবিতা-টবিতা লেখেন বোধ হয়?

যুবক॥ কবিতা? সে আবার কি জিনিস?

ইরা॥ কবিতা না লিখলে পড়েছেন তো?

যুবক॥ অনেকদিন বেরোই না, অনেক নতুন জিনিস আমদানি হয়েছে দেখছি। আজকাল আর সব কি বেরিয়েছে বলুন তো?

সুনীল॥ দয়া করে যে ঘরটিতে ছিলেন, ওখানে বসে বসে পড়ুন।

যুবক॥ কি পড়ব?

সুনীল॥ বই। যেটা পড়ছিলেন।

| *ইরা ওর হাত থেকে বইটা কেড়ে নেয়।*
একটা বই-এর মলাট ভিতরে
একটি পাতাও নেই। |

ইরা॥ একি, এটা যে একটা মলাট। (*যুবকটিকে*) এর ভিতরে কিছু নেই যে?

সুনীল॥ অথচ মেলে ধরে দিনরাত পড়ছেন, বিড়বিড় করছেন?

যুবক॥ ভিতরে কিছু ছিল? কি ছিল বলুন তো?

সুনীল॥ সেরেছে। এ দেখছি একেবারে মূর্তিমান মলাট—

ইরা॥ এরকম মাথার অবস্থা, বাবা! নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে চলে এসেছে, আর কাগজে ছবি ছাপিয়ে ওঁরা খুঁজছেন। এতক্ষণে ওর কথার মানেটা বুঝলে?

সুনীল॥ তাই হবে। (*যুবকটিকে*) বাবা-মা, ওরা আছেন তো?

যুবক॥ হ্যাঁ।

সুনীল॥ কোথায়?

যুবক॥ বাড়িতে।

ইরা॥ আপনি বাড়িতে যান না?

যুবক॥ যাই—ছুটিছাটায়।

ইরা॥ এখানে কাজ করেন?

যুবক॥ হ্যাঁ।

সুনীল॥ কি কাজ?

যুবক॥ ইমিটেশন—অনুকরণের কাজ করি।

ইরা॥ অনুকরণের কাজ কি রকম?

যুবক।। এও জানেন না? এই ধরুন, সবাই যে রকম অফিসে যায় ঠিক তেমনি করে অফিসে যাই, যেরকম করে কাঁদে, সেরকম ভাবে কাঁদি। সকলের হাসি দেখে হাসিটা প্র্যাকটিস করি, তাকানোটা দেখে নিয়ে তাকাই, দু-পা ফেলে যেমন হাঁটে, আমিও অমনি করে হাঁটি। আমি অনেক ভালবাসা দেখছি, একা একা প্র্যাকটিস করা যায়না তো—ওটা হয়নি। (*ইরাকে*) আপনি রাজি হলে দেখবেন কি চমৎকার ভালবাসা ইমিটেট করব। সব অনুকরণ করা শিখতে হয়—সব্বাই তাই করে। যারা খুব ভাল অনুকরণ করতে পারে, জীবনে তারা সাকসেসফুল হবেই।

ইরা।। এতো অনুকরণ করে আপনার ফলটাতো ভাল হল না?

যুবক।। সবাইতো পড়ে—কেউ কেউতো ফেলও করে। আমার ফল ভাল হয়না। বাড়িতে গেলে বাবা-মা আবার পড়াবে বলছে। আবার ফেল করব।

ইরা।। তাই পালিয়ে এসেছেন?

যুবক।। না, পালাইনি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, না জানি কোথায় লিখেছিলাম —"দয়া করে আমাকে কেউ গুম করে রাখুন।"

সুনীল।। গুম্ করে রাখতে অনুরোধ করলেন?

যুবক।। কেউ আসেনা। শেষ অবধি ক্যাপটেন হুররা এখানে গুম করে রাখল।

সুনীল।। ও! তাহলে এখন এখানে ভালই আছেন?

যুবক।।—না, ভাল কোথায়? এখান থেকে পালিয়ে যাব ভাবলাম। ঐ গুগলুটা এমন কড়া পাহারা দেয় তাই একটু আগে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে ঘরের জানালা গ'লে অন্ধকারে পালাতে পারি। জানালায়ও উঠেছি—ঠিক তক্ষুণি ওর নিচে ক্যাপটেন হুররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডালমুট চিবোতে লাগল! হলনা!

ইরা।। আলোটা আপনি নিভিয়েছিলেন?

যুবক।। কেন পারবনা? দেখে দেখে শিখেছি—ঠিক তারটা কেটে দিতে পারব। যাকগে, এ-সব বলে আর কি হবে। পালাতে যখন পারলুমনা তখন আর একটা অলটারনেটিভ আছে। আমি ও-ঘরে বসে সব ওভারহিয়ার করিতো—আমাকে আড়াল থেকে সব শুনতে হয়, নয়তো সব কথা জানব কি করে? আমি জানি, আপনাদের কাছে একটা ম্যাপ আছে. আমাকে দিন না?

সুনীল।। (*মাথায় হাত দিয়ে*) ঐ ম্যাপটি আপনারও চাই। সর্বনাশ!

যুবক।। কেন কি হবে দিলে?

ইরা।। একটি তো ম্যাপ, ক'জনকে দেব।

যুবক।। নতুন দেশ-টেশের কথা আছে শুনলাম। দুদিন ঘুরে আসা যেতে।

সুনীল।। হ্যাঁ, আপনার জন্য দেশখানা বানিয়ে রেখেছে, এবার আপনি গিয়ে উঠলেই হয়!

ইরা।। ওভাবে কথা বলছ কেন?

সুনীল।। এমন গা-জ্বালানে কথা শুনে মুখ বুজে থাকা যায়? তোমাদের মত গায়ে হাত বুলিয়ে কথা বলতে পারিনা।

যুবক।। ও-ঘরে গিয়ে ঘুমোন। অনেক রাত হয়েছে। দেশটা তৈরী হয়ে গেলে আপনাকে ডেকে দেব।

যুবক ।। মনে থাকবে আমার কথা?

সুনীল ।। যতোদিন বেঁচে থাকব, সারা জীবন মনে থাকবে।

যুবক ।। (*আব্দারের মত*) ম্যাপটা তাহলে দেবেন না?

ইরা ।। ম্যাপ-ট্যাপ আমাদের কাছে কিছু নেই।

যুবক ।। দেখতুম আর কি জিনিশটা।

সুনীল ।। আপনি যান তো। না-ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বায়ু চড়েছে। ঘুমোন ভাল করে। যান!

[*যুবকটি খুব শান্ত পায়ে চলে যায়।*]

সুনীল ।। কি এক ম্যাপের পাল্লাতেই না পড়েছি। এ-ঘরে যতক্ষণ থাকব, আরো কজন যে এসে উদয় হবে, কে জানে? এ-ঘরের বাইরে গিয়ে যদি একটু দাঁড়ানো যেত।

ইরা ।। ও-পাশেতো একটা বারান্দা আছে, চলনা।

সুনীল ।। চল, অন্তত একটু হাওয়াতো লাগবে।

ইরা ।। (*হেসে*) বল, সমুদ্র-বাতাস।

সুনীল ।। এই দুঃসময়েও তোমার রসিকতা আসে। চল। সিগ্রেটের প্যাকেটটা? (*পকেটে হাত দিয়ে*) আছে। ভাবতে পার এতক্ষণে একটা সিগ্রেট খাইনি।

ইরা ।। হ্যাঁ, তাতে মহা সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে তোমার। ও আপদটা ছাড়ত।

সুনীল ।। (*সিগ্রেট ধরিয়ে*) চল।

[*ওরা দুজন চলে যেতে দুহাত তুলে মিঃ গুগলু এবং হুররা ঢোকে। ওদেব পিছনে বিভলবার পয়েন্ট করে একটি ছেলে। চাপা প্যান্ট। চকরা-বক্‌রা জামা। কোমরে মোটা বেল্ট। ওর ভঙ্গি ফিল্মে দেখা কায়দাবাজ গ্যাঙ্গস্টারদের মত। বাঁ-হাতের ইঙ্গিতে লোকটি ওদের মঞ্চের মাঝখানে যেতে বলল। ওরা দুজন গেল। লোকটি মুখের সিগ্রেটটা বেল্টে একটা কাঠি ঘষে নিয়ে জ্বালায়। কয়েকটা রিঙ করে। শিস দিতে দিতে গোটা ঘরটা দেখে। হাত নামিয়ে ওরাও ওব মত দেখতে থাকে। লোকটি ধমকে বলে, 'হ্যাণ্ডস আপ'! ওরা আবার হাত তোলে। লোকটি টেবিলটায় হেলান দিয়ে ওদের দেখতে থাকে। লোকটির নাম ফান্টুস।*]

হুর্‌রা ।। মিঃ গুগলু, (*মৃদু-মৃদু হেসে*) কি রকম হাত তুলে আছি?

গুগলু ।। মজার, বেশ মজার, স্যর।

হুর্‌রা ।। গুগলু, এবার কাতুকুতু দিলেই সেরেছ। (*খিক্‌খিক্ করে হাসে*) দুহাত তুললে কিরকম লাগেনা? যেন হরি-সংকীর্তন করছি।

ফান্টুস ।। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

গুগলু ৷৷ আমরা কি করব? খালি খালি দাঁড়িয়ে আছি। একটু হাসতেও পারবনা? তাহলে কি করব বলুন?

ফান্টুস ৷৷ সেটাইতো মনোযোগ দিয়ে ভাবছি। অতো ফিক্‌ফিক্ করে হাসলে কি ভাবা যায়। নাউ, সাইলেন্স।

[*ফান্টুসের একটা পা হড়কে যায়।*]

ফান্টুস ৷৷ (*বিরক্ত*) শালা, এক বুদ্ধুর কারখানায় এসে উঠেছি। পাইপ বেয়ে উঠে বাইরের দু'চারজন লোক যেখানটায় নামবে, ঠিক সেখানে কেউ কাঁচা ডিমের ঝুড়ি রাখে? ফাটা ডিমে পাটা এমন লেপ্টে আছে, দাঁড়ালেই এখন পেছলাচ্ছি। ব্যাটা দুটোর খুপড়ি ওড়ালে তবে গায়ের ঝাল নামে। (*হুর্‌রা নিঃশব্দে হাসে*) আবার হাসে দ্যাখ! দাঁতে দোষ না থাকলে কেউ বন্দুকের মুখে হাসে? জানের মায়া অবধি নেই? সিন্দুকের চাবি নিকালো! জল্‌দি চাবি ছোড়ো! আমার সময়ের দাম আছে, বুঝলে? চাবি কোথায়?

হুররা ৷৷ গিলে ফেলেছি।

ফান্টুস ৷৷ গিলে ফেলেছি! আমি কে আছি জান?

(*নিজের বুকে সজোর থাপ্পড় মেরে*) এ তল্লাটের মাস্তান। সারা মহল্লার লোক আমার ফান্টুস নামে কুর্ণিশ করে। ইয়ার্কি হচ্ছে—আমার সঙ্গে? আমরা নাম শোননি? ফান্টুস —এডুকেটেড গ্যাঙ্গস্টার—ফান্টুস বি. এ. (*শেষ কথাটা বলেই নিজের শীর্ণ বুকে প্রবল বীরত্বসূচক থাপ্পড় মারে। চোট সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে যায়*)

হুর্‌রা ৷৷ আরে গুগলু, ধর, একে ধর।

গুগলু ৷৷ এই চেহারায় এতো বড় থাপ্পড় সইবে কেন?

হুর্‌রা ৷৷ (*ফান্টুসকে তুলতে তুলতে*) একেই বলে, আস্ফালনে অপঘাত। (*ফান্টুস চোখ মেলতে*) কি হ'ল।

ফান্টুস ৷৷ (*কোনমতে দাঁড়িয়ে*) যা হয়। লো ব্লাড-প্রেসারে ভুগছি তো, টেনশনে মাথা ঘুরে গেল। এক গ্লাস দুধ হবে? যান না মশাই, এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসুন।

হুররা ৷৷ গুগলু। দুধ এক গ্লাস। তাড়াতাড়ি!

গুগলু ৷৷ (*নোট বইতে লেখে*) দুধ এক গ্লাস। তাড়াতাড়ি। সঙ্গে আর কিছু?

ফান্টুস ৷৷ (*প্রায় কান্নার মত স্বরে*) কিরকম ইয়ার্কি করছে দেখুন—খালি টাইম কিল করছে। একে বুকটা ধুকপুক্ করছে। তার ওপর আবার বিল কাটছে? প্রাণটাতো আপনাদের বেঁচে গেল, তার বদলে একগ্লাস দুধ পর্যন্ত ফ্রি-তে পাব না? বাগে পেলে মানুষ কি রকম নিষ্ঠুর হয়, দেখেছ। এখনো লিখছে! (*হুর্‌রাকে*) ধমক দিন না, মশাই, আমি জোর পাচ্ছি না বলে ধমকাতে পাচ্ছি না। যেন আমার জীবনী লিখছে। (*গুগলুর কানের কাছে মুখ এনে যথাসাধ্য চেঁচিয়ে*) দু—ধ।

[*গুগলু চমকে সরে দাঁড়ায়। দ্রুত বেরিয়ে যায়।*]

হুর্‌রা ৷৷ বসুন চেয়ারটায় বসুন।

ফান্টুস ৷৷ (*বসতে বসতে*) মাথাটা ঘুরছে। যতবার শালা তড়পাতে গিয়েছি একটা না একটা কিছু ঠিক ঘটেছে। এ-সব কি সকলের পোষায়। কাকে বোঝাব? হৃদয় বোঝে তো পকেট বোঝে না।

[*গুগলু এক গ্লাস দুধ এনে দেয়। ফান্টুস একদমে খেয়ে নেয়। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে*]

ফান্টুস।। না দুধটা খাঁটি, বেশ বটের আঠার মত ঘন। অনেস্ট আছে বেয়ারাটি। সার্ভিসটিও ভাল, তাছাড়া চটপটে। বয়-বেয়ারাদের এ গুণটি কি আজকাল মেলে?

গুগলু।। বেয়ারা কি বলছেন? আমি ভাইস ক্যাপটেন মিঃ গুগলু। এটা জাহাজ।

ফান্টুস।। আমি মশাই আদার ব্যাপারী, এসব জাহাজের খবর রাখি না। আচ্ছা চলি, বাগে পেয়েও দুধ খাওয়ালেন। এসব সিমপ্যাথির তুলনা হয়না, মশাই। বলব, দু-দশ জায়গায় বলব। আচ্ছা, ফের দেখা হবে।

হুররা।। আবার দেখা হবে?

ফান্টুস।। ঐ আর কি, যাবার সময় ভদ্রতা করে বলতে হয়। চলি। (*গ্লাসটা হাতে নিয়েই এগোয়*)

গুগলু।। গ্লাসটা রেখে গেলে ভাল হয়, মশাই।

ফান্টুস।। (*গ্লাসটা রেখে*) জবাব নেই। কি অ্যালার্ট। একটা গ্লাস অবধি গলাবার উপায় নেই। হবে, আপনাদের হবে। যাকগে যাবার মুখে একটি সিগারেট চমকান তো!

হুররা।। ওটিতো নেই।

ফান্টুস।। ঠিক আছে। পেলে খেতাম, না পেলাম তো সংযম শিক্ষা হল—ঠকাতে পারবেন না। কেটে পড়ি তাহলে?

হুররা। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে রাতটা থেকে যেতে মন চাইছে?

ফান্টুস।। থাকতেই যদি বলেন, তাহলে কিন্তু সকালের ব্রেকফাস্টটি ছাড়বনা। তখন আবার বিল কাটতে যেন পেন্সিল খুঁজবেন না।

গুগলু।। ঠিক আছে, রাতটি থেকেই ধন্য করুন।

ফান্টুস।। (*বসে পড়ে*) না, বিনয়ে আপনাদের জুড়ি নেই। হবে—ব্যবসা চালাতে গেলে, এটাই হল গিয়ে মস্ত গুণ।

[*ফান্টুস চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বোজে। হুররা কাছে গিয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে দাঁড়ায়।*]

হুররা।। মিঃ ফান্টুস?

ফান্টুস।। (*চমকে যায়*) অতো মিহি গলায় প্রায় কান কামড়ে ধ'রে অমন প্রিয় সম্বোধন করবেন না—আমার সন্দেহ হয়। মতলব ছাড়া এতো প্রেম-প্রেম ভাব হয়!

হুররা।। তা একটু মতলব আছে, ভাই।

ফান্টুস।। (*উঠে দাঁড়িয়ে*) তা থাকবে না। সে আমি আগেই জানি। তা নাহলে আমাকে আদর করে কি আর থাকতে বলবেন?

হুররা।। মিঃ গুগলু তোমার কি মনে হয় লোকটা পারবে?

গুগলু। আলবৎ পারবে, ক্যাপেটেন।

হুররা।। পেরে গেলে?

গুগলু।। এক দানে রাজা।

হুররা।। রাজার রাজ্যখানা?

গুগলু।। হাসিখুশি।

হুররা।। মাটি খুঁড়লে?

গুগলু।। সোনা।

হুররা।। চোখ তুললে?

গুগলু।। আকাশ।

হুররা।। হাত বাড়ালে?

গুগলু।। মিষ্টি বাতাস।

হুররা।। (*ফান্টুসকে*) চাই নাকি?

ফান্টুস।। (*বিস্ময়*) কি?

হুররা।। যা বললুম।

ফান্টুস।। দু-জনে মিলে তো ছড়া কাটলেন? বললেনও আপনারা, বুঝলেনও আপনারা। শাদা বাংলায় বলবেন তো বলুন, না হলে এই চেয়ারেই লেটে যাচ্ছি।

হুররা।। দুটি ছেলে-মেয়ে আসবে এ-ঘরে।

ফান্টুস।। সর্বনাশ করেছে। সারাক্ষণ বকবক করে ঠিক ঘুমের বারটা বাজাবে। ও-সব ছাঁটান মশাই।

গুগলু।। (*গলা নামিয়ে*) ওদের কাছেই আছে।

ফান্টুস।। (*উৎসুক*) কি আছে?

হুররা।। একটা ম্যাপ।

ফান্টুস।। সে কি মশাই, ম্যাপ দিয়ে আমি কি করব? ম্যাট্রিকে ঐ ম্যাপ পয়েন্টিং-এ দুটি বছর ঘা খেয়েছিলাম। পুরণো ব্যথাটা আবার খুঁচিয়ে দিলেন। ম্যাপের কথা শুনলেই মশাই আমার গা জ্বলে ওঠে। শালা, সারা দুনিয়ায় একটু বসবার জায়গা পাচ্ছিনা; বলে কিনা অমুক দেশের রাজধানী বসাও। তমুক দেশের হীরের খনি দেখাও। আমি দেখাব আর অন্যে লুটে খাবে। ভাল খেল!

হুররা।। ঐ ম্যাপটায় একটা নতুন জায়গার খবর আছে।

গুগলু।। পৌছতে পারলেই সোনা।

হুররা।। তাল তাল সোনা।

ফান্টুস।। গোপন খনি আছে বোধহয়?

হুররা।। তা নয়তো কি? তবে তুলে আনবার জন্য মেহনত চাই।

গুগলু।। পথে বাধা বিপদ আছে।

ফান্টুস।। শালা সোনার বস্তা মাথায় করে আনব—তাতে বাধা বিপদ থাকবেনা? গাছের লিচুটায় হাত ঠেকালে মালী তেড়ে আসে। আর এতো সোনা। দাদারা মাইরি লোভ দেখাচ্ছেন নাতো? গরিব মানুষকে লোভ দেখিয়ে জ্বালাবেন না দয়া করে। তা ম্যপখানা কোথায়?

হুররা।। ওটিইতো যোগাড় করতে হবে।

ফান্টুস।। কোথায় আছে?

গুগলু।। যে ছেলেমেয়ে দুটি আসছে, ওদের কাছ থেকে কায়দা করে বের করতে হবে।

ফান্টুস।। (*বন্দুকটা দেখায়*) বন্দুকটা বের করলে জিনিশটা আপসে বেরিয়ে আসবে।

হুররা।। উঁহু—না, না। বন্দুকের আওয়াজ করবেন না ওতে আমার জাহাজের বদনাম হবে।

ফান্টুস।। রাখুন দিকিনি। মাল ছিনতাই করাচ্ছেন তাতে পাপ নেই, আর বন্দুক

তুললেই মহাভারত পাংচার। তার আগে বখরাটা মিটমাট হয়ে যাক—ফিফটি-ফিফটির তাইতো? (*ওরা 'হ্যাঁ' জানায়*) তাহলে লেখা-পড়া করে নিচ্ছি না? (*ওরা সায় দেয়*) ভদ্দরলোকের কথা লাখটাকা। তাহলে গুরুর নাম করে লেগে যাচ্ছি।

হুররা।। ঠিক আছে, বোধহয় ওরা আসছে। আমরা কেটে পড়ছি।

ফান্টুস।। আমাকে একা ফেলে যাবেন?

গুগলু।। এতক্ষণ তা হলে কি কথা হল?

ফান্টুস।। তা নয়, লাইনে একেবারে ফ্রেশ এসেছি কিনা। ঠিক আছে। চলে যান আপনারা।

হুররা।। উইশ ইউ গুড় লাক।

গুগলু।। (*চলে যেতে যেতে*) টা-টা, টা-টা।

[*ফান্টুস নার্ভাস মুখে হাসবার চেষ্টা করতে করতে হাত নেড়ে ওদের দুজনকে বিদায় জানায়। সুনীল এবং ইরা ঢোকে। ফান্টুসকে দেখেই থমকে দাঁড়ায়।*]

সুনীল।। আপনি?

ফান্টুস।। এই এ-ঘরটায় ওরা রেখে গেল আর কি।

ইরা।। এ-ঘরটায় আপনাকে থাকতে দিয়েছে?

ফান্টুস।। দিয়েছে, মানে থেকে গেলেই হল।

ইরা।। এটা আমাদের ঘর।

ফান্টুস।। সব ব্যাপারে এত আমার-তোমার করেন কেন? মিলেমিশে কোনমতে থেকে গেলেই হল।

সুনীল।। এখন একেবারে জুলুম শুরু হয়েছে। না, আপনাকে বলছিনা। ঐ ক্যাপটেন হুররা—ওর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? সমস্ত রাতটা নানা কায়দায় জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

ফান্টুস।। দেখুন, আমি—

সুনীল।। না, না, আপনার কি দোষ। টাকা দিয়েছেন, ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। তাছাড়া আপনারও তো অসুবিধে।

ফান্টুস।। না, আমাকে বলেছে . . . বলেছ, স্বামী-স্ত্রী দুটিতে আছে ; ছোট ভাই এর মত গল্পগুজব করে রাতটুকু ভোর করে নেবেন। এতো রাতে গাছতলায় তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। যা জায়গা ভালুকে ছিঁড়ে ফেলবে না!

ইরা।। এতো রাত্রে এলেন কোত্থেকে?

ফান্টুস।। ছোট ভাই-এর মত একটা সত্যি কথা বলব, বড়দি? (*হেসে*) বড়দি ডাকলুম, কিছু মাইণ্ড করলেন না তো?

ইরা।। মাইণ্ড করব কেন?

ফান্টুস।। সত্যি কথাটা হল, ছিনতাই-এর ধান্দায় ঘুরি। কখনো-কখনো এখানে-ওখানে ঢুকেও পড়ি। হোটেলটার মেইনটা অফ করে ঢুকে পড়েছি।

সুনীল।। হোটেলটার আলো আপনি নিভিয়েছেন?

ফান্টুস।। কেন, এটা কি একটা শক্ত কাজ নাকি?

ইরা।। তা নয়, যখন আপনিই আলো নিভিয়েছেন তখন আপনার আসার কারণটাও বোধহয় জানি।

ফাণ্টুস।। কি বলুন তো?

ইরা।। একখানা ম্যাপ চাই, তাইনা?

ফাণ্টুস।। পায়ের ধুলো দিন, বড়দি। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথা বলেছেন। কেমন করে দাবিটা রাখব তার কায়দাটা পাচ্ছিলাম না—কাজ আমার অর্ধেক এগিয়ে দিয়েছেন। এবার ম্যাপখানা বাড়িয়ে দিলে পুরো শান্তি।

সুনীল।। কোনও ম্যাপ আমাদের কাছে নেই।

ফাণ্টুস।। আশা দিয়ে হঠাৎ এমন এক একটা কথা বলেন না! অন্তর্যামীর মত সব যখন বুঝলেন তখন দয়া করে ছলনা করবেন না। (*হঠাৎ কি ভেবে*) আচ্ছা আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। জিনিশটা আপনার কাছেই থাক, কেবল বখরার বেলায় আমাকেও পার্টনার করে নিন। তাতে বেশ মিল মিশ হবে ব্যাপারটা। চুরি ডাকাতির ব্যাপারও নেই, অথচ কাজটিও বেরিয়ে এল। ভাগটা একটু কমে যাবে আমার, তাহলেও স্যাক্রিফাইস করতে আমি রাজি। এবার আপনারা রাজি হলেই লেখাপড়ার কাজটা সেরে ফেলা যাবে।

সুনীল।। দেখুন সারারাত্তির আপনার সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা হিসেব কষে আমি একসঙ্গে থাকতে পারবনা। আপনি দয়া করে চলে যান। ক্যাপ্টেন হুর্‌রাকে গিয়ে বলুন, ওদের অসুবিধে আছে, আমাকে অন্য কোথাও দিন। কোনো মালপত্র এনেছেন? সেটি আবার ফেলে রেখে যাবেন না।

ফাণ্টুস।। না, আমার বেডিং-স্যুটকেশ বলতে তো একটি রিভলবার—সেতো সঙ্গেই আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হল, সত্যিই ম্যাপটা নেই বলছেন? পুরো ভাঁওতা খেয়ে গেলুম। আচ্ছা, আমি একটু বরঞ্চ ওদের সঙ্গে কনসাল্ট ক'রেনি। কেমন যেন চারদিকটা পানসে হয়ে গেল! যাই।

[*দরজার কাছ থেকে দৌড়ে আসে*]

ফাণ্টুস।। বাপরে! জ্যাঠামশাই!

ইরা।। কে? কার জ্যাঠামশাই?

ফাণ্টুস।। আমারতো বটেই, বোধহয় আপনাদেরও।

[*কোন দিকে যাবে ঠিক না পেয়ে যে ঘরে যুবকটি থাকে সেখানে ঢুকে পড়ে*]

সুনীল।। জ্যাঠামশাইটি আবার কে?

[*পাশের ঘর থেকে যুবক ছেলেটি ফাণ্টুসের কলার চেপে নিঃশব্দে মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে আসে। জ্যাঠামণি ঢুকেই দৃশ্যটি দেখেন। ফাণ্টুসকে লক্ষ করেন। তারপর যুবকটির মুঠো ছাড়িয়ে নিজে ফাণ্টুসের কলার চেপে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যান। যুবকটি শান্তভাবে নিজের ঘরে ঢোকে। ওরা দুজন চুপ। জ্যাঠামণি আবার ঢোকেন। বড় ঢোলা হাতার গিলে করা পাঞ্জাবী। হাতে শৌখিন লাঠি। পুরোনো আমলের সোনালী ফ্রেমের চশমা। প্রৌঢ়।*]

জ্যাঠামণি।। আপদ ছেলেটা এ-ঘরে এসে জুটেছে। একটি নকল বন্দুক নিয়ে একে তাকে শাসাচ্ছে, একটি ধমক দিলেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়। অথচ বিক্রমের অন্ত নেই। কতো লোক এসব লাইনে দু-পয়সা করে খাচ্ছে। অপদার্থ। তাছাড়া, নিজের হিতাহিত বোঝে না। কতোবার বলেছি, আমার কাছে আয়, দেখি একটা হিল্লে করা যায় কিনা। কে কার কথা শোনে। যাকগে, মরুকগে —কতোদিক দেখব? (*ওদের*) তা তোমাদের উপর বুঝি উপদ্রব করে গেছে?

ইরা।। যতক্ষণ এসেছি, কখনও একা থাকিনি, উপদ্রবও কমেনি।

জ্যাঠামণি।। আমাকেও একটি মূর্তিমান উপদ্রব ভাবছ নিশ্চয়ই? (*হাসে*) তা আমি মা জানিয়ে শুনিয়ে ডাকাতি করি। বলেই রাখি তোমাদের একটু জ্বালাতেই এসেছি। রেগেছ আমার উপর যথেষ্ট, তা নইলে বুড়ো মানুষটাকে একটু বসতে অবধি বললে না?

ইরা।। বসুন। এতো ঝামেলায় আছি। আমরা নিজেরাই একটু বসবার মত সুযোগ পাই নি।

সুনীল।। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

জ্যাঠামণি।। একটা কেন, হাজারটা করবে। সকাল থেকে তো এই করেই বেড়াই।

সুনীল।। এখানে কি রাত্রে কেউ ঘুমোয় না।

জ্যাঠামণি।। (*হো হো করে হাসে*) এটা একটা দামি কথা বলেছ। আজ আমি একটি মাস ধরে এখানে আছি—ক'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি আঙ্গুলে গুণে বলে দিতে পারব। এই তো তিনটে মিটিং সেরে এখানে ফিরলাম। ভাবলাম, ঘণ্টা দুয়েক দু'চোখ বুজতে পারব। এসেই চৌধুরীর কাছে তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলাম। ঘুম আমার মাথায় রইল : জামা-কাপড় অবধি বদলাম না। একবস্ত্রে চলে এলাম। বুড়ো বয়সের গলদটা কোথায় দেখলে? সব কথাই বলছি অথচ নিজের পরিচয়টি এখনো দেইনি। এখানে সবাই আমাকে জ্যাঠামণি বলে ডাকে। এখানে কাজেকর্মে আসি। ওরই মাঝে সবাই মিলে কখন তাদেব জ্যাঠামণি বানিয়ে নিল। তোমরা কদিন থাকছ তো?

সুনীল।। পারলে এক্ষুণি যাই।

জ্যাঠামণি।। (*ইরাকে*) ভাইপো আমার খুব চটে আছে! তা মা তুমি সব ঘুরে টুরে দেখছ—তো? শুনেছি এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি মনোরম। দেখার তো সময় মেলে না। ওসব কি আমাদের জন্য।

ইরা।। আজকেই এসেছি। ইচ্ছে ছিল দেখব!

জ্যাঠামণি।। দেখছিতো, তোমাদের মত যারাই আসে চারদিকের দৃশ্য দেখে চোখের পলকটি ফেলতে পারে না। আর তখন আমরা খনির কুলি-মজুবদের পেটের ভাবনা নিয়ে মিটিং করছি, দশবার বসছি। ট্রেনে, মোটরে কুলোয় না—উড়োজাহাজেও ছুটোছুটি। তোমরা তখন সবুজ ডালটির ফাঁক দিয়ে চাঁদের প্রোফাইল আবিষ্কার করছ, নুড়িতে ধাক্কা খেয়ে জলে কার কাঁকনের কিঙ্কিনি বাজছে তাই শুনছ—কে একজন বলল, এখানকার ঝাউবন নাকি বড় ভাল বেহালা বাজায়। (*হো হো করে হাসে*) যৌবন বয়সটাই মা কাব্য, বুড়োদের না আছে কান, না আছে চোখ।

ইরা।। বুড়োদেরও কম রসবোধ নেই। রাজনীতি করেন, তাই প্রকাশ পায় না।

জ্যাঠামণি।। রাজনীতি বড় নিষ্ঠুর জিনিশ মা—দু'দণ্ডের জনপ্রিয়তা। দু'লক্ষ করতালি একটি ফুঁয়ে নিভে যায়। কি পাব শেষ অবধি। মরে যাবার পর ওরা একটা স্ট্যাচু বানাবে। বছরে একবার পায়ের কাছে মালার পাহাড় হবে। অথচ স্ট্যাচুর মাথায় দিন রাত হাজার পাখির মলমূত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এই-তো ফেট। এসব ভবিতব্যের কথা থাক। তোমাদের যে কথাটা বলতে এলাম। চৌধুরীর কাছে ম্যাপটি তোমরা দিওনা।

সুনীল।। ম্যাপের খবরটা আপনি না জানলেই অবাক হতাম। আচ্ছা, হোটেলে একবার আলো নিভেছিল, বোধহয় আপনিও ব্যাপারটা জানেন।

জ্যাঠামণি।। তাহলে তো নিজের একটি অপকর্মের স্বীকারোক্তি করতে হয়—আলোটি নেভাবার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়েছিল। এখানে ঢুকবার সময় আমি একটু লুকিয়ে ঢুকতে চেয়েছি। সেসব কথা পরে বুঝবে। বহু দুষ্ট লোকের নজর এই বুড়োর মাথাটার উপর রয়েছে—পারেতো ধড়-মুণ্ডু দু-জায়গায় রাখে। তা যে কথা বলছিলুম, ম্যাপটি চৌধুরীর হাতে দিওনা। নিশ্চয়ই চেয়েছিল?

ইরা।। হ্যাঁ।

জ্যাঠামণি।। চন্দ্রনাথ বড় বুদ্ধিমানের মত জিনিশটা হাতের বাইরে পাচার করেছে!

ইরা।। চন্দ্রনাথকে আপনি চেনেন?

জ্যাঠামণি।। চিনব মানে? এক পথের পথিক। মতের পার্থক্য হতে পারে—কিন্তু দুজনেই যে দেশের সেবক, তাতে বাধা কি?

সুনীল।। ও অ্যারেস্টেড হয়েছে জানেন?

জ্যাঠামণি।। জানব না, চোখের সামনে হল।

সুনীল।। কতদিনে ছাড়বে কিছু জানেন?

জ্যাঠামণি।। কিছুদিনতো রাখবেই।

ইরা।। কাল আমাদের সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?

জ্যাঠামণি।। থানা আমার হাতে। এ কী আর শক্ত কাজ? তবে আমার যাওয়া ঠিক হবেনা মা। শতহলেও রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ তো। তাছাড়া ম্যাপটার ফয়সালা না হওয়া অবধি ওর সঙ্গে দেখা করার পারমিশান তো পাবেনা।

ইরা।। আপনি অন্তত বিশ্বাস করুন, আমাদের কাছে কোনরকম ম্যাপ নেই। অথচ সবাই মিলে ঐ ম্যাপটা চাইছে। আমরা কিরকম বিশ্রী অবস্থায় আছি ভাবুন।

জ্যাঠামণি।। দেখ মা, ম্যাপটা তোমাদের দিতে হবেনা—আমি তোমাদেরই স্বার্থে অন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ও জিনিশটা বিপজ্জনক। দেশটাকে ভেঙেচুরে একটা নতুন দেশ বানাতে চাইলেই কি আর হয়? ঐ ভাঙচুরটাই হয়—নতুন দেশ আর আসেনা। তাই ওসব কাগজপত্তর সঙ্গে রাখতে নেই। বের কর কাগজখানা—কথা দিচ্ছি, কেউ নেবেনা।

সুনীল।। কোত্থেকে বের করব? আপনারা কী হলে বিশ্বাস করবেন বলুনতো?

জ্যাঠামণি।। বলছিলুম জিনিশটি আমি নিজের হাতে ছোঁবনা পর্যন্ত। তোমরা বের করবে, আমার চোখের সামনে ঐ বিপজ্জনক জিনিশটি পুড়িয়ে দেব! তোমাদেরও বিপদ রইল না, অন্য কারুর হাতেও পড়ল না।

সুনীল।। আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের পক্ষে বোঝানো অসাধ্য যে ও বস্তুটি

আমাদের সঙ্গে নেই। আপনারও বাজে সময় নষ্ট হচ্ছে। বরঞ্চ আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

জ্যাঠামণি।। *(উঠে পড়ে)* শুয়ে তো পড়বই। বড় একগুঁয়ে তোমরা। সঙ্গে সঙ্গে কি আর ঘুমুতে পারব—দশ রকম কাজ পড়ে আছে। চৌধুরী হয়ত ঘরেই বসে আছে। ঠিক আছে কথাটা ভেবে দেখ।

[জ্যাঠামশাই চলে যাবার মুখে গুগলু ঢোকে। ওর দিকে একবার সন্দিগ্ধ তাকিয়ে গুগলু কাছে আসে।]

গুগলু।। ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা যাত্রীদের সাবধান করতে আসছেন। জাহাজের চারদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যদি চান তাহলে ক্যাপ্‌টেনকে ডাকি?

সুনীল।। আমাদের মতামত নিয়ে কি হবে?

গুগলু।। এটা আমাদের জাহাজের কার্টসি। না জানিয়ে ক্যাপটেন আসেন না। *(চেঁচিয়ে)* ক্যাপ্‌টেন, আপনি আসতে পারেন।

[সঙ্গে সঙ্গে হুররা ঢোকে। অত্যন্ত ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন দেখায়।]

হুররা।। খানিকক্ষণ আমাকে আলোটা নিভিয়ে দিতে হয়েছিল। আপনাদের যথেষ্ট অসুবিধে হয়েছিল। আশা করি ক্ষমা করবেন। এখন আলো জ্বলছে, এবং আশা করি জ্বলবে।

সুনীল।। আচ্ছা এই আলোটা নেভানোর জন্য কতোজন লোক লাগে বলবেন?

হুররা।। না নিভিয়ে উপায় ছিল না। জাহাজটার কাছাকাছি একদল পাইরেট, মানে জলদস্যু আর কি, এগিয়ে আসছিল। আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম যাতে ওরা আমাদের জাহাজটা দেখতে না পায়। ওরা চলেও গিয়েছিল। কিন্তু এক্ষুণি খবর এসেছে, ওরা অনেকগুণ শক্তি বাড়িয়ে আবার জাহাজটার দিকে এগুচ্ছে।

গুগলু।। এ সব জলদস্যু ভয়ংকর। আপনারা এদের চেনেন না। এরা বড় নৃশংস।

ইরা।। কথাটা কি সত্যি? না, আপনাদের এক ধরণের রসিকতা।

হুর্‌রা।। রসিকতা আমরা কখনো করিনা।

[সেই যুবকটি ঢোকে।]

হুর্‌রা।। কি খবর?

যুবক।। পাইরেটরা এগুচ্ছে।

হুররা।। ঠিক আছে নজর রাখ। যাও।

[যুবকটি শান্তভাবে চলে যায়]

সুনীল।। এই ব্যক্তির নজরের উপর নির্ভর করেই কি জলদস্যুর ভয় পাচ্ছেন?

গুগলু।। ভয় আমরা পাইনা, সর্তক হই।

ইরা।। এ-কিন্তু খুব স্বাভাবিক নয়। ওর কথায় ভরসা করলে কিন্তু খুব ভুল করবেন।

হুর্‌রা।। ও আমাদের একজন ঘোষক। যে-সংবাদ আমাদের রক্ষীরা দেয় তা ঘোষণা করে।

গুগলু।। এ-এক ধরণের চিকিৎসা। ভয়-বিপদের কথা ঘোষণা করতে করতে ও ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠবে।

হুররা॥ তারপর বিপদটা মুখোমুখি হলে তার সামনে ওকে ঠেলে দেব। আর কিছু না হোক ওর 'ইন্সটিঙ্কট' ওর হয়ে লড়বে—ধীরে যুদ্ধটার কায়দা শিখে নেবে। যুদ্ধটার প্রয়োজন বুঝবে, আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যান্য যাত্রীদের আমি সতর্ক করেছি। আপনারা প্রস্তুত তো?

সুনীল॥ আমরা আবার কিভাবে প্রস্তুত হব?

হুররা॥ নিজেকে তৈরী রাখাই প্রস্তুত হওয়া।

[*ফান্টুস ঢোকে। হাতে অনেকগুলো প্লেট।*]

ফান্টুস॥ আমাকে ছেড়ে দিন, মশাই। শুনলাম এখানে ডাকাত পড়ছে।

হুররা॥ কেন চাকরি চাইছিলে যে?

ফান্টুস॥ কিন্তু শুনলাম, এ-বাড়িতে রোজ ডাকাত পড়ে। যে বাড়িতে রোজ ডাকাত পড়ে সেখানে চাকরি করাটা কি আমার ঠিক হবে? আমার রোগটা মনে আছে তো?

হুররা॥ কোথায় রোজ ডাকাত পড়ছে না? বল, উত্তর দাও?

ফান্টুস॥ সেরেছে! সারা দুনিয়ার খবর নেবার সময় আছে নাকি মশাই?

গুগলু॥ কথা বলার সময় নেই, ক্যাপটেন। ওকে ডিশগুলো রেডি করতে বলুন। আর আমরা টেবিলটা সাজিয়ে ফেলি।

হুররা॥ ঠিক বলেছ। ডিশ রেডি করো।

ফান্টুস॥ আপনারা আর সময় পেলেন না?—এদিকে জলদস্যু আসছে আর ডিনার—টেবিল সাজাচ্ছেন। ওরা হালুম করে ঘরে ঢুকলে হাত থেকে যদি ডিশ পড়ে যায় দাম দিতে পারবনা বলে রাখছি।

হুররা॥ ডিশগুলো পড়ে যাবার আগে ওদের ছুঁড়ে মারবে।

ফান্টুস॥ এই সেরেছে, এযে হাঁড়িকাঠে গলা বাড়াতে বলে। আমায় ছেড়ে দিন।

হুররা॥ কিচেনে যাও। বি-কুইক।

গুগলু॥ এক্ষুনি যাও, যে-কোনা মুহূর্তে বিপদসঙ্কেত বেজে উঠবে। যাও।

[*ফান্টুস চলে যায়।*]

হুরবা॥ আসুন, টেবিলটার চারদিকে আমরা চেয়ারগুলো সাজিয়ে ফেলি। হাত লাগান। এটা হবে আমাদের জরুরি কনসালটেশন রুম। এখন আমাদের কি করা কর্তব্য সে ব্যাপারে সবাই মিলে ভাবতে হবে। তারপর ডিনার। আজ আমার জন্মদিন। সবাই একসঙ্গে খাব। গুগলু, আরো চেয়ার চাই।

গুগলু॥ রেডি আছে, এক্ষুণি আনছি। (*ইরা ও সুনীলকে*) কই, হাত লাগান।

সুনীল॥ হাত লাগিয়ে কি করতে হবে বলুন?

হুররা॥ আসুন, আগে টেবিলটা মাঝখানে আনা যাক।

[*সবাই ধরাধরি করে টেবিলটা এগিয়ে আনে। পাশে পাশে চেয়ার এনে রাখে। মোট ছটি চেয়ার চাই। প্রয়োজনমত চেয়ার গুগলু মঞ্চের বাইরে থেকে নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে হুররা ওদের সঙ্গে কথা-বার্তা চালিয়ে যাবে। গুগলু এসময় এ কাজটিই মনোযোগ দিয়ে করবে।*]

হুররা।। আরো চেয়ার চাই।

গুগলু।। মোট ছ'খানা দরকার।

হুররা।। হ্যাঁ ছ'খানা। ফান্টুস আর ঐ ছেলেটা বসবেনা—ওদের অন্য কাজ আছে, দরজার দু 'প্রান্তে থাকবে। হ্যাঁ, চেয়ারগুলো নিয়ে এস।

[*গুগলু ভিতরে চলে যায়। ও এই ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকে।*]

ইরা।। আমরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিনা।

হুররা।। (*ব্যস্ত, অন্যমনস্ক*) বুঝতে পারবেন।

সুনীল।। যেটুকু বুঝতে পেরেছিলুন, তা আরো তালগোল পাকিয়ে গেছে।

হুররা।। তালগোল পাকিয়ে আর কতক্ষণ থাকবে? এবার কয়েকটা জরুরি কথা সেরেনি। এরপর এখানে আরো লোক এসে পড়বে। (*ইরাকে*) বলুন তো, আজ আমার জন্মদিনে কিরকম সাজলে ভাল হয়? কিছু ভেবে রেখেছেন?

ইরা।। জানলুম তো এক্ষুণি—আগে ভেবে রাখব কি করে?

হুররা।। (*সুনীলকে*) আপনার জন্মদিনে কি রকম সাজেন?

সুনীল।। জন্মদিনে কোন উৎসব-টুৎসবও হয়না—কোনো কোনো বছর সময়টাও খেয়াল করে রাখিনা।

হুররা।। আমারও কি এ-সব ভাল লাগে? ঐ গুগলুটা! এক্ষুণি ডাকাত পড়ছে, আর অমনি ও ধরে বসল—"ক্যাপটেন, আজ আপনার জন্মদিন পালন করুন।" আমার সন্দেহ হয়, আসলে আজ গুগলুর জন্মদিন কিনা—আমার উপর দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে! (*গুগলু টেবিলটা সাজাতে সাজাতে মুখ লুকিয়ে হাসে*)দেখছেন না, মুচুক-মুচুক হাসছে। মহা চালাক।

গুগলু।। আমার জন্মদিন কে বললে? জন্মদিনতো ঐ ফান্টুসটার। এখানে চাকরিটা পেয়েই বলল, আজ জন্মদিন ছিল, রাতটা উপোসে যাবে?

ইরা।। (*হঠাৎ কি ভাবল*) এই, অদ্ভুত দ্যাখ, আজ তোমারও জন্মদিনের তারিখ। কি আশ্চর্য দ্যাখ। আপনারা জন্মদিনের কথা না তুললে মনেই পড়ত না।

সুনীল।। (*মুখে অল্প হাসি*) তাইতো, ব্যাপারটা অদ্ভুত তো। হ্যাঁ, আজকেই।

হুররা।। বাপরে! এতোগুলো লোকের জন্মদিন—এ-জাহাজে ধরবে তো।

গুগলু।। ও-ঘরের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করছি—কি জানি হয়তো ওরও জন্মদিন। (*গুগলু যুবকটির ঘরের কাছে গিয়ে*) এই যে, একবারটি শোন, ভাই।

[*যুবকটি ঢোকে*]

হুররা।। আজ নিশ্চয়ই তোমার জন্মদিন?

যুবক।। না তো।

গুগলু।। সে কি জন্মদিন নয়!

যুবক।। আজকে তো নয়। তবে গত বছর এই তারিখে আমার জন্মদিন ছিল।

ইরা।। তাহলে তো আজকেই আপনার জন্মদিন।

যুবক।। (*এই প্রথম মুখে একটু হাসি দেখা দেয়*) তাইতো, হিসেব করলে তো সেরকমই দাঁড়ায়।

হুররা।। আজ দেখছি, জন্মদিনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। (*যুবকটিকে*) ও হ্যাঁ, ওদিকের কি সংবাদ?

যুবক।। ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

হুররা।। তাহলে আমাদের তৈরী থাকতে হয়! সবাই এখনো এল না যে? চৌধুরী, জ্যাঠামশাই—ওরাতো এখনো এল না?

গুগলু।। হয়তো জন্মদিনের প্রেজণ্টেশন খুঁজছে।

হুররা।। প্রেজেণ্টেশন। তাইতো! আজকে তা হলে অনেক ব্যাপার। গুগলু, একটু তাড়া দাও ওদের। (*যুবকটিকে*) যাও ওদিকে, নজর রাখো।

| *গুগলু এবং যুবকটি দুদিক দিয়ে অদৃশ্য হয়* |

হুররা।। (*সুনীলকে*) জন্মদিনে প্রেজেণ্টেশন চাই যে একটি।

সুনীল।। কি চাই?

হুররা।। সেই ম্যাপটি।

সুনীল।। দেখুন, ঐ ম্যাপটির প্রসঙ্গ আমাদের কাছে জলদস্যুদের থেকেও মারাত্মক। দয়া করে ওদিকটা আপনারা ভুলে যান, আমাদেরও ভুলতে দিন।

ইরা।। যা নেই তা নিয়ে আপনারা সেই শুরু থেকে এরকম কেন করে যাচ্ছেন?

হুররা।। আমি জানি, ওটা আছে।

সুনীল।। ভুল জানেন।

হুররা।। ওটা আছে, আর আছে বলেই ওটা সাবধানে রাখতে হবে। ডাকাতের দল ঠিক ওই জিনিসটার লোভেই আসছে। ওদের লক্ষ আপনারা। বিপদটা প্রধানত আপনাদের।

সুনীল।। আপনারা আমাদের ঐ ডাকাতের হাতে ছেড়ে দিন, বোঝাপড়াটা ওদের সঙ্গেই হোক। ওরা বিশ্বাস করলে করবে, অবিশ্বাস করলে যা ঘটার ঘটবে। আপনারা আমাদের ছেড়ে দিন।

হুররা।। আপনার কি মনে হয় না, এই ম্যাপটা মূল্যবান?

সুনীল।। সবাই মিলে যখন খুঁজছে তখন কোনরকম একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

হুররা।। (*রহস্যময়*) আজ আপনার জন্মদিনতো। যদি আজকের জন্মদিনে ঐ ম্যাপটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করি?

ইরা।। না, আমরা চাই না। যেটা সঙ্গে নেই, তাতেই এতো ঝামেলা, থাকলে তো কথাই নেই।

হুররা। যখন আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম তখন ঐ ম্যাপটা আপনাদের বাক্সে লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। আলোটা এই জন্যই নেভানো হয়েছিল।

সুনীল।। সর্বনাশ। (*দৌড়ে গিয়ে বাক্সটা খুলতে যায়*) এর মধ্যে ওটা রেখে দিয়েছে? কী কাণ্ড ভাব! চাবিটা কোথায়?

ইরা।। চাবিতো তোমার কাছে!

হুররা।। (*একটা চাবি আঙুলে তুলে ধরে*) এই যে আমার কাছে চাবি।

সুনীল।। চাবিটা দিন!

[*ক্যাপটেন হুররা মাথা নেড়ে 'না' জানান*]

ইরা।। (*সন্ত্রস্ত গলায়*) চাবিটা দিয়ে দিন, আমাদের এভাবে বিপদে ফেলছেন কেন?

সুনীল।। সেই থেকে একটা অদ্ভুত ষড়যন্ত্র চলছে।

ইরা।। কাকে বিশ্বাস করব? সব্বাই ভোল পালটাচ্ছে। আমাদের উপর এতো রাগ কেন আপনাদের? আমার আপনাদের কি অনিষ্ট করেছি?

হুররা।। কোনও রাগ নেইতো?

ইরা।। শত্রুতাতো করে যাচ্ছেন!

হুররা।। শত্রুতাও করছি না।

সুনীল।। তাহলে আমরা অকারণে চিৎকার করছি? অকারণ কষ্ট পাচ্ছি? একজনের পর আর একজন এসে যে উত্যক্ত করছে—সেগুলো মিথ্যে?

হুররা।। সব সত্য।

ইরা।। তাহলে?

হুররা।। এই জাহাজে এলে এগুলো ঘটে।

সুনীল।। কিসের জাহাজ এটা? একটা মনগড়া কল্পনায় আপনারা ভুগছেন। আপনারা সবকটা লোক অসুস্থ।

ইরা।। আপনারা সবাই অস্বাভাবিক। এক একটা কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে ঘুরছেন।

সুনীল।। একটা ভুল স্বপ্নের মধ্যে আপনাদের হোটেলেটাকে একটা জাহাজ বানিয়ে বসে আছেন। আপনাদের মত আজব, বাজে স্বপ্নে আমরা ভুগিনা। আমাদের কেন জড়াবেন?

হুররা।। এটা হয়তো স্বপ্ন, কিন্তু ভুল স্বপ্ন নয়। ঐ ম্যাপটা না পেলে আমাদের জাহাজটা যে সবাইকে নিয়ে চলতে পারছেনা—সে তার পথ খুঁজে পাবেনা। জাহাজটা তো ডাঙায় পৌঁছবে বলেই জলে নামে। নয়তো জাহাজটা কি অনন্তকাল কেবল জল ঠেলে ভাসবে! সে যে এক ভয়ঙ্কর পরিণাম! জাহাজটা একটা নতুন দেশের ডাঙা খুঁজছে—যেখানে মাটি খুঁড়লে সোনা, চোখ তুললে আকাশ আর হাত বাড়লে ঢেউ তুলে বাতাস ছুটে আসে। এর বেশি আর কি চাই আমরা? এই নতুন দেশে যাবার জন্য কবে থেকে একটা জাহাজ ভাসছে—একটা মানচিত্র খুঁজছে—আমাদের স্বপ্ন সেই মানচিত্র আঁকে। জলদস্যু আসে কেড়ে নিতে। কিন্তু আমরা দেব কেন? ওটা আমাদেব। আমাদের স্বপ্ন আমরা ছাড়বনা। আপনাদের কাছেও ঐ মানচিত্র আছে। কে স্বপ্নহীন? আপনাদের অজ্ঞাতে তাই ম্যাপটা আপনাদের বাক্সে রেখে দিয়েছি। ওটা ফেলবেন না—খুব সাবধানে রাখতে হবে। (*চাবিটা দেয়*) এই নিন চাবি, ম্যাপটা খুলে দেখুন। সব্বাই এসে পড়ার আগে, একবার চোখ বুলিয়ে নিন। দেখুন, কি সুন্দর ম্যাপ। (*সুনীল চাবিটা নেয়*)

সুনীল।। ওটাতো আপনি নিজের জন্যও রাখতে পারেন।

হুররা।। একবার দেখুন কি জানি পছন্দও তো হয়ে যেতে পারে। যদি পছন্দ না হয়, তখন ভাবা যাবে। আমি ভিতরটা দেখে আসছি। সবাইকে নিয়ে আসব। আপনারা তৈরী হয়ে নিন।

[*হুররা চলে যায়।*]

ইরা।। বাক্স থেকে বের করে হয় ওদের দিয়ে দেবে নয়তো ছিঁড়ে ফেলবে—কিছুতে সঙ্গে রাখবে না, বলে রাখছি।

সুনীল।। অদ্ভুত। কখন আমাদের বাক্সে ঢুকিয়ে রেখেছে!

ইরা।। খোল, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ?

[*সুনীল বাক্সটা খোলে। দুজনে ব্যস্তহাতে সব কিছু ঘেঁটে দেখতে থাকে*]

সুনীল।। কোথায়? কিছু নেইতো?

ইরা।। এদেব কোনো কথাটাই ঠিক নয়। যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে!

সুনীল।। বলা তো যায় না—এ-বাক্স থেকে অন্য কেউ আবার সরিয়ে ফেলেছে কিনা কে জানে?

ইরা।। তুমিও যেমন, গোটা ব্যাপারটা একটা ভাঁওতা!

সুনীল।। নাওতো হতে পারে?

ইরা।। যদি কেউ সরিয়েই ফেলে তাহলেও আমাদেরই লাভ। আমরা কি আর নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে রাখতাম? রাখাটা ঠিকও নয়।

সুনীল।। (*ভাবে*) কিন্তু কে নিতে পারে?

ইরা।। তার মানে তুমি ঐ ম্যাপটাতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ?

সুনীল।। বিশ্বাস কর বা নাই কর, ইরা-ওটা যদি একটা কল্পনাও হয় তাহলে কিন্তু এমন একটা কল্পনা যা আমাদের শত্রু-মিত্র সকলের দরকার। একদল ঐ কল্পনার পথ ধরে কিছু পেতে চাইছে, আর একদল ঠিক সেখানেই বাধা দিতে চায়—ম্যাপটা কেড়ে নিতে চায়। এ-কল্পনাটাও তো দামি।

ইরা।। কতো দামি জিনিশ আছে তাতে আমাদের কি?

সুনীল।। আমাদের ছোট্টো সংসারে কটা দামি জিনিস আমরা পাই—কিন্তু আমাদের ইচ্ছেটাতো ওদের বাদ দিয়ে নয়।

ইরা।। কিসব বলছ তুমি!

সুনীল।। বলছি, হঠাৎ যদি অমনি একটা দামি জিনিস আমরা পেয়ে যাই—সেটা আমাদের, এটা ভাবতেও তো একটা তৃপ্তি, একটা সম্মান, আমরা তা ছাড়ব কেন?

ইরা।। না ছাড়লে তোমাকেও ওরা ছাড়বে না।

সুনীল।। ধরে রাখবার চেষ্টাতো করব।

ইরা।। তোমার কতোটুকু জোর।

সুনীল।। যতোটুকু আছে রইল। তার সঙ্গে যারা আমাদের মত তাদের জোর এসে মিলবে।

ইরা।। তুমি ঠিক চন্দ্রনাথের মত কথা বলছ।

সুনীল।। চন্দ্রনাথ কি ভুল বলত?

ইরা।। জানিনা।

সুনীল।। আমিও জানিনা ইরা—কিন্তু এসব হয়ত জানতে হবে। আমরা কি জানতুম, এরকম একটা জাহাজ আছে? একদিন আমরা এসে এখানে উঠবে? কিছু তো জানলুম। এগুলো কি আমরা সব ফেলে দিতে পারব? জীবনটা বড় কাঙাল, যা পায় কিছুতে

ছাড়তে চায় না, আঁকড়ে ধরে থাকে আর দরকার হলে প্রাণপণে লড়তে চায়।

[বাইরে থেকে অনেকের গলা শোনা যায়, ওরা তাড়াতাড়ি বাক্সটা বন্ধ করে। হুররা, গুগলু, চৌধুরী, জ্যাঠামশাই, ফান্টুস ঢোকে]

হুররা।। বসুন সব। (*সুনীল এবং ইরাকে*) বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। (*সবাই বসে, ফান্টুস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ফান্টুসের হাতে একটি ফুলের টব। টেবিলে রেখে নিজের জায়গায় চলে যায়। জ্যাঠামণি ঝুঁকে ফুলের গন্ধ শোঁকে*)

হুররা।। গন্ধটি কেমন?

জ্যাঠামণি।। সুমিষ্ট।

গুগলু।। আপনার স্ট্যাচু কতোদূর?

জ্যাঠামণি।। দেখে এলুম—প্রায় পুরোটা বানিয়ে ফেলেছে। গলায় আবার পুষ্পমাল্য দিয়েছে।

ফান্টুস।। মরে যাবার আগেই একটা স্ট্যাচু বাগিয়ে নিলেন, জ্যাঠামণি?

জ্যাঠামণি।। দেশের মানুষ বড় পাগলারে—বোঝালেও বুঝবে না। কতোবার নিষেধ করলুম, পাগলাগুলো শুনবার পাত্র? তা ওদের যদি একটা সাধও মেটাতে পারলুম, ওতেই তৃপ্তি। এ-বয়সে কেবল দিয়ে যাওয়া, নেবার দিন কি আর আছে? ওপারে খালি হাতে ছাড়া যে যাওয়া যায় না ভাই।

চৌধুরী।। জ্যাঠামণিকে কতো বোঝালুম, দুদিন আরো থেকে যান, তা কাল ভোরেই যাচ্ছেন। আমাদের টানটাতো কেবল ওই মুখে—মনটা কাঁদেনা।

জ্যাঠামণি।। ওরে কান্না কি আমার নেই, ভেবেছিস? কাঁদলেও যে জ্বালা। তোদের কাছ থেকে যখন আর এক জায়গায় যাব—জনতা বলবে ওখানকার মত কাঁদলেন না তো—আমরা কি পর? কাঁদতেও তাই ভয় করে রে! মুখের কথায় কি দেব, বুকখানার ভেতর চলে আয়—বুঝবি, তোদের জ্যাঠামণি কেমন মানুষ। কাছে থেকেও চিনলি না, দূরে গেলে তো দূর ছাই (*হুররাকে*) তা' কাজটি চটপট সেরে নাও। ভোর-ভোর আবার আমাকে বেরোতেই হবে।

হুররা।। মিঃ গুগলু। স্টার্ট।

গুগলু।। আমাদের জাহাজ বিপদাপন্ন।

চৌধুরী।। কেন?

জ্যাঠামণি।। আর চালাতে পারছ না বুঝি? এতদঞ্চলে তো লোকসান একটু হতেই পারে। এখানে কি হোটেল চলে?

হুররা।। এটা জাহাজ।

জ্যাঠামণি।। তাওতো বটে।

গুগলু।। জাহাজ আক্রান্ত হতে চলেছে।

হুররা।। জলদস্যু ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য স্থির করতে হবে।

জ্যাঠামণি।। কিসের লোভে আসবে ভাই?

চৌধুরী।। আপনি তো জানেন জ্যাঠামণি (*সুনীল ও ইরাকে দেখিয়ে*) এদের কাছে—

জ্যাঠামণি (*চৌধুরীকে থামিয়ে দিয়ে*)॥ ওদের বলতে দাও। সব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কথা বোলোনাতো।

হুররা॥ সম্ভবত একটা মানচিত্র কেড়ে নেবার জন্য ওরা আসবে।

জ্যাঠামণি॥ তা কাড়বার দরকার কি? সবই আপোসে হয়। আমি নিজে এদের অনুরোধ করেছিলাম। ওরা বললে সঙ্গে নেই।

হুররা॥ এদের সঙ্গে নেই।

চৌধুরী॥ অনুসন্ধান করে দেখেছি, এদের সঙ্গে নেই।

জ্যাঠামণি॥ নেই, সে-খবরটি আমিও পেয়েছি, বিশ্বাসও হয়েছে। তা এখন আর ভাবনা কি? আমিও তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। অহেতুক এদের কষ্ট দেওয়াটাই সার হল।

হুররা॥ কিন্তু জলদস্যু যে আসছে?

জ্যাঠামণি॥ (*উঠতে উঠতে*) ভয় নেই, আসবেনা—সে আমি ওদের বলে দেব।

গুগলু॥ কাদের বলবেন?

জ্যাঠামণি॥ ন্যাকা কেমন, দ্যাখ!

চৌধুরী॥ জলদস্যু আর আসবে না। জ্যাঠামণি বলে দেবেন।

জ্যাঠামণি॥ এতোদিন কি করলুম রে। দেশের সেবা মানে তো আর কেবল শাসন তোষণ নয়—সকলের উপর অধিকার রাখতে হবে। সে ডাকাতই হোক, আর দস্যুই হোক। (*মুঠি বাড়িয়ে*) এই মুঠিটাই সব—এর মধ্যে একটি সরষেও ধরে, একটি পৃথিবীও ধরে। সবই মুঠির কায়দা। চল, চলো—ওঘরে খাবার বোধহয় জুড়লো।

সুনীল॥ শুনুন, ম্যাপটা আমার কাছে আছে।

জ্যাঠামণি॥ (*ঘুরে দাঁড়িয়ে*) আছে! (*চৌধুরীকে*) সে কি? কি বলছে?

সুনীল॥ ঠিক বলছি, আমাদের কাছে আছে। (*ইরাকে*) বল, নেই আমাদের কাছে? বল?

ইরা॥ (*শান্ত। একটু থেমে*) আছে।

চৌধুরী॥ স্ট্রেঞ্জ। থাকবারতো কথা নয়।

জ্যাঠামণি॥ যদি থেকেই থাকে, সে খবরটা বিপজ্জনক।

চৌধুরী॥ আমাকে ওটি আদায় করতে হবে।

সুনীল॥ কিন্তু আমরা দেবনা।

চৌধুরী॥ দেবনা বললে তো হবে না, দিতে হবে।

জ্যাঠামণি॥ আসলে কি জান মা—ও জিনিশটি কাছে রাখতে নেই। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার কথাটি রাখ—ওর হাতে দিয়ে দাও।

সুনীল॥ অসম্ভব।

চৌধুরী॥ তাহলে মিঃ হুররা, আমি ওটি নিতে বাধ্য হব।

হুররা॥ আমার জাহাজে আমার যাত্রীদের দায়িত্ব আমার। আপনি আমার যাত্রীদের কোনও কিছু কেড়ে নিতে পারবেন না।

চৌধুরী॥ তাই না কি? তাহলে তো বিপদ ঠেকানো যাবে না।

[*বিপদসঙ্কেতের ঘণ্টা বেজে ওঠে। যুবকটি ঢোকে। চৌধুরীর মুখে রহস্যময় হাসি।*]

যুবক।। পাইরেটরা জাহাজে ঢুকে পড়েছে।

জ্যাঠমণি।। ঢুকে পড়েছে?

হুররা।। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হল ঢুকে পড়েছে।

গুগলু।। (*জ্যাঠামণির দিকে সোজা তাকিয়ে*) অনেকক্ষণ হল ঢুকে পড়ছে।

হুররা।। সব একদিকে চলে আসুন। একদিকে চলে আসুন। (*টেবিলের একদিকে জ্যাঠামণি আর চৌধুরী নিকটস্থ হয়, বাকি সব বিপরীত দিকে একজোট হয়। পরস্পর পরস্পরের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকে। বিপদসঙ্কেতের ঘণ্টাটা বাজতে থাকে। মঞ্চে ধীরে ধীরে লাল আলো তীব্র হতে তাকে। হঠাৎ হুররা লাফ দিয়ে টেবিলের উপর দাঁড়ায়*)

হুররা।। (*দুপক্ষের দিকে দু'হাত ছড়িয়ে*) এক মিনিট। (*দর্শকদের দিকে দেখিয়ে*) ওখান থেকে আমাদের এই মুহূর্তের ফটো তোলা হচ্ছে। কারণ নাটকের এটি চরম মুহূর্ত। দু'পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি—কেড়ে নেবার এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি এই দৃষ্টিপাত এবং এই বিপরীত দৃষ্টির মানুষ।

[*জ্যাঠামণি ধীরে ধীরে চৌধুরীর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ান। চৌধুরী তার রিভলবারটায় হাত দেয়। বাকি সকলে প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের একটা তীব্র ভঙ্গী আনে তাদের কম্পোজিশনে।*]

হুররা।। ঠিক আছে। ছবিটা তোলা হল।

গুগলু।। ক্যাপটেন হুররার নাটকের এটিই শেষ দৃশ্য নয়। পরবর্তী অংশে একটি যুদ্ধের দৃশ্য। সমস্ত দেশেই সেটি অভিনীত হচ্ছে। আপনারা তা দেখছেন। আমাদের অভিনয় করে আপাতত না দেখালেও চলবে। সে আমাদের ভিন্ন নাটক।

হুররা।। আমাদের প্রতিপক্ষ আপাতত জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। (*চৌধুরী এবং জ্যাঠামণি ক্রুদ্ধ চোখে চলে যায়।*) কিন্তু আমাদের ছাড়বে না। আমরাও জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে যাব। জাহাজটা সেই যুদ্ধ দৃশ্যেব ঠিক পাশে গিয়ে থামবে। ভাইস ক্যাপটেন গুগলু?

গুগলু।। ইয়েস ক্যাপটেন।

হুররা।। কম্পাসটা দ্যাখ। জাহাজ ছাড়ছি।

গুগলু।। ও, কে—স্টার্ট।

হুররা।। স্টার্ট!!

[*হুররা এবং গুগলু ছোট্ট ছেলেরা যেমন হাতটা কাত করে মুখের কাছে রেখে জাহাজের ভোঁ দেয় তেমনি শব্দ করে। ওদের সকলের মুখে খুশি ফুটে ওঠে। ওরাও ভোঁ দেয়। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।*]

রাজরক্ত

চরিত্র লিপি

প্রথম

দ্বিতীয়

ছেলেটি

মেয়েটি

কোরাস

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের মাঝ বরাবর একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে। প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুটি কালো উঁচু দেওয়াল। প্ল্যাটফর্মের পেছনে দেওয়াল দুটির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা পর্দা। দুটি দেওয়ালেরই উপরিভাগে একটি করে ছোট জানালা, যেমন জেলখানায় থাকে। বাঁদিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি লাল বোর্ড ঝুলছে, বোর্ডের মাথায় কয়েকটি হুক লাগানো। হুকগুলিতে ঝুলছে একটি সাদা কোট, গলার ফাঁস ও একটি পুলিশের টুপি। ডান দিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি লাল দরজা, দরজাব মাথায় একটি লালা আলো। মঞ্চেব একেবাবে সামনে বাঁদিকের কোণে একটি স্ট্যাণ্ডে লাগানো একটি গ্লোব। গ্লোবের সঙ্গে লাগানো একটি বিরাট কালো নোংরা হাত গ্লোবটার ঠিক ওপরে ঝুলে আছে, দেখে মনে হয় যেন পুরো গ্লোবটাকে মুঠোয় ধরতে চাইছ। গ্লোবের ঠিক ওপরে হাতের থাবাব নিচে একটা সাদা টেলিফোন রিসিভার। মঞ্চের আবও সামনে দু'কোণে দুটি লাল চেয়ার। চেয়ার দুটির সঙ্গে লাগানো অনেকগুলি শেকল ঝুলছে।

পর্দা উঠলে মঞ্চে তিনজন পুরুষ। প্রথম ব্যক্তি মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একটি বড় হলুদ ঝাড়ন দিয়ে চামড়ার চাবুক পালিশ করছে। পরনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, সাদা ধুতি, পায়ে সাদার ওপর জরির কাজ করা নাগরা। মঞ্চের ডানদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি আরেকটি ঝাড়ন দিয়ে একটি বন্দুক সাফ করছে। পরনে চক্‌রাবকরা শার্ট ও জিনস্। প্ল্যাটফর্মের সিঁড়িতে দু'হাতেব মধ্যে মুখ গুঁজে ঝুঁকে বসে আছে একটি ছেলে। পরনে গাঢ় লাল পাঞ্জাবী ও সাদা পায়জামা।]

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের পাঠশালায় অগ্নিসংযোগ।
প্রথম।। শান্তি সেনানীর প্রহরায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট।
প্রথম।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ক্ষেত-খামার জবর দখল।
প্রথম।। জবর দখল নিবারক জব্বর আইন চালু।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের দপ্তরে দপ্তরে কর্মবিরতি।
প্রথম।। রাজাসাহেবের বিদ্রোহী কর্মীদের ছাঁটাই।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের গ্রামে-গঞ্জে ঝাণ্ডা আর ঝাণ্ডা।
প্রথম।। সবার ওপরে রাজাসাহেবের ডাণ্ডা আর ঠাণ্ডাঘর।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজপথে ছুরি, বোমা।
প্রথম।। রাজাসাহেবের হাতে টিয়ার গ্যাস গুলি।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে রাজপুরুষ হত্যা।
প্রথম।। রাজাসাহেবের রাজ্যে নারীপুরুষ হত্যা।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্য আজ রক্তাক্ত।
প্রথম।। রাজাসাহেবের হাত আজ রক্তাক্ত।
দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে উত্তাল গণবিক্ষোভ।
প্রথম।। কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজাসাহেবের কমিশন নিয়োগ।
দ্বিতীয়।। কমিশনের চেয়ারম্যান রাজাসাহেব।

প্রথম।। প্রথম সদস্য রাজাসাহেব।

দ্বিতীয়।। দ্বিতীয় সদস্য রাজাসাহেব।

প্রথম।। রাজাসাহেব দীর্ঘজীবী হউন।

দ্বিতীয়।। জনতার দাবি, রাজাসাহেবের রক্ত চাই।

প্রথম।। রাজাসাহেব আজও জীবিত।

ছেলেটি।। না, রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও। রাজাসাহেবের রক্ষী আসবে। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আ-আ—! আমাকে ধরে নিয়ে যাবে!

দ্বিতীয়।। *(বন্দুকটা চেয়ারে রেখে)* আবার শুরু হল।

প্রথম।। শুরু হল।

দ্বিতীয়।। জুতোটা সরিয়ে রাখলে ভাল হত।

প্রথম।। রাজাসাহেবের কুঠিতে কিছু সরাবার হুকুম নেই।

দ্বিতীয়।। আজকে ওর চোখটা আরো লাল হয়েছে।

প্রথম।। রাজাসাহেব দেখলে দশ ঘা চাবুকের হুকুম করবে।

দ্বিতীয়।। আজও চোখের যত্ন নিতে শিখল না। আমার চোখ দুটো দেখ *(ওর কাছে এসে চোখ টেনে দেখায়)* সাদা—একটুও লাল নেই।

প্রথম।। আমার চোখ দুটো দেখ *(চোখ দেখায়)* সাদা, একটুও লাল নেই

[দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠে]

দ্বিতীয়।। দশ ঘা চাবুক খেলে চোখে জল আসবে—ধুয়ে মুছে চোখ ঠিক সাদা হয় যাবে।

প্রথম।। রাজাসাহেবের চাবুকটা বেশ বাহাদুর আছে।

দ্বিতীয়।। *(তারিফের ভঙ্গিতে)* যেন ভেল্কি জানে, বল?

প্রথম।। কী সুন্দর আওয়াজ—সপাং সপাং সপাং...

দ্বিতীয়।। তাছাড়া চামড়ার দাগগুলো কেমন মিলিয়ে যায়!

প্রথম।। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেল, রাজাসাহেব এক্ষুণি আসবে।

দ্বিতীয়।। যেখানটায় যা ছিল ঠিক তেমনি রেখেছি। রাজাসাহেব আজ বখশিস দেবে!

প্রথম।। রাজাসাহেব বখশিস দেবে!

[দুজনে শিশুর মত হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। ছেলেটি মাথা তোলে।]

ছেলেটি।। *(চেঁচিয়ে)* স্টপ্! স্টপ্!

[ওরা হাততালি থামায়]

(চেঁচিয়ে) স্টপ! স্টপ!

[ওরা ঘুরে তাকায়। ভয়ানক চুপ]

প্রথম।। আবার শুরু হল।

দ্বিতীয়।। আমি পারব না, আমি আজ আর এসব খেলায় থাকব না।

ছেলেটি।। *(একপাটি জুতো ছুঁড়ে ফেলে)* ঘরের সব এলোমেলো করে দেব। (*ওরা*

বাধা দেয়) আমাকে ধরবে না, আমি স্বাধীন। কার ভয়? রাজাসাহেবকে আমি মেরেছি। কার ভয়?

প্রথম॥ যেখানকার জিনিশ সেখানে রেখে দাও, রাজাসাহেব আসছে—ভীষণ রেগে যাবে।

দ্বিতীয়॥ চাবুক নয়, এবার বন্দুক—সেই বুলেট!

ছেলেটি॥ বুলেট! *(হেসে ওঠে)* কার বুলেট! ঐ ছুরিটায় কার রক্ত? *(প্রথম চাবুকটা তুলে রাখতে চায়)* হাত দেবে না, চাবুকটা ওখানে থাকবে। এখন থেকে আমার আইন!

প্রথম॥ রাজাসাহেবের নিজের হাতে সাজানো ঘর—কেউ এর কিছু বদলাতে পারে না—এ ঘরের বদল নেই।

ছেলেটি॥ এই বুড়োটাকে আমি মেরে ফেলব, রাজাসাহেবের কুকুর! কুত্তা!

দ্বিতীয়॥ সেই খেলা শুরু হল! *(বন্দুক তুলতে যায়)* এটা তুলে রাখি। রাজাসাহেব এসে পড়লে ভাল হবে না।

ছেলেটি॥ হাত দেবে না। *(ঝাঁপ দিয়ে গলা চেপে ধরে)* স্পাই! আমার সব খবর তুই রাজাসাহেবকে লাগাস। জানিনা আমি, বুঝতে পারিনা, না? *(ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়)* গা থেকে রাজাসাহেবের কুত্তাটার গন্ধ আসছে! *(চেঁচিয়ে)* আমার আদেশ—ঘরটা এলোমেলো করে দাও। সব ছড়িয়ে ছত্রাখান কর। ভাঙো, সব ভেঙে দাও। তারপর ঘরটা আমাদের মনের মত করে সাজাব, ছড়িয়ে দাও সব।

প্রথম॥ আদেশ নেই।

ছেলেটি॥ আমার আদেশ।

দ্বিতীয়॥ এ ঘর বদলানো যাবে না!

ছেলেটি॥ আমার হুকুম!

প্রথম॥ যেখানে যা আছে, ঠিক তেমনি থাকবে।

ছেলেটি॥ আমার হুকুম! *(ভীষণ চেঁচিয়ে বলবে)*

প্রথম॥ তুমি কে?

ছেলেটি॥ আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি। এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব। আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে...আমি কে? তোদেব কাটলে রক্ত অবধি পড়বে না, মাটি-চাটা কেঁচো! আমি কে! আমি রাজাসাহেবের ঘাতক।

দ্বিতীয়॥ *(প্রথমকে)* ঠিক কাল রাতের মত, আমি আজ আর এসব খেলায় নেই।

প্রথম॥ কিন্তু আর থামানো যাবে না—ও আরম্ভ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়॥ আমি পারব না, আর ভাল লাগে না।

প্রথম॥ কিন্তু ও আবম্ভ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়॥ কী ভয়ংকর খেলা!

প্রথম॥ ওর চোখ কালকের মত লাল। ও এক্ষুণি পাশের ঘর থেকে ওকে ডেকে পাঠাবে।

দ্বিতীয়॥ মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে আছে, আজকের খেলায় ওর আরো কষ্ট হবে। রোজ রোজ ও আর কত সইবে?

প্রথম।। ও ঠিক এক্ষুণি ডাকবে। কালকে ঠিক এরকম সময় ডেকেছিল।

দ্বিতীয়।। (*ছেলেটিকে, ক্ষিপ্তের মত*) এই যে, শোন—এসব খেলায় আমি নেই। রোজ রোজ আমি আর পারিনা, যদ্দিন পারি ঘরটা আগলে যাব—যেখানে যা আছে ঠিক তেমনটি রেখে যাব। (*ছেলেটি তাকায় ওর দিকে, দ্বিতীয় অস্বস্তিবোধ করে*) এই শেষ কথা, আমি চলে যাচ্ছি।

ছেলেটি।। কোথায়?

দ্বিতীয়।। কোথায় আবার? আমার কাজে—ঘরের সব ঘষে মেজে রাখতে হবে না?

ছেলেটি।। (*একটা কাল্পনিক ছুরি কোমর থেকে বের করে দেখায়*) এটা ঘষে মেজে মুছে রাখবে না?

দ্বিতীয়।। (*ভয় পেয়ে*) ওটা সরিয়ে ফেল, সরিয়ে ফেল বলছি!

প্রথম।। রাজাসাহেব দেখলে রক্ষে নেই। চাবুক নয়—এবার ঠিক বুলেট বের করবে।

ছেলেটি।। বুলেট! (*হেসে ওঠে*) বুলেট! রাজাসাহেব কোথায়? (*হাসে*) বুলেট? অ্যাঃ বুলেট!—টু লেট, ভাইসব, টু লেট।

দ্বিতীয়।। আজ কোন কাজ করনি, (*জুতোজোড়া নিয়ে ছেলেটির দিকে এগোয়*) জুতোটা একদম পালিশ করনি।

ছেলেটি।। (*ভয়ার্ত*) সরিয়ে ফেল, লুকিয়ে রাখো বলছি। আমি ওটা দেখতে চাই না। রাজাসাহেব নেই—মরা মানুষের জুতো! আমার ভয় করে।

দ্বিতীয়।। (*জুতো জোড়া দূর থেকে দোলাতে থাকে*) একদম পালিশ নেই। কতোদিন পালিশ করনি—ধুলো জমেছে!

ছেলেটি।। (*চোখ ঢেকে*) লুকিয়ে রাখো, লুকিয়ে রাখো। মরা মানুষের জুতো—আমার ভয় করে।

প্রথম।। সেই তুমিই খেলাটা শুরু করে দিলে (*বোর্ড থেকে নিয়ে একটা সাদা লম্বা গলাবন্ধ কোট পরে নেয়*) তুমিই খেলাটা শুরু করে দিলে।

দ্বিতীয়।। তুমি যে ড্রেসটাও পরে ফেললে! অ্যা—ড্রেসটাও পরে ফেললে! (*হেসে*) যা-তা নয়—রাজাসাহেবের ড্রেস, খেলাটাতে তোমার লোভও তো কম দেখছি না। ঠিক রাজাসাহেবের মত দেখাচ্ছে।

প্রথম।। এক্ষুণি ও মেয়েটাকে ডাকবে।

দ্বিতীয়।। তা হলে সত্যি সত্যি খেলাটা আরম্ভ হল।

প্রথম।। না খেলে আমাদের উপায় নেই।

দ্বিতীয়।। মরে গেলে বেঁচে যেতুম।

প্রথম।। স্টার্ট!

দ্বিতীয়।। স্টার্ট!

প্রথম।। (*ছেলেটিকে দেখিয়ে*) ও ছুরিটা কোমরে লুকিয়ে রাখবে, মুখটা শান্ত। সুযোগ পেলেই রাজাসাহেবের পেছন দিক থেকে ছুরিটা তুলেই—ব্যস।

দ্বিতীয়।। ঠিক আছে। চমৎকার। দারুণ করেছে, তাই না? এবারে শুরু করা যাক। সব রেডি?

প্রথম।। মেয়েটি?

দ্বিতীয়॥ ও রেডি আছে। (*চেঁচিয়ে*) রেডি?

| *বাইরে থেকে একটি মেয়ের গলা—'রে—ডি'* |

প্রথম॥ স্টার্ট! ' *বেরিয়ে যায়*

দ্বিতীয়॥ স্টার্ট!

| *একটি বিচিত্র শব্দতরঙ্গ ধ্বনিত হল। লাল দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলছে-নিভছে। তার মধ্যেই রাজাসাহেবের পোশাকে প্রথম প্রবেশ করে। এবারে তার মাথায় জমকালো টুপি, কোটের বাটনহোলে রক্তগোলাপ। ঢুকেই দ্রুত টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। রিসিভার নামিয়ে রেখে ওদের দুজনের দিকে তাকায়। শব্দ ও ধ্বনি থেমে যায়। ইতিমধ্যে ছেলেটি মাটিতে বসে জুতোটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালিশ করতে শুরু করেছে। জোরে জোরে ঘষছে।* |

প্রথম॥ কেমন চলছে সব?

দ্বিতীয়॥ আপনার আশীর্বাদে ভালই চলছে।

প্রথম॥ ওতো এখনও পালিশে এক্সপার্ট হয়নি। ব্যাপারটা বপ্ত হয়ে গেলে অত গায়ের জোর লাগেনা—কাজের তালে তালে একটু দুললেই ঝকঝকে হয়ে যায় (*ছেলেটিকে*) এই যে, ইউ স্ট্যাণ্ড আপ।

| *ছেলেটি নিলডাউন হয়ে থাকে। দু'হাতে দু'খানা বৃহৎ জুতো* |

না, একবারে বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি—দাঁড়ানোটা শিখেছে। বড় ভাল দেখাচ্ছে তো!

দ্বিতীয়॥ কিছুদিন থাকলে আরো স্মার্ট দেখাবে। আমাদের মত তো আর নয়—এসব ব্যাপারে বেশ বডি ফিট থাকা চাই তো?

প্রথম॥ তুমি কি ওর পক্ষ হয়ে কথা বলছ?

দ্বিতীয়॥ (*ভয় পেয়ে*) না স্যার!

প্রথম॥ (*ছেলেটিকে*) কাজ-কর্ম কেমন লাগছে?

ছেলেটি॥ আপনার আশীর্বাদে ভাল লাগছে স্যার।

প্রথম॥ বন্দুকটা এখানে কেন?

দ্বিতীয়॥ ওঃ তুলে রাখছি, স্যার।

| *বন্দুকটা নিয়ে বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে। রাজাসাহেব মানে প্রথম এবার পা দিয়ে জুতোটা দেখায়* |

ছেলেটি॥ ও! জুতোটা—(*জুতো জোড়াটা নিয়ে বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে*)

প্রথম॥ (*দ্বিতীয়কে*) যেখানকার যা, ঠিক সেখানে সব আছে?

দ্বিতীয়॥ হ্যাঁ স্যার, এবার সব ঠিক আছে!

প্রথম॥ (*নির্লিপ্তভাবে*) এসব ভুল হচ্ছে কেন? কার ভুল?

দ্বিতীয়॥ (*গুছোতে গুছোতে*) আপনি এসে পড়েছেন, তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারিনি স্যার।

প্রথম॥ আমি আসার অনেক আগে থেকেই আমার পায়ের শব্দ শুনতে পাও না?

ছেলেটি॥ বাইরে গোলমাল হচ্ছিল, ঠিক শুনতে পাইনি, স্যার।

প্রথম॥ ওতো সব সময়ই হচ্ছে—তাই বলে ঐ গোলমালটাই বা বেশি করে কানে

যাবে কেন? পৃথিবীটা ভীষণ শব্দ করে ঘুরছে, তাই বলে নিজের পথটাতে ভুল হচ্ছে না। পৃথিবীর কাছে অনেক শেখার আছে।

দ্বিতীয়।। ওরা একটা ঢিল ছুঁড়েছিল হুজুর। একখানা কাচ ফেটে গেছে!

প্রথম।। পৃথিবীর বয়স কত হল?

ছেলেটি।। অনেক বছর হুজুর।

প্রথম।। সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে—দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচাবা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ কর—সব ঠিক হয়ে যাবে। (*ছেলেটিকে*) ও কী, এদিকে এস তো, চোখটা যেন একটু লাল দেখাচ্ছে। কী হয়েছে? (*ছেলেটি দু'হাতে চোখ মুছতে থাকে। প্রথম দ্বিতীয়কে বলে*) দেখ তো কাঁদছে কি না?

দ্বিতীয়।। কাঁদছ?

[*ছেলেটি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়*]

প্রথম।। বাঃ, চমৎকার। হবে, তোমার হবে। এবার বল, তুমি সুখী?

' *ছেলেটি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়*

স্বীকারোক্তি শব্দ করে বলতে হয়, স্বীকার করছ, তুমি সুখী?

ছেলেটি।। হ্যাঁ, সুখী।

প্রথম।। স্বীকার করছ যে তুমি সুখী?

ছেলেটি।। মনে নেই, হুজুর।

প্রথম।। মনে করার চেষ্টা কর।

ছেলেটি।। মনে পড়ছে না, স্যার।

প্রথম।। (*ধমক দিয়ে*) স্বীকার কর—তুমি সুখী।

ছেলেটি।। আমি সুখী।

প্রথম।। স্বীকার করে এবার বেশ ভাল লাগছে না?

ছেলেটি।। বুঝতে পারছি না, হুজুর।

প্রথম।। স্বীকার কর।

ছেলেটি।। স্বীকার করছি। বেশ ভাল লাগছে!

প্রথম।। চমৎকার। (*দ্বিতীয়কে*) তুমি কী ভাবছ?

দ্বিতীয়।। স্বীকার করছি, আমি সুখী!

প্রথম।। তা হলে ভালই আছ, শান্তি পেলাম। আচ্ছা বল তো—

দুজনেই।। স্বীকার করছি,আমি সুখী।

প্রথম।। বলছিলাম, তোমরা যদি—

দুজনেই।। স্বীকার করছি, আমি সুখী!

প্রথম।। আরে, আমি কী বলতে চাই আগে শোন, বলছিলাম—

দুজনেই।। স্বীকার করছি, আমি সুখী।

প্রথম।। সাবাস! জিতে রহো বেটে! একেবারে তৈরী! জিতে রহো!

[*একটি মেয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ে। মেয়েটিব পরণে কাঁচা হলুদ রঙের ব্লাউজ, সবুজ শাড়ি, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা দুটি বিনুনি ঝুলছে। সকলে ওর দিকে তাকায়*]

মেয়েটি ।। (*সন্ত্রস্ত*) রাজাসাহেব!

প্রথম।। কী হল?

মেয়েটি ।। ঢিল পড়ছে। ঘরে ঢিল পড়ছে। বাইরে থেকে ওরা ছুঁড়ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

প্রথম।। তাই নাকি? ছড়াটা বল তো? বল, ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল, সকলে মিলে বল।

মেয়েটি ।। (*প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে*) বুলেট বন্দনা—রাজাসাহেব বিরচিত।

দ্বিতীয়।। (*প্ল্যাটফর্মের নিচে ডানদিকে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গীতে*) ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি ।। যে কোন অশান্তির একমাত্র মহৌষধ।

ছেলেটি।। একবার মাত্র ব্যবহারেই কাজ হয়।

দ্বিতীয়।। ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি ।। যে কোন অশান্তির চিরস্থায়ী আরাম।

ছেলেটি ।। অত্যন্ত সস্তা, অথচ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয়।। (*কোমব দুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে*) জানটি আপনার গেল কোথায়, একি তাজ্জব বাত, রাজাসাহেবের বুলেটে হয়েছেন কাৎ।

মেয়েটি ।। আঃ বুলেট!

ছেলেটি ।। আঃ বুলেট! (*বুকে হাত দেয়*)

মেয়েটি ।। ট্রেডমার্ক লক্ষ করিবেন, টুং টাং! (*রেডিও কমার্শিয়াল*)

প্রথম।। সাধু! সাধু! (*মেয়েটির হাত ধরে নিচে নামিয়ে আনে*) মিষ্টি মেয়ে! লক্ষ্মী মেয়ে! এস, আমার কাছটিতে এসে দাঁড়াও। (*দ্বিতীয়কে*) কি হে রাস্তার লোকগুলো ছড়াটা শুনেছে?

দ্বিতীয়।। ঠিক শুনতে পেয়েছে। পাবে না মানে! কি ছড়া?

ছেলেটি ।। অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়।। একেবারে রেঞ্জের বাইরে।

প্রথম।। দৃষ্টির বাইরে তাহলে এখনও যায়নি?

ছেলেটি ।। না, হুজুর।

প্রথম।। যাবে, তাও যাবে—একে বলে শব্দব্রহ্ম! (*মেয়েটির হাত ধরে*) তাই না মামণি! আঙুলগুলো দেখছি বেশ তুলতুলে।

' *ছেলেটি প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। এবার লাফিয়ে নিচে নামে।*

ছেলেটি ।। ঢিল ছুঁড়ছে, ওরা ঢিল ছুঁড়ছে।

' *দ্বিতীয় এবার বোর্ড থেকে দ্রুত একটা পুলিশি টুপি মাথায় পরে নিয়ে দৌড়ে এসে রাজাসাহবকে স্যালুট করে।*

প্রথম।। বাইরে কি হচ্ছে? প্রশাসন বলতে যে আর কিছুই রাখলে না।

দ্বিতীয়।। ওদের এক্ষুণি থামিয়ে দিচ্ছি, স্যার।

প্রথম।। এতো ঢিল পাচ্ছে কোথায়?

দ্বিতীয়।। ওগুলো সব ঢিল নয়, স্যার।

প্রথম।। সে তোমাকে বোঝাতে হবে না, ওগুলোকে ঢিল ভাবতে শেখ। বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততোই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল। ওরা কী ছুঁড়ছে?

দ্বিতীয়।। স্রেফ হালকা ঢিল ছুঁড়ছে স্যার।

প্রথম।। কী ছুঁড়ছে?

দ্বিতীয়।। ঢিল ছুঁড়ছে।

প্রথম।। কী ছুঁড়ছে?

দ্বিতীয়।। ঢিল ছুঁডছে।

[*এই পৌনঃপুনিক প্রশ্নোত্তরের মাঝে প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের সামনের অংশটির পাটাতন তুলে দিলে সেটি প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা বোর্ডের মত খাড়া হয়ে থাকে। বোর্ডটির রং কালো— ঠিক ব্ল্যাকবোর্ডের মতই। তাতে খড়ি দিয়ে লেখা আছে* $(a+b)^2$ *= আমরা সুখী। প্রঃ চাঁদ কতো দূরে? উ: আমরা সুখী প্রঃ প্রধানমন্ত্রী কে? উঃ আমরা সুখী প্রথম ইতিমধ্যে তার কোট ও টুপি খুলে প্ল্যাটফর্মের ভেতরে রেখে দেয়। প্ল্যাটফর্মের ভেতর থেকে একটা নিকেল ফ্রেমের চশমা চোখে দেয় ও একটা চাদর তুলে নিয়ে প্রথম গলায় পরে নেয়। প্রশ্নোত্তরের শেষদিকে তার গলার স্বর ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকে।*]

প্রথম।। বাঃ, এইতো ঠিক হচ্ছে। সাতবার বল—ঠিক মুখস্থ হয়ে যাবে। বল, লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। কথাটা মনে রাখবে। বল—বল—

দ্বিতীয়।। (*তালে তালে*) ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁডছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে।

প্রথম।। বেশ বলেছ, কিন্তু কী বলনি বলতো? (*মেয়েটিকে*) তুমি বল, ওর কী বাদ পড়েছে?

[*মেয়েটি মাথা চুলকোয়, ভাবে*]

কিচ্ছু পড়াশুনো করছ না! (*ছেলেটিকে*) ইউ! ও কী বলতে ভুলে গেছে?

[*ছেলেটি ভাবে, কিন্তু বলতে পারে না*]

সব এক, কী করে যে সব পাশ করবে!

দ্বিতীয়।। মনে পড়েছে স্যার—আমি শুধু ঢিল ছুঁড়ছে বলেছি, তার সঙ্গে স্যার শব্দটা যোগ করিনি। আমার না স্যার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো না কিরকম গণ্ডগোল হয়ে যায়, স্যার।

প্রথম।। যাক তবু ভাল, মনে পড়েছে তাহলে। এবার সাতবার 'স্যার' বলতো—সুর করে, ওতে মনে থাকে।

দ্বিতীয়।। (*সা-রে-গা-মা- সাধার মত সুর তুলে*) স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার,

স্যার। (*এবার সা-নি-ধা-পা-র মত স্বর নামিয়ে*) স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার। স্যার-স্যার-স্যার—

প্রথম॥ বাঃ সুন্দর। সুন্দর মুখস্থ হয়েছে, যাও এবার বসে বসে একটু রপ্ত করে নাও। আর হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী ও মা লক্ষ্মী!

মেয়েটি॥ বলুন।

প্রথম॥ ওকে তোমার ঐ ছড়াটার একটা ট্রু কপি দিয়ে দেবে তো, বসে বসে মুখস্থ করবে। পুরো মুখস্থ করবে—একটা পাংচুয়েশনের ভুল হলেই কিন্তু নম্বর কাটা যাবে। ফুল মার্কস পাওয়া চাই। তোমার ওপর আমার ইনসটিটিউশনের অনেক ভরসা।

[*দ্বিতীয়জনের চিবুক ছুঁয়ে প্রথম নিজের আঙুলে চুমু খায়। তারপর কী ভেবে আঙুলের গন্ধ শোঁকে*]

প্রথম॥ মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি চিবুকে। আতর মেখেছ নাকি?

দ্বিতীয়॥ (*লাজুক*) না, স্যার। আঙুরের রস স্যার।

প্রথম॥ মালের গন্ধ বল। একেবারে চিবুক ভিজিয়ে টেনেছ। সোনা ছেলে! তা বাছা, দামী আঙুর মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, রুচিটাকে উন্নত রাখবে, তবেই না রেজাল্ট ভাল হবে। চিবুকের গন্ধটি বড় ভাল করেছ হে—মনখানি একেবারে উদাস করে দিয়ে যাচ্ছ হে। আ-হা-হা—

দ্বিতীয়॥ (*প্রথম-এর পায়ের ধুলো নিয়ে*) একদিন আপনার বাড়ি যাব স্যার।

প্রথম॥ এস, নিশ্চয়ই আসবে। তবে একা এস। সকলের সামনে তো সব কথা হয় না। এস। (ছেলেটিকে) দেখলে তো ছেলেটিকে, আদর্শ ছেলে, পড়াশুনো ছাড়া কিছু জানে না। (*ছেলেটিকে*) পড়াশুনো কী রকম হচ্ছে?

ছেলেটি॥ চালিয়ে যাচ্ছি, স্যার।

প্রথম॥ (*মেয়েটিকে*) তুমি?

মেয়েটি॥ পড়ছি তো দিনরাত—সব মনে থাকে না।

প্রথম॥ আসলে পড়াশুনোটা কী জান—এক ধরণের অ্যাসেসমেন্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পার—আপনি কী শেখাচ্ছেন? উত্তর হল, আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেউ একটা কিছু শিখেছিল—তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন। বুঝেছ?

ছেলেটি॥ হ্যাঁ, স্যার।—এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ লাইফ।

প্রথম॥ আহা ঐ তো ফের ভুল করলে। (*ছেলেটিকে থাপ্পড় মারে*) এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এডুকেশন—যার মানে হচ্ছে রিপিটিশন অফ রিপিটিশন। অর্থাৎ একটা জিনিশই মকসো করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। বুঝলে কিছু?

মেয়েটি॥ এবার বুঝেছি, স্যার।

প্রথম॥ বেশ জল হয়ে গেছে, তাই না?

মেয়েটি॥ স্যার, আমাদের রেজাল্ট কবে বেরুবে?

প্রথম॥ বেরুবে, বেরুবে। শীগগিরই বেরুবে। লিখেছ তো অনেক, অনেক পাতা নিয়েছ দেখলাম। ভাল স্পিড আছে হাতে।

মেয়েটি॥ আমার স্যার, তিন নম্বরের কোশ্চেনটা ঠিক মুখস্থের মধ্যে ছিল না বলে—

প্রথম॥ হ্যাঁ দেখেছি। মুখস্থটি ভাল করে কর—তোমার ডিফেক্টটা আবার ঐখানেই—মাঝে মাঝে ওরিজিনাল লিখতে চাও। ওরিজিনালই যদি লিখবে তবে আমি কী শেখালুম, আর আমার বইপত্তরগুলোই বা কেন?

দ্বিতীয়॥ আমি না স্যার, ওরিজিনাল আর মুখস্থ দুটোই অ্যাভয়েড করি স্যার।

প্রথম॥ রাইট। বুদ্ধিমান ছেলেরা চিরকাল তাই করে। যদ্দুর মনে পড়ছে, তুমিই বোধ হয় হাইয়েস্ট নম্বর পেয়েছ।

[*দ্বিতীয় পুলকিত। মেয়েটি বিষণ্ন মুখে মাথা নিচু করে*]

দ্বিতীয়॥ ওকী মা লক্ষ্মী, মুখখানা কালো করলে কেন মা? এস, কাছে এস। (*মেয়েটি এসে সিঁড়িতে বসে। প্রথম তার পিঠে হাত বোলায়*) তুমি পারবে—প্রোগ্রেস করছ, রীতিমত প্রোগ্রেস করছ। (*মেয়েটি অস্বস্তি বোধ করে*) তবে হ্যাঁ, মোটে দুষ্টুমি করবে না। যত বাধ্য থাকবে, দেখবে তত উন্নতি হচ্ছে। দেশ থেকে এই গুণটিই তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে কি না। (*এবার মেয়েটির গলার কাছে হাত বোলায়। মেয়েটির অস্বস্তি আরো বাড়ে*) মা লক্ষ্মী! (*ঘন আবেগে*) লক্ষ্মীটি!

মেয়েটি॥ (*ভয়ার্ত*) বলুন।

[*ছেলেটি ওদের দেখে। মুখ ক্রুদ্ধ হয়।*]

প্রথম॥ লক্ষ্মীটি! গলাখানি যে খালি—ফাঁকা গলা কি তোমাকে মানায়?

মেয়েটি॥ (*ছাড়াবার চেষ্টা করে*) আমি যাব!

প্রথম॥ যাবে, যাবে। তার আগে শুনতে পাচ্ছ?

মেয়েটি॥ কী শুনব?

প্রথম॥ শুনতে পাচ্ছ?

মেয়েটি॥ কী শুনব?

[*আবার এই পুনঃপৌনিক প্রশ্নোত্তরের মাঝে প্রথম তার চাদর ও চশমা খুলে প্ল্যাটফর্মের ভেতরে রেখে দেয়। তারপর দ্বিতীয়-এর সহায়তায় বোর্ডটা ফেলে প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। আবার সেই রাজসাহেবের কণ্ঠস্বরও ফিরে আসে।*]

প্রথম॥ যা বলছি।

মেয়েটি॥ কী বলছেন? বলবেন তো!

প্রথম॥ শুনতে পাচ্ছ না? আমার আঙুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে—আঙুলগুলোও কথা বলে। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছ না? আঙুলগুলো ফিস ফিস্ কর কী বলছে?

মেয়েটি॥ আ...: ছেড়ে দিন!

[*ছেলেটি কাল্পনিক ছুরিটা কোমর থেকে বের করে রাজাসাহবের অজ্ঞাতে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজিত।*]

প্রথম॥ ভয় করছে! আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কোমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করে দিতেও জানে।

মেয়েটি ॥ (*প্রায় কান্না*) ছাড়ুন! ছাড়ুন!

[*ছেলেটি ছুরিটা তোলে। তীব্র যান্ত্রিক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যায়। দরজার মাথায় লাল সংকেত জ্বলতে-নিভতে থাকে। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি। এই ধ্বনি ও সঙ্গীতের সাথে বহু মানুষের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠও যেন শোনা যায়। খানিক বাদেই আলো ফিরে আসে। দেখা যায় ছেলেটি এক কোণে চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে। অন্য চেয়ারে প্রথম এবং সিঁড়িতে মেয়েটি বসে। দ্বিতীয় পায়চারী করছে।—মাথায় পুলিশী টুপি নেই। সেটা বোর্ডে শোভা পাচ্ছে।*]

প্রথম ॥ (*হাসতে হাসতে*) কী হে? কোমরের ছুরিটা যে কোমরেই রয়ে গেল। রক্ত! রক্ত! রাজাসাহেবের রক্ত! কোনও কম্মের না। রাজাসাহেবের রক্ত না তোমার মুণ্ডু!

দ্বিতীয় ॥ নাও, নাও। কাজে লেগে যাও! রাজাসাহেব এসে পড়লে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

মেয়েটি ॥ (*গানের সুরে*) বুলেট! বুলেট! বুলেট!

ছেলেটি ॥ (*ক্রুদ্ধ*) চুপ কর বলছি, চুপ কর!

মেয়েটি ॥ তাই নাকি?

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ তাই।

মেয়েটি ॥ তাই, তাই, তাই—মামার বাড়ি যাই।

প্রথম ॥ মামা দিল দুধ ভাত।

দ্বিতীয় ॥ দুয়ারে বসে খাই।

মেয়েটি ॥ তাই, তাই, তাই।

ছেলেটি ॥ ফের এসব বললে আমি কিন্তু ঠিক গলা টিপে ধরব। আমাকে জ্বালাবে না বলছি।

মেয়েটি ॥ (*আদুরে গলায়*) গলা টিপে ধরবে? ধর নাগো, (*এগিয়ে এসে ওর পিঠে নিজের পিঠ হেলান দিয়ে*) তুমি আমাকে আজকাল একটুও ধর না!

ছেলেটি ॥ সরে যাও বলছি! ভাল লাগে না, সরে যাও।

মেয়েটি ॥ (*আদুরে ভঙ্গীতে*) যাব না, কী করবে? আমার সঙ্গে একটু ভাল করে কথা বল না! (*এবারে প্রথম-এর চিবুকটা টেনে*) বোবাটা কথা বলে না, বুনোটা কথা বলে না। আদর করে না—বুনোটা, বোবাটা! বুনোটা, বোবাটা! (*অন্যদের দিকে তাকিয়ে*) কথা বলছে না!

প্রথম ॥ (*ছেলেটিকে*) চুপ করে আছ কেন? এ সময় তোমার কথা আছে।

দ্বিতীয় ॥ অনেক ডায়ালগ।

প্রথম ॥ খেলাটা ভুলে যাচ্ছ নাকি?

দ্বিতীয় ॥ এই, কথা বল। নইলে কিন্তু আমরাও খেলব না—বয়ে গেছে আমাদের!

প্রথম ॥ স্টার্ট ডায়লগ!

দ্বিতীয় ॥ এই! ডায়ালগ! স্টার্ট ইওর ডায়ালগ! কথা বল!

প্রথম ॥ স্টার্ট!

মেয়েটি ॥ এরকম করলে কিন্তু আমি খেলব না। আমি একা সব বলে যাব নাকি!

দ্বিতীয়॥ এক্ষুণি বলবে, এক্ষুণি বলবে।

প্রথম॥ কথা বল না বাপু! সমাধিস্থ হয়ে গেলে নাকি!

মেয়েটি॥ (*হাসি মুখে*) আসলে আমার না ওর কাঁধে মুখটা ঘষে ঘষে এরকম বলে যেতে এখন খুব খারাপ লাগে না, শত হলেও ও পুরুষ আর আমি মেয়ে—কী যেন একটা হয়!

দ্বিতীয়॥ এই, চুপ! চুপ! আরে, এও তো দেখছি উল্টোপাল্টা ডায়ালগ বলতে শুরু করে দিয়েছে।

মেয়েটি॥ সত্যি হয়! আসলে ও না আরামে বোধহয় বুঁদ হয়ে আছে—তাই কথা বলছে না!

ছেলেটি॥ (*চেঁচিয়ে*) ধ্যাৎ! (*মেয়েটির কাছ থেকে সরে এসে*) কে বার বার আসতে বলে তোমাকে আমার কাছে?

মেয়েটি॥ (*সতেজ গলায়*) কী বলছ তুমি?

| *প্রথম ও দ্বিতীয় যেন খেলা আরম্ভ হল এরকম ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে চলে যায়।* |

ছেলেটি॥ কী বলছি? ভুল বলছি না।

মেয়েটি॥ তুমি আমাকে আসতে বলনি?

ছেলেটি॥ এই পৃথিবীটাতে তোমাকে আমি আসতে বলিনি।

মেয়েটি॥ বড় বড় কথা রাখো, যেন তোমাকেই আমি পৃথিবীতে আসতে বলেছি!

ছেলেটি॥ তাহলে আমরা কেউ কাউকে ডাকিনি।

মেয়েটি॥ ডাকিনি বেশ করেছি। তবু আমরা মিশব, দেখা করব, ভালবাসব—যা খুশি তাই করব। দেখ, ও সব ফিলজফি রাখো—অনেক শুনেছি। তুমি চাওনি তবু জন্মালে! তুমি চাওনি তবু মরতে হবে! এসব নিয়ে কচকচি ছেড়ে—আমরা আছি, অনেকদিন বাঁচব, চেষ্টা করে সুন্দর করে বাঁচব—এটা অনেক বড় সত্য বুঝলে?

ছেলেটি॥ সুন্দর করে বাঁচব! কে দিচ্ছে বাঁচতে?

মেয়েটি॥ কে দিচ্ছে না?

ছেলেটি॥ কে দিচ্ছে না তুমিও জান, আমিও জানি—ন্যাকা সেজে থেকো না।

মেয়েটি॥ তোমাকে হাজারবার বলেছি 'ন্যাকা' কথাটা বলবে না, কথাবার্তায় একটু রুচি রাখতে তো পয়সা লাগে না।

ছেলেটি॥ অনেক দিন পয়সা না থাকলে রুচিও থাকে না!

মেয়েটি॥ পয়সা আমারও নেই।

ছেলেটি॥ তোমারও কোথাও না কোথাও রুচি নষ্ট হয়েছে।

মেয়েটি॥ তুমি সিরিয়াসলি বিশ্বাস করে কথাটা বললে?

ছেলেটি॥ তুমি এমন কী দুনিয়া-ছাড়া হলে যে বলব না?

মেয়েটি॥ প্রমাণ করতে পারবে?

ছেলেটি॥ পারব, কিন্তু ওসব থাক।

মেয়েটি॥ না, থাকবে না।

ছেলেটি॥ তাহলে আমি বলব না।

মেয়েটি ॥ তোমাকে বলতে হবে।

ছেলেটি ॥ হবে? কেন?

মেয়েটি ॥ কতকগুলো কথা আছে যা আরম্ভ করলে শেষ না করাটই অভদ্রতা। আমি কী এমন রুচিহীন কাজ করেছি তোমাকে বলতে হবে।

ছেলেটি ॥ তুমি রাজাসাহেবকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে।

মেয়েটি ॥ তুমি হওনি?

ছেলেটি ॥ হয়েছিলাম—কিন্তু তার পাশাপাশি আর একটা ইচ্ছে ছিল, আর একটা সংকল্প জেগে উঠেছিল। তোমার মত ওর কাছে বিলিয়ে দিইনি।

[*মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ওঠে।*]

হাসছ যে! ওরকম হাসবে না বলছি!

মেয়েটি ॥ বিলিয়ে দাওনি, না! আজ কয়েক বছর ধরে কোত্থেকে একটা ছুরি উঁচিয়ে ধরে তুমি ওকে মারতে চাইছ। কিন্তু কোনদিন কি লক্ষ করে দেখেছ তোমার ছুরিটায় একটুও ধার আছে কি না বা ওটা খেলনার ছুরি কিনা যাচাই করে দেখেছ? তুমি ছাড়া —কে দেখেছে—তোমার ছুরি? কে ভয় পেয়েছে তোমাকে? রাজাসাহেবের এতো বড় রাজ্যে তোমার একটা ছুরির দাম কী?

ছেলেটি ॥ (*অসহায়*) কিন্তু তুমি তো দেখেছ, আমার হাতে ছুরি ছিল।

মেয়েটি ॥ আমার দেখাই তো আর সব নয়।

ছেলেটি ॥ তুমি বল, ভীষণ ধারালো না? বল!

মেয়েটি ॥ জানি না।

ছেলেটি ॥ দেখো, আমি রাজাসাহেবকে ঠিক মেরে ফেলব। একদিন ঠিক পারব।

মেয়েটি ॥ রাজাসাহেবকে তুমি চেনো না।

ছেলেটি ॥ চিনি না? যাকে আমি মারতে চাই, আঘাত করতে চাই, শোধ নিতে চাই, যার ওপর আমার জন্ম থেকে রাগ—তাকে চিনি না।

মেয়েটি ॥ কী করেছে তোমার রাজাসাহেব?

ছেলেটি ॥ যে আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সব কটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জান, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না!

মেয়েটি ॥ তুমি রাজাসাহেবের পুরস্কার পাবে।

ছেলেটি ॥ ঠাট্টা করছ?

মেয়েটি ॥ ঠাট্টা কেন? এদেশে তোমার মত এতো সুন্দর করে কেউ কাঁদতে পারে না। রাজাসাহেব, যে ভাল কাঁদে প্রত্যেক বছর তাকে পুরস্কার দেয়।

ছেলেটি ॥ তুমি আমার দিকে তাকাও—সত্যি সত্যি কি আমি কাঁদছি? রাগে আমার চোখ লাল হয়ে উঠছে না?

মেয়েটি ॥ চোখ লাল হলেই রাজাসাহেবের চাবুক—মনে আছে?

ছেলেটি ॥ আমিও চাবুক বানাব!

মেয়েটি ॥ বানাবে!—মারতে পারবে? ওসব থাক। অনেক্ষণ বকেছ, অনেকটা কেঁদেছ, অনেকটা রেগেছ—তোমার আজকের রুটিনে যতটা ছিল সব মিটে গেছে। এবার চল।

ছেলেটি।। অত ঠাট্টা না করে যদি খানিকটা সহানুভূতি অন্তত তোমার থাকত।

মেয়েটি।। সহানুভূতি নেই, না? শেষ অবধি কে আছে তোমার সঙ্গে? রাজাসাহেবের ওখান থেকে কে তোমাকে চলে আসতে বলল? কার কথায় তুমি চলে এলে?

ছেলেটি।। আসলে আমি এতো রেগে আছি—তাই ভুল বলি, ভুল করি। জান, রাজাসাহেবের ওখান থেকে চলে এসেও মনে হচ্ছে যেন ওর ছায়াটা আমাদের ছাড়েনি। আমাদের খুঁজছে—যেন ওর হাত থেকে কোনও কালে মুক্তি নেই।

মেয়েটি।। আমরা রাজাসাহেবের কাছ থেকে আরও দূরে চল যাব— ও আমাদের খুঁজেই পাবে না।

ছেলেটি।। রাজাসাহেব ঠিক খুঁজে পায়।

[*একটা গাড়ীর হর্ন শোনা যায়।*]

মেয়েটি।। রাজাসাহেবের মোটরের শব্দ না?

ছেলেটি।। কী আশ্চর্য। দেখলে? ঠিক খুঁজে খুঁজে এসেছে। এবার আমিও ছাড়ব না। যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই—তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই ভাল।

মেয়েটি।। দাঁড়াও, কে দেখি আগে। (*প্ল্যাটফর্মে উঠে বাইরে তাকায়*) মোটর থেকে নামছে। না গো, রাজাসাহেবের মত দেখতে তো নয়।

ছেলেটি।। ভাল করে দেখেছ?

মেয়েটি।। হ্যাঁ, রাজাসাহেব নয়, বুঝলে! তবে বেশ বড়লোক! ঝকমকে পোশাক —সঙ্গে আর একটা লোক—এদিকে আসছে।

ছেলেটি।। রাজাসাহেবকে দেখলেই কি চেনা যায়? লোকটা অসংখ্য ছদ্মবেশে ঘোরে। চল, আমার লুকিয়ে থাকি। পরে আসা যাবে। লোকটা এখানে কী চায় আগে দেখা যাক।

[*ওরা দুজন মঞ্চের দু'কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার মনোহারি যন্ত্রসঙ্গীতের ছন্দে তালে তালে পা ফেলে প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চে প্রবেশ করে। প্রথম-এর অভিজাত মূল্যবান পোশাক। একটা বাইনোকুলাব চোখে। পেছনে দ্বিতীয় ঘুঙুর পায়ে ফেরিওয়ালার সস্তা রঙচঙে পোশাকে হরেক চিজ্ নিয়ে উপস্থিত। তাব মধ্যে একটি ললিপপ, একটি শূন্য বোতল ও তিনটি মোমবাতির একটা সেট।*]

প্রথম।। রুস্তম।

দ্বিতীয়।। হুজুর।

প্রথম।। বাজ্যটা তাহলে আর একটু বাড়ল?

দ্বিতীয়।। তা বাড়ল হুজুর।

প্রথম।। একটু একটু করে বাড়াতে বড় সময় লাগে, তাই না? তা হোক, ধৈর্যই সিদ্ধির পথ। (*বাইনোকুলার চোখে দিয়ে*) দূরে দুটো মানুষকে যেন দেখেছিলাম। হ্যাঁ, ঐ তো —মানুষ—মানুষই তো মনে হচ্ছে। (*দ্বিতীয় ললিপপ্ বাড়িয়ে ধরে মুখে চুক চুক শব্দ করে*) এই যে, এদিকে এস না! বড় মিষ্টি খেতে। যত চুষবে, মুখে বস ভরে উঠবে। (*কিন্তু ছেলেটি ও মেয়েটি চুপচাপ। প্রথম ওদের লক্ষ করতে থাকে*) কী রকম মানুষ এগুলো রুস্তম, আসছে না তো। ছড়াটা বলতো—

দ্বিতীয়॥ ললিপপ্, ললিপপ্, ললিপপ্!
খেতে ভাল টপাটপ, টপাটপ, টপাটপ!
দুনিয়ার সেরা এই খাদ্য,
না খেলে বুঝব অবাধ্য।
খেতে বড় মজাদার—
মিলে যাবে উদ্ধার,
সাথে পাবে উপহার—
একখানা মৌচাক...
শিশিং ফাঁক, শিশিং ফাঁক, শিশিং ফাঁক।

(*হকারের মত ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে*) ললিপপ্ চাই, ললিপপ্। এক প্যাকেট কিনলে সঙ্গে এক শিশি মৌচাক-ভাঙা খাঁটি সুস্বাদু মধু। ছোট, বড়, মাঝারি নানা সাইজের প্যাকেটে পাবেন। নিজেদের এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাবেন। ললিপপ্ ললিপপ ললিপপ। তাছাড়া পাবেন সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম কোম্পানির মোমবাতি—ক্যাণ্ডেল। নিষ্প্রদীপ মানুষেব একমাত্র অবলম্বন—পথেঘাটে আপনারা এর সুখ্যাতি শুনে থাকবেন।

প্রথম॥ কই হে রুস্তম, আসছে না তো—বক্তৃতা দাও।

দ্বিতীয়॥ (*কাল্পনিক মাইক ধরে*) হ্যালো, মাইক টেস্টিং—ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর—হ্যালো, হ্যালো। বন্ধুগণ! আপনারা কি বিপন্ন নন, অর্থহীন নন, সুখহীন নন? একটু আশ্রয়, একটু সুখ, একটু আরাম কি আপনারা মানুষ হিসাবে দাবি করতে পারেন না? আমরা আপনাদের আহ্বান করছি। সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম ক্যাণ্ডেল কোম্পানিতে আসুন। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালুন।

প্রথম॥ আবেগ দাও।

দ্বিতীয়॥ (*গলা কাঁপিয়ে*) এগিয়ে আসুন ভাইসব, আপনার প্রাপ্য থেকে কে আপনাকে বঞ্চনা করবে? তাই বলে ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলবেন না। ক্ষুধা বিবেকহীন, মস্তিষ্কহীন, ক্ষুধা মত্ততা। অহেতুক উষ্মায় ক্ষুধা প্রশমিত হয় না—বিশৃঙ্খলা আসে। সংযত হোন, সভ্যতার প্রথম কথা সংযম। বাড়িতে সকলে সংযম শিক্ষা করুন, ক্ষুধা সহজে নিবৃত্ত হবে।

প্রথম॥ কান দিচ্ছে না ওরা—কবিত্ব আন।

দ্বিতীয়॥ (*সুরেলা গলায়*) অস্তমেঘের সোনা গলে পড়ছে আকাশে। বিদায় নিচ্ছে সূর্য। অন্ধকার—বড় অন্ধকার আসছে ভয়ংকর ঢেউ তুলে। কে বাঁচাবে? কে জাগাবে? কে শোনাবে আশার বাণী? সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম ক্যাণ্ডেল ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস-এ আসুন। আমরা সর্বপ্রকার মোমবাতি বিক্রী করে থাকি—মোটা, মাঝারি এবং সরু। পৃথিবী থেকে বিদ্যুৎ লুপ্ত হয়ে গেলে, শরীর থেকে বিদ্যুৎ লুপ্ত হয়ে গেলে, হৃদয় থেকে বিদ্যুৎ লুপ্ত হয়ে গেলে আমরা অবসন্ন মানুষকে ডাক পাঠাই। বেকারির যুগে ডেকে ডেকে চাকুরি—পাবেন না, আর পাবেন না। মাসিক মাইনে পঞ্চাশটি ললিপপ এবং সঙ্গে দু'শিশি খাঁটি মৌচাক ভাঙা সুস্বাদু মধু।

[*এবার ছেলেটি এবং মেয়েটি এগিয়ে আসে।*]

প্রথম॥ আসছে, আসছে।

ছেলেটি।। আপনারা ডেকে চাকরি দিচ্ছেন?

প্রথম।। হ্যাঁ, ভাই। চাকরি চাই?

মেয়েটি।। কেন চাইব না। পাচ্ছিলাম কোথায়?

প্রথম।। সবাইকে কি আর দিই হে—তোমাদের দেখে মনে হল বড্ড নীড়ি। তা চলে এস, সবই তো শুনলে।

ছেলেটি।। কিরকম সন্দেহ হচ্ছে—এত সহজে চাকরি?

প্রথম।। চাকরি তো তোমাকে করতেই হবে, ভাই। একবার ঢুকে দেখো আরাম পাবে। আরাম না পেলে ছাড়তে কে বাধা দিচ্ছে? (*দ্বিতীয়কে*) মা লক্ষ্মী যে একা পড়ে যাচ্ছে। কী চায় দেখো। আয়না, চুড়ি, স্নো, হিমানী—কী চায় দেখো।

দ্বিতীয়।। (*নেচে নেচে গান ধরে*)

আয়না চুড়ি স্নো হিমানী
মনে মনে চাইছ জানি।
দাম নেবনা, দেখব হাসি—
রাঙা ঠোঁটে একটুখানি।
আয়না চুড়ি স্নো হিমানী...

প্রথম।। ঘুরে ফিরে ভাই, ঘুরে ফিরে—

[*দ্বিতীয় এবার এক পাক ঘুরে যায়। ওরা দু'জনে মজা পায়। মেয়েটি হেসে ওঠে।*]

দ্বিতীয়।। (*মেয়েটির কাছে এসে*)

ঐতো হাসি, মন উদাসী—
হাত বাড়ায়ে পরব ফাঁসি।
মরে গেলে সোনা হব,
স্যাকরা বাড়ি চলে যাব,
নোলক হয়ে আসব ফিরে,
দুলব তোমার নাকে রাণী...
আয়না চুড়ি স্নো হিমানী।

মেয়েটি।। (*হাসতে হাসতে*) কী মজায় আছে এরা, না? আমাদের তো কোথাও যেতে হতই—ওদের ওখানেই যাই।

প্রথম।। তাই তো যাবে—এই জন্যেই তো আসা হে। গানে, নাচে, রসে, সুখে তুমিও পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঠিক নাচ শুরু করবে, দেখে নিও মা লক্ষ্মী।

ছেলেটি।। এতো মজা তবু লোক খুঁজছেন কেন? লোকের তো ভিড় জমে যাবে আপনার দরজায়।

প্রথম।। লোকগুলো যে আহাম্মুক—কাজ করবে আমার, নিয়মটা চালাতে চাইবে তার নিজের—সেটা কি ঠিক কথা রে ভাই।

মেয়েটি।। আপনার নিয়মকানুন বুঝি খুবই কড়া।

প্রথম।। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। যেখানটায় যা আছে ঠিক তেমনি রাখবে—কিচ্ছুটি নড়াবেনা। দশজন কানে মন্তর দেবে—এটা নড়াও, ওটা নড়াও। তোমরা চুপটি করে

থাকবে বসে—কে খায় চাকরি? কে কেড়ে নেবে সুখ?

ছেলেটি।। আপনি কে?

প্রথম।। কেন ভাই? এ প্রশ্ন কেন? ও রুস্তম—আমি কে জিজ্ঞেস করে যে! (*হাসে*) তাহলে প্রস্তুত হও।

ছেলেটি।। আপনাকে চিনতে পেরেছি!

মেয়েটি।। আপনি, আপনি রাজাসাহেব!

ছেলেটি।। এবার আমরা দুজনে আবার মুখোমুখি হয়েছি।

[কোমর থেকে কাল্পনিক ছুরি বের করে প্রথমকে পেছন থেকে আঘাত করতে যায়! কিন্তু প্রথম দ্রুত ঘুরে গিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করে। আবার সেই যান্ত্রিক শব্দ। আলোর জ্বলা নেভা। ক্রিং ক্রিং শব্দ। মঞ্চে খানিকক্ষণ পরে পুরো আলো ফিরে এলে দেখা যায় ছেলেটি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। কাঠগড়াটা অনেকগুলো বন্দুক দিয়ে তৈরী—চারদিক থেকে বেয়নেটের মুখ উঁচিয়ে আছে।]

ছেলেটি।। ধর্মাবতার, এবারেও আমি খুন করতে পারিনি। আমাকে শাস্তি দিন।

। বিরতি ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বের মত মঞ্চ। কেবল প্ল্যাটফর্মের ওপরে দুটো দেওয়ালের মাঝখানে এবার একটি জেলখানার কালো গরাদ দেখা যাচ্ছে। গবাদের সামনে প্ল্যাটফর্মের ওপর বন্দুক কাঁধে টুপি মাথায় দ্বিতীয় টহল দিচ্ছে। নিচে মঞ্চে দু'ধারে দুটো সেলের ভেতর বন্দী হয়ে আছে ছেলেটি ও মেয়েটি। ওদের মাঝখানে অদৃশ্য দেওয়াল। মেয়েটি ও ছেলেটির পরণে ডোরাকাটা জামা ও পাজামা।]

মেয়েটি।। এই যে শুনছ—

ছেলেটি।। উঁ?

মেয়েটি।। আমাদের কি ছাড়বে না?

ছেলেটি।। আমায় জিজ্ঞেস করে কী লাভ?

মেয়েটি।। আমার ভাল লাগছে না!

ছেলেটি।। তাই নাকি?

মেয়েটি।। আমি দেয়ালে মাথা ঠুকব কিন্তু!

ছেলেটি।। আমি আগে খানিকক্ষণ ঠুকেছি—ওটি কর না, বড্ড ঠকঠক শব্দ হয়। কপালে ব্যথা হয়।

মেয়েটি ॥ তাহলে কী করব বল না?

ছেলেটি ॥ আমি কী করছি?

মেয়েটি ॥ চোখ বুজে বসে আছ।

ছেলেটি ॥ তাহলে তাই কর।

মেয়েটি ॥ ভাল লাগে না, আমি তোমার কাছে যাব।

ছেলেটি ॥ চোখ বুজে বসে থাক। কিছু দেখতে পাবে না—একটু একটু দুলবে, এক সময় ঘুম পাবে।

মেয়েটি ॥ আমি তোমার কাছে যাব!

ছেলেটি ॥ আব্দার কোরো না তো!

মেয়েটি ॥ বিষ খাব কিন্তু!

ছেলেটি ॥ খেয়ে দেখেছি, খেলেই বাঁচতে ইচ্ছা করে।

মেয়েটি ॥ পালিয়ে যাব।

ছেলেটি ॥ এ নিয়ে ক'বার চেষ্টা করলে?

মেয়েটি ॥ সেপাইজিকে একটু বল না।

ছেলেটি ॥ ও শুনতে পায় না।

মেয়েটি ॥ পায়। জান, আমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন।

ছেলেটি ॥ কী কথা?

মেয়েটি ॥ জিজ্ঞেস করছিল রাত কটা? আমি বললুম, এখন তো দুপুর। ও বলল, তাহলে সূর্য উঠেছে কেন? আমি বললুম, তাই তো উঠবে। (*পাহারা-রত রক্ষী খিলখিল করে হেসে ওঠে*) লোকটা খিলখিল করে হেসে বলল, এই বুদ্ধিবলেই তো কয়েদ খাটছ।

ছেলেটি ॥ এতে কী বুঝলে?

মেয়েটি ॥ বুঝলুম, এবার সব উল্টে বলব। দিনকে রাত, রাতকে দিন।

ছেলেটি ॥ ভাল।

মেয়েটি ॥ শোন, সেপাইজিকে একটু মিষ্টি করে বলে দেখব?

ছেলেটি ॥ দেখো।

মেয়েটি ॥ তুমি মোটে চেষ্টা করছ না—নিজেও তো একটু চেষ্টা করবে।

ছেলেটি ॥ (*অদৃশ্য দেয়ালে ঘুঁসি মেরে*) কেবল দেয়ালটা ভাঙতে চেষ্টা করিনি, আর সব করেছি।

মেয়েটি ॥ একটু মিষ্টি গলায় বলেই দেখি না। বাড়িতে বাবাকে যেমন সিনেমা যাবার আগে বলতুম। কিছুতে ছাড়বে না, ঠিক ধরে রেখেছে—সিনেমার নাম করে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তারপব অনেক কায়দা করে ঠিক পারমিশন আদায় করতুম।

ছেলেটি ॥ পারমিশন তুমি পেতে না।

মেয়েটি ॥ পেতাম না? তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হত কী করে?

ছেলেটি ॥ আমার সঙ্গে দেখা করার পারমিশন পেতে না। উনি তোমাকে বিশ্বাস করে ছাড়তেন, উনি ঠকতেন। তুমি ঠকাতে আর কি।

মেয়েটি ॥ বাধ্য হয়ে ঠকাতাম। এতে পাপ হয় না।

ছেলেটি ॥ পাপ পুণ্যের কথা নয়, উনি আমাকে পছন্দ করতেন না, তুমি আসতে।

সে এক দুর্বিষহ সময় ছিল। তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ তখন, ভাবলে আমার এখন কষ্ট হয়।

মেয়েটি॥ বাবা না এমনিতে একটু কড়া প্রকৃতির, আসলে কিন্তু—

ছেলেটি॥ তোমার বাবা খুব ভাল, যতক্ষণ তার নিয়মের মধ্যে আছ।

মেয়েটি॥ তুমি আবার তর্ক শুরু করলে! কোথায় এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে—তা নয়, আমার বাবাকে নিয়ে পড়লে!

ছেলেটি॥ ঠিক আছে, আমি চোখ বুজছি। তুমি বাবাকে যেমন করে বলতে, তেমনি করে সেপাইজিকে বলে দেখো, ফল শুভ হলে আমাকেও ছাড়িয়ে নিও।

মেয়েটি॥ বলে দেখি?

ছেলেটি॥ দেখো, তবে একেবারে বাবা বলে ডেকে উঠো না। যেন বাবাকে বলছ—এ রকম কন্যা-কন্যা ভাব আর কি। সেপাইজি আবার রসিকতা ভেবে ক্ষেপে না ওঠে। আমি চোখ বুজলাম। স্টার্ট।

[*দ্বিতীয় ইতিমধ্যে রক্ষী থেকে বাবা হয়ে যাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। সিঁড়িব পাশে বন্দুকটা দাঁড় করিয়ে তার মাথায় টুপিটি রাখে। প্ল্যাটফর্মের ডালা খুলে চশমা ও চাদর বের করে পরে। এবার সিঁড়িতে গিয়ে বসে নাক ডাকাতে ও ঢুলতে শুরু করে।*]

মেয়েটি॥ (*দ্বিতীয়-এর দিকে এগিয়ে, মুখে আদুরে মেয়ের ভঙ্গি এনে*) ঘুমুচ্ছ? (*সাড়া নেই*) কী যে ঘুমোও ছাই দুপুরে!

দ্বিতীয়॥ (*ঢুলুনি ভেঙে বাবার মত ভারিক্কী গলায়*) কে, খুকি? কিছু বলছিস আমাকে?

মেয়েটি॥ এ ঘরে তুমি ছাড়া আর কে আছে? আর কাকে বলব?

দ্বিতীয়॥ কী বলছিস?

মেয়েটি॥ একটু বাইরে যাব।

দ্বিতীয়॥ বাইরে কী আছে?

মেয়েটি॥ কী আবার থাকবে? দরকার আছে, যাব?

দ্বিতীয়॥ পারমিশন নিতে এসেছ, তা দরকারটা কী তা তো জানালি না। এনিথিং প্রাইভেট? (*মেয়েটি অস্বস্তিতে নিরুত্তর*) কথা বল, আই হেট্ সাইলেন্স!

ছেলেটি॥ তুমি একদিন সাহস করে সত্যবাদী হয়েছিলে। দিনটা মনে কর। দুম্ করে বলে দাও।

মেয়েটি॥ আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ছেলেটি॥ ফাইন।

দ্বিতীয়॥ আই সি! যেতে পার, তবে আমি নিষেধ করেছিলাম। আমার অনুমতি ছাড়াই তুমি যেতে পার।

মেয়েটি॥ কেন, তুমি অনুমতি দেবেই বা না কেন?

দ্বিতীয়॥ (*ক্রুদ্ধ*) তর্ক কর না।

মেয়েটি॥ তর্ক কোথায়, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

ছেলেটি॥ রাইট!

দ্বিতীয়॥ জিজ্ঞেস করার একটা নম্র চেহারাও আছে। এত রাগ কেন তোমার গলায়? একটা অপদার্থ ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারছ না—এরকম তুচ্ছ একটা ব্যাপারে সমস্ত

সভ্য শৃঙ্খলা বিসর্জন দিতেও সঙ্কোচ বোধ করছ না! তুমি কি এ বাড়ির মেয়ে—আমার সন্দেহ হয়।

মেয়েটি ॥ তোমার সন্দেহটা খুব বেশি বলেই আজ এতো কথা বলতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় ॥ এতো কথাও আমি কোনওদিন শুনি না। তুমি যেতে পার।

মেয়েটি ॥ সারা জীবন তোমাব ইচ্ছেমত চলেছি। আমি তো একটা মানুষ, আমার নিজের কোনও কিছু থাকবে না?

দ্বিতীয় ॥ এটি তোমার প্রশ্ন না বিপ্লবের ফ্যাশান? শোন, এ বাড়ির যেখানে যা কিছু যেমন ভাবে আছে ঠিক তেমনি থাকবে। এভাবে চলে আসছে—তাতে আমাদের আভিজাত্য কিছু কমেনি। সামনে তোমার পরীক্ষা, অহেতুক উত্তেজনায় নিজের ক্ষতি কোরো না। আর শোন, এতদিন এই নিয়মেই বড় হয়েছ, হঠাৎ নিয়মটা নস্যাৎ করা যায় না—সেটা অকৃতজ্ঞতা হবে। তুমি বড় হয়েছ—এবার সবকিছু বুঝতে শেখো।

মেয়েটি ॥ ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

দ্বিতীয় ॥ কোথায়?

মেয়েটি ॥ এই বাড়িতে।

দ্বিতীয় ॥ এই বাড়িতে একটা রান্নাঘর আছে, সেখানে গিয়ে দু-কাপ চা কর। এই টেবিলে এনে রাখো—দুজনে গল্প করব। রাজী? (*মেয়েটি চুপ*) চুপ করে কেন? রাজী?

মেয়েটি ॥ আনছি।

[*মেয়েটি বাবার কাছ থেকে সবে আসে। বাবা আবার রক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ববৎ পায়চারি শুরু করে, নির্বিকাব।*]

ছেলেটি ॥ (*ব্যঙ্গের হাসিতে ভেঙে পড়ে*) তুমি দু-কাপ চা-ই এনেছিলে। তারপর গল্প থেকে হাসি এবং বাবার মাথা টিপে দেওয়া—চমৎকার!

মেয়েটি ॥ তাছাড়া কী করব?

ছেলেটি ॥ খুন করবে, মাথা টিপে দিতে দিতে সোজা খুন।

মেয়েটি ॥ বাবাকে?

ছেলেটি ॥ তোমার বাবার ঐ উদ্ধত গোঁয়ার্তুমিটাকে। ঘরের তিলমাত্র এধার থেকে ওধার নড়াতে দেবেন না—আর তুমি তা মেনে চলবে? তোমার উচিত ছিল খুন করা। একটা বন্দুক উঁচিয়ে ভদ্রলোক তোমাকে চৌকি দিয়ে যাচ্ছেন—আর তুমি ধূমায়িত চা খাচ্ছ? খুন করতে জান না!

মেয়েটি ॥ তোমার মত খুন করব? হাতে একটা অদৃশ্য ছুরি নিয়ে লম্ফঝম্ফ!

ছেলেটি ॥ শেষ দৃশ্যে ছুরিটা আর অদৃশ্য থাকবে না। আমি জিতবই।

মেয়েটি ॥ জিতবে! কয়েদখানায় পচে গলে জিতবে! যে জেতে সে এই দেয়ালটা লাথি মেরে ভাঙতে চায়। তার দুটো চোখ জ্বলে, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে যায়। তোমার মত বাক্যবাগিশ বক্তা হযে চোখ বুজে ঢুলতে চায় না।

ছেলেটি ॥ আচ্ছা, আমরা একটা কাজ কিন্তু করতে পারি। যদি খবরের কাগজে ফোন করি, খবরটা ওরা ছাপবে—কেউ না কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে।

মেয়েটি॥ ঠিক বলেছ, অন্তত লোকে জানুক—দুটো মানুষ বন্দী হয়ে আছে!

[*ছেলেটি একটা কাল্পনিক ফোন তুলে নম্বর ডায়াল করে। মেয়েটি অন্যপ্রান্তে উদ্‌গ্রীব। দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে বন্দুকটা বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে। পকেট থেকে বের করে একটা কালো ঠুলি-চশমা পরে নেয়। টুপিটি ডানহাতে ধরে থাকে। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা যাচ্ছে।*]

ছেলেটি॥ হ্যালো, হ্যালো,—(*মেয়েটির উদ্দেশে*) কেউ সাড়া দিচ্ছে না—(*আবার ফোনে*) হ্যালো, হ্যালো।

[*এবার দ্বিতীয় ধীর পায়ে এসে গ্লোবের ওপরের স্ট্যাণ্ড থেকে সাদা রিসিভারটা তুলে নেয়। বিচিত্র নিরাসক্ত কণ্ঠে কথা বলে।*]

দ্বিতীয়॥ হ্যালো।

ছেলেটি॥ এটা সংবাদপত্র অফিস? আমি মালিকের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

দ্বিতীয়॥ কথা বলছি!

ছেলেটি॥ (*মেয়েটিকে*) পেয়েছি।

মেয়েটি॥ সব খুলে বল।

ছেলেটি॥ আপনাদের একটা সংবাদ জানাতে চাই।

দ্বিতীয়॥ বলুন।

ছেলেটি॥ আমরা দুজন মানুষ এখানে বন্দী হয়ে আছি। এপাশের ঘরে আমি আর ওধারে একজন মহিলা।

দ্বিতীয়॥ কথাবার্তা হয়?

ছেলেটি॥ দূর থেকে।

দ্বিতীয়॥ দৃষ্টি বিনিময়ে বাধা নেই তো?

ছেলেটি॥ আজ্ঞে?

দ্বিতীয়॥ এরকম বন্দী জীবন তো সুখের কথা মশাই।

ছেলেটি॥ আমরা দীর্ঘ দিন ধরে বেরুতে পারছি না।

দ্বিতীয়॥ কী দরকার!

ছেলেটি॥ কী দরকার মানে। এভাবে থাকব নাকি। খবরটা দয়া করে ছাপুন না।

মেয়েটি॥ (*ছেলেটিকে*) বল, এ খবরটা সকলের জানা দরকার।

ছেলেটি॥ খবরটা ছাপলে সবাই জানতে পারত—কেউ না কেউ আমাদের হয়ে কিছু করতে পারে।

দ্বিতীয়॥ আপনি কাদের লোক।

ছেলেটি॥ কাদের লোক মানে। এই দেশের লোক।

দ্বিতীয়॥ ওসব বড় বড় কথায় কাজ হয় না। আমি এই পৃথিবীর লোক—তাতে গোটা পৃথিবীর কী এল গেল। আপনি নিজের কাগজটি আগে বেছে নিন।

ছেলেটি॥ কিন্তু এটা কি একটা খবর নয়—আপনারা তো খবরই ছাপেন। এটা একটা গুরুতর খবর।

দ্বিতীয়॥ দেখুন—টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি—আমাদের খবরের কাগজটি বৃহৎ বিজ্ঞাপন-

দাতাদের কৃপায় চলে। তাঁদের প্রয়োজনের বাইরে খবর ছেপে কাগজটিকে তো আর তুলে দিতে পারি না। আমার মতামত মানেই তাঁদের মতামত। আপনার অপরাধ?

ছেলেটি।। অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

দ্বিতীয়।। মার্ডার! কাকে খুন করতে চেয়েছিলেন?

ছেলেটি।। রাজাসাহেব! চেনেন?

দ্বিতীয়।। খুব ভাল চিনি। আমি রাজাসাহেবের হয়েই কথা বলছি।

ছেলেটি।। কী বললেন!

দ্বিতীয়।। (*ভয়ঙ্কর কণ্ঠে*) আমি রাজাসাহেবের হয়েই কথা বলছি। আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি।

[*রিসিভার নামিয়ে রেখে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়।*]

ছেলেটি।। (*চেঁচিয়ে*) হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো! (*এবার কাল্পনিক রিসিভারটি নামিয়ে রেখে ছুটে যায় মাঝের দেয়ালের দিকে*) সর্বনাশ হয়েছে।

মেয়েটি।। কী হল?

ছেলেটি।। যাকে ফোন করেছিলাম সে স্বয়ং রাজাসাহেবের লোক।

মেয়েটি।। রাজাসাহেবের লোক!

ছেলেটি।। এবার আমাদের অবস্থাটা ভেবেছ! কেবল বন্দী হয়েই থাকব না, কী ভয়ংকর শাস্তি শুরু হবে ভেবেছ?

মেয়েটি।। যেমন করেই হোক আমাদের পালাতেই হবে।

[*গরাদ ঠেলে এক বৃদ্ধের বেশে প্রথম ঢোকে। তার মাথার চুল একেবারেই সাদা, তার ওপরে ছোট একটা সুতোয় বোনা টুপি। একটা কালো চাদর আলখাল্লার মত ঝুলছে। কুঁজো হয়ে চলাফেলা করে।*]

প্রথম।। আহা-হা! আমার বাছারা সব কোথায়? কটা দিনই বা আছি, পোড়া চোখে এও দেখে যেতে হল। কোথায়, বাছারা সব কোথায়?

ছেলেটি।। আমাদের খুঁজছেন।

মেয়েটি।। (*আকুল গলায়*) এই তো আমরা!

প্রথম।। (*সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে*) কোথায়, কোথায় গো সব?

ছেলেটি।। (*ব্যাকুল গলায়*) এই যে, এদিকে তাকান।

মেয়েটি।। আপনার কাছেই—দেখতে পাচ্ছেন না?

প্রথম।। দেখতে পাব না কেন মা, কিন্তু তাকাতে পাচ্ছি না। এতো চোখে দেখা যায় না বাবা! (*বিশাল রিংয়ে আটকানো অনেকগুলো চাবি ঝম্‌ঝম্ করতে করতে গরাদের সামনে এসে দাঁড়ায় দ্বিতীয়। তার মাথায় পুলিশি টুপি। প্রথম ওর দিকে ফিরে তাকাতেই সে একটি সেলাম ঠোকে*) এই যে বাপু, সেলাম পরে ঠুকবে। আগে বাছাদের খালাস কর। কই গো, বাছারা! এস, এস—ছুট্টে বাইরে এস।

[*সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে দু'পাশে দুটো কাল্পনিক দরজা খোলে দ্বিতীয়। আবার চাবি ঝম্‌ঝম করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেরিয়ে যায়। ছেলে মেয়ে দুটি বেরিয়ে আসে।*]

মেয়েটি ॥ পৃথিবীতে আপনার থেকে আপন আর কেউ নেই। আপনি আমাদের বাঁচালেন! দেবতার মত আপনি এসে হাজির হয়েছেন।

ছেলেটি ॥ আপনি না এলে আমরা হয়ত এই কয়েদখানাতেই পচে মরতুম।

মেয়েটি ॥ ওঁকে প্রণাম কর।

[*দুজনেই প্রথমকে প্রণাম করে।*]

প্রথম ॥ পায়ের ওপরে যেন দুটি ফুল ঝরে পড়ল—ওঠ, ওঠ। ছাড়া তো তোমরা পেলে না, এইখানে *(নিজের বুক দেখিয়ে)* আমার নিঃশ্বাস আটকে ছিল, এবার সেটি ছাড়া পেল। আহ্!

ছেলেটি ॥ যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

প্রথম ॥ বল।

ছেলেটি ॥ অযাচিতভাবে আপনার এত করুণা, আপনি কে?

প্রথম ॥ আমি কে? আমি কে জানতে চেও না—শুধু তোমরা আমার বুকে এস। (*মেয়েটিকে*) মা, তোমার অঙ্গ বড় কোমল, ওরা কোনরকম পীড়া দেয়নি তো?

মেয়েটি ॥ ওরা আমাদের নানারকম কষ্ট দিয়েছে, শুনলে আপনি সহ্য করতে পারবেন না।

প্রথম ॥ থাক, আমায় শুনিও না। চামরের বাতাসেও যে অঙ্গে আঘাত লাগে, তার ওপরে পীড়ন—আমি শুনব না। চল মা, আমার সঙ্গে চল।

[*মেয়েটিকে নিয়ে একটুখানি এগিয়ে যায়। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।*]

মেয়েটি ॥ ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এস।

প্রথম ॥ (*পেছনে তাকিয়ে*) কী রে, অভিমান হয়েছে বুঝি? তোকে ডাকিনি, এই তো? দুষ্টুটা! কেমন ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখো! আয়, চলে আয়।

ছেলেটি ॥ কোথায় যাব?

প্রথম ॥ কথা শোন—কোথায় যাব! কয়েদখানাতেই তাহলে পচে মর। এতক্ষণ তো বেরুবার জন্য লাফাচ্ছিলি। বেরিয়ে কোথায় যেতিস?

ছেলেটি ॥ জানি না।

প্রথম ॥ জান না? শোন মা, ন্যাকা মদনের কথা শোন! তাহলে তো তোর কয়েদখানাই ভাল ছিল রে।

মেয়েটি ॥ আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। আপনি যা ভাল বুঝবেন, আমরা তাই করব। কয়েদখানার কষ্টে ও কেমন হয়ে গেছে।

প্রথম ॥ নে, তবে চল।

ছেলেটি ॥ আমি যাব না।

প্রথম ॥ দেখলে? মদন আবার একটু টেঁটিয়া মতনও আছে।

মেয়েটি ॥ আচ্ছা তুমি কী বল তো? যাবে তো?

ছেলেটি ॥ সেটাই ভাবছি—কোথায় যাব? গরাদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে—যখন পথ থাকে না তখনই

তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।

মেয়েটি॥ ওসব পরের ভাবনা—আপাতত এখান থেকে তো কোথাও যাই।

প্রথম॥ কিছু সাব্যস্ত হল, মা? গোঁয়ারটাকে বোঝাতে পারলে? হনুমান কোথাকার! নে চল।

মেয়েটি॥ চলুন, ও যাবে। আমার কথা শোন—চল।

প্রথম॥ *(পকেট থেকে কী যেন একটা বের করে দেখতে দেখতে)* চোখেও তেমন দেখতে পাই না।

মেয়েটি॥ আমি পড়ে দেব?

প্রথম॥ ক্যাশমেমোর আর কী পড়বে, মা!

মেয়েটি॥ ক্যাশমেমো? ক্যাশমেমো কিসের?

প্রথম॥ তোদের কিনেছি, তার ক্যাশমেমো।

ছেলেটি॥ আমাদের কিনেছেন!

প্রথম॥ ক্যাশমেমোটা পড়ে দেখো সোনা, ক্যাশ ট্রানজাকশান। খরচা করে নগদ কিনেছি, ক্যাশমেমোটি নিয়েছি—নগদানগদি কারবার।

মেয়েটি॥ আমাদের কিনেছেন, অথচ আমরা জানি না!

প্রথম॥ এই তো জানলে।

ছেলেটি॥ কার কাছ থেকে কিনলেন? *(প্রথম হাসতে থাকে। ছেলেটি ক্রুদ্ধ হয়)* কার কাছ থেকে কিনলেন? *(ধমকের গলায়)* কার কাছ থেকে কিনলেন?

প্রথম॥ *(হঠাৎ তীব্র শাসনের গলায়)* চুপ! উদ্ধত ছেলে—ফের কথা বললে নিলডাউন করিয়ে রাখব! কার কাছ থেকে কিনলুম! তোমাকে কিনলুম আর তুমি জান না? ন্যাকা মদন। বজ্জাত ছেলে, উদবক্কা কাঁহাকা।

ছেলেটি॥ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওরকম ইতর ভাষা ব্যবহার করবেন না!

প্রথম॥ শোন মা শোন, এই কড়ে-আংলা ছেলেটা আমাকে সাবধান করছে।

মেয়েটি॥ ও ঠিকই বলেছে। আপনার বয়স হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব বাজে কথা বলেন!

প্রথম॥ দেখছি দু'টোতে মিলে ফণা তোলে! ওটি কর না—বিষদাঁত ভাঙার পাথর থাকে আমার সঙ্গে—ছি; ওটি কর না! নগদ কারবার করেছি, অথচ আমাকে কী মাল-ই না দিয়েছে। দেখতেই দু মণ দুধ, শালা মাখন দেবে কতটুকু কে জানে? তবে মাখন তুলতে আমি জানি হে। যাকগে এবার চলা যাক।

ছেলেটি॥ আপনি যেখানে খুশি যান, আমরা যাব না।

প্রথম॥ তুমি মামণি?

মেয়েটি॥ ও যদি না যায়, একা একা কোথায় যাব?

প্রথম॥ একা কোথায়? আমি কি তেমন বুড়ো হে! তাছাড়া আমাকে যদি অপছন্দ, অনেক যুবক ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। অঙ্গে তোমার রাঙা যৌবন—এক একখানা ঢেউ দশখানা বুকে ভাঙবে। যৌবন একটু দুষ্টু না হলে মজা কোথায়! এস, পেখম তোলা পাখি সাজিয়ে দেব।

মেয়েটি॥ আপনি থামুন।

ছেলেটি॥ আপনি এক্ষুনি বিদেয় হোন, তা না হলে—

প্রথম॥ তা না হলে?

ছেলেটি॥ আমার কাছে একটা ছুরি থাকে, খবরটা আপনাকে দিয়ে রাখলুম।

প্রথম॥ সে কি আর জানিনে। ছুরি হাতে আজকের ছেলেমেয়েরা বড্ড তড়পে যাচ্ছে! একটু চিকিচ্ছে করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের ঐ চিকিচ্ছের জন্যই তো কিনলুম হে!

ছেলেটি॥ আপনাকে শেষবার বলছি, চলে যান!

প্রথম॥ একবার এলে তো আমি চলে যাই না। টাকা পয়সা খরচা করে কিনলুম. টাকা-পয়সা দিয়ে সুখের ঘর বানিয়ে দেব—বদলে আমায় একটু কাজ দেবে না? অত কৃতঘ্ন হলে চলে না তো ভাই!

ছেলেটি॥ এ ভাবে কতদিন চালাবেন ভেবেছেন?

প্রথম॥ চলে তো আসছে ভাই।

ছেলেটি॥ সত্যি নাকি?

প্রথম॥ চলে তো আসছে ভাই।

ছেলেটি॥ সত্যি নাকি?

প্রথম॥ মিথ্যেও নয়। তা মা তুমি অমন মন-মরা হয়ে বসে আছ কেন? এটা তো তবু পিড়িং পিড়িং করছে।

ছেলেটি॥ আপনি আমাদের নিয়ে কী করতে চান? ক্রমাগত ঠাট্টা কৌতুক, না আর কিছু?

প্রথম॥ ঐ তো বললুম, চিকিচ্ছে।

মেয়েটি॥ তারপর?

প্রথম॥ তারপর আমার কাজে নামাব।

ছেলেটি॥ কী কাজ?

প্রথম॥ সোনা তোলার কাজ।

মেয়েটি॥ সোনা তোলার কাজ?

প্রথম॥ হ্যাঁ। চারদিকে সোনা ছড়িয়ে আছে, তুলে আনব—তার জন্য লোক তো চাই।

ছেলেটি॥ তাহলে আমরা কি আপনার সোনার খনির মজুর না রক্ষী?

প্রথম॥ মজুর আর রক্ষীতো চাইই—তাই বলে ব্যাপারটা পরিচালনা করার লোকও তো দরকার।

ছেলেটি॥ তারপর?

প্রথম॥ তারপর নানাদেশে এমনি যেসব সংস্থা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা—একি দুটি একটি লোকের কর্ম! এ বড় বিরাট আয়োজন। বিশ্বব্যাপী আমাদের বন্ধুত্ব। এ এক সৌভ্রাত্রের বন্ধন হে—মিত্রতা বড় সুন্দর! আমার গায়ে ছুঁচ ফোটাও, ওর রক্ত পড়বে; সাত সমুদ্দুর পারে ওর মাথায় লাঠি মার, আমি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে থাকব। দুজনে দোকলা আছ—এ বন্ধন কী বুঝবে?

ছেলেটি॥ আপনি অন্য লোক খুঁজুন। আমরা চললুম।

প্রথম॥ চলে যাবে। পথ কোথায়? রাস্তাগুলোও যে আমার নামে সব কিনে নিয়েছি।

যখন কেউ হাঁটে, আমরা তার পায়ের শব্দ টেপ-রেকর্ডে তুলে রাখি। কী রকম শব্দ, কী তার মানে, পায়ের শব্দ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিলতে চায়, কাদের সঙ্গে এক তালে হাঁটে—সব নোট করে রাখা হয়।

ছেলেটি ॥ আপনার কেনাকাটার বাইরেও পথ আছে। সেই পথ দিয়েই আমরা যাব—আপনার চোখের সামনে দিয়েই যাব।

প্রথম ॥ (*হাসে*) বেশ এগোও! ও-রাস্তায় হাজার গণ্ডা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ল, আর তোমবা দুজন। এগোও, একটু দেখি—খেলাটি দেখি। কই, এগোও।

ছেলেটি ॥ নিশ্চয়ই এগুব। (*মেয়েটিকে*) চল।

[*ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে গরাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। দরজার কাছাকাছি পৌঁছতেই কড়কড় শব্দে যেন অসংখ্য বাজ ভেঙে পড়ল। বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওদিকে দরজায় লাল আলো জ্বলছে-নিভছে। সঙ্গে ক্রিং ক্রিং শব্দ। ছেলে মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। খানিক বাদে মঞ্চে পুরো আলো ফিরে এলে দেখা যাবে লাল দরজাটার সামন দাঁড়িয়ে আছে প্রথম। পরনে চুস্ত, নক্শাকাটা পাঞ্জাবী, মাথায় সেই রাজাসাহেবেব টুপি, পায়ে নাগরা। ওপাশে গ্লোবের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয়। আপাদমস্তক লাল আঁটোসাটো পোশাকে মোড়া। গলায় একটা ঘন্টি। কোমরে পেনসিল টর্চ।*]

প্রথম ॥ কী হল থেমে গেলে কেন? প্রাণের ওপর মায়াটা বড় কেউ ছাড়তে পারে না হে।

দ্বিতীয় ॥ রাজাসাহেব, আমাকে ডেকেছেন?

ছেলেটি ও মেয়েটি ॥ রাজাসাহেব!

প্রথম ॥ হ্যাঁ, তোমার নতুন পেশেণ্ট দুজন। চিকিচ্ছে শুরু কর।

[*একটা বিচিত্র আওয়াজ কবে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ওপর লাফ দিযে ওঠে। ছেলেটি মেয়েটি ইতিমধ্যে সিঁড়ির ওপবের ধাপে বসে পড়েছে।*]

দ্বিতীয় ॥ রোগটা কেমন?

প্রথম ॥ পুরনো রোগ?

দ্বিতীয় ॥ কী রোগ?

প্রথম ॥ পালাজ্বর।

দ্বিতীয় ॥ তেতে ওঠে?

প্রথম ॥ ভুল বকে।

দ্বিতীয় ॥ দাঁত কিড়-মিড় করে?

প্রথম ॥ হাত-পা ছোঁড়ে।

দ্বিতীয় ॥ ঘাম হয়?

প্রথম ॥ শ্বাস-প্রশ্বাস দপদপ্ করে।

দ্বিতীয় ॥ টুঁ মারে?

প্রথম॥ সাজান-গোছানো ঘরে টুঁ মারে।

দ্বিতীয়॥ শিং আছে?

প্রথম॥ ওঠেনি।

দ্বিতীয়॥ হাইজাম্প দিতে পারে?

প্রথম॥ ক্রোধ থেকে কান্না অবধি।

দ্বিতীয়॥ চোখ লাল হয়?

প্রথম॥ লাল হয়।

দ্বিতীয়॥ নখ আছে?

প্রথম॥ দাঁতে কেটে ছেঁটে ফেলে।

দ্বিতীয়॥ দল বাঁধে?

প্রথম॥ মেয়েটা চুল বাঁধে।

দ্বিতীয়॥ ছেলেটা দল বাঁধে?

প্রথম॥ ছেলেটার বাধো-বাধো লাগে।

দ্বিতীয়॥ ক্ষিধে আছে?

প্রথম॥ উল্টো পাল্টা ক্ষিধে।

দ্বিতীয়॥ চ্যাঁচায়?

প্রথম॥ চ্যাঁচায়।

দ্বিতীয়॥ কী চায়?

প্রথম॥ খুন করতে চায়।

দ্বিতীয়॥ খুন করতে চায়!

প্রথম॥ ছুরি আছে।

দ্বিতীয়॥ ছুরি আছে! (*ছেলেটিকে*) ছুরিখানা দাও। কই হে, ছুরিখানা দাও!

ছেলেটি॥ সঙ্গে নেই।

দ্বিতীয়॥ ওটি বের কর, বের কর।

ছেলেটি॥ নেই, গিলে ফেলেছি।

দ্বিতীয়॥ গিলে ফেলেছ? দেখি, হাঁ কর, হাঁ কর। (*ছেলেটি একটা বড় হাঁ করে। দ্বিতীয় ভেতরে টর্চ ফেলে*) ফলাটা দেখা যাচ্ছে! ঠিক আছে, ভয় নেই। ওটা ডিজলভ্‌ড হয়ে যাবে। অ্যাসিড় দিয়ে গলিয়ে দেখা যাবে! (*মেয়েটিকে*) তোমার কাছে ছুরি আছে?

মেয়েটি॥ আছে।

দ্বিতীয়॥ বের কর। বের কর। টুপ করে আবার গিলে ফেলোনি তো?

মেয়েটি॥ না।

দ্বিতীয়॥ তাহলে বের করে দাও!

মেয়েটি॥ সঙ্গে নেই। দোকানে পছন্দ করে রেখে এসেছি, এক সময় কিনব।

প্রথম॥ সৈ আর কিনেছ! সোজা আমার ক্লিনিকে যাবে, চিকিচ্ছে হবে—শান্ত মিষ্টি টুসটুসে মেয়েটি হয়ে যাবে। কতো খেলনা আমার—রোজ খেলবে।

ছেলেটি॥ ভাল খেলা দেখছি, আর খেলনা চাই না! কখন এই খেলাটা ফুরোবে তাই ভাবছি।

প্রথম।। ফুরোবে, ফুরোবে—ডাক্তার এসেছে, মাথাটা সাফ হয়ে গেলেই সব ভাল লাগবে, তাই না ডাক্তার?

দ্বিতীয়।। হ্যাঁ, মাথাটা সাফ করতে হবে। জঞ্জাল জমেছে। ধুয়েমুছে ব্রেনের মধ্যে নতুন বীজ বুনে দিতে হবে। গোটাকতক স্পেল দেব দুজনকে। আস্তে আস্তে অসন্তোষের মেঘ কেটে যাবে। বেশ আরাম-আরাম লাগবে। আর কী চাই?

প্রথম।। একটু কষ্ট পাবে না—স্নায়ুর মধ্যে যে উত্তেজনা তাকে আস্তে আস্তে আইসক্রিমের মত মিষ্টি আর ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে। লড়াইটা কেন? আরামের জন্য তো? পাবে। হাত পা ছুঁড়ে লাভ কী হে—হাত বাড়িয়ে আমি দিচ্ছি। কেউ লড়াই করে চায়, কেউ দুয়ার খুলেই পায়—পাওয়া নিয়ে কথা। সহজ অঙ্কটা বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন?

দ্বিতীয়।। আসলে একটু রাগ হয়েছে তো—ট্যাবলেট দেব, সব ঠিক হয়ে যাবে। স্নায়ু-পীড়া, বুঝলেন না?

প্রথম।। আসলে একটু যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করে তাই না? বক্সিং, অ্যাঃ—বক্সিং লড়তে চাও? লড়বে, লড়ে যাবে—ভাল গ্লাভস দেব। রিং-এর বাইরে হাততালি চাই তো? হাততালি দেবার আমার অনেক লোক আছে। বেতার, টেলিভিসন, নিউজপেপার, সিনেমা, থিয়েটার, ভাষণ, পোস্টার সবাই মিলে হাততালি দেবে। কী চাই? আমার সব আছে। কেবল মাথাটি শান্ত কর—আর কাজে মন দাও। চারদিকে সব গোছানো আছে—কেবল এলমেলো করবে না। কোন কিছু ভণ্ডুল করতে নেই, বুঝলে না? যেমনটি আছে তেমনটি রাখবে, কেমন?

ছেলেটি।। বারবার ঐ 'কেমন' 'কেমন' বলে মত জানতে চাওয়ার বিনয়টুকু এবার ছাড়ুন তো।

প্রথম।। ঠিক আছে। তোমার শেষ ইচ্ছেটি বল, ঠিক রাখব।

ছেলেটি।। ফাঁসির ঠিক এক মিনিট আগের ডায়ালগটি ছাড়লেন দেখছি। না, সেরকম ভয় পাই না আর এখন।

প্রথম।। আ-হা-হা অশুভ কথা বলতে নেই। *(ছেলেটির চিবুক ধরতে যায়, ও ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়)* জিও জিও, যুগ যুগ জিও?

মেয়েটি।। আমার একটা ইচ্ছে রাখবেন?

প্রথম।। বল মা লক্ষ্মী, বল। গাবলুটার মত তোমার অতো পিড়িং পিড়িং নেই, আমার বড় ভাল লাগে। নেবু ছেলেটার সঙ্গে কী করে যে মিশ খেলে? বল, কি ইচ্ছে বল?

ছেলেটি।। কিচ্ছু চাইবে না ওর কাছে।

প্রথম।। থাম। মদন!

মেয়েটি।। *(আদুরে গলায়)* আমাকে আপনার অ্যালবামটা একটু দেখতে দেবেন?

প্রথম।। অ্যালবাম? আমার? কী হবে?

মেয়েটি।। ক্লিনিকে তো কিছু করবার থাকবে না, বসে বসে দেখব।

প্রথম।। ছবি দেখবে?

মেয়েটি।। *(ঠাট্টার গলায়)* হ্যাঁ, ছবি। আপনার কত রকম মূর্তি, কত রকম সাজ-পোশাক, পাতা উলটে উলটে দেখব।

প্রথম॥ ও ব্বাবা! মেয়ে যে আবার বাঁকিয়েও কথা বলে।

মেয়েটি॥ তা একটু বলি, রাজাসাহেব!

প্রথম॥ (*অতর্কিতে উঁচু গলায়*) ডকটর! স্টার্ট ইওর ট্রিটমেণ্ট। স্টার্ট!

[*সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়-এর হিংস্র হুঙ্কার এবং ছেলে মেয়ে দুটির আর্ত চিৎকার শোনা গেল। আলো নিভে যায়। মুহূর্ত পরেই দেখা যায় ছেলে মেয়ে দুটির মাথায় পরানো মাস্কে নানা রঙের আলো কিলবিল করছে। সঙ্গে একটি মৃদু সঙ্গীতধ্বনি। মাথার আলোগুলো নিভে গেলে স্বাভাবিক আলো ফিরে আসে। দেখা গেল ছেলেটি ও মেয়েটি যন্ত্র পুত্তলিকার মত চেয়ারে উপবিষ্ট। চোখ বোজা।*]

দ্বিতীয়॥ রাজাসাহেব, স্পেল দেওয়া কমপ্লিট। এদের দুজনকে আলাদা করে দিয়েছি।

প্রথম॥ তা দুজনকে আলাদা করলেই তো চলবে না। বাইরে যে মানুষগুলো দিনরাত চ্যাচায়, ওদের থেকে আলাদা করতে হবে যে!

দ্বিতীয়॥ ধীরে ধীরে সব হবে। বাইরের লোকগুলোকে এখন ওদের ভালই লাগবে না।

প্রথম॥ জাগবে কখন?

দ্বিতীয়॥ জেগেই আছে, তবে আরামে দুটিতে চোখ বুজে আছে। এখন যে আর স্নায়ুপীড়া নেই, বুঝলেন না!

প্রথম॥ তাহলে ওদের একটু বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া যাক।

দ্বিতীয়॥ দেওয়া যাক।

প্রথম॥ তুমি এগোও, ওদের দুটো কথা বলে যাচ্ছি।

[*দ্বিতীয় অভিবাদন জানিয়ে চলে যায়। প্রথম ছেলেটির দিকে ঝুঁকে নানাভাবে লক্ষ করে। মেয়েটিকেও দেখে।*]

এই যে! মদন, ওহে মদন—চোখটা এক ঝিলিক খোল চাঁদ। শুনতে পাচ্ছ? (*এগিয়ে মেয়েটির কপালে, মুখে লোভী হাত বোলায়*) যৌবন তো কান দিয়ে শোনেনা—যৌবন যে বধির, অন্ধ। ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা বলে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে শোনে। কী বলছি, শুনতে পাচ্ছ? (*মেয়েটি চোখ না মেলে অস্ফুট শব্দ করে প্রথম-এর একটা আঙুল আবেশে আলগোছে কামড়ে ধরে*) বঁড়শিতে যে মাছ আটকাল! কোথায় টেনে তুলব? ডাঙায়? না, জলে? জলেই খেলব? (*মেয়েটি আবিষ্ট চোখ মেলে। মুখে মদির রহস্যময় মৃদু হাসি। প্রথম-এর হাতটা টেনে ধরে*) ওরে ও মদনা, তাকিয়ে দেখ—ওষুধ-চিকিচ্ছে যে আমার কথা বলে রে (*ছেলেটি কোনরকমে চোখ খুলে তাকায়। ওদের দেখে হি-হি শব্দে একগাল হাসে*) গাবলুটা যে একেবারে বাক্যহারা। একেই বলে চিকিচ্ছে। কী হাসি, আহা! (*চেঁচিয়ে*) ওরে কথা আছে, একটু সজাগ হবি তো?

[*এবারে দুজনে চোখ কচলে একটু পরিষ্কার চোখে তাকাতে চেষ্টা করে।*]

মেয়েটি॥ (*মৃদু কণ্ঠে*) আমি কোথায়?

প্রথম॥ আমার পাশটিতে।

মেয়েটি॥ ও কোথায়?

প্রথম॥ ঐ তো—নির্বাক মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই, চাঁদবদন জ্যোৎস্না বিলোচ্ছে।

মেয়েটি॥ (*আদুরে*) ঘুম পাচ্ছে!

প্রথম।। পাবে না? স্নায়ুপীড়া নেই যে। এখন তো একটানা ঘুমের মধ্যেই থাকবে। বড় শান্ত ঠাণ্ডা একটা ঘুমের মধ্যে হাঁটবে, ঘুরবে, ঘর-কন্না করবে। দেখে যেতে পারলুম, এই শান্তি?

মেয়েটি।। (*অভিমান*) আপনি কোথায় যাবেন?

প্রথম।। আমার কাজ হল, আর একজন আসবেন—তাঁর কাছে থাকবে, তাঁর কাজকর্ম করবে।

মেয়েটি।। কী কাজ?

প্রথম।। ভাল কাজ। তোমাদের যে প্রমোশন হয়েছে, চিকিচ্ছেয় ভাল ফল হলেই প্রমোশন, উনি আসবেন—এসে ইন্টারভিউ নেবেন। তোমরা ঠিক পাশ করে যাবে।

মেয়েটি।। আপনি যাবেন না, কাছে থাকুন!

প্রথম।। উনি থাকলেই তো আমার থাকা—কোন ভয় নেই।

মেয়েটি।। (*অভিমান*) না, আপনি যাবেন না!

প্রথম।। দেখেছ, এ যে বড্ড ন্যাওটা হয়ে পড়েছে! আরে আমি না থাকলে কি অনাথ হয়ে যাবে? আমার সার্টিফিকেট রইল, রেকমেণ্ডেশন রইল—তার মানে আমিই পাশে পাশে রইলুম।

মেয়েটি।। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগবে!

ছেলেটি।। মাথার ওপর ছিলেন—আর এখন বটবৃক্ষের ছায়াটি সরে গেল!

প্রথম।। যাবার সময় ওরকম করে না। মায়া বাড়িও না—শেষটায় কেঁদে ফেলব, সেটা কি ভাল হবে! তোমরাই তো আমার সব, আমার আশীর্বাদ রইল।

মেয়েটি।। আপনাকে আমরা কিছু দিতে পারলুম না।

প্রথম।। (*ফিসফিসিয়ে*) ঠিক আছে, মনের মত একটি প্রেজেণ্টেশন দিও! (*ইঙ্গিতময় হেসে*) অঙ্গভরা সুবাস—দুটি ফুল দিও। বয়স হল—মন তবু বলে, ঘ্রাণে বড় সুখ হে!

ছেলেটি।। (*কৌতুকের গলায়*) কী কথা হচ্ছে, সব শুনতে পাচ্ছি কিন্তু!

মেয়েটি।। (*কৃত্রিম রাগ*) আমাদের কথা কেন শুনবে? সব-তাতে কান পাতা চাই!

প্রথম।। না, না, ও শোনেনি। মজা করে ভয় দেখাচ্ছে তোমাকে!

মেয়েটি।। শুনলেই বা। ওকে কে ভয় পায়? ওকি আর কম কীর্তি করেছে? সব বলে দেব না!

ছেলেটি।। অমনি শাসাচ্ছ? আমি তোমায় কী বলেছি?

প্রথম।। এই দেখ, আবার ঝগড়া! সব চুপ কর। কেউ কারুর কথা ফাঁস করবে না, কেউ কাউকে বাধাও দেবে না। যৌবন তো সাগর—কত ঢেউ চুরি হয়, কে দেখেছে? ঝগড়াও নেই, বিবাদও নেই—ইন্টারভিউটা ভাল করে দাও সব। চলি। তাহলে আসি—আঙিনা ধুয়ে রাখব—দুটি ফুল ছড়িয়ে যেও।

[*দুজনের চিবুক ছুঁয়ে নিজের আঙুলে চুমু খায়, চলে যায়। ওরা হাত নেড়ে বিদায় জানায়। মেয়েটি এবার খিলখিল করে হাসে*]

ছেলেটি।। এই আস্তে। অত জোরে হেসো না, বুড়োটা এখনও হয়ত বিদেয় হয়নি। শুনতে পাবে।

মেয়েটি।। (*হাসি সামলে*) বুড়োর রসটা দেখলে। রসের ডালিমটি!

ছেলেটি ॥ হাতে তো রাখতে হবে। এটাও একটা আর্ট। কেমন কজা করেছি! শিখতে হয়!

মেয়েটি ॥ তোমাকে শেখাতে হবে না!

ছেলেটি ॥ (*হেসে*) বরঞ্চ শিখতে হবে, না?

মেয়েটি ॥ এই, বুড়োটা কে আসবে বলে গেল না?

ছেলেটি ॥ আসুক।

মেয়েটি ॥ বুড়োরও বড়কর্তা! ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখবে না?

ছেলেটি ॥ সর্বনাশ করেছিলে আর কি! ঘরটা যেমন আছে তেমনটি রাখলেই তো সার্টিফিকেট। এদের আইন-কানুন ভুলে গেলে?

মেয়েটি ॥ ভাগ্যিস মনে করলে! (*কাল্পনিক ফুলদানিটা ঠিক জায়গায় নেই দেখে রাগ প্রকাশ করে।*) নিজেই ভুল কর আর আমার দোষ ধর।

ছেলেটি ॥ (*সুর করে*) ঘড়িটা?

মেয়েটি ॥ (*সুরে*) ঠিক আছে।...ক্যালেণ্ডারটা?

ছেলেটি ॥ ঠিক আছে।

মেয়েটি ॥ (*নিজেব দিকে তাকিয়ে*) আর আমি? আমি ঠিক আছি?

ছেলেটি ॥ (*আদরের সুরে*) তুমি? তুমি দারুণ ঠিক! কিন্তু তোমাকে দেখে যে আমারই মাথার ঠিক নেই। (*ধরতে যায়, হেসে পালায়, দরজায় কড়া নড়ে। ওরা থমকে যায়)* ঐ এলেন বোধহয়, খুলছি।

মেয়েটি ॥ দাঁড়াও! (*অদৃশ্য একটি আয়নায় দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক হয়ে নেয়)* আই-ব্রাউ পেন্সিলটা কোথায় গেল বল তো?

ছেলেটি ॥ ও দরকার নেই।

মেয়েটি ॥ দরকার নেই মানে?

ছেলেটি ॥ দরকার নেই মানে দরকার নেই। (*অদৃশ্য ওয়াড্রোব হাতড়ে)* এই যাঃ, আমার টাই?

মেয়েটি ॥ কোথায় যে কোনটা রাখ! এখন খোঁজার সময় আছে! পাউডারটা অবধি পাচ্ছি না।

ছেলেটি ॥ চশমা, চশমাটা রাখলুম কোথায়?

মেয়েটি ॥ একটা জিনিশ যদি ঠিক জায়গায় রাখবে! আমার লিপস্টিক?

[*আবার কড়া নাড়ার শব্দ*]

ছেলেটি ॥ পরে খুঁজবে, খুলে দিচ্ছি। এতক্ষণ দাঁড় কবিয়ে রাখাটা কীরকম অভদ্রতা জান?

মেয়েটি ॥ এমন ঘুমোও না তুমি। ঠিক জানি, চুরি হয়ে গেছে। আর কিসব নিয়েছে কে জানে? ড্রয়ারটা দেখতো—আমার ঘড়িটা আছে কিনা।

ছেলেটি ॥ (*কাল্পনিক ড্রয়ার দেখে*) না নেই। ঐ তো তোমার হাতে।

মেয়েটি ॥ এটা নয়, কাল যেটা কিনলুম।

[*কড়া নাড়ার শব্দ*]

ছেলেটি ॥ দরজাটা বন্ধ রেখে কী ভদ্রতা হচ্ছে বল তো?

মেয়েটি ॥ তোমাকে আমি খুলতে বারণ করেছি? সব সময় আমাকে ধমকাবে!

ছেলেটি ॥ সর্বনাশ! আমার জুতো? জুতোটার দাম কত জান?

মেয়েটি ॥ এঃ! জুতো পরে তো আর দরজা খুলবে না! (*গলায় হাত দিয়ে*) একী, আমার জড়োয়ার নেকলেসটা! (*কানে হাত দিয়ে*) দুল! দেখেছ, হীরের দুলটা কী হল? ছেলেটি ॥ আহা, যেন নেমন্তন্ন বাড়ি যাচ্ছ! ওসব দিয়ে এখন কি হবে! একি, আমার হিরের বোতাম?

মেয়েটি ॥ যেন বেরুচ্ছে! থাকবে তো ঘরে! (*বাইরে তাকিয়ে*) একি, আমাদের গাড়িটা?

ছেলেটি ॥ সর্বনাশ, আমার ফোনটা?

মেয়েটি ॥ ঘরের সোফাসেট?

ছেলেটি ॥ মেঝের লিনোলিয়ম?

মেয়েটি ॥ রেডিওগ্রাম?

ছেলেটি ॥ টেলিভিশন?

মেয়েটি ॥ (*চেঁচিয়ে*) বয়! বেয়ারা!

ছেলেটি ॥ (*চেঁচিয়ে*) বয়! বেয়ারা!

মেয়েটি ॥ (*হতাশ*) সব কোথায় গেল!

ছেলেটি ॥ (*হতাশ*) কারও সাড়া নেই!

[*ওরা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে মেঝেতে পড়ে যায়। ঘরের আলোগুলোও এক এক করে নিভে যাওয়াতে গভীর অন্ধকার ওদের গ্রাস করে। খানিকক্ষণ বাদে খুব অস্পষ্ট আলোতে ওদের দুটি মুখ দেখা যায়। আব দেখা যায় প্ল্যাটফর্মের ওপর মত্ত অবস্থায় শায়িত দ্বিতীয়কে। তার পোশাক নাটকের শুরুতে যা ছিল ঠিক তাই। তবে চেহারা ও পোশাক বিধ্বস্ত।*]

মেয়েটি ॥ কী ভীষণ ফাঁকা—আমার ভয় করছে।

ছেলেটি ॥ কিরকম ফাঁকা বল তো?

মেয়েটি ॥ আমার ভয় করছে গো!

ছেলেটি ॥ আমাদের ভেতরটাও এরকম ফাঁকা—কে যেন সব তুলে নিয়ে গেছে। ফাঁকা, ভীষণ ফাঁকা!

[*দ্বিতীয় এবার কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক কড়া নাড়ার ভঙ্গি করে।*]

মেয়েটি ॥ দরজাটা খুলবে তো?

ছেলেটি ॥ দেখলে, একদম ভুলে গিয়েছি।

মেয়েটি ॥ আজকাল তুমি খালি ভুলে যাও—কতবার বললুম একজন ডাক্তার দেখাও।

ছেলেটি ॥ কেবল তো আমাকেই ধমকাচ্ছ, ডাক্তারের কাছে তুমিও তো যাচ্ছ না—সারা রাত্তির ঘুমোও না! একবার ডাক্তারের কাছে গেলে কী হয়?

মেয়েটি ॥ কী হবে?

ছেলেটি ॥ ঠিক বলেছ, কী হবে। মানুষ বোধহয় কেবল নিজেদের জন্য বাঁচতে চায় না—একঘেয়ে লাগে। এক সময় সব মুখস্থ হয়ে যায়! আমাদের আর কেউ নেই, তাই না?

[*দ্বিতীয় কড়া নাড়ে।*]

ছেলেটি ॥ দাঁড়ান খুলছি।

মেয়েটি ॥ না, একা ঘর—খুলবে না। ওদের হাতে অস্ত্রপাতি থাকে। খালি হাতে কেউ আসে না।

ছেলেটি ॥ (*চেঁচিয়ে*) ও মশাই, কে কড়া নাড়ছেন?

দ্বিতীয় ॥ (*মত্ত অবস্থায় চেঁচিয়ে*) আমি।

ছেলেটি ॥ মশাই, আমিটা কে?

দ্বিতীয় ॥ আমি মশাই, আমি।

ছেলেটি ॥ (*মেয়েটিকে*) এঃ, যেন আমার সাতজন্মের চেনা! (*জোরে*) নাম বলুন।

দ্বিতীয় ॥ বললুম তো, আমি। আরে ধ্যাৎ, আমি।

মেয়েটি ॥ বুঝলে 'আমি' নামও হতে পারে। (*চেঁচিয়ে*) 'আমি' কি আপনার নাম?

দ্বিতীয় ॥ (*ভেঙচিয়ে*) আমি কি আপনার নাম! কথার ছিরি দেখ না! আমি কি কারুর নাম হয়? খুলুন না, একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। সেই থেকে দুটোতে মিলে কিচির মিচির করে যাচ্ছে, আর আমি একটা কথাও বলতে পারছি না। এই, খুলুন না!

ছেলেটি ॥ হাতে কিছু নেই তো?

দ্বিতীয় ॥ থাকবে না কেন? দশটি আঙুল আছে। খুলবেন না ভাঙব? দরজায় লাথি মারছি কিন্তু।

[*কাল্পনিক দরজায় লাথি মারে।*]

মেয়েটি ॥ লাথি মারছে!

ছেলেটি ॥ তার আমি কী করব? লাথি ও মারছে, আমি মারছি? সব-তাতে আমার দোষ, না?

মেয়েটি ॥ ভীষণ রেগে গেছে।

ছেলেটি ॥ তা রাগাও কেন?

মেয়েটি ॥ আমি রাগিয়েছি?

ছেলেটি ॥ আমি তো খুলে দিতে চাইছি!

মেয়েটি ॥ দাও না খুলে।

ছেলেটি ॥ এই যে খুলছি।

[*ওরা চুপি চুপি দরজা খুলে দূরে গিয়ে তাকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রচণ্ড বেগে গিয়ে লাথি মারে এবং খোলা দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের নিচে গিয়ে পড়ে।*]

দ্বিতীয় ॥ উহ্‌হু, পায়ের বুড়ো আঙুলটায় লাথি মারতে গিয়ে এমন লাগল! এমন হয়েছেন না সব।

মেয়েটি ॥ লাথি মারতে আমরা বলেছি? পায়ের জোর ফলাতে গেলে এরকমই হয়।

ছেলেটি ॥ কী মশাই, কথাবার্তা নেই, আমার ঘরে ঢুকে বসে আছেন?

দ্বিতীয় ॥ কে কার ঘরে ঢুকে বসে আছে?

মেয়েটি ॥ কে কার ঘবে মানে? এটা কি আপনার ঘর?

দ্বিতীয় ॥ এতে আর সন্দেহের কী আছে!

ছেলেটি ॥ আপনার মাথার ঠিক আছে?

দ্বিতীয় ॥ (*বিচিত্র হাসে*) ওটি আমারও প্রশ্ন। আপনাদের মাথার ঠিক আছে?

ছেলেটি।। ঢং রাখুন! ওঘরে ঢুকলেন কী করে?

দ্বিতীয়।। আমার ঘরে আমি ঢুকেছি—তা কেমন করে ঢুকেছি তার বর্ণনা দিতে হবে নাকি? কি রে মাইরি—

মেয়েটি।। কী উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছেন বলুন?

দ্বিতীয়।। কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমায় পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে আটকে রাখলেন সেটি আগে বলুন।

মেয়েটি।। কি বলছে কী?

দ্বিতীয়।। ঠিকই বলছি—সক্কালবেলা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ওঘরে ঢুকিয়ে দিলেন না? কী পুয়োর মেমারি রে বাবা!

ছেলেটি।। (*ভেবে*) সকালবেলা...সকালবেলা কি যেন একটা হয়েছিল...

দ্বিতীয়।। হ্যাঁ। ভূমিকম্প হয়নি—আমি যা বলছি সেই কাণ্ডটিই হয়েছিল।

মেয়েটি।। আমাদের জিনিশপত্র কোথায় গেল বলুন?

দ্বিতীয়।। আমার জিনিশপত্র কোথায় গেল সেটি আগে বলুন—আমি কি আর ফাঁকা ঘরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ দেয়ালা করতুম? ঘর ভর্তি জিনিশপত্র ছিল, কোথায় গেল সেসব?

ছেলেটি।। এঘরে আপনার জিনিশ ছিল?

দ্বিতীয়।। নিশ্চয়ই। সোফা, লিনোলিয়ম, টেলিভিশন—সব। মায় আপনার গিন্নীর মত একটি মেয়েছেলেও।

ছেলেটি।। তিনি কোথায়? ওঘরে ঘুমুচ্ছেন নাকি? কোথায় তিনি?

দ্বিতীয়।। (*মেয়েটিকে দেখিয়ে*) উনি যেখানে যাবেন, সেখানে তিনি আগেভাগে গিয়ে বসে আছেন।

মেয়েটি।। কোথায়?

দ্বিতীয়।। অনন্তধাম, আর কোথায়?

মেয়েটি।। (*সহানুভূতি নিয়ে*) আপনার স্ত্রী মারা গেছেন?

দ্বিতীয়।। বেঁচে নেই হল মোদ্দা কথা—মারা গেছেন কিনা অতো কথা কে জানে?

মেয়েটি।। অতো ধোঁয়াটে করে কথা বলছেন কেন?

দ্বিতীয়।। ধোঁয়ার এখন আর কী দেখলেন? দুটি তো পিদিম, মিটি মিটি জ্বলছে! ফুঁ-টি লাগলেই ফোক্কা। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে—কবে যে বাড়ি ফিরব!

ছেলেটি।। এই যে বললেন এটা আপনার বাড়ি?

দ্বিতীয়।। বললেই হয়ে যায়? এই যে বলছিলেন, ঘরভর্তি আপনাদের জিনিশপত্র ছিল। সত্যি ছিল?

মেয়েটি।। ছিলই তো।

দ্বিতীয়।। (*ধমকের গলায়*) থামুন! কিচ্ছু ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। (*গলার স্বর বদলে গভীর হয়*) বলুন, ছিল? না মনে মনে সব চাইতেন? প্রসাধন, আসবাব, বয়, বেয়ারা, কমফর্ট—আরাম আর আরাম!

মেয়েটি।। আরাম কে না চায়?

দ্বিতীয়।। হ্যাঁ, আমিও চাই—সবাই চায়। শুধু চাওয়ার পথটা বলে দেয় কোনটাতে তৃপ্তি, কোনটাতে বিষ! আমি জানি, আপনাদের জিভে বিষ লেগে আছে। একটু একটু করে ভিতরে যাচ্ছে—স্লো পয়জন। হ্যাঁ, এইভাবে, ঠিক এইভাবে এ-বাড়িতে একটি মেয়ে আজ আর বেঁচে নেই। ময়ূরের মত কোথাও উড়ছে আর সোনা দিয়ে বাঁধানো কতকগুলো লোভী দাঁত একটা একটা করে তার পালক টেনে ছিঁড়ছে। রক্ত আর লিপস্টিক মিশে গেছে, জড়োয়া কঙ্কণ আর হাতের শেকল মিলে গেছে। এটা আমারও বাড়ি নয়। আমরা এসে পড়ি, কিংবা আরো সত্যি কথা—আমাদের টেনে নিয়ে আসা হয়।

ছেলেটি।। কে টেনে আনে হয়ত আমি জানি।

দ্বিতীয়।। কে?

মেয়েটি।। কে যেন ধীরে ধীরে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

ছেলেটি।। তাড়িয়ে তো আমাকেও নিয়ে এসেছে। তখনও বুঝেছি, এখনও বুঝছি। কিন্তু কী করতে পারলুম?

ছেলেটি।। আমার নিজের ইচ্ছেয় আসিনি—বাধ্য হয়েছি। প্রতিবাদ করেছি, আমি...আমি খুন করতে চেয়েছি পর্যন্ত।

দ্বিতীয়।। একা একা যুদ্ধ হয় না। ধীরে ধীরে মরতে হয়, না হলে এইখানে এসে একদিন হাজির হতে হয়।

মেয়েটি।। আমরা মানতে চাইনি, বিশ্বাস করুন।

দ্বিতীয়।। (*স্বগতোক্তির মত*) একা একা যুদ্ধ হয় না। ধীরে ধীরে মরতে হয়, নাহলে এইখানে এসে একদিন হাজির হতে হয়।

ছেলেটি।। আমরা এখানে কোথায় এসেছি?

দ্বিতীয়।। ল্যাবরেটরিতে।

মেয়েটি।। কেন?

দ্বিতীয়।। এক্সপেরিমেণ্ট।

ছেলেটি।। কিসের এক্সপেরিমেণ্ট?

দ্বিতীয়।। লাস্ট এক্সপেরিমেণ্ট।

মেয়েটি।। কী করবে ওরা আমাদের নিয়ে?

দ্বিতীয়।। (*বিষণ্ণ*) জানিনা। ওই দরজার কড়াটা নড়ে উঠবে—একজন আসবে।

ছেলেটি।। হ্যাঁ, আমরা তা জানি।

দ্বিতীয়।। আমিও ঐটুকুই জানি।

মেয়েটি।। কিন্তু শুনেছি ইণ্টারভিউ নিতে আসবে?

দ্বিতীয়।। প্রথমে ইণ্টারভিউ-ই হয়। ঠিক আছে আমি ওঘরে যাচ্ছি। আপনাদের পর হয়ত আমারও ডাক আসবে। পর পর অনেকগুলো ঘরে হয়ত এরকম অনেকেই আছেন। আচ্ছা, চলি।

[*ধীরে পায়ে দ্বিতীয় চলে যায়।*]

মেয়েটি।। কেউ এলে আমরা দরজা খুলব না।

ছেলেটি।। ওরা নিজেরাই দরজা খুলতে জানে।

মেয়েটি।। তাহলে আমরা কী করব?

ছেলেটি।। ইন্টারভিউ দেব।

মেয়েটি।। না।

ছেলেটি।। উপায় নেই।

মেয়েটি।। তোমার সেই ছুরিটা কোথায়?

ছেলেটি।। *(বিষণ্ণ হেসে)* খুঁজতে হবে!

মেয়েটি।। এস না, খুঁজে বের করি।

ছেলেটি।। একা একা যুদ্ধ হয় না—লাভ নেই। মনে আছে—একজন হঠাৎ হঠাৎ আসত আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলত, 'সময় নেই—এক্ষুণি চলে এস'—আমরা কান দেইনি। এখন ছুরি পেলেই বা কি না পেলেই বা কি ক্ষতি।

[একটি ভয়ংকর বাজনা—অনেকটা মিলিটারি ব্যাণ্ডের মত—তালে তালে বাজতে থাকে। ছেলে ও মেয়েটি উৎকর্ণ হয়ে শোনার ও কিছু বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের ডালাটা খুলে ভেতর থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে আসে। একটা চোখে কালো ঢাকনা সুতো দিয়ে মাথায় বেঁধে আটকানো। দামী খাকি শার্ট-প্যান্ট, পায়ে শু। বুকে কয়েকটা মেডান শোভা পাচ্ছে। মাথায় ফেল্টের টুপি। ছদ্মবেশের মধ্যেও দর্শকরা প্রথম-কে চিনতে পারেন।]

প্রথম।। *(চারিদিকে তাকায়)* লুসি, লুসি—!

ছেলেটি।। কাকে খুঁজছেন?

প্রথম।। লুসি—মাই হানি, সুইট্ ডগ। লুসিকে দেখেছ?

মেয়েটি।। না, কোন কুকুরই আসেনি এদিকে।

প্রথম।। ও যে ঢুকল, আমি দেখলাম। লুসিটা যা দুষ্ট হয়েছে না, মাই নটি প্রিটি লুসি!

ছেলেটি।। খুব ভালবাসেন বুঝি ওকে?

প্রথম।। আমার সঙ্গে ঘুমোয়। ভারি সতর্ক। শী ক্যান ইভেন স্মেল এনিবডিজ ফুটস্টেপস।

ছেলেটি।। আপনাকে ঠিক চিনলুম না—আপনি এখানেই থাকেন?

প্রথম।। কোন একটা জায়গায় থাকতে আমার ভাল লাগে না—আই লাভ এক্সপ্যান্শন। স্প্রেড-আউট, ব্রাদার, স্প্রেড আউট—দিস ইজ্ মাই মোটো। পৃথিবীটা বড্ড ছোট—মনে হয় পাশ ফিরে শুলেই গায়ে দেওয়াল ঠেকে যাবে। আই লাভ ফ্যান্সি। ইচ্ছে করে প্ল্যানেটগুলোয় দড়ি ঝুলিয়ে একটা মজার দোলনা বানিয়ে দুলব। বাট হোয়ারজ্ মাই লুসি?

ছেলেটি।। খুঁজে দেখব?

প্রথম।। কিচ্ছু দরকার নেই, আমার গলা শুনে ও ঠিক আসবে। মাই মিশন ইজ টু ব্যাপটাইজ্। আমাকে অনেকে মজা করে বলে জেসাস দি সেকেণ্ড। দ্যাট ওল্ড জেসাস্ কিন্তু একটা ভাল কথা বলেছিল, লাভ দাই নেবার—প্রতিবেশীদের ভালবেসো। বাট লেট জেসাস ওয়াজ লেস প্রাকটিক্যাল। বৃদ্ধ জানতেন না, সকলেই প্রতিবেশী নয়। প্রতিবেশী

চিনে নিতে হয়, গড়ে নিতে হয়। ইওর নেকস্ট ডোর নেবার মে বি ইওর নেক্স্ট ডোর এনিমি। তাহলে আমার রেলিজিয়ান দিয়ে আমি কাকে প্রোটেক্ট করব? আমার নিজের প্রতিবেশীদের, তাই তো? এটি একটি মহৎ দায়িত্ব। দায়িত্বই ধর্ম, রেলিজিয়ান। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য মডার্ন সায়েন্স আমাকে অ্যাসিস্ট করছে, টপ ব্রেনস আমাকে কাউনসেল দিচ্ছে। এবং আমার গোটা মেশিনারি অসংখ্য মানুষ মাথায় করে আছে। আই মাস্ট্ লাভ মাই সিলেকটেড নেবারস। প্রোটেক্শনের জন্য রয়েছে গান, বুলেট, প্লেন, ওয়ার—অ্যাণ্ড হোয়াট নট।...লুসি,...লুসি। ও হ্যাঁ, এখানে কি যেন একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল আমার?

ছেলেটি।। আপনি, আপনিই কি আমাদের ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন?

প্রথম।। ও হ্যাঁ, নেব। কিন্তু তার আগে লুসিটাকে যে চাই। কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারে। কন্স্পিরেসি। দেয়ারজ্ এ জুডাস ওয়ার্কিং অন আস্ সামহোয়ার।

মেয়েটি।। আপনি ওকে বেঁধে রাখেন না কেন?

প্রথম।। বাঁধব বলেই তো খুঁজছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ওকে ছাড়তে হয়। না ছাড়লে দুষ্টু ছেলেগুলোকে কামড়াবে কী করে? ওরও তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে কিছু আছে।...লুসি ঠিক এতক্ষণে বাচ্চাদের পার্কটায় ঢুকে পড়েছে. দুষ্টু ছেলেগুলোকে কামড়াতে শুরু করে দিয়েছে। হা—হাঃ!

ছেলেটি।। ওটাকে আপনার গুলি করে মারা উচিত।

প্রথম।। কী বলছ? জান ওটা কী জাতের কুকুর! তাছাড়া, ট্র্যাডিশন! এর পিতা-প্রপিতামহ, আরও পিছিয়ে যাও—এদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ চিরটাকাল আমাদের ফ্যামিলিকে জেনারেশন আফটার জেনারেশন সার্ভ করে এসেছে! আমি একে গুলি করব! লুসির বাচ্চাগুলোকে মানুষ করার জন্য কত পরিশ্রম আর খরচা ভাবতে পার? তাছাড়া কেবল ওকে দোষ দিলেই তো হবে না? আমার গ্রাণ্ড-গ্রাণ্ডফাদারের আমল থেকে একটা প্র্যাকটিস চলে আসছে। কুকুরগুলোকে এক চামচে, দু-চামচে ব্লাড ড্রিঙ্ক হিসেবে দেওয়া হত। এখন ওটা ওদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ওরা তো চাইবেই।

মেয়েটি।। রক্ত!

প্রথম।। হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড। তেমন কস্টলিও নয় অথচ ভারি টেস্টফুল—অ্যাণ্ড দে লাইক ইট ভেরি মাচ্। এখন, আমার লুসিটা পুরো একবাটি রক্ত চুক্‌চুক্ করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নেবে। রক্তটা যদি বাচ্চাদের হয়—ওর আরও আনন্দ। লুসিটা এলে দেখবে, এখন ও আমার কোলে উঠে সারা গায়ে মুখ ঘষবে, চাটতে থাকবে, আর গব-গব্ করে গলায় মিষ্টি আওয়াজ করবে—মাই প্রিটি নটি লুসি! শী ইজ আ জেম অফ আ ডগ—কতক্ষণ দেখি না ওকে জান! (*ডাকে*) লুসি—লুসি!

মেয়েটি।। ওকে এখানে ডাকবেন না।

প্রথম।। কেন?

ছেলেটি।। যে বর্ণনা শুনলাম, তাতে ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

প্রথম।। (*হাসে*) বড্ড ভিতু দেখছি। আরে, ও কি যাকে পাবে তাকেই কামড়াবে নাকি? ও যদি বুঝতে পারে, তুমি আমার বেশ ওবিডিয়েন্ট—তোমার কিচ্ছুটি করবে

না। পায়ের কাছে শুয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে তোমাকে আদর করবে। আর তুমি যদি অবাধ্য হও—ঘরের এটা সরাও, ওটা নাড়াও, এটা ভাঙো, ওটা ছুঁড়ে দাও—লুসি একেবারে খ্যাঁক করে তোমার ঘাড়ে চাপবে। যেমনটি আছ ঠিক তেমনি থাক—ওর মত ভাল আর হয় না।

ছেলেটি ॥ *(সন্দিগ্ধ)* আপনি কে বলুন তো?

প্রথম ॥ কেন?

মেয়েটি ॥ ঠিক এরকম কথা আমরা অনেকবার শুনেছি।

প্রথম ॥ শুনবে না কেন? যা সত্যি তা শুধু শুনলেই হয় না, মনে রাখতে হয়। কর্মে তাকে রূপ দিতে হয়।

ছেলেটি ॥ আপনি—আপনি রাজাসাহেব?

প্রথম ॥ কে রাজাসাহেব? কার কথা বলছ?

মেয়েটি ॥ আপনি—আপনার কথা বলছি। আপনাকে আমরা চিনি, অনেকদিন ধরে চিনি।

প্রথম ॥ *(রাজাসাহেবের স্বাভাবিক গলায় ফিরে আসে)* যাক আবার চিনতে পেরেছ তাহলে?

ছেলেটি ॥ (*উত্তেজিত*) অনেকদিন ধরে আপনার খেলা আমার দেখেছি। আপনার ঐ লুসি অনেকবার আমাদের বুকে থাবা বসিয়েছে। চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত পাইনি, থাবা মেলে কেড়ে নিয়েছে। বিশ্রী চিৎকারে ঘুমোতে পারিনি, জেগে থাকতে ভয় করেছে।

মেয়েটি ॥ এবার কী চান আমাদের কাছে? আমাদের আর কিছুই নেই, বিশ্বাস করুন কিছুই নেই!

প্রথম ॥ আছে। এখনও কিছু আছে বইকি!

ছেলেটি ॥ *(উত্তেজিত)* ছিল—আমার কাছে একটা ছুরি ছিল আর তার লক্ষ ছিলেন আপনি!

প্রথম ॥ কী হল সেটি?

ছেলেটি ॥ (*অসহায় কণ্ঠে*) আপনি ভাগ্যবান, ছুরিটা তুলে কোন লাভ নেই এখন। আপনি ভাগ্যবান—আক্রমণের চরিত্রটা বড় দেরীতে জানলুম। বড় দেরীতে জানলুম যে একা একা যুদ্ধ হয় না।

প্রথম ॥ তবুও জেনেছ, এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। কিন্তু জেনে কি লাভ তোমাদের?

মেয়েটি ॥ জানাটাও অনেক।

প্রথম ॥ কতটুকু?

ছেলেটি ॥ আমরা আর একা থাকব না—অন্তত এইটুকু।

প্রথম ॥ *(শক্তগলায়)* শেষ কথা?

ছেলেটি ॥ শেষ কথা।

প্রথম ॥ *(হাসে, যেন কিছুই হয়নি এভাবে)* যাকগে, কি খাবে তোমরা বল। এনি ড্রিঙ্কস্, ফ্রুটস্? অর এনিথিং?

মেয়েটি ॥ আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন?

প্রথম।। বিন্দুমাত্র না। তোমরা যখন শেষ কথা বল, আমিও শেষ সিদ্ধান্ত করি। শেষ নি:শ্বাস কেড়ে নেবার আগে শেষ ইচ্ছা পূরণের একটা প্রাচীন রীতি আছে। তাই জিজ্ঞেস করছি—কি খাবে?

ছেলেটি।। আমরা জানি আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই--কিন্তু এখন আর ভয় পাই না।

প্রথম।। উত্তম। তাহলে এবার ঐ পাশের ঘরে যাও।

ছেলেটি।। কেন?

প্রথম।। যাবে—কারণ সে রকম ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি।

মেয়েটি।। কিসের ব্যবস্থা?

প্রথম।। না—প্রাণে মেরে ফেলার কোন ব্যবস্থা নয়। ভয় কী? তোমাদের মত অনেকেই এরকম ফোঁস করে ওঠে—সবাইকে কি আর মারি! কত লোক তো আমাদের ছেড়েও যাচ্ছে।—তাই বলে কি তাদেব মেরে ফেললেই সমস্যা মিটে গেল? আমাকে ভাবতে হয় কেন যায়? ভাবতে হয়, তোমরা যে ফোঁস করে উঠলে তার কারণটা কী? রক্তে তোমাদের কী থাকে? ওঘরে তোমাদের নিয়ে সেই কারণটা খুঁজব।

[ওরা কঠিন অথচ শান্ত মুখে লাল দরজাটার দিকে এগোল]

ছেলেটি।। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেণ্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকে এগিয়ে আনবে।

প্রথম।। জানি, জানি! চূড়ান্ত মুহূর্তের কথা না ভেবে নিজেদের শেষ মুহূর্তের কথা ভাব। সিরিঞ্জে করে যেটুকু রক্ত আছে টেনে তুলে একটা বাটিতে রাখব। তারপর ঐ রক্তটা ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজব তোমাদের হঠাৎ হঠাৎ ফণাটা এত উঁচু হয় কেন? রক্তের মধ্যে থেকে ঐ বীজাণুটি খুঁজে বের কবে যদি তাকে ধ্বংস না করতে পারি—তা হলে শেষ যুদ্ধটায় যে ভাই বড় বেকায়দায় পড়ে যাব। নাও চল—আমার আর সময় নেই, চল।

[ওরা তিনজন অদৃশ্য হতেই মঞ্চ অন্ধকার। ওদেব দুজনের তীব্র আর্তনাদ—দূরে কোথাও যেন একটা কুকুর ডেকে উঠছে। দরজাটার উপর কেবল একটা লাল আলো পড়ে। খানিকক্ষণ পরে দরজা ঠেলে লাল বঙের একটা বাটি হাতে প্রথম ঢোকে। মঞ্চের মাঝখানে সন্ত্রস্ত, ভীত মুখে এগিয়ে আসে। মাথার ফেল্ট টুপিটা এবার নেই। পোশাকের ওপরে একটা কালো আলখাল্লা। তার গায়ে লাল ডোরাকাটা। একটা লাল আলো ওকে ধরে রাখে—অন্যদিক অন্ধকার। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলে]

প্রথম।। ব্লাড। বড্ড কম ছিল রক্ত—দুটো শরীর অথচ এত কম রক্ত না! লুসিটারও পেট ভরে না! আপনারা ব্লাড রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এবারও আমি আপনাদের সুখী করতে পারলাম না। সমস্ত রক্ত ঘেঁটে-ঘুঁটেও খুঁজে পেলাম না কোথায় ওদেব রোগের বীজাণুগুলো লুকিয়ে আছে—ওদের রক্ত এতো চালাক, ধূর্ত, এতো পিছল! আমার আঙুল ধরতে পারে না, মাইক্রোস্কোপে ছায়া পড়ে না। একটু নাড়লে বাটির মধ্যে

রক্তটা কিরকম খল্‌খল্‌ করে হাসে। আমার শেষ যুদ্ধ ওদের এই ভয়ঙ্কর রক্তকণাগুলোর সঙ্গে। আমাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে। বাটিটার রক্তে আমার ছায়া পড়েছে —কী সুন্দর মুকুট। *(বাটিটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে)* একী! আমার মুকুটটার গায়ে অসংখ্য পোকা! রক্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আমার মুকুটে! আমার মুকুট! *(দু'হাতে মাথার অদৃশ্য মুকুটটা চেপে ধরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। মাথাটা চেপে ঐ দিকে ভয়ার্ত তাকায়, লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়)* রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাকে তাড়া করছে, *(প্রায় কান্নার মত গলায়, মাথাটা দু'হাতে চেপে শরীরটা বাঁকিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ভয়ার্ত সরে যেতে যেতে)* গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তটা আমাকে তাড়া করছে! লুসি! লুসি! সেভ্ মি! লুসি! *(হঠাৎ যেন কাল্পনিক লুসিকে দেখতে পায়, স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আতঙ্কিত গলায়)* লুসি, মাই লুসি—ড্রিঙ্ক, লুসি ড্রিঙ্ক! *(লুসিকে আদর করে)* লুসি, মাই হানি! হ্যাঁ সবটুকু খেতে হবে, সবটুকু। *(হঠাৎ কী দেখে যেন আর্তনাদ করে ওঠে)* লুসি, গেট আপ। রান অন্। লুসি, রান অন্ —রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে—পালা, লুসি পালা! রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে, পালা!

[*ভয়ার্ত ছুটে পালিয়ে যায় প্রথম। একটা সঙ্গীত বাজতে থাকে— যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে রাজাসাহেবকে। ধীরে ধীরে মঞ্চে আবার স্বাভাবিক আলো ফিরে আসে। সঙ্গীত থেমে যায়। একে একে ছেলেটি, দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং মেয়েটি প্রবেশ করে। ওরা কখনো আলাদা, কখনো একসাথে কোরাসে কথা বলে।*]

ছেলেটি।। এই খেলা চলছে, রোজ—

ছেলেটি ও দ্বিতীয়।। এই খেলা চলছে, রোজ—

তিনজনের কোরাস।। এই খেলা চলছে। রোজ! ঘরে—বাইরে—দূরে।

মেয়েটি।। কিন্তু এ তো চিরকাল চলতে পারে না।

ছেলেটি।। আমার হাতের সেই ছুরিটা, সেও তো চিরকাল অদৃশ্য থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়।। রাজভৃত্যের ঘুম ভাঙে, চিরকাল ঘুমাতে পারে না।

কোরাস।। এ খেলার শেষ—যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।

প্রথম।। *(যেন আবির্ভাব)* শেষ লড়াই একটা সত্যিই দরকার। আমার শেষ অস্ত্র! ছিন্নভিন্ন হোক হাতে-হাতে জড়ানো মানুষের অসংখ্য ঢেউ। অন্ধ হয়ে যাক সুখে-দুঃখে মিলিত অসংখ্য দৃষ্টি। স্তব্ধ হোক মিলিত পদশব্দের তুমুল গর্জন। আমার শেষ অস্ত্র? ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওদের স্পর্দ্ধার নিষ্ঠুরতম জবাব আমি দিয়ে যাব।

[*তিনজন এগোয়। ধীর অথচ গম্ভীর কোরাস*]

কোরাস।। ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে এই স্পর্দ্ধার নিষ্ঠুরতম জবাব আমরা দিয়ে যাব।

প্রথম।। *(চিৎকার)* তাহলে কি চূড়ান্ত মুহূর্ত আসন্ন?

কোরাস।। হ্যাঁ, আসন্ন সেই ক্রান্তিকাল। ক্রান্তিকাল! ক্রান্তিকাল!

[*ওরা রাজাসাহেবকে ঘিরে ধরে*]

প্রথম।। কী চাও?

কোরাস।। রাজরক্ত!

প্রথম॥ রাজরক্ত? কিন্তু সে যে অনেক। লৌহভাণ্ডে জমানো আছে অনেক ঘরে, ভাঙতে হবে অনেক দুয়ার।

ছেলেটি॥ এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত কর বর্বর স্পর্দ্ধাকে—ইতিহাসের জন্য আঘাত কর।

মেয়েটি॥ আঘাত কর সিংহাসনের শোষণে—মর্যাদার জন্য আঘাত কর।

দ্বিতীয়॥ আঘাত কর শৃঙ্খলে—স্বাধীনতার জন্য আঘাত কর।

কোরাস॥ আঘাত কর জীবনের জন্যে—আঘাত কর—আঘাত কর।

[রাজাসাহেবকে ওদের আক্রমণের সামনে দুর্বল মনে হচ্ছে। তার পরাজয় যেন অবশ্যম্ভাবী। ওরা তাদের উদ্যত অস্ত্র নিয়ে রাজাসাহেবের মুখোমুখি—চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। এমন সময়...]

॥ যবনিকা নেমে আসে ॥

স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক

রিঙ

চরিত্র : অরুণ, শীলা, অফিসার, রামসিং, ডাক্তার

[*ঘরটা এলোমেলো। কিছু আধুনিক ছবির ক্যানভাস ইতস্তত—দেয়ালে, মেঝেয় ছড়ানো-ছিটোনো। একটা টেবিল ছবি আঁকার সরঞ্জামে প্রায় উপচে রয়েছে। টিনের চেয়ার-দু-তিনটে —এ-ধারে ও-ধারে রঙ লেগে আছে। একটা বেশ বড় মাটির ঘোড়া ভাঙা ডান-পা-টা শূন্যে তুলে আছে। অরুণ সিগারেটে বেপরোয়া টান দিচ্ছে, মুখে অস্থিরতা, দৃষ্টি অনির্দিষ্ট। ওর চেহারায় বিপর্যস্ত তারুণ্য। অরুণের অন্যমনস্কতার মধ্যে ওর স্ত্রী শীলা এসে এক কোণে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে রাত একটার ঘণ্টা বাজে। অরুণ কিছুটা চমকে ঘাড় ফেরাতে শীলাকে দেখে। শীলা ছিমছাম মার্জিত চেহারার মেয়ে—মুখটা বিষণ্ন।*]

অরুণ।। একি এখনও ঘুমোও নি?

শীলা।। ডাক্তারবাবু কি এত রাত্রে আর আসবেন? মিছিমিছি জাগছ, শুয়ে পড়।

অরুণ।। না-না ঠিক আসবে। ওর সঙ্গে আলোচনা ভয়ানক জরুরি, তুমি শুয়ে পড়।

শীলা।। ঘুম পাচ্ছে না।

অরুণ।। (*পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করে*) এই নাও, এই ঘুমের ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও।

শীলা।। ও-ট্যাবলেটে কিছু হয় না।

অরুণ।। বেশ, দুটো খাও।

শীলা।। আজকে আমাকে ঘুমোবার জন্য এত জোর করছ কেন বল তো? কিছু একটা তোমার মাথায় ঘুরছে। আজ সারাটা দিন তোমাকে অস্থির দেখাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই তুমি যেন কেমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছ।

অরুণ।। আমাকে কোনরকম সন্দেহ করছ, মনে হচ্ছে।

শীলা।। তুমি আমাকে সন্দেহ কর না?

অরুণ।। আমার উপায় ছিল না। তুমি যদি রিঙ দুটো ফিরিয়ে দিতে কোনরকম ঝঞ্ঝাট-ই হত না।

শীলা।। আমি তোমার রিঙ নেইনি।

অরুণ।। (*একটা রঙ আঁচড়ে-আঁচড়ে তোলা ঝোলানো ক্যানভাস দেখিয়ে*) ক্যানভাসটার দিকে তাকাও, তোমার মায়া হবে। আমাদের অমন প্রিয় ছবিটা থেকে তুমি যে কি করে রিঙ দুটো আঁচড়ে তুলে নিতে পারলে। ছবিরও গায়ে আঘাত লাগলে রক্ত পড়ে—আমি তোমার নখে ঐ রক্ত দেখেছিলাম। সন্দেহ আমার অমূলক নয়, শীলা!

শীলা।। আমার নখে কি করে রঙ লেগেছিল, আমি জানি না। তোমার টেবিল গোছাতে গিয়ে প্যালেট থেকেও লাগতে পারে।

অরুণ।। (*ক্ষুব্ধভাবে*) আমাকে বোঝাতে চেষ্টা কোরো না, আমি রঙ চিনি। ওটা আমার ক্যানভাসের রঙ। শুকনো রক্তের মতো তোমার নখে লেগেছিল। তোমার দুটো হাত আদর করে ধরতে গিয়ে আমি যেন সাপের ছোবল খেলাম। এ-সব তুমি হিংসায় করছ!

শীলা।। হিংসা?

অরুণ।। হ্যাঁ, হিংসা! তুমি দিনের পর দিন আয়তনে ছোট হয়ে যাচ্ছ—আর তার থেকে তোমার মধ্যে স্পষ্ট একটা কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে টের পাচ্ছি। তোমার ধারণা

তুমি ছোট্ট হয়ে যাচ্ছ বলে আমি তোমাকে মনে মনে বিতৃষ্ণায় ত্যাগ করছি। কিন্তু আমি তোমাকে এখনও আপন ভাবি।

শীলা।। মিথ্যে কথা। রোজ এসে তুমি আমাকে মাপো। আর যেই দ্যাখো, আর একটু ছোট হয়ে গেছি অমনি তোমার মুখটা কেমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

অরুণ।। নিষ্ঠুর নয়, করুণ হয়ে ওঠে।

শীলা।। নিষ্ঠুর মুখ কাকে বলে আমি চিনি। তাছাড়া তোমার আচরণ, সেটাও কি দিনের পর দিন বদলাচ্ছে না?

অরুণ।। তুমি ভুল ভাবছ।

শীলা।। ভুল আমি ভাবি না।

[*বাইরে কড়া নড়ে ওঠে। অনেকগুলো গলা শোনা যায়। অরুণ চঞ্চলভাবে উঠে পড়ে। দরজা খুলতে যায়।*]

অরুণ।। বললুম, তুমি ঘুমিয়ে পড়!

শীলা।। দাঁড়াও, দরজা খুলো না। আগে বল এত রাত্রে কারা এল? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এদের জন্যই অপেক্ষা করছ! ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই নন—অনেকগুলো অন্য রকম গলা পেলাম।

অরুণ।। তুমি ভিতরে যাও।

শীলা।। আমাকে ও-ঘরে পাঠালেই সব কথাবার্তা আড়াল হয়ে যাবে ভাবছ? আমি শুনতে পাব না?

অরুণ।। কি আশ্চর্য, ওদের কি বাইরে এতো রাত্রে দাঁড় করিয়ে রাখব?

শীলা।। ওরা কারা?

অরুণ।। পুলিশের লোক।

শীলা।। পুলিশের লোক কেন?

অরুণ।। আমি ডেকেছি।

শীলা।। কেন?

অরুণ।। ওরা বাড়িটা সার্চ করবে। রিঙ্ দুটো আমার চাই।

শীলা।। তার মানে, তুমি নিশ্চিত হয়ে আছ, আমি তোমার ক্যানভাস থেকে রিঙ্ দুটো চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি।

অরুণ।। বলেছি তো, আমার যা ধারণা হয়েছে, তোমাকে তা লুকিয়ে অসৎ হতে চাইনি। তোমাকে বারবার ফিরিয়ে দিতে বলেছি, তুমি কানেই তোলনি, অগত্যা আমার উপায় ছিল না।

শীলা।। আমি নেইনি।

অরুণ।। ওঁরা খোঁজার পরেই প্রমাণ হবে। যদি না পাওয়া যায় আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিও মিটে যাবে।

[*বাইরে তীব্র কড়া নড়তে থাকে।*]

অরুণ।। খুলে দিচ্ছি।

শীলা।। যা খুশি কর। কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করলে!

অরুণ।। অপমান করতে আমি চাইনি। খুলে দিচ্ছি।

[*দরজা খুলে দেয়। একজন অফিসার কয়েকজন পুলিশ-সহ ঢোকে।*]

অফিসার।। নমস্কার।

অরুণ।। নমস্কার।

অফিসার।। এখনও রিঙ্‌ দুটো পাননি?

অরুণ।। না।

অফিসার।। তাহলে সার্চ করতেই হবে?

অরুণ।। সেইজন্যই আমি আপনাদের ডেকেছি।

অফিসার।। (*পুলিশদের*) তোমরা ভিতরের ঘরগুলো খুঁজতে থাক। কেউ ওদের হেল্প করবে নিশ্চয়ই, মানে বাক্সের চাবিগুলো চাই, সার্চের সময় অবশ্য কাছে থাকা যাবে।

শীলা।। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

[*অরুণ শীলার দিকে তাকায়। শীলা গম্ভীর। পুলিশেদের সঙ্গে নিযে শীলা ভিতর ঘরে চলে যায়। অফিসার ওকে লক্ষ করে।*]

অফিসার।। আপনার স্ত্রী? উনি কতোদিন ধরে ছোট হচ্ছেন?

অরুণ।। সাত-আট বছর।

অফিসার।। কতো ইঞ্চি ক'রে ছোট হন?

অরুণ।। ইঞ্চি মেপে হন না—আমি টের পাই। ও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

অফিসার।। তাহলে উনি অনেক লম্বা ছিলেন বলেন?

অরুণ।। না, খুব একটা নয়।

অফিসার।। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ গোলমেলে লাগছে। আচ্ছা আপনার সেই ছবির ক্যানভাসটা কোথায়, যেখান থেকে রিঙ দুটো চুরি গেছে?

অরুণ।। (*ক্যানভাসটা দেখিয়ে*) ঐ দেখুন, কি রকম আঁচড়ে-আঁচড়ে তুলে নিয়েছে।

অফিসার।। ছবিটায় কি কেবল রিঙ্‌-ই ছিল?

অরুণ।। ছবিটাকে আমাদের একটা যৌথ পোর্ট্রেট-ও বলতে পারেন। সাবজেক্টটা ছিল, যেন আকাশ থেকে, কিংবা ধরুন তার-ও উঁচু থেকে।

অফিসার।। আকাশ থেকেও আবার উঁচু কোন বস্তুটি?

অরুণ।। ব্যাপারটা আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আকাশের উপরে আকাশ—বুঝতে পারলেন?

অফিসার।। না।

অরুণ।। তাহলে আপনি আমার স্টেটমেন্টটা কেবল লিখে যান।

[*অফিসার ঘাড় নেড়ে নোট করতে প্রস্তুত হয়।*]

অরুণ। সেই রহস্যময় উঁচু থেকে দুটো দড়ি ঝুলছিল, তার সঙ্গে আমি দুটো রিঙ্‌ আঁকলুম। এটা আমার ছবি।

অফিসার।। (*ভূতের গল্প শোনার মত মুখ। নোট নিতে থাকে*) তারপর?

অরুণ।। আমি ঐ রিঙ্‌ দুটোয় নানা রঙের পালকের দুটো পাখি দুলিয়ে দিলুম।

অফিসার।। পাখি দুটো দেখছি না তো।

অরুণ।। রিঙ্ নেই তো। কয়েকদিন ওরা হাওয়ায় ঝুলে থাকল। ওদের খাঁচাই বলুন আর আশ্রয়ই বলুন কিংবা আনন্দ—সেতো ঐ রিঙ দুটো। রিঙ্ চুরির পর ওরা দু-একদিন অসহায় ঝুলতে ঝুলতে আর্তনাদ করে চেঁচামেচি করল। তারপর একদিন—কোথায় উড়ে গেল!

অফিসার।। পাখি দুটোর যে রকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তাতে ওরা হয়ত বেশিদূর উড়েও যেতে পারেনি ; হয়ত কাছাকাছি কোথাও ডানা ভেঙে পড়ে আছে। কাছাকাছি চারিদিকটা খুঁজে দেখেছেন?

অরুণ।। মন্দ বলেননি, খুঁজতে হবে।

অফিসার।। আর একটা সন্দেহও আমার মাথায় উঁকি দিচ্ছে—এওতো হতে পারে শীলা দেবী ঐ পাখি দুটোও লুকিয়ে রেখেছেন।

অরুণ।। এটা কিন্তু ভাবি নি।

অফিসার।। ভাবতে হবে। ভাবার জন্য মাথা দরকার। আমাদের এটাই কাজ কিনা। আমাদের মধ্যে যে যতো সন্দেহ করতে পারে, তার ততো উন্নতি। আপনাকে আর একটা অনুমানের কথাও বলতে পারি। অর্থাৎ পাখি দুটো আর বেঁচে নেই।

অরুণ।। বেঁচে নেই?

অফিসার।। থাকবে কি করে? ওদের লুকিয়ে রাখতে হলে, মেরে ফেলাই স্বাভাবিক।

অরুণ।। আমি কিন্তু এতোটা ভয়ংকর কিছু ভাবতে পারিনি।

অফিসার।। ভাবতে গেলে মাথা চাই, বুঝলেন? আমাদের এটাই কাজ তো। আমাদের মধ্যে যে যতো অশুভ অনুমান করতে পারবে, সে ততো বড় হবে। দেখবেন, আমি কতো বড় হই।

[*বাইড়ে আবার কড়া নড়ে। অরুণ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে।*]

অফিসার।। *কে? এত রাত্রে?*

অরুণ।। ডাক্তারবাবু। উনি নিজের ইচ্ছেয় শীলার কেসটা টেক-আপ করেছেন। উনি একজন হিপনোটিস্ট। দাঁড়ান, খুলে দিচ্ছি।

অফিসার।। একটুকাল অপেক্ষা করুন। আমি বন্দুকটা বের করে'নি। যে-ই আসুক আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। না-জানিয়ে যদি আমার মা আসেন তাহলেও আমার রিভলবার লোডেড রাখব। আমাদের মধ্যে যে যতো বেশি সতর্ক হবে সে ততো বড় হবে। (*বন্দুক হাতে রাখে*) এবার খুলে দিন।

[*অরুণ দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পাবার মত মুখ করে। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে।*]

অরুণ।। কাউকে তো দেখলাম না। অথচ কড়াটা বেশ জোরে নড়ল না?

অফিসার।। বেশ জোরে। সম্ভবত আমার বন্দুকের কথা শুনে পালিয়েছে। একটু সাবধানে থাকবেন।

অরুণ।। এ-ও হতে পারে, সেই পাখি দুটো ঘরে ঢুকতে চাইছিল। ঠোঁট দিয়ে কড়াটা নেড়ে আমাকে ডাকছিল।

অফিসার।। তার মানে পাখির ভূত! এ ব্যাপারে কিন্তু আমি আপনাকে হেল্প করতে

পারব না, কারণ আমার বন্দুকে আজ অবধি কোন ভূত মারা পড়েনি। অবস্থাটা কিন্তু ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আমাদের দায়িত্বটা দ্রুত শেষ করে ফেলা উচিত। ওদের ভিতরে গিয়ে একটু তাড়া দিন না।

অরুণ।। আমি দরজাটা তাহলে খুলেই রাখি, কি বলেন? পাখি দুটোর আত্মা যদি আসতে চায়, আসুক। ওরা আমাকে চায়।

অফিসার।। কিন্তু আমাকে তো চায় না, বুঝলেন তো। আমার কাঁধ দুটো বেশ চওড়া দেখছেন তো। দাঁড় ভেবে যদি প্রেতাত্মা দুটি বসে পড়ে, সে কি রকম সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভাবুন। অহেতুক জড়িয়ে কী লাভ বলুন। আমাদের মধ্যে যে যতো অকারণে জড়াতে না চায়, সে ততো বড় হয়। বড় হতে গেলে, আমার উঠে পড়াই উচিত, তাই না? *(চেঁচিয়ে ডাকে)* রামসিং!

[*পুলিশের দলটা ফিরে আসে।*]

অফিসার।। পেলে?

রামসিং।। কুছ্ মিলা নেই, সাব।

অফিসার।। তাহলে আর কি, উঠে পড়ি। তোমরা বেরোও, আমি আসছি। শোন, বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ কিছু দেখে চমকে উঠলে চেঁচিও ; তাহলে আর আমি বেরুব না, মানে কাল ভোরে যাব। কেবল ডিউটিই বড় কথা নয়—নিজেকে বাঁচিয়ে না রাখলে ডিউটি দেবেটা কে? রাম সিং তোমরা তাহলে বেরোও।

[*পুলিশের দল বেরিয়ে যায়।*]

অফিসার।। রামসিং!

রামসিং।। (*বাইরে থেকে*) হুজুর!

অফিসার।। বাহার মে চাঁদনিকা আলো হ্যায়?

রামসিং।। হাঁ হুজুর।

অফিসার।। আচ্ছা, তাহলে উঠি, বাইরে আলো আছে। বুঝলেন, আলো ছাড়া চলবেন না। চাঁদের আলোতে তো সবটা দেখা যায় না, বাকিটা টর্চে দেখে নেব। তবে সাবোর্ডিনেটের সামনে আমি টর্চ জ্বালতে চাই না। কিন্তু আজকে জ্বালব। উঠি।

[*কড়া নড়ে উঠল। অফিসার উঠতে গিয়ে চমকে আবার বসে পড়ে*]

অফিসার।। বসলুম, মানে, আপনাকে আর একটু সাবধান করা প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা লোহার চাবি হবে?

অরুণ।। কেন বলুনতো।

অফিসার।। লোহা সঙ্গে থাকলে যে কোনরকম প্রেতাত্মা কাছেই ঘেঁষতে পারে না, বন্দুকটাইতো সব নয়। আমাদের পুলিশি আইনে, বন্দুকটা যতো কম ব্যবহার করা যায়, ততোই বাহাদুরি।

[*অরুণ একটা চাবি দেয়*]

অফিসার।। উঠি।

অরুণ।। আসুন।

[*প্রৌঢ় ডাক্তার ঢোকে। কেমন কৌতুককর চেহারা*]

অরুণ।। আরে ডাক্তারবাবু! আপনি কি আগে কড়া নেড়েছিলেন?

ডাক্তার।। হ্যাঁ, কড়াটা নেড়েই হঠাৎ দৌড়ে পাশের বাগানে গেলুম।

অরুণ।। বাগানে?

ডাক্তার।। হ্যাঁ, একটা ব্যপার চেজ করলুম।

অরুণ।। কী চেজ্‌ করছিলেন?

ডাক্তার।। (*অফিসারের দিকে তাকিয়ে*) বলছি।

অফিসার।। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তাহলে আপনিই কড়াটা নেড়েছিলেন? হ্যাঁ, অরুণবাবু, আপনার চাবিটা নিন। বন্দুক ছাড়া যে কোনও কিছুই আমার কাছে ভারি লাগে রাখুন। (*চাবিটা দিল*) নমস্কার, এখন বেশ হাল্কা লাগছে। চলি।

[*চলে যায়। ডাক্তার বসে।*]

ডাক্তার।। সার্চ করতে এসেছিল তো?

অরুণ।। হ্যাঁ।

ডাক্তার।। পাওয়া গেল?

অরুণ।। কিছু না।

ডাক্তার।। আমার ট্রিট্‌মেন্ট ছাড়া পাওয়া সম্ভব না। একটা হিপনটিক স্পেল দেব দুজনকে, ওতেই কাজ দেবে। শীলাকে ডাক।

অরুণ।। ও-আমার উপর চটে আছে। যদি দয়া করে আপনি ডাকেন!

ডাক্তার।। (*চেঁচিয়ে*) শীলা, শীলা! এদিকে একবার এস তো মা।

[*শীলা ঢোকে। মুখটা বিরক্ত।*]

ডাক্তার।। সার্চ করে কিছু পায়নি তো? পাবে না জানি।

শীলা।। ডাক্তারবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, আমি একটু শুয়ে পড়ব। অপমানের সীমা থাকা দরকার।

ডাক্তার।। তোমার ভয় নেই, আমি রিঙ্‌ দুটো আর পাখি খুঁজে বের করব। আর যদি পাওয়া যায়—তোমার ছোট হয়ে যাবার ওষুধ পর্যন্ত তৈরী। আমাকে বিশ্বাস কর। বোস, বোস তুমি। (*শীলা বসে*) এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

অরুণ।। ভেবেছিলাম, আপনি আরও আগে আসবেন।

ডাক্তার।। কিছুটা আগে অবশ্য এসেছিলাম, তোমাদের বাগানের মধ্যে ছুটতে গিয়ে আবার দেরী করে ফেললাম।

শীলা।। হঠাৎ বাগানে গেলেন?

ডাক্তার।। বাগানে গেলাম বলেই তো বিরাট রকম আবিষ্কারের হয়ত একটা সূত্র পেয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে আকাশ থেকে একটা নক্ষত্র ছিঁড়ে পড়ল, ঐ উল্কাপাত আর কি! দেখলুম, তোমাদের টগর ফুলগাছটার কাছে পড়ল, দৌড়ে ধাওয়া করে গেলুম। ওখানটায়—

শীলা।। নক্ষত্রটা দেখতে পেলেন?

ডাক্তার।। নিশ্চয়ই।

অরুণ।। তখনও পড়ে পড়ে জ্বলছিল নিশ্চয়ই?

ডাক্তার।। জ্বলবে না মানে, নিভে গেলে তারা দেখা যায় নাকি! ঝুঁকে পড়ে দেখলুম,

জ্বলছে আবার নিভছে—মানে প্রাণটা দপদপ্ করছে আর কি? কি করব ভাবছি—

অরুণ।। তুলে নিয়ে এলেন না কেন?

ডাক্তার।। এনেছি।

শীলা।। কোথায়?

ডাক্তার।। আমার কোটের পকেটে। দেখছ না, দুটো সেফটিপিন দিয়ে, পকেটের মুখটা আটকে রেখেছি। এটাকে নিয়ে এখন মহা সমস্যা, ধুঁকছে—কি খেলে বাঁচবে, কি ওষুধে জোর পাবে—সে তো আর আমাদের মেডিক্যাল শাস্ত্রে নেই।

শীলা।। একটু উঁকি মেরে দেখব?

ডাক্তার।। একটা সেফটিপিনের ফাঁক দিয়ে আলগোছে দ্যাখো।

[*শীলা উঁকি দেয়।*]

অরুণ।। কি করছে তারাটা?

শীলা।। একেবারে অন্ধকার। (*পরমূহূর্তে*) জ্বলছে, কি মিষ্টি আলো জ্বলল।

অরুণ।। সর, এবার আমি দেখব।

[*অরুণ উঁকি দিল।*]

ডাক্তার।। আমিও অনেকক্ষণ দেখিনি ওকে। কি? জ্বলছে?

অরুণ।। (*চেঁচিয়ে*) ঐ যে জ্বলল, কি চমৎকার আলো। আমার গোটা ক্যানভাসটা জুড়ে যদি এই আলোটা আঁকতে পারতুম। আবার জ্বলল।

শীলা।। যদি না বাঁচে, ডাক্তারবাবু! কিছু খাওয়ান। আপনার পকেটে দু' চামচে দুধ ঢেলে দেব, চুকচুক করে খাবে।

অরুণ।। দাঁড়াও, চকলেট আছে, তারাটা বাচ্চা মত আছে দেখছ না!

শীলা।। খাবে কি করে? ডাক্তারবাবু ওর দাঁত আছে?

ডাক্তার।। এখনও পুরোপুরি কিচ্ছু জানি না। কালকে গোটা দিন পরীক্ষা করতে হবে।

অরুণ।। শীলা কালকে আমরা দুজনে বসে বসে সব ব্যাপারটা দেখব, আমরা থাকব আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার।। গ্ল্যাডলি। তোমাদের চিকিৎসা করতে এসেই তো প্রাণীটাকে পেলাম।

শীলা।। যা খাওয়াতে বলবেন, আমি খাইয়ে দেব কিন্তু।

অরুণ।। কোনও বেড়াল বা পাখি এসে না ঠুকরে দেয় আমি দেখব।

শীলা।। তুমি যা কাজের আমার জানা আছে!

অরুণ।। কথা বোলনা তো, নিজে বেশ একা একা মজাটা পেতে চাও।

ডাক্তার।। দেখেছ, তোমরা দুটিতে কেমন সহজে হাসিখুশি হতে পার। তারাটা পেলুম বলেই বুঝতে পারলুম, চিকিৎসা করলে তোমরা সেরে যাবে। ভিতরে যখন তোমাদের ছেলেমানুষিটা একেবারে মরেনি, তখন সারবে না মানে?

অরুণ।। তাহলে আপনি এতক্ষণ আমাদের চিকিৎসা করছিলেন? ওটা কি? পকেটে ওটা কি জ্বলছে তাহলে?

ডাক্তার।। ওটা কি, আমি সত্যিই এখনও জানি না। চোখের সামনে আকাশ থেকে পড়েছে এটা সত্য কথা। দেখতে এবং চরিত্রে অনেকটা জোনাকির মতো।

শীলা।। ও, জোনাকি? তা-ই বলুন।

অরুণ।। ও রকমই দপ্‌দপ্‌ করছিল।

ডাক্তার।। কিন্তু ওটা আকাশ থেকে পড়েছে, সন্দেহ নেই। আমার ধারণা আকাশে যতোগুলো তারা দেখি ওদের মধ্যে অতিকায় কিছু জোনাকিও ঘুরে বেড়ায়। যাক্, ওটা আমার অন্য গবেষণার বিষয়। তোমরা দুজনে বসে পড়, শরীর রিলাক্স কর—আমি হিপনোটাইজ করব। তোমরা নিজেরাই বলবে, পাখি দুটো কোথায়, রিঙ্ দুটো কোথায়? আমি তোমাদের দুজনকেই সন্দেহ করি।

অরুণ।। আমার জিনিশ আমি চুরি করব?

ডাক্তার।। এটাই বেশি হচ্ছে।

শীলা।। এবার ধরা পড়বে, আসল চোর কে?

অরুণ।। আমি নির্ভয়।

ডাক্তার।। দু'জনে ইজিচেয়ার দুটোয় শুয়ে পড়। আমি দু'হাতের দুটো তর্জনী তোমাদের কপালে রাখছি—বাইরের জগৎ থেকে ঘুমিয়ে পড়, চোখ বোজ, চোখ বোজ, চোখ বোজ...চোখ বোজ...ভেরি গুড, অরুণ, শীলা কি ছোট হয়ে যাচ্ছে?

অরুণ।। (*আচ্ছন্ন কণ্ঠে*) হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু আমাদের বিয়ের আগে আমার দুটো হাতের মধ্যে যেন ওর মুখখানা ধরত না,...এখন একটা ছোট্ট নাক-চোখ শূন্য মারবেলের মত এতোটুকু। আমি স্পষ্ট বুঝি, ওর দুটো চোখ ছোট্ট হয় গিয়েছে।...হৃদয়টা সব জিনিশ রাখতে পারে না, উপছে মাটিতে পড়ে যায়। পায়ের স্টেপগুলো কী ছোট হয়ে যাচ্ছে!

ডাক্তার।। শীলা তুমি কি ছোট হয়ে যাচ্ছ?

শীলা।। ডাক্তারবাবু, কিছুদিন ধরে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। আগে ও যখন আমার সঙ্গে কথা বলত আমার মনে হত ছড়িয়ে যাচ্ছি...হাঁটলে মনে হত ভীষণ সুখে ছোট্ট মেয়ের মতো দৌড়তে পারি...ও মুঠো তুলে যা দিত, বুকের মধ্যে সব ধরে যেত, যা দেখতে বলত চোখের মধ্যে সমস্তটা ধরা পড়ত। এখন ওকে ছুঁলে কেমন আগের মতো লাগে না—যেন ঠাণ্ডা একটা হাত, আর ঠাণ্ডায়তো সব কিছুই গুটিয়ে কমে আসে। আমি এ সব চাইনি, ও আমাকে কেন এ রকম করল?

ডাক্তার।। অরুণ, তুমি শীলার কথা শুনেছে? কিছু বলার আছে?

অরুণ।। আমি কিছু বুঝি না, কেবল উদ্ধার চাই।

ডাক্তার।। শীলা, তুমি রিঙ্ দুটো নিয়েছ?

শীলা।। হ্যাঁ।

ডাক্তার।। নিয়ে আসতে পারবে?

শীলা।। পারব।

ডাক্তার।। তুমি যাও

[*শীলা আচ্ছন্নের মতো উঠে যায়*]

ডাক্তার।। অরুণ, তোমার রিঙ্ আসছে, শীলা আনতে গেছে।

অরুণ।। (*স্বপ্নাবিষ্ট*) আমি জানতাম।

ডাক্তার।। তুমি রিঙে তোমাদের না এঁকে পাখি দুটো আকলে কেন?

অরুণ।। ছোটবেলায় একটা রূপোর কলিং-বেলের স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওটা বাজালে মানুষের বদলে বনের পাখিরা আসত।

[*শীলা একটা গহণার বাক্সে করে রিঙ্ দুটো নিয়ে আসে। স্বপ্নাবিষ্ট ওর হাঁটা। বাক্সটা এনে মেলে ধরে।*]

ডাক্তার।। লক্ষ্মী মেয়ে। বোস। অরুণ, কেবল শীলা নয় তুমিও ছোট হয়ে গেছ, তাই শীলা তোমার মুঠোয় ধরে না। তোমারও চোখ ছোট হয়ে গেছে, তাই সব কিছু ছোট দেখ। তোমাদের দুজনকেই লম্বা হতে হবে। তার আগে তুমি ক্যানভাসের পাখি দুটো নিয়ে এস। তুমি তো লুকিয়ে রেখেছ, তাই না?

অরুণ।। হ্যাঁ, কিন্তু কখন চুরি করেছি জানি না।

ডাক্তার।। ঘুমের মধ্যে তুমি যখন হাঁটো, তারই মধ্যে এক সময় ও দুটো খুলে এনেছ। তুমি যাও নিয়ে এস। যাও।

[*স্বপ্নাবিষ্টের মতো ড্রয়ার খুলে অরুণ একটা রঙের বাক্স ডাক্তারের হাতে এনে দেয়।*]

ডাক্তার।। এবার তোমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এস, ফিরে এস। চলে এস, চলে এস। (*ওরা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সহজ দৃষ্টিতে তাকায়*) নাইস। শীলা, অরুণ—এবার তোমরা বুঝতে পারছ, দুজনেই চোর এবং দুজনেই ছোট হচ্ছ। স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় তোমাদের কথাবার্তা কাজকর্ম তোমাদের মনে আছে?

অরুণ।। আছে। আশ্চর্য!

শীলা।। আমরা এখন কি করব, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার।। অরুণ, তুমি ঐ রিঙ্ দুটো ক্যানভাসে জুড়ে দাও।

[*অরুণ সুতো সমেত রিঙ্ দুটো ক্যানভাসে ঝুলিয়ে দিল*]

ডাক্তার।। এবার পাখি দুটোকে তোল।

অরুণ।। (*বাক্সটা খুলে*) একি, সব ডানাগুলো ভাঙাচুরো, রঙ চুরমার হয়ে আছে। কি হবে?

ডাক্তার।। কোন ভাবনা নেই। ঐ রিঙ্ দুটোয় তোমরা দুজনে দুলবে—পাখি চাই না। পাখির চাইতে মানুষ কম নয়। তোমরা যত দুলবে, তত লম্বা হবার দিকে যাবে। মনে কর, তোমরা দুলছ, দুলছ, দুলছ।

অরুণ।। আমার অদ্ভুত লাগছে, আমি ভয়ানক জোরে দুলব!

শীলা।। আমি দেখব, তুমি কি করে আমাকে ছাড়িয়ে যাও!

[*স্থির তিনটে মানুষ ঘরে। উজ্জ্বল দুটো আলো ওদের গায়ের উপর দিয়ে দুলতে থাকে। দুলতে থাকে ঘর জুড়ে। পর্দা ক্রমশ নেমে এসে সব কিছু আড়াল করে দেয়।*]

বাজপাখি

চরিত্র : কল্যাণ, শুভা, সুব্রত, সদানন্দ, পবিত্র, সেনবাবু

[মধ্যবিত্ত পরিবেশেব একটি ঘর। টেবিলে একটি ফোন। রিসিভারটা টেবিলে নামানো। নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালক মঞ্চ-নির্দেশনা স্থির করবেন। একটা ট্র্যানজিস্টাব রেডিও-তে সকালে কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। কল্যাণ গামছায় মুখ মুছতে মুছতে ঢোকে। বাইরে থেকে 'কাগজ' বলে একটা হাঁক, সঙ্গে সঙ্গে রোল করা একটা খবরের কাগজ বাইরে থেকে কল্যাণের গায়ে ছুটে এসে লাগে। কল্যাণের বয়স পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ।]

কল্যাণ।। (*স্বগত*) কানা না কি!

[নিচু হয়ে কাগজটা তোলে। গামছাটা চেয়ারের হাতলে রাখে। কাগজ বাঁধা সুতলিটা খুলতে থাকে। পুরনো ইজিচেয়ার কিংবা একটা তক্তাপোশের ওপর বসতে যায়। রেডিওটা বন্ধ করে। কাগজে মন দেয়।]

কল্যাণ।। চা কি দেবে? (*দু এক মুহূর্ত বাদে*) কি হল?

[শুভা চা নিয়ে ঢোকে।]

শুভা।। এই তো উঠলে, (*শুভা, কল্যাণের স্ত্রী, কাপটা এগিয়ে*) ধর।

কল্যাণ।। (*কাগজে চোখ*) রাখ।

[শুভা টেবিল থেকে একটা পোস্টকার্ড বা এই ধরনের কিছু নিয়ে তার ওপর চা-টা রাখে। ওধারে গিয়ে টাইম-পিস্‌টায় চাবি মুচড়ে দম দিতে থাকে।]

শুভা।। শোন।...শুনছ—

কল্যাণ।। শুনছি।

শুভা।। দুনিয়াসুদ্ধ লোক কাগজ পড়ে, তোমার মত এমন হামলে পড়ে না কেউ। (*কল্যাণ চুপচাপ*) চা-টা ওঘরে গিয়ে খাও।

কল্যাণ।। কেন?

শুভা।। ও-বাড়ির ফোন এসেছে। ডাকতে পাঠিয়েছি। এক্ষুণি আসবেন।

কল্যাণ।। আসবেনটা কে?

শুভা।। সদানন্দবাবু।

কল্যাণ।। ওঃ! রোজ এই একটা লোকের জ্বালাতন! একটা মিনিমাম কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কোনও লোক পরের বাড়ির ফোন এভাবে ইউস করে না বুঝলে।

শুভা।। থাম, এক্ষুণি এসে পড়বেন।

কল্যাণ।। তা আসুক না। ফোন করে চলে যাবে। রাজ্যের ফোন আসবে আর আমি এঘর-ওঘর ছুটে বেড়াব। উনি কি ফুটবল খেলবেন যে মাঠের মত সব ফাঁকা করে দিতে হবে৷

শুভা।। চেঁচিও না।

কল্যাণ।। রাখ তো, চেঁচাবে না! এটা পাবলিক ফোন না! এবারের বিলটা দেখেছ? পয়সাটা তো আমাকে গুনতে হয়!

শুভা।। তা এসব আমাকে শোনাচ্ছ কেন!

কল্যাণ।। এবার বলে দিও—কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে বলতে হয়।

শুভা।। আমি কেন বলতে যাব? নিজে বল না।

কল্যাণ।। আমার ঠিক আসে না।

শুভা।। আমারও আসে না।

[*শুভা রান্নাঘরে যেতে যেতে ঘোরে। আলনা থেকে একটা গেঞ্জি নিয়ে কল্যাণকে দেয়।*]

কল্যাণ।। কি হবে?

শুভা।। গেঞ্জিটা পাল্টে নাও। বাইরের লোকের সামনে ফাটা গেঞ্জিটা পরে থাকবে?

কল্যাণ।। এতো আচ্ছা জ্বালাতন! (*গেঞ্জিটা পাল্টায়*) সে পার্টির তো পাত্তা নেই? খবরটা পেয়েছে তো?

শুভা।। হয়তো চানে ঢুকেছেন। তোমার মত অফিসটাকে তো কেউ হতচ্ছেদা করে না। সব টাইমে চলে। (*হাতলের গামছাটা তুলে*) সেই গামছাটা আবার এখানে রেখেছ ? রোজ সেই এক? (*কল্যাণ সিগারেট টেনে কাগজ পড়ে যায় চুপচাপ*) গামছাটা কিছুতে বাথরুমে রাখবে না? হয় চেয়ারে, না তো খাটে, নয়তো দরজার ওপর। এরকম করলে মানুষ পারে না। (*কল্যাণ সিগারেটের ছাই মেঝেয় ফেলে যাচ্ছে*) আবার মেঝেয় ছাই ফেলে যাচ্ছ?

কল্যাণ।। অ্যাশট্রে পাচ্ছি না।

[*টেবিল থেকে কাছে এনে সজোরে রেখে—*]

শুভা।। এটা কি? ক'বার করে ঝাড়ু দেব বলতে পার! ঘরময় ছাই করবে...

কল্যাণ।। ছাই থাক।

শুভা।। কি?

কল্যাণ।। ছাই থাক। বড্ড পিটপিটে হয়ে যাচ্ছ। ছাই কিছু খারাপ না, মহাদেব গায়ে মাখতেন।

শুভা।। তা তুমিও গায়ে মেখে বসে থাক না। নোংরামো সহ্য না হলেই পিটপিটে! পায়ে পায়ে ছাইগুলো সারা ঘর, বিছানা—ভাল লাগে না আমার!

কল্যাণ।। আমারও ভাল লাগে না। হাজার দিন বলেছি, সকালবেলা উঠে শান্তিতে একটু মন দিয়ে কাগজটা পড়ব,...এ সময় জ্বালাতন কোরো না—কথাটা তোমরা একদিনের জন্যও দাম দিয়েছ? এক্ষুণি অফিস দৌড়ব। সারাটা দিন তো পরিপাটি করে ঘুমোবে।

শুভা।। দ্যাখো, রোজ রোজ এ এক ঝগড়া তুলো না বলছি—ভাল লাগে না। সংসারে কার কত খাটুনি সেটা জানতে গেলে তোমার জিত হবে না, সেটা তুমি ভাল করেই জান। এ বাড়িতে টেনে এনে আমাকে কতটা সুখ-শান্তি দিয়েছ, সে কেবল আমিই হাড়ে হাড়ে জানি।

কল্যাণ।। আর কথা বাড়িও না।

শুভা।। কথা কে বাড়াচ্ছে? আমি না তুমি?

কল্যাণ।। আমি কাগজ পড়ছি।

শুভা॥ ঐ কাগজে মুখ ঢেকেই সংসারটা খেয়েছ।

কল্যাণ॥ চেঁচিও না, ভদ্রলোক এসে পড়বেন।

শুভা॥ কেন, আমি চেঁচালেই যত দোষ না? অমনি গার্জেনি শুরু হল। তোমরা জাতটাই বেয়াক্কেলে।

কল্যাণ॥ জাত নিয়ে কথা তুলো না, সে অনেক সময় লেগে যাবে—ওসব থাক।

[*সুব্রত ঢোকে।*]

সুব্রত॥ কাঁচিটা কি করলে?

শুভা॥ কি?

সুব্রত॥ কাঁচি, কাঁচি।

শুভা॥ মেশিনের বাক্সে নেই?

সুব্রত॥ না।

[*শুভা খোঁজে।*]

সুব্রত॥ দাদা, ও দাদা!

[*কল্যাণ তাকায়।*]

সুব্রত॥ আজকে কিন্তু মিটিং ছ'টায়।

কল্যাণ॥ কালীতলার মাঠে?

সুব্রত॥ হুঁ।

কল্যাণ॥ অফিস ফেরত এসে তোর বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

শুভা॥ হয়েছে। আদিখ্যেতা! একদিন সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে যেতে বছর ঘুরে যায় —উনি আমাকে মিটিং নিয়ে যাবেন?

[*কাঁচিটা দেয়।*]

শুভা॥ কি কাটবি?

সুব্রত॥ কাগজ।

শুভা॥ পিসবোর্ড-টিসবোর্ড কাটবি না?

সুব্রত॥ একদম না।...বৌদি, চল না...মিটিং-এ।

শুভা॥ তোমরা দাদা-ভাই দুজনে আগে দেশোদ্ধার করে এস!

সুব্রত॥ ফোন এসেছে কার?

শুভা॥ সদানন্দবাবুর। নন্তুকে খবরটা দিতে বললাম, কি জানি দিয়েছে কি না। তুই একবার যা না।

সুব্রত॥ চেপে যাও। দিনের মধ্যে দশবার ওর বাড়ি ছোটা—সদানন্দবাবু ফোন...সদানন্দবাবু ফোন...।

সদানন্দ॥ (*নেপথ্যে*) আসচি, এসে গেচি।

[*হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢোকেন সদানন্দ। বসে পড়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরেন, ওরা ছুটে যায়। খালি গা, তেল চুকচুক করছ সদানন্দবাবুর টাকের ধারের চুল।*]

কল্যাণ॥ কি হল?

শুভা।। পা-টা হঠাৎ হড়কে গেছে বোধ হয়।

কল্যাণ।। *(সুব্রতকে)* কিরে, তোর ঐ পোস্টার সাঁটার আঠাপাঠা ফেলেছিস নাকি?

[সদানন্দ আস্তে আস্তে ওঠে।]

সুব্রত।। আঠা ফেলতে যাব কেন?

সদানন্দ।। মিছে ধমকাচ্ছেন বেচারাকে। হোঁচট খাওয়া আমার হবি।

সুব্রত।। হবি? হোঁচট খাওয়া?

সদানন্দ।। হবি মানে, হেবিট। রঙ্গ করে বলি 'হবি'। দিনের মধ্যে যে কতবার হোঁচট খাচ্ছি।

শুভা।। আঙুলটায় খুব লেগেছে মনে হচ্ছে।

সদানন্দ।। তা লেগেচে। আঙুলগুলো আর থাকবে না—ঝ'রে খ'সে যাবে। *(কোণের ধারের চেয়ারটায় খুঁড়িয়ে বসে সদানন্দ)* গুণতিতে পায়ের আঙুল দশটাই আচে—কিন্তু সব কটা কাজ করে না। হঠাৎ হঠাৎ দু'চারটে নুলো মত হয়ে যায়। সাড় থাকে না। ভর দিতে যাও—হোঁচট! বাতব্যাধির যে কত লীলা, লীলাময় বাতব্যাধি!

[সুব্রত চলে যায়। ফোনটা তোলে সদান্দ।]

হেলো : বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। হেলো—নাঃ...হেলো হেলো...কোথায়? এত দেরী করে ফেললাম। তেল মাকচিলাম। ফেলুর ছোটটা আব্দার ধরলে—পিঠটায় তেলটা ডলে দি, তারপর যাও জেঠু। সে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামছি— আমাদের কাজের মেয়েটার হাতটা গায়ে ঠেকল। ললিতা, আমার ওয়াইফ...গঙ্গাজলের বোতল নিয়ে এল...গায়ে ছিটোল...দুগগা দুগ্গা করে বেরোলাম। ঝক্কি কি একরকম সংসারে, হেলো...কে টুনি? বাবাকে বল, আমি এসে গেছি। হ্যাঁ ধরে আচি...(*পায়ের আঙুলটা টিপে)* লেগেচে মন্দ না।

কল্যাণ।। রক্ত পড়ছে নাকি?

সদানন্দ।। না রক্ত জমে আচে।

কল্যাণ।। দাও, একটু চা দাও ওঁকে।

শুভা।। এমনভাবে বলছ, যেন চা ওর হোঁচট লাগার ওষুধ।

কল্যাণ।। তাহলে আয়োডিন দাও।

শুভা।। চা-ও দেব, আয়োডিনও দেব।

সদানন্দ।। হ্যাঁ, দুটো দ্রব্য মিশিয়ে খাব! কিচ্ছু চাই না। এক্ষুণি অফিস যেতে হবে। কারখানায় আবার স্ট্রাইক চলছে, এঁকে-বেঁকে ঢুকে পড়তে হবে। গুটি দশেক প্রাণী নিয়ে ঘরকন্না। একমুঠো-একমুঠো করে দিলেও তো দশ মুঠো যোগাতে হবে এই একখানা হাতে। মালিকের চোখে যতক্ষণ আছি, হাতের কলমটি নৌকার হালের মত দরিয়া পার করে দেবে। হেলো...আসেনি!

শুভা।। (*কল্যাণকে)* ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এস, ওঁকে শান্তিতে ফোনটা করতে দাও।

সদানন্দ।। না, না, তাতে কি আছে, তেমন প্রাইভেট কিছু নয়। এক্ষুণি হয়ে যাবে। আপনাকে উঠতে হবে না, কল্যাণবাবু। হেলো, কে সীতানাথ?

[কল্যাণ খবরের কাগজে চোখ রাখে। শুভা চলে যায়]

হ্যাঁ আমি বলছি...সদানন্দ—গলাটাও ভুলে গেলে? হ্যাঁ-হ্যাঁ (*হাসে*) কালকে বললাম কথাটা ভুলে গেলে? তা মাথার চুল উঠছে বলে কি ওর সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্মরণশক্তিও উবে যাচ্ছে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-তোমার ক্যানসার আর টাকের কোন ওষুধ নেই হে। টাকের চিকিৎসা থাকলে তো অষ্টম এডোয়ার্ডের মাথায় থোকা থোকা চুল গজাত। এইখানে তোমার পয়সাও অচল—দু-খানা বাড়ি নিয়েও জব্দ হয়ে গেলে। এখানে বাবা ক্লাসলেস সোসাইটি। (*হাসতে থাকে*) তা ভাল কথা, মণিময়ের খবর কি? ও তা বলছিলাম ললিতাকে ঐ জন্যই ফোন করছিলে? আচ্চা, আচ্চা (*হুঁ-হুঁ করে করে বললে*) পরশু? পরশু পাকা দেখা? আরে ললিতা যাবে না? বলা মাত্রই না সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে। তাহলে ওরা জামাইকে বাইরে পাটাচ্ছে? দেয়া-থোয়া? এক মেয়ে? ছেলে নেই? বাগিয়েচ ভাল। (*কল্যাণের দিকে তাকিয়ে*) ঠিক আচে, রেখে দিচ্চি। এখন গপ্পের সময়? অফিস ধত্তে পারব না গো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আচে। রাখচি। টুনিকে পাঠিয়ে দিও না একবারটি...আচ্চা...আচ্চা...হে হে হে...আচ্চা (*ফোনটা রেখে দেয় কল্যাণের দিকে তাকিয়ে*) খানিকটা সময় জ্বালাতন করলুম।

কল্যাণ॥ না, না, তাতে কি আছে। বাবা আর কিছু না হোক ফোনটা রেখে গেছেন বলে তবু যাহোক আপনাদের মত দু-চারজন প্রতিবেশীর পায়ের ধুলো পড়ে। মানে একটা যোগাযোগের সুযোগ হয় আর কি!

সদানন্দ॥ তা ঠিক। বিপদে-আপদে এক এক সময়...নিজে তো আর ফোন রাখতে পারব না কোনকালে।

[*শুভা চা নিয়ে আসে।*]

কল্যাণ॥ চা খান।

সদানন্দ॥ এই দ্যাখো। আমি তো উঠছিলাম। অফিস-টাইমে আবার হাঁড়ি নামিয়ে কেটলি চাপালে। এরপর দেখছি আর আসতে পারব না।

শুভা॥ চা করতে আর কতক্ষণ লাগে।

[*পেয়ালাটা হাতে নেয়। হঠাৎ কাগজের তৈরী বড় একটা বাজপাখি নিয়ে ভয় পাইয়ে দেবার মত শব্দ করে সুব্রত ঢোকে। সকলে চমকে ওঠে।*]

শুভা॥ দেখেছ, তোমার ভাইটির কাণ্ড দেখলে! যা চমকে উঠেছি না।

কল্যাণ॥ দানোর মত ওটা কি একটা নিয়ে ঢুকলি! এভাবে কেউ ঘরে ঢোকে? কে আছে না আছে, দেখবি তো।

সদানন্দ॥ তাতে কি, ছেলেমানুষ! (*শুভাকে*) এক-চামচে দুধ যদি থাকে, মানে হঠাৎ কাপটা চলকে গিয়ে ধুতিটা...

শুভা॥ দাঁড়ান, আমি আনছি। (*সুব্রতকে*) যা অসভ্য হয়েছ না।

[*শুভা চলে যায়*]

কল্যাণ॥ ওটা কি?

সুব্রত॥ বাজপাখি।

কল্যাণ॥ তা ওটা এঘরে কি ওড়াবে বলে নিয়ে এলে?

সুব্রত ।। বৌদিকে ভয় দেখাব বলে।

সদানন্দ ।। বৌদি তো ভয়ে মারা যাচ্ছিলেন। একটু সইয়ে সইয়ে ভয় দেখালে হয় না? প্রথমেই কড়া ডোজ।

কল্যাণ ।। পড়াশুনা তো ছেড়ে দিয়েছ। এখন পাখি নিয়ে খেলছ। কোত্থেকে ওটি জোটালে?

[শুভা ঢোকে। সদান্দ কাপড়ে দুধ লাগায়।]

শুভা ।। জোটাবে কি—বানিয়েছে। দুদিন ধরে তো এই করছে! বানিয়েছে কিন্তু বেশ! গুণ ছিল, বুঝলেন—দলে পড়ে না মাথাটি গোল্লায় দিচ্ছে! এই তো এল বলে সব দলবল, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন কাঁধে করে চলল সব দেশোদ্ধার করতে।

সুব্রত ।। আমি তো খালি পোস্টার এঁকে দি।

সদানন্দ ।। এই কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত, বুঝলে না।

সুব্রত ।। আজকে মিটিং-এর ডায়াসে এটা রাখা হবে। টেবিলে রেখে যাচ্ছি।

কল্যাণ ।। কেন?

সুব্রত ।। ছোড়দা বলেছে, ভেঙে দেবে।

শুভা ।। কেন, ভাঙবে কেন?

সুব্রত ।। ওর পকেট থেকে পয়সা নিয়েছি।

কল্যাণ ।। আমার, আমার পাঞ্জাবীটা কোথায়?

সুব্রত ।। তোমার পকেট থেকে অল্প নিয়েছি।

কল্যাণ ।। কেন, একটা পকেটে মন ভরল না?

সুব্রত ।। ভাগ ভাগ করে নিলুম। কারুর গায়ে লাগল না।

কল্যাণ ।। ঠিক আছে, তুই বেরো।

[সুব্রত বাজপাখিটা টেবিলে রেখে চলে যায়।]

সদানন্দ ।। বেশ হিসেবী হয়েছে ভাইটি।

সুব্রত ।। (*ভেতর থেকে*) বৌদি।

শুভা ।। যাই। বাজার এসে গেছে। শোন, তোমার জল গরম করে রাখছি, স্নান করতে যাবার আগে নিয়ে যেও। ঠাণ্ডা বাসি জল আবার গায়ে লাগিও না।

[শুভা চলে যায়।]

সদানন্দ ।। বৌটি পেয়েছেন মনের মত। দেখি তো, মাঝে মধ্যে দুটিতে বেরোন —কে বলবে দশটি বছর সংসারের জোয়াল বইছেন। যেন কনে বউটিকে নিয়ে চাঁদের আলো কুড়াতে যাচ্ছেন।

কল্যাণ ।। দূর থেকে সবই সুন্দর, বুঝলেন কিনা—সেই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস—

সদানন্দ ।। অয়েলক্লথ, আমূল দুধ কিনতে কিনতেই মাথার চুল দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। (*বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে*) ঐ বাজপাখিটার মত কোন শত্তুরে যেন সব ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠুকরে নিচ্ছে। কি আর আছে। আহার, নিদ্রা, প্রজনন—চলছে এই তিন চাক্কার গাড়ি! এক এক সময় রুখে উঠতে ইচ্ছে করে...যাকগে, চলুক হ্যাকড়া-গাড়ি, তিন চাক্কায় চেপে ধুঁকতে ধুঁকতে এগোন যাক। চলি, আপনারও তো বেরুবার টাইম হয়ে আসছে। উঠি।

(*উঠে পড়ে একটু হেসে বলে*) মালিকের তোষামোদ কচ্চি বটে কিন্তু এখনও আইডিয়ালিজম্ আছে, মরবার সময় সিরাজদৌলার মত বলে যাব, ভাইসব সুখে থাক। (*জোরে হাসে। যেতে যেতে*) বাজপাখি এতক্ষণ আমাকে দেখছিল, এবার কিন্তু আপনি একা, মুখটা ঘুরিয়ে নিন। চলি।

[*সদানন্দ চলে যায়। কল্যাণ একদৃষ্টে বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে কাছে যায়। পাশের দরজার কাছে পবিত্র। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ওকে লক্ষ করে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে। পায়ের শব্দে কল্যাণ কিছুটা চমকে ওঠে।*]

কল্যাণ।। ও, তুই!

পবিত্র।। ঝুঁকে পড়ে পাখিটায় অতো কি দেখছিলে?

কল্যাণ।। চোখ দুটো কি জ্বলজ্বলে দেখেছিস্ (*মুখটা কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে*) যেন কিছু নজরে পড়েছে, লোভে ঠোঁটটা চকচক করছে...

পবিত্র।। সুব্রতকে বখশিশ দিও, ওর শিল্পের এতোবড় সার্টিফিকেট কেবল প্রশংসায় মিটিয়ে দেওয়া তোমার ঠিক হবে না, দাদা।

কল্যাণ।। তা নয়, সদানন্দবাবু বলছিলেন—

পবিত্র।। ভদ্রলোক একটু কথা-পাগল আছে।

কল্যাণ।। হবে।

পবিত্র।। অফিস যাবে তো?

[*কাগজটা দেখতে তাকে পবিত্র*]

কল্যাণ।। দেরী আছে এখনো। গোটা দুনিয়ার উপর বাজপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, এখানটা খুবলে নিচ্ছে, ওখানটা ছিঁড়ছে। আমরা আর কি করব—খবরের কাগজ পড়ছি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। তোরা ডাক্তার ছেলেরা তো কিসব নিয়ে আন্দোলন করছিস?

পবিত্র।। করছে ওরা সব দলবল মিলে।

কল্যাণ।। সমর্থন থাকলেও তো আর সময় দেওয়া যায় না। তোমার পড়া হয়েছে কাগজটা?

কল্যাণ।। হ্যাঁ, নিয়ে যা।

[*পবিত্র কাগজটা নিয়ে চলে যাবার আগে দেখে কল্যাণ সেই বাজপাখিটার দিকে আবার তাকিয়ে আছে। পবিত্র চলে যায়। ফোনটা বাজতে থাকে, ধরে না কল্যাণ। শুভা ঢোকে।*]

শুভা।। ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছ, অথচ ফোনটা ধরতে পারছ না?

[*ফোনটা ধরে শুভা।*]

শুভা।। হ্যালো...হ্যালো...।

কল্যাণ।। দ্যাখো তো, রীণা বোধ হয়।

শুভা।। রং নাম্বার। (*ফোন রেখে দেয়*) হঠাৎ রীণা ফোন করছে তোমার মনে হল যে?

কল্যাণ।। না, ঐ পবিত্রদের হাসপাতালে মেয়েটা রাজনীতির বেশ বড় পাণ্ডা—ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতাম...ও হয়ত—

শুভা।। সে নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি হল? পবিত্রর বন্ধু, তা বলে পবিত্রই ওর ওসব কচকচিতে তেমন আমল দেয় না। হ্যাঁ, এই পাখিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কল্যাণ।। না, ওটা থাক।

শুভা।। না, থাকবে না, তুমি নাকি হাঁ করে কেবল ওটা দেখছিলে? তোমার তো ঢং-এরও শেষ নেই, অলক্ষুণে ব্যাধিরও শেষ নেই। সেবার কালীমূর্তির দিকে তাকাতে তাকাতে মা কালী তোমাকে ভর করল। সুব্রতকে ডাকছি, ও এসে নিয়ে যাক। সুব্রত, সুব্রত।

[*সুব্রত ঢোকে*]

সুব্রত।। কি বলছ?

শুভা।। এটা নিয়ে যা।

সুব্রত।। কেন কি হয়েছে?

কল্যাণ।। আহা থাক না। এক এক সময় তোমরা এমন ক্ষেপে ওঠ!

শুভা।। না নিয়ে গেলে আমি কিন্তু ঠিক ভেঙে ফেলব।

সুব্রত।। ওটা ভাঙ্গলে ওরা আমার মাথা ভেঙে ফেলবে না! আজকের মিটিং-এ এটা মঞ্চের পাশে রাখা হবে, বুঝলে? নিচে লেটারিং করে দেব 'শত্রুকে চিনুন'।

শুভা।। বুঝলুম, তুমি নিয়ে যাও।

কল্যাণ।। যা আরম্ভ করেছ না। তুই যা, যখন দরকার নিয়ে যাবি।

শুভা।। বস্তুটি কি যার ওপর তোমার এখন ওর থেকেও দরদ বেশি! মনে হচ্ছে ঐ বাজপাখিটার সঙ্গে পূর্বজন্মে কোনও সম্পর্ক ছিল তোমার।

সুব্রত।। দাঁড়াও, লেটারিং শেষ করে এসে নিয়ে যাচ্ছি।

[*সুব্রত চলে যায়।*]

কল্যাণ।। জান শুভা, কাগজে বানানো একটা পাখি। ওটার আর কিই-বা দাম। বাচ্চা ছেলেও নই যে খেলনা ভেবে নেচে উঠব। কিন্তু এক একটা তুচ্ছ জিনিশ হঠাৎ এমন জোরে নাড়িয়ে দেয় যা আমি ভাবতে পারতুম অথচ ভাবিনি, সেসব মনে পড়ে।

শুভা।। এ বয়সে আর নতুন করে নাড়া খেয়ে কাজ নেই। বেশ আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছ—এবার চান করতে যাবে তো যাও।

কল্যাণ।। যাই। (*শুভা টেবিলটা গোছায়*) লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনে রেখেছিলুম টেবিলে তোমার জন্য।

শুভা।। ওঘরে নিয়ে গেছি।

কল্যাণ।। পড়েছ?

শুভা।। দুপুর ছাড়া পড়তে পারি?

কল্যাণ।। আগে তুমি হাপুস-হুপুস করে পড়তে।

শুভা।। আগের দিন কি আর আছে? সেই তুমি আছ, না আমি আছি?

কল্যাণ।। কোথায় যায়?

শুভা।। ঘ্যানর ঘ্যানর থামাও তো!

কল্যাণ।। তুমি আজ বাড়ির বড় বউ। অন্তত একটা পোস্ট পেয়ে গেছ। মায়ের জায়গাটা তুমি নিয়ে নিয়েছ। আমি বাবার মত হতে পারলুম কই?

শুভা।। অকর্মা লোকদের তোমার মতই দশা হয়।

কল্যাণ।। পয়সা করতে চাইলে বাবা তা পারতেন। পয়সার বদলে বাবা চাইলেন দেশের মুক্তি। ইংরেজের গুলি খেয়ে পা-টা গেল। কিন্তু সেই খোঁড়া মানুষটা ছিলেন পাহাড়ের মত অটল। আর আমি একটা ক্লীব।

শুভা।। এ বয়সে আর নতুন করে কি করবে?

কল্যাণ।। বয়স আর কতটা নেয়, আরো একটা শত্তুর আছে। রোজ একটু একটু করে খুঁটে খুঁটে খায়।

শুভা।। খাচ্ছে খাক না, ফুরিয়ে তো যাওনি।

কল্যাণ।। (*মুখে নিষ্প্রভ হাসি*) কি জানি!

শুভা।। বাবা ছিলেন অন্য মানুষ সেরকম আর ক'জন হয়?

কল্যাণ।। সদানন্দবাবু বলেছিলেন, এক একদিন রুখে উঠতে ইচ্ছে করে।

শুভা।। রুখে ওঠ। সে সব মানুষ আলাদা।

কল্যাণ।। বদল তো হয়।

শুভা।। দ্যাখো, সব সময় সব কিছু ভাল লাগে না। কি আরম্ভ করেছ বল তো? সব আমাকে শুনতে হবে? খবরের কাগজে কোথায় যুদ্ধ বেধেছে দেখলে, আমার সামনে চেঁচাতে শুরু করলে! কোথায় গুলি চলল—পারলে তার বারুদের গন্ধ শোঁকাতে চাও। কোথায় কি হল না হল তার অতো খবরে আমার কি দরকার! (*জামাটা পাট করে রাখে। টুকিটাকি কাজের মধ্যে বলে*) হ্যাঁ, বুঝতুম তুমি একটা নেতা পাণ্ডা হয়েছে, দু-দশ জায়গায় সভা করে বেড়াচ্ছ, রাজ্যের অশান্তির কথা কাগজপত্রে লিখছ,—তবে মানায়। চড়ুই খোলের মত ঘরে বসে থাক—দশটা মানুষের মধ্যে গেলে মিনমিন কর—বাড়িতে বসে তর্জন গর্জন আর হা-হুতাশ কত ভাল লাগে বল তো? (*কল্যাণের দিকে তাকিয়ে*) —কি ঝিম্ মেরে বসে রইলে কেন? অফিস যেতে হবে না?

কল্যাণ।। তুমি যাও, যাচ্ছি।

শুভা।। যেতে তো আমাকে হবেই। অফিস কামাই করলেও তো আর উনুন কামাই যাবে না। ভাল চাকরিতে জুতেছ।

কল্যাণ।। আমি কিছু পারি, মানে এখনও পারি—তোমার বিশ্বাস হয়?

শুভা।। কি পার?

কল্যাণ।। অনেক কিছু

শুভা।। অনেক কিছুটা কি?

কল্যাণ।। আবার আগের মত ফূর্তিতে থাকতে পারি। ভাবতে পারি ঘর সংসার ছাড়াও আরো কিছু করা যায়।

শুভা।। হ্যাঁ, যায়। একটা কমণ্ডুলু আর চিমটে হাতে নিয়ে গায়ে ছাই ভস্ম মাখা যায়।

কল্যাণ।। তুমি জান, এতোবড় পৃথিবীটায় একটা যুদ্ধের মীমাংসার জন্য একটা বসবার জায়গা পর্যন্ত কেউ ছেড়ে দিতে সহজে রাজী হয় না।

শুভা॥ কেন, তোমার এতোবড় ঘরখানা আছে, দিয়ে দাও। তোমার খাতিরে না হয় দশ কাপ চা করে খাওয়াব।

কল্যাণ॥ তুমি জান তোমার আমার মত দশ ভাগের ন'ভাগ মানুষ সবকিছু জেনেশুনে চুপ করে আছে। ন'ভাগ শক্তি মোটে কাজেই লাগছে না।

শুভা॥ আচ্ছা জ্বালাতনে পড়লুম তো? তোমার কানে কি আমার কোন কথাই যাচ্ছে না। দ্যাখো, যদি পার কিছু কর, আমাকে জ্বালিও না!

কল্যাণ॥ (*কেমন দীপ্ত দেখায়*) আমি ঠিক কিছু করব।

শুভা॥ করবে তো কর, আমাকে বলে কি হবে?

কল্যাণ॥ কাগজ পড়ি আর কত কথা মনে হয়। তোমরা কেউ শুনতে চাও না কিন্তু কাউকে আমার বলতে ইচ্ছে করে। যদি এই ফোনটা তুলে মনের মত একজন মানুষ ওধারে পাই—

শুভা॥ মনের মতো মানুষ?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, গোটা পৃথিবীর কষ্টে যার মনটা কাঁদে, চোখ দুটো রাগে জ্বলে, আর দুটো হাত শূন্যে তুলে ঐ বাজপাখিগুলোর ডানা ছিঁড়ে ফেলতে চায়—

শুভা॥ তুমি যে বক্তৃতা দিতে শুরু করলে? এতো যে পারে, কে সেই মানুষটা?

কল্যাণ॥ তোমার নেতা; আমার নেতা; যাদের ক্ষোভ আছে, কষ্ট আছে তাদের নেতা।

শুভা॥ তোমার মত মানুষকে সে পুছতে যাবে কোন দুঃখে?

কল্যাণ॥ আমার দুঃখ আছে বলেই তো পুছবে।

শুভা॥ তোমার কি জ্বরটর আসছে?

কল্যাণ॥ কেন?

শুভা॥ গায়ে জ্বর উঠলে তোমার তো আবোল-তাবোল বকবকানি শুরু হয়ে যায়!

কল্যাণ॥ ঠাট্টা করছ?

শুভা॥ ঠাট্টা করার কি আছে!

কল্যাণ॥ আমি ঠিক কিছু করব।

শুভা॥ তাই কর। ডালটা ধরে গেল।

[*শুভা বিরক্ত-মুখে চলে যায়। মুহূর্তকাল বাজপাখিটার দিকে কল্যাণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে। মঞ্চে অনৈসর্গিক আলো ঘন হতে থাকে। ফোনটার কাছে যায়। মঞ্চের আলোর রঙ তীব্র হয়। ডায়াল করে। ভিতরের কোন উত্তেজনায় ওকে কিছুটা অস্থির মনে হয়। ফোন তোলে। অস্থিরতায় আচ্ছন্ন গলায় কল্যাণ ফোনে কথা বলে। কষ্ট এবং উত্তেজনা ওর কণ্ঠস্বরে।*]

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, আমি। আমি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, পিতা ঈশ্বর চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিঃসন্তান। পেশা কেরানি। না, কোন সাধ নেই। সামর্থ্য নেই। আমার স্ত্রীকেও পুরো সুখী করতে পারিনি। পৃথিবীর কাউকেই আমি সুখী করতে পারিনি। (*কান্নার মত শোনায়*) কাউকে পারিনি। আমি কল্যাণ, পিতা ঈশ্বর চন্দ্রনাথ। নিঃসন্তান। পেশা কেরানি এই

পৃথিবীতে বাস করি, কোন সাধ নেই, সামর্থ্য নেই। হ্যালো—হ্যালো, পৃথিবীর কাউকেই আমি সুখী করতে পারিনি। হ্যালো, হ্যালো—ওঁকে আমার চাই। দয়া করে ওঁকে একবার দিন। অতো দূরে ট্রাঙ্ক কল হয় না? ওঁকে আমার চাই। কতদিন, কতদিন ধরে চাইছি। আপনাদের প্রিয় নেতা। পৃথিবীর প্রিয় নেতা। এই বাজপাখিটা যাকে ভয় পায়—আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব। পৃথিবীর অতি নগণ্য একজন মানুষ, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে একজন মহান নেতার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। হয়ত প্রথম এরকম একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মুখোমুখি কথা বলব—আমি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। সাধ আছে, হয়ত সামর্থ্যও আছে, সে তার স্ত্রীকে সুখী করতে চায়—। পৃথিবীর অন্তত একজনকেও সুখী করতে চায়। হ্যালো, ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে? কি বলছেন? একটু বাদে কানেকশন্ হবে, আপনি জানাবেন? ঠিক আছে, রেখে দিচ্ছি।

[ফোনটা রেখে দেয়। কল্যাণকে ভীষণ খুশি দেখায়। ব্যাকুলভাবে শুভা বন্ধ দরজার কড়া নাড়তে থাকে। ওর গলা শোনা যায়—"দরজা বন্ধ করলে কেন? খোল, খোল বলছি।" সুব্রতর গলা—"দাদা, এই দাদা?" পবিত্রর গলা—"দাদা? দরজা ভাঙতেই হবে।" কল্যাণের সমস্ত মুখটা উপভোগের হাসিতে ছেলেমানুষের মত দেখায়। জোরে দরজায় একটা ধাক্কা পড়তেই দ্রুত খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের আলো বদলে আগের মত হয়ে যায়।]

(*ওরা ঘরে ঢোকে*)

শুভা।। (*শঙ্কিত*) দরজা বন্ধ করে ছিলে কেন?

সুব্রত।। কথা পর্যন্ত বলছ না!

পবিত্র।। ঠিক দরজা ভাঙতে হত এক্ষুনি। অন্তত সাড়া দেবে তো?

শুভা।। কি হয়েছে কি? একটু লজ্জা করে না তোমার! বাড়িসুদ্ধ লোককে ভাবিয়ে মজা পাচ্ছ? কী ঢুকেছে আজ সকাল থেকে তোমার মাথায়?

কল্যাণ।। বলছিলে না, অন্তত একটা কিছু কর।

শুভা।। হ্যাঁ, বেশ ভালরকম একটা রসিকতাই করলে!

কল্যাণ।। আমি যা করেছি, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কেউ তা করেনি; শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

সুব্রত।। কি করেছ?

কল্যাণ।। বলব কি না ভাবছি।

শুভা।। সে বল আর নাই বল। সুস্থ শরীরে তোমাকে দেখতে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এতো সব অলক্ষুণে দুর্ভাবনা হচ্ছিল; সত্যি তুমি এমন না!

পবিত্র।। বৌদি, দাদা নিশ্চয়ই একটা মজার কিছু করেছে। দেখছ না, হাসি-হাসি মুখ।

শুভা।। মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে, এই বল না, ব্যাপারটা বল না।

সুব্রত।। বলে দিলেই তো ফাঁস হয়ে যাবে। তাই বলছে না।

শুভা।। তাহলে তোমার মজা নিয়ে তুমি থাক। তোমরা চলে এস তো।

কল্যাণ।। ধর, যদি এই পৃথিবীর কোন মহান নেতা যিনি আমাদের এই দেশের থেকে ঢের ঢের দূরে। তার সঙ্গে আমি এক্ষুণি কথা বলি?

শুভা॥ তোমাকে যেমন দেখে গেছি, এখন দেখছি মাথাটা আরো বিগড়েছে। আগে তবু কথাবার্তার একটা মানে বুঝছিলাম—কি বলছ সব?

পবিত্র॥ বৌদি দাদাকে বলতে দাও। ও যা বলতে চায়, বলতে দাও।

সুব্রত॥ সেই যে কালী, মহাদেব—ওরা ভর করলে দাদা যেরকম কথা বলত—তেমনি বলছে।

শুভা॥ কি সর্বনাশ! ওঝা-বদ্যি না আবার ডাকতে হয়।

কল্যাণ॥ সর্বনাশের কিছু হয় নি। সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচেছি। তোমরা কেউ জান না, আজ কত বড় একটা শুভ দিন। আমি—একটু বাদেই এই পৃথিবীর একজন মহান নেতার সঙ্গে—

সুব্রত॥ নামটা তো বলবে?

পবিত্র॥ এ-সময় বাধা দিস্ না। যা বলতে চায়, বলতে দে।

শুভা॥ তুমি বল, বুঝলে, তুমি যা বলতে চাও বল।

কল্যাণ॥ তোমরা এমন করছ যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আরে আমি ঠিক আছি, পুরো ঠিক—অনেকদিন পর ভীষণ ভাল লাগছে আমার।

শুভা॥ ঠিক আছে, তোমার যা বলতে ইচ্ছে করছে বল।

কল্যাণ॥ বললুম তো আমি পৃথিবীর একজন প্রিয় নেতার সঙ্গে কথা বলব। এটা যে কতো বড় সৌভাগ্য তোমরা ভাবতে পারবে না। একটু আগেও আমি ভাবিনি।

শুভা॥ তিনি কি আসবেন?

কল্যাণ॥ না।

সুব্রত॥ তাহলে তুমি কথা বলবে কি করে?

কল্যাণ॥ কি করে কথা বলি সেটাই তোরা দেখবি। এই ঘরে, এখানে, তোদের সকলের চোখের সামনে এই বাজপাখিটার শত্রু, পৃথিবীর এক স্মরণীয় নেতার সঙ্গে কথা বলব।

শুভা॥ (*পবিত্রকে*) তুমি তো ডাক্তার, কি মনে হচ্ছে? কাউকে ডাকবে? যাকে ভাল বোঝ, তেমন কোন ডাক্তারকে বরঞ্চ ডাক।

কল্যাণ॥ কি আশ্চর্য সেই থেকে ব্যাপারটাকে অসুখ ভেবে যাচ্ছ। একশবার বলছি, বাপুরে আমার কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু না।

শুভা॥ মায়ের মুখে শুনিনি, যখন তোমার উপর মহাদেবের ভর হয়েছিল, তখনও তো তুমি বলতে কিছু হয়নি। হঠাৎ হঠাৎ ছাতাটা, লাঠিটাকে ত্রিশূলের মত ধরে হঠাৎ মহাদেব হয়ে যেতে। এসব তো তারই লক্ষণ। কি করি এখন? একটার পর একটা অশান্তি।

পবিত্র॥ বৌদি অত আপসেট হয়ে পড়লে তো চলবে না। আমাকে বুঝতে দাও। আচ্ছা দাদা, তুমি নিজে কি কোন নেতা হয়ে গেছ? মানে এরকম ভাবছ?

কল্যাণ॥ আরে এরা কি! যা বলছি, এতোক্ষণ ধরে সেটা মাথায় ঢুকছে না! বলছি, একজন নেতার সঙ্গে কথা বলব!

শুভা॥ (*চেঁচিয়ে*) কিভাবে বলবে সেটা তো বলবে? কোন্ নেতা সেটা তো বুঝব।

কল্যাণ॥ এত কৌতূহল না তোমাদের! কেন, একটুকাল ধৈর্য ধরতে পার না। একটু চেপে রাখার আনন্দও পেতে দেবে না?

সুব্রত।। কোনও একটা মজার প্ল্যান নিশ্চয়ই দাদার মাথায় ঘুরছে। আমার মনে হয় প্ল্যানচেট বসাবে। আর মিডিয়ম একজন প্রেতাত্মার গলায় কথা বলবে। কাল খেতে বসে প্ল্যানচেটের গল্প বলছিল না দাদা?

কল্যাণ।। তোমার মুণ্ডু!

শুভা।। মুণ্ডু কি? লাইব্রেরী থেকে 'মরণের পরপারে' বইটা আননি?

কল্যাণ।। আরে ওসব কিছু না।

পবিত্র।। কিছুটা কী বলতে কি আছে? তোমারও তেমনি গোঁ!

কল্যাণ।। ঐ যে ফোনটা দেখছ ঐ ফোনে কথা বলব। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। ট্রাঙ্ক কলে যার সঙ্গে কথা বলা প্রায় অসম্ভব সেই বিরাট মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলব। হল?

শুভা।। এতোই যখন বললে, দয়া করে নামটা বল।

কল্যাণ।। দয়া করে একটু বিশ্বাস করে আমাকে একটু সুস্থ থাকতে দাও। ফোনটা যে কোন সময়—হয়ত এক্ষুণি বেজে উঠবে, তোমরা সব জানতে পারবে।

শুভা।। সত্য বলছ?

কল্যাণ।। কিভাবে আমি বোঝাব, বল? আমার মধ্যে কোন লক্ষণ দেখছিস পাগলামোর?

সুব্রত।। দাদা যখন এতো করে বলছে—

শুভা।। বোধহয় ও ঠিকই বলছে।

শুভা।। ঠিক হলে কি, ওতো বলছেই সব ঠিক। তোমাদের ডাক্তারদের বাপু সব তাতে সন্দেহটা একটু বেশি।

পবিত্র।। না, আমি বলছিলাম, তাহলে কাগজে ওর ছবিও ছাপবে। এরকম ঘটনা সত্যিই তো কোথাও ঘটেনি।

কল্যাণ।। আরে ছবিটাই বড় হল। আগে ফোনটা বাজুক।

সুব্রত।। দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি।

[*সুব্রত দৌড়ে চলে যায়*]

কল্যাণ।। দেখলে, ও নিশ্চয়ই ঢাক পিটিয়ে খবরটা ছড়াতে চলল।

পবিত্র।। দু-চার জনের থাকা ভালই, সাক্ষী থাকা ভাল— আমাদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না, তারপরে তো বাইরের লোক। দাঁড়াও আমিও আসছি। সেনবাবুকে একটা খবর দি। কাগজের লোক, খবরটা ওদের পাওয়া দরকার।

শুভা।। বাড়ি আছে?

পবিত্র।। না থাকলে, অফিসে ফোন করব। (*চলে যায়*)

শুভা।। এই, এখন তো কেউ নেই, আমাকে নামটা বল। বল না? কেউ তো নেই।

কল্যাণ।। কেন ওরা কি আমাব পর নাকি ; বললে ওদের সামনেই বলতাম।

শুভা।। বেশ তাহলে আর একটা কথা তো অন্তত রাখবে?

কল্যাণ।। কি?

শুভা।। ওদের সামনে বললে ঠিক মুখ টিপে টিপে হাসত। জামা কাপড়টা বদলে তুমি একটু সেজে নাও।

কল্যাণ।। ঘরে বসে কথা বলব এতে সাজবার কি আছে?

শুভা।। সেনবাবু দেখো ঠিক ছবি তুলবে। তাছাড়া পাঁচজন লোক তো ঘরে আসবে।

কল্যাণ।। যা আছি, বেশ আছি—আমার ওসব ভাববার সময় নেই, ভিতরে কি রকম একটা একসাইটমেন্ট্ হচ্ছে। তুমি ভাবতে পারবে না!

শুভা।। রাজনীতি তো বিশ্বসুদ্ধ লোক করছে, তোমার মত ভাগ্য ক'জনের হয় বল তো? আমাকে তো যাচ্ছেতাই করে বল, কিন্তু বেশ পয়া আছি, সেটা তোমাকে এবার বলতেই হবে। তাই না?

কল্যাণ।। হবে।

শুভা।। হবে কি? আমার সঙ্গেও এখন ভরিক্কি চালে কথা শুরু করেছ। আমিই তো তোমাকে বলেছিলুম কিছু একটা কর—ওরকম খেপিয়ে না দিলে, এসব ঘটত?

কল্যাণ।। এক সময় আমি খেপে উঠতামই।

শুভা।। তবু তুমি আমাকে একটা দাম দেবে না!

কল্যাণ।। তোমাকে আমি চিরকাল দাম দি।

শুভা।। না বাপু, অনেক ঝগড়া করেছি, এখন আর কিচ্ছুটি বলব না তোমাকে। একটু সরবৎ খাবে?

কল্যাণ।। এই তো চা খেলাম।

শুভা।। চা-তো গরম! ঠাণ্ডামত কিছু? পাকা পেঁপে আছে, খাবে?

[*সদানন্দবাবু আর সুব্রত ঢোকে।*]

সদানন্দ।। সুব্রত যা বলল, সত্যিই তাই নাকি, কল্যাণবাবু?

কল্যাণ।। ও ঠিকই বলেছে।

সদানন্দ।। মশাই, আমাদের পাড়াটারই ইজ্জত বাড়িয়ে দিলেন। পাড়া বলছি কেন, দেশটারই সম্মান বেড়ে গেল।

[*সেনবাবু ক্যামেরা কাঁধে হন্তদন্তভাবে পবিত্রর সঙ্গে ঢোকে।*]

সেনবাবু।। এখনও ফোনটা বাজেনি তো? আমি তো প্রায় বেরুচ্ছিলাম। সবই লাক্ —একবার বেরিয়ে পড়লেই হয়ে ছিল! এসব খবর রীতিমতা দুর্লভ জিনিশ! গোটা পৃথিবীতে সেল করা যাবে। সত্যি, হুট করে একটা গ্লোরিয়াস কেস্ বাঁধিয়ে ফেললেন!

পবিত্র।। 'রীণাকে একটা ফোন করব?

শুভা।। না, এখন কেউ ফোনে হাত দেবে না।

[*হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে, সকলে চমকে ওঠে। কল্যাণ দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরে।*]

কল্যাণ।। হ্যালো, হ্যাঁ আমি। (*মুখটা বিমর্ষ*) না, শুভা এখানে নেই।

শুভা।। কি বলছ? আমি তো আছি।

কল্যাণ।। তোমার মা। পরে জানিও তুমি আছ। এখন ফোন আটকে রাখতে পারব না।

[*ফোন রেখে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন। কল্যাণ দৌড়ে যায়।*]

কল্যাণ।। (*ফোনটা ধরে*) না, সদানন্দবাবু নেই।

সদানন্দ।। আমি মানে—

কল্যাণ।। থামুন, আপনি নেই।

শুভা।। ফোনটা রেখে বল, শুনতে পাচ্ছেন না?

কল্যাণ।। বলছি তো, সদানন্দবাবুকে পাবেন না। হোঁচট খেয়ে শয্যাশায়ী। (*কল্যাণ ফোনটা রেখে দেয়*) এরপর ফোন এলে তোমরা ধ'র, আমার শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে! আমি অবশ হয়ে যাচ্ছি, কিবকম একটা হচ্ছে!

সদানন্দ।। তাতো হবেই, একটা একসাইটমেন্ট্ চলছে, তার উপর—

সেনবাবু।। সময় হয়ে এল বোধ হয়? কতক্ষণে ফোন পাবেন সেরকম কিছু জানিয়েছে?

কল্যাণ।। না। তবে পাব। ঠিক পাব। (*সদানন্দ ওঠে*) আবার উঠছেন কেন? দয়া করে এখন ফোন করতে যাবেন না।

সদানন্দ।। না, তা না। থুতুটা ফেলে আসচি। কৃমি আছে তো। ঘন ঘন থুতু আসে।

কল্যাণ।। চুপ করে বসে থুতু গিলতে থাকুন।

পবিত্র।। তুমি ওঘরে গিয়ে একটু বসবে?

কল্যাণ।। এখান থেকে আমি যাব না।

সুব্রত।। তুমি কথাও তো বলে যাচ্ছ সেই থেকে, একটু চুপ করে থাক না, ভাল লাগবে।

শুভা।। কিছু একটা হলেই সেই বকর বকর—কথা বলার কম ক্লান্তি।

কল্যাণ।। উপদেশ না দিয়ে তোমরা একটু চুপ কর।

[*সবাই একটুকাল চুপ করে থাকে।*]

সদানন্দ।। আপনি—

[*সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যায়।*]

কল্যাণ।। না, কথা বলুন, সবাই চুপ করে থাকলে কি রকম ভূতুড়ে লাগে।

শুভা।। সত্যি, এসময় একটু কথা না বলে কেউ পারে—

সদানন্দ।। আমি বলছিলুন, আপনি এমনিতে ভাল মানুষ, কিছুটি বোঝার উপায় নেই, তলায় তলায় রাজনীতির চিন্তাটি বেশ চালিয়ে গেছেন, না হলে মাথায় এরকম বুদ্ধি আসে।

পবিত্র।। দাদা একটু আগে আমাদের ইউনিয়নের খবর নিচ্ছিল। মাথায় সবসময় এসব ঘোরে।

সুব্রত।। আমাদের মিটিং-এ প্রায়ই দাদা হাজির হয়ে যায়...আজকে তো...

শুভা।। দিন রাত তো ঐ এক কথা—একটা ঘর-সংসারের কথা বলার সুযোগ পাই না। একটু আগেই তো একটা মোটা বই নিয়ে পড়ছিল। একটা ইংরেজিতে লেখা রাজনীতির বই। হাত থেকে কেড়ে নিতে হল, ঐ নিয়েই মুখ গুঁজে পড়ে থাকত—অফিস যাওয়া ওখানেই শেষ!

কল্যাণ।। শুভা!

শুভা।। আজকের দিনটায় ধমকিও না তো। যা খুশি বলব।

সদানন্দ।। যখনই ফোন কবতে আসি দেখি চোখের সামনে কাগজ ধরে আছেন। কাগজ ছাড়া আর কিছুতে ওর খেয়াল নেই।

সেনবাবু।। আরে মশাই, ঐ কাগজই তো সব কিছুতে খেয়াল এনে দেয়।

কল্যাণ।। আপনাদের কথাবার্তা কিছুই আমার কানে ঢুকছে না।

সদানন্দ।। শুধু একটা ক্রিং ক্রিং ক্রিং—হচ্ছে তো?

[*কল্যাণ তাকায়। সদানন্দ নিথর।*]

সেনবাবু।। দাঁড়ান, এই উৎকণ্ঠার মুহূর্তের একটা ছবি তুলে রাখি।

সদানন্দ।। উৎকণ্ঠা?

[*সদানন্দ মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব আনবার চেষ্টা করে। শুভা-সুব্রত চোখ তাকাতাকি করে। সেনবাবু প্রস্তুত হয়। শুভা কল্যাণের চেয়ারের পিছনে ছিল।*]

সদানন্দ।। (*শুভাকে*) মা লক্ষ্মী। (*শুভা তাকায়*) একটু এদিক পানে আসুন তো মা মণি! (*শুভা সরে আসতে ওর জায়গা দখল করে নেয়*) কেমন দুষ্টুমি করে জায়গাটা নিলুম। (*শুভা রকম দেখে জ্বলে যায়*) আমি প্রবীণ পেছনে, নবীন বসে আছে মাঝখানে, পদতলে—(*সুব্রতকে দেখিয়ে*) কিশোর। আর কোলে—(*দরজার কাছে একজনকে*) হ্যাঁরে ফেলুর ছোট্‌টাকে একবারটি নে আয় না...কিশোরের কোলে থাকবে বাল্য। ক্লাসিক!

শুভা।। (*বিরক্ত*) আর আমরা?

সদানন্দ।। কেন চেয়ারের দু'পাশে হাতল নেই? হাতল ছুঁয়ে থাকবে ভ্রাতা-পত্নী।

[*ওরা দুজনে দুপাশে দাঁড়ায়—দরজার পাশে দু-একজনকে উদ্দেশ্য করে সদানন্দ বলে—*]

সদানন্দ।। আয়। ঘিরে থাক। ছবি উঠছে—কাগজে। ফেলুর ছোট্‌টার কি হল রে? হাঁক পাড়্ না একটা।

সেনবাবু।। এখন ছেড়ে দিন।...(*সবাই এসে ঘিরে ধরে*) বৌদিকে দেখতে পাচ্ছি না।

শুভা।। জায়গা পাচ্ছি না তো।

সদানন্দ।। জায়গা করে নিন।

শুভা।। কি করে করব—সব তো ঘিরে আছে।

সদানন্দ।। এখন কি বিবাদের সময়!

সেনবাবু।। বৌদি, আপনি এগিয়ে ওঁর মুখের কাছে ঝুঁকে যেন কিছু বলছেন, যান।

শুভা।। (*কল্যাণের কাছাকাছি গিয়ে*) কি বলব আবার?

সেনবাবু।। কিছু একটা বলুন, তাহলে ছবিতে অ্যাকশন্ আসবে।

সদানন্দ।। আমরা?

[*সবাই মিলে কল্যাণকে ঘিরে ধরে ওকে প্রায় আড়াল করে ফেলে। বিড়বিড় করে শুভা অ্যাকশন দেয়।*]

কল্যাণ।। সর, সর সব। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[*সবাই সরে যায়।*]

কল্যাণ।। উঃ, পাগল করে ছাড়বে সব।

সেনবাবু।। আচ্ছা, কল্যাণবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। যে মহান নেতার সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁকে আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন?

[*নোট-বই আর পেন্সিল বার করে।*]

কল্যাণ।। কি জিজ্ঞেস করব মানে? কিছু একটা জিজ্ঞেস করব—

সেনবাবু।। আচ্ছা হঠাৎ আপনার এই ফোনে যোগাযোগের ব্যাপার কি করে মাথায় এল?

পবিত্র।। এই বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দাদা কি রকম অন্য রকম হয়ে যেতে থাকে।

[*সেনবাবু নোট নিতে থাকে।*]

সদানন্দ।। পাখিটা আমার চোখেও কেমন লেগেছিল।

কল্যাণ।। যে নেতার সঙ্গে আমি কথা বলব, তিনি ঐ বাজপাখিটার শত্রু। মানুষের অধিকারের ওপর যেখানেই বর্বর লোভ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে তাঁর সমস্ত শক্তি রুখে দাঁড়ায়। মানুষ এই সুন্দর পৃথিবীটায় সুন্দরভাবে বাঁচবে। এর থেকে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না।

সুব্রত।। দাদার কথা বলা কেমন সুন্দর হয়ে যাচ্ছে।—যেন মিটিং!

সেনবাবু।। যে মহান নেতার সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁর সঙ্গে আপনি কি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবেন?

সদানন্দ।। হ্যাঁ, তাঁকে তো আর কেমন আছেন—এটা জিজ্ঞেস করার অর্থ হয় না।

পবিত্র।। হাজার হাজার মাইল দূরের একটা মানুষ—

সদানন্দ।। হাজার মাইল দূরের নয়, আমাদের মনের খুব কাছের মানুষ।

পবিত্র।। এখানে এরকম একজন মহান মানুষ যিনি পৃথিবীর শুভাশুভ নিয়ে ব্যস্ত তাঁকে সত্যি করেই তাঁর যোগ্য প্রশ্ন করা উচিত। তুমি নিশ্চয়ই কিছু জানতে চাইবে? সেই প্রশ্নটা সেজন্যই যথেষ্ট বিবেচনা করে বলা দরকার।

সদানন্দ।। আপনি নিশ্চয়ই এ-বিষয় ভেবেছেন?

শুভা।। না ভেবে কি ও এতদূর এগিয়েছে?

সুব্রত।। সমস্ত মানুষের হয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

সেনবাবু।। সমস্ত মানুষের হয়ে কি প্রশ্ন? কল্যাণবাবু, কি প্রশ্ন করবেন আপনি?

কল্যাণ।। (*অসহায়*) আমি সেরকম কিছু ভাবিনি। আমি অতো জানি না। মানে বিশ্বাস করুন, আমার সে যোগ্যতা নেই।

সদানন্দ।। তাহলে আপনি কি তাঁর কাছ থেকে নিজের কিংবা দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু জানতে চান?

কল্যাণ।। কি জানতে চাইব?

শুভা।। কি আশ্চর্য, সেটাই তো তোমাকে ভেবে বের করতে হবে।

কল্যাণ।। বিশ্বাস কর, জানতে চাইতে হলে নিজেকে অনেক কিছু জানতে হয়। নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। আমি শুধু সংসার করে গেছি—কী ভীষণ ফাঁকি দিয়েছি! নিজেকে ফাঁকি দিয়েছি, নিজের চারদিকটাকে ফাঁকি দিয়েছি। আমি কি জানতে চাইব?

সুব্রত।। তুমি আমাদের দেশের কথা বল। তার ভিতরকার সমস্যাটা জানাও যা অতোদূর থেকে উনি সব জানেন না।

কল্যাণ।। (*আরো অসহায় দেখায় ওর মুখ*) দেশটাকে যে আমি ভাল করে দেখিনি।

কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! এতো বছর ধরে দু'চোখ মেলে আমি কি দেখলাম? কতো ক্ষত চারিদিকে, অথচ আর কাউকে তা আমি চিনিয়ে দিতে পারছি না। কোথায় যেন একটা সুতো ছেঁড়া, আমার যোগ নেই। মানুষের ব্যথা সারাতে চেষ্টা না করলে বোধহয় ব্যথাকে চেনা যায় না। আমি চিনতে এগিয়ে আসিনি! আমি অপরকে চেনাব কেমন করে?

শুভা।। তাহলে এক্ষুণি ওঁর সঙ্গে কি কথা বলবে?

কল্যাণ।। আমি পারব না। তুমি বল। তোমারও তো কথা আছে? তোমারও তো অভিযোগ আছে। দেশটা তো তোমারও!

শুভা।। আমি কিছু জানি না।

কল্যাণ।। কেন, কেন জান না? তুমি হাঁটনি এই মাটিতে? চোখ মেলে চলনি? চলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটেছে না? সেটা কিসের কাঁটা, কেন ফুটল, কোত্থেকে এল, জানবে না তুমি—কেবল ঠকবে?

শুভা।। তুমি কেন জান না? কেবল আমার দোষ! রান্নাঘরটা ছাড়া আমি আর কোথায় গেছি? কি দেখেছি? ধোঁয়া, কালি, হাঁড়ি-কলসী আর হেঁচকে টানা সংসার—আর কি জানি?

কল্যাণ।। কাউকে কিছু বলতেই হবে। সদানন্দবাবু। তাহলে আপনি বলবেন?

সদানন্দ।। আমি?

কল্যাণ।। হ্যাঁ, আপনি। একজন বিরাট মানুষের মুখোমুখি না হলে বোঝা যায় না —আমার কি জানা উচিত, করা উচিত। কী আমার দায়িত্ব। এখন সেই সময় এসেছে —আপনি বলবেন?

সদানন্দ।। আমাকে ক্ষমা করুন। মানে আমি—আপিসের ইউনিয়নের চোখে আমি বিষ...মালিকের পায়ে তেল ঢেলে সংসার ধরে রেখেছি—আমার কি বলা মানায়? মন চায় রুখে উঠি। পারলে, তখন বলব।

কল্যাণ।। সেনবাবুও বোধহয় বলবেন না? কেউ বলবেন না। আমাদের নেতা ডেকে ডেকে ফিরে যাবেন?

সেনবাবু।। খবর সংগ্রহ করি—কিন্তু আমারও তো মালিক আছে। আসলে খবর কুড়োতে কোথায় কিভাবে যেন নিজেকে বেচে দিয়েছি। মানে, কি রকম নষ্ট হয়ে গেছি —নিজের খবরটা যোগাড় করতেও তো সময় নেয়। এক্ষুণি বলতে পারব না। সময় পেলে—

পবিত্র।। আমাকে বলতে বোলো না দাদা। আমি কি বলব? স্টুডেন্ট লাইফে কেবল স্টুডেন্টই থাকতে চেয়েছি—নিজের শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু তেমন করে জানতেই চাইনি।

সুব্রত।। কিছুদিন পর আমি ঠিক বলতে পারব। আর একটু বুঝলে, আর একটু তৈরী হলে।

কল্যাণ।। (*অন্যদের*) আপনারা? (*ওরা চুপ*) আমাদের এই ছোট ঘরটায় আমরা কেউ আমাদের মহান নেতার সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে পারলুম না। তাই বলে তাঁকে ডেকে চুপ করে থাকবই বা কেমন করে? আজ না পেরে যদি কাল পারি, বা পরশু —তাহলে সেদিন তার সঙ্গে কথা বলব। গেট এভরিবডি রেডি—আমরা আমাদের মহান

নেতার সঙ্গে কথা বলবই। যে আগে আসবে সে-ই আগে কথা বলবে। তোমরা একটু বাইরে যাও। আমি জানিয়ে দি।

[*সকলে সন্তর্পণে বাইরে যায়। সেই রহস্যময় আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। কল্যাণ ফোনটা তুলে দাঁড়ায়।*]

কল্যাণ॥ হ্যালো, হ্যালো—আমরা কয়েকজন নিতান্ত গৃহস্থ মানুষ আমাদের মহান নেতার সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে পারলাম না। দয়া করে আমাদের একটুখানি সময় দিন। আমরা পারব। এই মুহূর্তে না হলেও আমরা পারব—কাল না হয় তার পরের দিন।...ভাঙাচোরা, অথচ অন্ধ, গৃহস্থ কয়েকটি মানুষের প্রার্থনা—দয়া করে একটুখানি সময় দিন। কাল না হয় পরশু—আমরা পারব, হ্যাঁ, হ্যাঁ বাজপাখিটা আমাদের চোখের সামনেই তাকিয়ে আছে...চোখ বুজেও আমরা দেখতে পাই—পৃথিবীর আকাশে যে বাজপাখিটা ভয়ংকর ডানা মেলে ওড়ে সেটা ছোট্ট সংসারের মধ্যেও ওঁৎ পেতে বসে থাকে। চোখে ক্ষুধা, নখে লোভ, ঠোঁটে হিংসা, সোজা তাকিয়ে আছে। শুনুন, শুনুন—পাখিটা আমাদেব ভিতরে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করছে, একটা আশ্চর্য পরিবর্তনের চেহারা দেখে ভয় পাচ্ছে...হ্যাঁ ভয় পাচ্ছে! আমরা চোখ মেলে আগের চেয়ে বেশি দেখছি...আমরা পায়ের নিচে মাটিটা আরো শক্ত টের পাচ্ছি...আমরা মুঠোর মধ্যে আরো জোর পাচ্ছি...আমাদের রক্তের মধ্যে এক নতুন শব্দ...যেন সমুদ্রের গর্জন...শুনুন...শুনুন...শুনুন ঐ সমুদ্রের শব্দ...

[*কল্যাণ বুকে চেপে ধরে ফোন।...সহস্র কণ্ঠের কল্লোলেব মত ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে।*]

পর্দা

মাছি

চরিত্র : কালাচাঁদ, বৈকুণ্ঠ, পালন, কালাচাঁদের বৌ, জয়নাল, বুড়ো, নকুল, চরণ, মানিক, গগন, গগনের বৌ, দারোগা।

[বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর ঘব। পিছন দিকের দেওয়ালে কোন পূর্বপুরুষের চিত্র। দু'পাশে গণেশজননী এবং শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের ফটো। বৈকুণ্ঠ গ্রামের মাতব্বর মানুষ। একখানা সেকেলে চেয়ার তার বংশগৌরবের সাক্ষী হিসেবে ঘরের বাঁদিকে। তার কাছাকাছি জানালা সমান উঁচু একটি বনেদি টেবিল। টেবিলটি জানালার ধার ঘেঁষে, টেবিলে বসে জানালা দিয়ে গলিয়ে ছিপ ফেলে বসে আছে কালাচাঁদ। বয়স বছর ত্রিশ হবে। গলায় কম্ফর্টার। হাফসার্ট গায়ে। বোধহয় কোন মাছ আটকেছে। উত্তেজিত মুখ চোখ। হুইলের সুতো ছাড়ছে, গোটাচ্ছে। মেঘ ডাকছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের আলো ঢুকছে ঘরে। পাশে একটি ট্রানজিস্টার তারস্বরে খবর বলে যাচ্ছে।]

রেডিও ।। অভূতপূর্ব বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দাপটে দেশের জনজীবন ও অর্থনীতি বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অবিরাম ধারাবর্ষণ, বাঁধভাঙা জল এবং বিভিন্ন নদীর জলস্ফীতির জন্য বহু জেলা প্লাবিত হয়েছে। অসংখ্য গ্রাম জলমগ্ন। অসংখ্য মানুষ বিপন্ন। জলমগ্ন অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকায় উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বন্যাকবলিত...

[কালাচাদ ক্ষুব্ধভাবে রেডিও বন্ধ করে মৎস্য শিকারে একাগ্র হয়। মনে হয় বড় রকমের একটা মাছের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলছে। ধনুকের মত বেঁকে গেছে ছিপ। কালাচাঁদ টেবিলে উঠে দাঁড়িয়েছে।]

কালাচাঁদ ।। (*উত্তেজিত*) জ্যাঠা! জ্যাঠা!!

[কোন সাড়া নেই। কালাচাঁদ সামলাতে পারছে না।]

কালাচাঁদ ।। জ্যাঠা গো!

[বৈকুণ্ঠ হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। ভোগে যত্নে থাকার চেহারা। মাছ গেঁথেছে— সে দেখতে পায়। বগলে চাপা বৈষয়িক দলিলপত্র টেবিলে রাখে।]

বৈকুণ্ঠ ।। গেঁথেছিস?

কালাচাঁদ ।। টেবুলে উঠে শীগগিরি কোমরডা জড়ায়ে ধর। আমারে টেনে নিচ্চে!

[বৈকুণ্ঠ কোনমতে টেবিলে উঠে কালাচাঁদের কোমর জড়িয়ে ধরে।]

বৈকুণ্ঠ ।। কি জিনিশ গেঁথেছিস রে কালাচাঁদ। এমন জোর তো মাছের শরীলে হবার না। জ্যাঠা-ভাইপো দুজনারে টেনে নিলে যে চৌধুরী বংশে বাতি দেবার কেউ থাইকবেনা!...আমার দম হালকা হয়ে আসতিছে, হাতের দাবনায় টান সইছে না!

কালাচাঁদ ।। ...ছাড়া নাই। এ সেই মাছ গো জ্যাঠা।

বৈকুণ্ঠ ।। কোন মাছ?

কালাচাঁদ।। ঐ যে গো ঢোল দিয়েছিল—চারমণ ওজনের মাছ, মাছের নাকে সোনার নোলক। এ মনে হচ্ছে এডা সেই মাছ। বন্যায় ভেড়ি থেকে ভেইসে গিছে। যে ধরি দিবে—চার বিঘা জমি পাবে, সঙ্গে দু হাজার ট্যাকা...জ্যাঠা...ও জ্যাঠা, আমার হাত পিছলে ছিপ হড়কে যাচ্ছে!

বৈকুণ্ঠ।। জোর কইরে ধর।

কালাচাঁদ।। যাঃ!

[*হুস করে ছিপ কালাচাঁদের হাত ফসকে জানালা দিয়ে অদৃশ্য হল। আলগা হতে বৈকুণ্ঠ টেবিলে ধুপ করে বসে পড়ল। একটু লেগেছে তার।*]

বৈকুণ্ঠ।। শালা, ঢ্যামনা!

কালাচাঁদ।। ইঃ! গাল পারে! আমার বলে জেবন বেইরে যাচ্ছিল।

বৈকুণ্ঠ।। নাঃ, গাল পাইরবে না! মাছের নামে লবডঙ্কা! ইদিকে আমার হুইলের ছিপটা যে গেল, হারামজাদা!

কালাচাঁদ।। (*টেবিল থেকে নামতে নামতে*) মানুষ, গরু ভেসে যাচ্ছ, আর এট্টা ছিপের জন্যি হুতাশ নেগেছে!

বৈকুণ্ঠ।। আরে অ কালাচাঁদ! বানে ভাসা গরু ছাগল ছিপে গাঁথিসনি তো? স্রোতের টানে কত সব ভেসে আসচে।

[*কালাচাঁদ কথা না বলে চলে যাচ্ছিল—*]

বৈকুণ্ঠ।। কুথায় চললি?

কালাচাঁদ।। আর একখান ছিপ তো আচে। নে আসচি।

বৈকুণ্ঠ।। কি পেয়েচিস! ও ছিপে হাত দিবি নি!

কালাচাঁদ।। কেন? কত কষ্ট করে পিম্‌রের ডিম যোগাড় করিচি! আমার অমন সাধের টোপগুলান কি পচে হেজে যাবে!

বৈকুণ্ঠ।। পচবে কেন? পিম্‌রের ডিমের পিণ্ডি পাকায়ে দে— গিলে খাই! সুখের পায়রা হয়েচ! বাবুর দোতলার জানলায় বসে মাছ ধরা হচ্ছে! ইদিকে জল বেড়ে একতলা ছাড়ায়ে দু'তলায় উঠবার জো হয়েচে—সে সব খেয়াল কত্তি হবে না? সুম্‌সারের জিনিসগুলা বাঁচাতি হবে না?

কালাচাঁদ।। ও তুমি কিচ্ছু ভেবনি জ্যাঠা, আমি জ্যান্ত থাকতে কিচ্ছু যাবে না। (*জানালার কাছে গিয়ে*) ঐ দ্যাখো জ্যাঠা, মাছে কেমন ঘাই মারতিচে।...ওঃ কি দিস্য, জলে জলাকার! কে বইলবে যে নিচোয় উঠোন ছেল! মনে হচ্চে যেন ইস্টিমারে বসে আচি।...ঘরে বসে মাছ ধরা...ওঃ, এমন মৌজ আর হবে কুনকালে জ্যাঠা!

বৈকুণ্ঠ।। তোরে নিশ্চিত মেছো ভূতে ধরেছে!

কলাচাঁদ।। ঐ দ্যাখো! বুয়াল মাছটা ঘাই মেরে চিৎ হয়ে ভাসচে? তার মানে, শরীল আলগা করে ডিম ছাড়তিচে। যাই, ছিপটা নে আসি।

[*কালাচাঁদ চলে যায়।*]

বৈকুণ্ঠ।। হারামজাদা, এঘরে যদি ছিপ নিয়ে আসিস তো, তোর মাথা ভাইঙবো আমি। যা করবার ওঘরে বসে করবি।

[*বৈকুণ্ঠ চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে কাগজপত্তর নিয়ে বসে। একখানা দলিল খুলে খুঁটিয়ে দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ ডাকে।*]

বৈকুণ্ঠ।। আরে, বারাণ্ডা দে যায় কে? পালান না? কথা শুনি যা।

[*পালান ঢোকে। এ বাড়ির ভৃত্য। মেঘ ডাকে।*]

বৈকুণ্ঠ।। জলের সোত যেন বেড়েচে মনে হয়।

পালান।। সে তো সমানে বেড়িই চলেছে।

[*জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় বৈকুণ্ঠ।*]

বৈকুণ্ঠ।। কালীবন্ন আকাশ! চাদ্দিক জমাট! ঐ ম্যাঘখান ভাঙি পড়লে পব্বত পর্যন্ত গলে যাবে—ঘরবাড়ি মানুষজন তো কিছু না। তা, একতলা ফাঁকা করে সব ওপরে তুলিচিস্ তো?

পালান।। তুলচি।

বৈকুণ্ঠ।। একটু তাড়াতাড়ি করিস, জল কিন্তু উঁচা হচ্ছে।...আর ভেজা ধানগুলা ঘরের মধ্যে মেলে দিয়ে হাওয়া দে শুকুতি বলেছিলাম, কচ্চিস?

পালান।। কালীর মা পাখা কত্তিচে।

বৈকুণ্ঠ।। তা, তুমি কত্তিচো না কেন? তোমার হাতে কি বাত হয়েচে?

পালান।। আমার শরীর আর দেচ্চেনা।

বৈকুণ্ঠ।। কেন? কি হয়েচে?

পালান।। চোখে মুকি আঁধার দেচ্চে। গতরে জুৎ নাই। কেমন যেন খেচন দেচ্চে।

বৈকুণ্ঠ।। ভেদবমি হয়েচে?

[*পালান মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।*]

বৈকুণ্ঠ।। (*শান্ত গলায়*) তোর ওলাওটা হয়েচে। বাড়ি চলি যা। ছোঁয়াচে রোগ।

পালান।। বাড়ি কুথায় যে যাব?

বৈকুণ্ঠ।। ও সোতে ভেসে গিচে। হ. যা চলি যা।

পালান।। য্যাখন যেতি চাইলাম, কিছুতে ছাইড়লেন না।

বৈকুণ্ঠ।। ছাইড়লে আমারে দেইকবে কে? খালি নিজের বিপদটাই দেখবি? আমার খাবি আর আমার দুদ্দিনে চলে যাবি— পয়সাগুলান সারা জেবন কি অমনি দিচ্চি?

পালান।। কত বইললাম, বাবু জল বাড়তি নেগেচে, মোরে একবারের জন্য ছাড়েন; মাগ-ছেলেডা কোথায় আছে একবার দেখে আসি। ছাইড়লেন না। কুথায় আছে ওরা কে জানে!

বৈকুণ্ঠ।। তেমনি যদি টান তোমার, জলে ঝাঁপ কেটে কেন গেলে না! তোরে তো আর আমি দড়ি দে বেন্ধে রাখিনি।...ম্যাঘের যা অবস্থা—দিনরাত্তির ঠাওর হয় না। সূয্যি ডুবে গেছে কখন। যা বৌমারে বল, পিদুমটা ধরিয়ে ঘর দোরে সন্ধ্যা দেখাতি। অনাছিষ্টির সুমসার হয়েছে। ভূতের বাড়ি! সাঁজ গিয়ে রাইত নামে, একটা পিদ্‌ম না, শাঁখের আওয়াজ না।

[*চলে যেতে থাকে পালান*]

বৈকুণ্ঠ।। আর শোন গরুগুলান উপাসে নাই তো? জাবনা কেটে দিইছিস্?

পালান॥ দিইচি।

বৈকুণ্ঠ॥ মণ্ডপখান আমার উঁচা ছেল তাই রক্ষা। নইলে গরু-ছাগলগুলান সব টেঁসে যেত। ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘুঁটের সাঁঝাল দে আয়—অবলা জীব—শীতি কষ্ট পাবে গরুকডা!

পালান॥ এই শরীলে সাঁতার কেটে মণ্ডপ যাব?

বৈকুণ্ঠ॥ ভগমানের জীবের সঙ্গেও রোষ করিস? কর! কাউরে কিছু বইলব না আমি!...যা, বিদেয় হয়ে যা। দুনিয়াডা চক্ষুশূল হয়ে যাচ্চে!

[*পালান চলে যায়। কালাচাঁদ ঢোকে। হাতে ঝোলানো টিনের একটি বাক্স, কাঁধে গামছা। বৈকুণ্ঠকে এসে প্রণাম করে। মুখ তার গোঁজ, বৈকুণ্ঠ বিমূঢ়।*]

বৈকুণ্ঠ॥ কি হল? হঠাস করে পেন্নাম করতিছিস্?

কালাচাঁদ॥ এই শেষ দেখা।

বৈকুণ্ঠ॥ ভর সন্ধেবেলা কিসব অকথা কুকথা শুরু করেচিস?

কালাচাঁদ॥ বাপ-মা মরা ছেলে আমি। কোলে পিঠে করে মানুষ করেচ। পরাণডাও তুমি রেকেচ। এই শরীলের তাবিচ কবচও তুমি নিজের হাতে একটা-একটা করে পরায়ে দিয়েচ।

বৈকুণ্ঠ॥ তা কি হয়েচে?

কালাচাঁদ॥ সেই তোমারে চেরকালের মত ছেড়ে চলে যেতে হচ্চে!

বৈকুণ্ঠ॥ কাণ্ডটা কি হয়েচে বলবি তো?

কালাচাঁদ॥ তোমার বৌমা এয়েচে দুবচর, আর তুমি আচ আমার জন্মকাল থিকে। সেই তুমার সঙ্গে আমার অধম্ম কত্তি হল!

বৈকুণ্ঠ॥ তোর কতা আমার মাতায় কিছুই নেচ্চেনা। হয়েছেডা কি?

কালাচাঁদ॥ এই বান-বন্যার জল ভেঙে এখন আমারে দু-কোশ সাঁতার কাটতি হবে।

বৈকুণ্ঠ॥ কেন?

কালাচাঁদ॥ কাটতি হবে আমি পিতিজ্ঞে করিচি। (*ক্ষিপ্ত*) যদি চৌধুরী বংশের সন্তান হয়ে থাকি—আমি ঝাঁপ দেব। (*দরজার দিকে কাকে শুনিয়ে*) বেধবা হয়ে বুঝবে কেমন সোয়ামী ছেল—কথার ইজ্জত তার জানা ছেল। সে মরদের ব্যাটা, মরদের বংশে তার জম্ম।

বৈকুণ্ঠ॥ কালাচাঁদ!

কালাচাঁদ॥ বলতি দেও আমারে। সন্নেসির মত চলে যাচ্চি, বুঝেচ। একখান গামচা আর আমার এই কবরেজি ওষুধের বাক্স সম্বল করে চলে যাচ্চি। রাজত্ব ফেলে চলে যাচ্চি, বুঝচ?

[*দরজার কাছে ঘোমটা-টানা একটি বউ এককোণে দাঁড়িয়ে ফোঁপায়।*]

বৈকুণ্ঠ॥ এধারে তুই দাপাচ্ছিস্—আর ওধারে বৌমা ফোঁপাচ্চে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না রে!

কালাচাঁদ॥ তারে এখন বাপের বাড়ির খপর এনে দিতে হবে! সারা দিনে মুখি অন্ন তোলেনি।

বৈকুণ্ঠ।। খপর আনতে তো করালীরে পাটিয়েছি বৌমা, অত চিন্তা কিসির?

বৌমা।। (*কাঁদতে কাঁদতে*) সে তো কাল গিচে, আজও এলনি। পথ তো মোটে দুকোশ! শুনিচি সেখানে খুব জল।

[*জোরে কাঁদে।*]

কালাচাঁদ।। করালী কি আর তার বাপের বাড়ি গিছে? নিজের সুমসার সামলাতে পালিয়েচে। এ বাড়িতে ফের পা ঠেকালি ওরে আমি জ্যান্ত না পুঁতি তো চৌধুরী বংশের কেউ না, পিতিজ্ঞে রইল আমার।

বৌমা।। সেখানে মানুষ গরু সব ভেসে যাচ্চে। অসুখে মরতিচে।

বৈকুণ্ঠ।। দু'তলা পাকা বাড়ি তোমার বাপের—অনর্থক চিন্তা করার কি আচে? যাও ঘরে পিদুম দেকিয়ে অন্নজল করগে। চিন্তা একটু থাকে—তা সবারই হচ্চে। আমার দেকোনা, এই ভেড়িডা বানের জলে ভেসে গিচে। এই সেদিন মাছের নাল ভেঙেচি —আজ সেই মাছ কোথায় যাচ্ছে কে জানে? জলের টানে জমির দাগ সব এলোমেলো হয়ে যাচ্চে—কাগজপত্তর বের করে সব দেকেশুনে রাকচি। এ-খন্দের ফল-ফসল কিছুই হবে না। একি যেমন তেমন শোক বৌমা! তবু কেমন মাতা ঠাণ্ডা রেকেচি। কায়দা কস্তা করে সবতো আমার রাখতে হবে। কিছুতে ভেঙে পইড়বে না, বুঝেচ?

কালাচাঁদ।। কারে কি কচ্চো? এসব কথা কি তারে আমি কম বুঝিয়েচি! মুখ্যুর কি জ্ঞান থাকে? কতবার বইললাম, চোকির ছামুতি জ্যাঠা আচে তার দেষ্টান্তটা নেও। শোকে তাপে মহাদেব টলতি পারে, কিন্তু জ্যাঠা আমার পাতর। জ্যাটাইমা মইরল—চিতায় তোলা হচ্ছে তেনারে...জ্যাঠা আমার চোখ মুছতি মুছতি দারোগা সাহেবের কানে কানে কথা বইলল, বুদ্ধি বাতলালো—সেই বুদ্ধিতেই ত্যাঁদোড়ের ত্যাঁদোড় চাষার ব্যাটা হরিচরণ খুনের মামলায় ফেঁসে গেল, এসব শোনা কতা না—নিজের চোকি দ্যাকা! এসব কতা কারে বোঝাব, চোকির জলই কমে না!

বৈকুণ্ঠ।। চোকির জল আচে, বান-বন্যার জলও আচে...তাই বলে সব কিছু কি ভেসে যাবে?

বৌমা।। আমি কি তারে জলে ঝাঁপ দিতে বলিচি? বলুক সে, এমন কথা বলিচি কি না!

কালাচাঁদ।। তা, চাকর-বাকর দে না হলে তো আমারেই যেতে হবে। খপর আনতে কি জ্যাঠা যাবে? ফোঁপাচ্চে তো ফোঁপাচ্চেই। এ ঘরে একটু ছিপ নিয়ে বসলাম, সে ছিপটা গেল। ওঘরে পালঙ্কে বসে সবে একখানা ছিপ নে বসেচি। কতা বললে তকরা হবে—বাপু চুপচাপ মাছ মারি। হঠাৎ করে এসে কথা নেই বাত্তা নেই মটাস করে ছিপটা মচকে ভেঙে জানলা দে ফেলে দেল।

বৈকুণ্ঠ।। এ ছিপটাও গিচে?

কালাচাঁদ।। নাঃ আস্ত আচে! তোমার এই এট্টা দোষ, সোজা কথাটা বুঝতি ঘামায়ে ওঠ! আমার কথায় এমন কি ধোঁয়া ছেল যে বুঝতি পাচ্চনা ছিপটা আচে না গ্যাচে?

বৈকুণ্ঠ।। বুছেচি। দু'খানই গেল! যাও একন বৌমারে অন্দরে নে অন্নজল করাও।

কালাচাঁদ।। আমার পিতিজ্ঞে?

বৈকুণ্ঠ।। তোমার বকলমে আমি জলে ঝাঁপ দেব। তুমি যাও।

[*বারান্দার দিক থেকে বমি করার শব্দ শোনা যায়।*
বৈকুণ্ঠ দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দেয়। নাক চেপে মুখ
বিকৃত করে ভিতরে আসে। কালাচাঁদ ওদিকে যায়।]

বৈকুণ্ঠ।। এঁ হে হে হে! বাবাগুটা আমার গিছে! ভেদবমিতে একাকার!

[*কালাচাঁদ নাক চাপা দিয়ে ফিরে আসে।*]

কালাচাঁদ।। কোঁৎ কোঁৎ করে গরু-ছাগল পচা জল গিলেচে। ঘরে তো মহামারী ছড়াবে!

বৈকুণ্ঠ।। পালান আমার সুমসারটারে না শ্মশান করে তোলে।

কালাচাঁদ।। সময় থাকতি ভেলা করে ভাসান দিয়া দরকার।

বৌমা।। ওডারে আবার ধরতি ছুঁতি যেওনি। ছোঁয়াচে ব্যাধি—ঝাড়েবংশে মারে।

[*হঠাৎ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় পালান। কলেরায় আক্রান্ত*
চেহারা। ওর দিকে তাকিয়ে ওরা ভয় পায়।]

পালান।। আমি যাবনি। এখন আমার জন্যি ভেলা আসে, মান্দাস আসে! য্যকন মাগপুত ভেসে যায় ত্যাকন দরদ ছেল কোথায়? আমি যাবনি।

বৈকুণ্ঠ।। মত্তি বসি দাপট ফলাচ্চিস!

কালাচাঁদ।। না যাস, বাঁশের খোঁচা দে তোরে জলে ফেলে দুব।

পালান।। সারা জেবনঠাইতো খোঁচাচ্ছেন। সারা গ্রামটারেই খোঁচাচ্ছেন। জানতি বাকি আচে কিচু!

বৈকুণ্ঠ।। চোপ!

পালান। সারা জেবন চুপ থেকেচি, মইরবার আগে ভয় কারে? বাপ দাদার সর্বস্ব গিচে, আমারে চাকর করেচ—এখুন খোঁচায়ে জলে ফেইলতে চাও। আমি যাব না! খোঁচাও, য্যাত পার খোঁচাও।

[*বারান্দার দিকে সবে যায় পালান।*]

বৈকুণ্ঠ।। গাল ভর্তি বিষ নে ছেল এতদিন হারামজাদা। নেমকহারামির শাস্তি দেচ্চে ভগমান, বুঝেচিস? থাক পড়ে ওখেনে। কথা শুনলি চিতার আগুন মাথায় উঠে আসে।

কালাচাঁদ।। তোরে শকুনে ছিড়ে খাবে। শেয়ালের ভোজন হয়ে যাবি। লাথায়ে শেষ কত্তি হয় এসব কেউটের জাত।

বৈকুণ্ঠ।। যাও বৌমা, অন্দরে থাক গে। বারাণ্ডার ধারপাড় মাড়াবে না।

কালাচাঁদ।। এখন তো ভাল, জল সরে গেলে পুরা গাঁ-টাতেই মহামারী লেগে যাবে। মড়কের আগুন জ্বইলবে।

বৈকুণ্ঠ।। হা অন্ন হা অন্ন করে মানুষ জানোয়ার হয়ে উঠবে। মহা বিপদ শিয়রে।

বৌমা। আমার ভয় কত্তিচে।

বৈকুণ্ঠ।। একটা কাম করে গে। গোলার চাল আমি আগেই সবিয়ে ফেলেচি। কিন্তু ঘরের মজুতও কম না। ঘরে বালিশ তোষক লেপ যা আচে সবগুলার ভেতর থে তুলা বের করে ছালার চাল ভেতরে ঠেসে দাও। তাছাড়া চাল নুকোবার আর জায়গা কোথায়। বলা যায় না—ঘরের মধ্যে এসে যদি চড়াও হয়।

বৌমা।। আর গয়নাগাঁটি?

কালাচাঁদ ॥ ট্যাকা-পয়সা? মাটি খুঁড়ে রাইখব তারও তো জো নেই। জলে জলাক্কার সব।

বৈকুণ্ঠ ॥ থাইকবে সব সিন্দুকে। ওটা ভাঙে তো কপাল ভাইঙল। আর করা কি? যা বললাম কর গে। আমি এই দলিল পরচাগুলানো একবার চোখ বুলিয়ে হাত নাগাচ্ছি।

[*এরা দুজনে চলে যায়। বৈকুণ্ঠ কাজে মন দেয়। বারান্দা থেকে পালানের বমি করার আওয়াজ আসে। মেঘ ডাকে। একটা ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। বৈকুণ্ঠ কান পাতে। কালাচাঁদ ঢোকে। মুখে ত্রাস। হাতে টর্চ।*]

কালাচাঁদ ॥ জ্যাঠা!

বৈকুণ্ঠ ॥ কি রে?

কালাচাঁদ ॥ জলে লগি ফেলার আওয়াজ হচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ ॥ কানে গিচে আমার।

কালাচাঁদ ॥ (*জানলার দিকে তাকায়*) মনে হচ্ছে, ভেলায় চেপে ইদিকপানে মানুষ আসচে। টর্চ ফেইলব? চাদ্দিক বড় আন্ধার।

বৈকুণ্ঠ ॥ টর্চ ফেলে কাম নাই।

[*বাইরে থেকে হাঁক শোনা যায় 'কত্তাবাবু, কত্তাবাবু'।*]

বৈকুণ্ঠ ॥ (হেঁকে) কারা যায়?

নেপথ্য ॥ যাচ্ছি না—সব ফেলে ঝেলে আপনার দুয়ারে ঠাঁই নিতে এইচি।

[*বৈকুণ্ঠ জানলার কাছে যায়।*]

বৈকুণ্ঠ ॥ (*ঝুঁকে*) আমার দুয়ার বইলতে কি আর কিচু আছে! জলে ভেসে আচি।

নেপথ্য ॥ এট্টুস ঠাঁই না পেলে তো বাঁইচব না।

বৈকুণ্ঠ ॥ ঐ পিছনের দিকে চলি যা। কালাচাঁদ টর্চ দেখাচ্ছে। সিঁড়িটা মালুম করে উঠে আয়।

[*জানালার কাছ থেকে বৈকুণ্ঠ চলে আসে।*]

বৈকুণ্ঠ ॥ যারে কালাচাঁদ, আলোটা দেখা।

কালাচাঁদ ॥ আপদগুলানরে আদর করে ঘরে তুলছ?

বৈকুণ্ঠ ॥ সবসময় কি খেঁটের বাড়ি মেরে কাম হয়! এসময় এট্টু না করলে চলবে? যা। ওদের আলো দেখিয়ে চালগুলোগে লেপ তোষকে ঠাস।

[*কালাচাঁদ চলে যায়। বৈকুণ্ঠ কাগজপত্রগুলো গুছোয়। দ্রুত চেয়ারে উঠে পূর্বপুরুষের তৈলচিত্রটির আড়ালে লুকিয়ে ফেলে। ওদিক থেকে লোকজনের দু'তলায় উঠে আসা সংক্রান্ত কথাবার্তা ভেসে আসে। বৈকুণ্ঠ চেয়ার থেকে নামে। দরজা দিয়ে কয়েকজন চাষী ঢোকে। একজন থুত্থুরে বুড়োকে দুজন পাঁজাকোলা করে এনে বসিয়ে দেয়। বুড়ো দলা পাকিয়ে বসে কাশতে থাকে। মুখ চোখ দেখা যায় না।*]

বৈকুণ্ঠ ॥ ওটা কে?

জয়নাল ॥ আমাদের ক্ষেত্তর, তার বুড়া দাদুডা।

[*বুড়ো মুখখানা তোলে। জুলজুল করে তাকায়।*]

বৈকুণ্ঠ ॥ এবেরে মালুম হচ্চে।

[*বুড়ো মুখের কাছে হাতের আঙুল জড়ো করে নাচায়।*]

চরণ॥ জোর ক্ষিদে লেগেছে—মুকি বাক্যি সরে না এখন।

নকুল॥ পিথিমি ডুবে আছে।

চরণ॥ শরীল কাঁপে—আজ চাদ্দিন এট্টা দানা পড়েনি পেটে।

জয়নাল॥ পানিতে দুনিয়া ছয়লাপ হয়ে আছে। হারাউদ্দিশ মানুষ যে যেখানে এট্টু উঁচা পাচ্চে উঠে আচে।

চরণ॥ মাটির ঘর কাদা হয়ে গিছে। সোতে মরা মানুষ গরু ভেসে যাচ্চে।

নকুল॥ য্যাতো ঝড়-ঝাপটা এই বুনা কাটার আগে।

চরণ॥ গোদের উপর বিষফোঁড়া ব্যারেজটাও ভেঙে গিছে— জল ধেয়ে আসছে।

বৈকুণ্ঠ॥ কে কোথায় উঠিছিস্?

জয়নাল॥ ইস্কুল বাড়িতে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা আচে সব।

মানিক॥ বোড-রাস্তায় দাঁইড়ে আচে অগুন্তি মানুষ।

চরণ॥ পাকাবাড়ি যা ছেল কেউ কেউ সেখানে উঠিচে।

জয়নাল॥ গাছে চড়ে আচে কতজন দেখেন গে।

নকুল॥ পেরাণডা যাদেরও বা আচে ক্ষিধার কামড়ে মরে যাবে সব।

জয়নাল॥ কত্তাবাবু, এট্টু খাওয়ার যোগাড় না হলি যে হচ্চে না। মাতা আর তোলা যাচ্চে না।

চরণ॥ লাগে য্যান, ভিড়মি খেয়ে পড়ে যাব।

বৈকুণ্ঠ॥ তা, এখানে খাবার মিলবে বলে এয়েচিস?

মানিক॥ ইখানে না মেলে তো ক্থায় মিলবে?

বৈকুণ্ঠ॥ এখনতো যার আছে আর যার নাই সকলের সুমান অবস্থা। তোদের চেয়ে চাড্ডি পয়সা আমার বেশি আচে। কিন্তু গেরামের মানুষের অন্ন তো সিন্দুকে নাই। পয়সা চিবিয়ে তোরাও বাঁচবি না, আমিও বাঁচব না। ঘরে এসে উঠিচিস্, থেকি যা।

চরণ॥ আমনি হচ্ছেন গরিবের মা বাপ—

বৈকুণ্ঠ॥ এখন বলচিস্—কিন্তু মন বলে অন্য কথা। আমার পাকা বাড়ি—আর তোদের খড়-মাটির ছাউনি। এই ফারাকটা আছে বলে কত বাপান্ত করিস মনে মনে। কিন্তু এই উঁচা বাড়িটা বেপদের দিনে তোদের পেরানডা বাঁচায় না? এই যে এয়েচিস্ দোরে ঝোঁটিয়ে, বিদেয় কচ্চি? ভগমান বেপদ ডেকে আনে কি জন্যি জানিস—তোর আমার চোখ ফোটাবার জন্যি।

[*কালাচাঁদ একটা বস্তা নিয়ে ঢোকে।*]

কালাচাঁদ॥ টিন ঝেড়েঝুরে দেকি দু'চার পালি মুড়ি আচে। দু কচা করে সবাই গালে দিলে কিচুতো হবে।

বৈকুণ্ঠ॥ ওঘর থেকে ওদের দুঃখের কথা সব শুনছিলি বোধ করি।

কালাচাঁদ॥ বান-আকালের দিনে কি আর কিচু শুনতি লাগে জ্যাঠা? ও দুক্যু ভিতর থিকে আপনিই উথলি বেরোয়, (*বুড়োকে*) নাও ধর।

বৈকুণ্ঠ॥ দে, দে, বুড়াডারে এক কৌটো বেশি দে।

কালাচাঁদ॥ দাঁত আচে?

[*বুড়ো দাঁত দেখায়।*]

নকুল॥ ছোটবাবুর আমাদের পেরাণে দয়ামায়া আচে।

বৈকুণ্ঠ।। তা আচে, ওরে, আমি তো চলে যাব। আমার দিনতো শেষ হইয়ে এল। তোদের দেখতি শুনতি এই ছোটকত্তা থাকবে, দয়ার শরীল পেয়ে য্যান উজাড় করে দিস না।

মানিক।। মুড়িতে কামড় দে ক্ষিধাটা য্যান লকলক করে উঠচে।

চরণ।। বাল-বাচ্চা মেয়েমানুষগুলাতো দুকচা মুড়িও পাচ্ছে না।

জয়নাল।। দু কচা মুড়ি খেয়ে কি আর বাঁচন যাবে। হিল্লে এট্টা কত্তি হবে।

নকুল।। ক্ষিদেয় আমার নাড়ি ছেঁড়ার জো হয়েছিল গো।

মানিক।। এবার যে এক ঘটি জল খাব তারওতো উপায় নাই। ভেদবমি শুরু হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ।। যাবে কিরে? পালানের তো শুরু হয়ে গিচে।

চরণ।। আমাদের পালান?

কালাচাঁদ।। ঐ জল গিলেছে—বিবির দয়া হবে না?

বৈকুণ্ঠ।। ঐ তো বারাণ্ডায় শুয়ে আচে।

[*ওরা দু-একজন কাছে যায়*]

নকুল। পালান, পালান রে—

[*পালান গোঙায়।*]

জয়নাল।। ভেলা তো ছেল। কিন্তু চিকিচ্চেব তো কিছু নাই।

মানিক।। পালান, কাঁধে মাথাডা হেলায়ে দে, দেকি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলি যদি কিচু হয়।

কালাচাঁদ।। ডাক্তারের কাছে গিয়ে আর কি হবে। ডাক্তারের একতলা ঘর। এ দুয্যোগে কারুর কিচু ঠিকানা আছে। ডাক্তার দ্যাকোগে পরিবার নে ক্যাটাল গাছে চড়ে আছে। ওষুধপত্তর সব বানের জলে ভেসে গিছে।

[*বারান্দা থেকে পালানের চিৎকার শোনা যায়। 'আমি যাব না। ইখানে মইরব।' ওরা ছুটে যায়।*]

চরণ।। আরও কজনের হয়েচে।

বুড়ো।। জলটা সরে যাক। ঘরে ঘরে মরণ। মড়া ডিঙিয়ে যাবি। বেঁচে থাইকব। লাতির বে দেখে গ্যাজায় টান মেরে লাচতে লাচতে মইরব।

[*গাঁজার কলকে বার করে।*]

জয়নাল।। একন গাঁজা খেলে মরে যাবে।

বুড়ো।। অ্যাদ্দিন মরেচি? আকালে আমারে মাইরবে? ছোটকত্তা আগুন দ্যাও।

নকুল।। তোমার লাতির পুত এসে মুয়ে আগুন দে যাবে বুঝেচ?

[*বুড়ো নকুলকে লাথি মারে।*]

বৈকুণ্ঠ।। ঘাটে এসে বয়স ঠেকেচে তবু গ্যাঁজা চাই!

জয়নাল।। মুড়িডা চিবিয়েচে অমনি গ্যাঁজার নেশা চেগে উঠেচে।

চরণ।। শুনেচি, সকালে গাঁজার দম পেটে ঢুকিয়ে সাঁজের বেলা ধোঁ ছাড়ত।

নকুল।। গ্যাঁজা খেলে দুনিয়া ভুলে যায়। মনে কোন কূটবিক নাই। একটা দম টাইনতে পেলে কাম করে যেত গরু মোষের মত। আর গ্যাঁজা না জুটলে খিটকেল হয়ে যায়।

কালাচাঁদ।। এই আকালেও গ্যাঁজার সরঞ্জাম সব আচে দেকচি।

মানিক।। ও ছাইড়বে না। সব্বক্ষণ ট্যাঁকে গোঁজা। *(আগুন দেয়)* এট্টা কাঠিতে জ্বালাবে। দেশলাই-এর আকাল চইলছে।

[*বুড়ো গাঁজার দম দেয়।*]

বুড়ো।। আকালের ফুটানি। ধোর শালা, বলে আকালে আমারে কি কইরবে রে? আমার কি আচে যে ভেসে যাবে? মাথা গোঁজারডা? ওটুকুর জন্য জেবনপাত কত্তি হবে?...গ্যাঁজা খা—বুঁদ হয়ে যা। খচ্চরের জাত নিপাত হলে ধোঁ ছেড়ে চোখ চাইবি। তার আগে না।

[*দম নিয়ে বুঁদ হয়ে যায় বুড়ো। হঠাৎ ধোঁয়া ছেড়ে জুলজুল করে তাকায়। সোজা তাকিয়ে থাকে বৈকুণ্ঠের দিকে।*]

খচ্চরডারে আমি দেখতিচি।

[*বৈকুণ্ঠ অস্বস্তি বোধ করে।*]

জয়নাল।। এই চাচা চুপ যাও, চুপ যাও। মাথাডা আজকাল বেতাল হয়ে থাকে। আবোল তাবোল বকে।

[*আবার দম নেয় বুড়ো।*]

বৈকুণ্ঠ।। তা তোমরা এখানে থিকে জিরোন কর। আমি অন্দরে যাই।...সামনে বড় পুজো, তার আগে কি কাণ্ডটা হয়ে গেল দ্যাখো। ধানের মড়াই, খড়ের পালুই, ভেড়ি, ক্ষেতখামার কিছুই থাইকল না।

মানিক।। ভুঁইচযা, বীজপোঁতা, কাদা করা, চারা রুয়া—এত গতরখাটা কাম সব জলে ধুয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ।। (*ওঠে*) সবই অদেষ্ট! মনুষ্যের জেবন—এই আচে, এই নাই। চল রে, কালাচাঁদ।

[*হঠাৎ বাইরে থেকে মেয়েলি গলায় একটা আকুল চিৎকার শোনা যায়—"ও নিতে, নিতে রে! কোথায় গেলি রে, নিতে।" সবাই উৎকর্ণ হয়। জানলার কাছে যায়। বৈকুণ্ঠ যেতে যেতে থমকে যায়।*]

জয়নাল।। (*হেঁকে*) অ গগন কি হল রে?

গগন।। (*নেপথ্যে*) ছেলেডার খোঁজ নাই।

নকুল।। ইস্কুল বাড়ি, রোডরাস্তা দেখেছিস্?

গগন।। কুথাও পালাম না।

[*গগনের বউ পাখির চিৎকার ভেসে আসে—'নিতেরে, কুথায় গিলিরে নিতে।'*]

বৈকুণ্ঠ।। এসব শুনলি বুকটা আমার কেমন করে। চলরে, কালাচাঁদ।

[*কালাচাঁদ-সহ প্রস্থান।*]

মানিক।। ওপরে উঠি আয়! ভেলায় দাঁইড়ে বউটা আছাড়িপাছিড়ি কত্তিছে—কি থেকে কি হয়ে যাবে! ওরে এখানে নে আয়। তোর সাথে আমরা খুঁজতি যাব'খন। উঠি আয়। হ্যাঁ আয়—পিছনে যা।

[*মানিক পথ দেখাতে যায়।*]

চরণ।। ছেলেটা সোতের টানে ভেসে যায়নি তো?

জয়নাল।। বলা যায় না। ছুটো ছেলা—সাঁতার কাটার বয়সওতো না।

[ক্লান্ত, আলুঝালু পাখিকে নিয়ে গগন ঢোকে। সঙ্গে মানিক।]

নকুল।। কোতায় ছেল তোর বাচ্চা?

গগন।। মাঠে।

নকুল।। দেখ, হয়ত জল আসতি কেউ তুলে নে গেচে।

গগন।। কে নেবে? কারে শুধোতে বাকি রেকেচি। তারে মা গঙ্গা নেছেরে, মা গঙ্গা নেছে।

[পাখি কেঁদে ওঠে। গগন ধরে বসায়।]

গগন।। এখন আর কাইন্দবারও শক্তি নাই। শোকের ঝাপটা তার সঙ্গে প্যাটের ক্ষিধা—আজ পাঁচ দিন।

চরণ।। ভাল করে বসাও ওরে।

গগন।। পাখি, ও পাখি বস এখানে। দিয়ালটাই পিট দে।

[পাখি প্রায় অবশ। দেয়ালে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে এগিয়ে থাকে। বুড়ো ধোঁয়া ছাড়ে। তাকায়।]

বুড়ো।। ওরে খেতি দে কিচু।

জয়নাল।। কি আচে যে দেব।

মানিক।। তোমার গ্যাজা খাবে?

বুড়ো।। এ ঘরে আছে।

নকুল।। আছে তো তার আছে।

বুড়ো।। কিছু না খেলি মেয়েডা মইরে যাবে।

গগন।। সবাই তো ধুকতে লেগেচে। ইস্কুল বাড়ি গেলাম বাচ্চাডারে খুঁজতি, পালম না। আমারডা নাই। কিন্তু যাদেরগুলান আছে সে গুলানও আর বেশিক্ষণ নাই, নিথর হয়ে যাচ্ছে সব। কাইন্দবার শক্তি নাই। হাত পা নাড়ে না। 'খাব'—এ কথাডা বলার জোরও পাচ্ছে না। যমপুরী হয়ে যাচ্ছে গাঁ-টা। হায়রে মা দুর্গা, তোর পূজার আগে এ কি করলি মা।...তোমরা আমার পাখিরে দেকো—আমি আর একবার বাচ্চাডারে খুঁজে আসি। আর এর মধ্যে বউডা মরলি—জলে ভাসিয়ে দিও।

বুড়ো।। কুথা যাসরে? বাচ্চা যদি কেউ তুলে নিয়ে থাকে তো আচে, না হলি সোতের টানে তোর আমার নাগাল ছাড়ায়ে গিচে। হুতাসে কোন ফল নাই। বউডারে বাঁচা! যেটুকু আচে ধরে রা'

গগন।। যেকানে আচে সেখান থিকে এনে বাঁচা...এঘরে আচে।

[দরজার কাছে মৃতপ্রায় পালান এসে দাঁড়ায়। কোনমতে দরজাটা ধরে দাড়িয়েছে।]

পালান।। আচে, এঘরে আচে, লেপের মধ্যে, তোষক, বালিশ সব কিচুর মধ্যে শুধু চাল আর চাল। ঠাকুরঘরে চালের বস্তার পাহাড় হয়ে আচে, তিনতলায় চলি যা, তেনারা খাচ্ছেন। সরু চাল, সর বাটা ঘি খাচ্চে।

[পালান চলে যায়।]

বুড়ো।। খাচ্চে। চালের পাহাড়ের উপর বসে খাচ্চে। তোরা মরতি মরতি দ্যাখ, মড়া বাচ্চা কোলে নিয়ে দ্যাখ, মড়া বৌ পাশে রেখে দ্যাখ আর আমি গ্যাজার দম দে লাতির লাতির বে'র বাজনা শুনি।

মানিক।। সোজা কত্তার কাছে গে বলি চাল দ্যান। মানুষ মরে!

বুড়ো।। অমনি কত্তা তোরে বস্তার মুখটা খুলে দেবে। কাঁড়ি কাঁড়ি বয়েস হয়েচে —কম দেকিচি।

জয়নাল।। তালি কি বল—লুটে নেব?

বুড়ো।। আমি গ্যাঁজায় দম দিচ্চি। খচ্চরের নিপাত হলি ধোঁ ছাড়ব। চিতার ধোঁ।

[*বৈকুণ্ঠর গলা খাঁকারির আওয়াজ শোনা যায়।*]

মানিক।। আসচে শালো!

[*বৈকুণ্ঠ একটা লণ্ঠন হাতে ঢোকে। পাখিকে দ্যাখে। শোকতাপেও যৌবন সুস্পষ্ট। লণ্ঠন নিয়ে পাখির কাছে যায়। গগনের দিকে তাকায়।*]

বৈকুণ্ঠ।। জ্ঞানগম্যি লোপ পেয়েচে বোধ করি। তাকালি আমার বুক পোড়ে। বাচ্চার খবর তো নাই? (*গগন মাথা নাড়ে*) রান্না ভাত ছিল চাড্ডি। তোদের কথা ভেবে মুখি তুলতি পারলামনা। (*পাখির কাছে যায়, চিবুকটা তুলে ধরে*) শরীল যে লড়বড়ে বাঁশপাতা হয়ে আচে! আহারে, পিত্তিমের মত মুখ, তার কি কপাল দেখো। (*মাথায় হাত বোলায়*) হ্যাঁরে মেয়ে, খাবি? হাঁড়িতে চাড্ডি পড়ে আছে, খাবি? (*পাখি তাকায়*) খাবি? (*'হ্যাঁ' জানায়*) ক্ষিধা কেমন বস্তু দেখলি তো? শোকতাপ জয় করে ক্ষিধা হাঁ মেলে থাকে।

চরণ।। বৌডার যা হালগতিক দেকচি—চাড্ডি পেটে না পড়লে পেরাণে বাঁচবে না।

বৈকুণ্ঠ।। তোরাও তো উপুসি! তোদের চোখের ছামুতি ওর খাওয়াটা ঠিক না। তাই ওরে আমি ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। (*পাখিকে*) আয় আমার সঙ্গে ভিতরে আয়, তুই খাবি। তোরে ভাত খাওয়াতে নে যাচ্ছি। ওঠ, উঠে পড়!

[*পাখি ভাতের কথায় যেন নতুন বল পায়। হাতে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে। বৈকুণ্ঠর বাঁ হাতে লণ্ঠন ডান হাতে পাখিকে ধরে ধীরে এগুতে থাকে। বাইরে থেকে কার গলা ভেসে আসে; 'বৈকুণ্ঠ বাবু।'*]

বৈকুণ্ঠ।। কে?

নেপথ্য।। গলা শুনেও চিনতে পারছেন না মশাই? জানালার ধারে আসুন।

[*পাখি সমেত জানালার কাছাকাছি দাঁড়ায় বৈকুণ্ঠ। লণ্ঠনটা উঁচু করে বাইরে তাকায়*]

বৈকুণ্ঠ।। দারোগাবাবু! নৌকা করে, এ সময়?

দারোগা।। (*নেপথ্য*) আমাদের কি আর সময় আচে? খবর গেল, পুরকাইতবাবুদের গোলা লুট হয়েচে।

বৈকুণ্ঠ।। গোলা লুঠ হয়েচে?

দারোগা।। একবার যেতে হয়। বন্ধু মানুষ, দুর্দিন বলে তো এড়িয়ে গেলে চলবে না। (*বাইরে থেকে টর্চের আলো ফেলে*) কে?

বৈকুণ্ঠ।। এখানে ঠাঁই নিয়েচে, গগনের বৌ—পাখি।

দারোগা।। পাখি? ডানা কাটা? (*দারোগা হাসে*) ফেরৎপথে হয়ে যাব'খন।

বৈকুণ্ঠ।। আসবেন।

[*বৈকুণ্ঠ পাখিকে নিয়ে দরজার বাইরে চলে যায়। এ ঘরে আলোছায়ায় মানুষগুলো বসে।*]

গগন ॥ সুমুন্দির পো'র এত দরদ আমার সুবিধার ঠেকে না।

চরণ ॥ কোথায় নে যায় দ্যাখ।

[*গগন দরজার কাছে লুকিয়ে দাঁড়ায়*]

গগন ॥ বারান্দা দে পাশের ঘরখানে ঢুকল।

জয়নাল ॥ এগিয়ে গে দ্যাখ।

[*গগন পা টিপে টিপে যায়।*]

মানিক ॥ বুড়োর ভীমবতি ধরেনি তো! নজর আমার ভাল মনে হচ্ছিল না।

[*গগন আসে।*]

গগন ॥ পাখির সামনে সত্যি সত্যি ভাতের থালা রেখেছে।

নকুল ॥ খাচ্চে?

গগন ॥ থাবায় থাবায় খাচ্চে। যেন হুতাশে খাচ্চিল। ও মনে হয় জ্ঞানে নাই। (*দরজার কাছে যায় গগন। বাইরে তাকায়*) লণ্ঠনটার পলতে একটু নামিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। ঘরের আলো কমেচে।...আরো কমল! লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়েচে। (*তীব্র গলায়*) কত্তাবাবু!

[*গগন ছুটে অদৃশ্য হয়, পাখির চিৎকার শোনা যায়। মানুষগুলো উঠে দাঁড়ায়। সবাই ছুটে যায়। ঘবে একা বুড়ো দরজার দিকে মুখের ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে থাকে। ওরা ঢোকে। পাখি ফ্যাল-ফ্যাল কবে তাকিয়ে আছে। অস্বাভাবিক তার চোখমুখ।*]

গগন ॥ ভাত খেলি? কেমন ভাত খাওয়াচ্ছিল তোরে, অ্যাঁ?

চরণ ॥ ধমকাও কারে? মাথার ঠিক আছে তার।

গগন ॥ সুমুন্দির পো'রে ধরতি পারলে নলিডা ছিঁড়ে নেতাম। আর এখন দরজা দে তিনতলায় উঠে খিল দিয়েচে। আমি জানতাম শালোর কুমতলব আচে।

জয়নাল ॥ অন্নের টোপ ফেলে শিকাব ধরচ? তোর ঐ অন্ন আজ সব লুটপাট করে নেব।

বুড়ো ॥ পুরকাইতের গোলা লুঠ হয়েচে।

মানিক ॥ এ ঘরে য্যাতো চাল আচে—সব নেব।

নকুল ॥ পাপের ধন লুটে নিলে পাপ-নাই।

জয়নাল ॥ আজ রাইতটা যেতে দাও। দারোগা সাহেব ঘুরে যাবে বলল। ভোর হতে দাও।

চরণ ॥ দিনের আলোয় মাল পাচারেও সুবিধে হবে।

গগন ॥ তবে সুমুন্দিরে আজ পেলে আমি ছাইড়ব না। রাতভর অপেক্ষা করা চলবে না আমার।

বুড়ো ॥ তোর বউ-এর গায়ে হাত দিয়েচে। তুই তারে ছাড়িবি না। আর তার চালে হাত দিলে সে তোরে ছাইড়বে?

জয়নাল ॥ এ চাল তার না।

মানিক ॥ আমবা গতর খেটে তার খামারে তুলেচি।

চরণ ॥ সুদ-দাদনের দায়ে জুলুম করে নিয়ে নিয়েচে।

নকুল ॥ সোজা কম্মটা করলে দোষ কি? সুমুন্দির পো য্যাদ্দিন বাঁচবে খালি মাইরবে। ও শালোরে আজ জলে চুবিয়ে মাইরব।

জয়নাল।। জানে মারে যে তারে মাইরতে পাপ নাই। সারা গেরামখানারে চিবায়ে খাচ্চে। এবার অরে খাব।

গগন।। আমার হাতে অর মরণ! অর নলিডা আমার হাতের মুঠায়! জলে বুড়ায়ে দেব শালোরে!

মানিক।। আজ রাতটা যেতে দাও. কাল দিনের বেলা ব্যবস্থা কইরব।

[ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। পাখি-পাখালির ডাকে মঞ্চে ভোর হয়। মানুষগুলো চুপচাপ বসে।]

বুড়ো।। একটা রাতে সব ঠাণ্ডা মেরে গেলি? রক্তের গরম জুড়ায়ে গেল!

জয়নাল।। থানার দারোগা বসে আছে তার ঘরে। কেমন করে কি কইরব।

বুড়ো।। আজ থানার দারোগা, কাল বাবুর বন্দুক, পরশু ভবিষ্যতের চিন্তা। গগন, নলিডা ধরবার দিনক্ষণ যে আর দেখচিনা রে।

গগন।। একটারে মারলে দশজুনার জেবন যে বরবাদ হয়ে যাবে। তার জোর বেশি।

বুড়ো।। গাঁ-সুদ্ধা মানুষ এক জয়গায় হলিও তার জোর বেশি?

জয়নাল।। গাঁ-সুদ্ধা মানুষ এক জোটেতো নাই।

বুড়ো।। একরাতে সব ঠাণ্ডা মেরে আচিস? রক্তের গরম জুড়ায়ে আচে।

চরণ।। ঠুঁটা মানুষ আমরা। সাধ হয় শোধ নিতি। আগুনডা বুকের মধ্যে লাফায়, খালি লাফায়।

বুড়ো।। তালি আর ইখানে কেন? ইখান থেকে চল। আমারে তোল। চল্, জলে নেমে পড়ি। বানের জলে আগুনডা নেভায়ে বউ বাচ্চাগুলার মড়া শরীল খুঁজতি যাই।

[ওরা যেতে যায়, দরজার কাছে পালান এসে দাঁড়ায়।]

পালান।। যাবার আগে শুনি যাও।

গগন।। কি?

পালান।। বড়কত্তার কাল রাইত থেকে ভেদবমি হচ্চে। আমি এখনও বেঁচে! সেসুমুন্দির পো যায় যায়। করালীব মা বলে গেল। শ্বাস উঠেচে!

জয়নাল।। তাই দেখি ঘর থমথমে। ছোটকত্তা ছুটোছুটি করে। দারোগার নৌকায় বোধকরি ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছিল।

[উপর থেকে কান্না ভেসে আসে।]

পালান।। সুমুন্দির পো শেষ হয়ে গেল!...বড়কত্তা, আমি কিচু কত্তি পারলাম না। কিন্তু আমার ভেদবমির উপর যে মাছিডা বসে ছেল সে তোমার অন্ন ছুঁয়ে মাইরল!

বুড়া।। পাঁচজনে যা পারলিনা এট্টা মাছি সেকম্ম হাঁসিল করে দিল।! মানুষের জোর একটা মাছির চেয়ে কম হয়ে গেল?

পর্দা

ফিনিক্স

চরিত্র : লরেন্স, ফ্রিডা, বার্থা

স্থান : ভেনিস *সময় : বিকালের শেষ*

[*লরেন্স একটি 'সানপর্চে' বসে আছে। দক্ষিণ দেওয়ালের জানালা সূর্যের মুখোমুখি, আর খোলা দরজাটা সমুদ্রেব দিকে। বাতাস বইছে, সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। লরেন্স এদিকে তাকিয়ে। তার পিছনে, বাঁ দিকেব দেওয়ালে লাল, রুপোলি আর সোনা-রঙে বোনা একটা বড় ব্যানারে লরেন্সের প্রিয় সিম্বল ফিনিক্সের ডিজাইন, আগুনের শিখায় ফিনিক্স জ্বলছে।*

লরেন্স বসে আছে—স্থির, নীরব। দাড়ি লালচে, অবিচল মুখটা যেন পোড়া মাটির মধ্যে তীব্র লালের সামান্য ছোঁয়া লাগিয়ে বানানো। একটা চেকার্ড ব্ল্যাঙ্কেট আর ল্যাভেণ্ডার উলের শাল জড়ানো। লবেন্সের যে হাত জীবনটাকে তীব্র মুঠোয় চেপে ধবে যেমন খুশি গড়ন দিয়েছে তা কেমন অবশ ভঙ্গিতে কম্বলেব উপর। স্ফুবিত নাক অতি সযত্নে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন আকস্মিক তীব্র টান লাগলে সিল্কের পলকা সুতোব মত নিঃশ্বাসের সূক্ষ্ম বাতাস হঠাৎ ছিড়ে যাবে। ভিতরেব কোন জ্বালা লবেন্স চেপে বাখছে বোঝা যায়। তাব ভিতবেব বাঘটা খাঁচায় আটকে আছে, কিন্তু এখনও মরেনি।

ফ্রিডা ভিতরে আসে—সবল, ছড়ানো চেহারা, সুন্দর, বয়স পঞ্চাশ। তাকে দেখে অনেকটা 'ভলকিরি'র মত মনে হয়—জার্মান পুরাণের প্রধান দেবতা ওডিনের অনুচবীদেব মধ্যে একজন সেই 'ভলকিরি' যে সেই বীবদের বেছে নেয়, যারা যুদ্ধে নিহত হবে, এবং তাদের আত্মা বহন কবে নিযে যায় আত্মার কোষাগার ভলহল্লা কক্ষে। ফ্রিডার হাতে একটি ছোট প্যাকেট, বেশ সৌখিন।]

লরেন্স॥ (*ঘাড় না ঘুবিযে*) ওটা কি নিয়ে এলে?

ফ্রিডা॥ দরজার সিঁড়িতে এক্ষুণি কে রেখে গেল।

লরেন্স॥ আমার কাছে নিয়ে এস।

ফ্রিডা॥ জানালা দিয়ে দেখলুম, প্যাকেটটা রেখেই কে যেন দ্রুত চলে গেল—চেনাশোনা কেউ নয় বলেই মনে হল।

লরেন্স॥ কোন মহিলা?

ফ্রিডা॥ হ্যাঁ...

লরেন্স॥ হ্যাঁ?

ফ্রিডা॥ তাই মনে হল। মটর-শুঁটি রঙের একটা জ্যাকেট ছিল গায়ে। আমি দরজাটা খুলতে যাব, তার আগেই সিঁড়ির কাছে টুপ করে রেখেই ছুট।

লরেন্স॥ (*গলায় ঝাঁজ বাড়ে, কিছুটা তীক্ষ্ণ*) নিশ্চয়ই আমার জন্য রেখে গেছে, তাই না?

ফ্রিডা॥ (*প্যাকেট লক্ষ করে*) তাই তো মনে হচ্ছে।

লরেন্স॥ মনে হচ্ছে নয়—ঠিক তাই। কিন্তু জিনিশটা সেই থেকে আমার চোখের আড়ালেই বা রাখছ কেন, ফ্রিডা? যা তোমার নয়—সেটা এতোক্ষণে আমাকে দেওয়াটাই তোমার উচিত ছিল। (*ক্রুদ্ধ*) ফ্রিডা, তুমি কি আমাকে রাগিয়ে মজা পেতে চাও? ফ্রিডা!

ফ্রিডা॥ (*প্যাকেটটা লরেন্সের হাত দেয়*) ডাক্তারের কথা তুমি শুনবে না বলে প্রতিজ্ঞা

করেছ বুঝি? সেই তুমি উত্তেজিত হবে, চিৎকার করবে—তুমি কি কারুর কথা শুনবে না? আজ বিকেলটায় মনে হচ্ছিল রোদ্দুরের আঁচে তোমার মনটা ঝকঝকে হয়ে উঠেছে...

লরেন্স।। রোদ্দুর! ঐ বেল্লিক বুড়ো সূর্যটার থলে—ঝাড়া রোদ্দুরের কথা বলছ তো? গোটা বিকেলটায় আমরা দুজন দুজনকে কেবল মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কেটেছি। তাছাড়া কি-ইবা করার ছিল! কতোবার মনে মনে আকাশের উষ্ণ আলোর দিকে তাকিয়ে বলেছি, তুমি কি আমাকে ভাল করে দিতে পার না, শরীরে কি আর একটু জোর পাব না! আমার দু'হাত ধরে জোরে টান মেরে এই চেয়ারটা থেকে তুলে নাও। কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমার ভিতরটা একবিন্দু তাপ, একফোঁটা আলোর জন্য খাঁখাঁ করছে—আর বুড়ো বদমাশ ঐ সূর্যটা যেন কানেই শোনে না অথচ চাকরের মত ওর বাড়িতে আলো ছড়াচ্ছে, তার উঠোনে তাপ বিলোচ্ছে! অথচ জান ফ্রিডা আমি ভিক্ষে চেয়েও পাই না!

ফ্রিডা।। (*সস্নেহ, বিষণ্ণ*) লরেঞ্জো, তুমি ভিক্ষা চেয়েছ? ভিক্ষা নিতে হলে দু'খানা হাত কেমন করে বাড়িয়ে দিতে হয় তুমি তো জানতে না!

লরেন্স।। (*ফ্রিডার দিকে তাকায়। দু'হাতে নিজের মুখটায় যেন কি মোছে। খুব আস্তে বলে*) ফ্রিডা, এই চেয়ারটায় বসলে আমার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে কাশিতে কাঁপতে কাঁপতে, দাঁতে, জিভে রক্ত জড়িয়ে কার একটা অবশ গলা বেরিয়ে আসে। সত্যি ফ্রিডা, ভিক্ষে আমি ভালবাসি না। তুমি তো জান আমি কেড়ে নিতে চাই। শক্ত মুঠো আছাড় দিয়ে ভেঙে ভেতর থেকে লুকনো হিরেটা টান মেরে নিতে চাইতাম। (*ফ্রিডা প্যাকেটটা খুলেছে। ওদিকে তাকিয়ে*) আরে, কি আশ্চর্য, কি মজার খাবার পাঠিয়েছে দ্যাখো—অরেঞ্জ মারমালেড। ফ্রিডা, আমি ঠিক যা সবচেয়ে ভালবাসি! (*ছোট শিশুর মত*) খাব? না বাবা রয়েসয়ে খাব, ফুরিয়ে গেলেই সেরেছে। একটা বয়ামে রেখে দাও। মারমালেড, তার মানে এটা আগস্ট মাস, বুঝতে পারলে? একটুও ভাগ বসাতে পারবে না। যাক্‌গে, অল্প একটু খেও।

ফ্রিডা।। আমার চাই না, ব্রেকফাস্টের সময় কাল খেও। এখন একটুও নয়—এক্ষুণি ওষুধ খেয়েছ।

লরেন্স।। আঃ হাঃ, যতদিন বাঁচব রোজ ব্রেকফাস্টের সময় খাব। দ্যাখো যেন মেপেজুপেই দিয়েছে—আমিও ফুরোব, মারমালেডও শেষ।

ফ্রিডা।। চুপ কর তো! চুপ কর!

[*ফ্রিডা লরেন্সের হাত থেকে প্যাকেটটা নিতে চায়। দ্রুত বেড়ালের মত যেন থাবা মেরে ফ্রিডার হাতটা ধরে ফেলে লরেন্স।*]

লরেন্স।। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

ফ্রিডা।। (*হেসে*) ববাঃ, এখনও বেশ জোর রয়েছে তো তোমার গায়ে। রোদে, ওষুধে ফল ধরেছে দেখছি।

লরেন্স।। শিরায়, কব্জিতে, রক্তে, বুকে এখনও দাপট আছে, ব্যাপারটা তো ইদানীং তুমি ভাবতে চাইতে না।

ফ্রিডা।। আসলে আজকাল তুমি এতো শান্ত, আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কোনও কালে তুমি অন্যরকম ছিলে।

লরেন্স ॥ (*ভিতরে অসহিষ্ণু হতে থাকে*) তোমার ধারণ, সেদিনের বুনো লরেন্সকে তুমি একটু একটু করে বশ করেছ, একটা পোষা, নিরীহ. গৃহপালিত কিছু একটা বানিয়ে তুলেছ?

ফ্রিডা ॥ আমার উপর রেগে গিয়ে নিজেকে নিয়ে অতটা রুক্ষ ঠাট্টা নাই বা করলে। তবে আমার একটা সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। এখানকার লাল সূর্যটা লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি চুমুক দিচ্ছ আর ভিতরটায় সেই টাটকা তেজ আসছে তার সবটুকু জড়ো করে কেবল আমাকে বিদ্রূপ করে যাচ্ছ, তাই না?

লরেন্স ॥ (*মনের রাগ দু'হাতে জামিয়ে ফ্রিডার হাত আরও শক্ত করে ধরে*) বিদ্রূপ? তুমি কতটুকু বোঝ? রক্তের ভিতরের অভিসন্ধি কতটুকু টের পাও? আসলে আমি ধীরে ধীরে একটা ইস্পাতের ঝকঝকে খাঁচা বানাচ্ছি যাতে তোমার ঐ বদরাগী দেমাকে বিগড়ে যাওয়া শরীরটা আবার বন্দী করতে পারি। হাতে চাপ দিয়ে দেখি, কেমন ছাড়িয়ে যেতে পার।

ফ্রিডা ॥ (*কাতরোক্তি করে, ছাড়াবার চেষ্টা করতে কবতে*) উঃ, কি করছ, লাগছে —হাতটা ভেঙে যাবে যে!

লরেন্স ॥ (*আস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে। অবশ গলায়*) ফ্রিডা, দোহাই তোমার, মিথ্যে কথা বোলো না। তোমার একটুও লাগছে না। এরকম ভান করে বোঝাতে চেওনা আমি আবার বাঁচব। (*তীব্র গলায়*) ফ্রিডা, মরে যাবার আগে অনুকম্পা চাই না! (*ফ্রিডার দিকে তাকিয়ে*) আঃ, ফ্রিডা—তোমার শরীর কী সুন্দর! উজ্জ্বল। এতো স্বাস্থ্য। তুমি আরও কতোদিন বাঁচবে। ঈশ্বর তোমাকে কেন এতো দিলেন—আর আমাকে? এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছি! তুমি এখন আমার হাতটা ধরে একটা শুকনো কাঠির মত ভেঙে দিতে পার!

ফ্রিডা ॥ লরেঞ্জো! (*লরেন্স ফিনিক্সেব ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে*)

ফ্রিডা ॥ লরেঞ্জো! আগে কোনদিন তোমার সঙ্গে আমি জিততে পারতুম না। সেসব কথা আমি মনে মনে ভাবি। সে মানুষটা হারিয়ে যায়নি—সে ফিরে আসবে। ফিনিক্স আবার ফিরে আসে।

লরেন্স ॥ (*ছবিটার দিকে তাকিয়ে*) আবার ফিরে আসে। ঠিক আছে, ফ্রিডা, তুমি মারমালেডের জারটা শেলফে রেখে দাও। আমার চোখের সামনে রেখো।

[*প্যাকেটটা ফ্রিডাব হাতে দেয়। ওর গায়ে একটা কার্ড আবিষ্কার করে ফ্রিডা।*]

ফ্রিডা ॥ দেখেছ, এর গায়ে একখানা কার্ডে মেয়েটা কি সব লিখে রেখেছে। (*পড়ে*) 'আপনার অনুরক্ত পাঠকদের একজন।' অন্য পিঠে লিখেছে, "মিঃ লরেন্স, আপনি পূজনীয়, কারণ একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া জীবনটাকে এতোখানি কেউ ধরতে পারেনি। আপনিও ঈশ্বর, মিঃ লরেন্স।"

লরেন্স ॥ (*শুকনো গলায়*) এরা বড় সহজে ঈশ্বরকে খুঁজে পায় ফ্রিডা! বৃষ্টি নামলে একটা গাড়ি-বারান্দা পেয়ে গেলে সেই আশ্রয়টুকুও এদের ঈশ্বর। কি স্মরণীয় অবিশ্বাস! নীলচে জ্যাকেট গায়ে বিকেলের রোদে দুলতে দুলতে একটা মারমালেডের জার ঈশ্বরের বেদীর উপর রেখে লুকোচুরি, এইতো পুজো! ঈশ্বরকে কত সহজে নৈবেদ্য শেষ হল।

অথচ আমি যদি আমার ঈশ্বরকে পেতাম...কখনও পেতাম, আমি সেই ঈশ্বরের সামনে হৃদয়টা ছিঁড়ে এনে তাঁর সামনে দাহ করতাম! কিন্তু কোথায় সেই ঈশ্বর? হয় আমাকে সে ভয় পায় কিংবা আমি তাকে চাইনি। এ-এক যন্ত্রণা! অসহ্য!

ফ্রিডা॥ অথচ ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের মত তুমি যন্ত্রণা ভালবাসতে। যিশুর সঙ্গে তোমার বিরোধ কোথায়? তুমি তো অন্য এক খ্রিস্ট।

লরেন্স॥ (*এবার শান্ত গলায়*) ফ্রিডা, আবার সেই অনুকম্পা! আমার এই দশটা আঙুলের মধ্যে তোমার গলাটা যদি আমি চেপে ধরতে পারতাম তুমি দেখতে একটা জীবনকে ভীষণ পিষ্ট করে আমি কি দারুণ এক খ্রিস্টের মূর্তির মত জেগে উঠতে পারি।

ফ্রিডা॥ (*কাছে হাঁটু মুড়ে বসে, গলা বাড়িয়ে দেয়*) এই নাও ধর, আমার শ্বাসরোধ করে চেপে ধর।

লরেন্স॥ (*আলগোছে আঙুলগুলো গলায়, মাথায় বুলিয়ে*) ফ্রিডা, আমি কি আবার নিউ মেক্সিকো ফিরে যেতে পারব?

ফ্রিডা॥ তুমি যা চাইতে, কোন বাধা তা আটকাতে পারেনি। লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে, না হলে হামাগুলি দিয়ে, নয় দু'হাতে মুচড়ে তুমি জিতে নিতে। তুমি সব পার লরেঞ্জো।

লরেন্স॥ রূপোলি বালি ছড়ানো একটা মরুভূমির উপর দিয়ে একটা তেজী শাদা ঘোড়ায় চেপে বসে দামাল বাতাসের মত আমি কি ছুটে যেতে পারব? আমি কি কেবল লিখব? বইয়েব শুকনো দেয়ালে পদাঘাত করব? কেউ জানে না, কেবল বই লেখার মধ্যে আমার ফুরিয়ে যাওয়া কী ভীষণ একটা বাজে রসিকতা।

ফ্রিডা॥ তোমাব লেখাটা কি জীবন নয়?

লরেন্স॥ একটা ছোট জগৎ—মাপা, সাজান, নির্বাচিত। আসলে জীবনটা একটা বিস্ফোরণ, একটা অতিকায় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল ঘটনা, কিংবা দামাল একটা গতি। কিন্তু আমি কি করেছি? কিছু পাণ্ডুলিপি, বিছানায় গলা জড়ানো অসংখ্য মেয়েলি ফাঁস আর ভাঙা স্বাস্থ্যের চাপা [illegible] পুরনো কথা, পচা নীতি গলে পড়া ধারণা —আমি এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, তাই না? কিন্তু ফ্রিডা, যুদ্ধে জিতে যাওয়ার থেকেও রণক্ষেত্রে যাবার অধিকার হারানো আরও বৃহৎ ক্ষতি। যদি এখন আমি একটা আদিম বুনো মানুষের মত মরুভূমির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, যদি দশ মাইল দূর থেকে মাথায় মুকুট পরা দানবদের মত যে ঝড়টা ছুটে আসছে আমি তাকে বুক পেতে রুখে দাঁড়াতাম! আমি এখনও তা পারি, তোমাদের অবিশ্বাস চুরমার করে তা স্পষ্ট পারি।

ফ্রিডা॥ কে বলছে, তুমি পার না!

লরেন্স॥ (*ক্ষিপ্ত*) তুমি! আবার কে? তুমি। তুমি জান আমার ভিতরে বন্য পুরুষটা ধুঁকছে কিংবা গলা দিয়ে খানিকটা শেষ রক্ত উগরে সে মরে যাবে। মেয়েরা মৃত্যুকে আগে থেকে টের পায়। মৃত্যু পা ফেলে এগুবার আগেই মেয়েরা তার অভিসন্ধি টের পায়। আমি বুঝি ঐ মেয়েরাই মৃত্যুকে দরজা খুলে দেবে। তারা ফিসফিস করে ডাকে, হাতছানি দেয়, অ্যাপ্রনের তলার খিড়কি দিয়ে মৃত্যু মন্থর চলে আসে, তাই না?

ফ্রিডা॥ না, মেয়েরা জীবনটাকে ডাকে, নিজে দাম চুকিয়ে তাকে নিয়ে আসে। তাদের দু'খানা হাত দুটো দুয়ারের মত খুলে জীবনটাকে ডাকে। পুরুষ মৃত্যু ভালবাসে...মেয়েরা নয়। পুরুষ ক্ষত বানায়, মেয়েরা রক্তপাত মুছে দেয়।

লরেন্স।। রক্তপাত মুছে দেয়? কিন্তু কি ভাবে? ঠোঁটে রক্তটা শুষে নিয়ে? রক্ত মুছে দিতে নয়, রক্ত ওদের জিভে বড় মধুর! (*ফ্রিডা ওর গায়ে হাত রাখে*) আমাকে ছোঁবে না। তোমার আঙুলগুলো জিভের মত রক্ত খুঁজছে, আমি বুঝি না, না? আমাকে ছোঁবে না।

ফ্রিডা।। এ তুমি কি বলছ, লরেঞ্জো!

লরেন্স।। প্রচণ্ড সত্য কিছু বলছি।

ফ্রিডা।। তুমি একটু শান্ত হও।

লরেন্স।। কেন? ভিতরটা ছটফট করে নড়লে রক্ত টেনে তুলতে তোমার অসুবিধে, তাই তো? ফ্রিডা, আজ তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ফ্রিডা।। কিসের প্রতিজ্ঞা?

লরেন্স।। যা কোনক্রমে তুমি ভাঙতে পার না, সেই প্রতিজ্ঞা।

ফ্রিডা।। বল।

লরেন্স।। (*কানে*) ফ্রিডা...আমি যদি মরে যাই।...

ফ্রিডা।। লরেঞ্জো!

লরেন্স।। যে মুহূর্তে আমি মরব, আমি সম্পূর্ণ একা থাকব। আমাকে ছোঁবে না, আমার শরীব তোমার আঙুল ছোঁবে না! আর কোন মেয়েকে আমাকে স্পর্শ করতে দেবে না, এই প্রতিজ্ঞা। (*ফ্রিডা ওর মুখের দিকে তাকায়*) আমি মাঝে মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি, ফ্রিডা—আমি যেন মারা যাচ্ছি, আর চারিদিকে অসংখ্য নারী। আমি তাদের ঠেলে সরিয়ে দিতে পারব না জেনেই যেন তারা দরজা, জানালা ভাসিয়ে আমার চারপাশে ঝাঁপিয়ে আসছে। পুড়ে যাওয়া ফিনিক্সের চতুর্দিকে তারা কাঁদবে আর পাখির ডানা ঝাপটিয়ে ভস্ম ওড়াবে। সিনেমার কায়দায় চুমুর উপর চুমু, নানারঙের চোখের জল, কুমারী আর মহিলাদের যৌনভক্তির উদারা-মুদারা-তারায় আক্ষেপ! তাছাড়া তাদের কান্না—কারণ আমি নাকি যৌনতা সম্পর্কে দৈববাণী করতাম! আমি...আমি এসব চাই না! আমি একা, একটা জন্তুর মত মরতে চাই। পাশে কেউ নেই। কেবল আমার ক্রোধ, ভয় আর ভালবাসা —এই তিনজন একটা পরিচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ মৃত্যুর সাক্ষী হবে। এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে রাখতে হবে।

ফ্রিডা।। এ আমি ভাবিনি লরেঞ্জো।

লরেন্স।। তার মানে তুমি অবাধ্য হচ্ছ।

ফ্রিডা।। আমি তা বলিনি।

লরেন্স।। ফ্রিডা, আমি জানি—একটু বাদেই শেষবারের মত গলা দিয়ে রক্ত বেরুবে শেষবারের মত ; আমাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যাবে না। না, কোন মেয়েদের সেবাও নয়। এই ঘরে আমি থাকব না। এই দরজাটা খুলে আমি বেরিয়ে যাব। আমি চাই না কেউ আমার পিছে পিছে আসে। এটাই সব থেকে দরকারি কথা। ফ্রিডা, আমি একা। একাই আমার শেষ কাজটা করতে চাই। কোন হাত নয়, কোন দৃষ্টি নয়, নারী, ওষ্ঠ, হৃদয়—কিছু না! রুক্ষ পাহাড়, চন্দ্রালোক আর গম্ভীর জলস্রোতের নির্দয়তা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তুমি প্রতিজ্ঞা করলে!

ফ্রিডা।। করলাম।

লরেন্স॥ আমি জানি, তুমি কথা রাখতে জান।

ফ্রিডা॥ হয়ত তুমি ঠিকই জান লরেঞ্জো।

লরেন্স॥ হয়ত শব্দটি বর্জন কর।

ফ্রিডা॥ প্রতিজ্ঞা করছি।

লরেন্স॥ ফ্রিডা...আমি বিশ্বাস করলাম।

ফ্রিডা॥ ঠিক আছে, এখন অন্য কিছু বল। একটু চা করছি।

লরেন্স॥ (*হঠাৎ অ্যাকুইরিয়ামটা দেখে*) এ কি?

ফ্রিডা॥ কি হল?

লরেন্স॥ অ্যাকুইরিয়ামের গোল্ড ফিশটা দেখছি না! সেই বেড়ালটা নিশ্চয়ই চিবিয়ে খেয়েছে?

ফ্রিডা॥ বেড়ালটা খেয়েছে তুমি কি করে বুঝলে?

লরেন্স॥ বুঝলাম কি করে? চারটে মাছ ছিল, এখন তিনটে আছে দেখছ না?

ফ্রিডা॥ তাতে কি বোঝাল—বেড়ালটা খেয়েছে?

লরেন্স॥ নির্বোধের মত তর্ক কোরোনা ফ্রিডা। তুমি জান না! তুমি ডালাটা খুলে রাখনি?

ফ্রিডা॥ না।

লরেন্স॥ আমাকে বিরক্ত কোরো না। তুমি ঐ বেড়ালটাকে ভালবাসো না?

ফ্রিডা॥ বেড়ালটা সারাদিন ঘরেই ছিল না।

লরেন্স॥ ও, ফ্রিডা...তুমি এতোদূর নেমেছ। তুমি আমাকে মিথ্যে বলে একটা বেড়ালের পক্ষ নিতেও রাজি—তাই না? কেন? কেন, অবশ্য তা আমি জানি। তুমি উচ্ছন্নে গেছ ফ্রিডা!

ফ্রিডা॥ এরপর থেকে ওটা তোমার চোখের সামনে রেখে দেব।

লরেন্স॥ গোল্ড্ ফিশটা কোথায় গেল?

ফ্রিডা॥ অকারণ উত্তেজিত হ'য়ো না।

লরেন্স॥ আমি জানতে চাই। কিংবা জানি।

ফ্রিডা॥ (*বিরক্ত*) কি জান?

লরেন্স॥ তুমি বেড়ালকে ঐ গোল্ড্ ফিশটা খেতে দিয়েছ? তোমার মত মেয়ের পক্ষেই এটা সম্ভব।

ফ্রিডা॥ তোমার মাথার ঠিক নেই।

লরেন্স॥ কারণ ভীষণ সত্য কথা বলছি। তুমি আর বেড়ালটা দুজনেই লোভী, স্বাস্থ্য ভালবাসো, আরও বাঁচতে চাও। তাই দুজনের মধ্যে গোপন সন্ধি হয়ে আছে। এখনও ক্ষিধে তীব্র। ঐ বেড়ালটার ক্ষিধেটা তুমি বোঝ...তাই ওকে জ্যান্ত মাছটা তুলে খেতে দাও। আমার ক্ষিধে ফুরিয়ে যাচ্ছে, আমি তাই বাতিল। তোমাদের থেকে দলচ্যুত, তাই না?

ফ্রিডা॥ একটা তুচ্ছ মাছ নিয়ে তুমি এতো কথা কোনও কালে বলতে না।

লরেন্স॥ ব্যাপারটা তুচ্ছ মাছ নিয়ে—কিন্তু ষড়যন্ত্রটা পৃথিবী জুড়ে।

ফ্রিডা॥ ও, লরেন্স!

[*চোখ ঢাকে।*]

লরেন্স।। বোধহয় কাঁদছ, কিংবা কাঁদবার চেষ্টা করছ। থাম। কান্না আমি দেখতে পারি না। আমার শরীর খারাপ লাগে।

ফ্রিডা।। (*চোখ তুলে*) লরেন্স, আমার বিশ্বাস, আসলে তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

[*খানিক চুপচাপ। তারপর কেমন সঙ্কোচ নিয়ে ফ্রিডার হাতটা ছোঁয়।*]

লরেন্স।। আমাকে বিশ্বাস কোরোনা...ফ্রিডা, চায়ের মধ্যে একটু রাম মিশিয়ে দিও। মনে হচ্ছে, যেন একটু ভাল লাগছে।

ফ্রিডা।। (*কপালে হাত রেখে*) একটু বিছানায় গিয়ে শোবে?

লরেন্স।। বিছানায় শুলে মনে হয় ফ্রিডা, আমি চাদরের সঙ্গে এঁটে যাব—আর খুলতে পারব না। কি দেখলে, জ্বর হয়েছে?

[*ফ্রিডা ভালবেসে ওর দু'চোখে হাত বোলায়। চোখ বুজে লরেন্স ছড়া কাটে।*]

লরেন্স।। "Ladybug, Ladybug, fly away home ; thine house is on fire, the children will burn!" মা যখন কোন ভাল মানুষ দেখতেন এটা গাইতেন। আজকাল সব মানুষ এতো জটিল, তোমার মত এতো সরল নয়।

ফ্রিডা।। (*উঠে ফিনিক্সের ছবিটার কাছে গিয়ে*) আগুনের মধ্যে এই রাগী অথচ সাহসী পাখিটা আসলে একটা ছোট্ট ভাবপ্রবণ শিশু তাইনা লরেন্স?

[*লরেন্স বাইরে তাকিয়ে।*]

লরেন্স।। তিন কাপ চা।

ফ্রিডা।। কেউ আসছেন?

লরেন্স।। বার্থা! আমার ছবির একজিবিশনের খবর নিয়ে লণ্ডন থেকে ফিরছে।

[*লরেন্স চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে কষ্ট করে এগোয়*]

ফ্রিডা।। কোথায় যাচ্ছ?

লরেন্স।। একজিবিশনের প্রথম খবরটা আনছে, নিশ্চয়ই দৌড়ে গিয়ে ওকে টেনে আনা উচিত।

ফ্রিডা।। বোস। আমি যাচ্ছি। আর শোন, এ বাড়িতে ওকে থাকতে বলবে না, তা হলে কিন্তু আমি থাকব না।

লরেন্স।। (*মুখে ক্লাক্ ক্লাক্ শব্দ করে*) ভাবছ মোরগটার পাশে আরও মুরগি এনে জড় করব?

[*ফ্রিডা চলে যায়। লরেন্স চেয়ার ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করে। কম্বলটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর জোর করে দু'পায়ের উপর দাঁড়ায়। প্রায় টলতে টলতে, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে কিচেনের দিকে চলে যায়। কাশতে থাকে। পর্দার আড়ালে কাশিটা অবসন্নভাবে থামে। ফ্রিডা বার্থাকে নিয়ে ঢোকে। বার্থা বালকের মত তাড়াতাড়ি কথা বলে, চাহনিও শিশুর মত।*]

ফ্রিডা।। একি, ও কোথায় গেল?

বার্থা।। চেয়ার ছেড়ে ওঠা তো ওর ঠিক নয়।

ফ্রিডা।। আর একবার রক্ত উঠলে আর ওকে বাঁচানো যাবে না। একটু পরিশ্রমেই ও শেষ হয়ে যেতে পারে। দেখেছ কাণ্ড। এক মিনিট বাইরে গেলুন, অমনি...লরেঞ্জো! লরেঞ্জো!

লরেন্স।। (*বাইরে থেকে*) মুরগিগুলো বড্ড ডাকছে! চা নিয়ে আসছি।

বার্থা।। তুমি যাও। সত্যি সত্যি ও নিজে চা করছে নাকি? তুমি যাও।

ফ্রিডা।। এখন গেলে নতুন রকম একটা অনর্থ বাধাবে। কোন লাভ নেই গিয়ে।

বার্থা।। ও কি মরবে নাকি? এই শরীরে—

ফ্রিডা।। ও মরবে না। ওর লাঙ্‌সটা নেই, অথচ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হার্টটা জুড়িয়ে গেছে তবু দপ্‌দপ্ করছে। এ একটা অদ্ভুত যুদ্ধ বার্থা। আর এই যুদ্ধটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। এক এক সময় মনে হয় সব শেষ হয়ে গেলেই ভাল!

বার্থা।। ফ্রিডা!

ফ্রিডা।। ওর শরীরটা দেখলে আমার মনে হয় কাগজে তৈরী, একপাশে আগুন লেগে গোটাটা দাউদাউ করে ধরে যাচ্ছে। মরে যাবার অনেক আগে থেকেই যদি মানুষের বাঁচার ইচ্ছেটা মরে যেত! তাহলে শান্তভাবে রক্ত মাংসের শরীরটা মোমের মত গলে যেতে পারত। আগুনের সঙ্গে কাগজের এই মর্মান্তিক যুদ্ধ, ভাগ্যিস তোমাকে দেখতে হচ্ছে না বার্থা। আর এই যুদ্ধের ফলাফলটা আগে থেকেই জানা।

বার্থা।। লরেন্স মরতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না।

ফ্রিডা।। শরীর ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ওর শরীর শেষ হয়ে আসছে।

বার্থা।। ফিনিক্স মরে না। ওর দেহটা সব কথা নয়। পুড়ে গেলেও থাকে।

ফ্রিডা।। ফিনিক্স উপকথা। লরেন্স মানুষ, রক্ত মাংসের নিয়মের মানুষ।

বার্থা।। লরেন্স মানুষের থেকে অনেক বেশি।

ফ্রিডা।। শরীর ব্যাপারটা তুমি জান না। যে যত বড়ই হোক তার একটা অসহায় শরীর থাকে।

বার্থা।। লরেন্স ঈশ্বর।

ফ্রিডা।। আমি তার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি বলেই জানি, লরেন্স ঈশ্বর নয়।

বার্থা।। আদিম ইচ্ছার বাইরেও অনেক কিছু থাকে।

ফ্রিডা।। আদিম জ্ঞানই আগে আসে।

বার্থা।। আমি তোমার কথা মানি না।

ফ্রিডা।। কিন্তু লরেন্স মানে। লরেন্স জানে। শরীর বাদ দিয়ে মেয়েদের লরেন্স বুঝত পারে না। নারীর আত্মা শরীর ছাড়া বাঁচে না।

বার্থা।। ফ্রিডা, তুমি লরেন্সকে শরীর দিয়ে যদি একটু কম বাঁধতে।

ফ্রিডা।। তোমার থাবাটা লরেন্সের উপর রাখলে তুমি কি করতে?

বার্থা।। আমার হাতকে অন্তত থাবা বলতাম না।

ফ্রিডা।। লরেন্সের শরীর থেকে অশরীরী লরেন্সকে তুলে নিতে একটা থাবা তো চাই। তারপর সেই নিরাকার লরেন্সকে কোথায় রাখতে? বাতাসে? ক্যাণ্ডেলের শিখাটা তুলে

নিয়ে একদিন তুমি লরেন্সকে উপহার দেবার চেষ্টা কোরো। যাকগে, আমরা দেখা হলেই তর্ক করি। আজ থাক।

বার্থা ॥ ফ্রিডা!

ফ্রিডা ॥ তুমি লরেন্সকে বোঝনি, বার্থা। লরেন্সকে নিয়ে আমাদের ভাগ ভাগ করে নেওয়া—কি দরকার। ও গোটা লরেন্স থাক। ও যা, তাই থাক।

বার্থা ॥ লরেন্সকে ভাগ করা যায় না, আমি তা জানি।

ফ্রিডা ॥ চুপ, আসছে।

বার্থা ॥ (*পর্দাটার দিকে একটু এগিয়ে*) লরেঞ্জো!

লরেন্স ॥ (*পর্দার আড়লে*) Pussy cat, Pussy cat, where have you been?

বার্থা ॥ (*মজা করে*) I have been to London to look at the Queen.

লরেন্স ॥ (*একটু এগিয়ে আড়ালে*) Pussy cat, Pussy cat, what did you there?

বার্থা ॥ I chased a little mouse under a chair.

[*হাসতে হাসতে লরেন্স ঢোকে। তিন কাপ চা ট্রে-তে। বার্থা আর ফ্রিডা সভয়ে তাকায়*]

বার্থা ॥ লরেঞ্জো, তোমাকে দেখলে মনে হচ্ছে, তোমার একটুও অসুখ নেই। মুখটা রক্তে লাল।

লরেন্স ॥ জ্বরের লাল, গলার কাছে যে রক্ত তার ছায়ায় লাল। আমি পুড়ে যাচ্ছি বার্থা, কিন্তু পুড়ে পুড়ে ফুরোচ্ছি না। (*হাসে*) ডাক্তাররা অবাক—হতাশও বলতে পার। ফ্রিডাকে দ্যাখো, বিধবা হব-হব করেও হতে পাচ্ছে না। একেবারে আশাটাই ছেড়ে দিয়েছে বোধ হয়। (*বার্থা ওকে সাহায্য করতে যায়*) ঠিক আছে, পারব।

ফ্রিডা ॥ ওকে তুমি চুপচাপ রাখতে পারবে না, বিশ্রাম নেওয়াতে পারবে না। অবাধ্যতা বাড়ছে। যাকে বেয়াদব বলে আর কি!

লরেন্স ॥ বিশ্রামে আমার উপকার হয় নি, ব্রেট। অনেক তো দেখলাম।

বার্থা ॥ আর একটু তোমাকে দেখতে হবে। আর একটু বিশ্রাম নাও, তারপর তিনজনে মিলে নিউ মেক্সিকো পাড়ি দেব।

লরেন্স ॥ তিনজনে মিলে পাল তুলে ছুট। তিনজনে তো—তুমি, ফ্রিডা আর জিভ দিয়ে আগুন চাটতে চাটতে এই বুড়োটা।

বার্থা ॥ (*লরেন্সের দাড়িটা নেড়ে*) আগুন-খেকো এই খোকাটা!

লরেন্স ॥ না, দাড়িটা একটু আঁচড়ে নিতে হবে।

[*ছোট্ট আয়না আর চিরুনি নেয়।*]

ফ্রিডা ॥ ও দাড়ি না আঁচড়ালেই ভাল।

লরেন্স ॥ (*আঁচড়াতে আঁচড়াতে*) আসলে ফ্রিডা আমার দাড়িটাকে হিংসে করে। সব, সব মেয়েরাই দাড়িতে চটে যায়। বুঝলে ব্রেট, মেয়েদের থেকে ছেলেদের যা কিছু আলাদা করে দেয় তার সবার উপরেই মেয়েদের জন্মগত বিরাগ।

ফ্রিডা ॥ যা বলছ ঠিক তার উল্টো। (*চা ঢালে*) উল্টোটাই টানে।

লরেন্স ॥ কেমন করে টানে জান? মেয়েরা পুরুষদের শরীরের ভেতর টেনে নিয়ে বাঁধে। যাতে আর কোনদিন না বেরুতে পারে। ভাবে, এতেই পুরুষদের ভাল হয়।

ফ্রিডা॥ একজন কুমারী মেয়েকে এসব কেন শোনাচ্ছ লরেঞ্জো?

লরেন্স॥ যাক্‌গে, এতোক্ষণ কিন্তু কিচ্ছু বলনি, ব্রেট।

বার্থা॥ কি বলিনি?

লরেন্স॥ বলেছ? তোমাকে লণ্ডনে পাঠালুম কেন?

বার্থা॥ যাতে তোমার কাছে থেকে জ্বালাতন না করি।

লরেন্স॥ সে তো একটা কারণ। (*সবাই হাসে*) আরে, আমার ছবির কি হল? সকলের কেমন লাগল? একটা খবর এতোক্ষণ চেপে রাখা, ক্ষমতা আছে তোমার ব্রেট! সাবাস!

বার্থা॥ মানে...

ফ্রিডা॥ যা বলবার বলে দাও। না শোনা অবধি তোমার নিস্তার নেই। যা সত্যি তা-ই বল।

বার্থা॥ আমি অন্যরকম বলি না।

লরেন্স॥ (*পিঠে মিষ্টি চড় মেরে*) ব্রেট! ব্রেট! ব্রেট! রাগতে নেই ব্রেট! তুমি যে রেগে গেলে একজিবিশনের খবরটা এক্ষুনি আর কেউ দেবার নেই।

বার্থা॥ একজিবিশনটা...সে একটা তুমুল কাণ্ড হয়েছে বলতে পার। আমি তো আগেই বলেছিলাম।

লরেন্স॥ মানে, সকলের দারুণ পছন্দ হয়েছে বলছ?

ফ্রিডা॥ পছন্দ হয়েছে! তোমার ছবিগুলোকে ওরা বিদ্‌ঘুটে, বিরক্তিকর বলে চেঁচিয়েছে!

লরেন্স॥ একেই কি সফলতা বলে? ওরা বলেছে, আমি আঁকতে জানি না, বাচ্চাদের মত দাগ টানি, রঙ ছড়াই ; আমার ছবি বিদঘুটে, অশ্লীল, দানবীয়, বিকৃত, দুর্বোধ্য, তাই তো?

বার্থা॥ তুমি নিশ্চয়ই রিভিউ পড়েছ? ঠিক একথা লিখেছে।

লরেন্স॥ রিভিউ আমি পড়িনি ব্রেট। কিন্তু যারা লেখে তাদের আমি জানি। এ কথাগুলো আমার ছবি আঁকার আগেই লেখা ছিল। সময়মত ওরা এনে বসিয়ে দিয়েছে। সমালোচকদের কথা ছেড়ে দাও, আর সব দর্শকরা কি বলেছে?

বার্থা॥ মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হেসেছে।

লরেন্স॥ হেসেছে?

ফ্রিডা॥ হাসবে না। তাদের কাছে তুমি যে লেখক, চিত্রশিল্পী নও। তাই তুমি একটা সোজা দাগও কাটতে পারনা। এতো সোজা কথা।

লরেন্স॥ হ্যাঁ, সোজা লাইন আঁকতে আমি পারি না—কিন্তু বাঁকা রেখা তো পারি, ফ্রিডা। আর এটা পারতুম বলেই বাঁকাচোরা জীবনটা ছবিতে ফোটাতে চেয়েছিলাম। ব্রেট, কিরকম লোক হয়েছিল? অনেকে দেখতে এসেছিল?

বার্থা॥ গণ্ডগোলটা হবার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দরজা বন্ধ করে দেবার পর কাণ্ডটা কি জানতে বেশ ভিড় হয়েছিল।

লরেন্স॥ গণ্ডগোল! কিসের বল তো?

বার্থা॥ লেডিজ ক্লাবের একদল সদস্য আদম আর ইভের ছবিটা নষ্ট করতে চেয়েছিল।

[*লরেন্স উম্মাদের মত হাসতে শুরু করে, শরীর কাঁপতে থাকে।*]

ফ্রিডা।। লরেঞ্জো, থাম! থাম বলছি!

[*আস্তে আস্তে থামে।*]

বার্থা।। ফলে পুলিশ এল।

লরেন্স।। পুলিশ!

[*লরেন্স সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গলা তীব্র হয়।*]

লরেন্স।। পুলিশ! ওরা আমার ছবি নিয়ে কি করল? জ্বালিয়ে দিয়েছে? নষ্ট করেছে?

বার্থা।। আমরা একটা ইনজাংশন পেয়ে গেলাম। ফলে ওরা ছবিগুলো পুড়িয়ে দিতে পারেনি।

লরেন্স।। তাহলে ছবিগুলোর ক্ষতি হয়নি?

বার্থা।। ছবিগুলো সব ঠিক আছে লরেঞ্জো।

ফ্রিডা।। এবার চেয়ারটায় বোস। নাহলে তোমাকে কিন্তু জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেব।

[*ফ্রিডা ওকে চেয়ারে বসাবার চেষ্টা করে।*
লরেন্স হঠাৎ জোরে চড় মারে।]

বার্থা।। লরেঞ্জো!

লরেন্স।। গায়ের জোর আছে তোমার, তাইনা? শক্তির বড়াই! আমাকে দুর্বল পেয়েছ, তাইনা! এই তো তোমার সুযোগ। গায়ের জোরের সুযোগ। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে? চেষ্টা করে দ্যাখো।—সাবধান, আমার শরীর স্পর্শ করবে না।

ফ্রিডা।। লরেন্স!

লরেন্স।। চুপ কর।

ফ্রিডা।। লরেন্স; চেয়ারটায় বোস। নাহলে আবার রক্ত পড়তে শুরু করবে।

[*লরেন্স খানিক ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।*
তারপর বাধ্যের মত বসে।]

লরেন্স।। (*খুব দুর্বল*) শালটা দাও। সূর্যটা বোধহয় এবার ডুবে যাবে। হ্যাঁ, বার্থা ছবিগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল, তাই না। (*শান্ত*) ওগুলো খুব দামী ছবি নয়—কিন্তু ওর মধ্যে জীবনের আলোড়ন ছিল, সেটা তো মিথ্যে নয়!

বার্থা।। ওরা তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই কবল। হয়ত তুমি ছবি না আঁকলেই ভাল ছিল।

লরেন্স।। কেন আঁকলুম? লিখে সব বলা যায় না, অক্ষর সবকিছু নয়। রঙ, রঙ দিয়ে অনেক কথা বলা যায়। আমি যেমন করে যা লিখতাম, রঙ দিয়ে তাই করতে চেয়েছি। কোন লজ্জা করিনি। প্রকাশ করতে সাহস চাই। এ এক রকমের আঘাত। ব্রেট, কেবল ভালবেসে এ আঘাত সম্ভব নয়। দু'হাতে ঘৃণা এনে দ্বিগুণ শক্তিতে আঘাত করাও একধরনের আত্মপ্রকাশ। যেমন করে ফ্রিডাকে না ভালবেসে একেক সময় আমি ঘৃণা করি। এ এক নির্লজ্জ উদ্ধার।

বার্থা।। ওরা তোমার ছবি বুঝল না, তাতে নিশ্চয়ই তুমি দুঃখ পাবে না!

ফ্রিডা।। লরেঞ্জো, তুমি বড় বেশি কথা বলছ।

লরেন্স।। ওরা আমার বই নিষিদ্ধ করেছে, ছবি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে। এটাই

হয়...প্রখর সূর্যের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়—কিছু দেখা যায় না। (*জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়*) সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সূর্যটা অবশ হচ্ছে। অন্ধকার বেশ্যার মত সূর্যটাকে লোভ দেখিয়ে আঁচলে ঢাকছে।

ফ্রিডা॥ সূর্যোস্তের দিকে তাকিয়ে ও যা বলে, তুমি শুননা বার্থা।

লরেন্স॥ অন্ধকার স্বৈরিণী। সূর্যের সমস্ত শরীরটা গ্রাস করছে। এবার সঙ্গম। সূর্য ভীষণ অবসন্ন। ব্যভিচার ওর সব শক্তি শুষে নিচ্ছে, একটু একটু করে ধ্বংস করবে। সূর্যটা গিলে ফেলছে। আঃ, ওকে হারাতে পারবে না। গণিকার পেটের উপর থেকে ও নেমে আসবে আর তক্ষুণি চার দিকে আলো আর আলো। সব কিছুর শেষে সব সময় আলো।

[*অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ায়!*]

বার্থা। লরেঞ্জো!

ফ্রিডা॥ উঠনা।

লরেন্স॥ চুপ! আমাকে স্পর্শ করবে না। (*কোনমতে বড় জানালাটার কাছে যায়*) সবশেষে আলো...আর আলো। (*কণ্ঠস্বর তীব্র হয়, দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি বাইবেলের প্রফেটের মত*) মহান আলো! দৃষ্টি উদ্ভাসিত করার মত আলো। ফুরোয় না এ সব আলো। আর আমি... তার ভবিষ্যৎ বক্তা!

[*লরেন্স টলতে থাকে। নিজের মুখ চেপে রক্ত আটকায়*]

ফ্রিডা॥ লরেন্স!

বার্থা॥ (ভীত) ফ্রিডা!

ফ্রিডা॥ ওর দু'হাতের মধ্যে রক্ত।

বার্থা॥ লরেঞ্জো!

[*বার্থা ওর দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ফ্রিডা তাকায়*]

লরেন্স॥ আমাকে তোমরা, তোমরা মেয়েরা কেউ স্পর্শ কোরো না। আমি একা মরতে চাই...যতক্ষণ না শেষ হয়ে যাই, কেউ নড়বে না!

[*ভীষণ মাধ্যাকর্ষণ যেন শক্ত হাতে তাকে একটু একটু করে মাটিতে ফেলে দিতে চায়। লরেন্স প্রাণপণে দেওয়ালটা ধরে পতন রোধ করে। কষ্ট করে যেন প্রবল যুদ্ধ জেতার চেষ্টায় দেয়াল আঁকড়ে আঁকড়ে দরজার কাছে যায়। দরজা খুলে ফেলে। ফ্রিডা, বার্থা অনড়*]

লরেন্স॥ তোমরা কেউ আমার পিছনে আসবে না।

[*লরেন্স চলে যায়*]

বার্থা॥ (*ফ্রিডার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে*) আমাকে ছাড়, আমি ওকে একা যেতে দেব না।

ফ্রিডা॥ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। কোন মেয়ে ওর কাছে থাকবে না।

বার্থা॥ অন্তত তুমি যাও।

ফ্রিডা॥ কেউ না! আমি না, তুমি না।

বার্থা ॥ ও কেন একা মরবে! না, তা হতে পারে না, ফ্রিডা—তা হয় না! এতোটুকু মায়া যার আছে, সে ওকে এভাবে যেতে দেবে না!

ফ্রিডা ॥ আমি দেব, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

[*একটা হাওয়া ওঠে। ফিনিক্সের ছবিটা নড়তে থাকে। বার্থা প্রায় ছুটে যায়। ফ্রিডা ওকে আটকে রাখে। কারুর ধাক্কায় ল্যাম্পটা পড়ে নিভে যায়। বার্থা চেঁচিয়ে ওঠে, মেঝেয় বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিছুকাল চুপচাপ। তারপর খুব মৃদু, যেন দূর থেকে লরেন্সের গলা ভেসে আসে— "ফ্রিডা!" মুহূর্তের মধ্যে ফ্রিডা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দ্রুত বাইরে চলে যায়*]

ফ্রিডা ॥ (*বাইরে থেকে শোনা যায়*) লরেঞ্জো!

যবনিকা

টেনেসি উইলিয়াম্‌স্‌-এর 'আই রাইজ্‌ ইন্‌ ফ্লেম ক্রায়েড় দ্য ফিনিক্স'-এর রূপান্তর।

সোনার চাবি

চরিত্র : নন্দিতা, গৌতম, সোমেন্দু, নন্দ

[*একটা বন্দুকের শব্দে পর্দা উঠল। ঘর প্রায় অন্ধকার, কেউ নেই। বাইরে কড়া নড়ে উঠল। দ্রুত, তীব্র।*]

নন্দিতা।। (*দরজার বাইরে থেকে দ্রুত কড়া নাড়ে*) গৌতমবাবু, গৌতমবাবু! দরজাটা খুলুন। নন্দ, আছ?

[*একজন বৃদ্ধ চাকর পুরনো আমলের চিমনির লণ্ঠন হাতে দরজা খুলে দিল। নন্দিতা রুমালে মুখটা মুছল। জানালা দিয়ে উদ্বিগ্ন তাকিয়ে কিছু খুঁজল। হঠাৎ আবার বন্দুকের শব্দ হতে নন্দিতা একটু চমকে উঠে নন্দ'র দিকে বিস্মিত তাকায়।*]

নন্দিতা।। গুলির শব্দ কেন, নন্দ?

[*নন্দ কোন কথা না বলে আলোটা টেবিলে সন্তর্পণে রেখে শিখাটা বাড়ায়।*]

গৌতমবাবু বন্দুক নিয়ে বাগানে বুঝি?

নন্দ।। তাছাড়া আবার কে? ছোটবাবুর মাথাটা গেছে, দিদিমণি। এই জঙ্গলে দুষ্ট আত্মা ঘুরে বেড়ায়, ওর হাওয়া লেগেছে ছোটবাবুর গায়ে।

নন্দিতা।। বাগানে বন্দুক নিয়ে কি করছেন?

নন্দ।। কি আর করবে। আকাশ তাক করে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে, গুচ্ছের ছাইপাঁশ গিলেছে তো! বুঝলে দিদিমণি, মানুষটা এই ভূতুড়ে বাড়ির ভিটেয় একদিন মরে পড়ে থাকবে, নিজের বাড়ি ঘরে আর ফেরা হবে না। কারুর কথা কি শোনে। তুমি এসেছ, বলিগে।

[*নন্দ চলে যাচ্ছিল*]

নন্দিতা।। নন্দ, শোন—এক্ষুণি ডাকতে হবে না ওকে। আমি একা এখানে একটু বসছি। (*নন্দ চলে যেতে থাকে*) নন্দ, জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখত একজন প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক উঠোনের গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কি না?

নন্দ।। (*জানালা দিয়ে তাকিয়ে*) হ্যাঁ, কাঁধে একটা ফটো তোলার বাক্স। এদিকে তাকিয়ে আছে আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।

নন্দিতা।। আচ্ছা, তুমি যাও নন্দ।

নন্দ।। দিদিমণি, লোকটা কে গো?

নন্দিতা।। চিনি না। কয়েকদিন ধরে এখানকার জঙ্গলে ঘুরতে দেখছি। কতোরকম লোক আসে এখানে। ঠিক আছে, তুমি যাও নন্দ।

[*নন্দ চলে গেলে নন্দিতা সন্তর্পণে জানালা দিয়ে আবার তাকাল। ভিতরের দরজা দিয়ে গৌতম ঢুকল। হাতে বন্দুক। মুখে দাড়ি, প্যান্ট-শার্ট মলিন। নন্দিতাকে দেখেনি এখনো। বন্দুকটা টেবিলে রাখল। পকেট থেকে একটা মদের*

বোতল বের করে, শব্দ করে টেবিলে গড়িয়ে দেয়। শব্দ শুনে নন্দিতা ফিরে তাকায়। মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হয়।]

গৌতম॥ (*আপন মনে*) "I would, if I could—
If I could not, how could I ?"

নন্দিতা॥ (*তীক্ষ্ণ গলায়*) গৌতমবাবু!—

গৌতম॥ (*দ্রুত ফিরে তাকায়। টেবিলটা পিঠ দিয়ে যথাসম্ভব আড়াল করে*) নন্দিতা দেবী, আপনি!

নন্দিতা॥ নেশার ঘোরেও চিনতে পারছেন দেখছি!

গৌতম॥ নেশা মরে এতক্ষণে ভূত, আর ভূত মরে...

নন্দিতা॥ আপনি নন্দকে একবার ডাকুন, ওকে সঙ্গে নিয়ে হস্টেলে ফিরে যাব।

গৌতম॥ এই তো এলেন, এক্ষুণি চলে যাবেন? নন্দকে বলছি, চা করবে একটু।

নন্দিতা॥ চা খেয়েই বেরিয়েছি।

গৌতম॥ আপনার গলা শুনে কিন্তু যে কেউ মনে করবে, আপনি চটেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি আসবেন জানলে আমি এসব ছুঁতাম না। জানেন নন্দিতা দেবী, একটা জ্বলজ্বলে চমৎকার তারা বন্দুক ছুড়ে মাটিতে নামাতে চাইছিলাম। কেন জানেন? আপনি যখন কাল ভোরবেলা আসতেন ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করতাম। আপনি টিকলি করে সিঁথির ওপর পরতেন, আগেকার কালে মায়েরা পরত। আপনাকে দারুণ দেখাত, আপনি দেখতে এত ভাল—আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাসন্তী পুজো হতো, সেই চৈত্র মাসের বাসন্তীর মতো।

নন্দিতা॥ গ্রাম ভাল লাগে আপনার, দেশের গ্রাম?

গৌতম॥ ভীষণ ভাল লাগে, আপনাকে যেমন লাগে সেরকম।

নন্দিতা॥ তাহলে তো কতটা ভাল লাগে বেশ বুঝতে পারছি। এখানে এরকম পাগলামো না করে দেশ থেকে ঘুরে আসুন। মাথায় যে পোকাগুলো ঢুকেছে মায়ের ধমক খেয়ে সব পালাবে।

গৌতম॥ আমার মা খুব ভাল।

নন্দিতা॥ বাড়ি গিয়ে মাকে একবার দেখে আসুন, মনটা অনেক ভালো হয়ে যাবে।

গৌতম॥ কিন্তু এখন আমি কি করে যাব, সম্ভব নয়। এই বাড়িটা ডাইনির মন্ত্রপড়া জালের মতো আমাকে জড়িয়ে আছে। এর প্রত্যেকটা ইঁট, কাঠ আমাকে একা পেলেই ফিসফিস্ করে বলে, 'গৌতম, গৌতম—সোনার চাবিটা আছে তো?' সেই বুড়ো জঙ্গল-সর্দারের আত্মা মহুয়ার রসে টলতে টলতে এসে বলে, 'সোনার চাবিটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলিস না, বেনারজিবাবু! আছে, আছে!'...কিন্তু কি আছে? কোথায় আছে? আমি কি করে জানব? চাবিটা প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাকে মারছে! ঐ চাবিটা আপনি নেবেন? আমি বেঁচে যাই! আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে দিতে চাই না, নেবেন?

নন্দিতা॥ নিজের বিপদটা বেশ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন, কেমন? চাবিটাকে একেবারে ভুলে যেতে পারেন না? এই পোড়ো বাড়িটার মেঝে, দেয়াল সব তো খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষেত বানিয়ে তুলেছেন! কোথায় আর হিরে জহরতের বাক্স লুকনো থাকবে? আর থাকলেই বা, কী হবে ও-সবে?

গৌতম॥ সম্পদে আমার তেমন লোভ নেই, নন্দিতা দেবী। কিন্তু রহস্য, একটা অজানা বাক্স, তার ভিতরে কি আছে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। একটা চাবি, কেবল একটা চাবি নিয়ে অপেক্ষা করা যে কী ভয়ংকর! আমি কিছু একটা খুলতে চাই, বিস্ময়ে অবাক হতে চাই, একটা অদ্ভুত ঐশ্বর্য দু-হাতে মুঠো করে এক মুহূর্ত অন্তত সম্রাটের মত উল্লাসে চিৎকার করে উঠতে চাই। না-হলে ঐ চাবিটা সারাজীবন আমাকে জ্বালাবে যে।

নন্দিতা॥ অ্যাদ্দিনে তো কিছুই পেলেন না, খোঁজের তো বাকি রাখেননি কিছু। চাবিটা আসলে জঙ্গল-সর্দারের মনগড়া কল্পনা, এরকমও তো হতে পারে।

গৌতম॥ মরবার সময়, বুড়ো সর্দার এই ঘরে বসে কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে চাবিটা আমাকে দিল ; বলল, 'আছে, আছে—একটা নক্সা করা বাক্স।' জিজ্ঞেস করলুম, 'ভিতরে কি?' কিছু না বলে হাসল। আবার বলল, 'আছে।' সবাই বুড়োকে পাগল বলত, কিন্তু আমি ওর চোখ দেখেছি, গলার স্বর শুনেছি, বুকের ভিতরের স্পন্দন শুনেছি—ও মিথ্যা বলেনি, মিথ্যা ও জানে না।

[*নন্দিতা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।*]

গৌতম॥ কি দেখছেন? গরম লাগছে বুঝি? দেখুন নন্দ'র কাণ্ড, দরজা বন্ধ করে রেখেছে। হাওয়া তো আর চোর নয় যে ঢুকলেই ভয়।

[*দরজা খুলতে গেল।*]

নন্দিতা॥ দরজা বন্ধ থাক।

গৌতম॥ কেন গরম লাগছে না?

নন্দিতা॥ না।

গৌতম॥ অথচ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার গরম লাগছে, অস্বস্তি হচ্ছে।

নন্দিতা॥ কিচ্ছু হচ্ছে না, আপনি চুপ করে বসুন। চারপাশে জনপ্রাণী নেই, এই ভুতুড়ে বাড়িটায় আপনি কি করে থাকেন? ছেড়ে দিন।

গৌতম॥ অসম্ভব। কোয়ার্টার ছেড়ে আমি এখানে উঠে এসেছি। জঙ্গল-সর্দারের এই ভাঙা বাড়িটা ছেড়ে আমি নড়ব না। আমি শেষ পর্যন্ত দেখব। ঐ বাক্সটা আমার চাই। আর যদি কোনদিন না পাই, চাবিটা এখানকার নদীর জলে ফেলে দেব। জঙ্গল-সর্দারের আত্মা বনের মধ্যে আর্তনাদ করে কাঁদবে। আমি একটা প্রতিশোধের আনন্দ পাব।

নন্দিতা॥ আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রতিশোধটা হয়ত আপনি নিজের উপরই নিচ্ছেন।

গৌতম॥ কিন্তু আমার সমস্ত রক্ত যেন টের পায়, এখানে কোথাও কোন অন্ধকারে বাক্সটা লুকিয়ে আছে।

নন্দিতা॥ আসলে একটা বানানো অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই আপনি ভালবাসেন। ঠিক আছে, উঠি আজ।

গৌতম॥ উঠবেন? এলোমেলো কথা বলে কেবল বিরক্ত করে যাচ্ছি আপনাকে, তাই না?

নন্দিতা॥ কথা বলা তো আপনার স্বভাব, বিরক্ত হব কেন? হস্টেলে ফিরতে তো হবে। জঙ্গলের পথ, তার উপর রাত্তির—আমি না হয়ে মণিকা হলে ভেবেই শেষ হয়ে যেত।

গৌতম॥ পৌঁছে দেব আপনাকে?

নন্দিতা॥ না, নন্দই তো যাচ্ছে। এমনিতেই আপনার এখানে আসি তাতে বিচিত্র ব্যাখ্যা হয়, তার উপর আপনার সঙ্গে ফিরলে তো কথাই নেই। মণিকা আলাদা, এতো ভাল—আমাকে ঠিক বোঝে। আলাপ করিয়ে দেব একদিন আপনার সঙ্গে।

গৌতম॥ কি দরকার; বেশ আছি একা।

নন্দিতা॥ আপনার এই বিশ্রী স্বভাবের জন্য স্কুলের দিদিমণিরা কি নাম দিয়েছে জানেন? কাঠবিড়ালি। মানুষ দেখলেই গাছপালার মধ্যে ঢুকে যান। আলাপ পরিচয় করে থাকতে ভাল লাগে না আপনার? আমি তো পারি না, মাঝে মাঝে এখানে এসে গল্প করে যাই, হয়ত আপনার খারাপ লাগে, তবু।

গৌতম॥ আমার অনেক কিছু ভাল লাগে না, কিন্তু কেন জানি না, আপনাকে বেশ ভাল লাগে। (*নন্দ ঢুকল*)

নন্দিতা॥ এই তো নন্দ এসেছে, চলি।

নন্দ॥ চল, দিদিমণি।

[*নন্দ এগিয়ে দরজা খুলে উঠোনের দিকে বেরিয়ে গেল।*]

গৌতম॥ (*অল্প হেসে, বালকের মতো*) সাবধানে যাবেন, এই জঙ্গলে একটা রাক্ষস আসে।

নন্দিতা॥ (*চিন্তিত মুখে*) রাক্ষস? আপনি কি কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো একজন অদ্ভুত লোকের কথা বলছেন?

গৌতম॥ না, সে রাক্ষসের ক্যামেরা নেই। এমন কি স্পষ্ট মুখ নেই, চোখ নেই, পা, হৃদয়—কিছুই নেই। তবু আস্তে আস্তে গিলে খায়।

নন্দিতা॥ (*হেসে*) ধাঁধা বলছেন না তো!

গৌতম॥ হবেও বা, অরণ্যের ধাঁধা। রাক্ষসটা আর কেউ নয়, অন্ধকার। আমি রোজ দেখি, সন্ধ্যার পর রাক্ষসটা গুটি গুটি জঙ্গলে নেমে আসে। ধীরে ধীরে ফুলের রঙ, লতামাটির উপর ছড়ানো-ছিটানো আলো—সব আস্তে আস্তে গিলে খেতে থাকে। কেবল সবুজ রঙটা গিলতে পারে না, অন্ধকারেও সবুজ চেনা যায়। আপনার সবুজ শাড়িটা এই রাক্ষসটা দাঁতে ছুঁতে পারবে না। আমি জানালা দিয়ে আপনার চলে যাওয়া দেখব আর রাক্ষসটার অসহায় অবস্থা দেখে মনে মনে বিপুল হেসে উঠব।

নন্দিতা॥ দেখবেন যেন শব্দ করে হাসবেন না। নিজেকেই পাগল মনে হবে। আর ঐ বোতলটা তুলে রেখে দিন, এক ফোঁটাও ছোঁবেন না।

গৌতম॥ (*বোতলটা তুলে*) কিছু নেই এতে, হৃদয়ের মত ফাঁকা। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ, খানিকটা রঙিন জল শরীরের মধ্যে ঢুকে কতো কাণ্ড করছে। সমস্ত কস্‌মস্‌টা বদলে যায়, শূন্যতায় কালার্ড পেইন্টিং ঝুলতে থাকে...মনে হয় বাতাসে ভাসমান ফ্রেস্কোর অসংখ্য দৃশ্য। ভাল লাগে না?

নন্দিতা॥ কাজ নেই আমার ভাল লাগায়। বেশ আছি। বাতাসে ভাসমান কালার্ড পেইন্টিং আর ফ্রেস্কো ছাড়াও আমার পৃথিবীটা বাঁচে। চলি, নন্দ আমার উপর ঠিক চটে যাচ্ছে।

গৌতম।। কাল আসছেন কিন্তু।

নন্দিতা।। দেখব, পারলে।

[*নন্দ ব্যস্ত ভাবে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ করে দিল।*]

নন্দিতা।। কি হল?

নন্দ।। সেই লোকটা আবার আসছে। দূরে থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকে আসছে দেখলাম।

গৌতম।। কে? কার কথা বলছ?

নন্দিতা।। (*আপন মনে*) আশ্চর্য! অদ্ভুত সাহস তো!

গৌতম।। কার কথা বলছেন? লোকটি কে? আপনার চেনা কেউ?

নন্দিতা।। কোনকালে চিনি না। আজকেও নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, লোকটা আমার পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাই আপনার এখানে কাছাকাছি বলে চলে এসেছি। যখন এলাম তখনও লোকটা বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। সেদিন আমরা মেলায় গিয়েছিলাম; বার বার লক্ষ করেছি, আমাদের কিছু দূরে দূরে থেকে হাঁটছে। বাসে করে শহরে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, লোকটাও ঠিক ঐ বাসে উঠেছিল।

গৌতম।। নন্দ, তুই লোকটাকে এদিকে দেখেছিস?

নন্দ।। এই প্রথম দেখলুম। গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করব?

গৌতম।। তোকে কিছু করতে হবে না, তুই ভিতরে যা, আমি দেখছি।

নন্দিতা।। আপনি যাবেন না। কি প্রকৃতির লোক কে জানে?

[*নন্দ ভিতরের ঘরে চলে যায়।*]

গৌতম।। (*বন্দুকটা নিল*) সঙ্গে বন্দুক রয়েছে আমার, ভয় কি?

নন্দিতা।। তাহলেও দরজা খুলবেন না, কোনও বিশ্বাসই নেই এসব অদ্ভুত লোককে!

গৌতম।। এতো ভয় কিসের! দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি? ভিতরে ডাকি ওকে।

নন্দিতা।। আসলে ওকে দেখলে আমার কেমন ভয় করে। পরশু একটা কাণ্ড হয়েছিল। ঘুমের মধ্যে আমি অনেক সময় নিজের অজান্তে হাঁটি। সেদিন শান্তা রাত জেগে পরীক্ষার খাতা দেখছিল, আমি ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। শান্তা ভাবতেই পারেনি আমি ঘুমের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি, ভাবল ঘরের মধ্যে গরম তাই বুঝি বাইরে যাচ্ছি। তারপর আমাকে হঠাৎ সোজা রাস্তার দিকে হাঁটতে দেখে দৌড়ে গিয়ে ধরে আনল। আমি যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকের রাস্তার মোড়ে নাকি ঐ লোকটা দাঁড়িয়েছিল। শান্তা বলল, সোজা আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলে আমার কেমন ভয় করে।

গৌতম।। লোকটির নিশ্চিত কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা জানা ভাল। লোকটার এই অদ্ভুত ঘোরাফেরার অর্থটা জানা দরকার। আপনার স্বার্থেই ওকে আমার ডেকে কথা বলা দরকার। আমি দরজাটা খুলছি, আপনি বরঞ্চ ভিতরে যান।

[*দরজা খুলতে গেল।*]

নন্দিতা।। আপনি যাবেন না, আমার অনুরোধ।

[*হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে থেকে একটা গলা—*

'দরজাটা একটু খুলুন।']

নন্দিতা।। খুলবেন না। একটা কিছু মতলব নিয়ে এসেছে।

[*বাইরে থেকে—'মিঃ ব্যানার্জি আছেন? গৌতম ব্যানার্জি?'*]

গৌতম।। আমি খুলছি। কোনও ভয় নেই আপনার।

[*বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে দরজাটা খুলে দিল। একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণদর্শন, দীর্ঘ চোখের তরুণ ঢুকল। কাঁধে ক্যামেরা, মুখে সিগ্রেট। একজন ট্যুরিস্টের মত দেখতে। গৌতমের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভ হাসল।*]

লোকটি।। বন্দুকটা রাখুন। ওটা অহেতুক এতো উৎকট শব্দ করে। (*দুজনের দিকে নমস্কারের হাত ঘুরিয়ে*) নমস্কার, নমস্কার।

[*ওরা প্রতি নমস্কার জানাল, হাত তুলে।*]

লোকটি।। আপনিই তো ফরেস্ট অফিসার গৌতম ব্যানার্জি? আমি সোমেন্দু, সোমেন্দু চক্রবর্তী। আপনারা কেন জানি না, বেশ অভিভূত, বসতেও বলছেন না। বসছি, কেমন? (*বসে*) বসে পড়লুম কিন্তু।

গৌতম।। আপনাকে ঠিক চিনতে পারলুম না।

সোমেন্দু।। এবার চিনবেন। আপনাকে আমি চিনি, এখানকার লোক আপনাকে সম্প্রতি পাগলাবাবু বলছে। আর নন্দিতা দেবীকে আমি তো চিনিই। ওঁর সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

নন্দিতা।। হ্যাঁ, দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা আমার পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়েছে। আপনি আমাকে সব সময় বিশ্রী ভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এমন কি আজকে—

সোমেন্দু।। অনুসরণ ব্যাপারটাই সবসময় পাপ নয়, কিংবা নোংরা নয়, নন্দিতা দেবী। কোন একটা সৎ উদ্দেশ্যও তো থাকতে পারে।

নন্দিতা।। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ লুকিয়ে কারুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় না।

সোমেন্দু।। তাহলে আপনার সামনে এলেই পাপের বদলে পুণ্য হত? যদি বলি, একটু আড়াল থেকে, দূর থেকে লক্ষ করাই আমার দরকার ছিল। একটা ছবি যেমন দূর থেকে দেখলে ভাল, এক একটা মানুষের ক্ষেত্রেও তা-ই।

গৌতম।। আপনার উদ্দেশ্যটা সম্ভবত আমাদের জেনে নেওয়া উচিত।

সোমেন্দু।। বিলক্ষণ। এককথায় নন্দিতা দেবী সম্পর্কে আমার একটা ইনটারেস্ট রয়েছে এবং তা আমি নন্দিতা দেবীর আড়ালে আগে আপনার কাছে বলতে চাই।

নন্দিতা।। আমার সম্পর্কে যা বলবেন, আমার সামনেই বলুন—এটাই ভদ্রতা।

গৌতম।। ওঁর সামনেই বলুন।

সোমেন্দু।। অসম্ভব। গৌতমবাবু, মজা কি জানেন, আপনার স্বার্থেই আমি নন্দিতা দেবীকে লক্ষ করে গেছি। অবশ্য আমারও একটা লোভ ছিল। একটা বিশেষ মুহূর্তে আর পরিবেশে নন্দিতা দেবীর একটা ছবি নেবার লোভ ছিল। কিন্তু যখনই তুলতে গেছি,

তক্ষুণি মনে হয়েছে এর পরেই ওকে আরও সুন্দর দেখাবে। আমি মাত্র একটাই ছবি তুলতে চেয়েছিলাম এবং সেটাই চূড়ান্ত।

নন্দিতা।। কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছবি তোলা অন্যায়—এ কাণ্ডজ্ঞানটুকু নিশ্চয়ই রয়েছে আপনার?

সোমেন্দু।। ছবি তুলিনি তো। তুললে আপনি জানতেও পারতেন না। চোখের আড়ালে তো কতো কিছু হয়—আমরা কিছু করতে পারি না; আপনি না, আমি না —কেউ না।

গৌতম।। কি করেন আপনি?

সোমেন্দু।। কিছু না, প্রায়ই ঘুরে বেড়াই। নানা রকম খেলা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। এসব খেলায় কখনো টাকা আসে, কখনো নেহাৎ মজা—কখনো বা একটু ঘটনা বানানোর লোভ। এও এক ধরনের দর্শন নিয়ে বাঁচা, বলতে পারেন—আমি একজন দার্শনিক।

গৌতম।। কিন্তু আমার এখানে কি জাতীয় দার্শনিক খেলায় আপনার আগ্রহ হল, বুঝতে পারছি না।

নন্দিতা।। খেলার কিছুটা নমুনা কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।

সোমেন্দু।। আমি কিন্তু নমুনাটুকুর থেকে অনেক বেশি, অনেক বড়। আমি একজন সুনিশ্চিত বিবেকবান, চতুর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুশিক্ষিত এবং দৈবক্রমে দেখতে ভালই বলা যায়। আমি ছবি আঁকতে ভালবাসি, গান গেয়ে সময় কাটাতে ভাল লাগে, নেহাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে সাহিত্য করি না। তাছাড়া এসবও এক ধরনের বন্ধন, ঝামেলা!

নন্দিতা।। কোন একটা বিষয় নিয়ে অন্তত কিছু সাধনা চালিয়ে গেলে পারতেন! নিজের জন্য মায়া হয় না আপনার!

সোমেন্দু।। ভীষণ মায়া হয়। আমি নিজেকে ভীষণ ভালবাসি। আমি মরে গেলে, সম্ভব হলে নিজের জন্য কাঁদতাম। আর এই কান্নাটা ভুলে থাকবার জন্য এক একটা খেলা খুঁজে বেড়াই। যেমন সম্প্রতি আপনারা।

গৌতম।। আমরা!

সোমেন্দু।। হ্যাঁ, আপনারা।

নন্দিতা।। আপনি নিজেকে একটি প্রহেলিকা বানিয়ে এক ধরনের আনন্দ পান দেখছি।

সোমেন্দু।। সব কিছুকেই কি আপনি প্রহেলিকা বলেন? গৌতমবাবু যে বাক্সটা খুঁজছেন। সেটা কি প্রহেলিকা?

গৌতম।। আপনি বাক্সটার ব্যাপার জানেন?

সোমেন্দু।। এটি জানা তো শক্ত নয়, এ অঞ্চলে তো এই একটাই গল্প। শুনে থেকে গেলুম—আমার ভিতরে একটা খেলা জাগল। আর মণিমুক্তোর রূপ দেখার লোভ।

গৌতম।। ঠিক বলেছেন, মণিমুক্তোর রূপের মোহ, স্পর্শের মোহ, আবিষ্কারের মোহ। জানেন, এ-বাড়ির সব জায়গায় আলো জ্বালিয়ে রাখলেও এক টুরো ভয়ংকর অন্ধকার চোখের আড়ালে এখানে কোথাও আছে, আর সেই অন্ধকারে বাক্সটা লুকিয়ে আছে। দেখতে না পাওয়া গেলেও আছে, যেমন একটা গাছের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফল লুকিয়ে থাকে, একটা একটা করে বোঁটায় দেখা দেয়; যেমন কোন নারীর হৃদয়ের মধ্যে প্রখর

একটা অন্ধকারে ভালোবাসা লুকনো থাকে। সেরকম একটা রহস্যময় অন্ধকার এ-বাড়িতে কোথাও আছে, সেখানে সেই বাক্সটা বড় একা। আমি ওটা চাই, ভীষণভাবে চাই।

সোমেন্দু॥ আপনার মত আমিও চাই, আর এ ব্যাপারে নন্দিতা দেবী আমাদের একমাত্র সহায়।

নন্দিতা॥ মানে?

সোমেন্দু॥ হ্যাঁ, ঐ মণিমুক্তোর বাক্সটা আপনার সাহায্য ছাড়া পাওয়া অসম্ভব।

গৌতম॥ আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সোমেন্দু॥ আপাতত নন্দিতা দেবী যদি একটু পাশের ঘরে যান, গৌতমবাবুকে রহস্যটা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারি।

নন্দিতা॥ আপনাদের এসব খেলায় আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই! আমি হস্টেলে ফিরে যাচ্ছিলাম, তাই যাব।

সোমেন্দু॥ কি আশ্চর্য! আপনি চলে গেলে একা গৌতমবাবুকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। দয়া করে কয়েক মিনিট থেকে যান।

গৌতম॥ নন্দিতা দেবী এসময়ে আপনি চলে যাবেন না। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, কয়েক মিনিট; আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। যদি সত্যি সত্যি মণিমুক্তোর বাক্সের ডালাটা খুলতে পারি। কয়েক মিনিট পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, আমার অনুরোধ!

নন্দিতা॥ সত্যি করেই আমাকে হস্টেলে এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে কিন্তু। অল্প একটু পরেই কিন্তু উঠব।

[*নন্দিতা পাশের ঘরে চলে গেল। একটুকাল দুজনেই চুপ। সোমেন্দু সোজা গৌতমের চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ হাসল।*]

সোমেন্দু॥ সোনার চাবিটা কোথায়?

গৌতম॥ আছে।

সোমেন্দু॥ ভাল। আমার চোখে এক রকম বিস্ময়কর আলো আছে, সব অন্ধকার ধরা পড়ে, এমন কি যে অন্ধকারে বাক্সটা, তাও।

গৌতম॥ সত্যি বলছেন?

সোমেন্দু॥ মিথ্যে আমি বলি না। তবে আমার অর্ধেক, আপনার অর্ধেক। এই বাটোয়ারায় রাজি?

গৌতম॥ যে কোন শর্তে আমি রাজি। কেবল ওটা খুঁজে বের করুন। কিন্তু আপনি আমাকে নিয়ে কোন মজার খেলা খেলতে চাইছেন না তো!

সোমেন্দু॥ অহেতুক খেলা আমি খেলি না। অকারণে দৌড়ে ঘেমে উঠতে কে চায়? নিছক মজাও আমাকে ক্লান্ত করে।

গৌতম॥ বাক্সটা খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই আপনি একটা প্ল্যান করেছেন, কিছু ভেবেছেন বা জানেন?

সোমেন্দু॥ প্ল্যান অবশ্যই একটা রয়েছে। (*সিগ্রেট ধরাল*) প্রথমত নন্দিতা দেবীকে আমার চাই।

[*তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল।*]

গৌতম।। কি বলছেন আপনি? অত্যন্ত বিশ্রী শোনাচ্ছে আপনার কথা।

সোমেন্দু।। এটাই আমার দুর্ভাগ্য। শুনতে বিশ্রী শোনালেও আমার বক্তব্য নিতান্তই সৎ। আমাদের প্ল্যানটায় সহযোগিতার জন্য নন্দিতা দেবীকে চাই। ব্যক্তিগত ভাবে কোন অর্থে ওঁকে দাবি করার দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া আমার ধাতে নেই। আমি ঘুরে বেড়াই। এসব আমার আসে না।

গৌতম।। কিন্তু নন্দিতা দেবী আপনার উপর চটে আছেন, তাছাড়া ওঁর উপর আমার সেরকম কোন জোর করার মত দাবি হয়ত নেই। উনি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজীই হবেন না হয়ত।

সোমেন্দু।। তাহলে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আমার। উঠি (*উঠল*)। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই অন্ধকারের কবর থেকে বাক্সটা তুলে আনা যেত। অন্ধকারটাই জিতল। একদিন এই অন্ধকারে আপনার চাবিটাও হারিয়ে যাবে।

গৌতম।। সত্যি সত্যি যাচ্ছেন আপনি?

সোমেন্দু।। আমার আসা এবং যাওয়া দুটোই সত্যি।

গৌতম।। আপনার প্ল্যানটা শুনলে, মানে যদি বিশ্বাসযোগ্য আর নিরীহ কিছু হয়, তাহলে হয়ত নন্দিতা দেবীকে বোঝাতে চেষ্টা করতে পারি।

সোমেন্দু।। (*এগিয়ে এসে সোজা গৌতমের চোখের দিকে তাকাল*) বেশ। আমার চোখের দিকে তাকান।

গৌতম।। চোখের দিকে তাকাব মানে? চোখের দিকে তাকালে কি হয়! *(হাসল)* আপনি আমার মতই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছেন, চোখের দিকে তাকালে কি হয়!

সোমেন্দু।। আপনি এক দৃষ্টে আমার চোখের দিকে তাকান। চোখের মধ্যে দিয়ে যদি রহস্যময় কিছু দেখেন ধীরে ধীরে বলে যাবেন। তাকান, তাকান আমার দিকে।

[*মন্ত্রাবিষ্টের মত গৌতম তাকাল।*]

সোমেন্দু।। মনোযোগ দিন। কেবল চোখের মণিটা লক্ষ করুন। মণিটা ক্রমশ বড় মনে হবে, যেন নীল আর উজ্জ্বল কালোতে মেশানো কাচের একটা বল। আর ঐ বলটার গায়ে দৃশ্য, দৃশ্যের পর দৃশ্য। দেখছেন?

গৌতম।। (*স্বপ্নমুগ্ধের মত*) অপূর্ব আপনার চোখ—ঘন পল্লব, গভীর দৃষ্টি, অপলক, রহস্যময়। যেন সমুদ্রের তলার শ্বেত শঙ্খটি আপনি দেখতে পান, যেন মাটির নিচের বীজ, বুকের তলদেশের জলে ভেসে বেড়ানো সোনালি রূপোলি মাছ, আপনার চোখে পড়ে। আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি,.অনেক কিছু—মেঘের মত দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে— একটা অদ্ভুত গাছ, প্রত্যেকটা পাতার রং আলাদা; একটা নদী, প্রত্যেকটা ঢেউ-এর রঙ আলাদা; নন্দিতা ...নন্দিতা—ওর শরীরে জ্যোৎস্না পড়ছে, চোখ হাওয়ায় বুজে আসছে...একটা সবুজ পাতা নড়ে ওঠার শব্দ দূর থেকে বীণার মত বেজে উঠল! কী অদ্ভুত সব দৃশ্য, শব্দ...দৃশ্য, শব্দ...

সোমেন্দু।। আমি যা ভেবেছিলাম আপনি তার থেকে আরও বেশি অভিভূত। যাক্গে, আমার উপর আপনার বিশ্বাস আছে? আমি কি রহস্যময় চোখ নিয়ে আসিনি?

গৌতম।। নিঃসন্দেহে। আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।

সোমেন্দু।। মানুষ যা দেখতে চায়, আমার চোখে তা-ই ফুটে ওঠে। এ-এক বিস্ময়কর

দর্পণ। এবার সেই সোনার চাবিটা বের করুন।

গৌতম॥ কিন্তু, কাউকে আমি এপর্যন্ত দেখাইনি। এমনকি আমার নিজেরও দেখতে ভয় করে। চাবিটা একটা গোপন অন্ধকারের ঝ'ড়ো বাতাসে আমার ভিতরটা ভীষণ নাড়াতে থাকে। চাবিটা আমি বড় বেশি দেখি না, কাউকে দেখাইওনি।

সোমেন্দু॥ আমাকে দেখানো দরকার। আনুন ওটা।

গৌতম॥ কিন্তু—

সোমেন্দু॥ সময় নষ্ট করবেন না, ওটা আনুন—আমার হাতে দিন।

[*খুব সন্তর্পণে ড্রয়ারটা খুলে চাবিটা বের করল গৌতম। মোহাচ্ছন্নের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর এগিয়ে সোমেন্দুর হাতে দিল। খুব সাধারণ ভাবে চাবিটা দেখল সোমেন্দু, তারপর ওর দিকে এগিয়ে দিল।*]

সোমেন্দু॥ রেখে দিন। হ্যাঁ, আপনার কাছেই রাখুন। এবার নন্দিতা দেবীকে ডাকুন।

গৌতম॥ এক্ষুণি?

সোমেন্দু॥ এক্ষুণি। আপনি নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন না। আমার দৃষ্টিতে আশ্চর্য এক সূক্ষ্ম শক্তি রয়েছে, লোকে একে মেসমেরিজম বলে জানে। নিপুণ সাধনায় এই শক্তি একটা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়। আমি মানুষকে একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে যেতে পারি, স্নায়ুগুলোকে বশীভূত করতে পারি এবং ইচ্ছে মত মানুষের ভিতরের গোপন সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আমি একজন মেস্‌মেরিস্ট। এর জন্য চাই সহানুভূতিশীল একজন মিডিয়ম।

গৌতম॥ মিডিয়ম হিসাবে কি আপনি নন্দিতা দেবীর কথা ভেবেছেন?

সোমেন্দু॥ ঠিক তাই। নন্দিতা দেবী আপনার সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। তাছাড়া তিনি একজন 'সম্‌নাম্‌বুলিস্ট'—নিশি পাওয়ার রোগ আছে ওঁর। এসব চরিত্রই ভাল মিডিয়ম হতে পারে। আমি এতোদিন ধরে নন্দিতা দেবীকে লক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

গৌতম॥ উনি যদি মিডিয়ম হতে রাজী না হন?

সোমেন্দু॥ আপনার খাতিরে অন্তত ওঁর রাজী হওয়া উচিত। আর এ কাজটাই আপনাকে করতে হবে। আমার চোখের মধ্যে মণিমুক্তোর সেই বাক্সটা খুঁজবেন। আমার চোখের ভিতরের একটা গোপন আয়নায় আমাদের দরকারি বাক্সটার ছায়া পড়বে, ঘন কুয়াশা আর অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে আবিষ্ট নন্দিতা খুঁজে বের করবেন। মিশরীয় যাদুকরেরা এ ব্যাপারে একটা ছোট্ট নীল রঙের আয়না ব্যবহার করত। আমার চোখটাই সেই আয়না। আপনি নন্দিতা দেবীকে ডাকুন।

গৌতম॥ সোমেন্দুবাবু, আপনি যদি একটু বাইরে যান ভাল হয়। কারণ যদি আপনি কাছে থাকেন কোনক্রমেই ওকে বোঝানো যাবে না—আপনার উপর নন্দিতা দেবী এতো চটে আছেন। আমি রাজী করাতে পারলেই ডাকব।

সোমেন্দু॥ বেশ। আমি দরজাটার কাছেই আছি। ডাকা মাত্র চলে আসব।

[*সোমেন্দু চলে গেল।*]

গৌতম॥ নন্দিতা দেবী, নন্দিতা দেবী।

[*নন্দিতা এল। একটু গম্ভীর দেখতে।*]

গৌতম।। বিশ্রীভাবে এতোক্ষণ আপনাকে পাশের ঘরে বন্দী করে রেখেছিলাম!

নন্দিতা।। এবার তাহলে আমি ফিরে যেতে পারি।

গৌতম।। চলে যাবেন? নন্দিতা দেবী, একটা অনুরোধ করব?

নন্দিতা।। আমি জানি। পাশের ঘরে থাকলে এ ঘরের কথা কানে যাবেই। আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারব না, ক্ষমা করবেন। অনেক রাত হয়েছে, এখন আমাকে যেতেই হবে।

গৌতম।। আপনি, আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারতেন, নন্দিতা দেবী।

নন্দিতা।। আপনি যেভাবে বাঁচতে চাইছেন, সেভাবে বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান এলোমেলো হয়ে গেছে, যে যা বলছে বিশ্বাস করছেন। আপনাকে ঠকানো এতো সোজা। ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি কি দেখেছেন জানি না, তবে মুহূর্তের মধ্যে একজন ঠগ লোকের বশ হয়ে গেছেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

গৌতম।। ভদ্রলোক ঠগ নয়। অদ্ভুত ক্ষমতাবান লোক।

নন্দিতা।। মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই মঙ্গল ডেকে আনে না। আমি একজন মেসমেরিস্টকে মেসমেরিস্ট বলেই ভাবি—এর বড় কিছু নেই তার মধ্যে।

গৌতম।। কিন্তু লোকটা মেসমেরিস্টের থেকেও বড়। অন্য কিছু একটা রয়েছে ওর মধ্যে। ভদ্রলোক আশ্চর্য রহস্যময়, অনেক গোপন শক্তি রয়েছে ওর মধ্যে।

নন্দিতা।। গোপন শক্তি অশুভ কিছুও হতে পারে। ওর কি উদ্দেশ্য আমরা এখনও জানি না, ওর মুখের কথা সত্য নাও হতে পারে।

গৌতম।। ভদ্রলোক অন্তত মিথ্যেবাদী নয়। ও কেবল আপনাকে মিডিয়ম করতে চায়।

নন্দিতা।। আমি শুনেছি।

গৌতম।। আপনিই মিডিয়ম হয়ে সেই বাক্সটার সন্ধান বলে দিতে পারবেন।

নন্দিতা।। (*হেসে*) আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

গৌতম।। কিছু একটা বিশ্বাস না করে কোন উপায় নেই আমার। নন্দিতা দেবী, যে কোন উপায়ে বাক্সটা আমি খুলতে চাই। নন্দিতা দেবী, আপনি আমাকে বন্ধুর মত দেখেছেন, বুঝতে চেয়েছেন, উদ্ধার করতে চেয়েছেন। এ যদি সত্য হয়, এই মুহূর্তে আমাকে আপনি বাঁচাতে চাইবেন না? বিশ্বাস করুন, ঐ চাবিটার রহস্য হয়ত আমি এক্ষুণি জানতে পারব। আমাকে জানতে দিন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমাকে আপনি বাক্সটা খুঁজে পেতে সাহায্য করুন। এই কুৎসিত অন্ধকার থেকে আমাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দিন। আমার অনুরোধ, আপনি রাজী হোন।

নন্দিতা।। সব ব্যাপারটা যখন বুজরুকি বলে টের পাবেন আঘাতটা আরও কত বেশি লাগবে ভেবেছেন?

গৌতম।। তবু এই শেষ চেষ্টা। আমার সব খোঁজা ব্যর্থ হয়েছে। খোঁজার কোনও পথ পর্যন্ত আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। একটা অহেতুক চাবির ভার আমি আর সইতে পারছি না। কিছু একটা খুলতে হবে, সেটা কি? এই প্রশ্নের যন্ত্রণা অসহ্য! আমি দিনের

পর দিন কি হয়ে যাচ্ছি! কী ভয়ংকর ভাঙা-চোরা! একটা দরজা খুললে কিছু একটা হয়, অথচ দরজাটা আমি খুলতে পারি না, ভাঙতে পারি না। আজ একটা অলৌকিক বাতাসে দরজাটা যদি নড়ে উঠল, যদি আপনার আঙুল লেগে খুলে যায়, আপনি তা চাইবেন না?

নন্দিতা॥ বেশ যদি আপনি খুশি হবেন ভেবে থাকেন, ওকে ডাকুন। আমি মিডিয়ম হব।

গৌতম॥ আপনি এতো ভাল! দাঁড়ান ওকে ডাকি আগে। (*চেঁচিয়ে*) সোমেন্দু বাবু! সোমেন্দু বাবু!

[*সোমেন্দু এল।*]

সোমেন্দু॥ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ নন্দিতা দেবী। আপনি আলিবাবার সেই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন—পাথরের দরজা খুলে যাবে...আপনি ভয়ংকর অন্ধকারে রূপোলি আলোর প্রদীপের মতো ভেসে ভেসে সেই বাক্সটা ছুঁয়ে দেবেন—রত্ন আর রত্নের বিপুল জ্যোৎস্নায় আমাদের হৃদয় জ্বলে উঠবে।

গৌতম॥ রত্ন আর রত্নের বিপুল জ্যোৎস্না! একটা গোপন বাক্সে জ্যোৎস্না শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে, আমি খুলব—কী প্রচণ্ড মুক্তি!

সোমেন্দু॥ আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক। টেবিলটা মাঝখানে আনতে হবে। (*মাঝখানে সোমেন্দু আর গৌতম টেবিলটাকে নিয়ে এল*) আলোটা? (*আলোটাকে অত্যন্ত মৃদু করল*) নন্দিতা দেবী, আপনি আর আমি মুখোমুখি বসব। গৌতমবাবু, অন্য পাশে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে বসুন। নন্দিতা দেবী যা বলবেন, আপনি সব টুকে যাবেন। আসুন, আমরা বসছি।

[*ওরা যথারীতি বসল। সোমেন্দুর মেস্‌মেরাইজ্ করার ভঙ্গি,*
কণ্ঠস্বর এবং পদ্ধতি একজন অভিজ্ঞ অথচ রহস্যময়
হিপ্‌নটিস্ট-এর মত মনে হবে।]

সোমেন্দু॥ নন্দিতা দেবী, আমার চোখের দিকে তাকান, আমার চোখের ভিতরের অলৌকিক আয়নায় তাকান। মনে করুন, ঘুমের মধ্যে হাঁটছেন, আপনার শরীর হাল্কা হচ্ছে...এতো হাল্কা যেন ইচ্ছে হলে বাতাসে আপনি ভেসে বেড়াতে পারেন। এখন আপনি অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছেন। আপনার ভিতর একটা অদ্ভুত রহস্যময় তরঙ্গ নড়ে উঠছে, আপনি একটা নতুন রকম আলোতে পথ দেখছেন, আপনার ভিতরটা আলোয় অন্ধকারে কাঁপছে। (*নন্দিতাকে ক্রমশ আবিষ্ট মনে হবে*) আপনি এখন ফুলের ভিতরটা দেখতে পান, বুকের ভিতর গাছের ভিতরের সবুজ প্রবাহ, আকাশের অনন্ত নীলের কম্পন আপনি টের পান। তাই না? নন্দিতা দেবী, আপনি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তাই না? (*নন্দিতা মাথা নাড়ল*)

গৌতম॥ কি আশ্চর্য, আমি—

[*সোমন্দুর ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে বসল।*]

সোমেন্দু॥ নন্দিতা দেবী, আপনি কি খুঁজছেন?

নন্দিতা॥ (*ক্লান্ত, একঘেয়ে যান্ত্রিক গলায়*) একটা বাক্স, কারুকার্য করা একটা মণিমুক্তোর বাক্স।

সোমেন্দু ॥ বাক্সটা কোথায়?

নন্দিতা ॥ খুঁজছি, আমি খুঁজছি।

সোমেন্দু ॥ কোথায় খুঁজছেন? আমার চোখের দিকে তাকান, আপনি পাবেন, আপনি পাবেন।

নন্দিতা ॥ আমি আপনার চোখের ভিতরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কুয়াশা, কেবল কুয়াশা।

সোমেন্দু ॥ তাকান এবার, দেখতে পাবেন, তাকান ; কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, তাই না?

নন্দিতা ॥ কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আমি বাক্সটা দেখতে পাচ্ছি, কী সুন্দর বাক্স!

[*গৌতম উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে সোমেন্দুর ইঙ্গিতে আবার বসে পড়ল।*]

সোমেন্দু ॥ বাক্সটা কোথায়?

নন্দিতা ॥ আপনার চোখের মধ্যে এই ঘর; এই ঘর, এই ঘরের মধ্যে ঘুরছে।

সোমেন্দু ॥ লক্ষ রাখুন, বাক্সটা কোথায় যায়।

নন্দিতা ॥ একটা মেঘ বাক্সটাকে আড়াল করছে, ঠেলছে ; আড়াল করছে, ভাসিয়ে নিতে চাইছে।

সোমেন্দু ॥ লক্ষ্য রাখুন, বাক্সটা কোথায় যায়। ঘরের বাইরে যাচ্ছে কি?

নন্দিতা ॥ মেঘটা সরে যাচ্ছে ; বাক্সটা ঘরের বাইরে যাচ্ছে, হাল্কা বাতাসে ভেসে ভেসে বাইরে যাচ্ছে।

সোমেন্দু ॥ তাকিয়ে থাকুন। বাইরে কোথায়, লক্ষ রাখুন—অনুসরণ করুন।

[*নন্দিতাকে ভয়ংকর ক্লান্ত আর ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে*]

গৌতম ॥ ওর কষ্ট হচ্ছে। সোমেন্দু, ওর কষ্ট হচ্ছে।

সোমেন্দু ॥ নন্দিতা দেবী, চেয়ারে মাথাটা এলিয়ে দিন। চোখ বুজুন। এবার চোখ বুজেই সব দেখতে পাবেন। (*নন্দিতা ক্লান্ত মাথাটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল*) বাক্সটা এবার কোথায়? বাগানে?

নন্দিতা ॥ বাগানে।

সোমেন্দু ॥ বাগানে কোথায়? কোনও গাছ? কোনও গাছের কাছে?

নন্দিতা ॥ হ্যাঁ, একটা গাছ, একটা গাছ...

সোমেন্দু ॥ বলুন কোন গাছ? কোন গাছ?

নন্দিতা ॥ একটা গাছ, একটা—(*কষ্টে যেন উচ্চারণ করতে পারছে না*)

সোমেন্দু ॥ কোন গাছ? রক্তকরবী? রক্তকরবী গাছের নিচে?

নন্দিতা ॥ রক্তকরবী গাছ, রক্তকরবী গাছের নিচে—(*অতি কষ্টে কথাগুলো বলে মূর্চ্ছিতের মত মাথাটা এলিয়ে দিল*)

গৌতম ॥ (*চেঁচিয়ে*) পেয়ে গেছি, আমি পেয়ে গেছি! কিন্তু নন্দিতা দেবী বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সোমেন্দু ॥ ভয় নেই। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে আসবেন। চাবিটি এবার আমার কাছে দিন।

গৌতম ॥ (*উদ্‌ভ্রান্তের মতো*) না, চাবিটা আমার কাছে থাকবে, আমি খুলব। আপনি নন্দিতা দেবীকে সুস্থ করুন যতোক্ষণ ওর চোখ বন্ধ, আমি বাক্সটা খুলব না, ওর চোখের সামনে আমি খুলব, সেই বন্দী শ্বাসরুদ্ধ জ্যোৎস্না আস্তে আস্তে কী প্রচণ্ড মুক্তিতে জ্বলে উঠবে। দাঁড়ান, আমি শাবলটা নিয়ে বাগানে যাচ্ছি।

সোমেন্দু ॥ দাঁড়ান। আপনি এখানে ওঁর কাছে থাকুন, আমি আনব বাক্সটা।

গৌতম ॥ (*চাপা উত্তেজনায়*) না! বাক্সটা আমার, চাবিটি আমার —আমি কাউকে দেব না। আমি খুঁড়ে বের করব—আমি, আমি, আমি! আমি প্রথম খুলব, আমি দেখব, আমি দেখব, আমি ছোঁব, আমি প্রথম উল্লাসে চিৎকার করে উঠব। আমি কাউকে ছুঁতে দেব না—না, না, না।

[*পিছু সরে সরে প্রায় দেওয়ালের কাছে দাঁড়ায় গৌতম।*]

সোমেন্দু ॥ (*শান্ত গম্ভীর গলায়*) আপনি ওর কাছে থাকুন। আমি যাব। ওর কাছে এখন আপনারই থাকা উচিত। আমাকে বিশ্বাস করুন। চাবিটা আপনার কাছেই থাক, আপনিই প্রথম খুলবেন। আমি কেবল বাক্সটা এনে দেব। এটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে—আমার কাজটা পুরো করতে দিন। আমি পালাব না। বাগান তো উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, কি করে পালাব? বরঞ্চ আপনি বন্দুকটা হাতে ধরে থাকুন—আপনার সাহস বাড়বে। আর যাই হোক, বন্দুকের সঙ্গে আমি পারব না।

গৌতম ॥ আপনিই যাবেন তাহলে, যান। সিঁড়ির কাছে শাবলটা আছে।

সোমেন্দু ॥ (*নন্দিতার কাছে গিয়ে*) নন্দিতা দেবী, আপনি তাকান (*তাকায়*) খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে আপনি ফিরে আসুন, খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ফিরে আসুন।

[*সোমেন্দু একটু তাকিয়ে নন্দিতাকে দেখল। নন্দিতা ক্লান্ত চোখে তাকাল। মৃদু নিঃশব্দে হেসে সোমেন্দু বাগানের দিকে গেল।*]

গৌতম ॥ নন্দিতা দেবী, সেই বাক্সটার খবর আপনি এনেছেন। আপনি কতো বড় একটা ব্যাপার করেছেন, জানেন না। আপনি আমার দিকে তাকান, তাকান আমার দিকে। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনাকে যে দেখতে হবে। আপনি না দেখলে আমার ভাল লাগবে না। নন্দিতা দেবী, আপনার এখন একটু ভাল লাগছে? শুনতে পাচ্ছেন, সোমেন্দু বাবু শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন—শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন? মাটির তলা থেকে ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না উঠবে! আপনার দেখতে ইচ্ছা করে না?

[*নন্দিতা ক্লান্ত ঘাড় নাড়ল।*]

গৌতম ॥ আপনি আমার হাত ধরুন, খুব আস্তে আস্তে হাঁটুন। ভাল লাগবে, সুস্থ লাগবে।

[*হাত ধরে তুলে আস্তে হাঁটল।*]

গৌতম ॥ নন্দিতা দেবী, নন্দিতা—এই আমি প্রথম আপনাকে ছুঁলাম। এতো ভাল লাগছে আপনাকে। আমি আপনাকে কেবল নন্দিতা বলব। আপনার দৃষ্টির মত হাল্কা লাগবে নাম—নন্দিতা, নন্দিতা—কেবল নন্দিতা। তুমি কথা বল। তোমাকে পৌঁছে দেব আমি। পৃথিবীর যে যা খুশি বলুক, আমি মানব না, শুনব না। নন্দিতা, তোমার হাঁটতে

কষ্ট হচ্ছে? এইখানে বোস। (*বসল নন্দিতা, ওর মুখের দিতে গৌতম মগ্ন চোখে তাকাল*) কি আশ্চর্য! আমি আর 'আপনি' করে বলছি না। যেমন করে একটা ফুলের পাপড়ি অনায়াসে খুলে যায়, একটুও পরিশ্রম হয় না, তেমনি নিঃশব্দে, আনন্দে হঠাৎ আমি তোমাকে তুমি বলছি। নন্দিতা, নন্দিতা তুমি শুনতে পাও। (*নন্দিতার মুখটা মধুর দেখাল। অনেকটা স্পষ্ট তাকাল*) নন্দিতা, এক্ষুনি সেই বাক্সটা নিয়ে সোমেন্দু বাবু আসবেন, শাবলের শব্দ আর শুনতে পাচ্ছি না। কথা বল, আমাকে চিনতে পারছ? আমার নাম কি বল? বল?

নন্দিতা॥ (*ম্লান, অস্পষ্ট গলায়*) গৌ-ত-ম ব্যা-না-র্জি! গৌতম ব্যানার্জি!

গৌতম॥ আবার বল, স্পষ্ট করে বল।

নন্দিতা॥ গৌতম ব্যানার্জি; গৌতম—পারছি না, গৌতম, গৌতম—গৌতম—

[*মাথাটা টেবিলে নমিয়ে 'গৌতম' শব্দটা বার বার উচ্চারণ করল। যেন নামটা ওর সারা মনে মাখছে কষ্টে, সুখে, গোপনতায়।*]

গৌতম॥ আমার নাম তোমার মুখে কি সুন্দর। আমি জানতাম না, জানতাম না।

[*মাটি-মাখা কারুকার্য করা একটা ছোট বাক্স হাতে দরজার কাছে গম্ভীর মুখে এসে সোমেন্দু দাঁড়ায়।*]

গৌতম॥ (*প্রবল চীৎকার করে*) নন্দিতা, দ্যাখো, দ্যাখো—ওই সেই বাক্সটা, সেই বাক্সটা।

[*দৌড়ে এসে দু'হাতের মধ্যে নিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। নন্দিতা ওর দিকে ম্লান তাকিয়ে। খুব আস্তে এগিয়ে এল গৌতম।*]

গৌতম॥ কি ভীষণ হাল্কা বাক্সটা। যদি কিছু না থাকে! খুলতে আমার ভয় করছে নন্দিতা, ভীষণ ভয় করছে।

সোমেন্দু॥ চাবিটা আপনার কাছে। খুলুন।

গৌতম॥ খুলব?

সোমেন্দু॥ খুলতে তো হবেই, আমারও তো একটা পাওনা রয়েছে।

[*খুলল গৌতম। ডালাটা তুলে বিস্ফারিত তাকাল। মুখে একটা নিদারুণ বিস্ময় আর যন্ত্রণার ক্লান্তি ফুটে উঠল।*]

গৌতম॥ একি! এ আমি কি দেখছি! মণিমুক্তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই বাক্সে—কেবল আমার হাতের এই চাবিটার মতো আরেকটা চাবি—কেবল আর একটা চাবি। হা ঈশ্বর, আবার সেই চাবি!

সোমেন্দু॥ ওটাকে দু-ভাগ করা যায় না। আমি চলি। এ খেলায় আমার কি লাভ হল জানি না। যেটুকু এল পুরো আপনাদের থাক। নমস্কার, চলি এরকমই হবে আমি ভেবেছিলাম।

[*সোমেন্দু চলে গেল।*]

গৌতম॥ নন্দিতা, আমার কি ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। কী ভীষণ ক্লান্তি! নন্দিতা, এই

চাবিটা দিয়ে আমি কি আবার কোনও মণিমুক্তোর বাক্স খুঁজে পাব? তুমি আমার দিকে তাকাও, আমি কি আবার খুঁজে যাব? সমস্ত ঘরটার মত, দেয়ালের মত, হৃদয়টা কুপিয়ে কুপিয়ে আমি কি আবার খুঁজে যাব। (*নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে*) তোমার মুখ কি সুন্দর উদ্ভাসিত লাগছে, তোমার মুখে আমি কি দেখছি? তোমার দৃষ্টিতে আমি কি দেখছি? নন্দিতা, মনে হচ্ছে তোমার বুকের মধ্যে সেই কাজ করা মণিমুক্তোর বাক্সটা, আমি ওটাকে খুঁজে পাইনি এতোকাল... নন্দিতা তোমার মধ্যে এতো মুক্তো, এতো হিরে...সব ঐ বাক্সটায় সাজিয়ে রেখেছ। আমি এই হিরের আলোতে মুখ ডুবিয়ে রাখব; তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি কর—সমুদ্রে ছুঁড়ে দাও, আকাশে ছুঁড়ে দাও, পাতালে ছুঁড়ে দাও যা খুশি কর। কিন্তু নন্দিতা (*ভাঙাচোরা আর্তনাদের গলায়*) নন্দিতা, তোমার বুকের ভিতরের ঐ বাক্সটা খুললে যদি আবার সেই চাবি...কেবল একটা চাবি!

[*বিষণ্ণ মাথাটা ঝুলে পড়ল গৌতমের। নন্দিতা বিমর্ষ তাকিয়ে থাকল।*]

পর্দা

নাটক পরিচিতি ও আনুষঙ্গিক তথ্য

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১ম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে এগারটি পূর্ণাঙ্গ ও পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক। নাটককার মোহিতের প্রথম পর্বটি (যা সাধারণ্যে *কিমিতিবাদী* রূপে পরিচিত), এখানে স্থান পেয়েছে। নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে অন্তর্ভুক্ত হল :

কণ্ঠনালীতে সূর্য

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম নাটক। নাটকটি সেকালের উল্লেখযোগ্য নাট্যপত্রিকা 'গন্ধর্ব'-এর ১৯৬৩ সালে শারদীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তখন একজন সুপরিচিত আধুনিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' থেকেই কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটককার হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই নাটকটির চেহারা ও চরিত্র ছিল সমকালীন বাংলা নাট্যধারার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিমূর্ততা, অভিনব বিষয় ও ভাবনা, কাব্যময়তা 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকটিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এই রচনাটির নাট্যমূল্য যা-ই হোক না কেন সমকালীন নাট্যপ্রবাহে এটি নিয়মভঙ্গের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রকাশিত হবার পর 'গন্ধর্ব'-এর পক্ষ থেকে কবি ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় নাটকটি মঞ্চস্থ করার কথা ভাবেন। তাঁর নির্দেশনায় রিহার্সালও চলতে থাকে। 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় নাটকটির মঞ্চে আত্মপ্রকাশের বিজ্ঞাপনও বিভিন্ন সংখ্যায় ঘোষিত হয়েছে কিন্তু শেষপর্যন্ত 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' 'গন্ধর্ব'-এর প্রযোজনায় নানা কারণে মঞ্চস্থ হতে পারেনি।

সেকালে পাঠক-মহলে আদৃত হলেও নাট্যজগৎ নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তবে নাট্যমহলের অনেকেই নাটকটির প্রশংসা করেছেন। হয়তো এধরনের একটি নিয়মভঙ্গের নাটক দর্শক সমাজের অভ্যস্ত উপভোগে কি প্রতিক্রিয়া ঘটাবে সে সম্পর্কে তাঁদের দ্বিধা ছিল।

পরবর্তীকালে কলকাতা, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' মঞ্চস্থ হয়।

নীল রঙের ঘোড়া

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আড্ডায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজন বন্ধুর মুখে একটি বিদেশি গল্পের সারাংশ শোনেন। গল্পের আইডিয়াটি তাঁকে আন্দোলিত করে। তারই ফলশ্রুতি তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'নীল রঙের ঘোড়া'। নাটকটি ১৯৬৪ সালের অগস্ট-অক্টোবরের শারদীয় 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি থেকেই অনেকে বুঝে নিয়েছিলেন নিজস্ব একটি ভিন্ন পথেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাট্যরচনাকে পরিচালিত করতে চান।

এ নাটকটিও নাট্যমহলকে আকর্ষণ করেছিল কিন্তু কোনও সংস্থাই মঞ্চস্থ করতে উৎসাহী ছিলেন না।

দুবছর পর 'চতুর্মুখ' নাট্যসংস্থার নির্দেশক অসীম চক্রবর্তী নাটকটি মঞ্চে নিয়ে আসেন, প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ২০ এপ্রিল।

মৃত্যুসংবাদ

'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি থেকেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাট্যমঞ্চে যথার্থ প্রতিষ্ঠা পেলেন। 'মৃত্যুসংবাদ' নাটক এবং তার অসামান্য প্রযোজনা প্রথম অভিনয়ের দিন থেকেই আলোড়ন তুলেছিল। বাংলা নাটকের জগতে 'কিমিতিবাদ' শব্দটির জন্ম এই নাটকটিকে কেন্দ্র করেই। শব্দটির উদ্ভাবক 'মৃত্যুসংবাদ'-এর নির্দেশক শ্যামল ঘোষ। প্রথাবিরুদ্ধ নাটকের এমন প্রথাবিরুদ্ধ মৌলিক প্রযোজনার উদ্ভাস আজও সেদিনের অনেক দর্শক স্মরণ করে থাকেন।

শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় 'নক্ষত্র' নাট্যসংস্থা ১৯৬৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর 'মৃত্যুসংবাদ' মঞ্চস্থ করে। পরবর্তীকালে কলকাতার বাইরের কয়েকটি নাট্যদলও নাটকটির অভিনয় করেছে।

চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড

'বহুরূপী' পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে অগস্ট সংখ্যায় 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' মুদ্রিত হয়। কিছুটা পরিবর্তিত রূপে নাটকটি 'নক্ষত্র' সংস্থার পক্ষ থেকে শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৭ সালের ২৬ জুলাই। নাটকটি ও তার প্রযোজনা নাট্যকার ও নির্দেশকের খ্যাতিকে আরও উজ্জ্বল করে। যদিও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকগুলি সেকালের অনেকের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য, অদ্ভুত খেয়ালিপনা কিংবা নাটককারের উন্মাদনার (?!) ফলশ্রুতি বলে মনে হত তাহলেও 'রসজ্ঞ' দর্শক-সমালোচকদের উৎসাহ ছিল বলেই তিনি নাটক থেকে সরে যাবার কথা ভাবেননি।

আকাশবাণী 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটিকে জাতীয় বেতার নাটকের সম্মান দিয়েছিল। ফলে বাংলা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে নাটকটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে একযোগে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

গন্ধরাজের হাততালি

১৯৬৬ সালে 'গন্ধর্ব' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রখ্যাত নাট্যকার মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় 'ঋতায়ন' সংস্থা প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রযোজনাটি ছিল উপভোগ্য ও শিল্পগুণান্বিত।

ইতস্তত অনেক সংস্থাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নাটকটির অভিনয় করে।

দ্বীপের রাজা

১৯৬৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিন সরকারের একটি যুদ্ধবিমান যান্ত্রিক

গোলযোগের কারণে দক্ষিণ আমেরিকার একটি দ্বীপের প্রান্তরে নামতে বাধ্য হয়। বিমানটির মধ্যে হাইড্রোজেন বোমা মজুত ছিল। প্লেনটি গোলযোগ সারিয়ে উড়ে চলে যায়। কিন্তু সামরিক বিমান-আরোহীদের অগোচরে একটি বোমা সংলগ্ন তরমুজ খেতের মধ্যে থেকে যায়। ঐ দ্বীপের একজন আমুদে তরুণ ছেলে ঐ বোমাটি আবিষ্কার করে। তার নাম পেপে। পেপেই প্রথম মানুষ যে প্রবল ঘৃণায় হাইড্রোজেন বোমায় পদাঘাত করেছিল।

পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি 'দ্বীপের রাজা' নাটকের উৎস। নাটকটি শারদীয় 'থিয়েটার' পত্রিকায় বাংলা ১৩৭৫ সালে (১৯৬৬/৬৭) মুদ্রিত হয়।

'লোকায়ন' নাট্যসংস্থা অরুণ রায়ের নির্দেশনায় প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এ-নাটকের মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক রাজেন তরফদার।

পরবর্তীকালে অরুণ রায়ের সুযোগ্য পুত্র নব-পর্যায়ে 'দ্বীপের রাজা' মঞ্চস্থ করেন।

জামশেদপুরের 'বর্তিক' নাট্যসংস্থা থেকে প্রদীপ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'দ্বীপের রাজা'র একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা হয়।

সিংহাসনের ক্ষয়রোগ

একটি লিটল ম্যাগাজিনে 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' প্রকাশিত হয়। ঐ সময়েই ১৯৬৭ সালে প্রখ্যাত নট-নাট্যকার এবং নির্দেশক দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' মঞ্চস্থ করেন। তখন তাঁর পরিচালিত সংস্থার নাম ছিল 'অনুকার'। প্রযোজনাটি নাট্যরসজ্ঞ সমাজের খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

নিষাদ

'নিষাদ' প্রকাশিত হয় 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকার ১৯৬৮ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর শারদীয় সংখ্যায়।

পঙ্কজ মুন্সি 'থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ'-এর পক্ষ থেকে 'নিষাদ' মঞ্চস্থ করেন।

জামশেদপুরের 'বর্তিক' নাট্যসংস্থার নির্দেশক প্রদীপ চক্রবর্তী 'নিষাদ'-এর প্রযোজনা করেন। খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেছিল এই মঞ্চায়ন।

কিষেণকুমার 'নিষাদ'-এর হিন্দী রূপান্তর মঞ্চস্থ করেন 'আদাকার' সংস্থা থেকে। চমৎকার এই প্রযোজনার অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্বনামধন্য খালেদ চৌধুরীর মঞ্চনির্মাণ।

বাঘবন্দী

প্রথম প্রকাশ—'অভিনয় দর্পণ', শারদীয়, ১৯৬৯।

জামশেদপুরের 'বর্তিক' নাট্যসংস্থা 'বাঘবন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে ১৯৭০ সালে। পরিচালক ছিলেন প্রদীপ চক্রবর্তী।

সুব্রত নন্দী এবং অসিত বসুও বিভিন্ন সময়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তাঁদের সুযোগ্য নির্দেশনায়। সুব্রত নন্দীর নাট্যস্থংস্থার নাম ছিল 'থিয়েটার ফ্রন্ট' এবং অসিত বসুর নাট্যসংস্থার নাম 'ক্যালকাটা পিপল্‌স্ আর্ট থিয়েটার'।

ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা

প্রথম প্রকাশ—'অভিনয়' পত্রিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।

প্রথম অভিনয়—ডিসেম্বর ৪, ১৯৭০।

নির্দেশক—শ্যামল ঘোষ, নাট্যসংস্থা—'নক্ষত্র'।

মঞ্চ—পূর্ণেন্দু পত্রী।

শ্যামল ঘোষ নির্দেশিত এই প্রযোজনা প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালে শ্রদ্ধেয় বাদল সরকার তাঁর নিজস্ব রীতি ও ভাবনায় 'ক্যাপ্‌টেন হুর্‌রা' নাটকটি নতুনভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করেন। অনেকের কাছেই এই প্রযোজনাটি ছিল একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা।

অন্যান্য বহু সংস্থাও নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে।

গিনিপিগ/রাজরক্ত

'রাজরক্ত' নাটকটি 'গিনিপিগ' নামে 'বহুরূপী' পত্রিকার সেপটেম্বর, ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' সংস্থার নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নাটকটির শেষাংশ পরিবর্তন করে 'রাজরক্ত' নামে বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। 'রাজরক্ত' নামকরণও বিভাস চক্রবর্তীর এবং এ নাটকটি বিভাস চক্রবর্তীর অন্যতম স্মরণীয় প্রযোজনা।

হিন্দী ভাষায় রূপান্তরিত 'বহুরূপী'তে প্রকাশিত 'গিনিপিগ' সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করে। রাজিন্দরনাথ দিল্লিতে তাঁর 'অভিযান' নাট্যসংস্থার পক্ষ থেকে 'গিনিপিগ' মঞ্চস্থ করেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন কুলভূষণ খারবান্দা। সত্যদেব দুবে তাঁর 'থিয়েটার ইউনিট', মুম্বাই সংস্থার পক্ষ থেকে এই নাটকটি 'আচ্ছা, একবার অউর' নামে মঞ্চস্থ করেন। রাজাসাহেব চরিত্রে অভিনয় করেন অমরীশ পুরি। চিত্রা পালেকার এবং অমল পালেকার মারাঠি ভাষায় 'গিনিপিগ' মঞ্চস্থ করেন। 'পদাতিক'-এর পরিচালক শ্যামানন্দ জালানও নাটকটির প্রযোজনা করেন।

রাজনৈতিক কারণে সত্যদেব দুবে-র প্রযোজনা ভারত সরকার নিষিদ্ধ করেন। থিয়েটার ওয়ার্কশপ নানা প্রতিকূল অবস্থা ও পুলিশী হাঙ্গামা সত্ত্বেও 'রাজরক্ত' চালিয়ে যায়।

১৯৬৫ সালে কাফকার 'মেটামরফসিস' কাহিনী অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় একটি নাটক লেখেন। নামও থাকে 'মেটারমরফসিস'। কবি মৃণাল দেব 'বীক্ষণ প্রকাশনী' থেকে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য ও মেটামরফসিস' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এটিই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাট্যসংকলন। মেটামরফসিসের নাট্যরূপ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অপছন্দের কারণে বর্তমান নাট্যসংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

বর্তমান সংকলনের কয়েকটি রচনা বিদেশি নাটক বা কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত—

ক) নীল রঙের ঘোড়া—কফি হাউসে কোনও এক বন্ধুর মুখ থেকে শোনা একটি বিদেশি কাহিনীর 'আইডিয়া'র অনুপ্রেরণা থেকে রচিত।

খ) মৃত্যুসংবাদ—সিঞ্জ্‌-এর 'প্লেবয় অফ্ দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড'-এর ছায়ায় নির্মিত।

গ) চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড—জঁ জিরাদু-র একটি নাটক এর উৎস।

ঘ) সিংহাসনের ক্ষয়রোগ—নাটকের অংশবিশেষে একটি বিদেশি নাটকের ছায়াপাত রয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি :

কোনো নাটকের সঙ্গে দেশি বা বিদেশি অন্য কোন নাটক বা গল্প-কাহিনীর সাদৃশ্য বা ছোঁয়া থাকলে অনেকেই সে-নাটককে 'মৌলিক' বলতে চান না। যে-নাটক একশভাগ নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবন কেবল তাকেই এঁরা মৌলিক বলতে চান। আমার নিজের কিছু নাটকও বিদেশি রচনার সঙ্গে স্পর্শদোষের কারণে মৌলিক ভাবা হয় না।

আমার প্রশ্ন, শিল্পের অবলম্বন বা উপাদানকে চূড়ান্ত মনে করে শিল্পের মৌলিকত্বের বিচার যথার্থ হয় কি? দেশি, বিদেশি, নিজস্ব ভাবনা—যেখান থেকেই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করি না কেন, তা যথেষ্ট মূল্যবান হলেও নাটকের সর্বস্ব তো নয়। নাট্যকারের নিজস্ব ভাবুকতা, সৃজননৈপুণ্য যে নাটকের মধ্যে তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে, আমার ধারণায়, সে-নাটক মৌলিকত্ব অর্জন করেছে—অন্য যে কোন রচনার সঙ্গে তার যাবতীয় সাদৃশ্য ও সম্পর্ক সত্ত্বেও।

এই কারণেই রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করেও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' মৌলিক। মহাভারতের ঘটনা নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' মৌলিক। শেক্‌সপিয়ার তো হলিনশেড-এর 'ক্রনিক্‌ল্', 'ওন্ডার প্লেজ', অন্যান্য 'টেল্‌স' এবং ইতিহাস থেকে তাঁর নানা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কোথায়—শেকস্‌পিয়ারের মৌলিকত্ব নিয়ে তো কেউ প্রশ্ন করেন না? আসলে উপাদানের অবলম্বন নয়, সৃজনীশক্তির গুণেই কোন রচনা মৌলিক হয়ে ওঠে।

আমার নাটকে আমিও নানা নাটক ও কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি এবং নিজস্ব ভাবনা, দর্শন ও সৃজনীশক্তির গুণে তাকে মৌলিক করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছি।

বর্তমান সংকলনের ছোট নাটকসমূহ প্রসঙ্গে

রিঙ	—	'ক্ষপণক' পত্রিকায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত।
বাজপাখি	—	'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকার এপ্রিল, ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' ও অন্যান্য বহু সংস্থা নাটকটি মঞ্চস্থ করে।
মাছি	—	'থিয়েটার বুলেটিন' (১৯৭৮) নাটক সংখ্যায় প্রকাশিত। বেতার ও অন্যত্র নানা মঞ্চে অভিনীত।
ফিনিক্স	—	'শুধু থিয়েটার' (১৯৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত।
সোনার চাবি	—	'নক্ষত্র' সংস্থা কর্তৃক শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত। 'অভিনয়' পত্রিকার ১৯৭৩-এর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত।

বর্তমান নাট্যসংকলনের অন্তর্ভুক্ত নাটকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য ও বিবরণ যথেষ্ট অনুসন্ধান সত্ত্বেও সংগ্রহ করে ওঠা গেলনা। আশা করছি নাটকসমগ্রের শেষ খণ্ডের পরিশিষ্টে এসব তথ্য বিবরণ দিতে পারা যাবে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত

অন্যান্য নাটক-সমগ্র

উৎপল দত্ত নাটক-সমগ্র
সাত খণ্ড

***

মনোজ মিত্র নাটক-সমগ্র
তিন খণ্ড

***

প্রমথনাথ বিশী নাটক-সমগ্র
এক খণ্ড

***

তৃপ্তি মিত্র নাটক-সমগ্র
এক খণ্ড

***

চন্দন সেন-এর
নির্বাচিত নাটক

***

রমাপ্রসাদ বণিকের
খেলাঘর ও অন্যান্য নাটক